সূচীপত্র

বাঙ্‌লা ব্যাকরণ

বিষয়		পৃষ্ঠা
কারক : বিভক্তি : অনুসর্গ	....	১০৬
বিভক্তি	....	১১১
বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ	....	১৭৭
ক্রিয়াপদ	....	১৯৩
ক্রিয়ার প্রকারভেদ	....	২০৬
ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বচন	....	২১৫
অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য	....	২৪৮
সমাস	....	২৫৫
শব্দ প্রকরণ	....	২৯১
প্রত্যয় কৃৎ ও তদ্ধিত	....	৩০৫
উপসর্গ	....	৩৪৮
বাক্য প্রকরণ	....	৩৫৫
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন	....	৩৬৬
বাচ্য	....	৩৭৮
বাচ্য পরিবর্তন	....	৩৮০
শব্দার্থ বৈচিত্র্য	....	৩৯০
অলঙ্কার প্রকরণ	....	৩৯৩
ছেদ বিন্যাস	....	৪০১
পরিশিষ্ট	....	৪০২
অশুদ্ধি সংশোধন	....	৪০৫
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন	....	৪১৯

বিষয় পৃষ্ঠা

(উচ্চ-মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক হইতে)

রচনা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্ৰকৃতিৰ লীলানিকেতন আসাম	....	১
ভাৰতবৰ্ষৰ একটি সুপ্ৰাচীন তীৰ্থ	....	৪
শিলং-এর প্রাকৃতিক শোভা	....	৭
আসামের ভূমিকম্প	....	৮
আসামের জাতীয় উৎসব	....	১১
আসামের অরণ্য	....	১৪
গোপীনাথ বরদলৈ	....	১৬
লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া		১৮
দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন	....	২০
শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও	...	২১
লাছিৎ বরফুকন	...	২৩
সতী জয়মতী	...	২৪
বঙ্গানুবাদ		১

বাঙলা ব্যাকরণ

ভূমিকা-প্রকরণ

ভাষা

১। ভাষা মানব সভ্যতার প্রগতিপথের প্রধান পাথেয়। মানুষ সামাজিক জীব আর পরিবার হইল আদিম সমাজ। এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের নিকট নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করিল।

কণ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সহায়তায় বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণ দ্বারা মানুষ মনোভাব অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। বিশিষ্টভাবের প্রকাশের জন্য বিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি নির্দেশিত হইল। চিন্তাশক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধ্বনির সংযোগ-বিয়োগে ভাবাভিব্যক্তির যে সুসমঞ্জস রূপটি দেখা দিল তাহাই হইল ভাষা। পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, জাতি প্রভৃতিতে সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বিবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাবাভিব্যক্তি আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ভাষাও বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃতে 'ভাষ্' ধাতুর অর্থ 'বলা'। ভাষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'যাহা বলা হয়' [√ ভাষ্ + অঙ্ (কর্মবাচ্যে) + আ (স্ত্রীলিঙ্গে)]। লিপির আবির্ভাবের পূর্বে ভাবাভিব্যক্তির ধ্বনিময় রূপটিই ভাষা আখ্যা পাইয়াছিল। আদিগ্রন্থ বেদের 'শ্রুতি'-আখ্যা এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। অভিব্যক্ত চিন্তাধারাকে অধিকৃত স্থায়ী রূপ দান করিবার জন্য লিপির আবির্ভাব হইল। ধ্বনিবিশেষের দ্যোতক হইল অঙ্কিত চিহ্নবিশেষ বা **বর্ণ**, ধ্বনি সমূহের জ্ঞাপক **বর্ণমালা**। অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি সূচিত হইল সার্থক বর্ণসমষ্টি দ্বারা; অভিব্যক্ত মনোভাব লিপির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্থায়ী রূপ লাভ করিল। 'ভাষা'য়-ও অর্থের প্রসার ঘটিল। অভিব্যক্ত মনোভাব উচ্চারিত ধ্বনিময় হউক আর লিখিত বর্ণময় হউক উভয়ত্র **ভাষা আখ্যা** লাভ করিল।

ব্যাকরণের আবির্ভাব অনেক পরের ব্যাপার। কতকগুলি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের আদৌ আবির্ভাব ঘটে নাই। কতক ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইলেও উহা পরিপূর্ণ ও সংহত রূপ লাভ করে নাই। ব্যাকরণ সভ্যতার দান। সুতরাং সভ্যদেশের সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর ভাষারই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণ ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছেন। বিভিন্ন ভাষায় নানাপ্রকারে ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশিত হইয়াছে। ভাষার জন্ম-ইতিহাসের সহিত উহার সংজ্ঞার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। ভাষার জন্ম ও জীবনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এখন, ভাষার নিম্নোদ্ধৃত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইতে পারে—

মনোভাব-প্রকাশক বাগ্‌যন্ত্র-নিঃসৃত সার্থক ধ্বনিসমষ্টি বা তাহার লিপিবদ্ধ প্রতিরূপকে ভাষা বলে।

২। **বাঙ্‌লা ভাষা**—উপরিলিখিত ভাষার সংজ্ঞার সহিত বাঙালী জাতির সম্বন্ধ সংযোজিত হইলেই বাঙ্‌লা ভাষার সংজ্ঞা নিরূপিত হইবে—

বাঙালীর মনোভাব-প্রকাশক তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র-নিঃসৃত সার্থক ধ্বনিসমষ্টি বা তাহার লিপিবদ্ধ প্রতিরূপকে বাঙ্‌লা ভাষা বলে।

গতি জীবনের ধর্ম। যে ভাষার গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা মৃত ভাষা। বহমান বা গতিশীল ভাষাই জীবন্ত ভাষা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবন্ত ভাষা সমূহের মধ্যে বর্তমানে বাঙ্‌লা * সপ্তম স্থানের অধিকারিণী। ইহা অন্যূন ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা।

* ১। উত্তর চীনা (প্রায় ৭০ কোটি লোকের মাতৃভাষা), ২। ইংরাজী (প্রায় ১৮ কোটি লোকের ভাষা), ৩। রুশ (প্রায় ৮ কোটির ভাষা), ৪। জার্মান (প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষের ভাষা), ৫। জাপানী (অন্যূন ৬ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা), ৬। স্পেনীয় (প্রায় ৬ কোটির মাতৃভাষা)।

৩। **বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভব**—বাঙ্‌লা ভাষার স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার উদ্ভবের ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। বাঙ্‌লা ভাষার বয়স অধিক নহে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে আবিষ্কৃত আদিম বাঙ্‌লার নিদর্শন তৎকর্তৃক প্রকাশিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্‌লা ভাষায়

বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের বাঙ্‌লা ভাষাভাষীর পক্ষে ইহার অর্থবোধ সুসাধ্য নহে।

বিজিত অনার্য এবং অশিক্ষিত আর্যনারী ও শিশুগণের উচ্চারণ দোষে আর্যভাষা সংস্কৃত রূপান্তরিত হইল প্রাকৃতে। এই প্রাকৃতও আবার প্রদেশভেদে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিল। বঙ্গদেশে আগত আর্যগণের ভাষা ছিল মাগধী বা পূর্বী প্রাকৃত। অনার্য ভাষার সহিত সংমিশ্রণে প্রাকৃত ভাষাও স্বরূপভ্রষ্ট হইল। ইহাকে বলা হয় অপভ্রংশ। প্রাগার্য বাঙালীর ভাষার সহিত অপভ্রংশের মিশ্রণে আবির্ভূত হইল বাঙ্‌লা ভাষা। পরিবর্তনের ধারাটি বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	বর্তমান বাংলা
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কণ্‌হ	কাহ্ন, কান	কানু (—উ প্রত্যয় যোগে)
				কানাই (—আই „ „)
গ্রাম	গাম	গাৰঁ	গাঁও	গাঁ

প্রাচীনতম বাঙ্‌লা ভাষায় অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ অতি অল্পই ছিল। বরং প্রাগার্য বাঙালীর ব্যবহৃত শব্দই ছিল খুব বেশি। পরে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের প্রবেশে বাঙ্‌লা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করে। তাহার পরে মুসলমান আমলে আসিল আরবী-ফারসী শব্দ। ইউরোপীয় বণিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্‌লা বহু পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ইংরেজীরই প্রাধান্য। সুদীর্ঘকাল ইংরাজ-শাসনের ফলে ইহা ঘটিয়াছে। ইংরেজীর বাক্যগঠন পদ্ধতি ও যতিসংস্থান গ্রহণ করিয়া বাঙ্‌লা ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে।

৪। **সাধুভাষা**—সকল দেশে ও সকল ভাষাতেই ছন্দোবাহনে প্রথম সাহিত্যের আবির্ভাব। বাঙ্‌লাতেও উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। আদিযুগ ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য পদ্যে রচিত। কিন্তু মানুষ পদ্যে কথা বলে না। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য দীর্ঘদিন যাবৎ রচিত হইতে থাকিলেই উহার ভাষা ও মুখের ভাষার ব্যবধান বাড়িতে থাকে। তৃতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে গদ্য রচনার সূত্রপাত-কাল হইতে

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ অবধি বাঙ্‌লা গদ্য রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের করায়ত্ত থাকায় উহা সংস্কৃতশব্দবহুল হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশের এক অঞ্চলের মুখের ভাষা অন্য অঞ্চলে দুর্বোধ্য হওয়ায় সকল বাঙালীর সুখবোধ্য ভাষায় সাহিত্যরচনা অবশ্যম্ভাবী হইল। ফলে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাষা বাঙালীর মুখের ভাষা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। এই সাহিত্যের ভাষাকেই বলা হয় **সাধু ভাষা**। অবশ্য সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষায় অল্পবিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে।

৫। চলিত ভাষা—মানুষের যে ভাষায় কথাবার্তা চলে তাহাই তাহার মুখের ভাষা বা চলিত ভাষা। বাঙালীর কথা বলার ভাষাই চলিত বাঙ্‌লা ভাষা। এই চলিত বাঙ্‌লা অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। তাই ইহা প্রাথমিক যুগে সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ষোড়শ শতকে লোচনদাস-রচিত পদে প্রথম চলিত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহার পর অষ্টাদশ শতকে রচিত রামপ্রসাদী-গানে, ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি লোকসাহিত্যেই চলিত ভাষা সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্য-রচনায় চলিত ভাষার ব্যবহার করিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)। ইহা ছিল কলিকাতাবাসীর মুখের ভাষা। উহা স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দুষ্ট হইলেও সাহিত্যে চলিত ভাষার আবির্ভাব নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। এখন ভাগীরথীতীরবর্তী শিক্ষিত জনগণের মুখের ভাষাই আদর্শ **চলিত ভাষা**।

৬। সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা—ইংরাজী বাক্যগঠন নীতির প্রবর্তনে রামমোহনের হস্তে সাধুভাষার ভিত্তিমূল দৃঢ় হইল। যতি-সংস্থানে বিদ্যাসাগর উহাকে প্রাঞ্জল করিলেন। ভাষার তারল্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয়ে বঙ্কিমের হস্তে সাধুভাষা প্রাণপ্রাচুর্য লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র উহাকে সারল্যে ও সুষমায় মণ্ডিত করিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার আসনে স্থাপন করিয়াছেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম প্যাঁচা সাহিত্যে চলিত ভাষার গোড়াপত্তন করেন। বঙ্কিমের প্রশস্তিধন্যা চলিত ভাষা আজ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) কৃতিত্বে সর্ববিধ অশ্লীলতা হইতে মুক্ত হইয়া শুচিস্মিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। **সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার** প্রাথমিক ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে। আজ দুই ভাষা পরস্পরের নিকটে আসিয়াছে।

চলিত ভাষা কাজের ভাষা, তাহার সময় কম। তাই সাধু ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদকে সে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে,—

		সাধু	**চলিত**
(ক)	সর্বনাম	কাহার, যাহার, তাহার,	কার, যার, তার,
		কাহাকে, যাহাকে, তাহাকে,	কাকে, যাকে, তাকে,
		কাহাকেও	কাউকে
(খ)	ক্রিয়া	যাইতেছি, যাইত,	যাচ্ছি, যেত,
		করিতেছিলাম	করছিলাম,
		দেখিযাছিল।	দেখেছিল।

(গ) **চলিত ভাষায়** কতকগুলি বিভক্তি ও অব্যয় স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

অব্যয	হইতে	হ'তে, থেকে
	অপেক্ষা	চেয়ে
	দ্বারা, কর্তৃক	দিয়ে
	তজ্জন্য	তাই
	সুতরাং	কাজেই

(গ) **সাধু ভাষার** সমাসবদ্ধ পদ অনেকক্ষেত্রে **চলিত ভাষা** নিজ শব্দ দ্বারা ভাঙিয়া লইয়াছে—

বৃক্ষচ্যুত	গাছ-থেকে-পড়া
ভগ্নশাখ	ডাল-ভেঙে-যাওয়া
অজ্ঞাতনামা	নাম-না-জানা

(ঙ) **চলিত ভাষা** রাশি রাশি আরবী-ফারসী-ইংরাজী শব্দ নিজস্ব করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে ; **সাধু ভাষায়** ইহাদের সবগুলির স্থান নাই।

(চ) অসংখ্য বাগ্‌ধারা ও প্রবচন **চলিত ভাষার** বৈশিষ্ট্য ও **স্বকীয় সম্পদ** ; কিন্তু **সাধু ভাষাতে** উহাদের বেশীর ভাগই ব্যবহৃত হইতে পারে না বা **সাধু ভাষায়** উহাদিগকে রূপান্তরিত করাও চলে না। যেমন—'হাতের পাঁচ', সাপের পাঁচ পা দেখা **সাধুভাষায়** অচল। আবার ইহাদিগকে সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া 'হস্তের পঞ্চ' ও 'সর্পের পঞ্চপদ দর্শন' লিখিলে ইহাদের বাগ্‌ধারাত্বই লুপ্ত হয়।

(ছ) **চলিত ভাষার** আঞ্চলিক বিভিন্নতার মধ্যে সাহিত্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য **সাধু ভাষা** একান্ত প্রয়োজনীয়।

(জ) বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্যবিচার, দর্শন প্রভৃতির পরিভাষা ও আলোচনার ব্যাপারে বহু শব্দ গ্রন্থনের প্রয়োজন রহিয়াছে। সংস্কৃত শব্দে **সাধু ভাষার** পরিপুষ্টি বলিয়া উহাতে সংস্কৃত শব্দ ও ধাতুর সহিত কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া বা সমাসের সহায়তায় প্রয়োজনীয় নূতন শব্দ অনায়াসে গ্রথিত হইতে পারে। **চলিত ভাষার** এই সুযোগ নাই।

৭। **ব্যাকরণ**—'ব্যাকরণ' শব্দটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত। উহার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা—'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্'—যে শাস্ত্রে শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয় তাহাই ব্যাকরণ। বাঙ্‌লা ব্যাকরণের পরিধি অধিক বিস্তৃত। ইংরেজী Grammar-এর প্রতিশব্দরূপে বাঙ্‌লায় 'ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে বলিতে পারা যায়—

যে বিজ্ঞান বলে কোন ভাষার বিশ্লেষিত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় এবং উক্ত ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহাই সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar)।

বাঙ্‌লায় এই অর্থেই ব্যাকরণ শব্দটি প্রযুক্ত—

যে শাস্ত্র বাঙ্‌লা ভাষার স্বরূপটি বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝাইয়া দেয় এবং যাহার সাহায্যে বাঙ্‌লা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহাকে বাঙ্‌লা ব্যাকরণ বলে।

৮। **উপসংহার**—বাঙ্‌লায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়ই সম-প্রয়োজনীয়। বিষয় অনুসারেই ভাষা নির্বাচিত হইবে। বিষয় লঘু ও তরল হইলে **চলিত ভাষাই** সবিশেষ উপযোগী। বিজ্ঞান দর্শনাদির মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় **সাধু-ভাষাই** প্রযোজ্য। কবিতায় ও সংবাদ-সাহিত্যে **সাধু ভাষা** ও **চলিত ভাষা** উভয়েরই স্থান রহিয়াছে। অতএব বাঙ্‌লা ব্যাকরণে উভয় ভাষাই আলোচ্য। **ছন্দঃ** ও **অলঙ্কার** ব্যাকরণের বিষয়ীভূত নহে; তথাপি বাঙ্‌লা ব্যাকরণের সহিত বাঙ্‌লা ছন্দ ও অলঙ্কারের আলোচনা করা একটা রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও

অলঙ্কার আলোচিত হইবে। আলোচ্য বিষয় পাঁচটি প্রকরণে বিভাজ্য—১। **বর্ণ ও ধ্বনি**, ২। **পদ**, ৩। **শব্দ**, ৪। **বাক্য** ৫। **অলঙ্কার**।

৯। সাধু ভাষার চলিত ভাষায় এবং চলিত ভাষার সাধু ভাষায় রূপান্তর—

(ক) **সাধু ভাষা**—প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি, শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

চলিত ভাষা—চলে যাবার সময়....হ'ল। ....শকুন্তলার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হ'লেন।........যা পারলেন সাজসজ্জার ব্যবস্থা করে দিলেন।...... শোকে কাতর হ'য়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—আজ.. যাবে ব'লে....উৎকণ্ঠিত হ'চ্ছে; চোখ জলে ভ'রে যাচ্ছে; গলা ধরে গিয়ে, কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি, জড়তায় একেবারে মুষড়ে পড়ছি।

(খ) **চলিত ভাষা**—রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজেদের বিচার শেষ করে বসে আছ। সঙ্গ, যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন—রাজ্যেশ্বর। সুরজমল বসেছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন—হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার।

সাধু ভাষা—রাজকুমার, তোমরা আপনারা আপনাদের বিচার সম্পূর্ণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছ। সঙ্গ, যিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ব্যাঘ্রচর্মে বীরাসনে, তিনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত স্থানে রহিয়াছেন—রাজ্যেশ্বর। সুরজমল উপবেশন করিয়াছেন ভূমিতে —সঙ্গের সন্নিহিত ভূমিতে, সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে ভূমিতে উঁহার অধিকার, সিংহাসনের সন্নিকটে উনি অবস্থান করিবেন—হয় মন্ত্রী, না হয় দলপতি, না হয় ভূস্বামী (জমিদার)।

(গ) **সাধুভাষা**—পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা উপবেশন করিয়াছ—সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছিন্ন কন্থায়—সুতরাং ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ব্যতীত তোমাদের ললাটে আর কিছুই নাই।

চলিত ভাষা—পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ—সন্ন্যাসিনী যে আমি আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়—কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই।

লক্ষণীয়—রচনায় সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়, অতএব বর্জনীয়। এইরূপ মিশ্রণকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। 'শবপোড়া' বা 'মড়াদাহ' হইবে না, 'শবদাহ' বা 'মড়াপোড়া' বলিতে হইবে।

অনুশীলনী

১। ভাষা কী? ভাষার বিভিন্নত্বের কারণ কী?

২। বাঙলা ভাষা কাহাকে বলে? উহার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। সাধুভাষা কী? চলিত ভাষাই বা কী?

৪। সাধু বাঙলা ও চলিত বাঙলার প্রভেদ কী?

৬। ব্যাকরণ কাহাকে বলে? বাঙলা ব্যাকরণ বলিতে কি বুঝায়?

৭। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় এবং চলিত ভাষাকে সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর :—

(ক) শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিমগতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা। এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

(খ) রাণার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্ত্রের ঘা খেয়ে মহারাণা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন।

(গ) সমারোহসহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নভাব শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়।

(ঘ) এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এলো। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস, চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো অথচ দেখতে সুপুরুষ।

(ঙ) হুজুর জানতুম ছোকরা বয়সে। তারপর আজ বিশ পঁচিশ বৎসর লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি : তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙ্গি কী করে।

(চ) এক কালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি।

(ছ) নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনী মৃদুগীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল।

(জ) মনে কোরোনা তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই যদি হয় তো বড় ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করো গে।

———

বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ

ভাষার মৌলিক উপাদান—ধ্বনি ও বর্ণ

মনোভাবের অভিব্যক্তির নিমিত্ত ভাষার সৃষ্টি। একটি সম্পূর্ণ মনোভাবের ধারক একটি **বাক্য**। **বাক্য** রচিত হয় কতকগুলি **পদের** (বিভক্তিযুক্ত **শব্দের**) সমন্বয়ে। **শব্দ** বিভিন্ন ধ্বনির সমবায়ে গঠিত হয় এবং একটি অর্থ প্রকাশ করে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, **ভাষার অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম উচ্চারিত অংশই ধ্বনি।**

"আমি ব্যাকরণ পড়ি" বলিলে একটি মনোভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। সুতরাং ইহা একটি **বাক্য**। এই বাক্যকে ভাষার **একক** বলা চলে। এই **বাক্যে** 'আমি', 'ব্যাকরণ" ও 'পড়ি'—এই তিনটি বিভক্তিযুক্ত **শব্দ** বা **পদ**। 'আমি' শব্দে আ+ম্+ই—তিনটি **ধ্বনি**, 'ব্যাকরণ' শব্দে ব্+য্+আ+ক্+অ+র্+অ+ণ্—শব্দে ৮টি **ধ্বনি** এবং 'পড়ি' শব্দে প্+অ+ড়্+ই—চারিটি **ধ্বনি** রহিয়াছে। ইহাদিগকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না।

কেবল সমীপবর্তী ব্যক্তির নিকট মনোভাব প্রকাশ করিয়া মানুষের তৃপ্তি ঘটে নাই, দূরগত জনকেও তাহার আপন মনের কথা জানাইবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে আরও একটি কথা তাহার মনে জাগে—সে যাহা বলিতেছে তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? আগামী দিনের মানুষ—তাহার স্বজাতি, তাহার বংশধর কি তাহার মনোভাবের পরিচয় পাইবে না? ফলে আবিষ্কৃত হইল **লিপি**। উচ্চারিত **ধ্বনির** প্রতীক বা সঙ্কেতচিহ্ন স্থিরীকৃত হইল। ইহাই **বর্ণ**।

ভাষার অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম লিপিবদ্ধ অংশকে বর্ণ বলে। ধ্বনিসমূহের নির্দেশক সঙ্কেতচিহ্নগুলির সমষ্টিকে বর্ণমালা (Alphabet) বলে।

বর্ণ ও **অক্ষর** এক নহে। একবারে ও অনায়াসে উচ্চারিত এবং এক বা একাধিক ধ্বনি দ্বারা গঠিত শব্দাংশকে **অক্ষর** (Syllable) বলে। প্রত্যেক অক্ষরেই একটি **স্বরধ্বনি** থাকিবে। যথা—মা (১টি অক্ষর), মাতা (২টি অক্ষর) মাতার (মা-তার—

২টি অক্ষর), মাতাকে (মা-তা-কে—৩টি অক্ষর), ইত্যাদি। অনেক সময় '**বর্ণ**' অর্থেও '**অক্ষর**' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাষা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল সম্পূর্ণ উচ্চারণগত ও শ্রবণসাধ্য। অনেক কাল পরে বর্ণমালার আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ তাহাকে করিল লিপিবদ্ধ ও দর্শনের বিষয়ীভূত। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা এক যুগান্তকারী ঘটনা।

বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

স্বর ও ব্যঞ্জন

'আমি' (আ+ম্+ই) শব্দটিতে তিনটি ধ্বনি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'আ' এবং 'ই' স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করিতে কোনও অসুবিধা হয় না ; কিন্তু 'ম্'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ হয় না। এইরূপ উচ্চারণের ভিত্তিতে ধ্বনিসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

অন্য ধ্বনির সহায়তা ব্যতীত যে সকল ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইতে পারে তাহাদিগকে স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির প্রতীকসমূহই স্বরবর্ণ (Vowels); যথা—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, (*ৠ, ঌ, ৡ—বাঙলায় নাই), এ, ঐ, ও, ঔ—বাঙলায় স্বরবর্ণ এই ১১ টি।

স্বরধ্বনির আশ্রয় ব্যতীত যে সকল ধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণ সম্ভবপর নহে তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনধ্বনি-নির্দেশক চিহ্নসমূহকে ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants) **বলে** ; যথা—

ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ ; চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্ ; ট্, ঠ্, ড্ (ড়্), ঢ্ (ঢ়্), ণ্ ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ ; প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ ; য্, র্, ল্, ব্। শ্, ষ্, স্, হ্

*এই ৩৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা স্বয়ং স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। ইহাদের পূর্বে বা পরে স্বরের যোগ থাকিলে উচ্চারণে অসুবিধা হয় না ; যেমন—'অক্' বা 'ক' (ক্ + অ) ; 'আম্' বা 'মা (ম্+আ) ইত্যাদি।

ক্ষ্—ইহাকে কেহ কেহ একটি পৃথক্ ব্যঞ্জনবর্ণ মনে করিয়া বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত

করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা একটি যৌগিক ব্যঞ্জন অর্থাৎ 'ক্' ও 'ষ্' এই দুইটি ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত।

ড়, ঢ়, য়—সংস্কৃতে এই তিনটি বর্ণ 'ড', 'ঢ' ও 'য' এর বিকারমাত্র অর্থাৎ উহাদের স্পষ্টতর ও কিঞ্চিৎ পৃথক্ উচ্চারণের ফল। কিন্তু কেহ কেহ বাঙ্‌লায় উহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনধ্বনিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ং (**অনুস্বার**)—স্বরের 'অনু' অর্থাৎ পরে অবস্থিত ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্ ও ম্-এর স্থানে ইহার উদ্ভব হইলেও বাঙ্‌লায় ইহাকে স্বতন্ত্রধ্বনি-সঙ্কেত বলিয়া ধরা হয়।

ঃ (**বিসর্গ**)—'র্', 'স্' এর স্থানে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহাকেও পৃথক্ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ধরা হইয়া থাকে।

ঁ (**চন্দ্রবিন্দু**)—স্বরের নাসিক্য উচ্চারণ জ্ঞাপনের জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়; যেমন—আঁধার ('আ') এর নাসিক্য উচ্চারণ, খুঁটি ('উ'—এর নাসিক্য উচ্চারণ), ইত্যাদি। চন্দ্রকলার উপরে বিন্দু স্থাপন দ্বারা ইহার দেহটি গঠিত বলিয়া ইহাকে **চন্দ্রবিন্দু** বলা হইয়াছে।

* ব্রাহ্মী লিপি হইতে বিবর্তিত বাংলা বর্ণমালায় প্রথমতঃ সংস্কৃত ধ্বনিসমূহই স্থান পাইয়াছিল। ম গতিশীলা বঙ্গভাষা কয়েকটি সংস্কৃত ধ্বনিকে বর্জন করিয়াছে, আবার বহু নূতন ধ্বনির আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। কিন্তু বর্ণমালা হইতে যেমন বর্জিত ধ্বনিগুলির প্রতীক বাদ যায় নাই, তেমনই নূতন ধ্বনির সূচক নূতন বর্ণও নির্মিত হয় নাই। সংস্কৃত 'ঋ' 'ঌ' 'ণ' 'ষ'-এর উচ্চারণ 'বাংলায় নাই, আবার বাংলা অ্যা', 'এই,' 'উও', 'আইও' প্রভৃতি ধ্বনির জ্ঞাপক সঙ্কেতচিহ্ন প্রস্তুত হয় নাই।

স্বরবর্ণের প্রকারভেদ

(ক) উচ্চারণকাল অনুসারে স্বরবর্ণ দ্বিধা বিভাজ্য—**হ্রস্ব স্বর** ও **দীর্ঘ স্বর**। নাড়ীর দুইটি স্পন্দনের মধ্যবর্তী সময় ১ মাত্রা। **যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণকাল একমাত্রা তাহাদিগকে হ্রস্বস্বর বলে।** যথা—অ, ই, উ, ঋ, (ঌ)। **যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণকাল দুইমাত্রা তাহাদিগকে দীর্ঘস্বর বলে।** যথা—আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

স্বভাবতঃ হ্রস্বই হউক আর দীর্ঘই হউক, দূর হইতে আহ্বান রোদন

এবং গানে যে সকল স্বরের উচ্চারণ তিনমাত্রা বা তাহারও অধিককাল স্থায়ী হয় তাহাদিগকে প্লুতস্বর বলে ; যথা—মা-আ-আ-আ (—এর **আ-কার**) বাবাগো-ও-ও-ও-ও (-এর **ও**-কার), ইত্যাদি।

(**খ**) **গুণস্বর—'অ'**-কারের সহিত মূলস্বরধ্বনির যোগে উৎপন্ন হয়। যথা—

মূলস্বর	গুণ	মূলস্বর	গুণ
অ + আ =	**আ**	**অ** + উ, ঊ =	**ও**
„ + ই, ঈ =	**এ**	„ **+** ঋ =	**অর্**

বৃদ্ধিস্বর—'অ' কারের সহিত **গুণ** যুক্ত হইলে স্বরের **বৃদ্ধি** হয়।

মূলস্বর গুণ	বৃদ্ধি	মূলস্বর গুণ	বৃদ্ধি
অ+অ, আ (অ, আ) =	**আ**	**অ**+ও (উ, ঊ) =	**ঔ**
অ+এ (ই ঈ) „ =	**ঐ**	অ+অর্ (ঋ) =	**আর্**

(**গ**) **মৌলিক স্বর**—শুদ্ধ স্বরধ্বনিকেই মৌলিক স্বর বলে। বাংলায় এই প্রকারের স্বর ছয়টি বলা যায ; যথা—**অ, আ, ই, উ, এ, ও**।

যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর—বর্ণমালায যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যক্ষর দুইটি—**ঐ, ঔ** (সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ এই চারিটিকে সন্ধ্যক্ষর বলা হইযাছে)। অনেকের মতে, **দুইটি স্বরধ্বনি যুগপৎ অতিদ্রুত উচ্চারণের ফলে যে স্বরধ্বনির উদ্ভব হয় তহাকে** তাহাকে **সন্ধ্যক্ষর** বলে ; যথা **ঐ** (উচ্চারণ—'অই' বা 'ওই'), **ঔ** (উচ্চারণ—'অউ বা 'ওউ')। **সন্ধ্যক্ষর*** (সন্ধি-জাত অক্ষর) কথাটি সংস্কৃত হইতে আহৃত। দুইটি বা ততোধিক বেশি স্বরের মিলনে উৎপন্ন স্বরধ্বনি দ্বারা একটি অক্ষর (Syllable) সূচিত হইলেই তাহা **সন্ধ্যক্ষর** বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরপর উচ্চারিত স্বরধ্বনিতে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর (Syllable) সূচিত হইলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া **সন্ধ্যক্ষর** আখ্যা দেওযা যুক্তিসিদ্ধ নহে। '**ঐ**' এবং '**ঔ**' এর উদ্ভব ও প্রয়োগে এই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বলিয়া উহারাই প্রকৃত সন্ধ্যক্ষর।

* ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫টি সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিক স্বরধ্বনির উল্লেখ করিয়াছেন ইহাদের অধিকাংশই একাক্ষর নহে। অথচ একাক্ষর না হইলে সন্ধ্যক্ষর হইতে পারে না। 'হেঁইও', 'নাইয়া', যাইও প্রভৃতি ত্র্যক্ষর (trisyllabic) শব্দ। সুতরাং 'এইও', 'আইআ' 'আইও' প্রভৃতিকে কোন্ যুক্তিতে সন্ধ্যক্ষর বলিব ?

বাঙ্‌লা স্বরবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

অ

ইহার উচ্চারণ দ্বিবিধ—(ক) স্বকীয়, স্বাভাবিক সহজ, প্রকৃত বা বিবৃত (ইংরেজী **cot, fox, got,** প্রভৃতির o-এর মত।) এবং (খ) পরকীয়, অস্বাভাবিক, অপ্রকৃত, সংবৃত বা ও-কার ঘেঁষা। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

বিবৃত	**সংবৃত**
কবা	[কোরি] করি
বল	[বোলী] বলী
পণ (প্রতিজ্ঞা)	[পোন্] পণ (২০ গণ্ডা)
বন্ধন	[বোন্ধু] বন্ধু
সৎ	[সোতী] সতী
জন	[জোন্ন] জন্য
অবোধ	প্রবোধ [প্রোবোধ্]
অনৃত	[বোক্‌তৃতা] বক্তৃতা
যজন	যজ্ঞ [যোগ্‌গঁ]
অ-ক্ষর	[ওক্ষর্] অক্ষব
অ-তুল (তুলনাহীন)	[ওতুল্] অতুল (নাম)
সবিনয	[সোহিত্] সহিত

উপরিলিখিত উদাহরণগুলি হইতে **অ**-এর উচ্চাবণ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম স্থিরীকৃত হইতে পারে।

(৵০) ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, য্-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ-এর পূর্ববর্তী **অ**-কারের প্রায়শঃ সংবৃত বা ও-কার ঘেঁষা উচ্চাবণ হয়—করি, বলী, বন্ধু, জন্য, যজ্ঞ, অক্ষর বক্তৃতা।

ব্যতিক্রম—অণিমা, অক্ষ, লক্ষ্মণ, (কিন্তু লক্ষণ—লোক্‌খন্) ইত্যাদির আদ্য **অ**-এব উচ্চারণ বিবৃত।

(৵০) শব্দের আদিতে অবস্থিত নিষেধার্থক **অ**-বা **অন্**-এর **অ** বিবৃত—অ-ক্ষর, অ-তুল, অ-নিয়ম, অ-ধীর, অনুচিত।

ব্যতিক্রম—নিষেধ ছাড়া অন্য অর্থে বা ব্যক্তির নাম বুঝাইলে **অ**-এর উচ্চারণ সংবৃত হইবে—অক্ষর (Syllable), অতুল (ব্যক্তির নাম), অধীর (ব্যক্তির নাম)।

(৶০) শব্দের আদিতে অবস্থিত সহার্থক '**স**' এবং সম্পূর্ণার্থক **সম্**-এর **অ** বিবৃত হইয়া থাকে—সবিনয, সম্প্রীতি।

(।০) **প্র** উপসর্গের **অ** সংবৃত হয—প্রবোধ, প্রণাম, প্রবেশ।

(।৴০) একাক্ষর শব্দের অন্তে **ণ** বা **ন** থাকিলে আদ্য **অ** সংবৃত হয—পণ [পোন-২০ গণ্ডা], মন [মোন্], বন [বোন্]।

ব্যতিক্রম—পণ [প্রতিজ্ঞা], রণ, সন, গণ প্রভৃতির আদ্য **অ** বিবৃত।

(।৵০) ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ ভিন্ন অন্য স্বরান্ত বর্ণের পূর্ববর্ত্তী **অ**-এর বিবৃত উচ্চারণ হয়—সবল, করা, মরে, মহৈশ্বর্য, কও, মহৌষধি।

(।৶০) অনুকার ও ভাববাচক অব্যয়ের আদ্য **অ** বিবৃত এবং অন্ত্য **অ** উচ্চারিত হইলে সংবৃত হইয়া থাকে—কড্-কড্, শন্-শন্, মর-মর, [মরো-মরো], ঝর-ঝর [ঝরো-ঝরো]।

(॥০) কতকগুলি (ক) বিশেষণ, (খ) সর্বনামীয় বিশেষণ, (গ) 'আন'-প্রত্যযান্ত এবং (ঘ) সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য **অ** সবৃংত হইয়া থাকে।

(ক) বিশেষণ—কাল [কালো], ভাল [ভালো], খাট [খাটো]।

(খ) সর্বনামীয বিশেষণ—কত [কতো], এত [এতো], কোন [কোনো]।

(গ) -'আন'-প্রত্যযান্ত শব্দ—দেখান [দেখানো], বসান [বসানো]।

(ঘ) সংখ্যাবাচক শব্দ—এগার [এগারো] হইতে আঠার [আঠারো]।

(॥৴০) সংস্কৃতে **হল্** বা **হস্** শব্দে ব্যঞ্জন বুঝায়। তাই কোন ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরবিহীন উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য যে চিহ্নটি ব্যবহৃত হয তাহাকে **হস্, হল্** বা **ব্যঞ্জন** চিহ্ন (্) বলে। যে বর্ণের নিম্নে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয তাহাকে **হসন্ত, হলন্ত** বা **ব্যঞ্জনান্ত** বর্ণ বলে।

[অনেকে ঐ চিহ্নকেই ভুল করিয়া হসন্ত বলিয়া থাকে 'হস্ অন্তে যাহার' তাহাই হসন্ত—একথা ভুলিলে চলিলে না।]

বাংলায় শব্দের অন্ত্য **অ**-কারকে লুপ্ত করিয়া উহার হসন্ত উচ্চারণের প্রবণতা রহিয়াছে ; যেমন—বাঘ [বাঘ্], কান [কান্], হাত [হাত্], কারণ [কারণ্], ব্যঞ্জন [ব্যঞ্জন্], ইত্যাদি। শেষে '-ক্ত' বা '-ইত' প্রত্যয়ের **ত** বা **ঢ়**, **হ** এবং যুক্তাক্ষর থাকিলে অন্ত্য অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ হয ; যথা—জাত [জাতো], প্রভাবিত [প্রভাবিতো], শিহরিত [শিহরিতো], মূঢ় [মূঢ়ো], সিংহ [সিংহো], প্রসন্ন [প্রসন্নো], চন্দ্র [চন্দ্রো]।

ব্যতিক্রম—সঙ্গীত [সংগীত্], উচিত [উচিত্], কুৎসিত [কুৎসিত্], আষাঢ় [আষাঢ়্], রহিত [রোহিত্], গর্হিত [গর্‌হিত্] ইত্যাদি।

(৷৶৹) অনেক স্থলে অন্ত্য **অ**-কারের সংবৃত ও হসন্ত উচ্চাবণের দ্বাবা ভিন্নার্থক শব্দ সূচিত হয ; যেমন—

জাত { জাতো = উদ্ভূত।
জাত্ = জাতি < জাইত < জা'ত।

কাল { কালো = কৃষ্ণবর্ণ।
কাল্ = কল্য < কালি < কাইল < কা'ল।

খাট { খাটো = বেঁটে।
খাট্ = পালঙ্ক।

গীত { গীতো = গাওযা
গীত্ = গান।

(৷৷৶৹) অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ)-এর পরবর্তী অন্ত্য **অ** সংবৃত—অংশ [অংশো], ধ্বংস [ধ্বংসো], দুঃখ [দুক্‌খো]।

(৵৹) আদ্য **অ**-কারের আর একটি অবিশুদ্ধ উচ্চারণ শোনা যায। ইহা বিবৃত **এ**-কারের মত ; যেমন ব্যক্তি [বেক্তি], ব্যবসায় [বেবসায], ব্যবহার [বেবহার] ইত্যাদি। মনে হয **য** (ইঅ)-এর **ই**-র টানে, **অ**-কার বিবৃত **এ**-কারে পর্যবসিত হইয়াছে। এই ভুল উচ্চারণের জন্য অনেকে এই সকল শব্দের বানানে ভুল করিয়া ব্যাক্তি, ব্যাবহার, ব্যাবসায—এইরূপ লিখিয়া থাকে।

অ হ্রস্ব স্বর ; কিন্তু বাঙলায় ইহার কখনও অর্ধমাত্রিক, কখনও বা দীর্ঘ উচ্চারণও হইয়া থাকে ; জল [দীর্ঘ], কিন্তু জলটুকু [হ্রস্ব], চট [পাটের তৈয়ারী, হ্রস্ব], কিন্তু চট্ [দ্রুত ' অর্ধমাত্রিক]। যুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত অ-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

———

আঁ

সংস্কৃতে **আ** দীর্ঘস্বর। কিন্তু বাঙ্‌লায় প্রায়শঃ ইহাব হ্রস্ব বা একমাত্রিক উচ্চারণ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত স্থলে **আ**-এর উচ্চারণ দীর্ঘ বা একমাত্রিক বলা যায় :—

(ক) একাক্ষর শব্দে—**মা, খা, যা, চা** [প্রার্থনা করা], **না, আম** [আ-ম্], **রাম** [রা-ম্], ইত্যাদি। কোন কোন বর্ণের বিশেষতঃ **ই** বা **উ** লুপ্ত হইয়া শব্দ একাক্ষরে পরিণত হইলে **আ** দীর্ঘ হইবে—আজ [**আজ্**>আইজ>আজি], **কাল** [কা-ল্ >কাইল>কালি], **ধাত** [ধা-ত>ধাউত>ধাতু], **জাত** [জা-ত্>জাইত্> জাতি], **বাঁ** [বাঁ<বাঁও>বাম], **ডান** [ডা-ন্>ডাইন>ডাহিন], ইত্যাদি।

(গ) স্বরমাত্রিক ছন্দে—**আ**-সিল যত বীরবৃন্দ **আ**-সন তব ঘেরি।

দিন **আ**-গত ঐ
ভা-রত তবু কই ?

(ঘ) যুক্ত বর্ণের পূর্বে—**আত্মা, আত্মীয, আস্থ, আখ্যা আশ্চর্য,** ইত্যাদি।

(ঙ) নঞর্থক [না-বাচক] 'অ'-এর স্থলে আগত **আ** ও অভাবার্থক **হা**-এর **আ**- দীর্ঘ হইযা থাকে—**আ**-ধোযা, **আ**-চমকা, **আ**-কাঁড়া, **হা**-পিত্যেশ, **হা**-ঘরে।

আছোলা, **আ**নাড়ী, **আ**কাল, **হা**ভাত—প্রভৃতি স্থলে হ্রস্ব, দীর্ঘ উভয়বিধ উচ্চারণই শ্রুত হয়।

ই, ঈ

বাঙ্‌লায ই, ঈ-এর উচ্চাবণে কোন প্রভেদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; যেমন— দিন [দিবস], দীন [দরিদ্র] ; চির [দীর্ঘকাল] ; চীব [ছিন্নবস্ত্র] নিতি [প্রত্যহ] ; নীতি [নিযম]।

(ক) কয়েকটি তৎসম শব্দে **ঈ**-এব উচ্চাবণ দীর্ঘই হইয়া থাকে—বি**লীন, প্রীতি ভীত, ধীমান্, বীতশ্রদ্ধ, নীপ,** অ**ধীত, জীবাশ্ম, গীত** [ক্রিযাজাত বিশেষণ কর্মবাচ্যে, বিশেষ্যে হ্রস্ব উচ্চারণ]।

(খ) স্বরমাত্রিক ছন্দে **ঈ** দ্বিমাত্রিক বা দীর্ঘ—উতল সাগরের অ**ধীর** ক্রন্দন। **নী**রব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

(গ) যুক্তবর্ণের পূর্বে **ই, ঈ** উভয়েরই উচ্চারণ সমান দীর্ঘ বা **দ্বিমাত্রিক,** এবং এক**ই**

প্রকারের—ইন্দ্র, ইত্যাদি, ইক্ষু, নিত্য—এর ই এবং বীর্য, আকীর্ণ, বিদীর্ণ, বীক্ষণ—এর ঈ একই ভাবে উচ্চারিত হয়।

উ, ঊ

বাঙ্‌লায় ইহাদের উচ্চারণেও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ উ, ঊ উভয়েই উ-এর মত উচ্চারিত হয়—কুল [বংশ, ফলবিশেষ] কূল [তীর]; সুত [পুত্র]—সূত [সারথি]—এর উচ্চারণে কোনও প্রভেদ নাই। আবার যুক্তবর্ণের পূর্বে বসিলে উ, ঊ দুইটিই ঊ-এর সংস্কৃত উচ্চারণের মত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইয়া যায়—উদ্দাম, উদ্বেগ, উচ্ছ্বাস-এর উ এবং মূর্খ, পূর্ণ, সূর্য—এর ঊ সমভাবে উচ্চারিত হয়।

(গ) কয়েকটি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দে ঊ-এর স্বকীয় দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ রহিয়াছে—অন্যূন, অভূতপূর্ব, মূঢ়, রূঢ়, প্রভূত, ইত্যাদি।

ঋ (ৠ, ঌ)

ইহাদের মধ্যে ৠ ও ঌ বাঙ্‌লায় নাই। ঋ-এর উচ্চারণ প্রায় রি-এর মত হইলেও সম্পূর্ণ একরূপ নহে। খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দে ঋ চলে না। অবিকৃত সংস্কৃত শব্দে ঋ রহিয়াছে এবং উহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সবিশেষ লক্ষণীয়। উচ্চারণে র্‌-যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়, কিন্তু ঋ-যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইবে না—কৃত [কিন্তু ক্রীত = ক্‌ + র্‌ + ঈ + ত], বৃত [কিন্তু ব্রীডা = ব্‌ + র্‌ + ঈ + ডা]। আবৃত্তি, অদৃষ্ট, বিশৃঙ্খল, বিজৃম্ভণ—অনেকে ইহাদের যথাক্রমে আব্ব্‌রিত্তি 'অদদ্‌রিষ্ট,' 'বিশ্‌শ্‌রিঙ্খল,' 'বিজ্‌জ্‌রিম্ভণ,' উচ্চারণ করিয়া থাকে। ঋ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব, কিন্তু যুক্ত বর্ণের পূর্বে বসিলে দীর্ঘ হয়।

এ

(ক) কেশ, বেশ, একটু, দেশ, ভেরী, বেকার, বেহায়া।

(খ) এক, দেখা, কেমন, যেমন, ক্ষেপা, জ্যেঠা, খেলা।

(ক)-এর শব্দগুলিতে এ-র নিজস্ব উচ্চারণ রহিয়াছে। ইহাকে এ-র প্রকৃত বা সংবৃত উচ্চারণ বলে।

(খ)-এর শব্দগুলিতে এ-কারের উচ্চারণ আ এবং এ-র মাঝামাঝি [ইংরাজী fat, cat, sat, mat প্রভৃতির 'a'-র মত]। এই উচ্চারণ বুঝাইতে গিয়া অনেকে অ্যা লিখিয়া থাকেন। এ-র এইরূপ উচ্চারণকে বক্র, বিকৃত বা বিবৃত উচ্চারণ বলা যায়।

এ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টি সবিশেষ লক্ষণীয় :—

(৴০) বাঙ্‌লা পুংলিঙ্গ শব্দের আদ্য এ-র বিকৃত বা বিবৃত উচ্চারণ হয়—**বেটা, নেতা, ক্ষেপা, জ্যেঠা, পেঁচা, ভেড়া** ইত্যাদি।

(৵) উহাদের স্ত্রীলিঙ্গে আদ্য 'এ,'র প্রকৃত বা সংবৃত উচ্চারণ হইবে—বেটী, নেত্রী, ক্ষেপী, জেঠী, পেঁচী, ভেড়ী, ইত্যাদি।

(৶) অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতিতে জাত এ-কার সংবৃত—**দেখে, রেখে, বলে, করে, এসে,** ইত্যাদি।

(।০) **বিবৃত** এ-যুক্ত শব্দে ই বা উ যুক্ত হইলে উক্ত এ সংবৃত হইয়া যায়—**খেলা** [বিবৃত]—**খেলুক, খেলি** [সংবৃত]; **একা** [বিবৃত]—**একুনে** [সংবৃত]; **দেখা** [বিবৃত]—**দেখি, দেখুন** [সংবৃত]।

(।৴০) বিদেশী উপসর্গ ও শব্দের সংবৃত এ-ধ্বনি বাঙ্‌লায় সংবৃত থাকে—**বে-**হেড, **চে**য়ার, **টে**বিল, **বে**-সামাল, ইত্যাদি।

(।৵) 'এক'-শব্দে এ-র উচ্চারণ বিবৃত হইলেও প্রত্যয় যোগে ও সমাসে উহা সংবৃত হইয়া যায়—একক [প্রত্যয়যোগে সংবৃত], একচ্ছত্র, একাধিক [সমাসে সংবৃত] ইত্যাদি।

(।৶) কবিতায় অনেক স্থলে এ-র স্বকীয় সংবৃত ও দীর্ঘ উচ্চারণ হয়—**দেশ দেশ** নন্দিত কবি মন্দ্রিত তব **ভেরী**।

ঐ, ঔ

সন্ধ্যক্ষরের আলোচনা প্রসঙ্গে **ঐ** এবং **ঔ** এর উচ্চারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙলায় এই দুইটি প্রকৃত **সন্ধ্যক্ষর** বা **যৌগিক** স্বর। সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ—এই চারিটি **সন্ধ্যক্ষর** বা **যৌগিক** স্বর, কেননা দুইটি মৌলিক স্বরধ্বনির সন্ধিতে বা যোগে উহাদের উদ্‌ভব হইলেও উহারা একাক্ষরত্বের সূচক, অর্থাৎ এইসকল স্বর-যুক্ত ব্যঞ্জন একাক্ষর বলিয়াই গণ্য। বাঙ্‌লাতে **এ** এবং **ও** এর উচ্চারণে নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে, উহাদের দীর্ঘত্ব প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু **ঐ** এবং **ঔ** এর বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে রক্ষিত—**শৈশব,** [উচ্চারণ—**শোইশব**], **কৈশোর** [উচ্চারণ—কোইশোর], **যৌবন** উচ্চারণ—যোউবন্], গৌরব [**উচ্চারণ**—গোউরব্]।

বাঙ্‌লায় **ও**-এর উচ্চারণ প্রায়শঃ হ্রস্ব—**তোমার, ওঁকে, কোন, ছোট, ইত্যাদি।** কিন্তু **ও**-র উদ্ভব ও উচ্চারণে কিছু বৈচিত্র্য রহিয়াছে—

(/০) **যোগ, রোগ, ভোগ,** প্রভৃতি স্থলে অনেক সময়ে **ও**-র উচ্চারণ দ্বিমাত্রিক, কিন্তু **রোগী, যোগী, ভোগী**-র ক্ষেত্রে **ও**-এর উচ্চারণ **উ**-কার ঘেঁষা এবং হ্রস্ব [প্রায় **রু**গি, **যু**গি, **ভু**গি-এর মতই উচ্চারিত হয়]।

(৵০) **অ**-এর সংবৃত উচ্চারণে উদ্ভূত **ও**-কার কখনও লিখিত হয়, কখনও হয় না ; যেমন—ছোট বা ছোটো, খাট বা খাটো, কাল বা কালো, ইত্যাদি।

যেখানে **অ**-এর সংবৃত ও হসন্ত উচ্চারণে শব্দার্থের প্রভেদ ঘটে সেখানে সংবৃত **অ**-এর পরিবর্তে **ও** লেখাই কর্তব্য ; যেমন—ছোট্ (দৌড়া—অনুজ্ঞা) কিন্তু ছো**টো** (ক্ষুদ্র) ; খাট্ (পালঙ্ক) কিন্তু খা**টো** (হ্রস্ব) ; কাল্ (সময়, কল্য) কিন্তু কা**লো** (কৃষ্ণবর্ণ) ; পাঠান্ (জাতি) কিন্তু পাঠা**নো** (প্রেরণ)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রভেদ দেখাইবার জন্য সংবৃত **অ**-এর স্থলে **ও** লেখা বিধেয় ; যেমন—পালান্ (পলায়ন, গোরুর স্তন) কিন্তু পালা**নো** (পলায়িত—ঘর পালা**নো** ছেলে)।

যে সকল স্থলে **অ**-এর কেবল সংবৃত উচ্চারণই রহিয়াছে এবং উচ্চারণ বৈষম্যে অর্থভেদের সম্ভাবনা নাই সে সকল ক্ষেত্রে **সংবৃত অ**-এর পরিবর্তে **ও** লিখিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

(৶০) বাঙ্‌লায় অনুজ্ঞাব ক্রিয়ার অন্ত্য **ও** সংস্কৃত লোট্ **হি** হইতে উদ্ভূত এবং অবশ্যই লেখ্য—ক**রো**, যা**ও**, ব**লো**, দে**খো**, ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বুঝাইতে চলিত ভাষায়—ক'রো, যেও, ব'লো, দেখো ইত্যাদি।

[কেহ কেহ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় 'কোরো' (কোরিও), 'বোলো' (বলিও) এইরূপ উভয় অক্ষরই **ও**-কারান্ত লেখেন ; কেহ বা বর্তমান অনুজ্ঞাতে 'কর' এবং ভবিষ্য অনুজ্ঞাতে 'কোরো' বা 'করো' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—করিও <কইর্‌ও< ক'রো হইয়াছে। অপিনিহিত **'ই'** লুপ্ত বলিয়াই স্বরসঙ্গতিতে **'ক'**-এর **অ** সংবৃত। অতএব **'ই'**-এর লোপচিহ্ন (') apostrophy ব্যবহার করাই উচিত]।

(।০) **উ**-এর **গুণস্বর ও**-কার। তাই **উ** এবং **ও**-এর একটির অন্যটিতে পরিণতির

প্রবণতা দেখা যায়। **ভুল্** ধাতু—**ভুল, ভুলি, ভোলা, ভোলে ; শুন্** ধাতু—**শুনি, শোনে, শোনো** [**শুন** মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে—মধুসূদন]।

(।৵০) সংস্কৃত 'অপি' অব্যয় হইতে উৎপন্ন **ও**-কে কখনও স্বতন্ত্রভাবে কখনও বা 'হসন্ত' উচ্চারিত ব্যঞ্জনে যুক্ত করিয়া লেখা হয়—কখন**ও** বা কখ**নো** ; কোন**ও** বা কো**নো** ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকারভেদ

জিহ্বা, কণ্ঠ, মূর্ধা, তালু, দন্ত ও ওষ্ঠ লইয়া বাগ্ যন্ত্র। জিহ্বার মূল, মধ্য বা অগ্রভাগের সহিত বাগ্যন্ত্রের অন্যান্য অংশের স্পর্শ বা ঘর্ষণ অথবা জিহ্বাদ্বারা স্থান বিশেষের তাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শ্বাসক্রিয়ার ফলেই বর্ণসমূহের উচ্চারণ ঘটে। উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্ণসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

জিহ্বার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগের সহিত মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানের স্পর্শে যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে স্পর্শবর্ণ বলে। ক্ হইতে ম পর্যন্ত—২৫টি স্পর্শবর্ণ।

উচ্চারণ-স্থান অনুসারে স্পর্শবর্ণ **পাঁচ** ভাগে বা **বর্গে** বিভক্ত। একই স্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণগুলি দ্বারা এক একটি **বর্গ** গঠিত। [অবশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ স্থানও ইহাদেরই মত। তবে তাহারা স্পৃষ্ট বা স্পর্শজাত নহে এবং তাহাদের উচ্চারণে অন্যবিধ ক্রিয়ার প্রাধান্য রহিয়াছে]।

ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্—**ক-বর্গ**   চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্—**চ-বর্গ**।
ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্—**ট-বর্গ**।   ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্,—**ত-বর্গ**।
প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্—**প-বর্গ**।

***অ, আ** এবং **ক-বর্গ** জিহ্বামূল ও কণ্ঠমূলের ঊর্ধ্বভাগের স্পর্শে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহাদের উচ্চারণ স্থান **কণ্ঠ** ধরা হয় এবং বর্ণগুলিকে **কণ্ঠ্য** বর্ণ বলে।

ই, ঈ, চ-বর্গ, য্, শ্-এর উচ্চারণস্থান **তালু** এবং বর্ণগুলি **তালব্য**।

ঋ, ট-বর্গ, র্ ও **স্**-এর উচ্চারণস্থান **দন্তমূল** এবং বর্ণগুলিকে **দন্ত্যবর্ণ** বলা হয়।

উ, ঊ, প-বর্গ, ব, (অন্তঃস্থ)-এর উচ্চারণস্থান **ওষ্ঠ** এবং বর্ণসমূহ **ওষ্ঠ্যবর্ণ**।

এ, ঐ-এর উচ্চারণস্থান **কণ্ঠ ও তালু** বলিয়া উহাদিগকে **কণ্ঠতালব্যবর্ণ** এবং **ও, ঔ**-এর উচ্চারণ স্থান **কণ্ঠ ও ওষ্ঠ** বলিয়া উহাদিগকে **কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ** বলে।

যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ কালে মুখবিবরে উষ্মা বা বায়ুর উষ্ণত্বের সঞ্চার হয় তাহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে; যথা—**শ, ষ, স্, হ্**। ইহাদের মধ্যে **শ্, ষ্, স্**-এর উচ্চারণের সহিত শিশ্-এব ধ্বনির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিযা ইহাদিগকে **শিশ্ ধ্বনি** বলা হয।

বর্ণমালায় স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তর্ অর্থাৎ মধ্যে যাহাদের অবস্থান অথবা যাহারা উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী তাহাগিকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে; যথা—**য্. র্ ল্**, ব্। ইহাদের মধ্যে **য্** (y) ও **ব্** (w)-কে বলা হয **অর্ধস্বর**; কারণ ব্যঞ্জন হইলেও স্থানবিশেষে ইহারা প্রকাশনে **স্বরের** বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যে বর্ণ দুইটির উচ্চারণকালে মূর্ধা-স্পৃষ্ট জিহ্বাগ্রের প্রকম্পনে স্বরের তরলতা সম্পাদিত হয় এবং জিহ্বাগ্রেব উভয পার্শ্ব দিযা বায়ু নিঃসৃত হয, তাহাদিগকে **তরলস্বর** বা **পার্শ্বিকধ্বনি** বলে; যথা—**র্, ল্**।

অকুহবিসর্জনীয়াণাং কণ্ঠঃ। ইচুযশানাং তালুঃ। ঋটুরষাণাং মূর্ধা। ৯তুলসানাং দন্তাঃ। উপূবানা মোষ্ঠৌ। এদৈতোঃ কণ্ঠতালু। ওদৌতোঃ কেণ্ঠৌষ্ঠম্। অন্তঃস্থাযরলবাঃ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ। অনুনাসিকা ঙঞণনমাঃ।

যে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলে; যথা—ঙ, ঞ্, ণ্, ন্, ম্।

উচ্চারণে প্রযোজনীয স্বরগাম্ভীর্য ও শ্বাসাঘাত অনুসারেও ব্যঞ্জনবর্ণ বিভক্ত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যবিহীন বা মৃদু থাকে, তাহাদিগকে **অঘোষবর্ণ** বা **শ্বাসবর্ণ** বলে; যথা—বর্গের ১ম, ২য বর্ণ [ক্, চ্, ট্, ত্, প্; খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্ ও শ্, ষ্, স্]। যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকালে কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয় তাহাদিগকে **ঘোষবর্ণ** বা **নাদবর্ণ** বলে; যথা—বর্গের ৩য, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ, [গ্, জ্, ড্, দ্, ব্; ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্, ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, য্ ব্, ল্, ব্, হ্,] এবং

যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকালে প্রাণবায়ু বা শ্বাসবায়ুর আঘাত ক্ষীণ থাকে তাহাদিগকে **অল্পপ্রাণবর্ণ** বলে; যথা—বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ [ক্, চ্, ট্, ত্, প্;

গ্‌, জ্‌, ড্‌, দ্‌, ব্‌]। যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকালে শ্বাসাঘাত প্রবল হয়, তাহাদিগকে **মহাপ্রাণ**বর্ণ বলে; যথা—বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ [খ্‌, ছ্‌, ঠ্‌, থ্‌, ফ্‌; ঘ্‌, ঝ্‌, ঢ্‌, ধ্‌, ভ্‌]। হ-কে **প্রাণধ্বনি** বলা হয়। **অল্পপ্রাণ**বর্ণের সহিত **প্রাণধ্বনি** হ-এর যুগপৎ উচ্চারণে **মহাপ্রাণ**বর্ণ উচ্চারিত হয়; যেমন—ক্‌+হ্‌=খ্‌, গ্‌+হ্‌=ঘ্‌, চ+হ্‌=ছ্‌, ড্‌+হ্‌=ঢ্‌, ত্‌+হ্‌=থ্‌, ইত্যাদি।

কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

ঙ—প্রাচীন বাঙ্‌লায় ইহার উচ্চারণ ছিল 'উঁঅঁ'। বর্তমানে ইহার উচ্চারণ (ং) অনুস্বারের মত। তাই প্রায়শঃ ইহার পরিবর্তে 'ং' লিখিত হয়; যথা. বাঙ্‌লা—বাংলা, বঙ্‌—রং ইত্যাদি। **ক**-বর্গীয় বর্ণের পূর্বেই ইহার ব্যবহার; যেমন, গঙ্গা [গ+ঙ্‌+গা], সঙ্গে [স+ঙ্‌+গে]—গংগা, সংগে হইবে না [কঃ বিঃ, ২০শে মে, ১৯৩৬]। ব-বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে সন্ধিতে পূর্বস্থিত **'ম্‌'**-স্থানে **'ঙ্‌'** বা 'ং' দুই-ই হইতে পারে; যেমন—অহঙ্কার—অহংকার, সঙ্গীত-সংগীত, ইত্যাদি।

ঞ—ইহার স্বকীয় উচ্চারণ 'ইঁঅঁ'। বাঙ্‌লায় ইহা চ-বর্গীয় বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার উচ্চারণ 'ন্‌'-এর মত হইয়া থাকে; যেমন—পঞ্চ [পন্‌চ], বাঞ্ছা [বান্‌ছা], অঞ্জন [অন্‌জন্‌]' ঝঞ্ঝাট [ঝন্‌ঝাট্‌]। যাচ্‌ঞা-তে 'ঞ'-এর প্রাচীন উচ্চারণ 'ইঙ্গ' [যাচিঙ্গা]। বর্তমান উচ্চারণ 'ন্য' [যাচ্‌ন্যা]।

প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'ঞ'-এর 'ই' উচ্চারণও দেখা যায়; যেমন—গোসাঞি [গোসাইঁ], মুঞি [মুইঁ], ঠাঞি [ঠাইঁ] ইত্যাদি।

পদান্তস্থিত জ্‌+ঞ [জ্ঞ]-এর উচ্চারণ 'গ্‌গঁ'—প্রজ্ঞা [প্রগ্‌গাঁ], মনোজ্ঞ [মনোগ্‌গঁ], যজ্ঞ [জোগ্‌গঁ], ইত্যাদি, কিন্তু পদের আদ্য জ্‌+ঞ [জ্ঞ]-এর উচ্চারণ 'গ্যঁ'—জ্ঞাত [গ্যাঁত], জ্ঞেয় [গ্যেঁয়], জ্ঞান [গ্যাঁন], ইত্যাদি।

ড়, ঢ়—মূলতঃ ইহারা **ড, ঢ** ছাড়া আর কিছুই নহে। সংস্কৃতে ও প্রাচীন বাঙ্‌লায় ইহাদের অস্তিত্ব নাই। বর্তমান বাংলায় **শব্দের মধ্যে** ও **অন্তে ড, ঢ** থাকিলে তাহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে **ড়, ঢ়** হইয়া থাকে; যেমন—দাড়িম্ব, বড়, আড়ম্বর, ষড়যন্ত্র, প্রগাঢ়, মূঢ়তা ইত্যাদি।

যেরূপ **ড** অল্পপ্রাণ ও **ঢ** মহাপ্রাণ, সেইরূপ **ড়** অল্পপ্রাণ ও **ঢ়** মহাপ্রাণ বর্ণ, জিহ্বা

অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাতের দ্বারা ইহাদের উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে **তাড়নজাত** ধ্বনি বলে।

ণ, ন—সংস্কৃতে 'ণ'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড'-এর মত। বাঙ্‌লাতে ণ, ন-এর উচ্চারণে কোনও প্রভেদ নাই। কেবল তৎসম শব্দের বানানে ইহারা যথাযথ লিখিত হইযা থাকে।

ম—স্বতন্ত্রভাবে ইহার উচ্চাবণ সংস্কৃত হইতে অভিন্ন; কিন্তু স্থান বিশেষে ইহা পূর্বে যুক্ত ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া নিজে সম্পূর্ণ নাসিক্য [৺] হইযা যায়— পদ্ম = পদ্‌ম [উচ্চারণ—পদ্দঁ], আত্মীয = আত্‌মীয [উচ্চারণ—আত্‌তঁীয়ো], বিস্মিত = বিস্‌মিত [উচ্চারণ বিস্‌সিঁতো] ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—জন্ম [জন্‌মো], তন্ময [তন্‌ময], বাঙ্ময [বাঙ্‌মষ] ইত্যাদি।

আদ্য অক্ষরে ম্-ফলা থাকিলে পূর্বব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয না; যেমন—ধ্মাত [ধঁাতো], শ্মশান [শঁশান্]। হ-এর সহিত ম্ যুক্ত হইলে উচ্চাবণকালে 'ম্' হ-এব পূর্বে চলিযা আসে, যেমন—ব্রাহ্মণ = ব্রাহ্‌মন্ [উচ্চারণ—ব্রাম্‌হন্]।

য—ইহার সংস্কৃত উচ্চারণ "ইঅ"। বাঙলায **জ** ও **য**-এব উচ্চারণ একই। শব্দেব মধ্যে ও অন্তে **য়**-এর সংস্কৃত উচ্চারণের আভাসমাত্র লক্ষিত হয [প্রায ই-বর্জিত 'অ'-এব মত]। য-এর এই বিশিষ্ট উচ্চারণ বুঝাইবার জন্যই উহার নিম্নে একটি বিন্দু যোগ করিয়া **য়** বর্ণটি রচিত হইযাছে; যেমন—ভয, নযন, গাযক, শযন, বিজয ইত্যাদি।

যম, যবন, যত, যুদ্ধ—ইহাদেব উচ্চাবণ যথাক্রমে—জোম্, জবোন্, জতো, জুদ্‌ধো।

আদ্যাক্ষরে ব্যঞ্জনপরবর্তী য-এর সহিত 'আ' যুক্ত হইলে উভযে মিলিযা বিবৃত এ-ধ্বনির [অ্যা] সৃষ্টি করে: যেমন—**ব্যাপার, খ্যাতি, ত্যাগ, ন্যায, ব্যাঘ্র** ইত্যাদি; কিন্তু আ-ভিন্ন অন্য স্বর যুক্ত হইলে য-এর উচ্চারণ হয না বলিলেই চলে; যেমন—ব্যুৎপত্তি [বুৎপৎতি], চ্যুত [চুত], ব্যোম [বোম্]।

পদেব মধ্যে অবস্থিত **য্**-ফলা পূর্বব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায; যেমন—অন্যায [ওন্‌নায], সত্যেন্দ্র [সোৎতেন্দ্রো], অত্যন্ত [ওত্তন্‌তো] ইত্যাদি।

আদ্যাক্ষরে **অ**-কারযুক্ত **য**-ফলা থাকিলে অনেকে সংবৃত **এ**-কারের মত উহার উচ্চারণ করেন; যেমন—ব্যথী [বেথী], ব্যক্তি [বেক্‌তি], ব্যতিক্রম [বেতিক্‌করম্],

ব্যতীত [বেত্তীত], ব্যাভিচার [বেভিচার্], ব্যাষ্টি [বেশ্‌টি]। এইগুলি ভুল-উচ্চারণের দৃষ্টান্ত।

'হ্'-এর সহিত **য** যুক্ত হইলে উহাদের সম্মিলিত উচ্চারণ হয় **'জ্ঝ'**-এর মত; যেমন—লেহ্য [লে'জ্‌ঝো], সহ্য [স'জ্‌ঝো] ইত্যাদি।

র্—ইহা অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে বসিলে রেফ (´) হইয়া তাহার মস্তকে যায় এবং সংস্কৃত শব্দে উক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন—অর্চনা [অর্‌চ্চনা—'অরচনা' নহে], মূর্ছা [মূর্‌চ্ছা 'মূরছা' নহে], কার্তিক [কার্‌ত্তিক্—'কার্‌তিক্' নহে]। সংস্কৃতে এই সকল শব্দের বানানেরও দ্বিত্বের বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। তদনুসারে বাঙ্‌লাতেও অনেক দ্বিত্বের ব্যবহার করেন; **কিন্তু [১৯৩৬ খ্রীঃ-তে] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারিত বানানের নিয়মে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।**

অসংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয় না; যেমন—ফর্মা [ফর্‌মা], চর্বি [চোর্‌বি] ইত্যাদি।

র্ অন্য ব্যঞ্জনের পরে যুক্ত হইলে র-ফলা (্র) হইয়া উহার তলায় বসে এবং উহার উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটায়; যেমন—বিক্রয় [বিক্‌ক্রয়], বক্র [বক্‌ক্র], বজ্র [বজ্‌জ্র] ইত্যাদি। আদ্যাক্ষরে র-ফলা থাকিলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব স্পষ্ট হয় না; যেমন—ক্রমে [ক্রমে], প্রমাণ [প্রমান্] ইত্যাদি।

ল্—শব্দের মধ্যে বা অন্তে **ল্**-যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণে স্পষ্টতঃ দ্বিত্ব ঘটে; যেমন—বিপ্লব [বিপ্‌প্লব], অক্লান্ত [অক্‌ক্লান্ত]। শব্দের আদিতে থাকিলে **ল্**-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব স্পষ্ট হয় না; যেমন—প্লাবন [প্লাবোন্], গ্লানি [গ্লানি], ক্লান্ত [ক্লান্‌তো]।

ব্—বর্ণমালায় **ব** দুইটি—একটি প-বর্গীয় **ব** এবং অপরটি অন্তঃস্থ **ব**। [দেবনাগরী লিপিতে [সংস্কৃতে ও হিন্দীতে] উহাদের পৃথক্ করিবার জন্য বর্গীয় **ব্**-এর পেট কাটিয়া দেওয়া হয়—**ব**; কি অন্তঃস্থ **ব**-এর নহে—**ব**]। অন্তঃস্থ **ব্**-এর প্রকৃত উচ্চারণ 'উঅ' (w)-এর মত। কিন্তু বাঙ্‌লায় অন্তঃস্থ **ব্**-এর উচ্চারণ নাই বলিলেই চলে। অন্তঃস্থ **ব্**-এর অস্তিত্ব কেবল **ব্**-ফলা রূপে। **ব**-ফলা শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থিত আশ্রয়-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটায়; কিন্তু শব্দের আদিতে নহে; যেমন—অশ্ব

[অশ্‌শ], বিল্ব [বিল্‌ল], বিদ্বান্‌ [বিদ্‌দান্‌]; কিন্তু দ্বিত্ব [দিৎত], স্বত্ব [শৎত], ধ্বংস [ধংশ]।

অন্তঃস্থ-**ব হ্‌**-এর সহিত যুক্ত হইলে উহার প্রকৃত উচ্চারণেব আভাস পাওযা যায় এবং **হ্‌**-এর পূর্বেই উগ উচ্চারিত হয; যেমন—আহ্বান [আওহান্‌], জিহ্বা [জিউহা] ইত্যাদি। [বাঙ্‌লার অঞ্চল বিশেষে আব্‌ভান, জিব্‌ভা—এইরূপ উচ্চারণ চলে]।

শ্‌, ষ্‌, স্‌—বাঙ্‌লায এই তিনটি বর্ণেরই উচ্চারণ **তালব্য শ** [sh]-এর মত কিন্তু **স্‌**-এর সহিত ঋ, ত, থ, ন, ব এবং **শ**-এর সহিত ঋ, র, ল যুক্ত হইলে ইহাদের উভযেরই উচ্চারণ **দন্ত্য স্‌** (s)-এর মত হইযা থাকে; যেমন—সৃজন [srijan], অস্ত [asta], স্থান [sthan], স্নান [snan], স্রোত [srota], শৃঙ্গ [sringa], শ্রবণ [sraban], সংশ্লিষ্ট [shanslishta]।

[কতক লোকে **শ্‌, ষ্‌, স্‌** তিনটিবই **দন্ত্য** (s) উচ্চাবণ করিযা থাকে - শ্যাম বাজারের শশিবাবু শিশ্‌ দিতে দিতে শেষে সাদা বাড়ীটায ঢুকলেন (Sambajarer Sasibabu sis dite dite sese sada baditay dhuklen)। এইরূপ উচ্চাবণ বিশেষ দূষণীয এবং সর্বথা বর্জনীয। 'সপ্তাহ' চলিত ভাষায 'হপ্তা' উচ্চারিত হয। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানে **স্‌**-এর **'হ'** উচ্চাবণ চলে।

হ্‌—য্‌-ফলাযুক্ত **হ্‌**-এর উচ্চারণের কথা পূর্বেই আলোচিত হইযাছে। **হ**-এর সহিত **ণ্‌** বা **ন্‌** যুক্ত হইলে ইহাব দ্বিবিধ উচ্চারণ শ্রুত হয (১) আগে **ণ্‌** বা **ন্‌** পরে **হ** অথবা (২) **ন্ন**-এর মত; যেমন—অপরাহ্ণ [অপরান্‌হ বা অপরান্ন], আহ্নিক [আন্‌হিক্‌ বা আন্নিক্‌]; অবশ্য দ্বিতীযটি অবিশুদ্ধ উচ্চারণ।

হ্‌-এর সহিত **ল্‌** যুক্ত হইলে **ল্‌**-কাব **হ**-এর পূর্বে উচ্চাবিত হয—আহ্লাদ [আল্‌হাদ্‌], **প্রহ্লাদ** [প্রোল্‌হাদ্‌], **হ্লাদিনী** [ল্‌হাদিনী, হ্‌লাদিনী—দুই রকম উচ্চারণই রহিযাছে]।

হ্ব-এর উচ্চারণের বিষয অন্তঃস্থ **ব**-এর প্রসঙ্গেই আলোচিত হইয়াছে।

ক্ষ—ক্‌-এর সহিত **ষ**-এর যোগে এই বর্ণটির উদ্‌ভব। শব্দের আদিতে ইহাব উচ্চারণ **খ**-এর মত, কিন্তু মধ্যে বা অন্তে **ক্‌খ**-এর মত; যেমন—ক্ষুর [খুর্‌],

ক্ষণিক [খোনিক্], ক্ষত্রিয় [খোত্রিয়ো], অক্ষ [অক্‌খ], অক্ষয় [অক্‌খয়] ইত্যাদি।

ং (**অনুস্বার**)—ইহা **আশ্রয়স্থানভাগী** বর্ণ। সংস্কৃতে ইহা স্বরের অনু বা পশ্চাতে বসিয়া উক্ত স্বরের উচ্চারণকে অনুনাসিক করিত। বাঙ্‌লায় ইহার উচ্চারণ ঙ[ng]-এর মত দাঁড়াইয়াছে। তাই ং এবং ঙ পরস্পরের পরিবর্তে লিখিত হয়; যেমন—**বাংলা** অথবা **বাঙ্‌লা**, **রং** অথবা **রঙ্** ইত্যাদি।

ঃ (**বিসর্গ**)—ইহা **হ্**-এর অঘোষ ধ্বনি এবং **আশ্রয়স্থানভাগী** বর্ণ অর্থাৎ স্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উচ্চারিত হয়। **বিসর্গ** দুই প্রকারের—**স্**-জাত ও **র্**-জাত। **স্**-জাত বিসর্গ—বহিঃ [বহিস্], পয়ঃ [পয়স্], আয়ুঃ [আয়ুস্]। **র্**-জাত বিসর্গ—নিঃ [নির্], পুনঃ [পুনর্], প্রাতঃ [প্রাতর্]।

পদমধ্যবর্তী ঃ (**বিসর্গ**) পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটায়; যেমন—অতঃপর [অতপ্‌পর], দুঃখ [দুক্‌খ], নিঃসম্বল [নিস্‌সম্‌বল্]।

বাঙ্‌লায় পদান্তস্থিত **বিসর্গ** উচ্চারিত হয় না—সাধারণতঃ [সাধারণতো], বিশেষতঃ [বিশেষতো] ইত্যাদি।

অনুস্বার (ং) **ও বিসর্গ** (ঃ) স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে। স্বর-ব্যঞ্জনের সহিত যোগ বহন করেনা বলিয়া ইহাদিগকে **অযোগবাহ** বর্ণ বলা হয়।

ঁ (**চন্দ্রবিন্দু**)—ইহা বর্ণ নহে। স্বরের নাসিক্য উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য চন্দ্রকলা ও বিন্দুর সাহায্যে গঠিত চিহ্নমাত্র; যেমন আঁক, পাঁক, শাঁখ ইত্যাদি। ইহাকে সংস্কৃত শব্দের অনুনাসিক বর্ণের লুপ্তিচিহ্ন বলা চলে না, কেননা সংস্কৃত শব্দে অনুনাসিক বর্ণ না থাকিলেও তদ্ভব শব্দে স্বরের নাসিক্য উচ্চারণ বুঝাইতে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যেমন—আঁখি [অক্ষি হইতে], কাঁখ [কক্ষ হইতে], কোঁক [কুক্ষি হইতে]।

অনুশীলনী

১। ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

২। বর্ণমালা কাহাকে বলে? বর্ণ ও অক্ষরে প্রভেদ কী?

৩। স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য পরিস্ফুট কর।

৪। উদাহরণসহ সংজ্ঞা প্রদান কর:—হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, প্লুতস্বর, মৌলিকস্বর, সন্ধ্যক্ষর, স্পর্শ বর্ণ উষ্মবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ, শিশ্‌ধ্বনি, অর্ধস্বর, তরলস্বর, অযোগবাহ বর্ণ।

৫। প্রভেদ দেখাও :—মৌলিকস্বর—যৌগিকস্বর, গুণস্বর—বৃদ্ধিস্বর, অঘোষ বর্ণ—ঘোষবর্ণ, অল্পপ্রাণবর্ণ—মহাপ্রাণ বর্ণ, অ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ, এ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ।

৬। অ-কারের সংবৃত উচ্চারণের পাঁচটি ক্ষেত্রের উল্লেখ কর।

৭। আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণের তিনটি ক্ষেত্রের উল্লেখ কর।

৮। 'ঋ' এবং 'রি' এর উচ্চারণে কোনও পার্থক্য আছে কিনা আলোচনা কর।

৯। সংবৃত অ-কারের পরিবর্তে ও-কারের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা আলোচনা কর।

১০। ঘ' এবং 'ঞ'-এর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও।

১১। ম-ফলা, য-ফলা ও ব-ফলার প্রয়োগে আশ্রয়-ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-দ্বিত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১২। হ এর সহিত ণ ন, ম, য ল, ব যুক্ত হইলে উচ্চারণে কী বৈচিত্র্য শ্রুত হয়?

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে আদ্যস্বরের উচ্চারণ নির্ণয় কর :—

অতি, অক্ষয়, সম্প্রীতি, সম্যক্ আচমকা, ভীত, চীর, কূল, এক, একাধিক, শৈশব, রোগ রোগী, যৌবন।

১৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে অন্ত্যস্বরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট কর :—

মর-মর, ভাল, খাট, বলে, ক'রো, ভীত, পলায়ন।

বাঙ্‌লার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য
ও
ধ্বনি-পরিবর্তন রীতি

প্রত্যেক ভাষারই স্বকীয় উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ভাষার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই বৈশিষ্ট্যটি আয়ত্ত করা আবশ্যক। বাঙ্‌লা ভাষার স্বরূপ, বাঙ্‌লায় সাধু ও চলিত ভাষার সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে বাঙ্‌লার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ও ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মগুলি অবশ্যই জানিতে হইবে। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যই জীবন্ত ভাষাতে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটায়। ভাষাকে বিশ্লেষিত করিয়া এই পরিবর্তনের ধারা বা রীতি নির্দেশিত করার দায়িত্ব ব্যাকরণের। এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া বাঙ্‌লার ব্যাকরণকারগণ কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ বা পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন।

১। **বর্ণাগম** বা **আগম—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট নূতন বর্ণের আবির্ভাবকে বর্ণাগম বা আগম বলে।** শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বর্ণাগম হইতে পারে :

(ক) আদ্যাগম—**আ**-স্পর্ধা [স্পর্ধা হইতে], **ই**-স্কুল ['স্কুল হইতে']।

(খ) মধ্যাগম—হন্‌ + অ = হন্‌ + **স্‌** + অ = হংস, [যত্‌ + ন = যত্‌ + **অ** + ন্‌] = যতন।

(গ) অন্ত্যাগম—সত্য + **ই** = সত্যি, বেঞ্চ + **ই** = বেঞ্চি।

২। **বর্ণবিপর্যয়—একই শব্দে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান বিনিময়কে বর্ণবিপর্যয়** বলে ; যথা—হিংস—সিংহ (হ ও স-এর স্থান বিনিময়], বাক্স [box]—বাস্ক [ক্‌ ও স্‌ এর স্থান বিনিময়], ডেস্ক [desk—ডেক্স [স্‌ ও ক্‌-এর স্থান বিনিময়], রিক্স [Rikshaw]—রিস্ক [ক্‌ ও স্‌-এর স্থান বিনিময়]।

৩। **বর্ণবিকার—একবর্ণের স্থলে বর্ণান্তরের উচ্চারণ চালিত হইলে তাহাকে বর্ণবিকার বলে** ; যেমন—বীজ—বীচি, কাক—কাগ, বক—বগ, গুলাব—গোলাপ ইত্যাদি।

৪। **বর্ণনাশ** বা **বর্ণলোপ**—উচ্চারণে বা সন্ধিতে এক বা একাধিক বর্ণ লুপ্ত হইলে তাহাকে বর্ণনাশ বা বর্ণলোপ বলে ; যেমন—পতঞ্জলি [পতৎ + অঞ্জলি **ত** লুপ্ত], বড়দা [বড় দাদা—**দা** লুপ্ত], নারকেল [নারিকেল—**ই** লুপ্ত,], করব [করিব—**ই** লুপ্ত]।

বাঙলার উচ্চারণে পদমধ্যবর্তী ব্‌ এবং হ-এর লোপ প্রবণতা রহিয়াছে ; যেমন—
ব্‌-লোপ—করিলাম<করলাম<ক'ল্লাম, কর্ম<কম্ম, ধর্ম<ধম্ম, ক'রছি< ক'চ্ছি ইত্যাদি।

হ-লোপ – গাহিল<গাইল, চাহি<চাই, নহে<নয়, সিপাহী<সিপাই ইত্যাদি।

৫। **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ—উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত নূতন স্বরধ্বনি আনয়ন করিয়া যুক্তব্যঞ্জনকে বিভক্ত বা পৃথক করিবার রীতিকে স্বরভক্তি বিপ্রকর্ষ বলে।** ধর্ম [ধ+র্‌+ম]—ধরম [ধ+র্‌+**অ**+ম], স্থান [স্‌+না+ন]—**সি**নান [স্‌+**ই**+না+ন], মুক্তা [মু+ক্‌+তা]—মুকুতা [মু+ক্‌+**উ**+তা], ইত্যাদি।

কবিতায় ও চলিত বাঙ্‌লার **স্বরভক্তি** সবিশেষ প্রচলন রহিযাছে। **স্বরভক্তিতে** অ, ই, উ, এ, ও—এই পাঁচটি স্বরের **আগম** দেখা যায়।

অ—ধর্ম—ধরম, কর্ম—করম, যত্ন—যতন, রত্ন—রতন, চন্দ্র—চন্দর, চক্র—চক্কর, ভক্তি—ভকতি, মূর্তি—মূরতি, পূর্ব—পূরব, মর্দ—মরদ, শহর্‌—শহর, নির্মল— নিরমল ইত্যাদি।

ই—স্নান—সিনান, প্রীতি—পিরীতি, বর্ষণ—বরিষণ, ফিল্ম—ফিলিম, ফিক্‌র—ফিকির ইত্যাদি।

উ মুক্তা—মুকুতা, পুত্র—পুত্ত্‌র, ভ্রূ—ভুরু, শুক্র—শুকুর, মুল্ক—মুলুক [মুল্লুক], ইত্যাদি।

এ—গ্লাস [glass] গেলাস, গ্রাম—গেরাম, শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ, গ্রাস—গেরাস, ইত্যাদি।

ও—শ্লোক—শোলোক, গ্লোব [globe]—গোলোব, মুর্গ—মোরোগ।

৬। **স্বরসঙ্গতি—**স্বরসঙ্গতি শব্দের অর্থ স্বরের সমন্বয়-সাধন। স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ-স্থানের আলোচনাকালে স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থানের কথাও বলা হইযাছে। একই শব্দে বিভিন্ন স্বরধ্বনি থাকিলে তাহাদের উচ্চারণে জিহ্বা পুনঃপুনঃ সঞ্চালিত করিতে হয। এই উচ্চারণজনিত শ্রমের লাঘবের জন্য মানুষ প্রধান স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থানে জিহ্বা রাখিয়াই অন্যান্য স্বরের উচ্চারণ করিতে চাহে। ফলে অন্যান্য স্বরধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। ইহাই স্বরসঙ্গতি। অতএব বলা যাইতে পারে যে—

চলিত ভাষায় এবং কখনও কখনও সাধুভাষায় পদমধ্যবর্তী প্রধান স্বরের প্রভাবে অপরাপর স্বরধ্বনির পরিবর্তন রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলে।

পূর্ববর্তী স্বর প্রধান হইলে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তী স্বর প্রবল হইলে পূর্বের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। (ক) **পূর্ববর্তী স্বরের প্রাবল্যে**—ইচ্ছা—ইচ্ছে, মিছা—মিছে, বিলাত—বিলেত, উনান—উনুন, মিথ্যা—মিথ্যে, পূজা—পূজো, খুড়া—খুড়ো, কুমড়া—কুমড়ো, কুড়াল—কুড়ুল প্রভৃতি স্থলে পরের স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হইয়াছে।

পরবর্তী স্বরের প্রাবল্যে—লিখা—লেখা, গিলে—গেলে, শুনে—শোনে ইত্যাদি স্থলে পূর্বের স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

অতি—ওতি, অনিল—ওনিল, বলুন—বোলুন, একা—অ্যাকা, দেখে—দ্যাখে প্রভৃতি স্থলে **অ**-কারের ও **এ**-কারের সংস্কৃত উচ্চারণেও স্বরসঙ্গতি লক্ষিত হয়। **বিলা**তি—**বিলে**তি—**বিলি**তি-তে পূর্বের ও পরের '**ই**'-এর প্রভাবে মধ্যবর্তী স্বরের দুইবার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

৭। **অপিনিহিতি—শব্দের মধ্যবর্তী বা অন্তস্থিত ই এবং উ-কে তাহাদের আশ্রয় ব্যঞ্জনের পূর্বে আনিয়া উচ্চারণ করিবার রীতিকে অপিনিহিতি বলে ;** যেমন—দেখিয়া = দে + খ্ + ই + যা ['খ'-এর পরে 'ই' রহিয়াছে] = দে + ই + খ + যা ['ই' আশ্রয়-ব্যঞ্জন 'খ'-এর পূর্বে আসিয়াছে] = দেইখ্যা [প্রাচীন বাঙলার সর্বত্র, কিন্তু বর্তমানে কেবল পূর্ববঙ্গে উচ্চারিত] ; সাধু = সা + ধ্ + উ ['ধ'-এর পরে 'উ'] = সাউধ ['উ' আশ্রয়-ব্যঞ্জন 'ধ'-এর পূর্বে আসিয়াছে]। নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—**ই**-কারের **অপিনিহিতি**—আ**ই**জ > আজি, কা**ই**ল > কালি, রা**ই**খ্যা > রাখিয়া, ক**ই**র্যা > করিয়া, জা**ই**ল্যা > জালিয়া, বা**ই**ন্যা > বানিয়া, চা**ই**র্ > চারি, যা**ই**ঠ > যাঠি।

য—ইঅ ; সুতরাং য-ফলার মধ্যে 'ই' রহিয়াছে বলিয়া য-ফলাযুক্ত শব্দেও 'ই'-কারের অপিনিহিতি হইয়াছে ; যথা—কা**ই**ব্ব > কাব্য, বা**ই**চ্চ > বাচ্য, মু**ই**ক্‌খ > মুখ্য, বা**ই**ক্ক > বাক্য ইত্যাদি।

উ-কারের **অপিনিহিতি**—মা**উ**ছ্যা > মাছুয়া, জ**উ**ল্যা—জলুয়া, রা**উ**ধ্যা > রাধুয়া, ম**উ**ধ্যা > মধুয়া, য**উ**দ্যা—যদুয়া, গা**উ**ছ্যা > গাছুয়া, চ**উ**খ > চক্ষু [চক্‌খু], **আউশ**—আশু, ইত্যাদি।

অপিনিহিতির বিপরীত প্রক্রিয়াও কচিৎ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কখনও কখনও ব্যঞ্জনের

পূর্বে অবস্থিত 'ই'-কে উক্ত ব্যঞ্জনের পরে বসাইয়া উচ্চারণ করা হয় ; যেমন—টালি [টা+ল্+ই]>টাইল [tile], বড়শি [ব+ড—শ+ই]>বড়িশ [ব+ড+ই+শ]

৮। **অভিশ্রুতি**—উচ্চারণ-পরিবর্তনেব ধারা **অপিনিহিতির** পরে আরও কিযদ্দূর অগ্রসর হইযা **অভিশ্রুতিতে** পৌছিযাছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে একদা সমগ্র বঙ্গদেশে অপিনিহিতি চলিত। পূর্ববঙ্গ **অপিনিহিতি**-তেই থামিয়া গিযাছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আরও কযেকটি স্তর অতিক্রম করিয়া **অভিশ্রুতি**-তে উপস্থিত হইয়াছে।

সাধুরূপ	**অপিনিহিতি**	**পূর্ববঙ্গে**	**পশ্চিমবঙ্গে**
আসিয়া	আইস্যা	আইস্যা [আইহ্যা, আইযা]	আইস্যা, এস্যা, এস্সে, **এসে [অভিশ্রুতি]**
জলুযা	জউল্যা	জউল্যা,	জউল্যা, জউলা, **জোলো** **[অভিশ্রুতি]**

উল্লিখিত উদাহরণ দুইটি হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে **অপিনিহিত ই** এবং **উ-এর সহিত পূর্বস্বরের সন্ধিতে এবং স্বরসঙ্গতি-প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে অভিশ্রুত স্বরধ্বনির [নূতন স্বরের] উদ্ভব হয় ইহাকে অ অভিশ্রুতি বলে।**

[আইস্যা-ব্ 'আ+ই'=এ, পরে এ-কাবের সহিত সঙ্গতির জন্য স্যা<স্সে<সে এবং জউল্যা-র 'জ+উ'=জো (অ+উ=ও), পবে ও-কারেব সহিত সঙ্গতির জন্য ল্যা<লা <লো হইযাছে। ইহাকে **আভ্যন্তর সন্ধি** বলা যাইতে পারে]।

আরও কয়েকটি অভিশ্রুতির উদাহরণ—

সাধুরূপ	**অপিনিহিতি**	**অভিশ্রুতি**
করিয়া	কইর‍্যা	ক'বে
বলিব	বইল্ব	ব'লব
নদীযা (নদিয়া)	নইদ্যা	ন'দে
বাদিযা	বাইদ্যা	বেদে
জালিয়া	জাইল্যা	জেলে
মাছুয়া	মাউছ্যা	মেছো
অভ্যাস (অভ্ইআস)	অইব্ভাস	অভ্যেস (ওব্ভেস)
গাছুয়া	গাউছ্যা	গেছো

৯। **য়-শ্রুতি, ব (ওঅ)-শ্রুতি** শব্দ মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে স্বভাবতঃই কখনও একটি মৃদু য়-ধ্বনি, কখনও বা একটি মৃদু অন্তঃস্থ ব (ওঅ)-ধ্বনি শ্রুত হয়। ইহাদিগকে যথাক্রমে **য়-শ্রুতি** ও **ব-শ্রুতি** বলে।

য়-শ্রুতির উদাহরণ—ভাই+এর=ভাইয়ের [ভা'য়ের], মা+এর=মায়ের, মা+এ=মায়ে, ঝি+এ=ঝিয়ে, বাবু+আনা=বাবুয়ানা, মুদি+আলি=মুদিয়ালি মা আমায=মায় আমায ইত্যাদি।

ব-শ্রুতির উদাহরণ—হ+আ=হওযা, দে+আ=দেওযা, মো+আ=মোযা [ইহাকে য-শ্রুতির দৃষ্টান্তরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে], না+আ=নাওয়া, পা+আ =পাওযা, খা+আ=খাওয়া ইত্যাদি।

এখানে আর একটি বিষয সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি অন্তঃস্থ ব-শ্রুতির ক্ষেত্রে য়-শ্রুতিও হইযা থাকে। প্রাচীন বাঙলায হওা, দেওা, খাওা—এইরূপ লিখিত হইত। পরে য-শ্রুতি হওযায হওয়া, দেওযা খাওযা—এইভাবে লেখা চলিতেছে। দে আল>দেযাল [য়-শ্রুতিতে] এবং দেওয়াল [ব-শ্রুতি ও য়-শ্রুতিতে] ছা+আ=ছাওযা [ব-শ্রুতি ও য়-শ্রুতিতে] এবং ছাযা [য়-শ্রুতিতে]।

অনুশীলনী

১। বর্ণাগম কাহাকে বলে। আদ্যাগম মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের উদাহরণ দাও।

২। বর্ণ বিপর্যয় ও বর্ণবিকার-এর উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৩। বর্ণনাশ কী? অন্ততঃ দুইটি বাঙলা ব্যঞ্জনের লোপ প্রবণতা বুঝাইয়া দাও।

৪। সোদাহরণ সংজ্ঞানির্দেশ কর :—

স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি, য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি।

৫। অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির প্রভেদ পরিস্ফুট কর।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কর :—

ইস্কুল সিংহ, গোলাপ, সিপাই, শহর, পিরীতি, গেলাস, কুড়ুল, লেখা, টালি, বড়শি, বেদে, গেছো, বাবুযানা, দেওয়াল।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের স্থূলাক্ষরে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—

সাপের হাসি বেদেয় চেনে। মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! কাগের বাসায় বগের ডিম। সত্যি বলছিস! যতন করহ লাভ হইবে রতন। কী আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! সদাই করি সেই চিন্তে। মাগো, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই! ও সব বিলিতি কায়দা। তারই লাইগ্যা পরাণ কাঁদে। এটা কি ছেলের হাতের মোয়া।

সন্ধি

'সন্ধি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মিলন। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে ব্যাকরণে কাহাদের কিরূপ মিলন এই শব্দটি দ্বারা সূচিত হয়। **'সন্ধি'** একটি সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃত হইতেই বাঙলায় উহা গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে **পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলন বা একান্ত সংযোগ** বুঝাইবার জন্য **সন্ধি** শব্দটি প্রযুক্ত। যে কোনও দুইটি বর্ণ পাশাপাশি থাকিলেই এই মিলন ঘটিবে না। কোন্ কোন্ বর্ণের উদ্দিষ্ট মিলন ঘটিবে তাহাই স্থির করিবার জন্য ব্যাকরণে সন্ধির সূত্র রচিত হইয়াছে। আর মিলনের স্বরূপও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বর্ণমিলন ত্রিবিধ—(১) একটি বর্ণের লোপ, (২) দুইটি বর্ণ মিশিয়া একাকার হওয়া এবং (৩) একটির প্রভাবে অপরটির রূপান্তর।

(১) অতঃ+এব=অতএব—**বিসর্গ** [ঃ] এবং **'এ'**-র মিলনে বিসর্গের লোপ হইয়াছে।

(২) শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক—**'অ'** এবং **'অ'** মিলিত হইয়া **'আ'** হইয়াছে।

(৩) উৎ+চারণ=উচ্চারণ—**'ত্'** এবং **'চ'**-র মিলনে **'চ'**-এর প্রভাবে **'ত্'** **'চ'**-তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

উচ্চারণের সুবিধা, সময়ের সংক্ষেপ এবং শ্রুতির মধুরতা—এই তিনটি কারণেই সন্ধির আবির্ভাব। প্রত্যেক ভাষাতেই সন্ধি রহিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় সন্ধির নিয়ম বিভিন্ন।

বাঙ্‌লা সংস্কৃতের প্রদৌহিত্রী-স্থানীয়া। অদ্যাপি বাঙ্‌লায় প্রতিনিয়ত সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইতেছে এবং সাধু ও চলিত উভয়বিধ বাঙ্‌লা ভাষায়ই প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা করা যায় না। সন্ধির নিয়মে ইহাদের বহু শব্দ গঠিত হইয়াছে, আর উহাদের বাদ দিয়া বাঙ্‌লা ভাষা চলিতে পারে না। কাজেই সংস্কৃত সন্ধির নিয়মগুলি বাঙ্‌লা ভাষায় শিক্ষার্থিমাত্রেরই জানা আবশ্যক।

সংস্কৃতে কতকগুলি ক্ষেত্রে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহা বক্তা বা লেখকের ইচ্ছাধীন। (১) ***একপদে** অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে, (২) **ধাতু** ও **উপসর্গের** মধ্যে এবং (৩) ***সমাসে** সন্ধি অবশ্য করণীয়, অন্যান্য স্থলে সন্ধি করা না-করা ইচ্ছাধীন।

(১) *একপদে [প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে]—পো+অন=পবন [ও+অ=অব], নৌ+ইক=নাবিক [ঔ+ই=আবি] ইত্যাদি।

* সন্ধিরেক পদে নিত্যো নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসেঽপি চ নিত্যঃ স্যাৎ স চান্যত্র বিভাষিতঃ॥

(২) ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে—উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল [ৎ+জ=জ্জ], অনু+এষণ=অন্বেষণ [উ+এ=বে], অতি+ইত=অতীত [ই+ই=ঈ], ইত্যাদি।

(৩) সমাসে—বিদ্যা+আলয=বিদ্যালয [আ+আ=আ], মহা+উৎসব=মহোৎসব [আ+উ=ও], রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র [ই+ই=ঈ], ইত্যাদি।

বিভাষা [বক্তা বা লেখকের ইচ্ছা]—তৎ+অত্র+অস্তি=তদত্রাস্তি বা তৎ অত্র অস্তি। সংস্কৃতে সন্ধিযোগ্য বর্ণ থাকিলে যে কোনও পদের সহিত যে কোনও পদের সন্ধি হইতে পারে। আবার বক্তা বা লেখক ইচ্ছা করিলে সন্ধি নাও করিতে পারেন। কিন্তু সন্ধি না করাটাই বাঙলার প্রকৃতি বা ধর্ম।

'আমি আপনার আদেশ পালনার্থ আগত'—ইহার বিভিন্ন পদের পরস্পর সন্নিহিত বর্ণের সংস্কৃতের নিযমে সন্ধি কবিলে দাঁড়ায—

'আম্যাপনারাদেশপালনার্থাগত [আমি+আপনার=আম্যাপনার, পালনার্থ+আগত=পালনার্থাগত, আম্যাপনার+আদেশপালনার্থাগত=আম্যাপনারাদেশপালনার্থাগত]।

কিন্তু ইহাকে কেহ বাঙলা বলিবেন কি? বাঙ্‌লায় এরূপ সন্ধি ত চলেই না। বরং পূর্বোক্ত (১), (২), (৩), ক্ষেত্রে সংস্কৃতে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য হইলেও বাঙ্‌লায় সহজে উচ্চারণ ও অর্থবোধের জন্য এবং কবিতায় ছন্দোরক্ষার নিমিত্ত বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেও অনেক সময সন্ধি করা হয় না; যেমন—"অনিল-বিকম্পিত **শ্যামল-অঞ্চল**" (রবীন্দ্রনাথ), **"জীবন-উদ্যানে** তোর যৌবন কুসুমভাতি" (মধুসূদন)। এইরূপ **মঙ্গল-আলোক, বিদ্যুৎদীপ্ত, বিবাহ-উৎসব, কানন-আনন, বেদনা-অধীর,** প্রভৃতি অজস্র সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দে বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকগণ সন্ধি করেন নাই। আবার সন্ধিবদ্ধ সমস্ত পদেরও অভাব নাই।

বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি বুঝিবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় স্থলে সন্ধি করিবার জন্য সংস্কৃত সন্ধির নিয়মগুলি জানা আবশ্যক।

পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের একান্ত সংযোগ বা মিলনকে সন্ধি বলে।

সংস্কৃত সন্ধি

সংস্কৃতে **সন্ধি** পাঁচভাগে বিভক্ত ; যথা—(i) **স্বরসন্ধি,** (ii) **ব্যঞ্জনসন্ধি,** (iii) **প্রকৃতিসন্ধি,** (iv) **অনুস্বারসন্ধি,** (v) **বিসর্গসন্ধি**

* যখন সন্ধিযোগ্যবর্ণ থাকিলেও প্রকৃতিই থাকিয়া যায় অর্থাৎ সন্ধি হয় না তখন তাহাকে প্রকৃতিসন্ধি বলে। দ্বিবচনের ঈ, ঊ, এ, প্লুতস্বর প্রভৃতির সন্ধি হয় না।

(i) স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

স্বরসন্ধির নিয়মগুলি সহজে আয়ত্ত করিতে হইলে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা কয়টি জানা আবশ্যক।

অ-বর্ণ=অ, আ। **ই-বর্ণ**=ই, ঈ। **উ-বর্ণ**=উ, ঊ। ঋ-বর্ণ=ঋ, ৠ। ঌ-বর্ণ =ঌ, ৡ।

সবর্ণ—যে যে স্বরবর্ণের উচ্চারণস্থান এক তাহারা সবর্ণ ; যেমন—অ, আ [কণ্ঠ্য], ই, ঈ [তালব্য], উ, ঊ [ওষ্ঠ্য], ঋ, ৠ [মূর্ধন্য], ঌ, ৡ [দন্ত্য]। ইহাদের প্রত্যেক জোড়ার প্রথম বর্ণটি **হ্রস্ব** এবং দ্বিতীয় বর্ণটি **দীর্ঘ** অর্থাৎ অ, ই, উ, ঋ, ঌ **হ্রস্ব** এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ **দীর্ঘ।**

[বাঙলায় ৠ, ঌ এবং ৡ-র প্রয়োজন নাই]

(ক) সবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বের **অ-বর্ণ, ই-বর্ণ, উ-বর্ণ** দীর্ঘ হইবে এবং **সবর্ণের** লোপ হইবে।

(৵) অ-বর্ণ+সবর্ণ=আ।

[অ+অ=আ]—সুর+অসুর=সুরাসুর, শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক।

[আ+অ=আ]—মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ, মায়া+অন্ধ=মায়ান্ধ।

[অ+আ=আ]—দেব+আলয়=দেবালয়, সিংহ+আসন=সিংহাসন।

[আ+আ=আ]—দিবা+আলোক=দিবালোক, বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়।

(৶) ই-বর্ণ+সবর্ণ=ঈ।

[ই+ই=ঈ]—রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র, অতি+ইব=অতীব।

[ঈ+ই=ঈ]—মহী+ইন্দ্রমহীন্দ্র, সুধী+ইন্দু=সুধীন্দু।

[ই+ঈ=ঈ]—পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা, গিরি+ঈশ=গিরীশ।

[ঈ+ঈ=ঈ]—সতী+ঈশ=সতীশ, কাশী+ঈশ্বর=কাশীশ্বর।

(১/০) **উবর্ণ+সবর্ণ=ঊ।**

[উ+উ=ঊ]—কটু+উক্তি=কটূক্তি, ঋতু+উৎসব=ঋতূৎসব।

[ঊ+উ=ঊ]—বধূ+উৎসব=বধূৎসব, ভ্রূ+উপরি=ভ্রূপরি।

[উ+ঊ=ঊ]—লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি, বহু+ঊর্ণা=বহূর্ণা।

[ঊ+ঊ=ঊ]—ভূ+ঊর্ধ্ব ভূর্ধ্ব, চমূ+ঊর্ধ্বক=চমূর্ধ্বক [যুদ্ধবাস্ত]।

(খ) অ-বর্ণের পর **ই-বর্ণ** থাকিলে উভযে মিলিয়া **এ**, **উ-বর্ণ** থাকিলে উভয়ে মিলিযা **ও**, **ঋ** থাকিলে উভযে মিলিযা **অর্‌** হয় এবং নূতন স্বর পূর্বব্যঞ্জনে যুক্ত হয় [অর্‌-এর র পরবর্ণের মস্তকে যায]।

(/০) **অ-বর্ণ+ই-বর্ণ=এ**

[অ+ই=এ]—দেব+ইন্দ্র=দেবেন্দ্র, শুভ+ইন্দু=শুভেন্দু।

[আ+ই=এ]=মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র, যথা+ইষ্ট=যথেষ্ট।

[অ+ঈ=এ]—নর+ঈশ=নরেশ, অপ+ঈক্ষা=অপেক্ষা।

[আ+ঈ=এ]—উমা+ঈশ=উমেশ, মহা+ঈশ্বর=মহেশ্বর।

(৵০) **অ-বর্ণ+উ-বর্ণ=ও।**

[অ+উ=ও]—সূর্য+উদয=সূর্যোদয, নর+উত্তম=নরোত্তম।

[আ+উ=ও]—গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক, দুর্গা+উৎসব=দুর্গোৎসব।

[অ+ঊ=ও]—গৃহ+ঊর্ধ্ব=গৃহোর্ধ্ব, এক+ঊনবিংশতি=একোনবিংশতি।

[আ+ঊ=ও]—মহা+ঊর্ধ্ব=মহোর্ধ্ব, গঙ্গা+ঊর্মি=গঙ্গোর্মি।

(১/০) **অ-বর্ণ+ঋ=অর্‌।**

[অ+ঋ=অর্‌]—সপ্ত+ঋষি=সপ্তর্ষি, উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ।

[আ+ঋ=অর্‌]—মহা+ঋষি=মহর্ষি।

ব্যতিক্রম—'ঋত' শব্দের সহিত **অ-বর্ণান্ত** শব্দের তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে অ-বর্ণ+ঋ=**আর্‌** হয়।

[অ+ঋ=আর্‌]—শীত+ঋত=শীতার্ত, দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত।

[আ+ঋ=আর্‌]—তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত।

দ্রষ্টব্য—(ক /০) অনুসারে শীত+আর্ত, ক্ষুধা+আর্ত প্রভৃতি সন্ধিতে শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি হইবে।

(গ) অ-বর্ণের পর এ, ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ এবং ও, ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ হয়, নূতন স্বর পূর্বব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

(/০) **অ-বর্ণ**+এ, ঐ=ঐ।

[অ+এ=ঐ]—জন+এক=জনৈক, হিত+এষণা=হিতৈষণা।

[আ+এ=ঐ]—তথা+এবচ=তথৈবচ, সদা+এব=সদৈব।

[অ+ঐ=ঐ]—মত+ঐক্য=মতৈক্য, রাজ্য+ঐশ্বর্য=রাজ্যৈশ্বর্য।

[আ+ঐ=ঐ]—মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য, মহা+ঐরাবত=মহৈরাবত।

(৵০) **অ-বর্ণ**+ও, ঔ= ঔ।

[অ+ও=ঔ]—কণ্ঠ+ওষ্ঠ=কণ্ঠৌষ্ঠ, বন+ওষধি=বনৌষধি।

[আ+ও=ঔ]—মহা+ওষধি=মহৌষধি, মহা+ওকঃ=মহৌকঃ।

[অ+ঔ=ঔ]—চিত্ত+ঔদার্য=চিত্তৌদার্য, উত্তম+ঔষধ=উত্তমৌষধ।

[আ+ঔ=ঔ]—মহা+ঔষধ=মহৌষধ, মহা+ঔৎসুক্য=মহৌৎসুক্য।

(ঘ) **অসবর্ণ** পরে থাকিলে পূর্ববর্তী **ই-বর্ণ** স্থানে য্-ফলা, **উ-বর্ণ** স্থানে ব্-ফলা এবং **ঋ**-স্থানে **র্**-ফলা হয় এবং পরের স্বর যথাক্রমে **য্**-ফলা, ব্-ফলা ও **র্**-ফলার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

(/০) **ই-বর্ণ+অসবর্ণ** হইলে **ই-বর্ণ** = **য্**।

[ই+অ=য]—যদি+অপি=যদ্যপি, [ই+আ=যা]—অতি+আচার—অত্যাচার, [ই+উ=যু]—অভি+উদয=অভ্যুদয়, [ই–ঊ=যূ]—প্রতি+ঊষ=প্রত্যূষ, [ই+এ=যে]—প্রতি+এক=প্রত্যেক।

[ঈ+অ=য]—নদী+অম্বু=নদ্যম্বু। [ঈ+আ=যা]—মসী+আধার=মস্যাধার। (কিন্তু স্ত্রী+আচার=স্ত্র্যাচার হইবে না)। [ঈ+উ=যু—নদী+উপকণ্ঠ=নদ্যুপকণ্ঠ।

(৵০) **উ-বর্ণ+অসবর্ণ** হইলে **উ-বর্ণ**= **ব**।

[উ+অ=ব]—অনু+অয়=অন্বয়। [উ+আ=বা]—পশু+আচার=পশ্বাচার।

[উ+ই=বি]—অনু+ইত=অন্বিত। [উ+ঈ=বী]—বহু+ঈশ্বর=বহ্বীশ্বর।

[উ+এ=বে]—অনু+এষণ=অন্বেষণ। [ঊ+আ=বা]—বধূ+আচার =বধ্বাচার (বাঙ্‌লায় চলে না)।

(৶০) **ঋ+অসবর্ণ হইলে ঋ=র্‌।**

[ঋ+অ=র]—পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি (বাঙ্‌লায় পিতৃ-অনুমতি প্রযুক্ত হয়, সন্ধি করা হয় না)। [ঋ+আ=রা]—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়।

(ঙ) **স্বরবর্ণ** পরে থাকিলে পূর্ববর্তী **এ**-স্থানে **অয়্‌**, **ঐ**-স্থানে **আয়্‌**, **ও**-স্থানে **অব্‌** এবং **ঔ**-স্থানে **আব্‌** হয় ; **অ** ও **আ** পূর্বব্যঞ্জনে এবং পরের **স্বর য়্‌** ও **ব্‌**-তে যুক্ত হয়।

(৴০) **এ+স্বর** হইলে **এ=অয়্‌**—নে+অন [ন্‌+এ+অন]=নয়ন [ন্‌+অয়্‌+অন]। শে+অন [শ্‌+এ+অন]=শয়ন[শ্‌+অয়্‌+অন]।

(৵০) ঐ+স্বর হইলে ঐ=**আয়্‌**—গৈ+অক [গ্‌+**ঐ**+অক]গায়ক=[গ্‌+**আয়্‌**+অক]। নৈ+অক [ন্‌+**ঐ**+অক] =নায়ক [ন্‌+**আয়্‌**+অক]।

(৶০) **ও+স্বর** হইলে **ও=অব**—পো+ইত্র [প্‌+**ও**+ইত্র]=পবিত্র[প্‌+**অব্‌**+ইত্র]। গো+এষণা [গ্‌+**ও**+এষণা]=গবেষণা[গ্‌+**অব্‌**+এষণা]। ভো+অন [ভ্‌+**ও**+অন]=ভবন[ভ্‌+**অব্‌**+অন]।

(।০) **ঔ+স্বর** হইলে **ঔ=আব্‌**—নৌ+ইক [ন্‌+ঔ+ইক]=নাবিক [ন্‌+**আব্‌**+ইক]। ভৌ+উক [ভ্‌+ঔ+উক]=ভাবুক [ভ্‌+**আব্‌**+উক]। পৌ+অক [প্‌+ঔ+অক]=পাবক [প্‌+**আব্‌**+অক]।

(চ) কয়েকটি প্রয়োজনীয় সন্ধির উদাহরণ—শ্রী+ঈশ=শ্রীশ, বি+ইত=বীত, সু+উক্ত=সূক্ত, প্র+ইত=প্রেত, আ+উত-প্র+উত=ওতপ্রোত, দ্বি+অর্গ=দ্ব্যর্গ, বি+আপ্ত=ব্যাপ্ত, বি+আস=ব্যাস, বি+উৎপত্তি=ব্যুৎপত্তি, বি+ঊঢ=ব্যূঢ (প্রশস্ত, বিবাহিত), বি+ঊহ=ব্যূহ, নি+ঊন=ন্যূন, শুদ্ধি+অশুদ্ধি=শুদ্ধ্যশুদ্ধি, সু+অচ্ছ=স্বচ্ছ, সু+অর্ণ বা স্ব+ঋণ=স্বর্ণ, মনু+অন্তর=মন্বন্তর, উপরি+উপরি=উপর্যুপরি, বহু+আড়ম্বর=বহ্বাড়ম্বর, সু+অল্প=স্বল্প, প্রতি+ইত=প্রতীত, সু+আগত=স্বাগত।

(ছ) পূর্বোক্ত **নিয়মাবলীর বহির্ভূত** কয়েকটি সন্ধি—

(৴০) প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় [অ+ঊ=ঔ, ও নহে], অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী [অ+উ=ঔ, ও নহে], বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ [অ+ও=ও, বিম্বৌষ্ঠও হয়], স্ব+ঈর=স্বৈর [অ+ঈ=ঐ, এ নহে], স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী [অ+ঈ=ঐ], গো+

অক্ষ=গবাক্ষ [ও+অ=অব+অ=অবা], গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র [ও+ই=অব+ই =অবে]।

[সংস্কৃত ব্যাকরণে এইগুলির জন্য স্বতন্ত্র সূত্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা নিয়ম বহির্ভূত বা নিপাতনে সিদ্ধ নহে; কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহাদিগকে নিপাতনে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে।]

(৵০) কুল+অটা=কুলটা [ভ্রষ্টা নারী] অ+অ=অ, আ নহে] সার+অঙ্গ= সারঙ্গ (হরিণ), মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড (সূর্য), শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন [পবিত্র অন্ন বা পবিত্র অন্ন যাহার] অ+ও=ও, ঔ নহে]—ইহারা **নিপাতনে সিদ্ধ। সন্ধির নিয়মে যে সকল সন্ধি সিদ্ধ হয় না, তাহাদিগকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।**

(ii) ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের, ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের এবং ব্যঞ্জবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয় তাহাকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলে।

স্বর + ব্যঞ্জন

(ক) **স্বরের** পরে **ছ** থাকিলে **ছ** স্থানে **চ্ছ** হয়—অব+ছেদ=অবচ্ছেদ, আ +ছন্ন=আচ্ছন্ন, পরি+ছদ=পরিচ্ছদ, তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া। অনুরূপে—একচ্ছত্র, মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, মুণ্ডচ্ছেদ, মধুচ্ছন্দা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ পদ গঠিত হইয়াছে—

(খ) নিয়ম বহির্ভূত সন্ধি [সংস্কৃতে নিয়মসিদ্ধ, কিন্তু বাঙ্‌লায় প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া সূত্ররচনা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় ইহাদিগকেও **নিপাতনে সিদ্ধ** বলা যাইতে পারে]—আ+চর্য=আশ্চর্য, আ+পদ=আস্পদ, পর+পর=পরস্পর, হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র, বিশ্ব+মিত্র=বিশ্বামিত্র [ঋষির নাম; কিন্তু 'জগতের বন্ধু' অর্থে সন্ধি হইবে না], গো+পদ=গোষ্পদ, বন+পতি+বনস্পতি।

ব্যঞ্জন + স্বর

(গ) বর্গের **প্রথমবর্ণের** পর **স্বর**বর্ণ থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থলে উক্তবর্গের **তৃতীয়** বর্ণ হয়।

ক্, চ্, ট্, ত্, প্+স্বর হইলে ক্, চ্, ট্, ত্, প্=**গ্, জ্, ড্, দ্, ব্।**

(/০) ক্+স্বর—বাক্+ঈশ=বাগীশ, বাক্+আড়ম্বর=বাগাড়ম্বর, দিক্+অন্ত=দিগন্ত।

(৵০) চ্+স্বর—ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত, অচ্+অন্তা=অজন্তা।

(৶০) ট্+স্বর—ষট্+আনন=ষডানন, ষট্+অঙ্গ=ষডঙ্গ, ষট্+ঋতু=ষড়্-ঋতু।

(৷০) ত্+স্বর—জগৎ+ঈশ=জগদীশ, সৎ+ইচ্ছা=সদিচ্ছা, মহৎ+আশ্রয়=মহদাশ্রয়, চিৎ+আনন্দ=চিদানন্দ।

(৷/০) প্+স্বর—সুপ্+অন্ত=সুবন্ত।

(ঘ) ব্যঞ্জনে-স্বরেও নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি রহিয়াছে—পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি (ঋষি), সীমন্+অন্ত=সীমন্ত [সঁীথি, কিন্তু সীমান্ত (সীমা+অন্ত)-সীমার শেষ], পশ্চাৎ+অর্ধ=পশ্চার্ধ।

ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জন

(ঙ) ঘোষবর্ণ পরে থাকিলে বর্গীয় প্রথমবর্ণ-স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

(/০) ক্+ঘোষবর্ণ—ক্=গ্—বাক্+দেবী=বাগ্‌দেবী, দিক্+গজ=দিগ্‌গজ, বাক্+ধারা=বাগ্‌ধারা।

(৵০) চ+ঘোষবর্ণ—চ্=জ্—বাঙ্‌লায় প্রযোগ নাই।

(৶০) ট্+ঘোষবর্ণ—ট্=ড—ষট্+দর্শন=ষড়্‌দর্শন, ষট্+ভুজ=ষড়্‌ভুজ, ষট্+যন্ত্র=ষড্‌যন্ত্র।

(৷০) ত্+ঘোষবর্ণ—ত্=দ্—উৎ+ভব=উদ্‌ভব, উৎ+যোগ=উদ্যোগ, সৎ+গুণ=সদ্‌গুণ, জয়ৎ+রথ=জয়দ্রথ, উৎ+ঘাটন=উদ্‌ঘাটন, জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু [জগবন্ধু অশুদ্ধ]

(৷/০) প্+ঘোষবর্ণ—প্=ব্—অপ্+জ=অব্জ, অপ্+ধি=অব্ধি, অপ্+দ=অব্দ (মেঘ)।

(চ) বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ পরে থাকিলে প্রথমবর্ণ-স্থানে তৃতীয় বর্ণ ও পঞ্চম বর্ণ দুই-ই হইতে পারে। **[তৃতীয় বর্ণ হইবার কথা পূর্বসূত্রেই উক্ত হইয়াছে]**।

(/০) ক্+৫ম বর্ণ—ক্=গ্ বা ঙ্—দিক্+নাগ=দিগ্‌নাগ বা দিঙ্‌নাগ, দিক্+নির্ণয়=দিগ্‌নির্ণয় বা দিঙ্‌নির্ণয়।

(৵০) চ+৫মবর্ণ—চ্=জ্ বা ঞ্—বাঙ্‌লায় প্রয়োগ নাই।

(৶০) ট্+৫মবর্ণ—ট্=ড্ বা ন্—ষট্+মাস=ষড্‌মাস বা ষণ্মাস, ষট্+নবতি=ষড্‌নবতি বা ষণ্ণবতি।

(৷০) ত্+৫মবর্ণ—ত্=দ্ বা ন্—জগৎ+নাথ=জগদ্‌নাথ বা জগন্নাথ।

(৷৴০) প্=ম্ বাঙ্‌লায় নাই।

(ছ) **ময়, মাত্র** ও **নদাদি** ধাতুজ পদ পরে থাকিলে প্রথমবর্ণ-স্থানে কেবল পঞ্চম বর্ণ হইবে।

বাক্+মাত্র=বাঙ্মাত্র, বাক্+ময=বাঙ্ময়, চিৎ+ময=চিন্ময, মৃৎ+মৃন্ময, উৎ+নতি=উন্নতি, উৎ+নযন=উন্নযন, তৎ+মাত্র=তন্মাত্র।

(জ) অঘোষবর্ণ পরে থাকিলে বর্গীয় তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ-স্থানে প্রথম বর্ণ হয় [বিশেষতঃ দ্ ও ধ্ স্থানে ৎ হয়]।

ক্ষুধ্+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা, তদ্+পব=তৎপর, তদ্+কাল=তৎকাল, বিপদ্+সঙ্কুল=বিপৎসঙ্কুল, তদ্+সম=তৎসম, তদ্+ক্ষণাৎ=তৎক্ষণাৎ, তদ্+ত্ব=তত্ত্ব, ক্ষুধ্+পীড়িত=ক্ষুৎপীড়িত।

(ঝ) ত্ ও দ্-এর স্থানে চ বা ছ পবে থাকিলে চ্; জ বা ঝ পরে থাকিলে জ্; ট বা ঠ পবে থাকিলে ট্; ড বা ঢ পরে থাকিলে ড্; ল পরে থাকিলে ল্ হয়।

(৴০) ত্, দ্+চ=চ্চ
ত্, দ্+ছ=চ্ছ } চলৎ+চিত্র =চলচ্চিত্র, উৎ+চারণ=উচ্চারণ, সৎ +চরিত্র=সচ্চরিত্র, বিপদ্+চিন্তা=বিপচ্চিন্তা, উৎ +ছেদ =উচ্ছেদ, তদ্+ছবি=তচ্ছবি।

(৵০) ত্, দ্+জ =জ্জ
ত্, দ্+ঝ=জ্ঝ } উৎ +জ্বল=উজ্জ্বল, যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন, তদ্ +জন্য =তজ্জন্য, সৎ+জন=সজ্জন, কুৎ +ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা।

(৶০) ত্, দ্+ট=ট্ট
ত্, দ্+ঠ=ট্ঠ } বাঙ্‌লায় নাই।

(৷০) ত, দ্+ড =ড্ড
ত, দ্+ঢ=ড্ঢ [বাঙ্‌লায় অচল।] } উৎ+ডীন=উড্ডীন।

(।/০) ত্‌, দ্‌+ল = ল্ল—উৎ+লাস = উল্লাস, উৎ+লেখ = উল্লেখ, ভগবৎ+লীলা ভগবল্লীলা, বিদ্যুৎ+লেখা = বিদ্যুল্লেখা, তদ্‌+লীলা = তল্লীলা।

(ঞ) **শ** পরে থাকিলে **ত্‌** ও **দ্‌**-স্থানে **চ্‌** এবং **শ**-স্থানে **ছ** হয়; এবং **হ** পরে থাকিলে **ত্‌** ও **দ্‌**-স্থানে **দ্‌** এবং **হ**-স্থানে **ধ** হয়।

(/০) ত্‌, দ্‌+শ = চ্ছ—চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি, উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল, উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস, তদ্‌+শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ।

(৵০) ত্‌, দ্‌+হ = দ্ধ—উৎ+হার = উদ্ধার, উৎ+হৃত = উদ্ধৃত, তদ্‌+হিত = তদ্ধিত, উৎ+হত = উদ্ধত, জগৎ+হিত = জগদ্ধিত।

(ট) **চ**-বর্গের পরস্থিত **ন্‌**-এর স্থানে **ঞ্‌** হয়। চ্‌+ঞ = ঞ্চ—যাচ্‌+না = যাচ্ঞা; জ্‌+ন = জ্ঞ—রাজ্‌+নী = রাজ্ঞী, যজ্‌+ন = যজ্ঞ।

(ঠ) **ষ্‌**-এর পরস্থিত **ত, থ** যথাক্রমে **ট, ঠ** হইয়া যায়।

(/০) ষ্‌+ত = ষ্ট—বৃষ্‌+তি = বৃষ্টি, [শাস্‌ =] শিষ্‌+ত = শিষ্ট, আকৃষ্‌+ত = আকৃষ্ট, [প্র-বিশ্‌ =] প্রবিষ্‌+ত = প্রবিষ্ট, কৃষ্‌+তি = কৃষ্টি।

(৵০) ষ্‌+থ = ষ্ঠ—ষষ্‌+থ = ষষ্ঠ।

(ড) **উৎ**-উপসর্গের পরস্থিত **স্থা**-ধাতুর **স্‌** লুপ্ত হয়—উৎ+স্থান [উৎ+থান] = উত্থান, উৎ+স্থিত [উৎ+থিত] = উত্থিত, উৎ+স্থাপন [উৎ+থাপন] = উত্থাপন।

(ঢ) **ম্‌**-এর পর যে **বর্গের বর্ণ** থাকে **ম্‌**-স্থানে সেই বর্গের **পঞ্চম** বর্ণ হয়।

(/০) ম্‌+ক-বর্গ হইলে ম্‌ = ঙ্‌—কিম্‌+কর = কিঙ্কর, শম্‌+কর = শঙ্কর, সম্‌+গত = সঙ্গত, সম্‌+ঘাত = সঙ্ঘাত।

[বিকল্পে অনুস্বার, যথা—কিংকর, শংকর সংগত, সংঘাত।

(৵০) ম্‌+চ-বর্গ হইলে ম্‌ = ঞ্‌—সম্‌+চয় = সঞ্চয়, সম্‌+জাত = সঞ্জাত, কিম্‌+চিৎ = কিঞ্চিৎ, সম্‌+জয় = সঞ্জয়।

(৶০) ম্‌+ত-বর্গ হইলে ম্‌ = ন্‌—সম্‌+তান = সন্তান, সম্‌+দীপন = সন্দীপন, সম্‌+ধান = সন্ধান, বসুম্‌+ধরা = বসুন্ধরা, কিম্‌+নর = কিন্নর, সম্‌+ন্যাসী = সন্ন্যাসী

(।০) ম্‌+প-বর্গ হইলে ম্‌ = ম্‌ (অপরিবর্তিত)—সম্‌+প্রীতি = সম্প্রীতি, সম্‌+ভব = সম্ভব, সম+বল = সম্বল, সম্‌+মত = সম্মত, সম্‌+মান = সম্মান।

(ণ) **ত**-এর পূর্বে **ধ্‌** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **দ্ধ**, **ভ্‌** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ব্ধ** এবং **হ** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **গ্ধ** হয়।

(৵০) ধ্ + ত = দ্ধ—বুধ্ + ত = বুদ্ধ, যুধ্ + ত = যুদ্ধ, (ব্যধ =) বিধ্ + ত = বিদ্ধ, বি-রুধ্ + ত = বিরুদ্ধ।

(৶০) ভ্ + ত = ব্ধ—লভ্ + ত = লব্ধ, ক্ষুভ্ + ত = ক্ষুব্ধ।

(৷০) হ্ + ত = গ্ধ—দহ্ + ত = দগ্ধ, মুহ্ + ত – মুগ্ধ, দুহ্ + ত – দুগ্ধ।

[ব্যতিক্রম—বহ—ত—উঢ, মুহ্ + ত – মূঢ—হ্ + ত = ঢ]

(iii) প্রকৃতিসন্ধি

(বাঙ্‌লায় নাই)

(iv) অনুস্বারসন্ধি

[ং] অনুস্বার ও [ঃ] বিসর্গ স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে। সুতরাং যে সন্ধিতে অনুস্বারের উদ্ভব এবং বিসর্গের লোপ, বা, পরিবর্তন ঘটে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র সন্ধি রূপে গ্রহণ করাই উচিত। যে সন্ধিতে অনুস্বারের উদ্ভব হয় তাহাকে **অনুস্বার সন্ধি** বলে। ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে সন্ধিতে এইরূপ ঘটে বলিয়া বাঙ্‌লায় অনেকে ইহাকে ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত করিয়াছেন।

(ত) **উষ্মবর্ণ** পরে থাকিলে পদমধ্যবর্তী **ন্** স্থানে ং (অনুস্বার) হয়—জিঘান্‌সা = জিঘাংসা, দন্‌শন = দংশন, হিন্‌সা = হিংসা, সিন্‌হ = সিংহ, প্রশন্‌সা = প্রশংসা।

(থ) ক-বর্গ পরে থাকিলে **ম্**-স্থানে বিকল্পে ং (অনুস্বার) হয়,—(ঢ) (৴০) দ্রষ্টব্য।

(দ) **অন্তঃস্থ** বর্ণ ও **উষ্মবর্ণ** পরে থাকিলে **ম্**-স্থানে ং (অনুস্বার) হয়।

(৴০) ম্ + অন্তঃস্থ বর্ণ—কিম্ + বা = কিংবা, সম্ = যম + সংযম, প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা, বশম্ + বদ = বশংবদ, সম্ = লাপ – সংলাপ, সম্ + রক্ত = সংরক্ত, বারম্ + বার = বারংবার, কিম্ + বদন্তী = কিংবদন্তী।

[ব্যতিক্রম—সম্ + রাট্ = সম্রাট, সংরাট্ নহে।

লক্ষণীয়—অন্তঃস্থ ব-এর পূর্ববর্তী ম্-স্থানে ং না লিখিয়া ম লিখিলে ভুল হইবে। বাঙ্‌লায় বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণে প্রভেদ না থাকিলেও সংস্কৃত শব্দের বানানে সংস্কৃত সন্ধির বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রক্ষণীয়। অতএব কিম্বা, প্রিয়ম্বদ, বশম্বদ, বারম্বার, কিম্বদন্তী হইবে না।]

(৵০) ম্ + উষ্মবর্ণ—সম্ + শ্লিষ্ট = সংশ্লিষ্ট, সম্ + শয় = সংশয়, সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা, সম্ + সার = সংসার, সম্ + শোধন = সংশোধন, সম্ + হার = সংহার।

(ব) বিসর্গসন্ধি

[ঃ] **বিসর্গের** সহিত **স্বর** বা **ব্যঞ্জনের** সন্ধিকে **বিসর্গ সন্ধি** বলা হয়। **র্** এবং **স্** এই দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে বিসর্গের উদ্ভব বলিযা বিসর্গ সন্ধিকে কেহ কেহ ব্যঞ্জন সন্ধি বলিতে চাহিযাছেন। কিন্তু কথা হইল—বিসর্গ **অযোগবাহ** বর্ণ আর *** র্‌-জাত** হউক বা **স্‌-জাতই** হউক ইহা **বিসর্গের** সহিত **স্বর ব্যঞ্জনের** সন্ধি, **র্** বা **স্** এর **সহিত নহে**। সুতরাং **বিসর্গ সন্ধিকে** স্বতন্ত্র বিবেচনা কবাই যুক্তিযুক্ত মনে হয।

(ধ) **অ**-পরবর্তী **স-জাত বিসর্গের** পরে **অ**-কাব থাকিলে পূর্বের **অ** ও **বিসর্গ** মিলিযা **ও** হয, **ও** পূর্বব্যঞ্জনে যুক্ত হয এবং পরের **অ**-কার লুপ্ত হয। [লুপ্ত অ-কারের চিহ্ন **ঽ** কদাচিৎ ব্যবহৃত হয]।

অঃ+অ=ও [ঽ]—ত**তঃ**+**অ**ধিক—ততোধিক [ত**তো**ঽধিক] ম**নঃ**+অভিলাব—ম**নো**ভিলাষ [মনোঽভিলাষ]. অ**ন্যঃ**+অন্য—অ**ন্যো**ন্য [অন্যোঽন্য—'পরস্পর' অর্থে, 'অপরাপর' অর্থে অন্য+অন্য—অন্যান্য], ব**য়ঃ**+**অ**ধিক—ব**য়ো**ধিক [বযোঽধিক]।

(**ন**) **অ**-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত **অ**-পববতা **বিসর্গের লোপ** হয, লোপের পর আব সন্ধি হয না।

অঃ+অন্যস্বব—অ**তঃ**+**এ**ব—অত**এ**ব, য**শঃ**+**উ**পার্জন—যশ**উ**পার্জন [বাঙ্‌লায 'যশোপার্জন শিষ্টপ্রযোগ], ব**ক্ষঃ**+উপরি=ব**ক্ষ**+**উ**পরি, শি**রঃ**+**উ**পরি—শি**র-উ**পরি—[বক্ষোপরি, শিরোপবি—বহুল প্রযোগ রহিযাছে]।

(**প**) **ঘোষবর্ণ** পরে থাকিলে পূর্ববর্তী **অ** ও **বিসর্গ** মিলিযা **ও** হয, ও পূর্বব্যঞ্জনে যুক্ত হয।

---

*র্‌ জাত বিসর্গ—অন্তঃ, দ্বাঃ, দুঃ, নিঃ, পিতঃ, পুনঃ, প্রাতঃ, ভ্রাতঃ, মাতঃ, স্বঃ, প্রভৃতি শব্দে।

স্‌-জাত বিসর্গ—অধঃ, অয়ঃ, আশীঃ, উরঃ, চেতঃ, জ্যোতিঃ, তঃ, তপঃ, তমঃ, তেজঃ, ধনুঃ, পয়ঃ, বক্ষঃ, বয়ঃ, মনঃ শিরঃ, সদ্যঃ, হবিঃ প্রভৃতি শব্দে।

অহঃ শব্দে ন্‌-জাত বিসর্গ হইলে ও উহা কখনও র্‌-জাত এবং কখনও স্‌-জাত বিসর্গের কার্য করিয়া থাকে।

বাঙ্‌লায় প্রায়শঃ উপরিলিখিত শব্দগুলির অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত ও লিখিত হয় না, যেমন—মন, বক্ষ শির, তেজ, প্রাতে [কিন্তু প্রাতঃকালে], বয়স [বয়ঃ বা বয়স্‌ নহে], ইত্যাদি।

অঃ+ঘোষবর্ণ—অঃ=ও—তপঃ+বন=তপোবন, সরঃ+বর=সরোবর,

অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র, শিরঃ+ধার্য=শিরোধার্য, মনঃ+যোগ=মনোযোগ,

পুরঃ+হিত=পুরোহিত, সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত, সরঃ+জ=সরোজ,

শিরঃ+বেদনা=শিরোবেদনা, তিরঃ+ধান=তিরোধান, মনঃ+হর=মনোহর,

অধঃ+মুখ=অধোমুখ, মনঃ+রম=মনোরম, ইত্যাদি।

(ক) **স্বরবর্ণ** বা **ঘোষবর্ণ** পরে থাকিলে অ আ-ভিন্ন স্বরের পরবর্তী **বিসর্গ**-স্থানে **র্‌** হয়, **র্‌** পরস্বরে যুক্ত হয় বা **রেফ** (র্) হইয়া পরবর্তী **ঘোষবর্ণের মস্তকে** যায়।

(৴০ (অ-আ-ভিন্ন স্বর) ঃ+স্বর=র্‌+স্বর—নিঃ+অবধি=নিরবধি,

নিঃ+আকার=নিরাকার, নিঃ+ঈশ্বর=নিরীশ্বর,

দুঃ+আচার=দুরাচার, জ্যোতিঃ+ইন্দ্র=জ্যোতিরিন্দ্র

জ্যোতিঃ+ঈশ=জ্যোতিরীশ [জ্যোতীশ নহে], দুঃ+আত্মা=দুরাত্মা,

দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা [দুরাবস্থা নহে]

দুঃ+আকাঙ্ক্ষা—দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃ+অপনেয—দুরপনেয।

(৵০) (আ-আ-ভিন্ন স্বর)—ঃ+ঘোষবর্ণ=[ঘোষবর্ণ]—বহিঃ+গত=বহির্গত

মুহুঃ+মুহু [ঃ]=মুহুর্মুহু [ঃ], নিঃ+মল=নির্মল, দুঃ+বোধ=দুর্বোধ,

চতুঃ+ভুজ=চতুর্ভুজ, আবিঃ+ভাব=আবির্ভাব,

আশীঃ+বাদ=আশীর্বাদ, জ্যোতিঃ+ময=জ্যোতির্ময, দুঃ+দান্ত=দুর্দান্ত,

ধনুঃ+বিদ্যা=ধনুর্বিদ্যা, আয়ুঃ+বেদ=আয়ুর্বেদ, ইত্যাদি।

(৶০) অন্তঃ, পুনঃ, প্রাতঃ, স্বঃ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে **অ**-পরবর্তী **র-জাত বিসর্গ** উক্ত ক্ষেত্রে র্‌-তে পরিণত হয়; যেমন—অন্তঃ+ইত=অন্তরিত, অন্তঃ+ধান=অন্তর্ধান, অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত, পুনঃ+আয=পুনরায, পুনঃ+আগমন=পুনরাগমন, প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ, অনুরূপ—পুনর্জন্ম, স্বর্গত, প্রাতর্ভ্রমণ পুনরপি, পুনর্বার অন্তর্যামী, অহরহ [ঃ], অহর্নিশ, প্রভৃতি।

(খ) **র** পরে থাকিলে পূর্বস্থিত **হ্রস্বস্বরের** পরবর্তী **বিসর্গ স্থানে জাত র্‌ লুপ্ত** হয় এবং **হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ** হয়।

হ্রস্বস্বর ঃ+র=দীর্ঘস্বর+র—নিঃ+রব=নীরব, নিঃ+রোগ=নীরোগ, নিঃ+রস=নীরস, চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষুরোগ, জ্যোতিঃ+রত্ন=জ্যোতীরত্ন, ইত্যাদি।

(ভ) পূর্ববর্তী **বিসর্গ**-স্থানে **চ ছ** পরে থাকিলে **শ্**, **ট ঠ** পরে থাকিলে **ষ্** এবং **ত-থ** পরে থাকিলে **স্** হয়।

(৴০) ঃ+চ, ছ=শ্চ, শ্ছ—পুনঃ+**চ**=পুন**শ্চ**, **নিঃ**+**চয়**=নিশ্চয়, নিঃ+**ছিদ্র**=নি**শ্ছ**দ্র, শিরঃ+ছেদ=শির**শ্ছে**দ; অনুরূপ—দু**শ্চ**রিত্র, দু**শ্চি**ন্তা, নি**শ্চি**ন্ত, **দুশ্ছে**দ্য, দু**শ্চ**র, তপ**শ্চ**র্যা, ইত্যাদি।

(৵০) ঃ+ট, ঠ=ষ্ট, ষ্ঠ—ধনুঃ+**ট**ঙ্কার=ধনু**ষ্ট**ঙ্কার।

[বাঙ্‌লায় ঃ+ঠ=ষ্ঠ—এর—দৃষ্টান্ত নাই। কেহ কেহ নিঃ+ঠুর=নিষ্ঠুর করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে পারে না। **নি**+**স্থুর** (স্থা+উর)=নিষ্ঠুর।]

(৶০) ঃ+ত, থ=স্ত, স্থ—মনঃ+**তা**প=মন**স্তা**প, ইতঃ+**ত**তঃ ইত**স্ত**তঃ, দুঃ+**ত**র=দু**স্ত**র। অনুরূপ—নভ**স্ত**ল, নিস্তাব, শিরস্ত্রাণ, অধ**স্ত**ন, নিস্তেজাঃ [বাঙ্‌লায় 'নিস্তেজ' ব্যবহৃত], ইত্যাদি। [ঃ+থ=স্থ—বাঙ্‌লায় নাই]।

(**ম**) **ক, খ, প, ফ,** পরে থাকিলে অ-আ-পরস্থিত **বিসর্গ** স্থানে **স্** এবং **অন্যস্বরের** পরস্থিত **বিসর্গ** স্থানে **ষ** হয়।

(৴০) (অ=আ) ঃ +ক, খ, প, ফ— ঃ=স্—**নমঃ**+**কার** নমস্কার, পুরঃ+**কার** পুর**স্কা**র, তিরঃ+**কার** তিরস্কার, ভাঃ+**কর** ভাস্কর, বাচঃ+**পতি** বাচ**স্প**তি; অনুরূপ—মনস্কামনা, শ্রেয়স্কর, অয়স্কান্ত, যশস্কর, ইত্যাদি।

(৵০) অন্যস্বর ঃ+ক, খ, প, ফ— ঃ=ষ্—**নিঃ**+**কলঙ্ক**=নি**ষ্ক**লঙ্ক, আবিঃ+**কার**=আবিষ্কার, চতুঃ+**কোণ** চতুষ্কোণ, **দুঃ**+**কর** দুষ্কর, **দুঃ**+**পাচ্য**=দু**ষ্পা**চ্য, **নিঃ**+**ফল** নি**ষ্ফল**; অনুরূপ—নিষ্কর্মা, নিষ্কৃতি, গীষ্পতি, বহিষ্কৃত, নিষ্কর, চতুষ্পদ, নিষ্পাপ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ইত্যাদি।

[ব্যতিক্রম—অধঃপতন, অন্তঃকরণ, শিরঃপীড়া, তেজঃপুঞ্জ, অতঃপর, অন্তঃপাতী, মনঃকষ্ট, প্রাতঃকাল, নিঃক্ষত্রিয়, পয়ঃপ্রণালী, দুঃখ, নভঃপ্রদেশ ইত্যাদি।

(**য**) মনস্+ঈষা মনীষা **নিপাতনে** সিদ্ধ।

[সংস্কৃতে **শিশ্**-ধ্বনির পূর্ববর্তী **বিসর্গ** বিকল্পে **শিশ-ধ্বনির সারূপ্য** লাভ করে; যেমন—মনঃ+**সং**যোগ=**মনঃসং**যোগ বা মন**স্সং**যোগ, মনঃ+**শান্তি**=**মনঃ** শান্তি বা মন**শ্**শান্তি; কিন্তু বাঙ্‌লায় এইসকল স্থলে উচ্চারণে শিশ্‌ধ্বনির দ্বিত্ব ঘটিলেও লিখিতরূপে সন্ধি করা হয় না অর্থাৎ লিখিত হয় 'মনঃসংযোগ' কিন্তু—উচ্চারিত হয় মনস্‌সংযোগ।

['নির্‌' এবং 'নি' উপসর্গের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইযাই কেহ কেহ **স্ত, স্থ, স্প**,—এর পূর্ববর্তী বিসর্গের বিকল্পলোপ ব্যবস্থিত করিযাছেন। উক্ত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য কবিলে একপ বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। নিস্তব্ধ=নি+স্তব্ধ [নি—স্তন্‌ভ্‌+ক্ত], এখানে **নিঃস্তব্ধ হইতে পারে না**; কিন্তু নিঃস্পন্দ নি(র্‌)ঃ + স্পন্দ [নির্‌ (নাই) স্পন্দ যাহার], এখানে 'নিস্পন্দ' অশুদ্ধ হইবে।]

তদ্ধিত প্রত্যযেব 'ত' পবে থাকিলে উ-ব পরস্থিত বিসর্গস্থানে **ষ্‌** হয—**চতুঃ+তয** =চতুষ্‌+তয=চতুষ্টয [ষ্‌-যুক্ত 'ত' 'ট' হয]।

৯। বাঙ্‌লা সন্ধি

সন্ধিব আলোচনায গোড়ার দিকে বলা হইয়াছে সন্ধি না কবাই বাঙ্‌লাব স্বভাবধর্ম এবং বাঙ্‌লা ভাষায ব্যবহৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বুঝিবার জন্য সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম জানা আবশ্যক। তবে কি খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দে সন্ধি নাই বা সন্ধি করা চলে না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বাঙ্‌লা সাধু ও চলিত ভাষার লিখিত ও মৌখিক রূপের একটু আলোচনার প্রয়োজন রহিযাছে।

[ইতঃপূর্বে যাঁহারা বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বহু খাঁটি বাংলা শব্দে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধিব সন্ধান পাইয়াছেন এবং শ্রমসহকারে উক্ত সন্ধির সূত্রও নির্দেশ করিযাছেন। আবার কোনও স্থলে একজনে যাহাকে সন্ধি বলিয়াছেন অপরজন তাহাকে সন্ধি বলিযা স্বীকার করেন নাই। সাধারণ শিক্ষার্থীব এইরূপ স্থলে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। এবংবিধ বিভ্রম যাহাতে না জন্মিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা]

(ক) সংস্কৃত সন্ধির প্রভাবে সংস্কৃত—অসংস্কৃত—দেশী-বিদেশী শব্দের সমাসে সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে সন্ধির প্রযাস পরিলক্ষিত হয।

(৵০) মনোমাঝে [মনঃ+মাঝে], বক্ষোমাঝে [বক্ষঃ+মাঝে], মনান্তর [মনঃ <মন+অন্তর], যশাকাঙ্ক্ষা [যশঃ<যশ+আকাঙ্ক্ষা] প্রভৃতি শব্দের বাঙ্‌লায়-বহুল প্রয়োগ রহিযাছে। ইহাদিগকে শিষ্টপ্রযোগ বলিতে হয়, বিশুদ্ধ সন্ধির উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না। বিশুদ্ধ সংস্কৃতরূপ চাহিলে 'মনোমধ্যে,' 'বক্ষোমধ্যে,' 'মনোঽন্তর,' 'যশ-আকাঙ্ক্ষা' লিখিতে হইবে। না হইলে বাঙ্‌লার রীতি অনুসারে [অন্ত্য বিসর্গের লোপ করিয়া] 'মনেরমাঝে,' 'বক্ষের মাঝে,' 'মনের অমিল' 'যশের আকাঙ্ক্ষা' ব্যবহার করিতে হইবে।

(৵০) দিল্লীশ্বর [দিল্লী+ঈশ্বর], ইংলণ্ডেশ্বরী [ইংলণ্ড+ঈশ্বরী], ঢাকেশ্বরী [ঢাকা + ঈশ্বরী] প্রভৃতি শব্দ সাধু বাঙ্‌লাতেও ব্যবহৃত। কেহ কেহ এইরূপ সন্ধিকে দূষণীয় বলিয়াছেন। এই ধরণের শব্দে কিন্তু একটু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। বিশেষসংজ্ঞা-বাচক (proper nouns) পূর্বপদের সহিত সংস্কৃত উত্তর পদের সমাস হওয়ায় সংস্কৃতের নিয়মে সন্ধি করা হইয়াছে। 'মথুরাধিপতি,' 'মগধেশ' প্রভৃতি পদে সংস্কৃত সন্ধি স্বীকৃত। ইহাদিগকেও বাঙ্‌লাসন্ধির আলোচনায় না ফেলিয়া সংস্কৃত স্বরসন্ধির উদাহরণরূপে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কী ?

(খ) করিয়াছি [করিয়া+আছি], আসিয়াছে [আসিয়া+আছে], জ্যেঠামি [জ্যেঠা+আমি], সোনালি [সোনা+আলি] প্রভৃতি শব্দে দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরবর্তী প্রত্যয়ের পূর্ববর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। ইহা **বর্ণলোপ, সন্ধি নহে।**

(গ) চাষাবাদ [চাষ্‌-আবাদ], আপনাপন [আপন্‌-আপন্‌], জিনিসাদি [জিনিস্‌-আদি] প্রভৃতি স্থলে পূর্বপদের অন্ত্য **অ** বাঙ্‌লায় **অনুচ্চারিত** বলিয়া পরের পদের আদিস্বর পূর্ব-ব্যঞ্জনের সহিত যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়। লিখিবার সময় পৃথক্‌ করিয়াই লেখা উচিত। এসকল ক্ষেত্রেও সন্ধি নাই। ঠাকুরালি [ঠাকুর্‌+আলি], চতুরালি [চতুর্‌+আলি], ঘরামি [ঘর্‌+আমি] ইত্যাদি শব্দেও মূল শব্দের ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণের জন্য প্রত্যয়ের স্বর উহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে, সন্ধি হয় নাই।

(ঘ) শতেক [শত্‌+এক], যতেক [যত্‌+এক], এতেক [এত্‌+এক], ক্ষণেক [ক্ষণ্‌+এক], আধেক [আধ্‌+এক]—এখানেও উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত পূর্ব শব্দের সহিত প্রত্যয়ের এ যুক্ত হইয়াছে।

[শতকরা, যতদূর, এতদূর, কতদূর—চলিত বাংলার এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এখানেও কার্যকর হইয়াছে। 'এক এইসকল স্থলে সংখ্যাবাচক শব্দ নহে, উহা 'পরিমাণ' বাচক প্রত্যয়মাত্র।]

(ঙ) ছেলেমি [ছালিয়ামি<ছাইল্যামি<ছেলেমি], মেয়েলি [মাইয়ালি<মেয়েলি আধুনিক বাঙ্‌লা সন্ধির নিদর্শন নহে, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির বলে এইসকল শব্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং ছেলেমি=ছেলে+আমি, মেয়েলি=মেয়ে+আলি বলা অযৌক্তিক।

(চ) ঘোড়গাড়ী, ঘোড়দৌড়, ঘোড়সওয়ার, কাঁচকলা, কালসাপ, পিস্‌শ্বশুর, বেশ-

কম, মাটকোঠা, সারবন্দী—প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের ফলে পূর্বপদের অন্ত্যস্বরের বিলোপ ঘটিয়াছে। সন্ধি হয় নাই।

[ঘোট<ঘোড<ঘোড়্, কাঞ্চ<কাঁচ্চ<কাঁচ<কাঁচ্—পরিবর্তনের এই ধারাটিই ঘোড়দৌড়, কাঁচকলা প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে রক্ষিত হইয়াছে।]

(ছ) খানিক=খানি+ক [খানি+এক নহে]	}	সন্ধি নাই;
কোটিক=কোটি+ক [কোটি+এক নহে]	}	সর্বত্র পরিমাণার্থে 'ক'
কুড়ি=কুড়ি+ক [কুড়ি+এক নহে]	}	প্রত্যয়।

(জ) শাঁখারী (শাঁখারি), কাঁসারী (কাঁসারি) প্রভৃতি শব্দের উদ্ভবধারাটি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, শাঁখা+আরী (আরি), কাঁসা+আরী (আরি)—এইরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়ের সন্ধিতে উহারা গঠিত হয় নাই। শঙ্খকার<শাঁখ আর<শাঁখার< শাঁখারী বা শাঁখারি [প্রস্তুত রূপ], কাংস্যকার<কাঁস আর<কাঁসার<কাঁসারী বা কাঁসারী [প্রস্তুত রূপ], লোহকার (লোহ আর<লোহার [এইরূপই এখনও প্রচলিত, আগের শব্দ দুইটির মত ইহা প্রস্তুত হয় নাই]।

(ঝ) মায়ে [মা+এ], তোমায় [তোমা+এ], আলোয় [আলো+এ] ইত্যাদিতে **য়্**-এর আগম সন্ধির ফল বলিয়া মনে হইলেও **য়-শ্রুতির** কথা ভুলিলে চলিবে না। বস্তুতঃ এখানে উচ্চারণগত **য়-শ্রুতি** লেখায়ও স্থান পাইয়াছে। চাওয়া [চা+আ], পাওয়া [পা+আ] প্রভৃতি **ব-শ্রুতির** উদাহরণ।

(ঞ) যাচ্ছেতাই [যা ইচ্ছে তাই]—চলিত বাঙ্‌লার 'যা ইচ্ছে তাই' দ্রুত উচ্চারিত হওয়ায় '**ইচ্ছে**'-র '**ই**' ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। 'যাচ্ছেতাই' রূপ দেখা দিয়াছে 'কদর্য' বা 'জঘন্য' অর্থে ব্যবহৃত "যাচ্ছেতাই"-কে স্বয়ংসম্পূর্ণ পদরূপেই গ্রহণ করা উচিত।

(ট) কান্না>কাঁদ্‌না, রান্না>রাঁধ্‌না, কুচ্ছিত>কুৎসিত, জ্যোছনা>জোৎস্না, নাজ্জামাই>নাত [নাতি>নাইত>না'ত>জামাই, বজ্জাত>বদ্‌জাত, ছোড দা>ছোট [ছোট্] দাদা, বট্‌ঠাকুর>বড় [বড্] ঠাকুর, ব্যাটাচ্ছেলে>বেটার ছেলে, চাদ্দিক> চারদিক, সগ্‌গ>স্বর্গ ইত্যাদি শব্দে **পরবর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির** যে **পরিবর্তন** ঘটিয়াছে তাহাকে **প্রত্যাবর্ত সমীকরণ** বলে, **সন্ধি নহে।** চলিত বাঙ্‌লার উচারণ-বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত এই শব্দগুলি লেখায়ও ব্যবহৃত হইতেছে।

নিম্নলিখিত স্থলে কেবল উচ্চারণগত **সমীকরণই** শ্রুত হয়, ইহাদের লিখিতরূপের প্রচলন হয় নাই।

এগ্গুঁযেমি>একগুঁযেমি, পাঁজ্জন>পাঁচজন, মুগ্ ধোয়>মুখ ধোয, রাদ্দিন>রাত দিন, হাদ্ধরা>হাতধরা, মেক্ক'রেছে>মেঘ ক'রেছে, পাঁশ্শের>পাঁস্সের>পাঁচসের, পাঁশ্শ>পাঁচশ, ঘোডাডিম>ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি।

পরস্পর সন্নিহিত দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণগত সমতা বা একরূপতাকে সমীকরণ বা **সমীভবন** বলে।

(১) জগজীবন, জগবন্ধু, জগমোহন—ইহাদের বিশুদ্ধ তৎসমরূপ জগজ্জীবন (জগৎ+জীবন), জগদ্বন্ধু [জগৎ+বন্ধু], জগন্মোহন [জগৎ+মোহন]। হিন্দীতে 'জগৎ অর্থে **'জগ'** শব্দের ব্যবহার এবং উল্লেখিত শব্দ কযটিরও ব্যক্তিবিশেষের নাম রূপে ব্যবহার রহিযাছে তাই বলিযা বাঙ্লায পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সন্ধিতে জগৎ-এর 'ৎ' লোপ ঘটিযাছে বলিলে ভুল হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খাঁটি বাঙ্লা শব্দে সন্ধি নাই বলিলেই চলে। ভাষায **শ্রুতিকটুতা দোষ**বিশেষ। বাঙ্লাভাষায উহা অবশ্য পরিহার্য। সুতরাং— স্ত্র্যাচার [স্ত্রী+আচার], বিদ্যুদ্দীপ্তাকাশ [বিদ্যুৎ+দীপ্ত+আকাশ], মাত্রুপদেশ [মাতৃ+উপদেশ], শীতর্তু [শীত+ঋতু], অনুমত্যনুসারে [অনুমতি+অনুসারে], ভরদ্বাজর্ষি] [ভরদ্বাজ+ঋষি], দৃষ্ট্যাকর্ষণ [দৃষ্টি+আকর্ষণ], শ্র্যঙ্গ [শ্রী+অঙ্গ] প্রভৃতি স্থলে সংস্কৃত সন্ধিও একান্তভাবে বর্জনীয। কিন্তু যেখানে কোনও যৌগিক শব্দ সমগ্র ভাবে সংস্কৃত হইতে বাঙ্লায আসিযাছে সেখানে সন্ধি রাখিতেই হইবে; যেমন— বিদ্যালয, মহাশয, সদাশয, নযন, গবাক্ষ, ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে বিদ্যা-আলয, মহা আশয, সৎ-আশয, নে-অন, গো-অক্ষ বলা বা লেখা চলিবে না।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইযা দাও।

২। সন্ধি কত প্রকারের ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের দুটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। সংস্কৃতে কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি অবশ্যকরণীয? বাঙ্লাতেও ঐ সকল নিযম প্রযোজ্য কিনা আলোচনা কর।

৪। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাহাকে বলা হয়? অন্ততঃ ৩টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর।

৫। খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দে সন্ধি হয় কিনা আলোচনা কর।

৬। সমীকরণ কাহাকে বলে? প্রত্যাবর্ত সমীকরণ কী? সমীকরণের ৩টি উদাহরণ দাও।

৭। **সসূত্র সন্ধি কর** :—লঘু+ঊর্মি, অপ+ঈক্ষা, পাদ+উদক, অধম+ঋণ, অভি+উদয়, নৈ+অক, ভৌ+অ, গো+ইন্দ্র, শুদ্ধি+অশুদ্ধি, বহু+আরম্ভ, উপরি+উপরি, স্ব+ঈরিনী, দুঃ+নিবার, ষট্+মাস, উৎ+নতি, তদ্+লীলা, চলৎ+শক্তি, উৎ+হৃত, কিম্+বদন্তী, তিরঃ+ধান, দুঃ+অবস্থা, নিঃ+রোগ, চতুঃ+তয়।

৮। **সূত্রের উল্লেখ করিয়া সন্ধিবিশ্লেষ কর** :—ক্ষুধার্ত, অক্ষৌহিনী, প্রৌঢ়, উচ্ছ্বাস, প্রাতবাশ, তরুচ্ছায়া, সম্রাট্, মনোরম, নীরব, অন্যোন্য, তদ্ধিত, আচ্ছন্ন, মহৌষধি, চাকেশ্বরী, চরণামৃত, নিজস্ব, উল্লেখ, গবাক্ষ, উত্তমর্ণ, নাবিক, সতীশ, কটুক্তি, পরীক্ষা, সপ্তর্ষি, জনৈক, অত্যাচার, অন্বয়, পিত্রালয়, শয়ন, গবেষণা, প্রত্যেক, মন্বন্তর, স্বচ্ছ, ন্যূন, স্বৈর, মার্তণ্ড, বিচ্ছেদ, আশ্চর্য, পরস্পর, ষড়ানন, পতঞ্জলি, সীমন্ত, ভরদ্বাজ, জয়দ্রথ, অব্ধি, দিঙ্‌নির্ণয়, মৃন্ময়, তত্ত্ব, উজ্জ্বল, কুজ্ঝটিকা, উদ্ধার, ষষ্ঠ, উত্থান, সঞ্জয়, সন্ন্যাসী, কিন্নর, দুগ্ধ, মূঢ়, সংহার, অতএব, পুরোহিত, নিরাকার, পুনরায়, নিশ্চিন্ত, নিষ্ঠুর, ইতস্তত, উচ্ছৃঙ্খল, অন্বেষণ, গায়ক, হরিশ্চন্দ্র, মনীষা, ভ্রাতুষ্পুত্র।

৯। **ব্যাকরণগত টীকা লিখ** :—মনান্তর, বক্ষোমাঝে, দিল্লীশ্বর, ঘটকালি, ক্ষণেক, মেয়েলি, ঘোড়দৌড়, কাঁচকলা, খানিক, শাঁখারী, তোমায়, কান্না, বজ্জাত, নাজ্জামাই, জগবন্ধু।

১০। **কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ করিয়া লিখ** :—অত্যান্ত, দুরাবস্থা, পশ্বাধম, জাত্যাভিমান, অনুমত্যানুসারে, জ্যোতীশ, অবনিন্দ্র, শুদ্ধাশুদ্ধি, বিদ্যুতালোক, ভূম্যাধিকারী বাগেশ্বরী, প্রিয়ম্বদা, সন্মানিত, কিম্বা, পৃথকান্ন, উজ্জল, তরুছায়া, সৎচিদানন্দ, হৃদ্‌পিণ্ড, উচ্ছাস, মনাভিলাষ, বক্ষোপরি, নভমণ্ডল, জ্যোতীন্দ্র, মনমোহন, শিরচ্ছেদ, চক্ষুরোগ, নিবস, অহরাত্র, তড়িতাভা, বিপদ্জাল, যশেচ্ছা।

১০। ণত্ব-বিধান

বাঙলায় ণ্ ন্-এর উচ্চারণে প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তাই, খাঁটি বাঙলা **শব্দের** বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের ণ্ লিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের বাণানেও ণ্ লিখিবার প্রয়োজন নাই। খাঁটি বাঙলা শব্দ রানী, ঠাকুরানী—ঠাকরুন, ঝরনা, ঝর্না, হারান—এইরূপই লেখা উচিত। [**বহুদিন হইতে—রাণী ঠাকুরাণী, ঝর্ণা, হারাণ—চলিয়া আসিতেছে।**]

বিদেশী শব্দে—জার্মানি, ইরান, তুরান, কোরান [কুর্‌আন], ট্রেন, দূরবীন, কুর্নিশ লেখা উচিত। [অনেকে জার্মাণি, ইরাণ, ট্রেণ প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন]

তদ্‌ভব শব্দ—কান, ('কর্ণ' হইতে) সোনা ('স্বর্ণ' হইতে), বামুন ('ব্রাহ্মণ' হইতে), বানান ('বর্ণন' হইতে): [সংস্কৃতে **র্** এর পরবর্তী বলিয়া **ণত্ব**বিধি অনুসারে **ন্** হইয়াছে। কিন্তু বাঙলা তদ্‌ভব শব্দে ণত্বের হেতু অর্থাৎ **র্** নাই অথচ **ন** রাখিতে হইবে ইহা অনেকের মত যুক্তিসিদ্ধ নহে; অথচ তাহারাই আবার **ষত্ব বিধিতে** মূল সংস্কৃত শব্দে **ষ** থাকিলে তদ্ভবশব্দে **ষ** লিখিবার পক্ষপাতী। **উভয়ত্র একই নিয়ম মানিয়া চলিতে আপত্তি কেন?** কাণ, সোণা, বাণান-এ উহাদের তদ্ভবত্ব পরিস্ফুট হয়।

তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত থাকিবে, আর সেইজন্যই **ণত্ব-বিধান** শিখিতে হইবে। ব্যাকরণ অনুসারে **ন্**-এর **ণ্**-তে পরিবর্তনের নিয়মকে **ণত্ব-বিধি** বা **ণত্ব-বিধান** বলে।

(ক) একপদস্থিত **ঋ,র্,ষ্**-এর পরবর্তী **ন্** ণ্ হইবে; যথা—ঋণ, তৃণ, বর্ণ, কর্ণ, কৃষ্ণ [কৃষ্‌ণ], বিষ্ণু [= বিষ্‌ণু], ইত্যাদি।

(খ) স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, ব্, হ্ এবং ং [অনুস্বার]**ঋ, র, ষ,** ও **ন্**-এর মাঝখানে বসিয়া উহাদিগকে পরস্পর হইতে দূরে রাখিলেও **ন্** ণ্ হইবে; যেমন—প্রাণ [প + র্ + আ + ন], কৃপণ [কৃ + প্ + অ + ন], বিরহিণী [বির্ + অ + হ্ + ই + নী], ভূষণ [ভূষ্ + অ + ন], পরিবহণ [পর্ + ই + ব্ + অ, হ + অ + ন],

রামায়ণ, শ্রবণ, দর্পণ, ম্রিয়মাণ, রুক্মিণী, লক্ষণ, লক্ষ্মণ, রুগ্‌ণ [ইহা লেখা উচিত, 'রুগ্ন' নহে]।

(গ) **প্র, পরা, পরি, নির্**—এই চারি উপসর্গের পরস্থিত **নদাদি** ধাতুর **ন্** ণ্ হইবে।

নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নুদ্, নু, অন্, হন্, আর নী।
নদ্ র'য়েছে গোড়ায়, দেখ, তাই হ'ল **নদাদি**॥

নাদ, নিনাদ—নির্ণাদ [নির্+নাদ (নদ্‌ধাতু)], তুর্নাম, হরিনাম—প্রণাম, পরিণাম [প্র-নম্ ও পরি নম্ ধাতু হইতে], নাশ—প্রণাশ [প্র-নশ্ ধাতু হইতে, কিন্তু প্রনষ্ট], অপনোদিত—প্রণোদিত [প্র-নুদ্ ধাতু হইতে], অভিনব—প্রণব [প্র-নু ধাতু হইতে], অভিনয়, বিনয়,—প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয় [প্র-নী, পরি-নী, নির-নী ধাতু হইতে], প্রাণ [প্র-অন্ ধাতু হইতে] ইত্যাদি। **প্র**-এর পরস্থিত **নি** উপসর্গের **ন্** ণ্ হয়—প্রণিপাত, প্রণিধান।

(ঘ) 'অহন্' শব্দ স্থানে সমাসে 'অহ্ন' আদেশ হইলে এবং পূর্ব ণত্বের হেতু [(ক) ও (খ) সূত্র অনুযায়ী] থাকিলে অহ্ন-এর **ন্** ণ্ হয়; যেমন—প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, কিন্তু সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন এখানে [ণত্বের হেতু নাই]।

[হ্+ন=হ্ন, হ্+ণ=হ্ণ]

* ঋ র্-ষ-এর পরে যদি ন এর দেখা পাই।
খাঁচ করে তার কাটবো মাথা, ফাঁসির ভয় তো নাই॥

‡ ঋবর্ণাদ রষকারাদ্বা পদান্তস্থস্য ন'স্য ণঃ।
স্বর-কবর্গ পবর্গ হ-য বৈ বন্তরে'পি চ॥

† নদো নমো নশশ্চৈব নহ-নী-নু-নুদস্তথা।
অনো হনশ্চেত নব নদাদি'গণ ঈর্য্যতে॥

(ঙ) **পর, পার, উত্তর, চান্দ্র** ও **নারা** বা নার শব্দের সহিত যুক্ত **অয়ন** শব্দের **ন্** ণ্ হইবে—পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ ও নারায়ণ।

(চ) **একপদ**-রূপে ব্যবহৃত **ত্রি, চতুর্** ও **অগ্র** শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ **হায়ন** শব্দের **ন্** ণ্ হইবে—ত্রিহায়ণ [তিন বৎসরের শিশু], চতুর্হায়ণ [চারি বৎসরের শিশু], অগ্রহায়ণ [মাস বিশেষ]; কিন্তু ত্রিহায়ন=তিন বৎসর, চতুর্হায়ণ—চারি বৎসর।

সূর্প শব্দের সহিত **নখ** শব্দের সমাসের নাম বুঝাইলে **ন্** ণ্ হইবে, নাম না বুঝাইলে হইবে না। সূর্পণখা=রাবণের ভগিনী সূর্পনখা=সূর্পের (কুলার) মত নখ যে নারীর;

(ছ) **শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র, খদির** প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাসে **বন** শব্দের **ন্** সংস্কৃতে সর্বদা **ণ্** হয়, কিন্তু বাঙ্‌লায় কখনও **ণ্** লেখা হয় না। সংস্কৃতে—**শরবণ**, **ইক্ষুবণ**, প্লক্ষবণ, আম্রবণ, খদিরবণ আর বাঙ্‌লায়—**শরবন**, **ইক্ষুবন**, **আম্রবন** ইত্যাদি।

(জ) **ট**-বর্গের পূর্বে যুক্ত **ন্**, সর্বদা **ণ্** হইবে—ঘণ্টা, কণ্ঠ, দণ্ড, যণ্ণবত্তি ইত্যাদি।

(ঝ) **ণত্ব-নিষেধ বিধি**—

(।০) সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে **ণ**ত্বের হেতু [(ক) ও (খ) সূত্র অনুযায়ী] থাকিলেও উত্তরপদের **ন্ ণ্ হইবে না**—হরিনাম, ত্রিনয়না, দক্ষিণায়ন, সবনাম, শ্রীনিবাস, বারিনিধি ইত্যাদি।

(৵০) **ঋ-র্-ষ্** এবং **ন্**-এর মধ্যে খ-সূত্রে উল্লেখিত বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকিলে **ন্ ণ্ হইবে না**—অর্জন, অর্চনা, বচনা, কীর্তন, দর্শন, প্রার্থনা, বর্ণনা, বর্ধন, মূর্ধন্য, কর্তন, মর্দন, বিসর্জন, ইত্যাদি।

(৶০) পদান্তস্থিত ন্ [হসন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ন] ণ্ হয় না—শ্রীমান্, ব্রাহ্মন্, শর্মন্, ইত্যাদি।

(ঞ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির **ণ্ স্বভাবসিদ্ধ**—

কঙ্কণ, কণিকা, কাণ, নিক্কণ, চিক্কণ, বাণ,
কণ, কণা, বেণু, বীণা, বাণী।
মৎকুণ, গণিকা, গণ, নিপুণ, কল্যাণ, পণ,
গুণ, গণ, মণি, বেণী, পাণি.॥
চাণক্য, শোণিত, গণ্য, আপণ, বিপণি, পণ্য
শাণ, ভাণ, ভণিতা, লবণ।
বাণিজ্য, লাবণ্য, অণু, পিণ্যাক, কফোণি, স্থাণু,
কোণ, তূণ, গৌণ, শোণ, শণ॥

ষত্ব-বিধান

বাঙ্‌লায় **শ, ষ, স**-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বিদেশী শব্দে **ষ**-এর ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ নহে।

খরগোশ, তোশক, পোশাক, বালাপোশ, তখ্‌তাপোশ, বারকোশ, জিনিস,

মুসলমান—এইরূপই লেখা উচিত। ইংরাজী **'st'**-এর প্রতিবর্ণীকরণে **স্+ট=স্ট** লেখা উচিত; ইহাতে উচ্চারণের সমতা রক্ষিত হয়। **খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান, ইষ্টিশন**, বা **ষ্টেশন মাষ্টার, পোষ্ট** অফিস না লিখিয়া **খ্রীস্ট, খ্রীস্টান, ইস্টিশন** বা **স্টেশন, মাস্টার, পোস্ট**-অফিস লিখিলে **st**-এর উচ্চারণ পরিস্ফুট হয়।

[খৃষ্ট বা খ্রীষ্ট, খৃষ্টান বা খ্রীষ্টান বর্জনীয়]।

তৎসম বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানানে **ষত্বের** প্রয়োজনীয় প্রধান নিয়মগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ব্যাকরণ অনুসারে শব্দে **ষ্**-এর প্রয়োগবিধিকে **ষত্ব-বিধান** বলে।

(ক) **অ-বর্ণ [অ, আ]-ভিন্ন স্বর, ক্ এবং র্**-এর পরবর্তী **প্রত্যয়ের স্ ষ্** হইবে; যথা শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়েষু [কিন্তু **আ**-এর পরে কল্যাণীয়াসু], প্রীতিভাজনেষু, ভবিষ্যৎ, চিকীর্ষা, বুভুক্ষা, বক্ষ্যমাণ, মুমূর্ষু, জিগীষা, ক্ষয়িষ্ণু, ইত্যাদি।

[বিভক্তি প্রত্যয়ের অন্তর্গত বলিয়া ৭মী বিভক্তিতে শ্রীচরণেষু হইয়াছে]

ব্যতিক্রম—সাৎ প্রত্যয়ের **স্** কখনও **ষ্** হয় না—ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ইত্যাদি।

(**খ**) **ঋ**-এর পর সর্বদা **ষ্** হইবে; যথা—ঋষি, ঋষভ, বৃষ, বৃষভ, কৃষ্ণ, বৃষ্টি, বৃষিত।

(গ) **ই**-কারান্ত

[অভি, বি অধি, নি, প্রতি ও পরি—বাংলায় অতি ও অপি অনাবশ্যক]

উ-কারান্ত [**অনু, সু**] উপসর্গের পরস্থিত **সদাদি** ধাতুর **স্ ষ্** হয়।

[সদ্, সঞ্জ্, সিচ্, সিধ্, সেব্, স্থা, স্যন্দ্, স্বপ্ ও সহ্ বাঙলায় অন্য ধাতু গুলির প্রয়োজন নাই]

সদ্—নিষাদ, পরিষদ্, বিষণ্ণ, ইত্যাদি। সঞ্জ্—অনুষঙ্গ, নিষঙ্গ। **সিচ্**—অভিষেক, নিষিক্ত, ইত্যাদি। **সিধ্**—নিষিদ্ধ, প্রতিষেধ, ইত্যাদি। **সেব্**—নিষেবণ, পরিষেবিত, ইত্যাদি। **স্থা**—অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠিত, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত, বিষ্ঠা ইত্যাদি। **স্যন্দ্**—অনুষ্যন্দ, নিষ্যন্দিত ইত্যাদি। **স্বপ্**—সুষুপ্তি, সুষুপ্ত। **সহ্**—দুর্বিষহ।

[অন্য উপসর্গের পরে ষ হইবে না, যেমন—সংসদ্, প্রসাদ প্রস্থান, সংস্থা, আসঙ্গ, দুঃসহ, প্রসুপ্ত, ইত্যাদি।

(ঘ) সমাসে **ই, উ, ঋ**, ও পূর্বপদের **অন্তস্বর** হইলে পরপদের **আদ্য স্ ষ্**

হয় ; যথা—অগ্নিষ্টোম [অগ্নি+স্তোম—যজ্ঞবিশেষ], বিষম, সুষেণ, সুষ্ঠু [সু+স্থু] **সুষমা**, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, গোষ্ঠ ইত্যাদি।

(ঙ) **ক্, খ্, প্, ফ্** পরে থাকিলে সন্ধিতে **অ-আ-ভিন্ন** স্বরের পরস্থিত **বিসর্গ** স্থানে **ষ্** হয় ; যেমন—বহিষ্কার [বহিঃ+কার], আবিষ্কৃত [আবিঃ+কৃত], দুষ্কর [দুঃ+কর], নিষ্পাপ [নিঃ+পাপ], নিষ্ফল [নিঃ+ফল], ইত্যাদি।

(চ) সন্ধিতে **ত্, থ, ট্, ঠ্**-তে পরিণত হইলে উহাদের পূর্ববর্তী **শ** ও **স্ ষ্** হইয়া যায় ; যথা—দৃষ্টি [দৃশ্+তি] ক্লিষ্ট [ক্লিশ্+ত], দংষ্ট্রা [দন্‌শ্+ত্র+আ (স্ত্রী)], যুধিষ্ঠির [যুধি+স্থির], ইত্যাদি।

(ছ) **বস্** ও **শাস্** ধাতু-স্থানে যথাক্রমে উস্ ও শিস্ হইলে **স্ ষ্** হয় ; যথা—অধ্যুষিত, শিষ্য ইত্যাদি।

(জ) নিম্নোদ্ধৃত তৎসম শব্দ গুলিতে স্বভাবতঃই **ষ** হয়।

আষাঢ়, ঈষৎ, ঈর্ষ্যা, উষ্মা, ঊষা, কোষ।
ঊষর, ওষধি, গ্রীষ্ম, পুষ্প, ভীষ্ম, রোষ ॥
ঔষধ, কাষায়, বর্ষ, তুষার, গণ্ডূষ।
নিকষ, পাষাণ, বিষ, প্রদোষ, পুরুষ ॥
ভিষক্, মহিষ, মেষ, মহিষী, ভূষণ।
শ্লেষ, ষট্, ষণ্ড, শেষ, বিষাণ, দূষণ ॥

(ঝ) তদ্ভব শব্দে তৎসমরূপের **শ, ষ, স** লেখাই উচিত। আঁষ ['আমিষ' হইতে], **ষাঁড়** ['ষণ্ড' হইতে], সরিষা ['সর্ষপ' হইতে] **শাঁস** ['শস্য' হইতে], * নিশুতি ['নিশীথ' হইতে], ✝ আউশ ['আশু' হইতে] ঘষা ['ঘর্ষণ' হইতে], ভয়সা ['মহিষ' হইতে] ইত্যাদি।

* ডা. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'নিসুপ্তিক' হইতে আগত বলিয়া শব্দটি হইবে নিসুতি ; কিন্তু সংস্কৃতে নিষুপ্তিক পদ হয় না।

‡ 'মানুষ' হইতে নহে। শীঘ্র [বর্ষারম্ভের অল্প পরেই] ফসলের জন্য 'আশু ধান্য' নাম হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। ণত্ব-বিধান কাহাকে বলে? উদাহরণ সহ ন্ এর ণ্-তে পরিবর্তনের তিনটি প্রধান নিয়মের উল্লেখ কর।

২। ষত্ব-বিধান কাহাকে বলে? বাঙ্‌লায় যে সকল শব্দে ষ্-এর প্রয়োগ অবশ্য করণীয় তাহাদের প্রধান তিনটি নিয়ম উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ণত্ব-ষত্বের কারণ নির্দেশ কর :—

বর্ণ, প্রণাম, অপরাহ্ণ, অগ্রহায়ণ, লবণ, নারায়ণ, প্রাণ, তৃণ, কঙ্কণ, কৃপণ, পরিবহণ, সূর্পণখা নিপুণ, কৃষ্ণ, শ্রীচরণেষু, ঋষি, বিষণ্ণ, সুষেণ, নিষ্পাপ, পাষাণ, শিষ্য, যুধিষ্ঠির, ভূষণ সরিষা, নিষেধ, পুরুষ।

৪। ভুল থাকিলে যুক্তি দেখাইয়া শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

বাণান, জার্মাণি, কল্যাণীয়াষু, ষ্টেশন, কাণ, ম্রিয়মান, ভবিষ্যৎ, মৃণ্ময়, সূর্পনখা, মূর্ধণ্য, সর্বণাম, খ্রীষ্ট, মধ্যাহ্ন, লাবণ্য, নিসেবন, ভৎসনা, নিস্ফল, বাষ্প।

৫। ব্যাকরণগত টীকা লিখ:—ঝর্ণা, সোনা, ইরাণ, প্রনষ্ট, অপরাহ্ণ, ত্রিহায়ণ, ব্রহ্মণ, মাস্টার, সংস্কার, ধূলিসাৎ।

———

(গ) পদ-প্রকরণ

১। শব্দ, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয় ও পদ

মানব, সূর্য, চন্দ্র, জল, ও, এ, গম্, যা, প্রভৃতির প্রত্যেকটি দ্বারা একটি অর্থের বোধ জন্মে। উহাদের কোনটিতে একটি বর্ণ কোনটিতে দুইটি বর্ণ আবার কোনটিতে ততোধিক বর্ণ রহিয়াছে। ইহাদের প্রথম ছয়টি শব্দ ও পরের দুইটি ধাতু।

কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের উপযোগী নহে। আবার কয়েকটি একত্র করিলেও অর্থবোধ হয় না। একটির সহিত অপরটির কোনও সম্বন্ধই নাই। মনোভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে যে সার্থক বর্ণসমষ্টি পরস্পর অর্থ সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয় তাহাই বাক্য এবং ভাষা পরিমাপের একক। বাক্য গঠন করিতে হইলে অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে প্রাক্তে **শব্দ** ও **ধাতুর** সহিত আরও কিছু যোগ করিতে হয়। যাহা যোগ করিতে হয় তাহাই হইল **বিভক্তি**। **শব্দ** ও **ধাতুকে** বাক্যে প্রযুক্ত করিতে হইলেই উহাদের সহিত **বিভক্তি** যোগ করিতে হইবে।

শিষ্যেরা গুরুকে ভক্তি করে—একটি বাক্য।

ইহাতে 'শিষ্যেরা', গুরুকে', 'ভক্তি' এবং 'করে' এই চারিটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শিষ্যেরা = শিষ্য + রা, গুরুকে = গুরু + কে, ভক্তি = ভক্তি + ০ [বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত]. করে = কর্ + এ। 'এরা', কে'. 'এ'—এইগুলি বিভক্তি। 'শিষ্য', 'গুরু'. এবং ভক্তি' শব্দ আর 'কর্' একটি ধাতু।

এইরূপ শব্দের অপর নাম **প্রাতিপদিক**। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে

(ক) **ধাতু-ভিন্ন অপরাপর বিভক্তিবিহীন সার্থক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে শব্দ বা প্রাতিপদিক বলে ;** যথা—মানব, সূর্য, এ, ও, শিষ্য, গুরু, ইত্যাদি।

(খ) **ক্রিয়ার মূল বা বীজকে ধাতু বলে।** অথবা **প্রাতিপদিক ব্যতীত অপরাপর বিভক্তিবিহীন সার্থক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ধাতু বলে ;** যথা—কর্, খা, গম্, দৃশ্, জিজ্ঞাস্, দেদীপ্য, ইত্যাদি।

(গ) **ধাতু ও প্রাতিপদিককে এক কথায় প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি** শব্দের অর্থ জননী। **ধাতু** ও **প্রাতিপদিক** হইতে যে কেবল **পদ** সমূহের উদ্ভব

তাহাই নহে; উহাদের সহিত আর কিছু যুক্ত হইয়া অনেক নূতন ধাতু ও প্রাতিপদিক ও গঠিত হইয়া থাকে; যেমন, 'মনু' একটি প্রাতিপদিক, আবার মনু+অন্ (ষ্ণ)='মানব' আর একটি প্রাতিপদিক। 'গম্' একটি ধাতু কিন্তু গম্+অন (ট্)='গমন' একটি প্রাতিপদিক এবং দীপ্+যঙ্='দেদীপ্য' একটি ধাতু।

(ঘ) **যাহারা ধাতু ও প্রাতিপদিকের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ বা ধাতু গঠন করে তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে;** যথা—**'ষ্ণ', 'অনট্', 'যঙ', প্রভৃতি।**

সংস্কৃতে প্রাতিপদিকের সহিত 'সুপ্' প্রভৃতি এবং ধাতুর সহিত 'তিঙ্' প্রভৃতি যুক্ত হইয়া পদ গঠিত হয় বলিয়া উহাদিগকে যথাক্রমে **শব্দ-বিভক্তি** ও **ধাতু-বিভক্তি** বলা যাইতে পারে।

(ঙ) **যাহা প্রাতিপদিক ও ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া পদ গঠন করে তাহাকে বিভক্তি বলে;** যথা—'র', 'ক' প্রভৃতি **শব্দ বিভক্তি** এবং 'ই', 'ইল', 'ইব' প্রভৃতি **ধাতু বিভক্তি**।

(চ) **বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও বিভক্তিযুক্ত ধাতুকে পদ বলে;** যথা—'তোমরা' ব্যাকরণ' 'শিখিবে' [তিনটিই পদ]।

[সংস্কৃতে কোনও প্রাতিপদিকের উল্লেখ করিতে হইলেই উহার সহিত প্রথমা বিভক্তি করিতে য। ফলে শব্দ মাত্রই পদে পরিণত হইয়া যায়। বাঙ্‌লায় প্রথমা বিভক্তির কোনও সূচক চিহ্ন াই। তাই অনেক সময় শব্দ ও পদ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাসবদ্ধ শব্দ প্রাতি- াদিক, কিন্তু বলা হয়—সমস্তপদ। ইহা ভুল নহে, সমাস গঠিত প্রাতিপদিকটির প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত পের উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু মূলতঃ প্রাতিপদিক বা শব্দ না হইলে বিভক্তিযুক্ত ইয়া পদে পরিণত হইতে পারে না।

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। সুনীতিবাবু ক্রিয়া-প্রাতিপদিক (verb-base)-এর আমদানি রিয়াছেন। ক্রিয়া—প্রাতিপদিক' অর্থহীন। বিভক্তি যুক্ত ধাতুই ক্রিয়া। ক্রিয়া একটি পদ। াতিপদিক শব্দের বিভক্তিহীন অবস্থা। সুতরাং একই বর্ণ সমষ্টি একই সময়ে বিভক্তি যুক্ত হইবে বং হইবে না ইহা অসম্ভব। আরও প্রাতিপদিকের সহিত ধাতু বিভক্তি যুক্ত হইতে পারে না। তরাং রাখির [রাখন+ইর্ প্রত্যয়], করিব [কর্+ইব প্রত্যয়] এইরূপ প্রাতিপদিক প্রস্তুত করিয়া রে 'আম', এ' প্রভৃতি ধাতুবিভক্তির যোগে ক্রিয়াপদ গঠন অনাবশ্যক মনে হয়। 'ইলাম', 'ইবে' ভৃতিকেই ধাতু বিভক্তিরূপে গ্রহণ করা উচিত।

২। পদের প্রকারভেদ

শব্দ ও **পদের** প্রভেদ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। শব্দ বা প্রাতিপদিক বিভক্তি-যুক্ত হইয়া পদে পরিণত হয় এবং ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে। বাঙ্‌লায় প্রথমাবিভক্তির একবচনের কোনও সূচকচিহ্ন নাই ; অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে [**প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা**] শব্দের কথা বলিতে হইলে প্রথমাবিভক্তি-যুক্ত ও একবচনান্ত করিয়াই বলিতে হয়। তখন ইহা পদ হইয়া যায়। তাই পদের প্রকারভেদই বলা হইল।

ভাষায় ব্যবহৃত **পদ**রাজির স্বরূপ বা স্বধর্ম বিচার করিয়া উহাদিগকে মুখ্যতঃ **পাঁচ** ভাগে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(/০) **বিশেষ্য,** (৵০) **সর্বনাম,** (৶০) **বিশেষণ** (।০) **অব্যয়** ও (।/০) **ক্রিয়া।** ইহাদের প্রথম চারিটিকে শব্দের প্রকারভেদ বলা যায়, কিন্তু **ক্রিয়া** সর্বদাই **পদ**।

[ইংরাজীতে Parts of speech ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা—Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition Conjunction, ও Interjection। ইংরাজীর Adjective ও Adverb বাঙ্‌লা বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত এবং Preposition, Conjunction, ও Interjection বাঙ্‌লাতে অব্যয়। নিম্নের তালিকাটি দেখিলেই পদবিভাগের পার্থক্য স্পষ্ট হইবে।
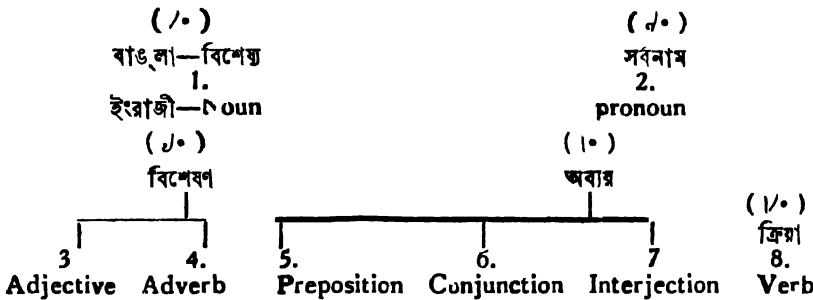
(/০) **বিশেষ্য**—যাহাতে বিশেষ্য করিয়া বুঝাইয়া দেয় তাহাই **বিশেষ্য**। বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্যই **সংজ্ঞার সৃষ্টি**। তাই **সংজ্ঞা**বাচক পদমাত্রই **বিশেষ্য**। সংজ্ঞা দুই প্রকারের হইতে পারে। **সাধারণ সংজ্ঞা** ও **বিশেষ সংজ্ঞা**। উভয় সংজ্ঞাই **বিশেষ্য** পদবাচ্য। পদার্থ বিবেচনা করিয়া সংজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় করিলে দেখা যায়—

যে শব্দ বা পদে বস্তু, জাতি, গুণ, ভাব বা অবস্থা, কার্য ও সমষ্টির নাম (সাধারণ সংজ্ঞা) **অথবা দ্রব্যবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নাম** (বিশেষ সংজ্ঞা) **বুঝায় তাহাকে বিশেষ্য বলে।**

সাধারণ সংজ্ঞা—মাটি, মানুষ, দয়া, দুঃখ, দর্শন, সভা।

বিশেষ সংজ্ঞা—রামায়ণ, রাম, চন্দ্র, কলিকাতা, জাভা।

(৵০) **সর্বনাম—সর্ব অর্থাৎ সকলপ্রকার, নাম অর্থাৎ বিশেষ্যের পরিবর্তে প্রযোজ্য পদকে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সর্বনাম বলে। সর্বনামের এই সংজ্ঞা ইংরাজী** ব্যাকরণ অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সর্বনামের সংজ্ঞা নাই; কেবল বস্তুনির্দেশের দ্বারা সর্বনাম সূচিত হইয়াছে।

* ইরাজী ব্যাকরণে A Noun is the rame of anything (কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে)।

[সর্বাদীনি সর্বনামানি—পাণিনি। সর্ব প্রভৃতি শব্দগুলিই সর্বনাম। সংস্কৃতে ইহার সংখ্যা ২৮]

বাঙ্‌লায় ৩০টি **সর্বনাম** ব্যবহৃত হয়; যথা—

সর্ব—সব, যে, সকল, অন্য, এক, আমি,
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

পর, অপর, এ, নিজ, স্ব, সে, আপনি,
(৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩)

ও, তুমি, কে, কী, কেহ, কোন, কিছু,
(১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০)

যাহা, তাহা, ইনি ইহা, উহা, তুই, উভয়,
(২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭)

উনি, যিনি, তিনি।
(২৮) (২৯) (৩০) 'আমি' থেকে 'মুই' বলা কবিতায় চলে।
(৩১)

একত্রিশ হবে একে স্বতন্ত্র ধরিলে।

আবার—

তুমি, ইনি, উনি, যিনি, তিনি—ত' আদরে।
তুই, এ, ও, যে, সে—মোরা বলি তুচ্ছ করে।"

বাংলায় বাক্যাংশ ও বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদও সর্বনাম আখ্যা পাইয়া থাকে।

অতএব বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সর্বনামের এইরূপ সংজ্ঞা করিতে হয়—

যে সকল পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ্য, বাক্যাংশ বা বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে তাহাদিগকে সর্বনাম বলা হয়। কেহ কেহ সর্বনামকে **প্রতিনাম** বলিযাছেন।

[ইহা ইংরাজী Pronoun এর অনুকরণে গঠিত কিন্তু লাক্ষণিক উৎকর্ষ সূচিত না হইলে নূতন পরিভাষা রচনায প্রযোজন আছে কি ?]

(৶০) বিশেষণ—(ক) **বীর** বালক **অটল** রহিল।

(খ) **একটি** কলম আন।

(গ) "**অতি বড় বৃদ্ধ** পতি।"

(ঘ) **মন্দ মন্দ** বহে বায়ু।

(ঙ) **অতি** অবশ্য আসিবে

উপরিলিখিত বাক্যগুলিতে স্থূলাক্ষর পদ সমূহ দ্বারা অন্যপদের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, প্রকৃতি প্রভৃতি সূচিত হইয়াছে। **বীর** দ্বারা 'বালক'—এই বিশেষ্য পদের গুণ এবং **অটল** দ্বারা তাহার অবস্থা বুঝাইতেছে; **একটি** দ্বারা 'কলমে'র সংখ্যা, **বৃদ্ধ** দ্বারা 'পতি'র অবস্থা, **বড়** দ্বারা কী পরিমাণে 'বৃদ্ধ', **অতি** দ্বারা কী পরিমাণে 'বড', **মন্দমন্দ** দ্বারা কিভাবে 'বহে' তাহা বুঝাইতেছে। এই শ্রেণীর পদগুলিই **বিশেষণ** পদ। অতএব বলা যাইতে পারে—**যে সকল পদদ্বারা অন্যান্য পদের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা, প্রকৃতি প্রভৃতি বিশেষ রূপে সূচিত হয় তাহাদিগকে বিশেষণ বলে।**

(।০) **অব্যয়—লিঙ্গভেদে, বিভক্তিভেদে ও বচনভেদে যে পদের ব্যয়** (অর্থাৎ রূপবিকার) **ঘটে না তাহাই অব্যয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে রহিয়াছে—**

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্ *]

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদের সহিত স্ত্রীপ্রত্যয, ও বিভক্তিযুক্ত হইলে উহাদের একটু রূপবিকার ঘটে এবং এই রূপগত বিকারদ্বারাই উহাদের লিঙ্গ, কারক ও সংখ্যার বোধ জন্মে। যেহেতু অব্যয় স্বতন্ত্র পদ এবং উহার রূপবিকার নাই তবে কি অব্যয়ের

লিঙ্গ, কারক, সংখ্যা নাই? কোনও কোন বৈয়াকরণ বলেন—না, "অব্যয়ের লিঙ্গ নাই, কারক নাই, সংখ্যা নাই [লিঙ্গকারকসংখ্যাভাবোঽব্যযত্বম্]।" কিন্তু লিঙ্গ-কারকাদি না থাকা এবং লিঙ্গকারকাদিতে এককরূপতা এক কথা নহে। [**লতা** শোভতে, **নদী** বহতি,—এই দুইটি বাক্যে যথাক্রমে **লতা** ও **নদী** কর্তৃপদ এবং প্রথমাবিভক্তিযুক্ত, অথচ প্রাতিপদিক **লতা** ও **নদী** হইতে ইহাদের কিছুমাত্র রূপবিকার ঘটে নাই। কিন্তু ইহাদের কাবকত্ব ও সংখ্যাবোধ ব্যাহত হয নাই]। বিভক্তিযুক্ত না হইযা কোন শব্দ বা প্রাতিপদিক বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ—একথা পূর্বেও বলা হইযাছে। অব্যযের পদত্ব অর্থাৎ বাক্যে প্রযোজ্যতা স্বীকার করিলে উহা যে বিভক্তিযুক্তি ইহাও মানিযা লইতে হইবে। কেহ হযত বলিবেন—বিভক্তিযুক্ত হইলেই সংখ্যা ও/বা কারকের বোধ থাকিবেই [সংখ্যাকারকবোধযিত্রী বিভক্তিঃ]। বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত একটি অব্যযের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে।

(ক) **কেমন** ছেলে? (খ) **কেমন** মেয়ে? (গ) **কেমন** ফল?

কেমন একটি বাঙ্‌লা অব্যয শব্দ। ইহা (ক), (খ) ও (গ) -তে তিনটি বাক্যে প্রযুক্ত হইযা পদে পবিণত হইযাছে। (ক) -তে ইহা পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদ। 'ছেলে'র (খ) -তে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদ 'মেযে'র এবং (গ) -তে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য পদ 'ফলে'র বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। রূপান্তব না ঘটিলেও বিশেষ্যের যে লিঙ্গ বিভক্তি ও বচন বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ; বিভক্তি ও বচন হইবে। অতএব **কেমন** পদটিব প্রাতিপদিক-রূপ অবিকৃত থাকিলেও উহাব লিঙ্গ-বচন-বোধে কিছু মাত্র অসুবিধা হয না। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—অব্যয যখন বিশেষণ হইল তখন ত তাহার লিঙ্গকারক-সংখ্যা ভাব [অব্যয়ত্ব] ঘুচিয়া গেল। তাহা হইলে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত অব্যয় পদে রূপবিকার কোথায়? উত্তব—বাঙ্‌লায অনব্যয় বিশেষণ পদেরও প্রাযশঃ রূপবিকার ঘটে না; যেমন—**ভাল** ছেলে, **ভাল** মেয়ে, **ভাল** খাবার। তাই বলিয়া কি **ভাল** -কে অব্যয় বলিব? যখন কোনও বিশেষণ পদের আলোচনা করিব তখন তাহার অব্যয়ত্বের প্রশ্ন উঠিবে কেন?

এইরূপ বিতর্কের শেষ নাই। অবশ্য ইহাও মিথ্যা নহে যে বিতর্কের মধ্য দিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় এবং এইরূপেই স্থায়ী মতের প্রতিষ্ঠা হয়। মোট কথা,

গোড়াতেই **অব্যয়** পদের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই আমাদের মতে সমীচীন সংজ্ঞা।

বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত সংস্কৃত অব্যয়—

অকস্মাৎ, অতএব (অতঃ+এব), অথবা, অন্যথা, অপি (যদ্যপি), অবশ্য, অর্থাৎ, আঃ, ইতি, ইদানীং, ঈষৎ, একদা, এব (সর্বৈব), এবং (এবংবিধ), কচিৎ (ক+চিৎ), কথঞ্চিৎ (কথম্+চিৎ), কদাচিৎ (কদা+চিৎ), কিঞ্চিৎ (কিম্+চিৎ), কিন্তু (কিম্+তু), কেবল, ঝটিতি, তথা, ধিক্, নচেৎ (নে+চেৎ), নতুবা (ন+তু+বা) নমঃ, নিতান্ত, পরন্তু (পরম্+তু), পশ্চাৎ, পুনঃ, পৃথক্, প্রতি, প্রভৃতি, প্রায়, বা, মুহুর্মুহুঃ, যথা, যদি, যাবৎ, যুগপৎ, বরং, বিনা, বৃথা, শীঘ্র, সতত, সদা, সদ্যঃ, সম্প্রতি, সম্যক্, সর্বদা, সহ, সহিত, সহসা, সাক্ষাৎ, স্বয়ং, ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা অব্যয়—

আর, আহা, আহা মরি, ই, ইস্, উঃ, এখন, এমন, এঃ, এই মরেছে, ও, ওঃ, ও হরি, ওর নাম কি, কখন, কবে, কি, কেন, কেমন, কোথা, কোথায়, চমৎকার, ছি, ত, তখন, তক্ষুণি, তবু, তবে, তা, তাই, তেমন, ধেৎ, না, বটে, বলিহারি, বাপরে, বাব্বাঃ, বুঝি, বেশ, মত, মতন, মরি, মরিমরি, মানে, মোদ্দা, যখন, যেথা, যেথায়, যেমন, সেথা, সেথায়, হরিহরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, হেথায়,ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গগুলিও অব্যয়, উহাদের কথা পরে আলোচিত হইবে।

(।/০) **ক্রিয়া—**

অবিভাজ্য সার্থক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিই **প্রকৃতি**। প্রকৃতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) **প্রাতিপদিক**, (২) **ধাতু**। **ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে যে পদের সৃষ্টি হয় তাহাকে ক্রিয়া বলে।** 'কর্', 'খা', 'হ', প্রভৃতি ধাতু, কিন্তু 'করি', 'খাইল', 'হইবে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ।

[ধাতু ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রিয়াপ্রকরণে দ্রষ্টব্য]।

অনুশীলনী

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

২। প্রকৃতি কাহাকে বলে? উহা কয়ভাগে বিভক্ত? প্রত্যেক ভাগের স্বরূপ নির্ণয় কর।

৩। পার্থক্য বুঝাইয়া দাও:—(ক) প্রত্যয় ও বিভক্তি; (খ) প্রাতিপদিক ও পদ; (গ) ধাতু ও ক্রিয়া।

৪। পদ কত প্রকারের ও কী কী?

৫। সর্বনাম কাহাকে বলে? কতকগুলি সর্বনামের উল্লেখ কর।

৬। অব্যয় কাহাকে বলে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

বিশেষ্য কাহাকে বলে—পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। নামের দিক হইতে বিচার করিলে বিশেষ্য দুই প্রকার—(ক) সাধারণসংজ্ঞাবাচক এবং (খ) বিশেষসংজ্ঞাবাচক।

(ক) মাটি, মানুষ, দয়া, দুঃখ, দর্শন, সভা।

(খ) রামায়ণ, রাম, চন্দ্র, নারিকেল, জাভা॥

(ক)-এর বিশেষ্যগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 'মাটি' একটি **পদার্থের** নাম, 'মানুষ, **জাতি**বিশেষের নাম, 'দয়া' একটি **গুণের** নাম, 'দুঃখ' **ভাব**বিশেষের নাম, 'দর্শন' একটি **ক্রিয়ার** নাম এবং 'সভা' জন**সমষ্টির** নাম। সুতরাং (ক) **সাধারণ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**-কে এই ৬টি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(৵০) **পদার্থবাচক বা দ্রব্যবাচক** (Material Noun) (৶০) **জাতিবাচক** (Common Noun), (৷০) **গুণবাচক** (Abstract Noun), (৷৹) **ভাববাচক** বা **অবস্থাবাচক** (Abstract Noun), (৷৵০) **ক্রিয়াবাচক** (Abstract Gerund, Verbal Noun), (৷৶০) **সমষ্টিবাচক** (Collective Noun)। (খ) বিশেষ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (**Proper Noun**)-কে ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত না করাই সমীচীন মনে হয়। কারণ উহাতে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করা হইবে।

[ইংরাজীতে Noun-কে প্রথমে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—Abstract ও Concrete, পরে Concrete Noun আবার Proper, Common, Meterial ও Collective এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইংরাজী ব্যাকরণের এই ধারা অনুসরণে কোন কোন বৈয়াকরণ বাঙ্‌লার বিশেষ্যকে অরূপাত্মক ও রূপাত্মক অথবা অমূর্ত ও মূর্ত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরে নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এই পাঁচভাগের সন্ধান দিয়াছেন; কেহ বা অর্ধরূপাত্মক (যে সকল বিশেষ্য অরূপাত্মক হইলেও রূপাত্মক লক্ষণদ্বারা সূচিত হয়) নামে একটি তৃতীয় বিভাগ স্থির করিয়াছেন, যেমন—যৌবন, শৈশব, বৎসর ইত্যাদি। কেহ কেহ গুণবাচক বিশেষ্যকে আবার দুইভাগ করিয়া গুণবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্য স্থির করিয়াছেন]।

নিম্নের তালিকাটি লক্ষ্য করিলেই বিশেষ্যের প্রকারভেদ পরিস্ফুট হইবে—
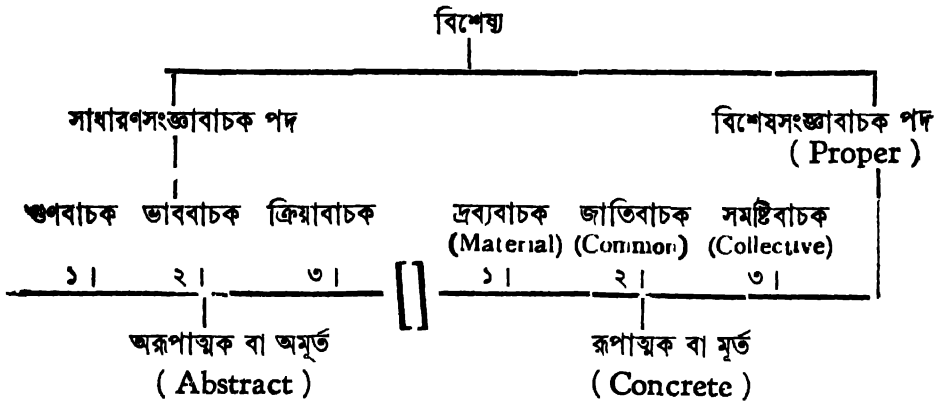
অনুশীলনী

১। বিশেষ্য কাহাকে বলে ? উদাহরণদ্বারা বুঝাইযা দাও ।

২। বিশেষ্য কত প্রকারের ও কী কী ? প্রত্যেক প্রকারের ২টি করিযা উদাহরণ দাও।

৩। অমূর্ত ও মূর্ত বিশেষ্যের প্রভেদ পরিস্ফুট কর ।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলির কোন্‌টি কোন্‌প্রকারের বিশেষ্য নির্ণয় কর :—

ফুল্লরা, বারমাস্যা, ঘর, ভেরেণ্ডা, অনল, বিষ, দহন, উপবাস, বাদল, ছাগ চিন্তা, শীত, তুলা, বৃত্রাসুর, দেবতা, অনীকিনী, পরাজয়, সুখ, গগন, খ্যাতি, সংগ্রাম, তরঙ্গ, নগর, উৎসাহ, সভা।

———

৪। সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ

সর্বনাম কাহাকে বলে এবং বাঙ্‌লায় সর্বনাম কয়টি তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইংরেজী ব্যাকরণের অনুসরণে ঐ সর্বনামগুলিকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) **পুরুষবাচক** (ব্যক্তিবাচক) [Personal]—**আমি** (মুই), **তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, অন্য, পর, অপর।**

এই সকল সর্বনামদ্বারা উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের বোধ জন্মে।

(২) **নির্ণয়সূচক** [Demonstrative]—**এ, ইনি, ইহা, ও, উনি, উহা, তাহা।**

[কেহ কেহ ইহাকে **নির্দেশক** আখ্যা দিয়াছেন ; কিন্তু ইংরাজী Definite Articles এর প্রতিশব্দই **নির্দেশক** হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার Definite Articles-কে **নির্দেশক প্রত্যয়** বলিয়াছেন। বোধ হয় বাঙ্‌লায় Definite Articles এর অর্থবোধক 'টি,' 'টা,' 'খানা,' 'খানি' প্রভৃতি শব্দের পরে যুক্ত হয় বলিয়াই উহাদিগকে প্রত্যয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যয়ের কার্য—নবশব্দগঠন ; কিন্তু 'টি', 'টা,' 'খানা,' 'খানি' প্রভৃতির যোগে নূতন শব্দ গঠিত হয় না। অতএব উহাদিগকে কেবল **নির্দেশক** বা **নিশ্চয়ক** বলাই সমীচীন মনে হয়। **তাই Demonstrative** Pronouns-কে **নির্ণয়সূচক** সর্বনাম আখ্যা দেওয়া হইল।]

এই **নির্ণয়সূচক** সর্বনামকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) **এ, ইনি, ইহা**—সমীপস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত বলিয়া **সামীপ্যবোধক** বা **অন্তিক-নির্ণয়সূচক** সর্বনাম।

(খ) **ও, উনি, উহা, তাহা**—দূরস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে প্রযুক্ত বলিয়া **দূরত্ব-বোধক** বা **দূরত্ব-নির্ণয়সূচক** সর্বনাম। [দূরস্থিত এবং পরোক্ষ এক কথা নহে ; তাই **দূরত্ববোধক**-কে **পরোক্ষবোধক** বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।]

(৩) **সাকল্যবাচক** [Inclusive]—সম্পর্কিত ব্যক্তি বা বস্তুর কাহাকেও **বাদ** দেওয়া হয় নাই—ইহা বুঝাইতে যে সকল সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে **সাকল্যবাচক** সর্বনাম বলে ; যথা—**সব (সব্), সকল, উভয়।**

(৪) **সাপেক্ষ** [Relative]—যে সকল সর্বনামের প্রয়োগ তৎসংশ্লিষ্ট বিশেষ্য বা অন্য সর্বনামের প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে তাহাদিগকে **সাপেক্ষ** সর্বনাম বলে; যথা— **যে, যিনি, যাহা।**

[অনেকে ইহাকে **সম্বন্ধ,-সংযোগ,-সম্পর্ক** বা **সঙ্গতি-বাচক (-মূলক-বোধক)** সর্বনাম বলিযাছেন। কিন্তু উহাদের কোনটাই সার্থক সংজ্ঞা বলিয়া মনে হয না। বরং একই প্রকারের সর্বনামের বিবিধ নামের আবির্ভাবে অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয। সার্থক সংজ্ঞা সন্দেহাতীতরূপে বস্তুনির্দেশ করিবে; কিন্তু **সম্বন্ধবাচক সর্বনামের** উদাহরণ দিতে গিযা কেহ **'আমার'** 'তোমার' বলিলে তাহাকে নির্বোধ বলা যায় না।]

(৫) **প্রশ্নসূচক** [Interrogative]—যে সকল সর্বনাম দ্বারা প্রশ্ন সূচিত হয় তাহাদিগকে **প্রশ্নসূচক** সর্বনাম বলে; যথা—**কে, কোন্‌, কী।**

[**'কী'**-এর প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ! কিন্তু বর্তমানে এই বানানই বিদ্বজ্জন-স্বীকৃত। **'কি'** প্রশ্নসূচক অব্যয।]

(৬) **অনির্ণায়ক** [Indefinite]—যে সকল সর্বনাম দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বলা হইতেছে তাহা সম্যক্‌ নির্ণীত হয় না তাহাদিগকে **অনির্ণায়ক** সর্বনাম বলে; যথা—**কেহ, (কেউ), কিছু।**

[কেহ কেহ ইহাদিগকে **অনিশ্চয়সূচক** সর্বনাম বলিযাছেন; কিন্তু সংজ্ঞার্থ-বিবেচনায় **অনির্ণায়ক** কথাটিই অপেক্ষাকৃত সমীচীন মনে হয।]

(৭) **আত্মবাচক (-বোধক)** [Reflexive]—উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ নহে—বুঝাইবার জন্য যে কযেকটি সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে **আত্মবাচক** সর্বনাম বলে; যথা—**স্বয়ং, নিজ, আপনি, খোদ** (বিদেশী শব্দ)।

(৮) **ব্যাতিহারিক** [Reciprocal]—একাধিক ব্যক্তি উদ্দিষ্ট হইলে তাহাদের পারস্পর্যবোধের জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয তাহাকে **ব্যাতিহারিক** সর্বনাম বলে; যথা—আপনা-আপনি, আপসে (আপোসে—বিদেশী-শব্দ)

[ব্যতিহার+ষ্ণিক=**ব্যাতিহারিক** (আদিস্বরের বৃদ্ধিহেতু), **ব্যতিহারিক** নহে।]

অনুশীলনী

১। সর্বনাম কয়ভাগে বিভক্ত? প্রত্যেক বিভাগের নাম কর এবং উদাহরণ দাও।

২। নির্দেশসূচক সর্বনাম বলিতে কী বুঝায়? উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

৩। সাপেক্ষ সর্বনাম কাহাকে বলে? ইহাকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বলা যায় কি না আলোচনা কর।

৪। অনির্ণায়ক, আত্মবাচক ও ব্যাতিহারিক সর্বনামের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উদাহরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত সর্বনামগুলির কোনটি কোন প্রকারের সর্বনাম লিখ :—
যে, তুমি, স্বয়ং, কে আপনি, সব, কিছু, তাহা আমি।

৫। (ক) লিঙ্গ

লিঙ্গ শব্দের অর্থ 'লক্ষণ' বা 'চিহ্ন'। যে 'লক্ষণ' দ্বারা শব্দের পুরুষত্ব, স্ত্রীত্ব বা **ক্লী**বত্ব সূচিত হয় তাহাই ব্যাকরণে **লিঙ্গ** নামে অভিহিত। অতএব লিঙ্গ **তিন প্রকারের—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ** ও **ক্লীবলিঙ্গ।**

প্রাণিগণের মধ্যেই **'পুরুষ'** ও **'স্ত্রী'** দৃষ্ট হয; প্রাণহীন সকলই ক্লীব। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তিনটি লিঙ্গ ধরা হইযাছে। **পুরুষার্থক** শব্দ **পুংলিঙ্গ**; যথা—পিতা, পুত্র, বালক, পতি, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি। **স্ত্রীবোধক** শব্দ **স্ত্রীলিঙ্গ**; যথা—মাতা, কন্যা, বালিকা, পত্নী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি। **প্রাণহীন,** যে সকল শব্দে **স্ত্রী-পুরুষের বোধ জন্মে না** তাহারা **ক্লীবলিঙ্গ**; যথা—পুস্তক, জল, পুষ্প, ফল ইত্যাদি।

এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে গুলিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ শব্দকে **উভয়লিঙ্গ** বলা হয়; যথা—মানুষ, গোরু, কবি, সন্তান, বন্ধু, লোক, দেবতা, ইত্যাদি।

এইরূপ অর্থগত লিঙ্গ বিচার ইংরাজী ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতে প্রধানতঃ ব্যুৎপত্তিদ্বারা শব্দের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়া থাকে; যেমন—**ঘঞ্**-ও **'অল্'**-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অর্থ-যাহাই হউক না কেন তাহারা পুংলিঙ্গ হইবে; **ক্তি**-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ এবং ভাববাচ্যে **অনট্** প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমূহ ক্লীবলিঙ্গ। বাঙ্‌লায় লিঙ্গ বিচার অংশতঃ সংস্কৃত মতে এবং অংশতঃ ইংরাজী ব্যাকরণের অনুসরণে হইযা থাকে। বাঙ্‌লায় তৎসম শব্দ সমূহের লিঙ্গবিচারে প্রধানতঃ সংস্কৃতের রীতিই অনুসৃত হয়। তাই **সূর্য, চন্দ্র গ্রহ, পর্বত, সাগর, বৃক্ষ** প্রভৃতি প্রাণহীন হইলেও **পুংলিঙ্গ**। আবার **ছায়া, তারা** বা **তারকা, পৃথিবী, নদী, লতা** প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ।

ইংরাজী ব্যাকরণে **ক্লীবলিঙ্গ** অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যক্তিত্ব আরোপিত হইলে তাহা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হইযা থাকে। [Sun পুংলিঙ্গ, কিন্তু Moon স্ত্রীলিঙ্গ]। সংস্কৃতে এবং বাঙ্‌লাতেও অনুরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছে। তবে সাধারণতঃ প্রাণহীন বস্তুবাচক শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ এবং উহাদের পরিবর্তে যাহা, তাহা, ইহা, উহা, প্রভৃতি

সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। [হিন্দীতে ক্লীবলিঙ্গ নাই ; কিন্তু ক্রিয়ার লিঙ্গ থাকাতে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গভেদে সর্বনামের কোনও রূপান্তর হয় না। কেবল অপ্রাণীবাচক ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের পরিবর্তে **যাহা, তাহা, ইহা, উহা**—প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

মাধুর্য বা সৌকুমার্যের জন্য প্রমোদগৃহ, সভাসমিতি, গ্রন্থাদির নাম স্ত্রীলিঙ্গে রচিত হয় ; যথা—গীতবীথিকা, সুরাপাননিবারিণী (সভা), অবকাশরঞ্জিনী, ইত্যাদি।

সংস্কৃতে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের লিঙ্গ গ্রহণ করে এবং তদনুসারে বিশেষণের রূপান্তর ঘটে [যথা—**সুন্দরঃ** বৃক্ষঃ, **সুন্দরী** লতা, **সুন্দরং** ফলম্]। বাঙ্‌লায় বিশেষণের এইরূপ পরিবর্তনের রীতি নাই বলিলেই চলে ; যথা—**সুন্দর** বৃক্ষ, **সুন্দর** লতা, **সুন্দর** ফল। কিন্তু তৎসমশব্দবহুল সাধু বাঙ্‌লায় কথনও কখনও সংস্কৃতের রীতি অনুসৃত হয় ; যথা—

(৵০) "...**পাবক-শিখা-রূপিণী** জানকী....", "**মধুকরী** কল্পনা....",—মধুসূদন।

(৶০) **সসাগরা** বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়"
"মঙ্গল-বারতা নিত্য **তড়িৎ-গমনা**"—হেমচন্দ্র।

(৷০) "ধন্য আশা **কুহকিনি !** ....—নবীনচন্দ্র।

(।০) "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি **উন্মাদিনী** কাল বৈশাখীর....",
"**মহান্**মৃত্যুর সাথে........",
"**বিপুলা** এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(।৵০) "....মহাত্মাদের **মহীয়সী** কীর্তি",—বঙ্কিমচন্দ্র।

(।৶০) "ঠাকুরদাস মুখুয্যের **বর্ষীয়সী** স্ত্রী ...."—শরৎচন্দ্র।

তবে অধিকাংশ স্থলেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় ; যেমন—

(৵০) "ভূতলে **অতুল** সভা...."
"কাকলী-লহরী, মরি ! **মনোহর**"—মধুসূদন।

(৶০) "**বিদ্যুৎ-মিশ্রিত** শিলা...",
"**বেষ্টিত** অমরাবতী...."—হেমচন্দ্র।

(৷০) "শারদীয় শুক্লাষ্টমী !"—নবীনচন্দ্র।

(।০) "....**বহু-যোজন বিস্তৃত** পীতাম্বরী শাটী।"—বঙ্কিমচন্দ্র

(।/০) "....**শোকার্ত** কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।"—শরৎচন্দ্র।

(।৵০) "....যে **অজ্ঞাত** তারা,"

"আমার কবিতা....হয় নাই সে **সর্বত্রগামী**।"

"অবজ্ঞার তাপে **শুষ্ক নিরানন্দ** সেই মরুভূমি"—রবীন্দ্রনাথ।

মোট কথা, বাঙ্‌লায় বিশেষণের লিঙ্গ ব্যাপারে বক্তা ও লেখকের যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে। তাই—"**লক্ষ্মী** ছেলে, **লক্ষ্মী** মেয়ে, **লক্ষ্মী** ভাইটি আমার, **ভাই** আরতি, **ভাই** বেলা" প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ শুনিতে ও দেখিতে পাই।

আবার, অ-তৎসম বিশেষ্যের তৎসম বিশেষণে সংস্কৃতের লিঙ্গরীতির প্রয়োগও দৃষ্ট যথা—**বিদুষী** মেয়ে, **করুণাময়ী** মা, **সুন্দরী** বউ, (**সুন্দর** বউ-ও চলে), ইত্যাদি। বাঙ্‌লা সাহিত্যের বহুস্থানে সমস্ত পদের লিঙ্গ না ধরিয়া (বিশেষ্য) পূর্বপদের লিঙ্গানুসারে বিশেষণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা—"**নৈশগঙ্গাবিহারিণী তরণী**মধ্যে", "**স্বচ্ছসলিলা বাপী**তীর"—বঙ্কিমচন্দ্র। **ক্ষীণতর** জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—রবীন্দ্রনাথ। "সৎ" 'ভাল' অর্থে ও "মহৎ" এই বিশেষণ পদ দুইটির তিন লিঙ্গের রূপই বাঙ্‌লায় দেখা যায়; যথা—**সন্মার্গ, সতী** নারী, **সৎ** কার্য; **মহান্‌** আত্মত্যাগ, **মহতী** কীর্তি, **মহৎ** কার্য।

কার্যকরী ঔষধ, **লাভকরী** ব্যবসায়, **মোহিনী** প্রভাব—এইরূপ প্রয়োগ কোন ক্রমেই মানিয়া লওয়া যায় না।

শ্রুতি লালিত্যই বাঙ্‌লা বিশেষণ পদকে লিঙ্গান্তরিত করিবার ভিত্তি। সর্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলিলে বাঙ্‌লা বাঙ্‌লা হইত না। 'ইহাই **মূল** কথা' না বলিয়া 'ইহাই **মূলা** কথা' বলিলে কথা থাকিত না, 'মূলা'র অম্বলই সম্বল হইত। "**অমূল্যা** সম্পদ্‌", "**স্থায়িনী জাতীয়া** উন্নতি" লিখিলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও অ-সাহিত্যে পরিণত হইত।

(খ) স্ত্রী-প্রত্যয়

যাহা পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর যুক্ত হইলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠিত হয়, তাহাকে স্ত্রী-প্রত্যয় বলে; যথা—আ, ঈ, আনী, ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গ শব্দ		স্ত্রী-প্রত্যয়		স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ
অশ্ব	+	আ	=	অশ্বা।
দেব	+	ঈ	=	দেবী।
ঠাকুর	+	আনী	=	ঠাকুরাণী।

দুইটি বিভিন্ন অর্থে পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠিত হয়—

(১) তাহার পত্নী এই অর্থে; যেমন—(পুং) **আচার্য**—আচার্যাণী (আচার্য পত্নী)।

(২) তজ্জাতীয় স্ত্রীলোক'—এই অর্থে; যেমন—(পুং) আচার্য—আচার্যা (স্ত্রী-আচার্য)।

তৎসম শব্দ সমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃতের নিয়ম মানিযা চলে বলিয়া তাহাদের ক্ষেত্রে প্রাযশঃ সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হইযা থাকে। বাঙ্‌লায অ-তৎসম শব্দের অভাব নাই। তাহাদের স্থলে বাঙ্‌লায নিজস্ব প্রত্যয রহিয়াছে। অতএব **স্ত্রী-প্রত্যয়কে** আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) বাঙ্‌লা **স্ত্রী-প্রত্যয়** ও (২) সংস্কৃত স্ত্রী-**প্রত্যয়**।

(১) বাঙ্‌লা স্ত্রী-প্রত্যয়

আ, (তজ্জাতীয়া-অর্থে), আই (পত্নী-অর্থে)

পুং	+ প্রত্যয়	=স্ত্রী	পুং	+ প্রত্যয়	=স্ত্রী
পর্দানশীন	আ	পর্দানশীনা	সাহেব	আ	সাহেবা
মরদ	,,	[মর্দা-মদ্দা—]মাদা	জ্যেঠা	আই	জ্যেঠাই

ঈ

তজ্জাতীয়া-অর্থে

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
[অভাগ্য-] অভাগা	অভাগী	বান্দা	[বান্দী-] বাঁদী
[আদরিয়া-] আদুরে	আদুরী	বুড়া [বুড়ো]	বুড়ী

পুং	স্ত্রী
[আহ্লাদিয়া-] আহ্লাদে	আহ্লাদী
কুত্তা	কুত্তী
খোকা	খুকী [খুকু-আদরে]
ঘোড়া	[ঘোড়ী-] ঘুড়ী
ছোঁড়া	ছুঁড়ী
নেড়া	নেড়ী
পাগল, পাগলা	পাগলী
[পোড়াকপালীযা -] পোড়াকপালে	পোড়াকপালী
বাড়িওয়ালা	বাড়িওয়ালী [বাড়িউলী]
বাঁদর	বাঁদরী, [বাঁদ্‌রী]
বেটা	বেটী
বোষ্টম	বোষ্টমী [বোষ্টুমী]
[বিহঙ্গম-] ব্যাঙ্গমা	ব্যাঙ্গমী
ভাগিনা [ভাগ্‌নে]	ভাগিনী [ভাগ্‌নী]
ভেড়া	ভেড়ী
মরদ	[মর্দী-মদ্দী-] মাদী
মুসলমান	মুসলমানী
মোরগ	মুরগী
শাহ্‌জাদা	শাহ্‌জাদী
শালা	শালী
[হিংসুটিয়া-] হিংসুটে	হিংসুটী

তৎপত্নী-অর্থে

পুং	স্ত্রী
কাকা	কাকী
খুড়া [খুড়ো]	খুড়ী
চাচা	চাচী
জ্যেঠা	জ্যেঠী
দাদা	দাদী [দিদিমা]
নানা	নানী
বামুন	বামনী
মামা	মামী

নী

তৎপত্নী-অর্থে বা তজ্জাতীয়া-অর্থে

পুং	স্ত্রী
উড়ে	উড়েনী
কামার	কামারনী
কুমার	কুমারনী
চামার	চামারনী
জমিদার	জমিদারনী
সর্দার	সর্দারণী
জেলে	জেলেনী
ডোম	ডোমনী [ডুমনী]
নাতি	[নাতিনী] নাত্‌নী
বাগ্‌দি	বাগ্‌দিনী
বেদে	বেদেনী
বেহাই [বেযাই]	[বেহাইনী- বেহাইন্‌-] বেয়ান্‌

আনী

তৎপত্নী বা তজ্জাতীয়া-অর্থে

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
খোট্টা	খোট্টানী	ধোপা	ধোপানী
গয়লা	গয়লানী	নাপিত	নাপিতানী
চাকর	চাকরানী		[নাপতানী]
চৌধুরী	চৌধুরানী	মেথর	মেথরানী
ঠাকুর	ঠাকুরানী	রাজপুত	রাজপুতানী

ইনী

তৎপত্নী বা তজ্জাতীয়া অর্থে

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
কাঙাল	কাঙালিনী	পাগল	পাগলিনী
[কাঙালী—উভয়লিঙ্গ]		প্রেত	প্রেতিনী [পেতিনী —পেত্নী]
গোয়ালা	গোয়ালিনী		
[গোপাল—গোয়াল]		বাঘ	বাঘিনী
নাগ	নাগিনী	ভিখারী [রি]	ভিখারিনী
		সাপ	সাপিনী

(২) সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়

[টাপ্] আ

(ক) কয়েকটি অ-কারান্ত জাতিবাচক শব্দে :

অজ—অজা, অশ্ব—অশ্বা, কোকিল—কোকিলা, ক্রৌঞ্চ—ক্রৌঞ্চা, বৎস—বৎসা, মক্ষিক—মক্ষিকা, মূষিক—মূষিকা।

(খ) কতকগুলি অ-কারান্ত বিশেষণ শব্দে ; তর, তম, ইষ্ঠ,—ইত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত এবং ক্ত, শানচ, কৃত্য—কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দে :

আধুনিক—আধুনিকা আদ্য—আদ্যা, আর্য—আর্যা, কুটিল—কুটিলা, কৃশ—কৃশা,

ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রা, চঞ্চল—চঞ্চলা, তৃতীয়—তৃতীয়া, দক্ষ—দক্ষা, দীন—দীনা, দীর্ঘ—দীর্ঘা, দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া, ধন্য—ধন্যা, নবীন—নবীনা, নিপুণ—নিপুণা, পঙ্কিল—পঙ্কিলা, প্রথম—প্রথমা, প্রবীণ—প্রবীণা, বৎসল - বৎসলা, বন্য—বন্যা, বয়স্ক—বয়স্কা, বৈবাহিক—বৈবাহিকা, মনোহর—মনোহরা,—মূর্খ—মূর্খা, শারদীয়—শারদীয়া, সভ্য—সভ্যা, সরল—সরলা, স্থূল—স্থূলা, ইত্যাদি

অন্যতর—অন্যতরা, ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতরা, গুরুতর—গুরুতরা ; প্রিয়তম—প্রিয়তমা, বৃহত্তম—বৃহত্তমা ; গরিষ্ঠ—গরিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠা ; উৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠিতা, কলঙ্কিত—কলঙ্কিতা, কুসুমিত - কুসুমিতা, চমকিত—চমকিতা, পণ্ডিত—পণ্ডিতা [তজ্জাতীয়া অর্থে], শব্দিত—শব্দিতা, ইত্যাদি।

অভ্যর্থিত—অভ্যর্থিতা, অজ্ঞাত—অজ্ঞাতা, গৃহীত—গৃহীতা, ধৃত—ধৃতা, নন্দিত—নন্দিতা, নিন্দিত—নিন্দিতা, নিবেদিত—নিবেদিতা, প্রীত—প্রীতা, বন্দিত—বন্দিতা, বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, মৃত—মৃতা, হীন—হীনা, হৃত—হৃতা ; উদীয়মান—উদীয়মানা, মুহ্যমান—মুহ্যমানা, ম্রিয়মান—ম্রিয়মানা, রোরুদ্যমান—রোরুদ্যমানা, শয়ান—শয়ানা ; আরাধ্য—আরাধ্যা, উপাস্য—উপাস্যা, পূজনীয়—পূজনীয়া, প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতস্মরণীয়া, মাননীয় - মাননীয়া, শিষ্য—শিষ্যা, ইত্যাদি

(গ) বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ **অ**-কারান্ত বিশেষণ পদে :

অনাথ—অনাথা, অন্যমনস্ক—অন্যমনস্কা, অল্পবয়স্ক—অল্পবয়স্কা, চারুনেত্র—চারুনেত্রা, ত্রিনয়ন—ত্রিনয়না, দ্বিভুজ—দ্বিভুজা, নীলবসন—নীলবসনা, প্রিয়ংবদ—প্রিয়ংবদা, শস্যশ্যামল—শস্যশ্যামলা, সুজল—সুজলা, সুফল—সুফলা, ইত্যাদি।

(ঘ) পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে **অক** আছে (ষক-প্রত্যয়জাত না হইলে) তাহা **আ**-যোগে **ইকা** হইয়া যায় :

অধ্যাপক—অধ্যাপিকা, অনামক—অনামিকা, অপুত্রক—অপুত্রিকা, অভিভাবক—অভিভাবিকা, উপকারক—উপকারিকা, উপযাচক—উপযাচিকা, গায়ক—গায়িকা, গ্রাহক—গ্রাহিকা, নায়ক—নায়িকা, পাচক—পাচিকা, পাঠক—পাঠিকা, পালক—পালিকা, বালক—বালিকা, লেখক—লেখিকা, শিক্ষক—শিক্ষিকা, শ্যালক—শ্যালিকা, সম্পাদক—সম্পাদিকা, সহায়ক—সহায়িকা, ইত্যাদি।

[ক্ষুদ্রার্থে **আ** হইলেও ঐরূপ-**অক**-স্থানে-**ইকা** হয় ; যথা—কণক [কণা+ক]—কণিকা, ঘণ্টক [ঘণ্টা+ক]—ঘণ্টিকা, চয়নক—চয়নিকা, নাটক—নাটিকা, পুস্তক—পুস্তিকা, মালক [মালা+ক স্বার্থে]—মালিকা ।

[ঙীপ্‌] ঈ

(ক) অধিকাংশ **অ**-কারান্ত জাতিবাচক শব্দে :

কাক-কাকী, গোপ—গোপী, ঘোটক—ঘোটকী, চণ্ডাল—চণ্ডালী, দেব—দেবী, নিষাদ—নিষাদী, পিশাচ—পিশাচী, ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী, মানব—মানবী, সারস—সারসী, হংস—হংসী ; অনুরূপ—কপোতী, কুক্কুরী, নারী, বিড়ালী, ব্রাহ্মণী, ভুজঙ্গী, ময়ূরী, মৃগী, রাক্ষসী, শার্দ্দূলী, সিংহী, হরিণী, ইত্যাদি ।

(খ) **গৌর** প্রভৃতি শব্দে এবং কতকগুলি **অ**-কারান্ত বিশেষণ শব্দে :

গৌর—গৌরী, নদ—নদী, কাল—কালী, নট—নটী, পুত্র—পুত্রী ; কিশোর—কিশোরী, তরুণ—তরুণী, মহৎ—মহতী ; অনুরূপ—ঈশ্বরী, কুমারী, দূতী, পাত্রী, সুন্দরী, ইত্যাদি ।

(গ) **গুণবাচক উ**-কারান্ত শব্দে বিকল্পে :

গুরু—গুর্বী বা গুরু, তনু—তন্বী বা তনু, লঘু—লঘ্বী বা লঘু, বহু—বহ্বী বা বহু, সাধু—সাধ্বী বা সাধু ইত্যাদি ।

(ঘ) [তৃচ্‌-তৃন্‌-প্রত্যয়ান্ত] **ঋ-কারান্ত শব্দে** :

[কর্তৃ] কর্তা—কর্ত্রী, [দাতৃ] দাতা—দাত্রী, [ধাতৃ] ধাতা—ধাত্রী, [নেতৃ] নেতা—নেত্রী, [শিক্ষয়িতৃ] শিক্ষয়িতা—শিক্ষয়িত্রী ; অনুরূপ—অভিনেত্রী, জনয়িত্রী, প্রসবিত্রী, যোদ্ধ্রী, রচয়িত্রী, সাবিত্রী, ইত্যাদি ।

(ঙ) **দ্বিগুসমাসদ্ধ** ও কতকগুলি **বহুব্রীহিসমাসবদ্ধ** পদে :

ত্রিলোকী, পঞ্চবটী, শতাব্দী ; ত্রিপদ—ত্রিপদী, মৃগাক্ষ—মৃগাক্ষী, শতমূল—শতমূলী, সুদন—সুদতী [কিন্তু সুদন্ত—সুদন্তা] ; হেমাঙ্গ—হেমাঙ্গী, ইত্যাদি ।

(চ) **চতুর্থ** হইতে আরম্ভ করিয়া **পূরণবাচক** বিশেষণে :

চতুর্থ—চতুর্থী, ষষ্ঠ—ষষ্ঠী, নবম—নবমী, একাদশ—একাদশী, ষোড়শ—ষোড়শী [ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীও বুঝায়] বিংশতম—বিংশতমী ; অনুরূপ—পঞ্চমী, সপ্তমী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, শততমী, সহস্রতমী, ইত্যাদি।

(ছ) **ষ্ণ, ষ্ণায়ন, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, ইন্, বিন্, ঈয়স্, মতুপ্, ময়ট্, ডামহচ্ প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দে :**

দৌহিত্র [দুহিতৃ+ষ্ণ]—দৌহিত্রী, পৌত্র—পৌত্রী, পাঞ্চাল—পাঞ্চালী, বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী ; দাক্ষায়ণ [দক্ষ+ষ্ণায়ন]—দাক্ষায়ণী, নারায়ণ—নারায়ণী, বার্ষিক [বর্ষ+ষ্ণিক]—বার্ষিকী, সাপ্তাহিক—সাপ্তাহিকী ; আত্রেয় [অত্রি+ষ্ণেয়]—আত্রেয়ী, ভাগিনেয়—ভাগিনেয়ী ; [কাম+ইন্] কামিন্ [কামী]—কামিনী, দুঃখিন্ [দুঃখী] দুঃখিনী, রোগিন্ [রোগী]—রোগিনী, সন্ন্যাসিন্ [সন্ন্যাসী]—সন্ন্যাসিনী ; [ওজস্+বিন্] ওজস্বিন্ [ওজস্বী]—ওজস্বিনী, তেজস্বিন্ [তেজস্বী]—তেজস্বিনী, মেধাবিন্ [মেধাবী]—মেধাবিনী ; [গুরু+ঈয়স্] গরীয়স্ [গরীয়ান্]—গরীয়সী, [প্রশস্য+ঈয়স্] শ্রেয়স্ [শ্রেয়ান্, শ্রেয়ঃ]—শ্রেয়সী ; মৃন্ময় [মৃৎ+ময়ট্]—মৃন্ময়ী, হিরণ্ময়—হিরন্ময়ী ; [গুণ+মতুপ্] গুণবৎ [গুণবান্]—গুণবতী, স্রোতস্বৎ [স্রোতস্বান্]—স্রোতস্বতী, ভগবৎ [ভগবান্]—ভগবতী ; পিতামহ [পিতৃ+ডামহচ্]—পিতামহী ; অনুরূপ—কৈকেয়ী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, ষাণ্মাসিকী, মৈত্রেয়ী, তরঙ্গিনী, যামিনী, পাপীয়সী, প্রেয়সী, বলীয়সী, ভূয়সী, চিন্ময়ী, প্রেমময়ী, স্বর্ণময়ী, আয়ুষ্মতী, পুত্রবতী, বুদ্ধিমতী, ভক্তিমতী, শ্রীমতী, মাতামহী, ইত্যাদি।

(জ) **ষক, অকারাবশেষ, ণিনি, ঘিনুণ্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দে :**

[গণ্+ষক] গণক—গণকী, নর্তক—নর্তকী, রজক—রজকী ; অর্থকর—অর্থকরী, কিঙ্কর—কিঙ্করী, ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্করী, শঙ্কর—শঙ্করী ; খেচর—খেচরী, সহচর—সহচরী ; বিদ্যাধর—বিদ্যাধরী, বংশধর—বংশধরী ; ঈদৃশ—ঈদৃশী, তাদৃশ—তাদৃশী, সদৃশ—সদৃশী ; [অধি-বস্+ণিনি=অধিবাসিন্] অধিবাসী—অধিবাসিনী, অনুগামী—অনুগামিনী, মিথ্যাবাদী—মিথ্যাবাদিনী ; [অনু-রঞ্জ+ঘিনুণ্=অনুরাগিন্] অনুরাগী—অনুরাগিণী, কুলত্যাগী—কুলত্যাগিনী, যোগী—যোগিনী ; অনুরূপ—খনকী, কার্যকরী, শুভঙ্করী,

হিতকরী, অনুচরী, নিশাচরী, ধুরন্ধরী, এতাদৃশী, মাদৃশী, যাদৃশী, বিলাসিনী, সত্যবাদিনী, ভোগিনী, সর্বত্যাগিনী ইত্যাদি।

(ঝ) কতকগুলি অ-কারান্ত এবং অঙ্গবাচক উত্তরপদযুক্ত বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন পুংলিঙ্গ শব্দে আ, ঈ উভয়ই হইতে পারে :

কল্যাণ—কল্যাণা, কল্যাণী, কৃপণ—কৃপণা, কৃপণী, চণ্ড—চণ্ডা [উগ্রা], চণ্ডী [দেবী], বিশাল—বিশালা, বিশালী ; কৃশোদর—কৃশোদরা, কৃশোদরী, কুন্দদন্ত—কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী, চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী, সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী ; অনুরূপ—কমলা, কমলী ; বিকটা, বিকটী ; ভাবুকা, ভাবুকী ; সাধারণা, সাধারণী ; তাম্রনখা, তাম্রনখী ; বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা ; সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী, ইত্যাদি।

আনী [প্‌]

(ক) তৎপত্নী অর্থে

আচার্য—আচার্যাণী, ইন্দ্র—ইন্দ্রানী, বরুণ—বরুণানী, ভব—ভবানী ; অনুরূপ—ব্রাহ্মণী, মাতুলানী, রুদ্রাণী, ইত্যাদি।

(খ) বৃহত্ত্ব, প্রাচুর্য, দুষ্টতা, লিপি অর্থে

অরণ্য—অরণ্যাণী [বৃহৎ অরণ্য], হিম—হিমাণী [প্রচুর হিম], যব—যবানী [দুষ্টযব], যবন—যবনানী [যবন-লিপি]।

(গ) লিঙ্গ পরিবর্তন

তিনটি উপায়ে পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-বোধক রূপ পাওয়া যাইতে পারে—

(১) তজ্জাতীয় স্ত্রী-বোধক পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ; যথা—পিতা—মাতা, সাহেব—বিবি, মেম, ইত্যাদি।

(২) উভয়লিঙ্গ শব্দের [প্রধানতঃ] পূর্বে বা [ক্বচিৎ] পরে পুরুষবাচক শব্দ যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশিত হয় ; যথা—বেটা-ছেলে মেয়ে-ছেলে, এঁড়ে-বাছুর, বক্‌না-বাছুর, ইত্যাদি।

(৩) পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত উপযুক্ত স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে।

(১) পৃথক্ শব্দের প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ

তৎসম শব্দ

পুং	স্ত্রী [পত্নী-অর্থে]	স্ত্রী [তজ্জতীয়া-অর্থে]
জনক	জননী	—
জামাতা	কন্যা, দুহিতা	স্নুষা
পতি	পত্নী, জায়া	কন্যা, দুহিতা
পুত্র	স্নুষা, বধূ	—
পুরুষ	—	প্রকৃতি, স্ত্রী, নারী [ক'নে—চলিত বাঙ্‌লা]
বর	বধূ, কন্যা	
বৃষ	—	গবী [গাভী—বাঙ্‌লায় প্রচলিত]
ভর্তা	ভার্যা	—
ভূত	—	প্রেতিনী
ভ্রাতা	—	ভগিনী [ভগ্নী-বাংলায় চলে]
[যুবন্] যুবা [যুবক]	—	যুবতী, যুবতি [সংস্কৃতে যূনীও হয়]
শ্বশুর	শ্বশ্রূ	—
ষণ্ড	—	গবী [গাভী—বাঙ্‌লায় প্রচলিত]
স্বামী	স্ত্রী	—

অ-তৎসম শব্দ

কর্তা	গিন্নী [গিন্নি-ভুল]	—
খানসামা, খিদ্‌মতগার	—	আয়া
গোলাম, নফর, বান্দা	—	বাঁদী
ছেলে	বউ [-মা]	মেয়ে
জনাব	—	খাতুন, খানুম
জামাই	মেয়ে, ঝী	—
ঠাকুরদাদা [ঠাকুর্দা]	ঠাকুরমা, ঠানদিদি	—

পুং	স্ত্রী [পত্নী-অর্থে]	স্ত্রী [তজ্জাতীয়া-অর্থে]
তালুই, তাউই	মাউই	—
দাদা	দাদী, বৌদি [দি]	দিদি
দাদামশাই, দাদু	দিদিমা	—
নবাব	বেগম	বেগম
পাতিশাহ্‌, পাতশাহ্‌, বাদশাহ্‌ ,,		,,
পো	—	ঝী
বাপ, বাবা	মা	—
বেটা	বউ [- মা]	ঝী
বেয়াই	বেয়ান	বেয়ান
ভাই	ভাজ	বোন
[ছোট] ভাই	[ভ্রাতৃবধূ—ভাদ্রবধূ] ভাদরবউ	—
ভাসুর, [দেবর -] দেওর	জা	—
ভূত	—	পেত্নী
মিন্‌সা [- সে]	—	মাগী [অশিষ্ট]
রাজা	রানী [ণী]	রাণী [-নী]
[লর্ড -] লাট	লেডী	লেডী
শালা	শালাজ [- শেলেজ]	শালী
শ্বশুর	শাশুড়ী	—
ষাঁড়, বলদ	—	গাভী, গাই
সাহেব	বিবি, মেম [-সাহেব]	বিবি, মেম [- সাহেব]

(২) <u>উভয়লিঙ্গ শব্দে পুংবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গনির্ণয়</u>

উভয়লিঙ্গশব্দ	পুং	স্ত্রী [তজ্জাতীয়া-অর্থে]
উট	মদ্দা-উট	মাদী-উট
কবি	পুরুষ-কবি	স্ত্রী-কবি, মহিলা কবি, মেয়ে কবি,

উভয়লিঙ্গ শব্দ	পুং	স্ত্রী [তজ্জাতীয়া-অর্থে]
কুকুর	মদ্দা-কুকুর	মাদী-কুকুর, নেড়ী কুকুর
কেরানি	পুরুষ-কেরানি	মেয়ে-কেরানি
[গো-রূপ—] গোরু, গরু	এঁড়ে-,ষাঁড-,বলদ-গোরু [গরু]	গাই-গোরু [গরু]
গোঁসাই	গোঁসাই [-বাবা]	মা-গোঁসাই
চিল	মদ্দা-চিল, পুরুষ-চিল	মাদী-চিল, মেয়ে-চিল
ছেলে .	বেটা-ছেলে	মেয়ে-ছেলে
পাখী	নর-পাখী	মাদা-পাখী [মাদী পাখী —ভুল]
পুলিস	পুলিস	মেয়ে-পুলিস
প্রতিনিধি	পুরুষ-প্রতিনিধি	মহিলা-প্রতিনিধি
বন্ধু	পুরুষ-বন্ধু	মেয়ে-বন্ধু
বাছুর	এঁড়ে-বাছুর	নই. বক্‌না-বাছুর
বাঁদর	বীর-বাঁদর [বীরহনু]	মেনি-বাঁদর
বিড়াল [বেড়াল]	হুলো-বিড়াল [-বেড়াল]	মেনি-বিড়াল [-বেড়াল]
মানুষ	পুরুষ-মানুষ	মেয়ে-মানুষ
মোষ	এঁড়ে-মোষ	গাই-মোষ
যাত্রী	পুরুষ-যাত্রী	মেয়ে-যাত্রী
লোক	পুরুষ-লোক	স্ত্রীলোক, মেয়ে-লোক
সন্তান	পুত্র-সন্তান	কন্যা-সন্তান
সৈন্য	পুরুষ-সৈন্য	নারী-সৈন্য, স্ত্রী-সৈন্য
হাতী	মদ্দা-হাতী	মাদী-হাতী

মানব-সম্বন্ধী উভয়লিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে প্রায়শঃ স্বাভাবিকরূপেই ব্যবহৃত হয়, স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বে যুক্ত থাকে ; যেমন—'পুরুষ-কবি' বুঝাইতে শুধু কবি, 'পুরুষ কেরানি' বুঝাইতে শুধু কেরানি ব্যবহার করি। আবার অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র বাক্যের অর্থ ধরিয়া প্রযুক্ত উভয়লিঙ্গ শব্দটির লিঙ্গ স্থির করিতে হয় ; যথা—

গোরুতে ঘাস খায়—'গোরু' উভয়লিঙ্গ

গোরুতে লাঙ্গল টানে—'গোরু' পুংলিঙ্গ [=এঁড়ে-গোরু]।
এই গোরুর দুধ পাতলা—'গোরু' স্ত্রীলিঙ্গ [=গাই-গোরু]।

(৩) পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত উপযুক্ত স্ত্রী প্রত্যয় প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ

বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় প্রসঙ্গে ইহার বহু উদাহরণ দর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের কথাই উল্লেখিত হইতেছে।

কয়েকটি পুংলিঙ্গ শব্দে বিভিন্ন স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে কখনও সমার্থক কখনও বা ভিন্নার্থক একাধিক স্ত্রী-রূপ গঠিত হইয়াছে ; যথা—

পুং +	স্ত্রী প্রত্যয় =	স্ত্রী	অর্থ
আচার্য	আ	আচার্যা	আচার্যবৃত্তিধারিণী নারী
	আনী	আচার্যানী	আচার্য-পত্নী
উপাধ্যায়	আ	উপাধ্যায়া	উপাধ্যায়-বৃত্তিধারিণী নারী
	আনী	উপাধ্যায়ানী	উপাধ্যায়-পত্নী
	ঈ	উপাধ্যায়ী	উপাধ্যায়া বা উপাধ্যায়ানী
ক্ষত্রিয়	আ	ক্ষত্রিয়া	ক্ষত্রিয়-জাতীয় স্ত্রীলোক
	আনী	ক্ষত্রিয়াণী	ঐ
	ঈ	ক্ষত্রিয়ী	ক্ষত্রিয়-পত্নী
ছাত্র	আ	ছাত্রা	শিক্ষার্থিনী
	ঈ	ছাত্রী	ছাত্র-পত্নী [বাঙ্‌লায় 'শিক্ষার্থিনী' অর্থেই প্রচলিত]
বৈশ্য	আ	বৈশ্যা	বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী
	আনী	বৈশ্যানী	বৈশ্য-পত্নী
শূদ্র	আ	শূদ্রা	শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী
	ঈ	শূদ্রী	শূদ্র-পত্নী
	আনী	শূদ্রাণী	ঐ [এই রূপটি সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত নহে ; কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহার বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে।]

পুং +	স্ত্রী প্রত্যয় =	স্ত্রী	অর্থ
যবন	আ	যবনা	যবনজাতীয়া স্ত্রী
	ঈ	যবনী	যবন-পত্নী
	আনী	যবনানী	যবনগণের লিপি
সূর্য	আ	সূর্যা	সূর্যের দেবীপত্নী
[সুর]	ঈ	সূরী	„ মানবী পত্নী [কুন্তী]
স্থল	আ	স্থলা	কৃত্রিম ভূমি
	ঈ	স্থলী	অকৃত্রিম ভূমি
কাল	আ	কালা	নীলের গাছ
	ঈ	কালী	কৃষ্ণবর্ণা, দেবী
নীল	আ	নীলা	নীলকান্ত মণি, নীলবর্ণের পোকা
	ঈ	নীলী	নীলের গাছ
কবর [বিবিধ, বিচিত্র	আ	কবরা	বিবিধা, নানা প্রকারের
বাঙ্‌লায় সমাধি]		কবরী	বেণী, খোপা

লিঙ্গ (সম্বন্ধে কয়েকটি কথা)

(ক) সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উদ্ভব হইলেও কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারে গঠিত [অর্থাৎ আগে স্ত্রীবাচক শব্দ পরে বিবাহ সম্পর্কে পুংবাচক শব্দের আবির্ভাব] যেমন—

স্ত্রী	পুং
ঝী, মেয়ে	জামাই
ঠাকুরঝী	ঠাকুরজামাই
দিদিমণি	দাদাবাবু

[ছাত্রীরা শিক্ষিকাগণকে অনেক সময় 'দিদিমণি' বলিয়া থাকে।]

স্ত্রী	পুং
ননদ	নন্দাই
নাত্‌নী	নাত্জামাই
[পিতৃষ্বসা—পিউসী] পিসী [-মা]	[পিউসা—পিসা] পিসে [-মশাই]
[পিসীশাশুড়ী] পিসেশ	পিসশ্বশুর
বোন	বোনাই
[ভগিনী-] ভগ্নী	ভগ্নীপতি
ভাগ্নী	ভাগ্নিজামাই
[মাতৃষ্বসা—মাউসী] মাসী [-মা]	[মাস্বয়া—মাউসা] মেসো [-মশাই]
[মাসীশাশুড়ী-] মাসাশ	মাসশ্বশুর
শালী	ভায়রাভাই
শ্যালী	শ্যালীপতি

(খ) কতকগুলি সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দের সংস্কৃত স্ত্রীরূপ ও বাঙ্‌লা স্ত্রীরূপ স্বতন্ত্র; অবশ্য কখনও কখনও উভয়রূপই বাঙ্‌লায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল—

পুং	সং স্ত্রী	বাং স্ত্রী
কর্তা	কর্ত্রী	গিন্নী
গৃধ্র	*গৃধ্রী	গৃধিনী
ঘটক	*ঘটিকা	ঘটকী
জনক	*জনিকা	জননী
ত্রিনয়ন	ত্রিনয়না	ত্রিনয়নী
দিগম্বর	দিগম্বরা	দিগম্বরী
ধবল	*ধবলা	ধবলী
নট	নটী	নটিনী
		["সুপ্ত নটিনীর মতো....." —রবীন্দ্রনাথ]
নাপিত	*নাপিতী	নাপিতানী
প্রেত	*প্রেতা	প্রেতিনী
যুবক	*যুবিকা	যুবতী
রাজা	রাজ্ঞী	রানী [রাণী]
শিব	শিবা	শিবানী
শিষ্য	শিষ্যা	শিষ্যাণী
শ্যামল	শ্যামলা	শ্যামলী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ	শাশুড়ী [শাশ]
সম্রাট্ [সম্রাজ্]	*সম্রাজী	সম্রাজ্ঞী
স্বামী	*স্বামিনী	স্ত্রী
কিন্তু গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী	

(গ) **কাঙাল**-এর স্ত্রীলিঙ্গে **কাঙালিনী**-ই গ্রহণীয়। **কাঙালী** উভয়লিঙ্গ শব্দ; যথা—শ্রাদ্ধান্তে **কাঙালী**-বিদায় আরম্ভ হইল [পুং-কাঙাল, স্ত্রী-কাঙাল দুই-ই বুঝাইতেছে]।

---

[*] তারকা চিহ্নিত রূপগুলির বাঙ্‌লায় প্রয়োগ নাই।

"ওই-যে **কাঙাল** বসি রাজপথধারে"—নবীনচন্দ্র। "....দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ।

অনুরূপ—**অনাথিনী, কুরঙ্গিণী, অভাগিনী, চণ্ডালিনী, চাতকিনী, পিশাচিনী, ভুজঙ্গিনী, গোপিনী, সুকেশিনী** প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে ভুল বলিবার প্রয়োজন আছে কি? সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ না করিলেই কি ভুল বলিতে হইবে? বাঙ্‌লায় কি '**ইনী**' একটি স্ত্রীপ্রত্যয় নহে? **পাগলিনী, গোয়ালিনী, সাপিনী, বাঘিনী** যদি ভুল না হয় তবে এগুলিকেই বা ভুল বলিব কেন? আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে সাহিত্যরথীদের রচনায় বহুল প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও এইসকল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বর্জনের পরামর্শ দিতে হইবে কি? তৎসম স্ত্রীলিঙ্গ-অপেক্ষা '**ইনী**' প্রত্যয়ান্ত বাঙ্‌লা স্ত্রীরূপ শ্রুতিমধুর বলিয়াই সাহিত্যরথিবৃন্দ উহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

"**অনাথিনী** মাগিছে সহায়"—রবীন্দ্রনাথ। "**অভাগিনীর** কপালে কী আছে কে জানে?" বলেন্দ্রনাথ। "**কুরঙ্গিণী** সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে"—মধুসূদন। "ব্রজমাঝে আছি মোরা যতেক **গোপিনী**"—বৈষ্ণবপদ। "আমি **চণ্ডালিনীর** ঝী"—রবীন্দ্রনাথ। "**চাতকিনী** কুতুকিনী ঘন দরশনে"—মদনমোহন। "**নাগিনীরা** ফেলিছে নিঃশ্বাস"—রবীন্দ্রনাথ। **সুকেশিনী** শিরশোভা কেশের ছেদনে ···।" "আছে কাল **ভুজঙ্গিনী**"—রামপ্রসাদ। "শুন **রজকিনী** রামী"—চণ্ডীদাস।

বাঙলা সাহিত্যে এইরূপ '**ইনী**'-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অজস্র প্রয়োগ রহিয়াছে। সুতরাং এইগুলিকে প্রয়োগ-সিদ্ধ শুদ্ধরূপই বলিতে হয়।

পুং	**স্ত্রী**	
অনাথ	অনাথা, অনাথিনী	["**অনাথ** (স্ত্রী) কত
অভাগা	অভাগী, অভাগিনী	সদ্য বধূ"—সত্যেন্দ্রনাথ।]
কুরঙ্গ	কুরঙ্গী, কুরঙ্গিণী	
গোপ	গোপী, গোপিনী	
চণ্ডাল	চণ্ডালী, চণ্ডালিনী	['চণ্ডালিকা'—'চণ্ডালক'
চাতক	চাতকী, চাতকিনী	হইতে]
তুরঙ্গ	তুরঙ্গী, তুরঙ্গিনী	
নট	নটী, নটিনী	

পুং	স্ত্রী
নাগ	—, নাগিনী
পাগল	পাগলী, পাগলিনী
পিশাচ	পিশাচী, পিশাচিনী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী, বিহঙ্গিনী
ভুজঙ্গ	ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গিনী
রজক	রজকী, রজকিনী
সিংহ	সিংহী, সিংহিনী
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী
হংস	হংসী, হংসিনী

(ঘ) **গৌরাঙ্গিণী, ক্ষেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী** কিন্তু **'ইনী'**-প্রত্যয়ান্ত নহে। নিম্নের তালিকাটি দেখিলেই উহাদের শুদ্ধিবিষয়ক সন্দেহের নিরসন হইবে।

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
গৌরাঙ্গ	গৌরাঙ্গী	[গৌর এমন অঙ্গ = গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ + ইন্ অস্ত্যর্থে] গৌরাঙ্গী [গৌরাঙ্গিন্]	গৌরাঙ্গিণী
ক্ষেমাঙ্গ	ক্ষেমাঙ্গী	[ক্ষেমময় অঙ্গ = ক্ষেমাঙ্গ, ক্ষেমাঙ্গ + ইন্] ক্ষেমাঙ্গী [ক্ষেমাঙ্গিন্]	ক্ষেমাঙ্গিনী
শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গী	[শ্বেত এমন অঙ্গ = শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ + ইন্]	শ্বেতাঙ্গিনী
হেমাঙ্গ	হেমাঙ্গী	[হেমময় অঙ্গ = হেমাঙ্গ, হেমাঙ্গ + ইন্] [হেমাঙ্গিন্] হেমাঙ্গী	[হেমাঙ্গিনী

অনুরূপ—**শ্যামাঙ্গিনী**

(ঙ) **ননদী** ও **ননদিনী** প্রকৃতই অশুদ্ধপদ; কারণ **ননদ** স্ত্রীলিঙ্গ, উহার সহিত আবার **ঈ** বা **ইনী** স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে না। **বনানী—অরণ্যানীর** অনুকরণে গঠিত। উহা তৎসমরূপ নহে।

(চ) সংস্কৃতে **যুবন্** শব্দের স্ত্রী-রূপ তিনটি—**যুবতি, যুবতী, যূনী**; কিন্তু বাঙ্‌লায় **যুবা, যুবক** উভয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **যুবতী** ব্যবহৃত হয়।

(ছ) অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মতে **বিপত্নীক, মুক্তদার, সভাপতি নিজ্ঞ**

পুংলিঙ্গ এবং **বিধবা—নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ**। **বিধবা** যদি **নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ** হয় তাহা হইলে **বিপত্নীক** ও **মৃতদার নিত্যপুংলিঙ্গ** বলা চলে। কিন্তু মহামুনি যাস্কের রচিত নিরুক্ত অনুসারে **ধব** শব্দের অর্থ পতি বা স্বামী; অতএব **বিধবা** শব্দের অর্থ মৃতভর্তৃকা। কাজেই **'বিধবা' বিপত্নীক** ও **মৃতদার** এই পুংলিঙ্গ শব্দদ্বয়ের সমপর্যায়ের স্ত্রীবোধকশব্দ।

(জ) **নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ**—করণবাচ্যে নিষ্পন্ন বহু কৃদন্ত শব্দ স্ত্রীপ্রত্যয়যোগে নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ; যথা—আকর্ষণী [আঁকষি], ক্ষেপণী [দাঁড], চালনী [চালুনী], ছেদনী [ছেনী], লেখনী [কলম], বন্ধনী [ব্রাকেট্], ইত্যাদি।

কাঁচী, কাটারী, বঁটী, সাঁড়াশী, হাতুড়ী, ইত্যাদি।

অঙ্গনা, ললনা, রূপসী, বন্ধ্যা, সজনী, ধনি [নী] এবং অবীরা, এয়ো, পোয়াতী বাঁজা, সতী, 'সপত্নীর' চারিটি অপভ্রংশ সৎ [সৎ-মা], সতা, সতীন, সতিনী, ইত্যাদি।

(ঝ) (৵০) **নদ** ও নদের **নাম** পুংলিঙ্গ; যথা—**সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র**। **নদী** ও নদীর **নাম** স্ত্রীলিঙ্গ; যথা—**গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,** ইত্যাদি।

(৶০) **গ্রহ** ও গ্রহের **নাম** পুংলিঙ্গ; যথা—**রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি,** ইত্যাদি। **তারা** ও তারার **নাম** স্ত্রীলিঙ্গ, যথা—**অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা,** ইত্যাদি।

(৶৹) সংস্কৃত **ইমন্** প্রত্যয়ান্ত শব্দ **পুংলিঙ্গ**; যথা—**অণিমা, নীলিমা, লঘিমা, মহিমা,** ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্‌লায় উহারা যখন মেয়েদের নামরূপে ব্যবহৃত হয় উহাদিগকে **পুংলিঙ্গ** বলা হইবে কি? **সবিতা,** [সবিতৃ], **ইন্দু পুংলিঙ্গ, পুষ্প, কমল, ক্লীবলিঙ্গ**; কিন্তু মেয়েদের নামরূপে উহাদের অজস্র ব্যবহার চলিতেছে। ইহাদের লিঙ্গনির্ণয়ের জন্য নিম্নস্থ সিদ্ধান্তটি লক্ষণীয়—

পুং	**স্ত্রী**
অণিমা [অনুর ভাব]	অণিমা [তন্নাম্নী স্ত্রী]
নীলিমা [নীলের ভাব]	নীলিমা "
সবিতা [সূর্য]	সবিতা "
ইন্দু [চন্দ্র]	ইন্দু "

[ইন্দুমতী বা ইন্দুলেখা হইলেত' কথাই নাই।]

(।০) **গুপ্ত, বসু, ঘোষ** প্রভৃতি কুলোপাধির স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর সাধন করিয়া **গুপ্তা, বসুজা** বা **বসুজায়া, ঘোষজা** বা **ঘোষজায়া** লিখিবার প্রয়োজন আছে

বলিয়া মনে হয় না। **বিবাহিতা** হইলে নামের পূর্বে **শ্রীমতী** এবং **অবিবাহিতার** নামের পূর্বে **কুমারী** ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে।

(ঞ) (৵০) **সেবক** শব্দের 'নাষ্টকাদেঃ' সূত্রানুসারে **সেবকা** স্ত্রীলিঙ্গ হয়। অর্থান্তরে **সেবিকা** পদও হইতে পারে, সেবিন্‌+ক+আ করিবার প্রয়োজন নাই। **সেবকা**= সেবা, সেবিকা=যে নারী সেবা করে।

(৵০) **উপন্যাসিক** [উপন্যাসিন্‌+ক] শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **উপন্যাসিকা**, কিন্তু **ঔপন্যাসিক** [উপন্যাস+ষ্ণিক] শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **ঔপন্যাসিকী** হইবে। **মাতুল** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **মাতুলা, মাতুলী, মাতুলানী** তিনটি পদ হয়।

(৶০) কয়েকটি তৎসমশব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ লক্ষণীয়—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
অগ্নি	অগ্নায়ী	মহারাজ	মহারাজী [বাঙ্‌লায় চলিত **মহারাজ্ঞী**—মহতী রাজ্ঞী এইরূপ কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন]
[উদচ্‌] উদক্‌	উদীচী		
নর	নারী	সভাপতি	সভাপতি, সভাপত্নী [বাঙ্‌লায় **সভানেত্রী** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ **সভানেত্রী** বহুল প্রযুক্ত হয়।]
পতি	পত্নী		
[প্রত্যচ্‌] প্রত্যক্‌	প্রতীচী		
[প্রাচ্‌] প্রাক্‌	প্রাচী		
মৎস্য	মৎসী	সম্রাজন্‌ [বিরাজমান]	সম্রাজ্ঞী
মনু	মনায়ী, মনাবী	সম্রাট্‌ [সম্রাজ্‌]	সম্রাজী [সম্রাজ্ঞী বাঙ্‌লায় প্রচলিত]
মনুষ্য	মনুষী		

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাহাকে বলে? বাঙ্‌লায় লিঙ্গ কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। বাঙ্‌লায় নামবিশেষণের লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে তোমার মতামত সংক্ষেপে পরিব্যক্ত কর এবং উহার সমর্থনকল্পে উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

৩। স্ত্রী-প্রত্যয় কাহাকে বলে? বাঙ্‌লা ও সংস্কৃতের প্রধান স্ত্রী-প্রত্যয়গুলির উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া প্রয়োগ দেখাও।

৪। কোন্ কোন্ অর্থে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ গঠিত হয় উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৫। এমন তিনটি পুংলিঙ্গ শব্দ দেখাও, যাহাদের সহিত বিভিন্ন স্ত্রীপ্রত্যয়যোগে ভিন্নার্থক স্ত্রীরূপ গঠিত হয়।

৬। এমন পাঁচটি পুংলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ কর, যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৭। তিনটি উভয়লিঙ্গ শব্দের উল্লেখ করিয়া তাহাদের পুংত্ব-স্ত্রীত্ব-নির্ণয়ের উপায় প্রদর্শন কর।

৮। এইরূপ পাঁচটি তৎসম শব্দের উল্লেখ কর যেগুলির সংস্কৃত স্ত্রীরূপ বাঙ্‌লায় চলে না। এইগুলির বাঙ্‌লা স্ত্রীরূপ প্রদান কর।

৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোনও তিনটির স্ত্রী-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন রূপ লেখ এবং তাহা দিয়া বাক্য রচনা কর :—অভাগা, সোহাগী, জ্যেঠা, বাঘ, মহারাজ। (C.U. 1949)

১০। বাঙ্‌লা শব্দকে পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের যে নিয়মগুলি রহিয়াছে, যথোপযুক্ত উদাহরণ-সহ তাহাদের যে কোনও পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ কর। (S. F. 1953)

১১। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দগুলির স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ নির্ণয় কর :—

অশ্ব, সাহেব, জ্যেঠা হিংসুটে, শিক্ষক, আদুরে, অভাগা, নাতি, মহীয়ান্, গয়লা, সুকেশ, নাপিত, শ্রীমান্ উড়ে, পাগল শিষ্য অধ্যাপক, ভুজঙ্গ, নর্তক, নিরপরাধ, নবাব, কর্তা, সাধু শ্বশুর, অভিনেতা, সভাপতি, বৈষ্ণব ভৃত্য, অনুচর উচ্চ, গোঁসাই, ধুরন্ধর, ভগবান্ যুবক, খ্যাতনামা, ষাঁড়, শূদ্র, ছাত্র।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে লিঙ্গান্তরিত কর :—

ননদ অশ্ব বিপত্নীক, শালী, যব, কবরী, মেনী-বেড়াল মৎস্য, বিবি, ভাসুর, অগ্নি, মনু, বৌদিদি, শ্যালক, সখী, সুরী, গায়ক, প্রাচী বরুণ যব কার্যকরী, চণ্ডী, শ্রেয়সী, ওজস্বিনী, হিরণ্ময়, সাপ্তাহিক, ষোড়শী, গুরু নন্দিতা, নাটক কাঙাল, বান্ধবী, বাঁদী, সম্রাট্, চৌধুরী।

১৩। শব্দযুগলের অর্থ-পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

সেবকা—সেবিকা, শালী—শালাজ ; স্থূলা—স্থূলী ; শূদ্রা—শূদ্রী, আচার্যা—আচার্যানী, যবনা—যবনানী ; যবনী—যবানী, কালা—কালী ; অরণ্যানী—বনানী।

১৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কর :—মহারাজ্ঞী, নটিনী, অভাগিনী, কাঙালিনী, সুকেশিনী, চণ্ডালিনী, ননদিনী, বনানী, রজকিনী, অনাথিনী, নাগিনী, অশ্বিনী, হেমাঙ্গিনী, যুবতি, শ্যামাঙ্গিনী, ত্রিনয়ন, শিবানী, দিগম্বরী।

—— — ——

বচন

ক	খ
এক যে ছিল **রাজা**।	**রাজারা** থাকেন **প্রাসাদে** (=প্রাসাদ সমূহে)।
"—**দূত সভায়** দাঁড়াল আসি" —রবীন্দ্রনাথ।	**দূত** (দূতেরা) অবধ্য।
	কত সভা দেখলাম।
"নমি **আমি, কবিগুরু** তব পদাম্বুজে" —মধুসূদন।	"**মানুষ আমরা** নহিতো **মেষ**"— —দ্বিজেন্দ্রলাল।

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে **ক** এর নিম্নবর্তী স্থূলাক্ষর পদসমূহের দ্বারা একটিমাত্র বিশেষ্য বা সর্বনাম সূচিত হইতেছে; কিন্তু **খ**-এর নিম্নস্থ স্থূলাক্ষর পদরাজি বহুত্ব-জ্ঞাপক। যাহাতে এইরূপ এক ও অনেক-এর বোধ জন্মাইয়া দিল তাহাই বচন, সুতরাং বলা যায় যে—

যদ্দ্বারা আমাদের বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সংখ্যাবোধ জন্মে তাহাকে বচন বলে।

বাঙ্‌লায় **একটিমাত্র সংখ্যা** বুঝাইলে **একবচন** এবং **একাধিক** সংখ্যা বুঝাইলে, হয় **বহুবচন**। [ইংরেজী ও অন্যান্য আধুনিক ভাষাসমূহে এই দুইটিমাত্র বচনই রহিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক ও আরবী প্রভৃতি ভাষায় দুই-সংখ্যাবোধক দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়।]

একবচন

সংস্কৃতে কেবল **বিভক্তি দ্বারাই সংখ্যা ও কারকের** বোধ জন্মে [সংখ্যাকারক-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ]; কিন্তু বাঙ্‌লায় বিভক্তি দ্বারা প্রায়শঃ বিশেষ্যের সংখ্যা বোধ হয় না, সূত্র বা প্রসঙ্গের (context) দ্বারাই বচন নির্ণয় করিতে হয়। অবশ্য পুরুষবাচক সর্বনামের সহিত বিভক্তি ও অনুসর্গ যুক্ত হইলে একবচন বহুবচন বুঝিতে পারা যায়।

বিশেষ্যের একবচন বুঝিবার ও বুঝাইবার উপায়:—

(ক) **টি, টা, খানি, খানা, খান, গাছি, গাছা, গাছ** প্রভৃতি নির্দেশক

বিশেষ্যের সহিত যুক্ত করা হয়; যথা—"প্রগল্‌ভ **বিদূষকটি** ···সম্মানের অধিকারী ছিল না",—রবীন্দ্রনাথ। "**ক্যাতাটা** পেতে দেব মা ?—শরৎচন্দ্র। "কী-জানি কখন উল্‌টায় **গাড়িখানি** ।"—দ্বিজেন্দ্রলাল। "**বেহালাখানা** বাঁকায়ে ধরে বাজাও ওকী সুর !"—রবীন্দ্রনাথ। "**মালাগাছি** খুলে দিনু হাতে", "**লাঠিগাছা** বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন।" ইত্যাদি।

(খ) বিশেষ্যের পূর্বে **এক**—এই সংখ্যাবাচক বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়; যথা—"**এক** যে ছিল পাখি।"—রবীন্দ্রনাথ। "নন্দ একদা কাগজেতে **এক সাহেবকে** দেয় গালি"—দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনকাল গিয়া **এককালে** ঠেকেছে"—বঙ্কিমচন্দ্র। "**একদিন** যাইতে না যাইতেই রামকানাই···**এক** সাক্ষীর **সপিনা** পাইলেন"—রবীন্দ্রনাথ, "**এক হাতে** মোরা মগেরে রুখেছি····" সত্যেন্দ্রনাথ।

(গ) প্রায়শঃ **এক**-এর সহিত **টি, টা, খানা, খানি,** প্রভৃতি যুক্ত করিয়া বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়; যথা—

"····জাগায়ে তুলিল **একটি** বিরাট **হিয়া**" রবীন্দ্রনাথ॥ "নন্দলাল তো একদা **একটা** করিল ভীষণ **পণ**"—দ্বিজেন্দ্রলাল। "···মাঝে **একখানি হাট**"—যতীন্দ্রনাথ। "**একখানি** যাত্রীর **নৌকা** গঙ্গাসাগর হইতে **প্র**ত্যাগমন করিতেছিল"—বঙ্কিমচন্দ্র। "**একখানা** বড়ো দুহাতে **লাঠি** ধরে···"—প্রমথ চৌধুরী।

(ঘ) একবচনের সর্বনাম বিশেষণরূপে বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহার করা হয়; যথা—"দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে **যে** অজ্ঞাত **তারা**"—রবীন্দ্রনাথ। "**সে কবির** বাণী লাগি কান পেতে আছি"—রবীন্দ্রনাথ। "**এই দৃশ্য** দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না"—শরৎচন্দ্র।

(ঙ) প্রসঙ্গে একবচনের বোধ জন্মিলে শব্দের রূপ অবিকৃত থাকে; যথা—"ধীরে ধীরে কহে **রামা**····" মুকুন্দরাম। **দূত**···সভাস্থলে হ'ল উপনীত"—হেমচন্দ্র। "আমার **বাঁশীর** সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি"—রবীন্দ্রনাথ, "তামাক সাজিয়া **হুঁকা** হাতে দিতে····"—শরৎচন্দ্র। "নারিলি হরিতে **মণি**, দংশিল কেবল **ফণী**"—মধুসূদন।

(চ) **কে, এ, তে, র** প্রভৃতি বিভক্তিযোগে কখনও কখনও একবচনের বোধ জন্মে; যথা—"কিন্তু **গুহার** এ দশা আজকাল হইয়াছে" বঙ্কিমচন্দ্র। "**সাপে কামড়াইয়াছে,** আমরা **ডিঙিতে** যাব"—শরৎচন্দ্র।···**পুত্রকে রাজ্য** দিয়ে····" —রাজশেখর বসু।

বহুবচন

বাঙ্‌লায় বহুত্ব জ্ঞাপনের বিবিধ উপায় রহিয়াছে। বহুবচন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উক্ত উপায়গুলি জানা আবশ্যক। বিশেষ্যের বহুত্ব সূচিত হয়:

(ক) **রা, এরা, দিগকে, দিগের, দের** প্রভৃতি বিভক্তির যোগে; যথা—"এলেন **পণ্ডিতেরা** দূর দূর থেকে"—রবীন্দ্রনাথ। "এই **নৌকারোহিরা** সঙ্গিহীন"—বঙ্কিমচন্দ্র। "...**জোলাদের** ছেলে কবীর রচিল গান"—সত্যেন্দ্রনাথ। "**যাত্রীদিগের** ব্যবহার....অবলোকন করিলাম"—অক্ষয় দত্ত। "**বন্ধুদিগকে** এই বই আর কী বলিয়া দিতে হইবেক?"—বিদ্যাসাগর।

সাধারণতঃ উন্নতশ্রেণীর প্রাণীবাচক শব্দের উত্তর এই সকল বিভক্তিযুক্ত হইয়া বহুবচন সূচিত হইলেও অনেক সময় **ইতর প্রাণিবাচক** এবং প্রাণিরূপে কল্পিত **প্রাণহীন পদার্থ বাচক** শব্দের সহিতও **বহুবচনে রা, এরা** প্রভৃতি যুক্ত হইয়া থাকে; যথা—**ইতরপ্রাণিবাচক**—"**পাখীরা** আকাশে উড়ে দেখিয়া, হিংসায়—হিংসার ফল।—"**বানরেরা** চলে ধেয়ে"—কৃত্তিবাস। '**মৌমাছিরা**', '**ভেকেরা**' ইত্যাদি।

নিষ্প্রাণ পদার্থবাচক—"**মেঘেরা** দলবেঁধে যায় কোন্ দেশে"—অতুলপ্রসাদ, "**ফুলেরা** হেসেই আপন-হারা"—গান। "**লতাদের** মাথাগুলি"—অক্ষয় বড়াল।" "**তারাদের** এড়িয়ে"—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) বিশেষ্যের সহিত **গুলি, গুলা** [গুলো] সংযোগে; যথা—"**দংশনগুলি** যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে"—রবীন্দ্রনাথ। "**কুকুরগুলো** সরিয়া দাঁড়াইল"—শরৎচন্দ্র। "**নিন্দুকগুলো** খাইতে পায় না"—রবীন্দ্রনাথ। "শুন্‌লে তো **কথাগুলো**?" —শরৎচন্দ্র। "সেই পুরানো **দিনগুলি**"—নজরুল।

(গ) বহুত্ব-বোধক পদ সমূহের সহিত সমাসের দ্বারা; যথা—

(/০) **গণ, বর্গ, বৃন্দ, ব্রজ, কুল, মণ্ডলী, যূথ**—ইহাদের সহিত সাধারণতঃ প্রাণিবাচক বিশেষ্যের সমাস হয়—দেব**গণ**, বন্ধু**বর্গ**, সুধী**বৃন্দ**, বামা**ব্রজ**, দৈত্য**কুল**, পণ্ডিত—**মণ্ডলী**, মৃগ**যূথ**, ইত্যাদি।

"আসিল যত **বীরবৃন্দ** আসন তব ঘেরি"—রবীন্দ্রনাথ।

"রাজহং**সকুলে** মিলি করি কেলি আমি..."—মধুসূদন।

"বাষ্পাকুল শিষ্য**বৃন্দ**"—হেমচন্দ্র। "...সব্যসাচী নেতৃ**গণ**—কালিদাস রায়।

(৵০) **আবলী, গুচ্ছ, গ্রাম, চয়, জাল, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি** ইহাদের সহিত নিষ্প্রাণ পদার্থ বাচক বিশেষ্যের সমাস হয় :—

দৃশ্যা**বলী**, অলক**গুচ্ছ** গুণ**গ্রাম**, সর্ষপ**চয়**, জলদ**জাল**, কুন্তল**দাম**, নখর**নিকর** অভ্র**পুঞ্জ**, মেঘ**মালা**, পত্র**রাজি**, ঊর্মি**রাশি**, ইত্যাদি।

(১০) **দল, নিচয়**, সকল, সব, সমূহ, সমুদয়—ইহাদের সহিত প্রাণী ও নিষ্প্রাণ উভয় বাচক বিশেষ্যপদের সমাস হয় :—মৃগ**দল**, ফুল**দল**, নক্ষত্র**নিচয়**, দানব**নিচয়**, দৈবত**সকল**, দ্রব্য**সকল**, ভাই**সব**, মাল**সব**, পক্ষি**সমূহ**, বৃক্ষ**সমূহ**, জীব**সমুদয়** দ্রব্য**সমুদয়**, [ইহাদের মধ্যে **সকল, সব** ও **সমুদয়** বিশেষণরূপে পূর্বে বসিয়াও বিশেষ্যের বহুত্ব সূচনা করে।]

কয়েকটিপ্রয়োগ—"ভিখ্‌মাগি আনো সর্ষপ**চয়**"—করুণানিধান।

"ফুল**দল** দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"—মধুসূদন।

"কুন্তলে অশোক**গুচ্ছ**"—দেবেন্দ্রনাথ সেন। "অর্ণবের ঊর্মি**রাশি**"—হেমচন্দ্র।

"স্বরগ বেষ্টি দৈবত**সকলে**"—ঐ। "নিরখে মাতঙ্গ**যুথ**....'—ঐ। "বিহঙ্গ**নিচয়** গাহিতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে"—নবীনচন্দ্র। "বিশাল ভূধর**মালা**"—ঐ। "শোভে রত্ন**রাজি**" —মধুসূদন। "জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখী**দল**"—রবীন্দ্রনাথ। "নক্ষত্র**মণ্ডলী** সারি সারি"—ঐ।"...ঝরণার শীকর-**নিকরে**"—ঐ। "কুন্তলে কুসুম**রাজি**"—ঐ। "তখন সিপাহী-**মহলে** (দের মধ্যে) গান আরম্ভ হইল"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(ঘ) বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ব বাচক বিশেষণে ব্যবহার দ্বারা—

(১০) "**নানা** ছল, **নানা** বেশ, **বিবিধ** কৌশল"—হেমচন্দ্র।

"অনন্তের **সমুদয়** নক্ষত্র বা যথা" ঐ।

"শেখর....**সমস্ত** বাতায়ন খুলিয়া দিলেন"—রবীন্দ্রনাথ।

"**একরাশি** শেফালিকা ফুল"—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

"পৌছিলনা **বহুতর** ডাক"—রবীন্দ্রনাথ।

"**অনেক** যন্ত্রী" "**বিস্তর** লোক" "**যথেষ্ট** নিন্দুক"—ঐ।

(৵০) সর্বনামীয় বিশেষণ প্রয়োগে—

"**কতনা** নগর রাজধানী—**কত** নদী গিরি সিন্ধু মরু"—রবীন্দ্রনাথ,

"**এই সকল** স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"**সব** কথা **সকল** লোকের কাছে বলা চলে না।"

"**যত** ব্যথা **যত** গান।" "**কত** লোক" ইত্যাদি।

(১/০) বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে সংখ্যাবাচক বিশেষণ প্রয়োগে ; যথা—

"**সাত** সমুদ্র **তের** নদী পার হইয়া"—দক্ষিণারঞ্জন। "**ত্রিংশৎত্রিকোটি** দেব" —হেমচন্দ্র।

"**দু** নয়নে অভাগার বহিতেছে নীর। ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ**তিন** প্রহর"—নবীনচন্দ্র।

"জাগায়েছ যূথিকার অঙ্গে অঙ্গে **অযুত** কোরক"—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

"ভেবে দেখি **চারি** দিক"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

"**শত**চুম্বনে মেলে না নয়ন"—করুণানিধান।

"নদ-নদী একাকার **আট** দিকে জল"—কবিকঙ্কণ।

"জন **দশেক**-এর খাবার সে একাই সট্‌কাতে পারত।" "বিঘে **দুই** ছিল মোর ভূঁই"—রবীন্দ্রনাথ।

(ঙ) বিশেষ্যের দ্বৈত-প্রয়োগে ; যথা—"ভিক্ষা মাগি **দ্বার দ্বার**"—রবীন্দ্রনাথ।

"**দেশ দেশ** নন্দিত করি মন্দ্রিল তব ভেরী"— ঐ।

"**দেউলে দেউলে** কাঁদিয়া ফিরিগো"—করুণানিধান।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ-দর্শন"—হেমচন্দ্র।

নীপে নীপে ঢালি দিয়া অমৃত মদিরা"—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

রঞ্জিযাছ **পুষ্পে পুষ্পে** ধরিত্রীর বিচিত্র অলোক"—ঐ।

(চ) বিশেষণের দ্বৈত প্রযোগ ; যথা—"**বড় বড়** বানরের শকতি অপার"—কৃত্তিবাস।

পাকা পাকা আম, **সুন্দর সুন্দর** ফুল, **ভালো ভালো বই**, ইতাদি।

[বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্যের দ্বৈত-প্রযোগে পরবর্তী বিশেষ্যেরও বহুত্ব সূচিত হয় ; যথা—**সারি সারি গাছ** (সারি ও গাছ উভয়েরই বহুত্ব বুঝাইতেছে), **ঝুড়িঝুড়ি আম** (ঝুড়ি ও আম উভয়েরই বহুবচন) ; অনুরূপ—**হাঁড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা**, "**আঁটি আঁটি ধান** চলে ভারে ভার"— রবীন্দ্রনাথ। "খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ **থালে থাল**"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

(ছ) সহচরশব্দ-সংযোগে ; যথা—

গাছ**পালা**, গাছ**গাছড়া**, লোক**জন**, ছেলে**পুলে**, রাজ**রাজড়া**, দোকান**পাট**, যন্ত্র**পাতি**, লাঠি**সোটা**, বাগ**বাগিচা**, আত্মীয়**স্বজন**, বন্ধু**বান্ধব**, পুঁথি**পত্র**, কাপড়-**চোপড়**, আনাচ-**কানাচ** ইত্যাদি।

"দেখিল পাড়ার শেষে **লোকজন** জমি"—গোবিন্দ চন্দ্র দাস। "ভয়ে সবে **পুঁথিপত্র** গুটায়"—কালিদাস রায়। "ছেলে-মেয়েদের **ছেলেপুলে** হইয়াছে" —শরৎচন্দ্র।

(জ) সমগ্র বাক্যের অর্থগ্রহণে ; যথা—

পাগলে [পাগলেরা] কী না বলে, **ছাগলে** [ছাগলেরা] কী না খায়"—প্রবচন। [একবচনের বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্তি চিহ্ন-বর্জিত হইলেও জাতিবাচক বিশেষ্য পদে বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হয।]

"**চাষী** [চাষীরা] ক্ষেতে চালাইতেছে হাল,

"**তাঁতি** [= তাঁতিরা] বসে তাঁত বোনে, **জেলে** [= জেলেরা] ফেলে জাল" —রবীন্দ্রনাথ।

"তুলি সযতনে তব কাব্যোত্থানে **ফুল** [= ফুলগুলি]—মধুসূদন,

"কর্তব্য **নরের** [= নরগণের] নিত্য স্বার্থপরিহার"—হেমচন্দ্র।

(৵০) বহ্বর্থক অধিকরণের প্রযোগে [কর্তার বহুবচন] ; যথা—'রাস্তায় রাস্তায়' **সিনেমা** [= বহু সিনেমা], ট্রামে-বাসে সর্বত্র **পকেটমার** [=পকেটমারেরা], 'ঘরে ঘরে' **রোগী** [= অনেক রোগী], "দেশে দেশে দিশে দিশে' **কর্মধারা** [= কর্মধারাসমূহ] ধায়" —রবীন্দ্রনাথ।

(৶০) বহ্বর্থক ক্রিয়াবিশেষণ বা অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বৈত-প্রয়োগে [কর্তা বা কর্মের বহুবচন] ; যথা—'অবিরাম চলে **ট্রাম** [ট্রামগুলি], ক্ষেপা 'হরদম' **গান** [= অনেক গান] গাহিতেছে, "নৌকা [= অনেক নৌকা] 'ফি সন' ডুবিছে ভীষণ"—দ্বিজেন্দ্র লাল। "দূরে দূরে **গ্রামে** [= গ্রামগুলিতে] জ্বলে ওঠে **দীপ** [= দীপগুলি]"—যতীন্দ্রনাথ। "কাটিতে কাটিতে ধান [= ধানগুলি] এলো বরষা"—রবীন্দ্রনাথ। **হাড়** [= হাড়গুলি] কাটিতে কাটিতে কাটারিটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

(ঝ) **একবচনের** সর্বনামের **দ্বিরুক্তি দ্বারা** উহার **বহুবচন** সূচিত হয় ; যথা—

"**কে কে** [=কাহারা] যাবি, আয়"—দাশরথি রায়। **যে যে** [=যাহারা] পড়া **কর** নি, **সে সে** [=তাহারা] দাঁড়াও। **কা'কে কা'কে** [=কোন্ লোকদিগকে] নেমন্তন্ন ক'রেছ ?

(৶০) বিশেষণরূপে প্রযুক্ত সর্বনামের দ্বৈতপ্রয়োগে বিশেষ্যের বহুবচন সূচিত হয় ; যথা—'যে যে' **লোক** [=লোকেরা] উপস্থিত ছিল, তারা সাক্ষ্য দেবে ত' ? 'কোন্ কোন্' **স্থানে** [=স্থানসমূহে] হীরক পাওয়া যায় ?

১। **টি, টা, খানা, খানি** প্রভৃতি নির্দেশকযুক্ত একবচনাত্মক শব্দ এবং **গুলি, গুলা, (গুলো), * গণ, বর্গ** প্রভৃতির সহিত সমাসবদ্ধ বহুবচনাত্মক শব্দের সহিত মাত্র একবচনের বিভক্তিই যুক্ত হইতে পারে ; যথা—গাছটি, লোকটাকে, লতাগুলির, কুকুরগুলোকে, দেবগণকে, বন্ধুবর্গের, ইত্যাদি।

২। রা, এরা, এবং, গুলি, গুলা [গুলো] র প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত স্মরণীয় ও স্বীকার্য—

"....'রা' চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে ব'লতে পারি, 'ঐ **মোষরা** পাঁকে ডুবে আছে,' কিন্তু 'ঐ **মোষগুলো** পাঁকে ডুবে আছে' ব'ললেই মানানসই হয়। **মোষরা** ব'ললে **মোষজাতিকে** মনে আসে, **মোষগুলো** ব'ললে মনে আসে **বিশেষ মোষের দল**। '**মানুষরা** নিষ্ঠুরতায় পশুকে হার মানাল,' ঠিক শোনায়,........কিন্তু '**মানুষগুলো** পশুকে হারমানায়'—অশুদ্ধ। সাধারণ বিশেষ্যে 'রা' চলে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ্যে 'গুলো'। **মানুষরা** ওখানে জটলা করছে' ব'ললে মনে হয় যেন জানানো হ'চ্ছে অন্য কোনো জীব করেনি এখানে **মানুষগুলো** ব'ললেই সংশয় থাকে না। **টেবিলরা চৌকিরা**—নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের **গুলো** ছাড়া গতি নেই।"

৩। সংস্কৃত সর্ব-শব্দজাত **সব** বাঙলায় সংখ্যা ও পরিমাণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; যেমন—'সব' লোক ['সংখ্যা' বুঝাইতেছে], 'সব' দুধ [পরিমাণ বুঝাইতেছে] ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও 'সব-' এর বিশেষ ব্যবহার রহিয়াছে। **সব** এবং ইহার সমার্থক **সকল** ও **সমস্ত যে, সে, এ** [এই], **কোন্** সর্বনামের সহিত যুক্ত হইয়া বিশেষ্যের পূর্বে বসে এবং তাহার বহুবচন বুঝাইয়া দেয় ; যথা—'যে-সব' বা

* ইহারা সংস্কৃত 'কুল' শব্দজ, সুতরাং প্রত্যয় নহে , 'ব্রাহ্মণকুল' = 'বামনগুলা'।

'যে-সকল' বা **'যে সমস্ত'** লোক বা বস্তু। 'সে-সব' দিন চলিয়া গিয়াছে। 'এ-সকল' কথা শুনিলেও পাপ হয়। 'কোন্‌-সব' দেশের কথা যে বলছে তাদের নামও শুনিনি।

সব-এর সহিত **গুলি, গুলা** [গুলো] যুক্ত হইয়াও বহুত্বজ্ঞাপক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—সবগুলি দরজা খোলা, সবগুলো জাম পচা,....ইত্যাদি।

অন্য **সর্বনাম** শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া **সব** তাহার বহুবচন সূচিত করে; যথা—"....প্রভো! ভুলিলে কি **আমাসবে?**" "**তা-সবে,** অবোধ আমি, অবহেলা করি"—মধুসূদন। "আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে **তোমাসবাকার** ঘরে ঘরে"—রবীন্দ্রনাথ।

বহুবচনান্ত বিশেষ্যের বা সর্বনামের পূর্বে বা পরে বসিলে **সব, সকলে** ইত্যাদি দ্বারা **একান্ততা বা সমকারকত্ব** (Apposition) সূচিত হয; যথা—**সবাই** [সবে + ই] **মোরা** মাযের ছেলে। **যাত্রীরা সবে** বলিযা উঠিল 'জয় জয় বারাণসী'! "**তোমরা সকলে** এই করিও মিলে"—প্রাচীন সংগীত। ["**সব চৌকিগুলোই** ভাঙ্গা, **সব ভিখিরিগুলোই** চেঁচাচ্ছে। এখানে **'সব'** বোঝাচ্ছে **একান্ততা,** আর **'গুলো'** বোঝাচ্ছে বহুবচন"—রবীন্দ্রনাথ।]

৪। **একই** শব্দের পূর্বে ও পরে বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত করা অসঙ্গত। যথা :—'বহু'দিন 'গুলি', 'অনেক' লোকে'রা', ইত্যাদি লিখিলে ভুল হইবে।

৫। সংখ্যাবাচক বিশেষণ **অনেক** এবং সর্বনামীয বিশেষণ **এত, যত, তত, কত, কতক**-এর সহিত বহু ক্ষেত্রে **গুলি, গুলা** [গুলো] প্রভৃতি যুক্ত হইয়া একযোগে বিশেষ্যের বহুবচন বুঝাইয়া থাকে; যথা—"... আমরা **এতগুলি** লোক মারা যাই"—বঙ্কিমচন্দ্র। **যতগুলি** মজুরের কথা আপনি বলিয়াছিলেন **ততগুলি** মজুরই আসিয়াছে।' **কতগুলো** বাড়ী পুড়ে গেছে? "—**কতকগুলা** কম্পিত বক্ররেখা—" —রবীন্দ্রনাথ। "খাসা-নাড়ু **গুটিকতক** জল খেতে দিলেন—অবনীন্দ্রনাথ।

৬। বহুত্ববোধক সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত সময় সময় **টি, টা, খানি, খানা** প্রভৃতি নির্দেশক যুক্ত হইয়া থাকে; যথা—"**দু'টি** আঁখি **দু'টি** পাখী মন-বনে ধায় নিতি"—গান। হাতের **পাঁচটা** আঙ্গুল সমান হয় না। "দূরে দূরে গ্রাম **দশ-বারো খানি**"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বচন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

৭। বিশেষ্য পদের বহুবচনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সকলপ্রকার বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। **দ্রব্যবাচক** বিশেষ্যের সংখ্যাদ্বারা গণনা সম্ভবপর নহে, সুতরাং উহাদের বচনভেদের প্রসঙ্গ অবান্তর। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"ঘটিতে কত দুধ আছে, পুকুরে কত জল আছে, একখানা কয়লার ওজনে কত বস্তু আছে—তাহা গণিবার উপায় নাই, তাহা মাপিয়া বলিতে হয়।........জল, তেল, দুধ মাপিবার বিষয়, গণিবার নহে। আমরা পাঁচসের জল বলি,........কিন্তু পাঁচটা জল, দশটা জল, এরূপ বলিতে পারি না।"

'বাল্‌তির **জলটা** বা **জলগুলি** ঢালিয়া ফেল—এখানে 'টা'-দ্বারা একচন এবং 'গুলি' দ্বারা বহুবচন সূচিত হয় না। 'টা' এবং 'গুলি' এখানে 'একান্ততা'-বোধক। '**তিনখানা দধি** আন' বলিলে—হয় দধি=দধিপূর্ণপাত্র', না হয় 'তিনখানা=তিনহাঁড়ি' বুঝিতে হইবে। **সবটা দুধ** বা **সব দুধটা** বলিলেও 'একান্তভাবে' দুধের 'পরিমাণকে' বুঝাইয়া থাকে। 'আজকালকাব **সব চা**-ই সুগন্ধহীন', বা '**সব তেল**-ই ভেজাল'—এখানেও 'সব'='সব রকমের' বা 'সব দোকানের' অর্থাৎ 'সব'-দ্বারা বহুত্ব সূচিত হইয়াছে 'রকম' বা 'দোকান'—এই উহ্য জাতিবাচক বিশেষ্যের। মোট কথা **যাহা পরিমেয় কিন্তু সংখ্যেয় নহে, তাহার বহুবচন হইতে পারে না।**

৮। **ভাববাচক** বা ক্রিয়াবাচক এবং গুণবাচক বিশেষ্যের সংখ্যাদ্বারা গণনা সম্ভবপর নহে বলিয়া উহাদের বহুবচন হইতে পারে না। কিন্তু ভাব বা ক্রিয়া ও গুণ দ্বারা যখন যথাক্রমে ভাবের আধার, কৃত বস্তু ও গুণের অভিব্যক্তস্বরূপের বোধ জন্মে তখন তাহারা সংখ্যেয় এবং সেক্ষেত্রে তাহাদের বহুবচনও হইয়া থাকে; যথা—**দেনাগুলো** পরিশোধ কর। "**সাত নকলে** আসল খাস্তা"—রেজাউল করিম। আদুরে ছেলের **সাত খুন** মাপ। অন্যান্য লেখকের মত আল্‌বেরুণি হিন্দুদের **গুণগুলির** কথা বাদ দিয়া কেবল দোষগুলির কথাই আলোচনা করেন নাই।

[মনে রাখিতে হইবে বহুবচন হইলে এই সকল বিশেষ্য জাতিবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয়।]

৯। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যেরও বহুবচন হয় না। তবে **ব্যক্তিদ্বারা জাতি, শ্রেণী** বা **গোষ্ঠির** বোধ জন্মিলে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য জাতিবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয় এবং তখন তাহার বহুবচনও হইয়া থাকে ; যথা—

রামেরা [রাম এবং আর তিন জন মিলিয়া] চারি ভাই।

"**মুচিরামরা** [মুচিরামের মত স্বভাববিশিষ্ট লোকেরা] পিঠ পাতিয়াই দেয়"—বঙ্কিমচন্দ্র।

কলির **ভীমেরা** [ভীমের মত বীরেরা] শত্রুর বুক চিরিয়া রক্ত পান করে না।

এ **কুম্ভকর্ণদের** [কুম্ভকর্ণের মত অভ্যাস বিশিষ্ট লোকদের] ঘুম কে ভাঙাবে ?

অনুশীলনী

১। বচন কাহাকে বলে ? বাংলায় বচন কয়টি ও কী কী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলায় একবচন বুঝাইবার ৩টি নিয়মের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

৩। বাংলায় বহুবচন বুঝাইবার প্রধান ৪টি নিয়মের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

৪। সকল প্রকার বিশেষ্যের বহুবচন হয় কিনা আলোচনা কর।

৫। শব্দের দ্বিত্ব দ্বারা বহুবচনের ক্ষেত্রগুলি আলোচনা কর।

৬। 'রা' 'গুলি' এবং 'সব', এর প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও।

৭। নিম্ন লিখিত বাক্য সমূহের নিম্ন-রেখ পদগুলির যুক্তিসহ বচন নির্ণয় কর :—

"মাটীর মালিক তাঁহারই হন।" " ওই যে কাঙাল বসি রাজপথ ধারে।" "কত ক্ষুদ্র নর··· লভিয়াছে অমরতা।" "সেথা হতে সবে আসে উপহার।" "তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা···। "···তোমারই পাদুকাখানি ।" "এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।" "আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।" "নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একটি কাকের ডাকে।" কাকের ডাকে ঘুম ভাঙ্‌ল। "বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল।" "এ বাড়ী নয়, ইটের পাঁজা।" "সুধীমণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন।" "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখী ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে।" "পাখীরা ফিরিল নীড়ে।" "আমরা ছাত্রদল।" পথের দুই পাশে বড় বড় বাড়ী। উহু আব ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।" সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি ? "আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।" জান না তো কত ধানে কত চাল ? "মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে।"

পুরুষ

স্বপন—কে, তপন ? **আমি** এই চিঠিটা লিখ্‌ছিলাম। **আমার** মাসী শেফালীকে তো **তুই** চিনিস্? **সে** এখন রাঁচীতে আছে। কাল **তার** চিঠি পেযেছি, এটা **তারই** জবাব। শোন্ না কী লিখ্‌ছিলাম—'মাসীমা, **তোমার** চিঠি পেলাম। **তুমি** জান্‌তে চেযেছ **আমি** এর পরে কী করব। কাল মামাবাবু এসেছিলেন, **তিনি**-ও ঐ প্রশ্নই করেছিলেন। **তাঁকে** যা ব'লেছিলাম **তোমাকে**-ও **তা**-ই লিখছি। সাহিত্য **আমি** ভালবাসি, সাহিত্য-সাধনাই **আমার** জীবনের লক্ষ্য। বিজ্ঞান-চর্চায় তন্ময় হ'লে **আমি** লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। আগে থাকতেই জানিযে দিলাম, পরে যেন **আমাকে** গালমন্দ ক'রো না।' কেমন, জবাবটা **তোর** পছন্দ হ'লো তো ?

এখানে **বক্তা** স্বপন বন্ধু তপনের নিকটে প্রথমে **নিজের কথা** এবং সেখানে অনুপস্থিত তাহার মাসী শেফালীর কথা বলিয়াছে। অতঃপর পত্রে মাসীকে সম্বোধন করিয়া নিজের কথা ও ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মামাবাবুর কথা বলিযাছে এবং সর্বশেষে পত্র সম্বন্ধে সম্মুখে উপস্থিত তপনের মতামত চাহিয়াছে।

বক্তা নিজের কথা বলিতে গিয়া নিজনামের পরিবর্তে **আমি, আমার, আমাকে**—এই সর্বনাম পদগুলির ব্যবহাব করিযাছে অর্থাৎ এইগুলির দ্বারা বক্তা নিজেকেই বুঝাইতে চাহিযাছে, ইহাদের মধ্যে আবার মূল সর্বনাম **আমি**; আমার, আমাকে, 'আমি'-শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির রূপ। **ব্যাকরণে বক্তার নিজনামের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনামকে উত্তম পুরুষ বলা হয়।**

বক্তা যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে (সে দূরে থাকুক বা নিকটে উপস্থিত থাকুক) তাহার নামের পরিবর্তে সর্বনামপদ ব্যবহার করে; যেমন—সম্মুখস্থ বন্ধুর ও সম্মুখে অনুপস্থিত দূরস্থিত মাসীর নামের পরিবর্তে বক্তা স্বপন **তুই, তুমি, তোমার, তোমাকে, তোর** ব্যবহার করিয়াছে। এই সর্বনামগুলির মূলরূপ তুমি, তুই **মধ্যম পুরুষ**। অতএব—**সম্বোধিত ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় ব্যাকরণে তাহাকে মধ্যম পুরুষ** বলে।

অতঃপর দেখা যাইতেছে যে, বক্তা সম্বোধিতের নিকট অনুপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির প্রসঙ্গে তাহার নাম অথবা **সে, তার, তিনি, তাঁকে** সর্বনামের প্রয়োগ করিয়াছে। এই সকল সর্বনামের মূলরূপ **সে, তিনি**। **বক্তা সম্বোধিতের নিকটে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর প্রসঙ্গে যে বিশেষ্য বা সর্বনামের ব্যবহার করে তাহাকে প্রথম পুরুষ বা নামপুরুষ বলে।**

কাজেই পুরুষ তিন প্রকার; যথা—

উত্তম পুরুষ † (First Person)—আমি (মুই), আমরা (মোরা)

মধ্যম পুরুষ (Second Person)—তুমি (তুই), তোমরা (তোরা), *আপনি, *আপনারা

প্রথম পুরুষ বা **নাম পুরুষ** † (Third Person)—সে (তিনি), তাহারা (তাঁহারা) অবশিষ্ট সকল সর্বনাম, এবং যাবতীয় বিশেষ্য পদ ও বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত অন্য পদ।

উত্তম পুরুষে 'মুই, মোরা' আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় এবং কবিতায় প্রচলিত।

মধ্যম পুরুষে 'তুই, তোরা'—তুচ্ছতা, অতিঘনিষ্ঠতা বা অতি-আদর বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, 'আপনি, আপনারা'—গৌরব সম্ভ্রম এবং কচিৎ ক্রোধ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রথম পুরুষে 'তিনি, তাঁহারা'—সম্ভ্রমার্থে বা গৌরবার্থে আর 'সে, তাহারা'—সাধারণ ভাবে ও তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়।

ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্যবোধের জন্যই পুরুষভেদের স্থান আবশ্যক। একটি উদাহরণ ধরিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

উত্তম পুরুষে—[আমি, আমরা] যাইতেছি

মধ্যম পুরুষে—[তুমি, তোমরা] যাইতেছ, [তুই, তোরা] যাইতেছিস্ [আপনি, আপনারা] যাইতেছেন।

প্রথম পুরুষে—[সে, তাহারা] যাইতেছে, [তিনি, তাঁহারা] যাইতেছেন।

[† ইংরাজী First শব্দের বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ 'প্রথম' এবং Third শব্দের প্রতিশব্দ 'তৃতীয়' কিন্তু Third Person হইবে প্রথম পুরুষ এবং First Person উত্তম পুরুষ।

* সংস্কৃত 'ভবৎ' প্রথম পুরুষ কিন্তু বাঙ্‌লায় প্রতিশব্দ 'আপনি' মধ্যমপুরুষ]

অনুশীলনী

১। পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ প্রত্যেকের সংজ্ঞা বুঝাইয়া দাও।

২। পার্থক্য বুঝাইয়া দাও:—আমি—মুই, তুমি—তুই—আপনি, তাহারা—তাঁহারা।

৩। পুরুষ বিভাগের প্রয়োজন কী?

কারক : বিভক্তি : অনুসর্গ

কারক

(১) **রাম** খায়।

(২) রাম **ভাত** খায়।

(৩) রাম **চামচ দিয়া** খায়।

(৪) রাম **ভিখারীটিকে** ভাত দেয়।

(৫) রাম **থালা হইতে** ভাত খায়।

(৬) রাম 'রান্নাঘরের' **বারান্দায়** ভাত খায়।

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বাক্যের স্থূলাক্ষর পদটি বাক্যস্থ ক্রিয়াপদের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্কের বন্ধনে বদ্ধ ; কিন্তু প্রত্যেকের সম্পর্ক স্বতন্ত্র। 'খায়'বা 'দেয়' ক্রিয়াপদের সহিত **রাম**-এর যে সম্পর্ক **ভাত, চামচ** বা **ভিখারী**-র সে সম্পর্ক নহে ; অথচ প্রত্যেকটি পদের সম্পর্কই প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট ক্রিয়াপদের সহিত এই সম্পর্কের বন্ধনকে **অন্বয়** বলে, আর অন্বিত পদগুলিই **কারক**। উপরের বাক্যগুলিতে **রাম, ভাত, চামচদিয়া, ভিখারীটিকে, থালা হইতে** এবং **বারান্দায়** কারক। তাহা হইলে বলা যায় যে, **ক্রিয়ার সহিত যে নামপদের অন্বয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান, তাহাকে কারক[১] বলে।**

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে-পদের ক্রিয়া-সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট নহে তাহা কারক হইতে পারে না। ৬নং বাক্যে **'রান্নাঘরের'** পদটি **বারান্দা** পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ক্রিয়াপদ **খায়**-এর সহিত উহার সম্পর্ক স্পষ্ট নহে। সুতরাং 'রান্নাঘরের' পদটি **কারক** নহে। এইরূপ পদকে **সম্বন্ধপদ** বলে। নামপদের সহিত নামপদের সম্পর্ককে আমরা **সম্বন্ধ** বলিব।[২] ক্রিয়ার সহিত নামপদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে **অন্বয়** বলাই যুক্তিযুক্ত। **সম্বন্ধপদ**-কে **বিশেষণস্থানীয়[৩]** বলা যাইতে পারে। কিন্তু **কারক** বলা যায় না।

১। "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্।" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী বলিয়াছেন—"সম্বন্ধ বুঝাইলে সে ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। যে শাস্ত্রে গিয়া পড়ে, তাহার নাম বাদার্থ, ন্যায়শাস্ত্র অথবা ন্যায়শাস্ত্রের শব্দখণ্ড।" ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে গিয়া পড়ে কেমন করিয়া? ন্যায়শাস্ত্রকে বাদ দিয়া পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হইতে পারে না। ব্যাকরণের সূত্রাবলী ন্যায়ানুমোদিত হওয়া চাই। অবশ্য অর্থতত্ত্বসম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের মতবিরোধ রহিয়াছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তাই বলিয়া বৈয়াকরণ ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া খেয়াল খুশি মত অন্যায়পথে চলিতে পারেন না। পূর্বসূরিগণ তাহাদের মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার যে ফল রাখিয়া গিয়াছেন, উত্তরসূরি ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার বিচারবিবেচনা করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিবেন (ক্ষেত্রবিশেষে সিদ্ধান্তটি নূতনও হইতে পারে)—ইহাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বাঙ্‌লা ও সংস্কৃতের গতিপ্রকৃতি এক না হইলেও বাঙ্‌লার কারকসংজ্ঞাতে ক্রিয়ান্বয়িত্ব অনস্বীকার্য।

২। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই সম্বন্ধকে শেষ বলা হইয়াছে। "কারকপ্রাতিপদিকার্থব্যতিরিক্তঃ স্বস্বামিভাবাদিসম্বন্ধঃ শেষঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। নামপদের সহিত নামপদের এই সম্বন্ধ যে কারকত্ব নহে তাহাও সুস্পষ্ট। 'বাক্যপদীয়'-কার ভর্তৃহরি-লিখিত "সম্বন্ধঃ কারকেভ্যোঽন্যঃ ক্রিয়াকারকপূর্বকঃ"-এর টীকায় হেলারাজের উক্তি "...ক্রিয়াকারকপূর্বক ইত্যনেন কারকত্বং ব্যাচষ্টে শেষস্য।'—ইহা কি ঠিক? 'ক্রিয়া কারকপূর্বকঃ'পদটির অর্থ কী? ক্রিয়া-কারকানি ক্রিয়ান্বয়িত্বাৎ কারকত্বমাপন্নানি পদানি পূর্বে প্রাগুক্তানি যস্য স (সম্বন্ধঃ)। ক্রিয়াকারক সম্বন্ধের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এখন অন্য যে সম্বন্ধের কথা (নামপদের সহিত নামপদের) বলা হইতেছে তাহা 'শেষ'। অধিকন্তু পূর্বেই 'কারকেভ্যোঽন্যঃ' বলা হইয়াছে। সুতরাং হেলারাজের টীকায় ইত্যনেনাকারকত্বং হইবে না কি?

৩। মহাভাষ্যে সম্বন্ধপদকে স্পষ্টতঃ বিশেষণ বলা হইয়াছে। "রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যত্র রাজা বিশেষণম্।"

৪ ইংরেজী case এবং সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা কারক এক নহে। অবশ্য রামমোহন রায় তাঁহার 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ সম্বন্ধপদকে 'সম্বন্ধ পরিণাম' ও 'সম্বন্ধীয় কারক' বলিয়াছেন। ইংরেজী case-অর্থেই তিনি কারক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার তাঁহার 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর পাদটীকায় রামমোহনকে সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন। এসম্বন্ধে বাঙ্‌লার আর দুই মনীষীর উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না, কিন্তু ইংরেজীতে case-এর লক্ষণ অনুরূপ; নাউনের কণ্ডিশন দেখাইয়া দিলে case হয়।· সম্বন্ধ, কারক হইতে পারে না, কারণ উহার ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ অন্বয় হয় না; কিন্তু case অনায়াসেই হইতে পারে, কারণ উহার কোন-না কোন শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে।" রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, কিন্তু ইংরেজীর case বাক্যমধ্যে স্থানগত ও অবস্থাগত।" কাজেই ইংরেজীতে—Ram's book বলিলে Ram's Possessive বা Genitive Case হইলে সংস্কৃতে রামস্য পুস্তকম্ এবং বাঙ্‌লায় 'রামের পুস্তক'—এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে 'রামস্য' এবং 'রামের' সম্বন্ধপদ।

"**ইন্দ্র**, হুঁকো কলকে রাখলি কোথায় ?"

"**কাঙালী**, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।"—শরৎচন্দ্র।

"তুমি সন্ন্যাসিনী কেন, **মা** ?"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"**ভাগিনা**, একী কথা শুনি !"—রবীন্দ্রনাথ।

উপবিলিখিত বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত স্থূলাক্ষর পদগুলির সহিত বাক্যস্থ ক্রিয়াপদ-সমূহের অন্বয় বা সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই। **ইন্দ্র, কাঙালী, মা, ভাগিনা**—ইহাদের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া সেই ব্যক্তির উদ্দেশে পরবর্তী বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে। কাজেই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না থাকায় ইহারাও কারক হইতে পারে না; ইহারা সম্বোধন-সূচক পদমাত্র। **যে বিশেষ্যপদ দ্বারা বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্বোধিত হইয়া থাকে, তাহাকে সম্বোধনপদ বলে।** সম্বোধনপদ যে কারক নহে সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। পূর্বের আলোচনা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে—

ক্রিয়াপদের সহিত যে নামপদের অন্বয় বা সাক্ষাৎ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহাই কারক। সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকে না বলিয়া উহারা **কারক** নহে।

কারকের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষসম্পর্ক দ্বারা নামপদের [বিশেষ্য ও সর্বনামের] কারকত্ব নির্ণীত হয়—ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ হইলেও সর্বত্র একরূপ নহে। পূর্ব-অধ্যায়ে উল্লেখিত বাক্যগুলি হইতেই ক্রিয়া সম্পর্কের বিভিন্নতা বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) **রাম** খায—কে খায় ? **রাম**। 'খায' অর্থাৎ 'খাওয়া' রূপ ক্রিয়াটির 'সম্পাদক' **রাম**।

(২) **ভাত** খায়—**কী** খায় ? **ভাত**. 'খায়' অর্থাৎ 'ভাত' রূপ পদার্থ 'খাওয়া' রূপ ক্রিযাদ্বারা আক্রান্ত।

(৩) রাম **চামচ দিয়া** খায়—**কী দিয়া** খায় ? **চামচ দিয়া**। 'খায়' অর্থাৎ 'খাওয়া'-রূপ ক্রিয়ার সম্পাদনব্যাপারে সর্বাধিক সহাযতা হইতেছে **চামচ দিয়া**।

(৫) রাম **থালা হইতে** ভাত খায়—**কোথা হইতে** খায়? **থালা হইতে।** 'খায়' অর্থাৎ 'খাওয়া'-রূপ ক্রিয়াটির সম্পাদনের জন্য ক্রিয়াক্রান্ত বস্তুটির **থালা হইতে** বিশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

(৬) রাম রান্নাঘরের **বারান্দায়** ভাত খায়—**কোথায়** খায়? **বারান্দায়** 'খায়' অর্থাৎ 'খাওয়া' রূপ ক্রিয়া একটি বিশেষ স্থান **বারান্দায়** সম্পাদিত হয়।

(৪) রাম **ভিখারীটিকে** ভাত দেয়—**কাহাকে** 'দেয়'? **ভিখারীটিকে।** দান'-ক্রিয়া **ভিখারীটিকে** অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয় অর্থাৎ সম্পাদক 'রাম'-এর ক্রিয়া-সম্পাদনদ্বারা ক্রিয়াক্রান্ত 'ভাত'-এ তাহার স্বত্ব পরিত্যক্ত হইতেছে এবং 'ভিখারীটির' স্বত্ব উৎপাদিত হইতেছে।

৬টি বাক্যের ক্রিয়াপদের নিকট যথাক্রমে **কে, কী, কী দিয়া, কোথা হইতে, কোথায়** এবং **কাহাকে** প্রশ্ন করিয়া ৬টি স্বতন্ত্র উত্তর পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ বাক্যটির ক্রিয়াপদের সহিত উত্তররূপে প্রাপ্ত বিশেষ্য পদগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হইতেছে এবং সম্পর্কের প্রভেদও বুঝা যাইতেছে। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হেতু উহাদের প্রত্যেকটি বিশেষ্য পদই **কারক** এবং প্রদর্শিত ৬টি বিভিন্ন উপায়ে এই অন্বয় সাধিত হয় বলিয়া **কারক ছয়** ভাগে বিভক্ত—**কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান অধিকরণ** ও **সম্প্রদান।**

ক্রিয়ার **সম্পাদক**	....	**কর্তৃ** কারক [সংক্ষেপে **কর্তা**]।
ক্রিয়ার দ্বারা **আক্রান্ত**	....	**কর্ম** কারক।
ক্রিয়ার **উপাদান**	....	**করণ** কারক।
ক্রিয়া সম্পাদক বা ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থের **যাহা হইতে বিশ্লেষ**	....	**অপাদান** কারক।
ক্রিয়ার **আধার**	....	**অধিকরণ** কারক।
ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থে সম্পাদকের **স্বত্ব**-বিলোপ পূর্বক **যাহার স্বত্ব সমুৎপাদিত হয়**	....	**সম্প্রদান** কারক।

সহজে **কারকের স্বরূপ** বুঝিবার ও মনে রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি তরুণ শিক্ষার্থিগণের সহায়ক হইতে পারে :—

যে করে সে **কর্তা** ; আর যা' করে তা' **কর্ম** ।
ক্রিয়াকে সাহায্য করা ***করণেরই** ধর্ম ।
বিশ্লেষ, উৎপত্তি, ভয়, ত্রাণ যাহা হ'তে,
***অপাদান** কারক সে ব্যাকরণ মতে ।
যে স্থানে, যে বিষয়ে, অথবা যে কালে,
ক্রিয়ার নিষ্পত্তি, তায় ***অধিকরণ** বলে ।
দান ক্রিয়া যে জনের স্বত্বোৎপত্তি করে,
সে কারকে ব্যাকরণ ***সম্প্রদান** ধরে ।

*রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সংস্কৃত ব্যাকরণের ছয়টি কারক বাঙ্‌লায় রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"...বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক প্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক :—কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তি-চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিয়া দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই।" অধ্যাপক সুনীতি কুমার তাঁহার ব্যাকরে ছয়টি কারকের আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কারক-বিভাগে যেন তাঁহার সম্মতি নাই। ণ রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমতকে তিনি "অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও সারগর্ভ" বলিয়াছেন। বসন্তকুমার তাঁহার 'সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ' এ রামেন্দ্রসুন্দরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কারককে নস্যাৎ করিয়াছেন—"বাঙ্‌লা বাক্যের গঠন প্রণালীতে কারকের চিন্তা না করিলেও চলে।... ... বাঙ্গালায় কারক অপেক্ষা বিভক্তিরই প্রাধান্য...বিভক্তির চিন্তা অপরিহার্য।" অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ইহার আলোচনায় বলিয়াছেন—'আমরা ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করি।...আগে কারকবোধ পরে বিভক্তি বোধ।" আমাদের নিকট উভয় মতই চরমপন্থীর মত বলিয়া মনে হয়। "টিপ্‌" করিয়া "তাল পড়িল" না "তাল পড়িয়া টিপ্‌ করিল ?" কারকবোধ আগে না বিভক্তিবোধ আগে ? এমন প্রশ্ন না তোলাই ভাল। আমাদের বিবেচনায় কারক ও বিভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাই ব্যাকরণে উহাদের স্থানও আছে। বিভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইবে।

বিভক্তি

বিভক্তির সংজ্ঞা এবং উহার প্রকারভেদ অর্থাৎ শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তির কথা পদপ্রকরণ-১ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। **কারকের** প্রসঙ্গে **শব্দবিভক্তিই** আমাদের আলোচ্য। সুতরাং এই প্রকরণে **বিভক্তি** বলিতে **শব্দবিভক্তিকেই** বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ-বিভক্তি-বচন দ্বারা বিশেষণের লিঙ্গ-বিভক্তি-বচন নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঙ্‌লায় তদ্রূপ নহে। লিঙ্গ ও বচনের কথাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃতে বিশেষণ পদে বিশেষ্যের বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্‌লায় নামপদেই **বিভক্তি** যুক্ত হয়। বিশেষণ কি তবে নির্বিভক্তিক ? এ বিষয় পরে আলোচ্য।

সংস্কৃতে—যদ্দ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মে তাহাই **বিভক্তি**,* অবশ্য সর্বত্র সংখ্যার বোধ জন্মাইলেও ক্ষেত্রবিশেষে **অ-কারকত্বের** বোধও বিভক্তি দ্বারা উৎপাদিত হয়। এজন্য সংস্কৃতে সুনির্দিষ্ট বিভক্তি-চিহ্ন রহিয়াছে। **৬টি** কারকের নিজস্ব বিভক্তি **৬টি** এবং **সম্বন্ধ** পদের জন্য **১টি**—এই **৭টি** বিভক্তি। উহাদের নাম **প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী,** ও **সপ্তমী**।

কারক		নিজস্ব বিভক্তি	কারক		নিজস্ব বিভক্তি
কর্তা	...	১মা	সম্প্রদান	....	৪র্থী
কর্ম	....	২য়া	অপাদান	....	৫মী
করণ	....	৩য়া	অধিকরণ	....	৭মী

এবং সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী

সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই বাঙ্‌লা ব্যাকরণে **কারক** ও **বিভক্তি** পারিভাষিক শব্দদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্‌লা বিভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিভক্তিবিহীন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। **শব্দ** বিভক্তিযুক্ত হইলে **পদ** হয় এবং এই **পদেরই** কেবল বাক্য-মধ্যে প্রবেশাধিকার।

উপরের সূত্রটি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ক্রিয়াপদ এবং ধাতু-বিভক্তির কথা এখন ছাড়িয়া দিলাম। বাক্য মধ্যে প্রযুক্ত অন্যান্য পদ [বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়] এবং তাহাদের বিভক্তির কথা ধরা যাউক।

---

* সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তি।

‡ সম্বন্ধপদে (কারকে নহে) ষষ্ঠী বিভক্তি।

"সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র।

এই বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ ব্যতীত আর ৫টি পদ আছে ; যথা—

সেই—সর্বনাম-জাত **বিশেষণ পদ।**

ললিতগিরি – বিশেষ্য পদ, কর্তৃকারক।

আমার—সর্বনাম, সম্বন্ধপদ।

চিরকাল—বিশেষ্যপদ, ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয়, ব্যাপ্তিবোধক।

মনে—বিশেষ্যপদ, অধিকরণ কারক।

'সেই', 'ললিতগিরি', 'আমার', 'চিরকাল' এবং 'মনে' বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং বৈয়াকরণ প্রদত্ত পদের সংজ্ঞানুসারে ইহারা যে পদ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উহারা বিভক্তিযুক্ত। বিভক্তির চিহ্ন না থাকিতে পারে, কেন না

১ "শব্দ বা ধাতুতে বিভক্তি যুক্ত হইলে, তাহা হয় 'পদ' এবং তখন তাহা বাক্যে ব্যবহার করা চলে। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি কথাকে বলে 'পদ'।—সুনীতি কুমার

"বিভক্তি যুক্ত শব্দ বা ধাতুকে পদ বলে,"—ডা সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত।

"শব্দ বা প্রাতিপাদিকের উত্তর বিভক্তি যুক্ত হইলে তাহাকে বলা হয় নামপদ।" ধাতুকে বিভক্তিযুক্ত করিলে যে পদের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম ক্রিয়াপদ।"—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী।

বিভক্তি-চিহ্ন বাপারে ব্যাঙ্‌লা সত্যই দরিদ্র। কিন্তু কোন **পদকে নির্বিভক্তিক বলা চলিবে না। বিশেষণ পদ** এবং **অব্যয় পদ** বিভক্তিযুক্ত।

পূর্বোক্ত বাক্যে **ললিতগিরি** কর্তৃপদ। কর্তার নিজস্ব বিভক্তি **প্রথমা** ; সুতরাং কোন বিভক্তি চিহ্ন না থাকিলেও এখানে 'ললিতগিরি' **প্রথমা** বিভক্তি যুক্ত বুঝিতে হইবে ; উহার সর্বনামজাত বিশেষণ 'সেই'-পদেও **প্রথমা** বিভক্তিই রহিয়াছে। 'আমার'-পদে সম্বন্ধ বুঝাইতে **ষষ্ঠী** বিভক্তি এবং উহার চিহ্ন **'র'** রহিযাছে। 'চিরকাল' পদে ব্যাপ্তি-অর্থে **দ্বিতীয়া** বিভক্তি যুক্ত হওয়ায উহা ক্রিয়াবিশেষণের কাজ করিতেছে। এখানেও বিভক্তির চিহ্ন নাই। 'মনে'-পদে অধিকরণ কারকের নিজস্ব বিভক্তি **সপ্তমী** এবং তাহার চিহ্ন **'এ'** যুক্ত হইয়াছে।

বিভক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন ঘটিল। এইবার উহার সংজ্ঞা ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। সংস্কৃতে ব্যাকরণে প্রদত্ত বিভক্তির সংজ্ঞা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বাঙলায় আমরা নির্বিবাদে বলিতে পারি—

যাহার একান্ত সহযোগিতায় **শব্দ পদে** পরিণত হয় বাঙ্‌লা ব্যাকরণে তাহাকে **বিভক্তি** বলে।

(ক) বিভক্তি চিহ্ন না থাকিলেও পদমাত্রেরই সহিত একটি না একটি বিভক্তি যুক্ত আছে বুঝিতে হইবে [যেমন, পূর্বে দর্শিত **সেই, ললিতগিরি, চিরকাল**]।

(খ) বাক্যের বাহিরেও পদ থাকিতে পারে ; যেমন, **রামের ভাই**। ক্রিয়াপদের অভাবে সম্পূর্ণ মনোভাবটি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া 'রামের ভাই' বাক্য নহে, **দুইটি** পদের সমষ্টি মাত্র। **রামের—ষষ্ঠীবিভক্তি**-যুক্ত এবং **ভাই—প্রথমান্ত** পদ। ক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বা **কারকত্বের** প্রশ্নই উঠে না ; ইহারা **অকারক পদ**। সুতরাং 'আগে কারকবোধ পরে বিভক্তিবোধ' বলিলে এক্ষেত্রে ভুল হইবে।

(গ) 'রামের ভাই আসিতেছে' একটি বাক্য। 'আসিতেছে' এই ক্রিয়াপদের সহিত 'ভাই এই কর্তৃপদের অন্বয়। এখানে আগে কারকবোধ ঘটিয়াছে। 'ভাই' কর্তৃকারক স্থির হইলে বিভক্তির চিহ্ন না থাকিলেও উহা প্রথমান্ত বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু 'রামের'—এই পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় নাই বলিয়া উহা কারকত্ব-বর্জিত, 'ভাই' কর্তৃকারকের সহিত উহার সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কাজেই নির্বিবাদে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে—

(/০) কারকপদে আগে * কারকবোধ পরে বিভক্তিবোধ এবং (৵০) অ-কারক পদে মাত্র বিভক্তিবোধ।

এখন বাঙ্‌লায় **শব্দবিভক্তি** কয়টি ও কী কী ? সংস্কৃত ব্যাকরণে ৬টি কারকের নিজস্ব বিভক্তি ৬টি এবং অকারক সম্বন্ধ পদের নিজস্ব বিভক্তি ১টি ; এই ৭টি বিভক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাঙ্‌লাতেও ৬টি কারকের কথা আলোচিত হইয়াছে। অতএব বাঙ্‌লাতে বিভক্তি ৭টিই হওয়া উচিত।

কিন্তু বাঙ্‌লায় বিভক্তিচিহ্ন কম এবং তাহাও সংস্কৃতের মত সুনির্দিষ্ট নহে। সেই জন্যই বৈয়াকরণগণের কারক-বিভক্তি লইয়া এত মতবিরোধ। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে 'এ' বিভক্তিচিহ্নটি বাঙ্‌লায় সকল কারকে শব্দ-বিভক্তিরূপে ত' ব্যবহৃত হয়ই, ধাতু-বিভক্তিরূপেও ব্যবহৃত হয়।

---

* কোন্ পদটি কারক এবং কোন্‌টি কারক কহে—এই জ্ঞানকে কারকবোধ ধরিলে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মতই সমর্থিত হয় অর্থাৎ আগে কারকবোধ, পরে বিভক্তিবোধ স্বীকার করিতে হয়।

"গ্রামে সবে একমনে পূজিয়ে দেবতাগণে
খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।"

—৺বিজয়চন্দ্র মজুমদারের
History of the Bengali Language গ্রন্থে উদ্ধৃত।

গ্রামে—অধিকরণ কারক, শব্দ-বিভক্তিচিহ্ন—'এ'
সবে - কর্তৃকারক, " "
একমনে—ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় " "
অকারক পদ
দেবতাগণে—কর্মকারক " "
খড়্গে – করণকারক " "
ছাগে—কর্মকারক " "
লোকহিতে—নিমিত্তবোধক পদ " "
পূজিয়ে—অসমাপিকা ক্রিয়া, ধাতু-বিভক্তিচিহ্ন—'এ'
কাটে—সমাপিকা " " "

অধিকরণ-কারকের নিজস্ব বিভক্তি সপ্তমী, কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া এবং নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অথচ উদ্ধৃত উদাহরণে সর্বত্র 'এ' বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। 'এ'কে কোন্ বিভক্তির চিহ্ন বলিব? এইখানেই সমস্যা। অধিকন্তু বিভক্তি ও বিভক্তির চিহ্ন—এই দুইটিকে এক করিয়া ফেলিয়া সমস্যাটিকে আরও ঘোরাল করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে সকল কারকেই 'এ' বিভক্তিচিহ্নটি যুক্ত হইয়া থাকে। তথাপি ইহাকে কোনও নির্দিষ্ট বিভক্তির চিহ্ন বলা সঙ্গত কিনা তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। সংস্কৃতে* একই বিভক্তিচিহ্ন দুই বা তিন বিভক্তিতে নির্দেশিত হইয়া আসিয়াছে; তস্ প্রত্যয় সকল বিভক্তিরই দ্যোতক।

বাঙ্‌লাতেও 'এ' কে সকল কারকবিভক্তির চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? তাই বলিয়া 'এ'-কে বিভক্তি বলিব না, উহা বিভক্তির চিহ্নমাত্র।

* ঔ—১মা ও ২য়ার দ্বিবচনে, ভ্যাম্—৩য়া, ৪র্থী, ৫মীর দ্বিবচনে, ভ্যস্—৪র্থী, ৫মীর বহুবচনে এবং ওস্—৬ষ্ঠী, ৭মীর দ্বিবচনে সর্বজনস্বীকৃত বিভক্তিচিহ্ন। সার্বাবভক্তিকস্তসিল্।

অনুসর্গ

যেখানে বিভক্তির চিহ্ন নাই সেখানে বিভক্তি দ্যোতনার জন্য অব্যয়স্থানীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেমন, **তৃতীয়া** বিভক্তি বুঝাইতে **দ্বারা, দিয়া,** শব্দের পরে যুক্ত বা পৃথক্ ভাবে বসিয়া থাকে; **পঞ্চমী** বিভক্তি বুঝাইতে **থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা** প্রভৃতিরও অনুরূপ প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার ইহাদিগকে **অনুসর্গ** বা **পরসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়** বলিয়াছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ দেখাইয়াছেন —[১]"**বাঙ্‌লায় কর্মপ্রবচনীয় নাই।**" এখানে আমরাও তাঁহার সহিত একমত। সংস্কৃতে 'অতি', 'অধি', 'অনু', 'অভি', 'উপ', 'পরি' ও **'প্রতি'** উপসর্গ কয়টি উপসর্গ না হইয়া বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহাদের সহিত সম্পর্কিত শব্দে **দ্বিতীয়া** বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই উহারা **কর্ম প্রবচনীয়** আখ্যা পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র **প্রতি** উপসর্গ না হইয়া বিশেষার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন— **দেশের প্রতি** ভালবাসা, **সন্তানের প্রতি** স্নেহ, "**হরপ্রতি** প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী", ইত্যাদি। এই **'প্রতি' কর্মপ্রবচনীয়** নহে, **অনুসর্গও** নহে; ইহা আধার, উদ্দেশ, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত অব্যয়মাত্র। [২]ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় **অথবা** ইহা উত্তরপদ রূপে থাকিয়া সমস্তপদ গঠন করে।

অনুসর্গের কথা উল্লেখিত হইয়াছে; কিন্তু **অনুসর্গ** কাহাকে বলে?

যে অব্যয় কোনও প্রাতিপাদিকের 'অনু' অর্থাৎ পরে বসিয়া বিভক্তির অর্থদ্যোতনা দ্বারা উক্ত প্রাতিপাদিকের পদত্ব সৃষ্টি করে [সর্গ], তাহাকে অনুসর্গ বলে।

এখান থেকে চলে যাও। **ইহা অপেক্ষা** মরণ ভাল। "**ফুলদল দিয়া** কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"—মধুসূদন। **এখান থেকে, ইহা অপেক্ষা, ফুলদল দিয়া**—পদ তিনটিতে 'থেকে', 'অপেক্ষা' ও 'দিয়া' যথাক্রমে **পঞ্চমী, পঞ্চমী** ও

---

১ 'কর্মপ্রবচনীয় কথাটির অর্থ অতীব জটিল, ন্যায়ের বহু কূটতর্ক ইহার সহিত জড়িত।... ...এ অরণ্যে প্রবেশ আমাদের অর্থাৎ বাঙ্‌লা বৈয়াকরণদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।"—অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

২ প্রতি' এবং উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদ মিলিয়া নাম-বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ বা পদ গঠন করে।

তৃতীয়ার বোধ জাগাইয়া দিতেছে; অতএব উহারা **অনুসর্গ**। **অনুসর্গ** প্রাতিপদিকের সহিত **বিযুক্তভাবে** ও বসিতে পারে; যেমন—"**ইহার চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুইন।"—রবীন্দ্রনাথ। তখন বাহ্যতঃ প্রাতিপদিকে ষষ্ঠীর চিহ্ন দেখা গেলেও অনুসর্গ সহযোগেই উহার পদত্ব নির্ণীত হইবে; যেমন—'**ইহার চেয়ে**' **একটি পঞ্চমীবিভক্তি-যুক্ত পদ**। '**তোমাকে দিয়া** আমার চলিবে না' বাক্যে '**তোমাকে দিয়া**' একত্র **তৃতীয়ান্ত একটি পদ**।

অব্যয় ও অনুসর্গ

অনুসর্গমাত্রই অব্যয়—অনুসর্গের স্বরূপ—বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার বলিয়াছেন—"বাঙ্‌লাতে অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তির পরিবর্তে বিশেষ কতকগুলি অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসিয়া 'বিভক্তির কাজ চালায়'; এইরূপ ক্ষেত্রে এই জাতীয় অব্যয়কে, আধুনিক বাঙ্‌লা ব্যাকরণে, বলা হয় **অনুসর্গ** (বা **পরসর্গ**)।" কিন্তু অনুসর্গের প্রয়োগ ব্যাপারে তিনি * রামেন্দ্রসুন্দরকে সমর্থন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত ও উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাদের কতকগুলির যৌক্তিকতা অবশ্যই বিচারসাপেক্ষ।

প্রথমতঃ পঞ্চমীবিভক্তি-বোধক "হইতে" 'হ'-ধাতু জাত **অসমাপিকা ক্রিয়া** নহে; **অব্যয়** বা **অনুসর্গও** নহে; ইহা পঞ্চমীবিভক্তিরই চিহ্ন। সংস্কৃতে পঞ্চমীর বহুবচনে বিভক্তিচিহ্ন **ভ্যস্**; তাহা হইতে প্রাকৃতে **হিংতো, সুংতো**; প্রাচীন বাঙ্‌লায় **হন্তে**, হন্তেঁ, এবং বর্তমান বাঙ্‌লায় **হইতে, হ'তে,**—রূপ-বিবর্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত বহুবচনের বিভক্তিচিহ্ন হইতে বাঙ্‌লা একবচনের বিভক্তিচিহ্নের উদ্ভব যাঁহারা মানিতে চাহেন না তাহাদিগকে অধ্যাপক শ্যামাপদর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই বলিতেছি—"অস্মদ্ শব্দের **তৃতীয়া বহুবচনরূপ** 'অম্হেহি' হইতে যদি বাঙ্‌লা **প্রথমা একবচন** 'আমি' ভূমিষ্ঠ

* "উহারা [অনুসর্গগুলি] স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ, 'দ্বারা' পদটি সংস্কৃত হইতে অবিকল আসিয়াছে, অন্তগুলা [হইতে<হ তে, থাকিয়া<থেকে, ইত্যাদি] হয়ত অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সংকীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজীতে Preposition যেমন Objective case এর পূর্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপ বাঙ্‌লা পদের পরে বসিয়া পূর্ববর্তী পদকে শাসন করে বা পদের সহিত অন্বিত হয়।"—রামেন্দ্রসুন্দর।

ইহতে পারে," তাহা হইলে **পঞ্চমী** বহুবচনরূপ 'অস্মভ্যম্' হইতে **পঞ্চমী** একবচন 'আমাহতে' "কি অপরাধ করিল ?—সে তো আপন ঘরেই (পঞ্চমীতে) রহিয়াছে, এমন ঘরথেকে ঘরান্তরে তো দৌড়-ঝাঁপ করে নাই।"

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল অব্যয় নামপদের পরে বসে, কিন্তু বিভক্তির কাজ চালায় না তাহাদিগকে **অব্যয়ই বলিব, অনুসর্গ বলিতে পারি না। লাগিয়া (লাগি), কারণ, জন্য, নিমিত্ত, হেতু, ছাড়া, বিনা, বই, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, সনে, সঙ্গে, সাথে, মতো, মতন, নামে, বলিয়া** (ব'লে)—ইহারা বিভক্তির কাজ চালায় না। "কোন্ সুখে **মোর সনে** হইবে ব্যাধিনী," "**মাটিয়া-পাথর বিনা** না আছে সম্বল"—মুকুন্দরাম। "**শশক-বৃন্দের মত**—দৈত্য অস্ত্রাঘাতে"—হেমচন্দ্র। "**তাদের সবার সাথে** আছে মোর এইমাত্র যোগ", "সে কবির **বাণী লাগি** কান পেতে আছি"—রবীন্দ্রনাথ। "**পরের কারণে** স্বার্থ দিয়া বলি", "সকলের তরে সকলে আমরা"—কামিনী রায়।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে যে, **দ্বারা, দিয়া, থেকে, চেয়ে,** প্রভৃতি নামপদের সহিত যুক্তভাবে যেমন বিভক্তিবোধ জাগ্রত করে, এখানকার অব্যয়-গুলি তেমন পারে না। ইহাদের ব্যবহারে ইহাদের পূর্বস্থিত নামপদে **ষষ্ঠী** বা **প্রথমা** বিভক্তি হয় কিন্তু ইহারা স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। আবার এই **ষষ্ঠী** বা **প্রথমা** এবং কখনও কখনও বা **দ্বিতীয়া** বিভক্তি নামপদকে কারকে পরিণত করে না। এইরূপ বিভক্তিকে **উপপদ বিভক্তি** বলা হয়।

বিশেষ বিশেষ শব্দের যোগে নামপদে যে বিভক্তি হয় তাহাকে উপপদ বিভক্তি বলে। "**মোর সনে**"—এখানে '**মোর**'-পদে 'সনে'-যোগে **ষষ্ঠী**। "**বাণী** লাগি"—এখানে **বাণী** পদে 'লাগি'-যোগে **প্রথমা**। **তোমাকে** ধিক্—এখানে 'ধিক্'-যোগে **তোমাকে** পদে দ্বিতীযা হইয়াছে। এই **ষষ্ঠী, প্রথমা** ও **দ্বিতীয়া** এখানে **উপপদবিভক্তি** এবং **'সনে', 'লাগি', 'ধিক্'**, প্রভৃতি **অব্যয়। অনুসর্গ নহে।**

তৃতীয়তঃ, **উপর, নীচ, নিকট, কাছ, পাশ, ভিতর, মধ্য, মাঝ,** প্রভৃতি **বিশেষ্যশব্দ, অব্যয়** নহে। ইহাদের সহিত **বিভক্তিচিহ্ন** বা **অনুসর্গ** যোগ করিলে তবে ইহারা পদে পরিণত হয়। কাজেই ইহারা **অনুসর্গ হইতে পারে না।**

" 'পর্বতের' **উপর হইতে** পৃথিবীর দৃশ্য অতি রমণীয় মনে হয়।" " 'তাহাদের' **মধ্য হইতে** একজন বলিয়া উঠিল।" " 'আমার' **কাছথেকে** সরে দাঁড়াও।" " 'আপনার' **নিকটে** বা **নিকট হইতে** এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই।" " 'বাড়ীর' **পাশ দিয়া** নদীটা বহিয়া গিয়াছে।"—উল্লেখিত বাক্যগুলিতে 'পর্বতের', 'তাহদের', 'আমার', 'আপনার', 'বাড়ীর', পদসমূহে **সম্বন্ধে** ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; **উপর হইতে, কাছথেকে, নিকটে** বা **নিকট হইতে**—অপাদান-কারকে পঞ্চমী বিভক্তি এবং **পাশদিয়া**—**স্বভাবতঃ** তৃতীয়া [প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ]। ইহারা যে অনুসর্গ নহে তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না।

সিদ্ধান্ত :

(ক) বাঙ্‌লাতে কারক ৬টি এবং বিভক্তি ৭টি। সম্বন্ধপদ এবং সম্বোধনপদ কারক নহে। বাঙ্‌লায় বিভক্তি ৭টি হইলেও বিভক্তিচিহ্ন খুবই কম। তাই অনুসর্গদ্বারা "বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়"।

(খ) নিম্নে বিভক্তিচিহ্নের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল—

বিভক্তি	চিহ্ন
প্রথমা	'×', 'এ', 'তে (এতে)'
দ্বিতীয়া	'কে', 'রে (এরে)', 'এ'
তৃতীয়া	×, 'এ', 'তে (এতে)'
চতুর্থী	'কে', 'রে (এরে)', 'এ'
পঞ্চমী	হইতে, 'এ', 'তে (এতে)'
ষষ্ঠী	'র (এর)'
সপ্তমী	'এ', 'তে (এতে)'।

(গ) দেখা যাইতেছে যে **'এ'** চিহ্নটি ষষ্ঠী ব্যতীত আর সকল বিভক্তিতেই প্রযুক্ত হয়। **সুতরাং উহাকে সপ্তমীর স্বকীয় সম্পত্তি বলিবার সার্থকতা নাই।** **'তে (এতে)'**—প্রথমা, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এখানেও অর্থদ্বারা কারক-বিভক্তি নির্দেশিত হইবে।

"**বাঘে** বা **বাঘেতে** খাইলেও খাইবে, **সাপে** বা **সাপেতে** খাইলেও খাইবে।" উদাহরণটিতে **'এ'** ও **'তে'**-যুক্ত পদগুলি **কর্তৃকারকের** পদ। **কর্তার** নিজস্ব বিভক্তি **প্রথমা**। সুতরাং উহাদের ব্যাকরণগত টীকায় লিখিতে হইবে—**কর্তায় প্রথমা**, **বিভক্তিচিহ্ন—'এ'**। 'কর্তৃক'-যোগে তৃতীয়া বিভক্তির বোধ জন্মিলেও উহা বিভক্তি-চিহ্ন নহে, অনুসর্গও নহে। 'কেহ কর্তা যাহার' এই অর্থে পূর্বপদের সহিত **বহুব্রীহি** সমাসে 'কর্তৃ' শব্দের সহিত সমাসান্ত 'ক(প)' যুক্ত হইয়া থাকে।

(ঘ) বাঙ্‌লায় একমাত্র **'রা (এরা)'**-কেই প্রথমার **বহুবচনের** বিভক্তিচিহ্ন **বলা** যায়। তাহা ছাড়া **বহুবচনের** জন্য আর স্বতন্ত্র বিভক্তিচিহ্ন নাই। **বহুবচনান্ত শব্দের সহিত একবচনের বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত করিয়াই বহুবচনের বিভক্তির কার্য সম্পন্ন হয়।** **বহুবচন**-জ্ঞাপনের উপায়গুলি **বচন**-অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

(ঙ) যে সকল অব্যয় দ্বারা স্পষ্টরূপে বিভক্তির বোধ জন্মিবে এবং যাহাতে আবার কোনও বিভক্তিচিহ্ন বা অনুসর্গ যুক্ত হইবে না তাহাকেই **অনুসর্গ** বলিব ; যেমন—**দ্বারা, দিয়া, জন্য, তরে, চেয়ে, থেকে, অপেক্ষা,** ইত্যাদি।

(চ) বাঙ্‌লায় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের রূপনির্দেশ করিতে বলা উচিত নহে ; কারণ যেমন বিভিন্ন কারক-বিভক্তিতে উহাদের একরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে তেমনি আবার নানা অনুসর্গের যোগে একই কারক-বিভক্তিতে নানারূপ প্রযুক্ত হয়। নিম্নে নমুনা দেখান হইল :—

বিশেষ্য—দেব শব্দ

	একবচন	**বহুবচন**
১মা	দেব, দেবে, দেবেতে	দেবেরা, দেব-গণ, -বৃন্দ, -কুল, -বর্গ, -সমূহ, -নিকর, ইত্যাদি।
২য়া	দেবকে, দেবেরে, দেবে	-গণ, -বৃন্দ, প্রভৃতির সহিত সমাস-
৩য়া	দেবদ্বারা, দেবের দ্বারা, দেবকে দিয়া, দেবে, দেবেতে	বদ্ধ বহুবচনাত্মক প্রথমার রূপ-গুলির সহিত একবচনের

৪র্থী	২য়ার মত	বিভক্তিচিহ্ন বা অনুসর্গ যোগ করিলেই বহুবচনের অন্যান্য বিভক্তির রূপ পাওয়া যাইবে।
৫মী	দেব হইতে, দেবের চেযে, দেবের চাইতে, দেব থেকে, দেব অপেক্ষা, দেবে, দেবেতে	
৬ষ্ঠী	দেবের	
৭মী	দেবে, দেবেতে	

সর্বনাম—আমি শব্দ

	একবচন	বহুবচন
১মা	আমি, মুই	আমরা, মোরা, আমা সব (+'এ'), মো সব(+'এ'।
২য়া	আমাকে, আমাবে, আমায, মোকে. মোরে, মোয়(মোএ)	আমাদিগকে, আমাদিগেরে, আমাদের, মোদের, মোদেবকে, আমাদেরকে, আমা সবে, মোসবে।
৩য়া	আমা(র) দ্বারা, আমাকে দিয়া, আমাকর্তৃক, মোর দ্বারা, মোকে বা মোর দিয়া, আমায় দিয়া	আমাদিগের বা আমাদের দ্বারা, আমাদিগকর্তৃক মোদের দ্বারা বা দিয়া, মোদেরকে দিয়া।
৪র্থী	২য়ার মত	
৫মী	আমা হইতে, আমার চেযে, আমার থেকে, আমার চাইতে, আমা অপেক্ষা, আমাতে, আমায়, মোর চেযে বা থেকে, মোয়	আমাদিগ হইতে, আমাদিগের বা আমাদের চেয়ে, আমাদের থেকে, বা অপেক্ষা বা চাইতে, আমাদিগে, মোদের থেকে বা চেয়ে।
৬ষ্ঠী	আমার, মোর	আমাদিগের, আমাদের, মোদের।
৭মী	আমাতে, আমায়, মো'তে, মোয	আমাদিগেতে।

(ছ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া অধ্যাপক সুনীতিকুমার বলিয়াছেন—**"শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না"**। এখানে **বিভক্তি-চিহ্ন** অর্থে **বিভক্তি** কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। **'রামকে'** পদে **'কে'** বিভক্তি নহে,

বিভক্তির চিহ্নমাত্র; বিভক্তিটি হইল দ্বিতীয়া। সুতরাং **'রামকে ডাক'** বাক্যে **রামকে**—'কর্মে কে-বিভক্তি' অথবা **'গরুতে** ঘাস খায়' বাক্যে **গরুতে—কর্তায়** **তে**-বিভক্তি বলিলে ভুল হইবে। **বলিতে হইবে**:—'রামকে'—**কর্মে দ্বিতীয়া, বিভক্তি চিহ্ন—'কে'**; 'গরুতে'—**কর্তায় প্রথমা, বিভক্তি-চিহ্ন—'তে'।**

(জ) যে সকল শব্দ বিভক্তি-চিহ্নযুক্ত হইয়া **স্বতন্ত্র পদে** পরিণত হয় তাহারা **অনুসর্গ হইতে পারে না। 'কবিগণের মধ্যে** কালিদাস শ্রেষ্ঠ'—এই বাক্যে **'কবিগণের মধ্যে'** কি একটি পদ? কখনই নহে। **কবিগণের**—সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং **মধ্যে**=নির্ধারণে সপ্তমী [বা অধিকরণে ৭মী বলিলেও দূষণীয় হইবে না, কেন না, 'হ'ন' এই উহ্য ক্রিয়ার আধার 'মধ্য']। 'কবিগণমধ্যে'-র সমাস বিশ্লেষণ করিলে উক্তিটি আরও পরিস্ফুট হইবে। কবির গণ, ষষ্ঠীতৎ পুরুষ; তাহার মধ্য ষষ্ঠীতৎ পুরুষ; তাহাতে। অতএব **কবিগণের মধ্যে** একযোগে একপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। **'উহাদের মধ্য হইতে** একজনকে ডাক।' এইবাক্যে **উহাদের**—সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং **মধ্য হইতে** অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে—**একপদ নহে।**

কর্তৃকারক ও তাহার বিভক্তি নির্ণয়

কর্তা, কর্তৃপদ বা কর্তৃকারক

ক্রিয়ার সম্পাদককে তাহার কর্তা বলে। ক্রিয়ার সহিত **কর্তার** অন্বয় বাক্যমধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাই **কর্তাই** সর্বপ্রধান **কারক।** যে পদে এই **কর্তৃত্ব** অধিষ্ঠিত হয় তাহাকে **কর্তৃপদ** বলে:

(ক) **রাম** যাইতেছে।

(খ) **তোমরা** ব্যাকরণ পড়।

—বাক্য দুইটিতে 'যাওয়া' ও 'পড়া' ক্রিয়ার কর্তৃত্ব যথাক্রমে **'রাম'** এই বিশেষ্য পদ ও **'তোমরা'** এই সর্বনাম পদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং (ক)-তে **রাম** এবং (খ)-তে **তোমরা** কর্তৃপদ। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় বর্তমান তাহাই কারক। কর্তা ও ক্রিয়ার অন্বয়ই মুখ্য অন্বয়। অতএব **কর্তৃপদই কর্তৃকারক।** অনেক সময় সম্পূর্ণ মনোভাবপ্রকাশে কেবল **কর্তা** ও **ক্রিয়াই** যথেষ্ট; অন্যান্য কারকের প্রয়োজন

হয় না। (ক)-বাক্যে কেবল **কর্তৃকারক** ও **ক্রিয়ার** দ্বারাই বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধারণতঃ **ক্রিয়ার** নিকট **'কে?'** প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাই উক্ত **ক্রিয়ার** কর্তা হইয়া থাকে। '**রামানন্দ** পেলেন গুরুর পদ।'—রবীন্দ্রনাথ।

প্রশ্ন : কে পেলেন?

উত্তর : **রামানন্দ**। **রামানন্দ** এখানে **কর্তৃকারক**।

কর্তার প্রকারভেদ

(১) **উক্তকর্তা**—সাধারণ ও সরল বচনভঙ্গীতে ক্রিয়াসম্পাদক কর্তার কথাই প্রধান ভাবে বলা হইয়া থাকে; সেইজন্য এইরূপ কর্তাকে **উক্ত কর্তা** বলে। যথা—'**সে** আসিছে আজ কাল-বৈশাখে'—মোহিতলাল। '**বায়ু** বহে পুনঃ মৃদু উচ্ছ্বাসে'—ঐ। '**আমরা** হেলায় নাগেরে খেলাই'—সত্যেন্দ্রনাথ।

(২) **উহ্য কর্তা**—পূর্বে উল্লেখিত উক্ত কর্তা **মধ্যম পুরুষের** হইলে প্রায়শঃ অপ্রযুক্ত থাকে। অনুজ্ঞায় বিশেষতঃ সম্বোধনপদ পূর্বে থাকিলে কর্তৃপদের প্রয়োজনই অনুভূত হয় না; যথা—'অতএব দয়া করি কহো [**তুমি**], দয়াবতি'—নবীনচন্দ্র। 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে [**তুমি**] জাগো রে ধীরে'—রবীন্দ্রনাথ। 'হে রুদ্র বীণা, [**তুমি**] বাজো বাজো বাজো,'—ঐ। 'ভ্যালারে নন্দ, [**তুই**] বেঁচে থাক্ চিরকাল'—দ্বিজেন্দ্রলাল।

কখনও কখনও **উত্তম পুরুষের** কর্তাও অনুল্লেখিত থাকে। যথা—'ঠাকুর, [**আমি**] কী অপরাধ করেছি?'—রবীন্দ্রনাথ। 'দেউলে দেউলে [**আমি**] কাঁদিয়া ফিরিগো'—করুণানিধান। 'শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে [**আমরা**] চমকিয়া উঠি'—মোহিতলাল। 'হে সুন্দর, [**আমি**] তাকেই ডাকি'—বঙ্কিমচন্দ্র।

একটি বাক্যে **প্রথম পুরুষের** কর্তার ব্যবহারের পরে পরবর্তী বাক্যে উহার ব্যবহার না করিলেও চলে। যথা—'**সে** গান গাহিত, [**সে**] শাস্ত্র পড়িত না। [**সে**] লাফাইত, [সে] উড়িত, [সে] জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।'—রবীন্দ্রনাথ। 'মন্বন্তরে মরিনি, **আমরা**, [**আমরা**] মারী নিয়ে ঘর করি, [**আমরা**], বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে'—সত্যেন্দ্রনাথ।

[ ] বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত কর্তৃপদগুলি ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ উহাদের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে কোনও সন্দেহেরও অবকাশ নাই। এইরূপ কর্তা **উহ্য কর্তা**। **যে কর্তৃপদের উল্লেখ না থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না তাহাকে উহ্য কর্তা বলে।**

(৩) **অনুক্ত কর্তা**—আমরা সর্বদা সহজ সরল ভাবে বাক্যের ব্যবহার করি না, কর্মপদের উপর প্রাধান্য ন্যস্ত করিবার জন্য তির্যক্ বচনভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করি। কর্তৃপদের কথা তখন আর প্রধানরূপে কথিত বা **উক্ত হয় না**। **কর্মবাচ্য** ও **ভাববাচ্য** এই তির্যক্ বচন ভঙ্গী। এই দুই বাচ্যের কর্তাই **অনুক্ত কর্তা**। যথা—**রামকর্তৃক** রাবণ হত হইল। '**তাহে** জঠর-অনল নাহি হবে নির্বাপিত';—নবীনচন্দ্র। 'সারাদিন **তাঁর** কাটে জপে তপে',—রবীন্দ্রনাথ। '**মানুষ-কোকিলে** তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়'—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪) **বহুক্রিয় কর্তা—এক বা একাধিক অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার একটিমাত্র কর্তা হইলে তাহাকে বহুক্রিয় কর্তা বলে।** যথা [**তুমি**] কু-উঃ "বলিয়া ডাকিয়া" মনের জ্বালা "নিবাইও"—বঙ্কিমচন্দ্র। [অস-ক্রি "বলিয়া ডাকিয়া" এবং স-ক্রি—"নিবাইও" ; ইহাদের একটিমাত্র কর্তা—তুমি (উহ্য)]। 'এদিকে **নবদ্বীপ** তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক "পরামর্শ করিয়া" মাকে "আসিয়া" বলিল'—রবীন্দ্রনাথ। [অস-ক্রি—"পরামর্শ করিয়া", "আসিয়া" এবং স-ক্রি—"বলিল"-এর কর্তা—**নবদ্বীপ**]। '[**আমি**] হেথায় "দাঁড়ায়ে" দুবাহু "বাড়ায়ে" "নমি" নরদেবতারে'—রবীন্দ্রনাথ। [অস-ক্রি—"দাঁড়ায়ে", "বাড়ায়ে" এবং স-ক্রি—"নমি" : **ইহাদের** একক কর্তা—**আমি** (উহ্য)]। '**সাহেব** "আসিয়া" গলাটি তাহার "টিপিয়া" "ধরিল" খালি।—দ্বিজেন্দ্রলাল। [অস-ক্রি—"আসিয়া", "টিপিয়া" এবং স-ক্রি—"ধরিল"-এর কর্তা **সাহেব**]।

(৫) **একক্রিয় কর্তৃপদসমূহ**—ভিন্নজাতীয় বিশেষ্য বা ভিন্ন পুরুষের সর্বনাম একযোগে বা স্বতন্ত্রভাবে একই ক্রিয়া সম্পাদন করিলে বাক্যে কর্তৃপদগুলির উল্লেখ করিয়া ক্রিয়াপদটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়। তখন উক্ত ক্রিয়াপদের **কর্তাগুলিকে একক্রিয়** বলা যাইতে পারে। যথা—'**গৌতমী,** এবং **শার্ঙ্গরব** ও **শারদ্বত**........ গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত **হইলেন**'—বিদ্যাসাগর। [এখানে 'হইলেন' ক্রিয়াটির তিনটি কর্তা—**গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত** একক্রিয়]। 'হেথায় **আর্য**, হেথা **অনার্য,**

হেথায় **দ্রাবিড় চীন—শক-হুন-দল, পাঠান, মোগল** একদেহে "হ'ল" লীন।'—রবীন্দ্রনাথ। [**আর্য** হইতে আরম্ভ করিয়া **মোগল** পর্যন্ত স্থূলাক্ষর ৭টি বিশেষ্য পদ **একক্রিয় কর্তা**। 'মানুষের কত **কীর্তি**, কত **নদী, গিরি, সিন্ধু, মরু**, কত না অজানা **জীব**, কত না অপরিচিত **তরু** "র'য়ে গেল" অগোচরে।'—রবীন্দ্রনাথ। [কীর্তি, নদী; গিরি, সিন্ধু, মরু, জীব, তরু—**একক্রিয় কর্তৃপদসমূহ**, ক্রিয়া—"র'যে গেল"]।

(৬) **সমধাতুজ কর্তা**—ক্রিয়াপদটি যে ধাতু হইতে উৎপন্ন সেই ধাতুজ বিশেষ্য উক্ত ক্রিয়ার কর্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইলে ঐ কর্তাকে **সমধাতুজ কর্তা** বলে। যথা—'**অঘটন** "ঘটেছে", গিরি',—উমাসঙ্গীত। [ঘট্-ধাতুজ ক্রিয়া "ঘটেছে"-র কর্তা **অঘটন**ও ঘট্-ধাতু হইতে উৎপন্ন]। তাহাতে কোন **ফল** "ফলিবে" না। [কর্তা **ফল** এবং ক্রিয়া "ফলিবে" উভয়ই ফল্-ধাতুজাত]। বড় **বাড়** "বেড়েছে", দেখছি। ['বাড্'-ধাতু হইতে প্রস্তুত "বেড়েছে" ক্রিয়াপদের কর্তা **বাড়** ও 'বাড্'-ধাতুজ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।]

(৭) **প্রযোজক কর্তা** ও **প্রযোজ্য কর্তা**—কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়ার প্রকৃত অনুষ্ঠাতা অপর কাহারও দ্বারা উক্ত ক্রিয়ার সম্পাদন ব্যাপারে প্রয়োজিত বা প্রবর্তিত হইয়া থাকেন। যেমন—**মা শিশুকে** চাঁদ 'দেখাইতেছেন'—এখানে 'দেখা'-ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে **'শিশু'** কিন্তু **'শিশু'**, স্বয়ং ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হয নাই, **'মা'**-দ্বারা উহাতে সে প্রবর্তিত বা প্রযোজিত হইয়াছে। তাই **'মা' প্রযোজক কর্তা** এবং **'শিশু' প্রযোজ্য কর্তা**। অতএব বলা যাইতে পারে—

যাহার প্রেরণা, প্রযোজনা বা প্রবর্তনায় অপর কাহারও দ্বারা কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

যে স্বয়ং ক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত না হইয়া অপর কাহারও দ্বারা উহাতে প্রেরিত, প্রবর্তিত বা প্রযোজিত হয় তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে; যথা—'**বঙ্কিম** বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের **সূর্যোদয়** বিকাশ করিলেন—রবীন্দ্রনাথ। ['বঙ্কিম' —**প্রযোজক** ও 'সূর্যোদয়'—**প্রযোজ্য** কর্তা]। '**তুমি আমায়** স্বর্গে উঠিয়েছো'—দ্বিজেন্দ্রলাল। ['তুমি'—**প্রযোজক** এবং 'আমায়'—**প্রযোজ্য** কর্তা]। 'নাচায় **পুতুল** যথা দক্ষ **বাজিকরে**, নাচাও তেমতি **তুমি** অর্বাচীন **নরে**'—নবীনচন্দ্র। [**প্রযোজক** কর্তা—'বাজিকরে' এবং 'তুমি' **প্রযোজ্য কর্তা**—'পুতুল' এবং 'নরে']। 'তাহাদ্বি ছায়ার

আমরা মিলাব জগতের **শতকোটি**—সত্যেন্দ্রনাথ। [আমরা—**প্রযোজক** কর্তা এবং 'শতকোটি'—প্রযোজ্য কর্তা]।

(৮) **কালাত্যয়ী কর্তা—চোর** "পালালে" বুদ্ধি বাড়ে—বাক্যটিতে "পালালে [পলাইলে]"—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা **চোর**। 'চোর পালালে'—এই বাক্যাংশ-দ্বারা 'কাল' বা সময়ের 'অত্যয়' অর্থাৎ গতি সূচিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে ***কালাত্যয়ী কর্তা** বলাই সঙ্গত।

(৯) **ব্যতীহারিক বা সমক্রিয় কর্তা—দুইটি কর্তৃপদের সহযোগিতায় বা সংঘর্ষে একটি মাত্র ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে কর্তৃপদদ্বয়কে একযোগে ব্যাতীহারিক বা সমক্রিয় কর্তা বলে ;** যথা—তাহার ভয়ে **বাঘে গরুতে** একঘাটে জল 'খাইত'। [**বাঘ** ও **গরুর** সহযোগিতায় 'খাওয়া'-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত]। '**খুড়ো ভাইপোতে** আজ এক থালেই 'খাবে' '—অবনীন্দ্রনাথ। [**খুড়ো** এবং **ভাইপো**-র সহযোগিতায় 'খাওয়া'-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে]। **বরদাসুন্দরী** এবং **নবদ্বীপচন্দ্র** পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে "গিয়া উপস্থিত হইল"—রবীন্দ্রনাথ। [**বরদা সুন্দরী** এবং **নবদ্বীপচন্দ্রের** সংঘর্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান ; অতএব উহারা ব্যাতীহারিক কর্তা]। '**রাজায় রাজায়** "যুদ্ধ করে", উলু খাগড়া প্রাণে মরে।' [এক **রাজার** সহিত অপর **রাজা**-র সংঘর্ষে ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয়]।

---

* সংস্কৃতে এইরূপ স্থলে অসমাপিকা ক্রিয়াটির পরিবর্তে কৃদন্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হয় এবং কর্তৃস্থানীয় বিশেষ্য বা সর্বনামে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়। ইহাকে ভাবে সপ্তমী বলে ; যথা—চৌরে পলায়িতে বুদ্ধিঃ বর্ধতে। ইংরেজীতেও এইরূপ ক্ষেত্রে Participial Adjective এর পূর্বে Nominative Absolute ব্যবহৃত হয়, যেমন—The thief running away, wit increases. কবিশেখর কালিদাস রায় ইহাকে নিরপেক্ষ কর্তা বলিয়াছেন। বোধ হয় সমাপিকা ক্রিয়া এই প্রকার কর্তার অপেক্ষা রাখেনা বলিয়াই ইংরেজী Nominative Absolute-এর অনুকরণে নিরপেক্ষ কর্তা পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ কর্তাকে নিরপেক্ষ বলিতে আপত্তি নাই, তবে কালাত্যয়-সূচক বলিয়া কালাত্যয়ী কর্তা সংজ্ঞাটি সমীচীন মনে হয়।]

কর্তৃকারকে বিভক্তি

(১) **কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা** বিভক্তি হইয়া থাকে। (৵০) বাঙ্‌লায় প্রায়শঃ প্রথমা **বিভক্তির** কোন **চিহ্ন থাকে না**; যথা—'তৃষ্ণায় আকুল **বঙ্গ** করিত রোদন'—মধুসূদন। 'কত ক্ষুদ্র **নর** লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়'—নবীনচন্দ্র। 'ভোরের **পাখি** উঠল ডেকে'—রবীন্দ্রনাথ। 'নন্দর **ভাই** কলেরায় মরে'—দ্বিজেন্দ্রলাল। 'আমাদের **সেনা** যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে'—সত্যেন্দ্রনাথ। 'সাত **মহারথী** শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি'—নজরুল। '**পুতুলগুলা**ও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে'—বঙ্কিমচন্দ্র।

(৶০) কখনও কখনও প্রথমা বিভক্তিতে **'এ'** যুক্ত হয়। প্রাচীন বাঙ্‌লায় কর্তৃকারকে সংজ্ঞাবাচক ও জাতিবাচক বিশেষ্যে **'এ'**-কার যুক্ত হইত; মধ্যযুগে **'এ', 'এতে'** উভয়ই প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। তেন্তলী **কুম্ভীরে** খাই; কানেট **চোরে** নিল;' '**কাহ্নে** গাই'—প্রাচীন বাঙ্‌লা, চর্যাপদ। 'কহে দ্বিজ **চণ্ডীদাস**'—চণ্ডীদাস। '**মূর্খে** রচিল গীত'—বিজয়গুপ্ত। '**বলরামদাসে** কয়'—বলরামদাস। '**গায়কেতে** গীত গায়'—কৃত্তিবাস। '**মূর্খেতে** বুঝিতে নারে'—মুকুন্দরাম। —মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা।

বর্তমান বাঙ্‌লাতেও নিম্নলিখিত স্থলে কর্তৃপদে **'এ'** যুক্ত হইয়া থাকে :—

(ক) **জাতিবাচক বিশেষ্যে**; যথা—**বলদে** লাঙ্গল টানে। 'তাকে **শিয়ালে** খাইয়াছে'—বঙ্কিমচন্দ্র। 'কত **লোকে** কতই বলে'—রামপ্রসাদ। 'কালো **গরুতে** ভালো দুধ দেয়।

(খ) **বহুত্ব-দ্যোতনায়**; যথা—'প্রফুল্লকে **দস্যুতে** লইয়া গিয়াছে'—বঙ্কিমচন্দ্র। এমন কাজও **মানুষে** করে। গাধায় [গাধাএ<গাধায়্ (য়-শ্রুতিতে) <গাধায়] বোঝা বয়।

(গ) **প্রবচন** বা **প্রবাদবাক্যে**; যথা—'**পাগলে** কী না বলে **ছাগলে** কী না খায়'। 'মায়ে বলে "পড়, পুতা"।' 'সাপের হাসি বেদেয় (বেদেএ<বেদেয়্‌এ (য়-শ্রুতিতে) <বেদেয়] চেনে'।

(ঘ) **অনির্দেশ্যতায়**; যথা—বারভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে। '**দশে** মিলি করি কাজ'।

(ঙ) **ব্যতীহার** বা **সহযোগিতা** বুঝাইলে; যথা—'এবার **মায়ে** [মাএ<মায়্‌এ য়-শ্রুতিতে) = মায়ে] **পোয়ে** [পোএ<পোয়্‌এ য়-শ্রুতি] = (পোয়ে) করব ঝগড়া'

—রামপ্রসাদ। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই করে। তোতে আমাতে খেয়ে নিই, আয়।

(চ) **প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া** ও **তৃতীয়া** হয়; যথা—মা **শিশুকে** চাঁদ দেখাইতেছেন। মা, **আমায়** [আমাএ<আমায়্‌এ (য়-শ্রুতি) <আমায়, ২য়াতেও 'এ' চিহ্ন রহিয়াছে] ঘুরাবি কত ? মা **মেয়েকে দিয়ে** বা **মেয়ের দ্বারা** জল তোলাচ্ছেন [৩য়া]।

(২) **কর্মবাচ্যে** কর্তৃকারকে বাঙ্‌লায় কোথাও **দ্বিতীয়া**, কোথাও **তৃতীয়া**, কোথাও **পঞ্চমী** ও অধিকাংশ স্থলে **ষষ্ঠী** বিভক্তি হয়।

[সংস্কৃতে কর্মবাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া এবং বর্তমান কালিক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, দ্বিতীয়া হয় না। ইংরেজীতে Passive Voice (কর্মবাচ্য) এ Active Voice (কর্তৃবাচ্য)-এর Subject (কর্তা) 'by' Preposition-এর Object (কর্ম) হইয়া যায়]।

(/০) **কর্তায় দ্বিতীয়া** [বিভক্তি চিহ্ন—কে]—এ বোঝা **তোমাকেই** বইতে হবে। এই বইখানি **তাহাকে** পড়িতেই হইবে। বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রতিপালনের দায়িত্ব **সন্তানকেই** লইতে হইবে।

* (৵০) **কর্তায় তৃতীয়া** [অনুসর্গযোগে]—**দুঃশাসন দ্বারা** দ্রৌপদী রাজসভায় আনীতা হইলেন। **অর্জুন কর্তৃক** প্রবীর হত হইল। **তোমাকে দিয়ে** এ কাজ করানো যাবে না।

* (৶০) **কর্তায় পঞ্চমী** '**আমা হতে** এই কার্য না হবে সাধন।'

(।০) **কর্তায় ষষ্ঠী** [বিভক্তি চিহ্ন—র, এর]—বইখানা **তোমার** পড়া হইয়াছে কি ? আনন্দমঠ **বঙ্কিমচন্দ্রের** রচিত।

(৩) ভাববাচ্য প্রযোগে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; তবে নিত্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া থাকিলে দ্বিতীয়াও হইয়া থাকে।

(/০) **ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী—আমার** যাওয়া হইল না।
মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হইয়াছে ?

(৵০) **ভাববাচ্যের কর্তায় দ্বিতীয়া**— 'তা হ'লে **আমাকে** [বা **আমার**] এখানে থাকতে হয়।' **রামকে** [বা **রামের**] যাইতেই হইবে।

---

* 'কর্তৃকারকে বিভক্তি প্রয়োগ' অধ্যায়ের শেষে পাদটীকায় অধ্যাপক সুনীতি কুমার তাঁহার 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারিতেছি

না। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্যাকরণে অর্থাৎ গ্রামারে বাক্যের ভঙ্গী আলোচিত হয়; বাক্যগত অর্থ অপেক্ষা, অর্থের প্রকাশ রীতিই হইতেছে প্রধান বিচার্য'; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কারক নির্ণয় কি কেবল ভঙ্গী সাপেক্ষ না অর্থেরও অপেক্ষা রাখে? ক্রিয়ার্ সহিত বাক্যে ব্যবহৃত পদ-নিচয়ের অন্বয় কেবল ভঙ্গীদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। অন্বয়ের প্রকারভেদেই কারকের স্বাতন্ত্র্য। কারক বিচার প্রধানতঃ, অর্থসাপেক্ষ। বাঙ্‌লায় সুনির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্নের অভাব অর্থের উপর নির্ভরশীলতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

অতঃপর সুনীতি বাবু লিখিয়াছেন—"'এ কাজ তাহার দ্বারা হইয়াছে'—এই বাক্যের অর্থ, 'এ কাজ সে করিয়াছে। 'তাহার দ্বারা," এই বাক্যাংশকে অনেকে 'কর্তার তৃতীয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ...। বাস্তবিক পক্ষে, 'সে' হইতেছে কর্তা, কিন্তু যে ভাবে বাক্যটি গঠিত হইযাছে তাহাতে 'কাজ' পদটির উপর একটু জোর দেওয়া হইয়াছে, 'কী হইয়াছে?' 'কাজ': 'কাজ' এখানে কর্তৃপদ-বাচ্য।' এই অবাস্তব কথাটির অবতারণা কিসের জন্য? আর, কর্মবাচ্যে কর্মের উপর জোর পড়ে বলিয়াই তো ঐ কর্মকে উক্ত কর্ম এবং উহার কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলা হইয়াছে। ইংরেজীতে Active Voice-এর Object Passive Voice-এ Subject হয়। তাই বলিয়া বাঙ্‌লাতেও কি কর্তৃবাচ্যের কর্ম কর্মবাচ্যে কর্তা হইয়াছে বলিতে হইবে?

ইহার পরে সুনীতিবাবু আর এক সোপান অগ্রসর হইয়াছেন—' সেইরূপ 'রামের ভাত-খাওয়া হইল না'; 'কী হইল না?' —'ভাত খাওয়া'; ভাত-খাওয়া' এখানে কর্তৃপদবাচ্য ('খাওয়া' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)। 'আমা হইতে এ কাজ হইবে না'; 'কী হইবে না?'—'কাজ', এখানেও 'কাজ' কর্তৃপদ বাচ্য; আমা-হইতে'—অর্থাৎ আমাকে সাধন বা উপায়-রূপে ব্যবহার করিয়া'— অর্থে করণ-পদ, রূপে কিন্তু ('হইতে' অনুসর্গের যোগে। অপাদান-সদৃশ।" সংস্কৃতে 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' সূত্রানুসারে কৃদন্ত পদের কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্তা ও কর্ম উভয়ই বর্তমান থাকে এবং পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে উভয়ত্র ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযোজ্য হয়। তাই সূত্র করা হইয়াছে উভয়-প্রাপ্তৌ কর্মণি' অর্থাৎ কেবল কর্মেই তখন ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইবে এবং কর্তায় হইবে তৃতীয়া; কিন্তু যদি কৃদন্ত পদের সহিত কর্মের সমাস হয় তাহা হইলে কর্তায় ষষ্ঠী হইবে। 'রামেন ভক্তস্য ভোজনম্', কিন্তু 'রামস্য ভক্ত-ভোজনম্'। এখানে লক্ষণীয় এই যে 'ভোজন' ক্রিয়ার রামের কর্তৃত্ব কোথাও লুপ্ত হয় নাই। 'রামস্য ভক্তভোজনম্ নাভূৎ' [রামের ভাত-খাওয়া হইল না] বলিলে অভূৎ' ক্রিয়ার কর্তা 'ভক্তভোজনম্', কিন্তু 'ভোজনম্' কৃদন্তপদে যে ক্রিয়াটি নিহিত আছে তাহার কর্তা 'রাম' তাই বলিতে হয় 'রামস্য' 'কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী'। বাঙ্‌লায় 'খাওয়া' [খা+আ ভাবার্থে]-কে কৃদন্ত পদ ধরিয়া 'ভাত-খাওয়া' [ভাতকে খাওয়া, ২য়াতৎ]' কে সমস্ত পদ ধরিলে 'রামের' কর্তৃসম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু কথা হইল—'রাম ভাত খাইল না' বাক্যটির বাচ্যান্তর করিলে কী হইবে? বাক্যটি কর্তৃবাচ্যে রহিয়াছে— রাম'— কর্তায় ১মা, 'ভাত'—কর্মে ২য়া, 'না' - নঞর্থক অব্যয় এবং 'খাইল'— সাধারণ ভূতকালিক ক্রিয়া পদ। স্পষ্টতঃ ইহা কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হইবে এবং তখন বাক্যটির রূপ

কর্মকারক ও তাহার বিভক্তিনির্ণয়

কর্মকারক

কর্মকারকের সংজ্ঞা পূর্বে একবার প্রদত্ত হইয়াছে। [**'যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম'** কলাপ—ব্যাকরণম্]। যাহা করা হয় তাহাই কর্ম। **বাক্যস্থ যে বিশেষ্যপদ বা সর্বনামপদের উপর ক্রিয়ার ফল পতিত হয় তাহাকে সেই ক্রিয়ার কর্ম বলে**; যথা—ছাত্রেরা **বই** পড়ে। **তাহাকে** সাপে কামড়াইয়াছে। প্রথম বাক্যে **'বই'** এবং দ্বিতীয় বাক্যে সর্বনামপদ **'তাহাকে'**-এর উপর যথাক্রমে 'পড়ে' ও 'কামড়াইয়াছে' ক্রিয়ার ফল পতিত হইয়াছে অর্থাৎ উহারাই 'ক্রিয়াদ্বারা আক্রান্ত' বা 'ক্রিয়ার বিষয়', সুতরাং উহারা **কর্মপদ** বা **কর্মকারক**। ক্রিয়ার নিকট 'কী'? ও 'কাহাকে'? প্রশ্ন করিলে উত্তরে **কর্মপদ** পাওয়া যায়।

কর্মের প্রকারভেদ

১। **মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম**—কয়েকটি ক্রিয়ার **দুইটি** করিয়া কর্মপদ থাকে—একটি **বস্তুবাচক** এবং অপরটি **ব্যক্তিবাচক**। **বস্তুবাচক কর্মটি** প্রকৃত কর্ম বলিয়া উহাকে **মুখ্য কর্ম** (Direct Object) বলা হয়, এবং **ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে গৌণ** বা অপ্রধান কর্ম (Indirect Object) বলে। ক্রিয়ার নিকট 'কী?' প্রশ্নের উত্তরে

হইবে 'রামের ভাত খাওয়া হইল না।' 'খাওয়া' এখানে ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য নহে, উহা ভূতকালিক কৃদন্ত বিশেষণ (Past Participle) এবং 'রামের' 'অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী'। 'আমা-হইতে এ কাজ হইবে না' বাক্যে 'আমা-হইতে' পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত অনুক্ত কর্তা, করণও নহে, অপাদানও নহে। 'আমা-হইতে' না বলিয়া 'আমা দ্বারা' ও বলা চলে। 'আমি এ কাজ পারিব না' বাচ্যান্তর করিলে 'আমা-হইতে [বা আমা-দ্বারা] এ কাজ হইবে না' বলিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রিয়ার সম্পাদকই কর্তা, অন্য কেহ নহে। 'হইবে না' এখানে 'সত্তা' বোধক নহে, 'নিষ্পত্তি'-বোধক এবং নিষ্পাদক 'আমি' 'কাজ' নহে। কিন্তু ভঙ্গীবিচারে 'কাজ' এর প্রাধান্য বলিয়া 'কাজ' উক্ত কর্ম এবং 'আমা-হইতে' অনুক্ত কর্তা। 'আমা-হইতে' বাদ দিলে দাঁড়ায় 'এ কাজ হইবে না' এবং তখন ইহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলিতে হইবে, কারণ এখানে প্রকৃত কর্তার সন্ধান মেলে না এবং কর্ম 'কাজ'-কে কর্তা বলিয়া মনে হয়। ক্রিয়া-সম্পাদক 'কর্তা' এবং সাধকতম 'করণ' কোনও কালে এবং কোনও কারণে এক হইতে পারে না, উহারা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্বতন্ত্র।

মুখ্যকর্ম এবং 'কাহাকে ?' প্রশ্নের উত্তরে **গৌণকর্ম** পাওয়া যায়। **মুখ্যকর্ম** বিভক্তি-চিহ্নহীন হয় এবং **গৌণকর্মে** বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকে ; যথা—দূত **রাজাকে এই কথা** বলিল 'ভরত **দূতগণকে** [গৌণ] অযোধ্যার প্রত্যেকের **কুশল** [মুখ্য] জিজ্ঞাসা করিলেন'—দীনেশচন্দ্র সেন। **আত্মীয়-স্বজনকে** [গৌণ] **পত্র** [মুখ্য] লিখিযাছি।

২। **ধাত্বর্থক** বা **সমধাতুজ কর্ম**—কখনও কখনও বাক্যে প্রযুক্ত **ক্রিয়াপদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন সেই ধাতুর** সহিত কৃৎপ্রত্যয-যোগে গঠিত **ভাববাচক বিশেষ্য উক্ত ক্রিয়ার কর্ম**-রূপে ব্যবহৃত হইযা থাকে ; এইরূপ কর্মকে **ধাত্বর্থক** বা **সমধাতুজ কর্ম** বলে। ইহাতে বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয না। অকর্মক ক্রিয়ার অর্থকে নিযন্ত্রিত বা সীমিত করিবার জন্য অথবা উহার উপর জোর দিবার উদ্দেশ্যে **সমধাতুজ** কর্ম ব্যবহৃত **হয়** এবং উহা **অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক** করিযা তোলে। অন্য কর্মের যোগে **সকর্মক** হইবার যোগ্যতা থাকিলেও সাধারণতঃ কোন ক্রিয়া **সমধাতুজ কর্মের** সহিত একত্র অন্য কর্ম গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মকত্ব প্রাপ্তির পর **ধাত্বর্থক কর্মযোগে** পুনরায সকর্মক হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "**খেলা** 'খেলিতে' আসা, কত খেলিব আশা।
'খেলিতে খেলিতে' **খেলা** বাড়ে পিযাসা ॥"—গান।

(খ) "আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া 'হাসি' পুষ্পের **হাসি**"—নজরুল।

(গ) "প্রলয় **নাচন** 'নাচলে' যখন, হে নটরাজ"—গান

(ঘ) আচ্ছা **চাল** 'চেলেছ' তো !

(ঙ) কী **খাওয়াটাই** না 'খেলে'।

(চ) নিমেষের **দেখা** 'দেখিতে' পাইবনা ?

(ক) হইতে (ঘ) বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদসমূহ স্বভাবতঃ অকর্মক হইলেও এখানে সমার্থক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ কর্মরূপে লাভ করিযা উহারা সকর্মক হইযাছে। কিন্তু (ঙ) ও (চ) বাক্যদ্বয়ে ব্যবহৃত ক্রিযার √খা ও √দেখ্ স্বভাবতঃ সকর্মক হইলেও উহাদের স্বাভাবিক কর্মপদের প্রয়োগ নাই। ক্রিযাটিই বক্তার লক্ষ্য এবং তাহারই উপর জোর দিবার জন্য ঐ দুইটি ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'খাওয়া' এবং 'দেখা' ক্রিয়া দুইটির কর্মরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—তারা 'চোরটাকে' কী **মারটাই** না 'মারল'! এখানে 'মারল' ক্রিয়ার স্বাভাবিক কর্ম 'চোরটাকে' রহিয়া গিয়াছে, অথচ **সমধাতুজ** কর্ম 'মারটা'ও ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'চোরটাকে' **গৌণকর্ম** এবং **'মারটা' মুখ্যকর্ম**।

লক্ষণীয়—(ক)-এর খেলা ব্যতীত প্রত্যেকটি সমধাতুজ কর্মের পূর্বে একটি বিশেষণ পদ রহিয়াছে। ইহাই সমধাতুজ কর্মের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য।

৩। **ভাব-কর্ম**—ক্রিয়ার্থকে **ভাব** বলে; সুতরাং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য **ভাব**-আখ্যা পাইতে পারে। সাধারণ ব্যবহারে সকর্মক ক্রিয়ার অবশ্যই কর্ম থাকিবে। কিন্তু উক্ত ক্রিয়ার মূল বা ধাতুর সহিত কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ** বাক্যে প্রযুক্ত হইলে প্রাক্তন ক্রিয়াক্রান্ত **কর্ম**টির কী গতি হইবে? উত্তর—**কর্মটি কর্ম ই থাকিয়া যাইবে।** ইহাই **ভাব কর্ম**। **'রামকে** ডাকিবে? তাহার দরকার নাই'।—এই বাক্য দুইটিকে এক করিয়া বলিলে দাঁড়ায়—**'রামকে 'ডাকা'র** বা **'ডাকিবা'র** দরকার নাই। পূর্বের পৃথক্ বাক্য দুইটির প্রথমটিতে **রামকে** 'ডাকিবে' সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম। পরের একীভূত বাক্যে 'ডাকা' (ডাক্+আ) বা 'ডাকিবা' (ডাক্+ইবা) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ, সম্বন্ধে ষষ্ঠীবিভক্তির চিহ্ন 'র' যুক্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রাক্তন কর্ম **রামকে কর্ম ই** রহিয়া-গিয়াছে।*

৪। **বহুধাক্রান্ত কর্ম বা একাধিক ক্রিয়ার একটি কর্ম**—কখনও কখনও **একটিমাত্র বিশেষ্যপদ বাক্যে প্রযুক্ত দুইটি বা ততোধিক ক্রিয়া দ্বারা পর পর আক্রান্ত হইয়া থাকে** অর্থাৎ উহা সব কয়টি ক্রিয়ারই বিষয় বা সকল ক্রিয়ার ফলই উহার উপর বর্তমান। এইরূপ কর্মকে **বহুধাক্রান্ত** [বহুধা (বহুপ্রকারে) আক্রান্ত] **কর্ম** বলিতে পারি। যথা—'ক'রে হানাহানি তবু চলো "টানি" "নিয়াছ" যে **মহাভার'**—নজরুল। [অসমাপিকা 'টানি' এবং সমাপিকা 'নিয়াছ' ক্রিয়ার একটিমাত্র কর্ম—'মহাভার']।

---

* ইংরাজীতে Gerund (Verb-Noun)-এর ক্ষেত্রেও এইরূপই হয়। Reading History is interesting (ইতিহাস পাঠ [হয়—উহ্য] কৌতুকাবহ) বাক্যে History 'Reading' এই Verb-এর Object (কর্ম)—আবার Reading 'is' এই verb-এর কর্তা বলিয়া Noun। বাঙ্‌লায় 'ইতিহাসের (কৃদযোগে কর্মসম্বন্ধে ষষ্ঠী) পাঠ' সমাস করিয়া 'ইতিহাস-পাঠ' বলিতে হয়, অথবা ইতিহাস পৃথক্ রাখিয়া উহাকে "পাঠ' এই 'বিশেষ্যস্থানীয়' (বা বিশেষ্যরূপী) ক্রিয়ার বা ভাবের কর্ম'—বলিতে হয়।

'গজপতি বিশাল বৃক্ষের **কাণ্ড** "উপাড়ি," শুণ্ডেতে "তুলিয়া" গগনমার্গে "বিস্তারে" যখন'—হেমচন্দ্র। [অসমাপিকা, "উপাড়ি" ও "তুলিয়া" এবং সমাপিকা "বিস্তারে" ক্রিয়ার একটিমাত্র কর্ম—'কাণ্ড']। **ওকে** আর না "মেরে" পুলিশের হাতে "দাও"।[অসমাপিকা "মেরে" এবং সমাপিকা "দাও" ক্রিয়ার একটিমাত্র কর্ম—'ওকে']। '**জানকী** "পাইবে", "পেয়ে" "হারাইবে", বেঁদে বেঁদে হবে দিবা অবসান।'—গান। [সমাপিকা "পাইবে" ও "হারাইবে" এবং অসমাপিকা "পেয়ে" ক্রিয়ার একটিমাত্র কর্ম জানকী]।

লক্ষণীয়—যে সকল অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া একটিমাত্র বিশেষ্যপদকে কর্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা কখনও মিলিত হইয়া যৌগিক ক্রিয়ায় পরিণত হয় না। সর্বত্র একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পরে অপর ক্রিয়া অনুষ্ঠিত। অবশ্য 'সমাপিকা' ও 'অসমাপিকা' গতানুগতিক অর্থেই এখানে গৃহীত হইয়াছে। ক্রিয়াপ্রকরণে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫। **উপবাক্যীয় কর্ম**—বৃহত্তর বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর বাক্যকে **উপবাক্য** বলে। যে **উপবাক্য** দ্বারা বিশেষ্যপদের কার্য সাধিত হয় তাহা **বিশেষ্যস্থানীয় উপবাক্য**। **যে বিশেষ্যস্থানীয় উপবাক্য প্রধান উপবাক্যস্থ সকর্মক ক্রিয়ার কর্মরূপে প্রযুক্ত হয় তাহাকে উপবাক্যীয় কর্ম বলা যায়**; যথা—আগে "ঠিক কর" **কে কে সেখানে যাইবে** [প্রধান উপবাক্যস্থিত "ঠিক কর" সকর্মক ক্রিয়ার উপবাক্যীয় কর্ম]। একবার গিয়ে "দেখি" **কত দূর কী হ'ল** [প্রধান উপবাক্যস্থিত "দেখি" ক্রিয়ার উপবাক্যীয় কর্ম]। 'কাঙালী আশ্চর্য হইয়া "জিজ্ঞাসা করিল"—**তুই খেলিনে মা?**'—শরৎচন্দ্র। '**আমার কবিতা**, "জানি" আমি **গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী**'—রবীন্দ্রনাথ। 'তখন "মনে করিলাম"—**হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি**'—বঙ্কিমচন্দ্র।

৬। **কর্মসম্বন্ধী অনুপূরক**—অনেকসময়ে কর্মসহ ক্রিয়ার প্রয়োগেও বাক্যার্থ সম্পূর্ণ হয়না; কর্মের অন্ত অর্থাৎ পশ্চাতে প্রযুক্ত একটি বিশেষ্যপদ বাক্যার্থ এবং বিধেয়াংশকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলে। এই বিশেষ্যপদটিই **অনুপূরক**। কর্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ বলিয়া ইহাকে **কর্মসম্বন্ধী অনুপূরক** (Objective Complement) বলিব। তাহারা 'তাহাকে' **রাজা** "করিল"—এই বাক্যে 'তাহাকে' কর্মপদ, কিন্তু **রাজা** পদটি ব্যবহার না করিলে সার্থক বাক্য হয় না, [১]'আকাঙ্ক্ষা' থাকিয়া যায়। প্রশ্ন জাগে—'কী

১। 'আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা' সার্থক বাক্যের এই তিনটি লক্ষণ বাক্যপ্রকরণে আলোচিত হইবে।

করিল ?' **রাজা** পদটির প্রয়োগে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, বিধেয়াংশ সম্পূর্ণ হয়। **রাজা** কর্মপদ 'তাহাকে'-র পশ্চাতে বসিয়াছে। এবং কর্ম্ম 'তাহাকে'-র সহিতই উহার সম্বন্ধ। সুতরাং **রাজা**[১] **কর্মসম্বন্ধী অনুপূরক**।

নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

' "তোমারে" করিল বিধি ভিক্ষুকের **প্রতিনিধি**'—রবীন্দ্রনাথ।

'যে ধনে হইয়া ধনী "মণিরে" মাননা **মণি**'—ঐ।

'রসনা তাহার শ্যামল "ধরায়" করিছে **সাহারা-গোবী**—নজরুল।

'ছেলেটা আমার "স্ত্রীকে" **মা** ডেকেছে'।

কর্মকারকে বিভক্তি

(ক) কর্তৃবাচ্যে **কর্মকারকের** স্বকীয় বিভক্তি **দ্বিতীয়া**। বিভক্তির চিহ্ন 'কে (একে)', 'রে (এরে)', 'এ (য়)'; যথা—"এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, **তাঁহাকে** ডাকি"—বঙ্কিমচন্দ্র। "হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি **নর-দেবতারে**" —রবীন্দ্রনাথ। "**কাহারে** বলিব বল দোষী বাপমায়"—কবিকঙ্কণ। "সমরে অমর ত্রস্ত করিলা **দানবে**"—হেমচন্দ্র। "কী দিয়ে পূজিব **তোমায়**"—গান।

(খ) **দ্বিকর্মক** ক্রিয়ার **মুখ্য**কর্মে **বিভক্তিচিহ্ন থাকে না, গৌণ** কর্মে পূর্বোক্ত **দ্বিতীয়া** বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে; যথা—"আয় **তোকে** 'রূপকথা' বলি" —শরৎচন্দ্র। [এখানে গৌণকর্ম **তোকে** দ্বিতীয়ার 'কে'-চিহ্নযুক্ত, কিন্তু মুখ্যকর্ম 'রূপকথা' বিভক্তিচিহ্নহীন]। 'বক বলে—চারি "প্রশ্ন" জিজ্ঞাসি **তোমারে**' —মহাভারত। ["প্রশ্ন"—মুখ্যকর্ম, **তোমারে**—গৌণকর্ম]।

১। অধ্যাপক সুনীতিকুমার-প্রমুখ বাঙ্‌লা ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতৃবর্গ ইহাকে বিধেয় কর্ম আখ্যা দিয়াছেন। বিধেয় কর্ম যে অর্থহীন সংজ্ঞা অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি আবার ইহাকে বিধেয় বিশেষণ বলিয়াছেন। আমাদের মতে বিধেয় কর্ম, বিধেয় বিশেষণ দুইটিই অসমীচীন সংজ্ঞা। বাক্যপ্রকরণে উদ্দেশ্য-বিধেয় প্রসঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপস্থাপিত হইবে।

(গ) বর্তমান বাঙ্‌লাতে **অপ্রাণি-বাচক** বা **ইতরপ্রাণি-বাচক কর্ম কারকে বিভক্তি-চিহ্ন দৃষ্ট হয় না ;** যথা—'এই **ঝুলি** লহো তবে স্কন্ধে তুলি'—রবীন্দ্রনাথ। 'ধরণীর' পরে বিরাট ছায়ার **ছত্র** ধরিল কে,—মোহিতলাল। 'ভয়ে সবে **পুঁথিপত্র** গুটায়'—কালিদাস রায়। **ছাগ, মেষ, মহিষ** দিয়া বলিদানে'—কবিকঙ্কণ।

(ঘ) **প্রাণিবাচক কর্ম জাতি-অর্থে** ব্যবহৃত হইলে [1]**বিভক্তি-চিহ্ন গ্রহণ করে না ;** যথা—সব বাঘে **মানুষ** খায় না। এখনি **ডাক্তার** ডাক। 'সে সময় পাচক **ব্রাহ্মণ** ও হিন্দু **ভৃত্য** সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন....'—শিবনাথ শাস্ত্রী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এ পর্যন্ত [(ক) হইতে (ঘ)] যে সকল কর্মকারকের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি সবই দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত।

(ঙ) **উক্ত কর্মে** [কর্মবাচ্যের কর্মে] **প্রথমা** বিভক্তি হইয়া থাকে ; যথা—বামনরূপী নারায়ণের দ্বারা **বলি** পাতালে প্রেরিত হইল। আমার **ভাত** খাওয়া হয় নাই। "একটা পরীক্ষার **বেড়াজাল** দেশজুড়ে পাতা হোক"—রবীন্দ্রনাথ। "গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় **ঘনঘটা** বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়"—হেমচন্দ্র।

(চ) [2]**সংযোগমূলক ক্রিয়া** পদের প্রয়োগে **কর্মকারকে ষষ্ঠী** বিভক্তি হয় ;

১। বিভক্তি-চিহ্নের প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"...যে-বিশেষ্যপদ সাধারণ-বাচক, তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না। যেমন—'রাখাল গোরু চরায়', 'গোরুকে' চরায় না। 'ময়রা সন্দেশ বানায়,' কিন্তু 'সন্দেশকে' বানায় না। কিন্তু 'যে গাড়োয়ান গোরুকে পীড়ন করে, সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই'। এখানে 'গোরু' যদিও সাধারণ বিশেষ্য, তবু এখানে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হ'ল। 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'—এখানে 'ঝি,' 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু 'কে' বিভক্তি গ্রহণ করেছে,......রাখাল সাধারণ গোরু চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যবসা। কিন্তু গাড়োয়ান 'গোরুকে' যে পীড়ন করে, সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্য শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে, সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়। বলে থাকি, 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে' তৈরি করে' বলিইনে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বলা অসম্ভব নয় যে 'ময়রা মালপোকে ক'রে তোলে জুতোর সুকতলা'। ...সুকতলার মত 'মালপো' তৈরি করা নিঃসন্দেহে সাধারণ ব্যাপার নয়।"

২। ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের সহিত 'কর্' 'পা' প্রভৃতি ধাতু হইতে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়াপদের মিলনে সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। ইহাকে ভাবকর্মে ষষ্ঠী বা কর্মসম্বন্ধে ষষ্ঠীও বলা যায়।

যথা—"যাও না, নন্দ, 'কর গে' **ভা'য়ের** 'সেবা'"—দ্বিজেন্দ্রলাল। সকলে **রোগীর** 'শুশ্রূষা করিতে পারে না'। **গুরুজনের** 'সম্মান করিবে'। **কাহার** 'পূজা করিস' তোরা ? "বড় ভাগ্য **তোমার** পাইনু দরশন"—কৃত্তিবাস।

করণ কারক ও তাহার বিভক্তিনির্ণয়

করণকারক

করণকারকের সংজ্ঞা কারকের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে উহার সম্বন্ধে আরও দুই-চারিটি কথা বলা হইল। "ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণ-সংজ্ঞং স্যাৎ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। ক্রিয়ানিষ্পত্তি ব্যাপারে কর্তার সর্বাধিক উপকার যে করে সেই কারকের নাম হইল **করণ**। সেই তো সাধকতম, ক্রিয়াসম্পাদনের উপায় বা যন্ত্র [Instrument]। **কণ্টকদ্বারা** কণ্টক উদ্ধার কর। **হাতে** কাজ কর, **মুখে** হরি বল। 'উত্তম **বসনে** বেশ করয়ে বনিতা'—কবিকঙ্কণ। উল্লেখিত উদাহরণগুলিতে 'উদ্ধার কর' 'কর', 'বল', 'করয়ে' এই ক্রিয়াপদগুলি যথাক্রমে **কণ্টকদ্বারা, হাতে, মুখে, বসনে** যন্ত্র বা উপাযের সাহায্যে নিষ্পন্ন। সুতরাং উহারাই সাধকতম, আর সাধকতমই করণ [সাধকতমং করণম্]। ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে ক্রিযার অনুষ্ঠাতা বা সম্পাদক (Doer or Agent) এবং সম্পাদক বা অনুষ্ঠাতার সর্বাধিক উপকারী উপায বা যন্ত্র [Instrument] কখনও এক হইতে পারে না। **"আমা হ'তে** এই কার্য হবে না সাধন"—নবীনচন্দ্র। —বাক্যে **আমা হ'তে** কখনও উপায বা যন্ত্র হইতে পারে না। কার্যের অনুষ্ঠাতা বা সম্পাদক 'আমি' [কর্তৃবাচ্যে প্রথমাবিভক্তিযুক্ত কর্তা]; কর্মবাচ্যে অনুক্তকর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইলে 'আমাদ্বারা' পদ হয। এখানে অনুক্ত কর্তায় পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। **'কার্য' কর্তৃপদ নহে।** কর্তৃবাচ্য—**আমি** [কর্তায় প্রথমা] এই কার্য [কর্মে ২যা] সাধিতে পারিব না ; কর্মবাচ্য—**আমাদ্বারা** [অনুক্ত কর্তায় তৃতীযা] এই কার্য [উক্ত কর্মে ১মা] সাধিত হইবে না [কর্তৃবাচ্যের √পার্ কর্ম ও ভাববাচ্যে √হ-তে পরিণত] = **আমাদ্বারা** এই কার্যের [উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি ষষ্ঠী] সাধন হইবে না = আমা হ[ই]তে এই কার্য-সাধন [বা কার্য সাধন] হ'বে না। **আমা হ'তে** করণে নহে, অনুক্ত-কর্তায পঞ্চমী। [অনুক্তকর্তার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

করণ দ্বিবিধ—**যন্ত্রাত্মক** ও **উপায়াত্মক**। 'আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ**গুণে**' —মুকুন্দরাম। মূর্ত 'ধনুকের ছিলা'-অর্থে **গুণে** যন্ত্রাত্মক করণ এবং অমূর্ত 'সদ্‌গুণাবলী' অর্থে উহা উপায়াত্মক করণ।

করণকারকে বিভক্তি

১। **করণ**কারকের স্বকীয় বিভক্তি **তৃতীয়া**। **(ক)** অনুসর্গ—'দ্বারা', 'দিয়া', প্রভৃতির—যোগে করণে **তৃতীয়া** বিভক্তি সূচিত হয়; যথা—

ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে ?'—মধুসূদন। 'সে রক্তবর্ণ **দুই চক্ষু দ্বারা** সেই তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিল'—তারাশঙ্কর তর্করত্ন। 'সাক্ষাৎ **অভিজ্ঞতার দ্বারা** তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ··' —রেজাউল করীম। '**কাঁটা দিয়ে** কাঁটা তুলতে হয়।' 'কাটা কান **চুল দিয়ে** ঢাক' —প্রবচন। "এইদিনকে আমরা **ফুল-পাতার দ্বারা** সাজাই, **দীপমালার দ্বারা** উজ্জ্বল করি, **সংগীতের দ্বারা** মধুর করিয়া তুলি'—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) মূলতঃ অসমাপিকা ক্রিয়া '**করিয়া** [ক'রে]' অনুসর্গরূপে করণে তৃতীয়া সূচিত করে; যথা—**রিক্‌শা ক'রে** গেলে গাড়ী ধ'রতে পারবে না, **ট্যাক্সি ক'রে** যাও। গ্লাসের অভাবে **ঘটি করিয়া** জল খাইতে হইল। বর্ষার দিনে তাদের **নৌকো ক'রে** যেতে হ'ত।

(গ) অনেক সময় বিভক্তি-চিহ্ন **'এ'** [**'তে'**, **'য়'**] দ্বারা **করণে তৃতীয়া** বুঝিতে পারা যায়; যথা—'**হাতে** কাজ কর, **মুখে** হরি বল'—প্রবচন। '**গাছ-পাথরেতে** বান্ধে সাগরের জল'—কৃত্তিবাস। 'রঞ্জিয়াছ **পুষ্পে পুষ্পে** ধরিত্রীর বিচিত্র অলক'—দেবেন্দ্রনাথ সেন। 'পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ **ধনে**'—রবীন্দ্রনাথ। 'কেমনে আমি···মম ক্ষুদ্র **কল্পনায়** করি প্রকাশিত ? '—নবীন চন্দ্র। 'এক **ঝাপটায়** জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে · একটি ছুরির **ঘায়ে** তার সব আস্পর্ধা শেষ ক'রে দিলেন'—অবনীন্দ্রনাথ। '**কড়িতে** বাঘের দুধ মেলে'—·প্রবচন।

(ঘ) বাঙ্‌লায় কখনও কখনও করণ-কারকে বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে 'নির্বিভক্তিক' বা 'প্রথমা বিভক্তিযুক্ত' **বলা চলিবে না** অথবা

'করণে শূন্যবিভক্তি' বলাও অর্থহীন। এক্ষেত্রেও **করণে তৃতীয়া** বিভক্তি বলিতে হইবে, তবে বিভক্তিচিহ্ন অদৃশ্য ; যথা—

'বাবু······আজ একে **চাবুক** [=চাবুক **দিয়ে**] মারেন, পাঠান ঠেকিয়ে **জুতো** [=জুতো **দিয়ে**] মারেন'—টেকচাঁদ ঠাকুর। শকুনি যুধিষ্ঠিরের সহিত **পাশা** [=পাশা **দিয়া**] খেলিতে বসিলেন। 'কালা মুখে **ঝাঁটা** [=ঝাঁটা **দিয়া**] মার।' ছাত্রদের এখন আর **বেত** [=বেত **দিয়ে**] মারা হয় না। 'তা হলে তুমি **লাঠি** [=লাঠি **দিয়ে**] খেলতে জান না?—প্রমথ চৌধুরী। 'কৃষকে **লাঙ্গল** [=লাঙ্গল **দিয়া**] চষিতেছে—বঙ্কিমচন্দ্র। 'তাঁতি ব'সে **তাঁত** [=তাঁত **দিয়া**] বোনে'—রবীন্দ্রনাথ।

[১]**খেলা, মারা, চষা, বোনা** প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়ার **করণ-কারকে তৃতীয়ার চিহ্ন অদৃশ্য থাকে**—উপরের উদাহরণগুলি হইতে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(ঙ) 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতি অনুসর্গের যোগে যে সকল পদে তৃতীয়া বিভক্তি সূচিত হয় তাহাদের সহিত অনেক সময় আর একটি বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত থাকে।

---

১ অধ্যাপক সুনীতিকুমার বলিয়াছেন—"আমরা হা ডু-ডু খেলি, কপাটি খেলি" : এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ হইতেছে 'হা-ডু-ডু খেলি,' 'কপাটি-খেলি'—শুদ্ধ 'খেলি' নহে। 'হা ডু-ডু-খেল্' ও -'কপাটি- খেল্' সংযোগ মূলক ধাতু এই সংযোগ-মূলক ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়া-পদ 'হা ডু-ডু খেলি', 'কপাটি খেলি'—যেমন 'খেলা-কর্' হইতে 'খেলা করি', সুতরাং এক্ষেত্রে 'হা-ডু-ডু' ও 'কপাটি'-তে করণ-কারকের প্রশ্ন উঠে না।" সুনীতিবাবু 'হা-ডু-ডু খেল্' ও 'কপাটি-খেল্'-কে সংযোগমূলক ধাতু বলিয়াছেন। কিন্তু সংযোগ-মূলক ধাতুর বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে দেখা যায় যে ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য পদের সহিত √কর্, √পা, √পা প্রভৃতি মৌলিক ধাতুর সমবায়ে উহারা গঠিত হয় [ক্রিয়া-প্রকরণে সংযোগ-মূলক ধাতু দ্রষ্টব্য]। 'হা-ডু ডু' ও 'কপাটি দুইটি ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। 'হা-ডু-ডু-ডু-ডু-ডু-ডু' বা 'কপাটি-কপাটি-কপাটি-কপাটি' ধ্বনি তুলিয়া দম রাখিয়া খেলিতে হয়। কোথাও 'ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্' ধ্বনিতে খেলা হয় বলিয়া ইহাকে 'ডুগ্-ডুগ্ খেলাও বলে। 'হা ডু-ডু' বা 'কপাটি' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য নহে, উহারা বিশেষ ধ্বনির দ্যোতক এবং খেলার যন্ত্র মাত্র। যেমন 'ফুটবল [যন্ত্র দ্বারা] খেলি', 'তাস [যন্ত্র দ্বারা] খেলি', তেমনই 'হা-ডু-ডু [ধ্বনি-যন্ত্র দ্বারা] খেলি', কপাটি [ধ্বনি-যন্ত্র দ্বারা] খেলি', সুতরাং হা ডু-ডু' ও কপাটি' করণ এবং তৃতীয়া বিভক্তির-চিহ্ন অদৃশ্য।

ইহাকে কোনও বিশেষ বিভক্তি বলা যায় না, কেন না **অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য বা সর্বনামেরই কারক-বিভক্তি বিবেচিত হইবে** অর্থাৎ **বিশেষ্য বা সর্বনাম এবং অনুসর্গ মিলিয়া একটি পদ** হইযা থাকে। 'অভিজ্ঞতার দ্বারা' এ স্থান লাভ করিযাছি; 'ওটাকে দিযে' তুমি কী করবে? 'নৌকায় ক'বে' গেলাম—ইত্যাদি স্থলে **'র', 'কে', 'য়'** প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তির দ্যোতক নহে। উহারা বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত পরবর্তী অনুসর্গের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে মাত্র। 'অভিজ্ঞতার দ্বারা' একটি কথা এবং একটিমাত্র পদ; সেইরূপ 'ওটাকে দিযে' একটি পদ এবং 'নৌকায করিযা'-ও একটি পদ—সর্বত্র করণ কারকে তৃতীযা। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে '-র', '-কে' এবং '-য' প্রভৃতিকে **অনুসর্গসম্বন্ধী** বলিতে হয।

(চ) একটি বাক্যে একই ক্রিযাপদের **একাধিক করণপদ** থাকিতে পারে; যথা—'**নিজহস্তে দিব্যমন্ত্রে স্বর্ণপদ্মে** পূজি ভোলানাথে।' 'যাও, মা, খোকাকে **ঝিনুক দিয়ে নিজহাতে** দুধ খাওযাও গে।' 'বলি, **তাস, পাশা, দাবা** খেলেই কি জীবন কাটিবে?' 'সেখানে **ট্রামে ক'রে, বাসে ক'রে** বা **ট্রেনে ক'রে** যেতে পার।'

সম্প্রদানকারক ও তাহার বিভক্তিনির্ণয়

সম্প্রদানকারক

(ক) **দরিদ্রকে** অর্থ **দাও**। (খ) **ধোপাকে** কাপড় **দাও** [কাচিবার জন্য] উপরিলিখিত দুইটি বাক্যেই 'দাও' ক্রিযাপদে দানের আদেশ বুঝাইতেছে; কিন্তু এই দুইটি দান দুই রকমের। (ক) বাক্যে দরিদ্রকে যে অর্থদানের কথা রহিযাছে তাহাতে অর্থের উপর হইতে দাতার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু (খ) বাক্যে ধোপাকে দেওয়া 'কাপড়'-এর উপর দাতার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে (ক) বাক্যে **স্বত্ববর্জন**-পূর্বক দান এবং (খ) বাক্যে 'স্বত্বসংরক্ষণপূর্বক' দান বুঝাইতেছে। **স্বত্ববর্জন**-পূর্বক দানকে **সম্প্রদান** [সম্-প্র-দা+অনট্ ভাবে (সম্যক্ ও প্রকৃষ্ট দান)] বলে। **যাহাকে আশ্রয় করিয়া সম্যক্ রূপে ও প্রকৃষ্টভাবে দানক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে;** যথা—

'**অন্ধজনে** দেহ আলো, **মৃতজনে** দেহ প্রাণ'—রবীন্দ্রনাথ। 'হে ভবেশ হে শঙ্কর, **সবারে** দিয়েছ ঘর'—ঐ। 'সন্ধ্যাবেলায় **ঠাকুরকে** ভোজ্য করেন নিবেদন'—ঐ। '**কুমারে** আমার করো প্রাণদান'—করুণানিধান। 'তুমি **তাঁদের** অর্ধরাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর'—রাজশেখর। 'তব কনিষ্ঠা মেয়ে **ধরণীরে** দিলে দান ধূলামাটী' —নজরুল।

সম্প্রদান-কারক সম্বন্ধে আলোচনা

" সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎ-প্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে একারণ তাহার পৃথক্ প্রকরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না,"

—রাজা রামমোহন রায়।

"অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাঙ্গালাতেও সম্প্রদান কারক নাই।"

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

"... সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে তাহার নাম কর্ম, উহার নির্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া, ক্রিয়ামাত্রের পক্ষেই এই বিধি। কেবল দানক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায়, উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও, বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্যান্য ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না · দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দান ক্রিয়ার সম্প্রদান না বলিয়া কর্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে? ... (সংস্কৃতে) যদি বিভক্তি-চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকই কর্ম সংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে সম্প্রদানকে কর্ম সংজ্ঞা দিলে এমন কি অপরাধ হইবে? ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কিনা জানি না, কিন্তু একমাত্র দানক্রিয়ার জন্য বাঙ্গালায় একটা পৃথক্ কারক খাড়া করা উচিত কিনা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার **সম্প্রদান-কারক** সঙ্কোচিত অর্থে স্বীকার করিয়া উপসংহারে মন্তব্য করিয়াছেন—

"সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সর্বত্রই সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে, এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই বাঙ্গালাতে সম্প্রদান কারক বলিয়া পৃথক্ একটি কারক স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্রদান-কারককে কর্ম কারকের অন্তর্গত দেখিলে ক্ষতি নাই এবং তাহাই সমীচীন।"

উপরিলিখিত মতামতগুলি যাঁহাদের তাঁহারা সকলেই মনীষী, তাঁহাদের নিকট বাঙ্‌লা ভাষা, বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালী জাতি অবিসংবাদিত রূপে ঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের উক্তিমাত্রই বেদবাক্য হইতে পারে না। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"—মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়। পূর্বসূরিগণের সকলমতই কি পরবর্তীযেরা বিনা বিচারে গ্রহণ করিযাছেন? উদ্ধৃত মতগুলিই বা কতখানি বিচারসহ তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে।

মতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায যে বাঙ্‌লায চতুর্থীর জন্য স্বতন্ত্র বিভক্তিচিহ্নের অভাববশতঃই ইঁহারা সম্প্রদান কারককে নস্যাৎ করিতে চাহিযাছেন। কিন্তু কথা হইল—পদের কারকত্ব কি তাহার রূপান্তর ঘটার উপরে নির্ভর করে? কখনই নহে। ইঁহাদের যুক্তিনিচয অনুধাবন করিলে যুক্তিবিভ্রম আরও স্পষ্ট হইবে—

যেহেতু দ্বিতীযা ও চতুর্থীর জন্য স্বতন্ত্র বিভক্তিচিহ্ন নাই সুতরাং দুইটি বিভক্তির প্রযোজন নাই, অতএব দ্বিতীযাকে রাখিযা চতুর্থীকে ছাঁটিযা ফেল।

যেহেতু চতুর্থীকে ছাটিলাম, অতএব সম্প্রদানকেও কাটিতে হইবে। কর্মকারক দ্বারাই কার্য সিদ্ধ।

স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে ইঁহারা (১) **বিভক্তি** ও বিভক্তির **চিহ্ন** মিশাইয়া তালগোল পাকাইযাছেন এবং (২) কারকের **কারকত্ব** অর্থাৎ **ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের** কথাটাই বিস্মৃত হইযাছেন। কারক ও বিভক্তি প্রসঙ্গে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিযাছি। তথাপি **কর্ম হইতে সম্প্রদানের স্বাতন্ত্র্য** প্রদর্শনের জন্য দুই চারিটি কথা বলার প্রযোজন রহিয়াছে।

(ক) **ক্রিয়ার সহিত** নামপদের **অন্বয়** দ্বারাই উক্ত **নামপদের কারক** নির্ণয় হইবে। [**কারক-নির্ণয়** দ্রষ্টব্য।]

(খ) **বিভক্তি-চিহ্ন** এবং **বিভক্তি** এক নহে; বাঙ্‌লায **একই** চিহ্নে **বিভিন্ন** বিভক্তি সূচিত হইতে পাবে। [**বিভক্তি-নির্ণয়** দ্রষ্টব্য।]

(গ) চিহ্নের একত্বের জন্য **দ্বিতীয়া**কে রাখিযা **চতুর্থী**কে ছাটিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। [**বিভক্তির আলোচনা** দ্রষ্টব্য]

(ঘ) **ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের স্বাতন্ত্র্যই সম্প্রদানকে গৌণ কর্ম হইতে পৃথক্** করিযা রাখে। ইহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুইটি

কর্মের **বস্তুবাচক কর্মটি মুখ্য** বা প্রধান কর্ম, কেননা উহাই ক্রিয়াদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আক্রান্ত অর্থাৎ উহাকে অবলম্বন করিয়াই ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়। উহার সহিত ক্রিয়ার **অন্বয় প্রত্যক্ষ**; তাই বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত না থাকিলেও উহাকে **কর্ম** বলিয়া চিনিতে বেগ পাইতে হয় না। অপরপক্ষে ব্যক্তিবাচক কর্মের সহিত ক্রিয়ার **অন্বয় পরোক্ষ** তাই সময়ে সময়ে এই ব্যক্তিবাচক গৌণ কর্মটি কর্মত্ব (কারকত্ব) হারাইয়া **সম্বন্ধ পদে** পরিণত হয়। কিন্তু **দানক্রিয়া**-র ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে ব্যক্তি অর্থাৎ পাত্রটিই **দানক্রিয়ার আশ্রয়স্থল** বা **মুখ্য**। দানের **বস্তুটি** তুলনামূলক ভাবে অপ্রধান বা **গৌণ**। সাধারণ দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে **ব্যক্তিটি** ছিল গৌণ দান-ক্রিয়ায় **অর্থতঃ** সে হইল মুখ্য এবং তাহার এই প্রাধান্যই তাহাকে **সম্প্রদান কারকের** বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্ম দুইটির মধ্যে একটি থাকে পাত্র (person), অপরটি বস্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শেষবটি ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মুখ্য,' অর্থাৎ প্রধান এবং পাত্রটি 'গৌণ' বা অপ্রধান। গৌণ বা কমমুখ্যের বলিয়া পাত্রের রূপান্তর চলে—তিনি আমাকে 'পত্র লিখেছেন', আমার নামে' পত্র লিখেছেন,'আমার কাছে' পত্র লিখেছেন। ইংরেজীতেও এই অবস্থা: He wrote 'me' a letter, wrote a letter 'to me', শুধু তাই নয় আসল বিষয় পত্র এবং তাহার পাত্র যে সে হইতে পারে। কিন্তু সম্প্রদানকারকে অবস্থা অন্যপ্রকার। দানের পাত্রটই এখানে বড়। দরিদ্রকে অর্থদান যেমন করা যায়, তেমনি অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান অর্থাৎ যে কোন প্রকারে সাহায্যদান করা যায়, দেয়বস্তুর ক্ষেত্রবিশেষে রূপভেদ হইতে পারে, কিন্তু পাত্র ঐ দরিদ্র। সুতরাং পাত্র দানক্রিয়ায় প্রধান। এই বিচারে দানের পাত্র (সম্প্রদানকারক ও গৌণকর্ম 'অর্থতঃ' এক নয়, বরঞ্চ দানক্রিয়ায় মুখ্য দানের পাত্র, গৌণ দেয় বস্তু। ক্রিয়াটিকে দ্বিকর্মক ধরিলে, ইহার লক্ষণ সাধারণ দ্বিকর্মক ক্রিয়ার লক্ষণের বিপরীত হইয়া যায়।"

দান-ক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই **সম্প্রদান কারকের প্রয়োজন রহিয়াছে।** ভোজন-ক্রিয়া বা তাড়ন-ক্রিয়া **দ্বিকর্মক** নহে। উহাদের পাত্রের জন্য 'সম্ভোজন কারক' বা 'সন্তাড়ন-কারক' সংগঠনের **প্রশ্নই** উঠিতে পারে না, কেননা উহাদের আক্রমণে **গৌণত্ব মুখ্যত্বের** প্রসঙ্গ উঠে না।

সম্প্রদান-কারকের অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার পরে উহার পরিসর সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিতে

হয়। প্রচলিত রীতিতে সম্প্রদান-কারকের স্বীকৃতিস্থলেও সুনীতিবাবু প্রমুখ বৈয়াকরণগণ উহার পরিধির সঙ্কোচসাধন করিতে চাহিয়াছেন। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন—

"যেখানে স্বত্বত্যাগ পূর্বক নিজস্ব কোনও জিনিস অপর কাহাকেও দান করা হয়, কেবল সেখানেই প্রকৃত 'সম্প্রদান' বুঝায়, এবং সেই দান-ক্রিয়ার পাত্রের প্রসঙ্গেই সম্প্রদান কারকের প্রশ্ন উঠে।......যে জিনিসে দাতার স্বত্ব নাই, অর্থাৎ যে জিনিস প্রকৃতপক্ষে অন্যের, সেই জিনিস দান করাকেও প্রকৃত 'সম্প্রদান' বলা চলে না। যেখানে স্বত্ব রাখিয়া, কিংবা ভয়ে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া, কাহাকে কোনও কিছু দেওয়া হয়, সেখানেও 'দেওয়া' অর্থে সম্প্রদান বুঝায় না এবং সেই হেতু, বাক্যস্থিত যে পদে সেইরূপ দান-ক্রিয়ার পাত্রকে বুঝায়, সেই পদকেও 'সম্প্রদান-পদ' বলা সংগত হয় না; যেমন—

"(১) 'কৈলাসবাবু তাঁহার ছোট ভাইয়ের ঘড়িটি আমাকে দিলেন': এখানে দানের জিনিস (ঘড়ি) দাতা কৈলাসবাবুর নিজস্ব নহে, ইহার সত্ত্বাধিকারী তাঁহার ছোট ভাই, অর্থাৎ কৈলাসবাবু পরের জিনিস পরকে দিলেন, এখানে স্বত্বত্যাগ-পূর্বক দান বুঝাইতেছে না, সুতরাং 'আমাকে' পদটিকেও সম্প্রদান-পদ বলা চলে না—ইহা গৌণ কর্ম।

"(২) ধোপাকে কাপড় দাও" এখানে 'দেওয়া' অর্থে কাচিতে দেওয়া বুঝাইতেছে, স্বত্বত্যাগ পূর্বক দান বুঝাইতেছে না, সুতরাং 'ধোপাকে' পদটিকে সম্প্রদান পদ বলা যাইবে না।

"(৩) 'ইন্দিরা ডাকাতদিগকে তাঁহার বহুমূল্য অলংকারগুলি দিলেন': এখানে, ভয়ে বাধ্য হইয়া দেওয়া, এইরূপ বুঝাইতেছে; সুতরাং এখানেও ডাকাতদিগকে' সম্প্রদান পদ নহে, ইহা গৌণ কর্ম। সেইরূপ 'দরোয়ানকে কিছু ঘুষ দিয়া ভিতরে ঢুকিলাম', 'চাকরকে মাহিনা দাও' (=চাকরের প্রাপ্য পারিশ্রমিক তাহাকেই দেওয়া), 'প্রজা রাজাকে কর দেয়', —এই সমস্ত স্থলেও দান-ক্রিয়ার পাত্রকে 'সম্প্রদান' বলা চলে না।"

অধ্যাপক শ্যামাপদ সম্প্রদানের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এ দানে একটা মাহাত্ম্যবোধ একটা পবিত্রতাবোধ আছে এবং ইহা পবিত্রতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ইহা পুলিশকে ঘুষদান নয়, চোরকে সর্বস্বদান নয়...... ।

'স্বত্বত্যাগের প্রশ্ন যেখানে নাই, সেখানে সম্প্রদান কারক নাই: 'তোমার কলমটা একবার আমাকে দাও তো'—'আমাকে' কর্মকারক। পবিত্র উদ্দেশ্য যেখানে নাই সেখানে সম্প্রদান কারক নাই: পুলিশকে ঘুষ দেওয়া—'পুলিশকে' কর্মকারক।"

সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্প্রদানের ব্যাখ্যায় একস্থানে বলা হইয়াছে 'স্ব-স্বত্বপরিত্যাগ-পূর্বকং পরস্বত্বোৎপাদনং সম্প্রদানম্'—স্বাধিকারবর্জন এবং পরাধিকার উৎপাদনই সম্প্রদান। যে দান-ক্রিয়াতে ব্যাপার এইটি ঘটে তাহাকেই সম্প্রদান বলিতে হইবে।

দাতার মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া 'সম্প্রদান'—নির্ণয় করিতে হইলে সম্প্রদানের ক্ষেত্র মিলিবে কি? গীতোক্ত সাত্ত্বিকদানের কয়টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়? সুনীতিবাবুর (১)নং বাক্যটির 'কৈলাসবাবু' কি 'তাঁহার ছোট ভাইয়ের ঘড়িটি' দান করিয়া আনিয়া 'আমাকে দিলেন'? বাক্যটি তাহা বলে না। 'কৈলাসবাবু' যখন ঘড়িটি দান করিতে পারিয়াছেন তখন ধরিয়া লইতে হয়—তাঁহার উহা দানের অধিকার ছিল। রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে ঘড়ির মালিকানা সাব্যস্ত করার দায়িত্ব আদালতের [অবশ্য যদি তাঁহার ছোট ভাই নালিশ করে], বৈয়াকরণের নহে। 'কৈলাসবাবু পরের জিনিস' দেন নাই, **নিজের** ছোট ভাইয়ের জিনিস **'আমাকে' সম্প্রদান** করিয়াছেন;

সুতরাং **'আমাকে' সম্প্রদান-কারক,** গৌণকর্ম নহে।

'ধোপাকে কাপড় দাও': 'দাও' ক্রিয়াপদে 'কাচিবার জন্য দাও' বুঝাইলে 'ধোপাকে' নিঃসন্দেহে গৌণকর্ম। কিন্তু বিবাহাদি কর্মে ব্যবস্থিত দান-ক্রিয়া বুঝাইলে 'ধোপাকে' **সম্প্রদান কারক**। সংস্কৃতে দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বিভক্তিচিহ্ন স্বতন্ত্র বলিয়া কর্ম বা-সম্প্রদান চিনিতে অসুবিধা হয় না। বাঙ্‌লায় সূত্র দ্বারা বা প্রসঙ্গ দ্বারা এইরূপ ক্ষেত্রে কারক নির্ণীত হইবে।

১ "দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ১৭। ১০

—কেবল কর্তব্যানুরোধে ফলাসক্তিরহিতচিত্তে পবিত্রস্থানে পুণ্যকালে প্রত্যুপকারে অসমর্থ সৎপাত্রকে যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। ১৭। ২১

—প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা [স্বর্গাদিলাভ] ফল কামনায় মনঃ কষ্ট অনুভব করিয়া যে দান-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা রাজসিক দান।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ১৭। ২২

—অপবিত্রস্থানে অসময়ে ও অপাত্রে অবজ্ঞাসহকারে শ্রদ্ধাবিরহিত দান তামসিক দান বলিয়া খ্যাত।

'দরওয়ানকে কিছু **ঘুষ** দিয়া ভিতরে ঢুকিলাম' : যে টাকাটা 'ঘুষ' দিলাম তাহার উপর **আমার স্বত্ব** নিশ্চিতরূপে **পরিত্যক্ত** হইল এবং **দরওয়ানের স্বত্ব** উৎপাদিত **হইল**। 'অবশ্য ভিতরে ঢুকিতে পাইব'—এই প্রত্যুপকার-প্রত্যাশায় 'ঘুষ দিলাম'; দানের সময়ে আমার মনঃকষ্ট হইতেও পারে অথবা কার্যসিদ্ধিজনিত আনন্দও হইতে পারে। ইহাকে রাজসিক দান বলিতে হয়। কিন্তু ব্যাকরণে **ইহাকেও সম্প্রদানই বলিতে হইবে। 'চাকরকে মাহিনা'** এবং **'রাজাকে কর'** দেওয়াও **সম্প্রদান**। 'চাকর' ও 'রাজা' স্ব-স্ব-বৃত্তিদ্বারা যথাক্রমে 'মাহিনা' ও 'কর' এর দানপাত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন মাত্র। দান-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দত্ত অর্থের উপর দাতার **স্বত্ব**বিলোপ এবং গ্রহীতার স্বত্বোৎপত্তি ঘটে। ইহাকেও ব্যাকরণে **সম্প্রদানই** বলিতে হইবে। সুতরাং **'চাকরকে'** ও **'রাজাকে' সম্প্রদান-কারক।**

'গুরু শিষ্যকে **পাঠ দিতেছেন,** বা **শিক্ষা দিতেছেন'** 'শয়তানটাকে **শাস্তি দাও',** 'তাহাকে **অর্ধচন্দ্র দিয়া** বিদায় দিল' : এসকল ক্ষেত্রে দানক্রিয়া নাই। 'পাঠ-দে, 'শিক্ষা-দে'—**সংযোগমূলক ধাতু** এবং অর্ধচন্দ্র দেওয়া বাঙ্‌লা **বাগ্‌ধারা।**

সম্প্রদান-কারকে বিভক্তি

(ক) **সম্প্রদান কারকের** স্বকীয় বিভক্তি **চতুর্থী**। বাঙ্‌লায় **চতুর্থী** বিভক্তির চিহ্ন **দ্বিতীয়া** বিভক্তির অনুরূপ অর্থাৎ **কে, রে, এ** [য]। কয়েকটি উদাহরণ—

" পিতা **পাণ্ডবগণকে** যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা তা পাবেন না" ।—রাজশেখর।

"বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজী সঁপিছে অদ্য **তাঁরে** নিজ রাজ্য-রাজধানী"—রবীন্দ্রনাথ।

"ফিরি দিবে হারাধন কে **তোরে,** অবোধ মন "—মধুসূদন।

"তোমার অসীম প্রেমের পরশ একটুখানি **আমায়** দিও"—কবিবর।

"কর্মফল **নারায়ণে** কর সমর্পণ"—গিরিশচন্দ্র।

"**অন্নহীনে** অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে"—ইত্যাদি।

"না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন **বরে"**—ভারতচন্দ্র।

(খ) ক্বচিৎ **সম্প্রদান**-কারকে **ষষ্ঠী**-বিভক্তি হইয়া থাকে ; যথা—**ঠাকুরের** ভোগ দাও। **আমার** ভাতটা দাও না, ঠাকুর! **সরস্বতীর** অঞ্জলি দিয়েছ ?

অপাদান-কারক ও তাহার বিভক্তি নির্ণয়

অপাদান কারক

বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র 'পতিত হইয়াছে'।

স্নানকালে অঙ্গুরীয়ক **হস্ত হইতে** 'স্খলিত হইয়াছিল'।

বীজ হইতে অঙ্কুর 'উদ্গত হয়'।

লোকটা সারাজীবন **সুখ থেকে** 'বঞ্চিত রইল'।

উপরিলিখিত বাক্যগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে স্থূলাক্ষরপদসমূহের সহিত ক্রিয়া-পদগুলির অন্বয় বিশ্লেষাত্মক অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা ঐগুলি হইতে [1]বিশ্লেষ [বিচ্যুতি, ভ্রংশ, উদ্গম প্রভৃতি] বা [2]অপায় [অপগম বা অপসরণ] বুঝায়। ক্রিয়ার সহিত এইভাবে অন্বিত পদকেই অপাদান-কারক বলা হইয়া থাকে। আপেক্ষিকভাবে ধ্রুব বা স্থির **বৃক্ষ হইতে** 'পতন'-দ্বারা শুষ্কপত্র সমূহের বিশ্লেষ বা অপায় [অপ-ই+ঘঞ্] অর্থাৎ অপগম বুঝা যাইতেছে। সেইরূপ 'স্খলন'-দ্বারা **হস্ত হইতে** অঙ্গুরীয়কের, 'উদ্গত' দ্বারা **বীজ হইতে** অঙ্কুরের এবং 'বঞ্চিত থাকা' দ্বারা **সুখ থেকে** লোকটার অপায় সূচিত হইতেছে। **বৃক্ষ হইতে, হস্ত হইতে, বীজ হইতে, সুখথেকে** এইগুলি **অপাদান-**কারক। অতএব বলা যাইতে পারে—

আপেক্ষিক ভাবে *ধ্রুব বা স্থির যে পদার্থ হইতে অপর কোন পদার্থের অপায় বা বিশ্লেষ বুঝায় তাহাকে অপাদান-কারক বলে।

---

১ যতো বিশ্লেষোঽপাদানম্—কলাপ।

২ ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্—পাণিনি।

* পাতঞ্জল ভাষ্যে 'ধ্রুব' হইতে 'অপায়ে'র বিশদ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বস্তুতঃ 'ধ্রুব'— শব্দের অর্থ এখানে 'চিরস্থির' বা 'নিত্য' নহে। 'হারটা ছিনাইয়া লইয়া 'চোরটা চলন্ত গাড়ি হইতে 'লাফাইয়া পড়িল'' 'গাড়ি চলন্ত' হইলে ও 'অপায়ী' চোরের অপেক্ষায় 'ধ্রুব'। অপায়-স্থলে এই আপেক্ষিক 'ধ্রুব'ই অপাদান আখ্যা পাইয়াছে।

এই অপায় বা বিশ্লেষ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নানা ভাবে সূচিত হইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রের উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

সাধারণ অপায়—'**কোথা হতে** আগমন কী নাম, ঠাকুর ?'—রবীন্দ্রনাথ।
'ঝর ঝর ঝরে জল **চক্ষু মুখ নাকে**'—ভারতচন্দ্র।
'**সেথা হতে** সবে আনে উপহার'—রবীন্দ্রনাথ।
'মুক্ত হইব **দেবঋণে** মোরা মুক্তবেণীর তীরে'—সত্যেন্দ্রনাথ।
'.. খড়ের **আঁটি হইতে** যে স্বল্প ধুঁযাটুকু....আকাশে উঠিতেছিল'—শরৎচন্দ্র।

বিবিধ অপায়

(ক) **উৎপত্তি** অর্থে—"**তিল হইতে** তৈল হয়, **দুধে** হয় দই"—ব্রতচারী-সঙ্গীত।
হিমালয় হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।
কাল **মেঘে** বৃষ্টি হয়।
"**দেহ হৈতে** বাহির হইল ভূতগণ"—ভারতচন্দ্র।

(খ) **ভীতিও ত্রাণ** অর্থে—"**বিপদে** মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।
বিপদে আমি না যেন করি ভয়"—রবীন্দ্রনাথ।
"উগ্র **কর্মে** বা কঠোর **বাক্যে** ভয় পেযে আমরা ইন্দ্রের কাছেও নত হব না"—রাজশেখর।
"স্মরণে রাখো যদি মোরে, **মরণে** তবে কী বা ভয়"।
—কবিরত্ন।

(গ) **বিরতি**-অর্থে—**অধ্যয়নে** বিরত হইও না। 'বিরত সতত **পাপে** দেবকুল'। 'ক্ষান্ত হও এ কাল **সমরে**।' **ঝগড়া থেকে, মারামারি থেকে** সর্বদা দূরে থাকবে। **এ অপকর্ম হইতে** নিবৃত্ত হও।

(ঘ) **গ্রহণ**-অর্থে—"মাঘ মাসে **কাননে** তুলিতে নাহি শাক"—মুকুন্দরাম। পঙ্‌ক্তিটি কোন **কবিতা হইতে** উদ্ধৃত ? ভ্রমর **পুষ্প হইতে** মধু সংগ্রহ করিতেছে।

(ঙ) **অবগতি** ও **অধিগমন**-অর্থে—তোমার **পত্রে** সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আমি তাঁর **কাছ থেকে** সংস্কৃত শিখছি। **লোকমুখে** ইহা শুনিতে পাইযাছি।

(চ) **মুক্তি**-অর্থে—'পাপের **হাত থেকে** বাপেরও রেহাই নাই'—প্রবচন। "আপনি ক্ষত্রিয়গণকে **মৃত্যুপাশ-থেকে** মুক্ত করুন"—রাজশেখর। **কিছুতেই** এ **দায়িত্ব থেকে** অব্যাহতি পাবে না।

(ছ) **অবধি**-অর্থে—**এখান থেকে** কলকাতা পাঁচ মাইল। **স্বাধীনতা-লাভ হইতে** আজ পনের বৎসর অতীত হইয়াছে।

এইরূপ নানাভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অপায় বা বিশ্লেষের দ্যোতনায় অপাদান কারকের প্রয়োগ হয়। মোটকথা, **যাহা হইতে** কোন ব্যক্তি বা বস্তু **ভ্রষ্ট, স্খলিত, অপসৃত, চলিত, গৃহীত, ভীত, রক্ষিত, মুক্ত, নিবৃত্ত, অবগত, আরব্ধ, বঞ্চিত, উৎপন্ন, লজ্জিত,** প্রভৃতি বুঝাইবে তাহাকেই **অপাদান পদ** বলিয়া ধরিতে হইবে।

অপাদান-কারক সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজা রামমোহন রায়, অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেহ কেহ **'হইতে'**-কে **বিভক্তি-চিহ্ন**বলিয়া স্বীকার করেন। সুনীতিবাবুর মতে—

'হইতে (হ'তে)' শেষক অনুসর্গ পঞ্চমী "বিভক্তির কাজ চালায়"—অপাদান কারকেও, কারক-ভিন্ন স্থলেও।'

কিন্তু পূর্ববর্তী দুইজন বাঙ্‌লায় অপাদান কারকের অস্তিত্বই দেখিতে পান নাই। ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—

অপাদান কারক বিভক্তি-চিহ্ন লইতে চায় না, post-position বা পরবর্তী অব্যয় পদ দ্বারা কাজ চালায়—'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে, বাঘ হইতে ভয় পায়, হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে'।......'ঘোড়া বাঘ' এবং 'হিমালয়' এর যখন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অবধি নাই, তখন লাঠি তুলিলেও উহাদিগকে অপাদান-কারক বলিতে পারিব না। ..বাঙ্‌লায় সম্প্রদান কর্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটিকে উঠাইতেই হইবে।"

বক্তা সাহসী, সন্দেহ নাই; লাঠির ভয়েও পশ্চাৎপদ হইতে রাজী নহেন; সম্প্রদান ও অপাদানকে বাস্তুহারা করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু যাহাদের 'অস্তিত্বই নাই' তাহাদিগকে কেমন করিয়া 'উঠাইতেই হইবে'? দেখা যাইতেছে অন্যের লাঠিকে ভয় না করিয়া ত্রিবেদীমহাশয় 'সম্প্রদান' ও 'অপাদান'-কে উদ্বাস্তু করিবার জন্য নিজেই লাঠি তুলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতেই **অপদানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়।** যখনই

বলিযাছেন—"অপাদান কারক বিভক্তি-চিহ্ন লইতে চায না", তখনই তিনি অপাদান-কারককে স্বীকার করিযাছেন। নতুবা যে নাই তাহার আবার চাওয়া, না-চাওয়া কী? তাঁহার "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয"টি হয়ত সকলে বুঝিতে পারিবেন না। 'ঘোড়া', 'বাঘ' এবং 'হিমালয়' তো শব্দমাত্র। শব্দের আবার অন্বয কী? **'ঘোড়া-হইতে'**, **'বাঘ-হইতে'** এবং **'হিমালয়-হইতে'** পঞ্চমী-বিভক্তিযুক্ত পদ এবং উহাদেরই সহিত পরবর্তী ক্রিয়াপদ সমূহের অন্বয। বলাবাহুল্য **'হইতে'** যে পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন তাহা **বিভক্তির** আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখিত হইযাছে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"হইতে" 'বিভক্তি', অনুসর্গ নয, কারণ সংস্কৃত পঞ্চমী বহুবচন 'ভ্যস' প্রাকৃতে 'হিংতো' ও 'সুংতো' রূপ গ্রহণ করে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, এই 'হিংতো' বা 'হিন্তো' আমাদের 'হইতে'র আদিরূপ। বররুচির 'প্রাকৃত প্রকাশ' ব্যাকরণে দেখা যাইবে পঞ্চমী বহুবচনে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এবং সর্বনামের 'হিন্তো' ও 'সুন্তো'—যুক্ত রূপ। অস্মদ্-শব্দের পঞ্চমী বহুবচনে প্রাকৃত রূপ 'অহ্মাহিন্তো' তুহ্মাহিন্তো'-র সহজ বিবর্তিত রূপ। বাঙ্‌লা 'অমাহন্তে'—'আমাহতে'—আমাহ'তে—হইতে ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলা কাব্যে 'হন্তে', 'হন্তের' প্রয়োগ আছে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'আমা হইতে' তো আমরা একবচনে ব্যবহার করি, বহুবচনের রূপ হইতে একবচনের রূপ আসিয়াছে এ কথা মানিব কেন? ইহার উত্তর এই যে জগতে অলৌকিক ঘটনা যে ঘটে না এমন তো নয।

অস্মদ্ শব্দের তৃতীয়া বহুবচন রূপ 'অস্মভি' হইতে যদি বাঙ্‌লা প্রথমা একবচন 'আমি' ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, আমাদের আমা হইতে কি অপরাধ করিল?—সে তো আপন ঘরেই (পঞ্চমীতে) রহিযাছে, এমন কি কোন ধরান্তরে তো দৌড়-ঝাঁপ করে নাই। আমাদের মতে 'হইতে' বিভক্তি-চিহ্ন, অনুসর্গ নয।

'থেকে,' এবং **'চেয়ে'** পঞ্চমী-বিভক্তিস্থানীয **অনুসর্গ**। আর একটি বিষয়ে বৈয়াকরণগণের দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। **অনুসর্গ**-প্রসঙ্গে বলা হইযাছে—যাহারা স্বরূপে কেবল বিভক্তির দ্যোতনা করে তাহাদিগকেই অনুসর্গ বলিতে হইবে; বিভক্তির কাজ না চালাইয়া নিজেরাই যদি বিভক্তিযুক্ত হয এবং বিশেষ অর্থ বহন করিয়া পদরূপে ব্যবহৃত হয, তাহা হইলে তাহাদিগকে অনুসর্গ বলিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না। সুনীতিবাবুর **'অপাদান-কারকে অনুসর্গ'** হইতে দুইটি উদাহরণ গৃহীত হইল—'এই **লোকগুলির কাছ থেকে** টাকা পেযেছি।'

"এক কাফের **পাদ্রীর নিকট হইতে** পলাইয়া বাদশাহী বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল"—রাখালদাস।

এই বাক্য দুইটিতে স্থূলাক্ষর অংশদ্বয় সুনীতিবাবুর মতে অনুসর্গ-যোগে অপাদান-কারকের দৃষ্টান্ত। কিন্তু **লোকগুলির কাছ-থেকে** কি একটি পদ? **পাত্রীর নিকট-হইতেও** [১]একটি পদ? স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে **লোকগুলির** ও **পাত্রীর** ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত এক একটি পদ এবং **কাছ-থেকে** ও **নিকট-হইতে** পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত স্বতন্ত্রপদ। কাজেই পদ পরিচয়ে বলিতে হয়—**কাছ-থেকে, নিকট-হইতে**—অপাদানে পঞ্চমী; **লোক গুলির, পাত্রীর**—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। **'কাছ', 'নিকট'** এখানে সংস্কৃতের **'সমীপ'** শব্দের সমার্থক এবং অনুরূপ বিশেষ্য। সুনীতিবাবুকে সমর্থন করিতে হইলে বলিতে হয় **লোকগুলির-কাছ, পাত্রীর-নিকট**—অলুক্ ষষ্ঠীতৎ পুরুষ-নিষ্পন্ন শব্দ, যথাক্রমে—অনুসর্গ **থেকে** এবং বিভিক্তি-চিহ্ন **হইতে**-র যোগে অপাদান কারকে পরিণত হইয়াছে।

১ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের বহুল-প্রচারিত 'বাগ-দীপ' হইতে একটু উদ্ধৃতির লোভ-সম্বরণ করা গেল না। উহাতে রহিয়াছে—"অপাদান কারকের পদ ব্যক্তিবাচক হইলে 'হইতে' বা 'থেকে' শব্দের পূর্বে কখনও কখনও 'নিকট বা 'কাছ' শব্দ প্রযুক্ত হয়; যথা—পিতার নিকট হইতে টাকা আনিয়াছে। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় হয়। 'নিকট' বা 'কাছ' শব্দের যোগে অপাদান কারকের পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।"

বৈযাকরণের উক্তি অনুসারে পিতার ও প্রজাদের ষষ্ঠী-বিভক্তিযুক্ত অপাদান কারক-পদ এবং নিকট, হইতে, কাছ, থেকে চারিটি শব্দ। কিন্তু কোন্ প্রকারের শব্দ? বাক্যে যখন স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তখন নিশ্চিতরূপে পদ। কিন্তু বৈযারকণ এ বিষয়ে নীরব। কোন্ অপরাধে ইহাদের 'পরমপদ'—প্রাপ্তি ঘটিল বুঝিতে পারা যায় না।

অপাদান-কারকে বিভক্তি

(ক) **অপাদান**-কারকে **পঞ্চমী**-বিভক্তি হয়। **পঞ্চমী অপাদান**-কারকের স্বকীয় বিভক্তি। পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন—**হইতেন** [হ'তে] **এ** [**তে, য়**], এবং দ্যোতক অনুসর্গ—**থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা।**

"নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস **কাশী-হৈতে** যান"—ভারতচন্দ্র।

"বন-হ'তে এলো এক টিয়ে মনোহর"—ঈশ্বর গুপ্ত।

"**নন্দন-কানন হ'তে** যে সুজন আনে—
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে"—মধুসূদন।

"তেজস্বী দৈত্যের **নামে** হইযা শঙ্কিত"—হেমচন্দ্র।

"নানা কবি ঢালে গান **নানাদিক্ হ'তে**"—রবীন্দ্রনাথ।

"মুক্ত হইব **দেবঋণে** মোরা মুক্তবেণীর তীরে"—সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।

"আমার **চক্ষুতে** জলধারা বহিতে লাগিল"—বিদ্যাসাগর।

"ভিড়ের **ভিতর থেকে** একটি লম্বা ছিপ ছিপে লোক বেরিয়ে এল"—প্রমথচৌধুরী।

"সেই সময পৃথ্বীরাজ **ঘোড়া থেকে** ঘুরে পড়লেন"—অবনীন্দ্রনাথ।

(খ) কখনও কখনও **অপাদানে দ্বিতীয়া**-বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হইযা থাকে; যথা—"তুই কোন্ রাজার বেটা **তোরে** ভয় কী?"—কৃত্তিবাস।

"আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—**যমকে** ভয করিনে, তা জানিস?"—শরৎচন্দ্র।

(গ) সমযে সমযে **অপাদান**-কারকে তৃতীয়া-বিভক্তি সূচক অনুসর্গ **'দিয়া'** [**দিয়ে**] ব্যবহৃত হয়; যথা—

"**চক্ষুদিয়া** পড়ে জল দরদর অবিরল"—কবিরত্ন।

"তাঁহার গৌরবর্ণ **ললাট দিয়া** রক্ত…পড়িতেছে"—রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) **অপাদান**-কারকে ষষ্ঠী বিভক্তিও হইতে পারে; ইহাকে **অপাদান-সম্বন্ধে ষষ্ঠী** বলা যায; যথা—

"যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয"—প্রবচন।

গাছের পাতাগুলো ঝ'রে পড়ছে।

তাঁর **চোখের** জল পড়তে লাগল।

(ঙ) ক্বচিৎ **অপাদানে** পঞ্চমী **বিভক্তি—চিহ্ন** উহ্য থাকে; যথা—"করিলাম মন **শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরি"—রবীন্দ্রনাথ। যে-সব ছেলে **স্কুল** পালায় বা [**কলেজ** পালায়] তাদের লেখা-পড়া হ'তে পারে না।—এই সকল স্থলে **পঞ্চমী** বিভক্তির চিহ্ন **'হইতে' উহ্য** রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

[কেহ কেহ ইহাকে 'অপাদানে প্রথমা' বা 'শূন্য বিভক্তি' বলিয়াছেন। 'শূন্যবিভক্তি কথাটি যে অর্থহীন তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অর্থের কথা না ভাবিলে

কেবল রূপবিচারে প্রাণহীন পদার্থ **প্রথমা** ও **দ্বিতীয়াতে** একই প্রকার হইয়া থাকে। যাঁহারা অর্থকে বর্জন করিয়া রূপকে গ্রহণ করিতে চাহেন তাঁহাদের যুক্তিতেই এইগুলিকে 'অপাদানে দ্বিতীয়া'ও বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে **রূপের ও অর্থের সুসঙ্গতি বিধানই** ব্যাকরণের কার্য। আর তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থাপিত করিতেছি]। **শ্রীবৃন্দাবন, স্কুল, কলেজ**—রূপে প্রথমা বা দ্বিতীযার মত হইলেও বস্তুতঃ **পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত অপাদান পদ ; বিভক্তির চিহ্ন অপ্রযুক্ত।**

অধিকরণ-কারক ও তাহার বিভক্তি-নির্ণয়

অধিকরণ কারক

(ক) "**জীবন-উদ্যানে** তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতদিন রবে ?"—মধুসূদন।

(খ) "নববর্ষের **পুণ্য বাসরে** কাল বৈশাখী আসে"—মোহিতলাল।

(গ) "রামানন্দ দুইহাত বাড়িযে তাকে নিলেন **বক্ষে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(ক) বাক্যে **কর্তা** 'যৌবন-কুসুম-ভাতি'-র 'রহা'-**ক্রিয়া** সম্পন্ন হইবে স্থান-বাচক **জীবন-উদ্যান**-আধারে। (খ) বাক্যে **কর্তা** 'কাল বৈশাখী'-র 'আসা'-**ক্রিয়া** সম্পন্ন হয় কাল বাচক **পুণ্যবাসর**-আধারে।

(গ) বাক্যে **কর্তা** 'রামানন্দ' **কর্ম** 'তাকে' 'নেওয়া'-**ক্রিয়া** সম্পন্ন করিলেন স্থানবাচক '**বক্ষ**'-আধারে। **জীবন-উদ্যানে, পুণ্যবাসরে** এবং **বক্ষে**—এই নামপদ তিনটি[1] সহিত যথাক্রমে 'রবে', 'আসে' এবং 'নিলেন' ক্রিয়াপদ তিনটির অন্বয় বর্তমান বলিযা উহাবা যে **কারক** সে বিষযে কোনও সন্দেহ নাই। তবে ইতঃপূর্বে যে সকল কারকের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদের সহিত ক্রিয়ার যেরূপ সম্পর্ক এইপদগুলি সম্পর্ক তাদৃশ নহে। ইহাদের দ্বারা কর্তার ক্রিয়া নিষ্পাদনের[2] **আধার**

১ "আধারোঽধিকরণম্'—পাণিনি।

২ '**কর্তৃকর্মদ্বারা তন্নিষ্ঠক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণসংজ্ঞং স্যাৎ**'—সিদ্ধান্ত কৌমুদী।

সূচিত হইতেছে। তাই, ইহারা[২] **অধিকরণ কারক।** অতএব বলা যাইতে পারে—

কর্তার কর্তৃত্বে যে আধারে ক্রিয়ানিষ্পত্তি ঘটে অথবা কর্ম ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাকে অধিকরণ-কারক বলে; যথা—

"রাধার কি হৈল **অন্তরে** ব্যথা"—চণ্ডীদাস। "পড়ু তাব **মুণ্ডে** বাজ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। "ভেরেণ্ডাব খাম ওই আছে **মধ্যঘরে**"।—**বৈশাখ মাসে** নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে"—কবিকঙ্কণ। "নীরবিন্দু **দূর্বাদলে** নিত্য কিরে ঝলমলে ?"—মধুসূদন। "ওই যে কাঙ্গাল বসি **রাজপথধারে**"—নবীন চন্দ্র। "হয যুদ্ধ অহরহঃ **স্বর্গ-বহির্দেশে**"—হেমচন্দ্র। "এই **সুরসাধনায়** পৌছিলনা বহুতরডাক"—রবীন্দ্রনাথ। "আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই **তীর্থে** বরদ **বঙ্গে**"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। "হেরি যে হোথায **আকাশ-কটাহে** ধূম্রমেঘেব ঘটা"—মোহিতলাল। "কেহ টেবিলের **নীচে** গড়ায"—বঙ্কিমচন্দ্র। "আমাব **থিয়েটারে** হারমোনিযম বাজাতেই হবে"—শরৎচন্দ্র।

অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ

আধারের স্বরূপভেদে অধিকরণেরও প্রকার ভেদ হইতে পারে। 'আধাব'-এর দ্বারা ক্রিযানিষ্পত্তির (১) **স্থান (বা দেশ)** বুঝাইলে **স্থানাধিকরণ** (২) **কাল** বুঝাইতে **কালাধিকরণ,** (৩) **বিষয়** বুঝাইলে **বিষয়াধিকরণ** এবং (৪) **ভাব** বুঝাইলে[১] **ভাবাধিকরণ** বলা যায়।

১ 'ভাবাধিকরণ' নামটি অধ্যাপক সুনীতিকুমারের দেওয়া। 'কাল, দেশ বা বিষয়ের সীমায পড়ে না' এমন আধারের জন্যই এই স্বতন্ত্র প্রকারের অবতারণা। তবে মনে রাখিতে হইবে এখানে 'ভাব' কথাটি 'অবস্থা' অর্থেই প্রযুক্ত হইযাছে। বাঙ্‌লায 'অবস্থা'-অর্থে 'ভাব'-এর বহুল প্রযোগ রহিযাছে; যেমন—রোগীর ভাব [=অবস্থা] ভাল মনে হ'চ্ছে না, সে কী ভাবে [=অবস্থায] আছে জানি না, ইত্যাদি। কাজেই ভাবাধিকরণ' সার্থক সংজ্ঞা।

২ সংস্কৃতে 'অর্থ ও ব্যাপ্তি' উভয়কে একযোগে আধার-ভেদের ভিত্তিরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বৈষয়িক অধিকরণ আধারের অর্থভিত্তিক প্রকারভেদের নিদর্শন। যে আধাবের দ্বারা কোনও বিষয়ের' বোধজন্মে তাহাকে বৈষযিক অধিকরণ বলা হয। এখানে 'বিষয' ও 'ব্যাপার' সমার্থক।

(১) **স্থানাধিকরণ**—"**আকাশে** পূর্ণচন্দ্র ['ছিল'—ক্রিয়াপদ উহ্য]"—শরৎচন্দ্র। "অন্দরের **দরজাতেই** ধরা প'ড়েগেলেন"—অবনীন্দ্রনাথ। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের **হাতে**"—প্রমথ চৌধুরী। "দেখিলে **শরীরে** রোমাঞ্চ হয়"—রবীন্দ্রনাথ। "ভগ্ন শৈল সেই **তুষারশয্যায়** শায়িত হইল"—জগদীশচন্দ্র। "··আমার **চালাঘরে** নদী বহে"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) **কালাধিকরণ**—"**সময়ান্তরে** আগামী **বৎসরে** তুমি আমার নিকটে আসিও"—বঙ্কিম চন্দ্র। "লজ্জিতে হবে **রাত্রি-নিশীথে**"—নজরুল। "সে আসিছে আজ **কাল-বৈশাখে**"—মোহিত লাল। "**দিবসেতে** সেথা কত কোলাহল" —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। "**সন্ধ্যাবেলায়** ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন"—রবীন্দ্রনাথ। "বস্তুত আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি **জীবনে** অল্পই দেখিয়াছি" —শরৎচন্দ্র।

(৩) **বিষয়াধিকরণ** [বা **বৈষয়িক** অধিকরণ]—"· আমি তাঁহার **পাহারায়** নিযুক্ত থাকি··"—শরৎচন্দ্র। "এমনি নানা **আমোদে** মত্ত থাকে"—অবনীন্দ্রনাথ। "বাবুরাম বাবু কেবল **ধন-উপার্জনেই** মনোযোগ দিতেন"—টেকচাঁদ ঠাকুর। "শুধু **লাঠিখেলাতে** নয়, পৃথিবীর সব **খেলাতেই**—যথা, সাহিত্যের **খেলাতে**, পলিটিক্‌সের **খেলাতে**, তিনিই দিগ্বিজয়ী হন····"—প্রমথ চৌধুরী।

(৪) **ভাবাধিকরণ**—"**সুখে** আছে সর্বচরাচর"—রবীন্দ্রনাথ।

"দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—**আঁধারেতে** থাকে হাট"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

"দুই ভাই ব্রজে **প্রেমাবেশে** মজি বিভোর আছেন **সুখে**"—কবিশেখর।

"কে দিল ঔষধ **রোগে**····?"—অক্ষয় বড়াল।

"**শীতে হিমে** রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

"তাই মনে হয় দিবসে নিশীথে, **তন্দ্রায় জাগরণে**"—মোহিতলাল।

"দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় অজস্র সহস্রবিধ **চরিতার্থতায়**"—রবীন্দ্রনাথ। "মূক যারা **দুঃখে সুখে**"—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাপ্তি-র ভিত্তিতে আধার দ্বিধা বিভাজ্য (ক) **ব্যাপ্তিমূলক** ও (খ) **অব্যাপ্তিমূলক** [=যেখানে ব্যাপ্তির প্রশ্ন উঠে না]। **ব্যাপ্তিমূলক** অধিকরণ দুইভাগে বিভক্ত

(১) **ঐকদেশিক** এবং (২) **অভিব্যাপক ;** আর **অব্যাপ্তিমূলক** অধিকরণও দুইপ্রকার (৩) **বৈষয়িক** এবং **সামীপিক।** (১) **ঐকদেশিক—যে আধারের একদেশ অর্থাৎ মাত্র একটি অংশব্যাপিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে ঐকদেশিক অধিকরণ বলে ;** যথা—"**আশ্বিনে** অম্বিকা পূজা করে জগজনে" —কবিকঙ্কণ। "বিকল-হৃদয় ডোবে **শোক-সাগরে,** মৃণাল যথা **জলে**"—মধুসূদন। "**সাগর-জলে** সিনান করি সজল এলোচুলে বসিয়াছিলে **উপল-উপকূলে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(২) **অভিব্যাপক—কর্তার ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যাপারে যে আধারের সামগ্রিক ব্যাপ্তি বুঝায় তাহাকে অভিব্যাপক অধিকরণ বলে ; যথা**—"**পৌষে** প্রবল শীত", "**মধুমাসে** মলয় মারুত মন্দ মন্দ"—কবিকঙ্কণ। "বকের **পাখায়** আলোক লুকায়"—যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত। "**তৃণ-অঙ্কুরে** সঞ্চারি রস, মধু ভরি **বুকে** মৃত্তির"—মোহিতলাল। "শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক **দেহে** হল লীন"—রবীন্দ্রনাথ. "**গন্ধে** বিষ আছে—বঙ্কিমচন্দ্র। "**দীপে দীপে** ঢালি দিয়া অমৃত-মদিরা জাগায়েছ **অঙ্গে অঙ্গে** অপরূপ অপূর্ব পুলক"—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

(৩) **বৈষয়িক বিষয়াধিকরণ**-প্রসঙ্গে ইহার কথা বলা হইয়াছে।

(৪) **সামীপিক—আধারবাচক পদের দ্বারা উহার সমীপবর্তিতা সূচিত হইলে উহাকে *সামীপিক অধিকরণ বলা যাইতে পারে ;** যথা—"চরকার দৌলতে আমার **দুয়ারে** [=দ্বারের সমীপে] বাঁধা হাতী।" সেবার **গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে** [=গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের সমীপে] কুম্ভমেলা হইয়াছিল। "বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে [=বাতায়নে-সমীপে]"—রবীন্দ্রনাথ।

অধিকরণ কারকে বিভক্তি

অধিকরণ-কারকের স্বকীয় বিভক্তি **সপ্তমী** (ক) উহার চিহ্ন এ [তে, য়]। বিবিধ অধিকরণের বহু উদাহরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

* বোপদেব রচিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের মতে।

"হাটে মাটে মাঠে গৃহে গোঠে [ঐকদেশিক স্থানাধিকরণ] সবাকার ধান"
—কবিকঙ্কণ।

"পরদিনে [ঐকদেশিক কালাধিকরণ] রামদাস গেলেন রাজার পাশ"—রবীন্দ্রনাথ।

"চণ্ডাল **শবদাহে** [বৈষয়িক অধিকরণ] ব্যাপৃত"—রবীন্দ্রনাথ। "কোথা সে মাধুরী আধো আধো **বোলে**" [অভিব্যাপক অধিকরণ] করুণানিধান। "....**বিকালবেলায়** [ঐকদেশিক কালাধিকরণ] যে যাহার সবে **ঘরে** [স্থানাধিকরণ] ফিরে যায়"—যতীন্দ্র নাথসেনগুপ্ত। "**দিল্লীতে** [ঐকদেশিক স্থানাধিকরণ] তোমার মত কয়টা বানর আছে"—বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি।

(খ) কখনও কখনও অধিকরণে সপ্তমীচিহ্ন লুপ্ত থাকে ; যথা—

"শিবাজী হেরিলা **একদিন**" [ঐকদেশিক কালাধিকরণ]—রবীন্দ্রনাথ।

"রামদাস গুরু তার ভিক্ষা মাগি **দ্বার দ্বার** ফিরিছেন যেনঅন্নহীন [সামীপিক অধিকরণ]—রবীন্দ্রনাথ।

শনিবার শনিবার ছুটি পাইলে, **বৈদ্যবাটি** যাইবে [স্থানাধিকরণ] টেকচাঁদ ঠাকুর।

"সেই **সময়** পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন"—অবনীন্দ্রনাথ।

(গ) ক্বচিৎ অধিকরণ কারকে **'কে'** বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। ইহাকেও **অধিকরণে সপ্তমী** বিভক্তিই বলিতে হইবে, কারণ এই **'কে'** দ্বিতীয়ার চিহ্ন নহে। মূল শব্দটির স্বার্থে **'ক'** প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার পর সপ্তমীচিহ্ন **এ** সংযোজিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; যথা—"**আজিকে** [আজি+ক+এ] যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ"—মোহিতলাল।

(ঘ) 'সংস্কৃতে ল্যপ'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হইলে তাহার অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। সংস্কৃতের ক্ত্বাচ্-ল্যপ্' এর স্থানে বাঙ্‌লায় ধাতুর সহিত **'ইয়া'**প্রত্যয় যুক্ত হয়। ফলে বাঙ্‌লাতেও **'ইয়া'** প্রত্যযন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের **অপ্রয়োগে** অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয ; যথা—**গৃহ হইতে** [=**গৃহে থাকিয়া**] আগন্তুককে দেখিতে পাইলাম ['থাকিয়া' এই **ইয়া** প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া লুপ্ত হওযায় 'গৃহে' না হইয়া **গৃহ হইতে** হইয়াছে।] **'রথ হৈতে** [=**রথে** 'বসিয়া' [চাহি দেখে বাণ— কৃত্তিবাস। **হোটেল থেকেই** [=**হোটেলে** 'থাকিয়া'] খাওয়াটা সেরে নিয়েছি' ইত্যাদি।

(ঙ) ক্বচিৎ **অধিকরণে তৃতীয়া** বিভক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয ; যথা— **ঘরদিয়া** [=**ঘরেতে**] জল পড়ে। ভাঙ্গা **নৌকা দিয়া** [=**নৌকাতে**] জল উঠিতে লাগিল।

(চ) কখনও কখনও **অধিকরণপদে** ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হয। ইহাকে **অধিকরণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী** বলাই যুক্তিযুক্ত ; যথা - **বনের** [=**বনে** বাস-কবা] বাঘে খায না তো **মনের** [=**মনে** কল্পিত] বাঘে খায' প্রবচন।

সম্বন্ধপদ ও তাহার বিভক্তি-নির্ণয়

সম্বন্ধপদ

(ক) সম্বন্ধ পদ যে কাবক নহে তাহা পূর্বে বিশদভাবে আলোচিত হইযাছে। এখানে উহার সংজ্ঞানিরূপণ বিষযে দুই চারিটি কথা বলা হইতেছে। **নামপদের** [বিশেষ্যের ও সর্বনামের]**সহিত নামপদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধকে *শেষ** বলে। এই **শেষ**-সম্বন্ধযুক্ত পদই সাধারণভাবে **সম্বন্ধপদ** আখ্যা পাইযাছে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয ; যথা ;— **রামের** ভাই ? **আশার** মাযা ; **প্রেমের** নিগড ; **অভাগার** কানে ;' '**আমার** শোণিতে' ; 'রামানন্দ পেলেন **গুরুর** পদ' ; ইত্যাদি।

(খ) **ক্রিয়ার** সহিত যাহার সাক্ষাৎ **সম্বন্ধ** তাহা **কারক**। কিন্তু বাঙ্‌লায বহু স্থলেই তো প্রধান ক্রিযার পরিবর্তে ক্রিযাবাচক বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত হয সে সকল ক্ষেত্রে কী হইবে ? ইহা একটি বিচিত্র মিথ্যা সন্দেহ নাই। তাই ইহার সমাধানও একটু বিচিত্র। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াপদটির কারকই তাহার বিশেষ্যরূপে তাহার সহিত নূতন সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছে ; উহাদের সম্বন্ধ হইল **কারক-সম্বন্ধ**। একটি উদাহরণ লইলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে। **রামের** 'খাওয়া'—এখানে' 'খাওযা' ব্যাপাররূপ ক্রিয়ার 'কর্তা, **রাম** ক্রিযাবাচক বিশেষ্য 'খাওয়া'র সহিত যে সম্পর্কে বাঁধা পড়িয়াছে তাহা **নাম পদের সহিত নামপদের সম্বন্ধ** ; **রামের** সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; কিন্তু ক্রিযার সহিত কর্তার সম্পর্কটিও অবহেলাব নহে, তাই ইহাকে বলা হইবে—কর্তৃসম্বন্ধে ষষ্ঠী। অন্যান্য কারকের ক্ষেত্রেও বাঙলায় এইরূপ বহুল প্রযোগ রহিয়াছে।

(গ) উক্ত দুই প্রকার সম্বন্ধ ছাড়া আরও একটি সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। **অনুসর্গ**-প্রয়োগে বিভক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইহার কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইল **নামপদের সহিত অনুসর্গের সম্বন্ধ**। আমরা এই সম্বন্ধের নাম দিয়াছি **আনুসর্গিক সম্বন্ধ**। **ইহার চেয়ে** "হতেম যদি আরব বেদুইন"—রবীন্দ্রনাথ। **ইহার চেয়ে**—পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদ, [চেয়ে,—পঞ্চমী-বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ] **ইহার** পদের 'র' অনুসর্গ সম্বন্ধী চিহ্নমাত্র। **ইহার**—ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদ নহে। **রামকে দিয়ে** আমার চ'লবে না'—এখানেও রামকে দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত নহে; **'কে'**—অনুসর্গ সম্বন্ধী চিহ্ন, **দিয়ে** [দিয়া]—তৃতীয়া-বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ, এবং **রামকে দিয়ে**—তৃতীয়া-বিভক্তিযুক্ত পদ। **ইহার** এবং **'কে' অনুসর্গ সম্বন্ধী**।

লক্ষণীয়ঃ ইংরেজীতে 'of' পূর্বে থাকিলে অথবা **'s'** পরে থাকিলেই Noun-এর Possessive case হয়; কিন্তু ইংরেজীর case এবং বাঙ্‌লার **কারক** এক নহে; বাঙ্‌লার **র** [**এর**] যুক্তপদ **সম্বন্ধ পদ,** সম্বন্ধ কারক নহে। তবে ইংরেজীর Possessive বা Genitive case এর মত বাংলায়ও সম্বন্ধ পদের ব্যবহার অত্যধিক। "এই আধিক্যের একটি কারণ খাঁটি বাঙ্‌লা যতদূর সম্ভব সমাসবদ্ধ পদ বর্জন করিতে চায়। সম্বন্ধ যুগপৎ ব্যবধান ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে—। ইহা ছাড়া, সম্বন্ধ বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বারা বাঙ্‌লা ভাষা বিশেষণের কাজও চালাইতে চায়। সেজন্য বাঙ্‌লার বহু সম্বন্ধ পদই * **বিশেষণেরই** বিশেষ্য রূপ"—কবিশেখর কালিদাস রায়। উদাহরণ **শরীরের** [=শারীরিক] ব্যাধি; **মনের** [=মানসিক] পীড়া; **দানবের** [=দানবীয়] মূর্তি; ইত্যাদি।

* 'কারকপ্রাতিপদিকার্থব্যতিরিক্তঃ **স্বস্বামিভাবাদি সম্বন্ধঃ** শেষঃ'—সিদ্ধান্ত কৌমুদী।' কর্মাদি-ভোঽন্যঃ প্রাতিপদিকার্থব্যতিরিক্ত স্বস্বামিসম্বন্ধাদিঃ শেষ'—কাশিকা।

* সংস্কৃতেও শেষ-সম্বন্ধযুক্ত পদকে বিশেষণ বলা হইয়াছে। 'রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যত্র রাজা বিশেষণম্ পুরুষো বিশেষ্য ইতি'—মহাভাষ্য।

সম্বন্ধের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ মূলতঃ **তিন** প্রকার ; যথা—(ক) **কারক সম্বন্ধ** (খ) **শেষ সম্বন্ধ** এবং (গ) **আনুসর্গিক সম্বন্ধ**।

(ক) কারক সম্বন্ধ ছয় প্রকার [যেহেতু কারক ছয়টি] ; যথা—

(১) **কর্তৃ**-সম্বন্ধ—**দেবতার** আবির্ভাব ; **তাঁহার** আগমন ; **তোমাদের** পাঠ্য ; ইত্যাদি।

(২) **কর্ম** সম্বন্ধ—**সরস্বতীর** পূজা ; **আর্তের** সেবা, **ব্যাকরণের** আলোচনা ; ইত্যাদি।

(৩) **করণ** সম্বন্ধ—**চোখের** দেখা ; **হাতের** বাড়ি ; **তাসের** খেলা ; ইত্যাদি।

(৪) **সম্প্রদান** সম্বন্ধ—**ঠাকুরের** ভোগ ; "**দেবতার** ধন কে যায় ফিরায়ে ল'য়ে এইবেলা শোন্"—রবীন্দ্রনাথ।

(৫) **অপাদান** সম্বন্ধ—'কেন **চোখের** জলে ভিজিয়ে দিলামনা ; **ভূতের** ভয় ; **দূরের** শব্দ ; ইত্যাদি।

(৬) **অধিকরণ** সম্বন্ধ—'বহে মাঘ মাস **শীতের** বাতাস'—রবীন্দ্রনাথ। **তীর্থের** কাক, **বনের** পাখী ; **জলের** মাছ ; **স্কুলের** ছাত্র ; 'জানিস আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে'—শরৎচন্দ্র।

(খ) **শেষ** সম্বন্ধ নানাপ্রকারের ; তাহাদের প্রধান ভেদগুলির উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

(১) **স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধ**—[সম্পত্তি এবং উহার মালিকের পারস্পরিক সম্বন্ধ] **রাজার** রাজ্য বা **রাজ্যের** রাজত্ব **আমাদের** বাড়ী, **ছাতুবাবুর** বাজার, **মেয়েদের** শাড়ী, **বাদশাহের** গোলাম, **বাড়ীর** কর্তা, **টাকার** লোক, ইত্যাদি।

(২) **জন্য-জনক-সম্বন্ধ** [জাতক ও জন্মদাতার পারস্পরিক সম্বন্ধ] **বাপের** বেটা, **ধনুকের** টঙ্কার, **গাছের** ফল, **জলের** দাগ, **রামবাবুর** ছেলে, **মেয়ের** বাপ, **ফুলের** গাছ,

(৩) **কার্য-কারণ-সম্বন্ধ**—**মেঘের** ছায়া, **অগ্নির** উত্তাপ, **বঙ্কিমের** উপন্যাস, কালিদাসের মেঘদূত, 'ঝড় বিদ্যুৎ, **বজ্রের** ধ্বনি,—মোহিতলাল।

(৪) **আধার-আধেয়-সম্বন্ধ**—আধার এবং তাহাতে অবস্থিত পদার্থের পারস্পরিক্ সম্বন্ধ] 'চল্ তোরে দিয়ে আসি **সাগরের** জলে'—রবীন্দ্রনাথ। **ফলের** ঝুড়ি, **গাঁজার** কলকে, **খামের** চিঠি, 'ধরে সে **দুধের** বাটি'— নজ্‌রুল।

বস্তুতঃ আধেযের সম্বন্ধ অধিকরণ সম্বন্ধ, এবং আধারের সহিত আধেযের সম্বন্ধই আধারাধেয সম্বন্ধ।

(৫) **অঙ্গাঙ্গী**-সম্বন্ধ [অঙ্গীর সহিত অঙ্গের এবং, অঙ্গের সহিত অঙ্গীর সম্বন্ধ]— **হাতীর** দাঁত, **গণ্ডারের** চামড়া, **পর্বতের** শিখর; **ঘাট-বৈঠার** ছিপ, **রক্তমাংসের** শরীর, ইত্যাদি।

(৬) **বাহ্য-বাহন**-সম্বন্ধ [যে বহন করে' এবং 'যাহা বহন করে'—তাহাদের পারিবারিক সম্বন্ধ]—**ডাকের** চিঠি, **তারের** খবর, **মাথার** বোঝা, **চিঠির** ডাক, **চিনির** বলদ, **মালের** জাহাজ, ইত্যাদি।

(৭) **প্রকৃতি-বিকৃতি**-সম্বন্ধ [প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান এবং বিকৃতি অর্থাৎ উপাদত্ত বা প্রস্তুত পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক]—**মাটীর** পুতুল, **সোনার** হার, **মাছের** কালিয়া, **চামড়ার** জুতো; **হারের** সোনা, **জুতোর** চামড়া,সন্দেশের ছানা।

(৮) **স্বভাব**-সম্বন্ধ—**রামের** ভাই, **চামেলীর** দিদি, **মামার** শালা, **পিসের** ভাই, **বৌদির** বোন, **কাকার** পিস্‌শ্বশুর, **ইলার** বন্ধু, **অর্জুনের** সখা **তোমার** শত্রু ইত্যাদি।

(৯) **সামীপ্য**-সম্বন্ধ—**নদীর** তীর, **গঙ্গার** ধার, **হাওড়ার** পুল, **কাশীর** গঙ্গা, **সমুদ্রের** সৈকত, ইত্যাদি।

(১০) **নিমিত্ত**-সম্বন্ধ—**ঘোড়ার** ঘাস, **জপের** মালা, **শোবার** ঘর, **টাকার** মায়া, **বলির** পাঁঠা, **চিঠির** কাগজ, ইত্যাদি।

(১১) **হেতু**-সম্বন্ধ—**দুঃখের** কান্না, **সুখের** হাসি, **দারিদ্র্যের** ক্লেশ, **টাকার** গরম, **রূপের** দেমাক, **বিদ্যার** বড়াই, ইত্যাদি।

(১২) **ব্যাপ্তি**-সম্বন্ধ—**একমাসের** ছুটি, **বছরের** খোরাক, **সারাজীবনের** আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি।

(১৩) **অভেদ**-সম্বন্ধ—'**শোকের** ঝড় বহিল সভাতে'—মধুসূদন। **ক্রোধের** অনল, **স্নেহের** বন্ধন, '**অনাবৃষ্টির** অসুরের বাধা'—মোহিতলাল।

(১৪) **পূরণ**-সম্বন্ধ—**ছয়দিনের** দিন, **আটের** পৃষ্ঠা, **পাঁচের** অঙ্ক, **তিনের** নম্বর, [=তৃতীয়] **দশের** অধ্যায়, ইত্যাদি।

(১৫) **নিবৃত্তি**-সম্বন্ধ—**পিপাসার** জল, **ক্ষুধার** অন্ন, **ঘা-এর** মলম, **ইঁদুরের** কল, **রোগের** ঔষধ, ইত্যাদি।

(১৬) **উপযোগিতা**—সম্বন্ধ—**যুদ্ধের** [=যুদ্ধোপযোগী] জাহাজ, **যাইবার** [=গমনোপযোগী] সময়, **স্নানের** বেলা, ইত্যাদি।

(১৭) **গুণ**-সম্বন্ধ—**পুষ্পের** সৌন্দর্য, **রমণীর** রূপ, **লক্ষ্মীর** শ্রী, **ফলের** তিক্ততা, **সঙ্গীতের** মাধুর্য, ইত্যাদি।

[সূক্ষ্মবিচারে **গুণ**-সম্বন্ধ **অধিকরণ** সম্বন্ধেরই অন্তর্গত।]

১৬-ক) **যোগ্যতা**-সম্বন্ধ - **রাজার** [=রাজযোগ্য] ব্যবহার, **বাপের** [=বাপের যোগ্য] বেটা,

(১৮) ***নির্ধারণ**-সম্বন্ধ—বহুর মধ্য হইতে একের গ্রহণ বুঝাইলে]—**পালের** গোদা, **সবার** সেরা, **বিশ্বের** নিকৃষ্টবস্তু, **সকলের** বড়, **দলের** ওঁছা, তাঁহাদের অন্যতম, ইত্যাদি।

(১৯) **অবলম্ব**-সম্বন্ধ—[অবলম্বিত পদার্থের সহিত অবলম্বনকারীর সম্বন্ধ]—**অন্ধের** যষ্টি বা নড়ি, **দরিদ্রের** ভগবানে বাবেক ডাকিয়া'—রবীন্দ্রনাথ,

* সংস্কৃতে নির্ধারণ বা নির্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। বাংলাতে ষষ্ঠী, তবে কখনও কখনও পঞ্চমী বিভক্তিও হয়, যথা—'সকলের চাইতে' বড়, যাঁহারা 'মধ্যে' কে অনুসর্গ বলিতে চাহেন তাঁহাদের মতে সপ্তমীও হয়, যথা—কবিগণের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 'মধ্যে' কি অনুসর্গ? উহা কি স্বতন্ত্র বিশেষ্য শব্দ নহে? 'কবিগণের মধ্যে বলিলে 'কবিগণের সাধারণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে এবং মধ্যে'—অধিকরণে সপ্তমী বুঝিতে হইবে। হাদের মধ্য হইতে' একজনকে ডাক—বাক্যটিতে' উহাদের"—সাধারণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং 'মধ্য হইতে'—অপাদানে পঞ্চমী। উহাদের মধ্যের [ভিতরের] কেহ এই কাজ 'করিয়াছে'—এখানে উহাদের'—সাধারণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী' 'মধ্যের [মধ্যস্থিত]—বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। দেখা যাইতেছে 'মধ্য' শব্দটি নিজেই যথাক্রমে সপ্তমী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তির যোগে পদে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্যে অনুসর্গ নহে, নামপদ, উহার সহিত যে নামপদের সম্বন্ধ তাহাতে শেষে ষষ্ঠী হয়।

(২০) **ব্যবসায়-সম্বন্ধ—সোনার** [স্বর্ণ ব্যবসায়ী] বেণে, **জমি বাড়ীর** [=জমি-বাড়ী-ব্যবসায়ী] দালাল, **ধানের** [=ধান্য-ব্যবসায়ী] কারবারী, **আদার** [= আদা-ব্যবসায়ী] ব্যাপারী, ইত্যাদি।

(২১) **বিশেষণ** সম্বন্ধ—**মজার** [=মজাদার] গল্প, **নিন্দার** [=নিন্দাসূচক] কথা, লজ্জায় কথা, প্রশংসার কথা, এমন **গুণের** [গুণবান] ভাই—আমি কোথায় পাই'—গান, **সোণার** [=স্বর্ণবর্ণ] চাঁদ, **মাটীর** [মৃত্তিকাশীতল] মানুষ, **সুখের** [সুখময়] সংসার, **দুঃখের** [দুঃখময়] দিন, ইত্যাদি।

(২২) **মূল্যমান**-সম্বন্ধ [যে সম্বন্ধ দ্বারা মূল্যের পরিমাণ বুঝা যায়]—**লাখটাকার** সম্পত্তি, **কাণা** কড়ির তাকত, **একটাকার** মাছ, **পাঁচশ-টাকার** চাকুরি, '**একপয়সার** পান কিনে তিন বাটা সাজাযে'—ত্রিনাথের গান, **হাজার-টাকার** ধাক্কা, ইত্যাদি।

(২৩) **দক্ষতা**-সম্বন্ধ—**কাজের** [=কাজেদক্ষ] ছেলে, **নাচের** [নাচেদক্ষ] মেয়ে, **গল্পের** [=গল্পেদক্ষ] লোক ইত্যাদি।

(২৪) **ভগ্নাংশ-সম্বন্ধ—একের** দুই [$\frac{1}{2}$], **একের** তিন [$\frac{1}{3}$], **দু'য়ের** পাচ [$\frac{2}{5}$], **তিনের** সাত [$\frac{3}{7}$], ইত্যাদি।

(২৫) **উপলক্ষ**-সম্বন্ধ—**গ্রীষ্মের** [=গ্রীষ্ম-উপলক্ষে] অবকাশ, [ইহা **হেতু** সম্বন্ধের অন্তর্গতও হইতে পারে], **পূজার** [=পূজা-উপলক্ষে] ছুটি, **শ্রাদ্ধের** [=শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে] নিমন্ত্রণ, **বিয়ের** [=বিবাহ-উপলক্ষে], ভোজ, **বড়দিনের** [=বড়দিন-উপলক্ষে] ছুটি, ইত্যাদি।

(২৬) **ভাব-সম্বন্ধ—ব্যথার** [=ব্যথা ঘটিলে] ব্যথী, **সুখের** [=সুখ ঘটিলে] সুখী, **দুঃখের** [দুঃখ ঘটিলে] দুঃখী, ইত্যাদি।

অতিরিক্ত

ষষ্ঠীবিভক্তি সম্বন্ধদ্যোতক বাংলায় কোনও পদে ষষ্টিবিভক্তির চিহ্ন 'র' [।এর, **কার, কের**] থাকিলেই উহা **সম্বন্ধপদ** ধরিতে হয়। **কিন্তু সম্বন্ধের স্বরূপনির্ণয়** অসাধ্য বা দুঃসাধ্য এমন অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে। সে সকল ক্ষেত্রে জোর করিয়া সম্বন্ধের একটা অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল **সম্বন্ধে ষষ্ঠী** অথবা 'বিশেষ শব্দের যোগে **ষষ্ঠী**'.

বলাই ভাল। **চিনির বলদ**—কথাটিতে যখন সত্যই চিনি-বহনকারী বলদকে বুঝাইবে তখন **চিনির**—বাহ্যবাহন-সম্বন্ধে ষষ্ঠী বলিতেই হইবে। কিন্তু উহা 'ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়'—অর্থে বাগ্‌ধারারূপে ব্যবহৃত হইলে **চিনির—সম্বন্ধে ষষ্ঠী** [বাগ্‌ধারায়] বলিলেই যথেষ্ট হইবে। **তীর্থের কাক** দ্বারা 'তীর্থস্থানবাসী কাক' বুঝাইলে **'তীর্থের'**—অধিকরণ-সম্বন্ধে ষষ্ঠী; কিন্তু 'লুব্ধ ও লাভ প্রত্যাশী' অর্থে **তীর্থের** কেবল **সম্বন্ধে ষষ্ঠী** [বাগ্‌ধারায়]। **'তোমার প্রতি'**—'প্রতি'-যোগে **ষষ্ঠী**, **'মুখের পানে'**—'পানে'-যোগে ষষ্ঠী, এইরূপ বলিলেই চলিতে পারে, অথবা **'অব্যয়ের সহিত সম্বন্ধে ষষ্ঠী'** বলিলেও ক্ষতি নাই। [**ষষ্ঠীবিভক্তির** আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

সম্বোধনপদ

১। সম্বোধনপদ নামটিতেই ইহার পরিচয় নিহিত রহিযাছে।

যে বিভক্তিযুক্ত শব্দে কাহাকেও আহ্বান বা সম্বোধন বুঝায় তাহাকে সম্বোধনপদ বলে।

বিভক্তিটি **প্রথমা**; সুতরাং একবচনে মূলশব্দের সহিত বিভক্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না, কাজেই বাক্যান্তর্গত ক্রিয়াপদের সহিত সম্বোধন পদের অন্বয় নাই বলিযা উহা **কারক** নহে; যথা—"হে **কাশী**। কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্"—মধুসূদন। "হে মোর **চিত্ত** পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে"—রবীন্দ্রনাথ। "**পণ্ডিত**, এসো"—কালিদাস রায়, ...তখন কোথায থাক, **বাপু**?"—বঙ্কিমচন্দ্র।

২। তৎসম শব্দের সম্বোধনে কখনও কখনও সংস্কৃত-রীতি অনুসৃত হয়ঃ

(ক) **অন্ত্য আ-কার এ-কার** হয়; যথা—"**গঙ্গে** ['গঙ্গা' হইতে]! তব **অঙ্গ**-বারি বারি নয় তো, সুধার ধারা"--গান। "**বৎসে** ['বৎসা' হইতে]! বেলা হইতেছে, প্রস্থান করো"—বিদ্যাসাগর।

অনুরূপ—**ভদ্রে** ['ভদ্রা' হইতে]! **যমুনে** ['যমুনা' হইতে]! **দুর্গে** ['দুর্গা' হইতে], **শিবে** ['শিবা' হইতে]! ইত্যাদি

(খ) অন্ত্য **ই**-কার **এ**-কার হয়; যথা—"সখে ['সখি' হইতে]! তুমি ত' জীবিত আছ ?"—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

অনুরূপ—**নৃপতে** ['নৃপতি' হইতে]! **মুনে** ['মুনি' হইতে]! ইত্যাদি।

(গ) অন্ত্য **ঈ**-কার **ই**-কার হয়; যথা—"ধন্য, আশা **কুহকিনি** ['কুহকিনী' হইতে]!"—নবীন চন্দ্র। "**পদ্মবাসিনি** ['পদ্মবাসিনী' হইতে] **ভারতি** ['ভারতী' হইতে]।"—মধুসূদন। "না **সখি** ['সখী' হইতে]! ভীত হইও না"—বিদ্যাসাগর।

অনুরূপ—**জননি** ['জননী' হইতে]! **সুন্দরী** ['সুন্দরী' হইতে]! ইত্যাদি।

(ঘ) অন্ত্য **উ**-কার **ও**-কার হয; যথা—হে **সাধো** ['সাধু' হইতে]! **বন্ধো** ['বন্ধু' হইতে]! হে **প্রভো** ['প্রভু' হইতে]। ইত্যাদি।

(ঙ) অন্ত্য **ঋ**-কার **অঃ** হয; যথা—"রে **বিধাতঃ** ['বিধাতৃ' হইতে]! কি পাপে এ তাপ আজ দিলি তুই মোরে ?"—মধুসূদন। "কর অভিষেক, **পিতঃ** ['পিতৃ' হইতে], এ দাসেরে আজ"—হেমচন্দ্র।

অনুরূপ—**মাতঃ** ['মাতৃ' হইতে]! **ভ্রাতঃ** ['ভ্রাতৃ' হইতে]! ইত্যাদি।

(চ) অন্ত্য **ন্** লুপ্ত হয না; যথা—"হে **রাজন্**!....ক্ষম এ দাসেরে"—মধুসূদন। অনুরূপ—**মন্ত্রিন্**! হে **স্বামিন্**! হে **ব্রহ্মন্**! ইত্যাদি।

৩। **সম্বোধন-পদের পূর্বে** কথনও কথনও **অ, ও, হে, ওহে, রে, অরে, ওরে, লো, ওগো, হ্যাঁগো, হ্যাঁলো, হ্যাঁলা,** [তুচ্ছার্থে], **হ্যাঁরে, হ্যাঁহে, অয়ি, অয়ে** প্রভৃতি অব্যয ব্যবহৃত হয; যথা—'বলি **অ** পরীর মা!' "**ও** পি—**ও** পিপি—প্রফুল্ল—**ও** পোড়ারমুখী"—বঙ্কিমচন্দ্র। "**হে** মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে"—রবীন্দ্রনাথ। '**ওহে** ভাযা!' "নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, **রে** দূত!"—মধুসূদন। '**অরে** অনৃতভাষিন্!' "**ওরে** মোর মূঢ় মেযে,"—রবীন্দ্রনাথ। '**লো** সুন্দরি!' '**ওগো** মোর ধ্যানের দেবতা!' '**হ্যাঁগো** খুকী!' '**হ্যাঁলো** রামের মা!' '**হ্যাঁলা** পোড়ারমুখী!' '**হ্যাঁরে** বিট্‌লে বামুন!' '**হ্যাঁহে** ভাযা!' "**অয়ি** ভুবন মনোমোহিনি!"—রবীন্দ্রনাথ। "**হ্যাঁদে গো** পাষাণের মেয়ে!"—রামপ্রসাদ।

৪। **গো** এবং সমযে সমযে **রে, হে, লো সম্বোধন পদের পরে** বসিয়া

থাকে ; যথা—"মা গো, আমার কপাল দোষী"—রামপ্রসাদ। "সখি **রে !** নিশ্চয় **করিয়া** কহি তোরে"—চণ্ডীদাস। "বঁধু **হে,** তুমি ত' রাধার নাথ"—চণ্ডীদাস। "বৃন্দাদূতী **লো",** ইত্যাদি।

৫। কোন কোন স্থানে সম্বোধন পদটিই উহ্য থাকে, **সম্বোধনসূচক অব্যয় দ্বারাই সম্বোধন পদের কাজ চালানো হয় ;** যথা—**'ওগো!** শুনছ ?' **'হ্যাঁরে !** এখনও গেলি নে ?' **'ওরে, ও—!** তোর নাম কী [নাম জানা না থাকায় **দুইটি অব্যয় দ্বারা** সম্বোধনের কাজ চালানো হইযাছে] ?'

৬। **সম্বোধনে বহুবচন** বিশেষ্য অবিকৃত থাকে ; যথা—**বন্ধুগণ !** আমার প্রিয় **ভাই-বোনেরা !** সমবেত **ভদ্র মহোদয়গণ** ও **ভদ্রমহিলাবৃন্দ !** শ্রদ্ধেয় **অতিথিবর্গ !** উপস্থিত **সকলে ! বাবারা সব ! ওগো মেয়েরা ! ওহে ছেলেরা !** ইত্যাদি।

৭। অনেক সময়ে **সম্বোধন পদ বিস্ময়াদি-ভাবদ্যোতক অব্যয়** রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা—**'ওমা !** এ তুই কী করেছিস্ !' **'ও বাবা !** আমি তা পারব না।' **"হরি হরি !** কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গিযাছি"—বঙ্কিমচন্দ্র। **"হে বিধাতঃ !** নন্দন কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য !"—মধুসূদন। **'রাম রাম !** এমন কাজও লোকে করে !' **"রাধে !** স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে"—রবীন্দ্রনাথ।

বিভক্তি-প্রয়োগ

প্রথমা

১। **অভিধেয়-মাত্রে** প্রথমা। যে শব্দে [প্রাতিপদিকে] যাহা বুঝায় তাহাই **সেই শব্দের অভিধেয়।** এই **অভিধেয়** বা **শব্দার্থ** নির্দেশের জন্যই শব্দে **প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়।** বাঙ্‌লায় ইহার জন্য কোনও বিভক্তি-চিহ্ন নাই। তাই বলিয়া **বিভক্তি নাই** বলিলে ভুল হইবে। **রাম, মানুষ, গরু, লতা, জল, মহত্ত্ব,** ইত্যাদি **বিশেষ্য পদ** এবং **প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত।**

২। **উক্ত কর্তায়** [কর্তৃবাচ্যের কর্তায়] প্রথমা ; যথা—"নমি **আমি** কবিগুরু, তব পদাম্বুজে"—মধুসূদন। "সেথা হতে **সবে** আনে উপহার"—রবীন্দ্রনাথ। "**অন্ধেতে** নয়ন পায়, **বোবায়** বলে 'বম্ ভোলা' "—গান।

৩। **উক্ত কর্মে** [কর্মবাচ্যের কর্মে] প্রথমা ; যথা—উভয় পক্ষেরই **বহু সৈন্য** হতাহত হইয়াছে। **চোর** ধরা পড়ে নাই।

৪। **প্রযোজক কর্তায়** [প্রেরণার্থক বা প্রযোজক ক্রিয়ার কর্তায়] প্রথমা ; যথা—**মা** শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছেন। "নাচায় পুতুল যথা দক্ষ **বাজিকরে** নাচাও তেমতি **তুমি** অর্বাচীন নরে"—নবীনচন্দ্র।

৫। **সম্বোধনে** প্রথমা ; যথা—"অয়ি **শ্যামাঙ্গিনি ধনি**, অয়ি **বর্ষা করুণারূপিণি**!"—দেবেন্দ্র নাথ সেন।

৬। **নামে, ইতি, প্রভৃতি *অব্যয়ের যোগে** প্রথমা ; যথা—"**যাদব** 'নামে' এক বালক ছিল"—বিদ্যাসাগর। পত্রের উত্তর দিও, 'ইতি' তোমার **দাদা**।

৭। বিশেষ্যে যে বিভক্তিই হউক না কেন তাহার **বিশেষণে সর্বদা প্রথমার**

---

* ডাঃ সুধীরকুমার দাশ গুপ্তের ব্যাকরণ পুস্তকে 'বলিয়া'-কে এই শ্রেণীর অব্যয় বলা হইয়াছে। বাঙ্‌লায় 'বলিয়া [ব'লে]'-র প্রয়োগে বৈচিত্র্য রহিয়াছে। 'আমি' বলিয়া তুমি পার পাইলে। 'আমার' বলিয়া তুমি বইখানা ছিঁড়িয়াও পার পাইলে। 'আমাকে' বলিয়া তুমি গালাগালি দিয়াও পার পাইলে। 'তাই' বলিয়া মনে করিও না তোমাকে আবার বই দিব। তাহাকে শত্রুর 'গুপ্তচর' বলিয়া মনে হয়। "নির্দয় লোক 'পশু' বলিয়া গণ্য"। 'আমি ছিলাম' বলিয়া তাহার কোনও অসুবিধা হয় নাই, ইত্যাদি। প্রথম তিনটি বাক্যে বলিয়া-র অর্থ যেহেতু তাই', চতুর্থ বাক্যে 'জন্য', পঞ্চম ও ষষ্ঠে 'রূপে 'এবং সপ্তমে 'তাই'। ইহার যোগে ১ম বাক্যে ১মা, ২য় বাকে ষষ্ঠী, ৩য় বাক্যে ২য়া, ৪র্থ বাক্যে ১মা হইয়াছে। সর্বনাম 'আমি' শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির রূপ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। ৭ম বাক্যে 'বলিয়া' দুইটি বাক্যের যোজনা করিয়াছে' ইহা কারণার্থক সমুচ্চয়ী অব্যয়। কিন্তু ৫ম বাক্যে বলিয়া যোগে গুপ্তচর'-এ কোন্ বিভক্তি হইয়াছে ? 'যখন গুপ্তচর মনে হয়' প্রয়োগও চলে, তখন 'গুপ্তচর' কর্মসম্বন্ধী অনুপূরক এবং ২য়া-যুক্ত। ৬ষ্ঠ বাক্যে 'লোক' উক্ত কর্ম, সুতরাং ১মা-যুক্ত, উহার অনুপূরকে কোন্ বিভক্তি? '১মা' বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল অব্যয় যোগে ১মা হইবেই, 'বলিয়া' তাহাদের অন্তর্গত নহে।

একবচন থাকিবে ; যথা—এই **সুন্দর** পৃথিবীর **সুন্দর** পদার্থগুলি যে **সুন্দর স্রষ্ট** সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম জানাই।

দ্বিতীয়া

১। **অনুক্ত কর্মে** [কর্তৃবাচ্যের কর্মে] দ্বিতীয়া ; যথা—"মানবের **আত্মাকে** [বিভক্তিচিহ্ন—কে] রামমোহন অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন"—শিবনাথ শাস্ত্রী। "এনেছি শুধু **বীণা** [বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত], দেখ তো চেয়ে **আমারে** [বিভক্তিচিহ্ন—রে] তুমি চিনিতে পারো কি না"—রবীন্দ্রনাথ। "কী দিয়ে পূজিব হে **তোমায়** [বিভক্তিচিহ্ন—য়]"—গান। "পবিত্রিলা আনি **মায়ে** [বিভক্তিচিহ্ন—এ, য-শ্রুতি] এ তিন **ভুবন** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত]"—মধুসূদন।

২। **অনুক্ত কর্তায়** [কর্মবাচ্যের ও ভাববাচ্যের কর্তায] **কখনও কখনও** দ্বিতীয়া হয় ; যথা—**আমাকে** ইহা করিতে হইবে ; **তোমাকে** যাইতেই হইবে, **মানুষমাত্রকে** মরিতে হইবে, ইত্যাদি।

৩। **অপাদানে কচিৎ** দ্বিতীয়া [**ভয়ের হেতুতে**] ; যথা—"তুই কোন্ রাজার বেটা **তোরে** ভয় কি ?"—কৃত্তিবাস।

৪। **বিনার্থক অব্যয়ের যোগে** দ্বিতীয়া ; যথা—"**দুঃখ** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] 'বিনা' সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?" "**হরি** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] 'ভিন্ন' ভবার্ণবে গতি নাহি আর"। **তুমি** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] 'ছাড়া' আমার আর কে আছে ? **শ্রম** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না ; কিন্তু—'বিনা' **মেঘে** [বিভক্তিচিহ্ন—এ] বজ্রপাত।' 'বিনা' **নৌকায়** [বিভক্তিচিহ্ন—য়] পার ক'রে দেয"—গান। "আর কে আনিবে পদ্ম 'বিনা' **হনুমান** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] ?"—রামায়ণ।

লক্ষণীয়—'বিনা' সংশ্লিষ্ট নামপদের পরে ত' বসেই, পূর্বেও বসিতে পারে। সাধারণতঃ, 'বিনা' পরে বসিলে নামপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হয় না, কিন্তু পূর্বে বসিলে বিভক্তিচিহ্ন বর্তমান থাকে। সংস্কৃতে 'বিনা' যোগে তৃতীয়াও হয, কিন্তু বাঙ্‌লায কেবল দ্বিতীয়া হয।

৫। **ধন্যবাদ ও ধিক্ শব্দের যোগে** দ্বিতীয়া ; যথা—**আপনাকে** শত 'ধন্যবাদ' ! " 'ধিক্' 'ধিক্', ওরে মূর্খ শত 'ধিক্' **তোরে**।

৬। **পর্যন্তার্থক শব্দের যোগে** দ্বিতীয়া; যথা—**কালকে** [বিভক্তিচিহ্ন —কে] বা **কাল** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] 'পর্যন্ত' বা 'অবধি' আমি অপেক্ষা করিব **স্টেশন** 'তক' আমার সঙ্গে চল।

৭। **অত্যন্তসংযোগ** অর্থাৎ **ব্যাপ্তি বুঝাইলে দূরত্ববাচক** ও **সময়বাচক শব্দে** দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়; যথা—"শ্রাবণে বরিষে ঘন **দিবসরজনী** (ব্যাপিয়া)" —মুকুন্দরাম। "আমরা **দ্বাদশবৎসর** (ব্যাপিয়া) বনবাসে এবং **এক বৎসর** (ব্যাপিয়া) অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি"—রাজশেখর। "সেই সময় **তিন ঘণ্টা** (ব্যাপিয়া) ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে…"—অবনীন্দ্রনাথ। এই অরণ্য **বহু যোজন** (ব্যাপিয়া) বিস্তৃত। 'সারাটা **রাস্তা** (ব্যাপিয়া) আমাকে জ্বালিয়েছে'।

(ক) **ব্যাপ্ত্যর্থক শব্দের যোগেও** দ্বিতীয়া; যথা—**বহুদিন** 'যাবৎ' [=ব্যাপিয়া] তোমার পত্রাদি না পাইয়া চিন্তিত আছি। পাঁচ **দিন** 'ধরিয়া' [=ব্যাপিয়া] অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে।

লক্ষণীয়—সর্বত্র বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত।

৮। **ক্রিয়াবিশেষণে** *দ্বিতীয়া; যথা—"আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই **ধীরে ধীরে** [বিভক্তিচিহ্ন—**এ**] অগ্রসর হইলাম"—শরৎচন্দ্র। **সত্বর** [বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] ধাবিত হও। "আয় ফিরে **সগৌরবে**"—রবীন্দ্রনাথ।

---

* সংস্কৃতে দ্বিতীয়া হয়। বাঙলায় কোথাও বিভক্তি চিহ্ন থাকে না, কোথাও বা 'এ' যুক্ত হয়। 'এ' কোনও বিভক্তির নিজস্ব নহে। তাই সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বলাই উচিত।

তৃতীয়া

১। **করণে তৃতীয়া** বিভক্তি হয়। তৃতীয়া বিভক্তির **চিহ্ন—এ** [**তে, য়**], তৃতীয়াদ্যোতক **অনুসর্গ—দ্বারা দিয়া**; যথা—"জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল **জলে**"—মধুসূদন। "তপোধন শিরঃ স্পর্শি **সুকরকমলে**"—হেমচন্দ্র। "….কেমনে আমি….মম ক্ষুদ্র **কল্পনায়** করি প্রকাশিত ?"—নবীনচন্দ্র। "যেন কেউ **সিঁদুর**

দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে”—প্রমথ চৌধুরী। “**রজ্জু দ্বারা** তাহাকে বন্ধন করিল”. ‘এ **ছুরিতে** কাটিতে পারিব না”, ইত্যাদি।

অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া; যথা—**লক্ষ্মণ কর্তৃক** [সমাসে উত্তর পদ কর্তার প্রাতিপদিক কর্তৃ+সমাসান্ত ক-প্রত্যয] মেঘনাদ নিহত হইল। **ভৃত্য দ্বারা** পাত্রটি আনীত হইল। **আমাকে দিয়ে** এ কাজ হবে না, ইত্যাদি।

৩। **প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া**; যথা—**লোকটাকে দিয়ে** কাজটা করাও। তিনি **আমাদ্বারা** দলিলটা লিখাইয়াছেন, ইত্যাদি।

৪। **অপাদান**-কারকে কচিৎ **তৃতীয়া** বিভক্তি হয; যথা—**চক্ষু দিয়া** জল পড়িতেছে। তার **মুখ দিয়ে** এমন কথা বেরোতে পারে না, ইত্যাদি।

৫। ***সহার্থে** সহার্থক শব্দের প্রযোগ না হইলে **তৃতীয়া**; যথা—**ভাতে** ভাত খেয়ে এসেছি। “সুদূর গ্রামখানি **আকাশে** মেশে”—রবীন্দ্রনাথ। গরুটা **খুঁটোয়** বাঁধা আছে।

৬। **হেতু-অর্থে** তৃতীযা; যথা—“**ধূলিভয়ে** নাহি মেলি শযনে নযন”—মুকুন্দরাম। “**অভিমানে** সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই”—ভারতচন্দ্র। “**তৃষ্ণায়** আকুল বঙ্গ করিত রোদন”—মধুসূদন। “নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে **ভয়ে** ঘরে যায় ধেয়ে”—রবীন্দ্রনাথ। “আপনার **আনন্দে** এই দপ্তর লিখিযা বেড়াই”—বঙ্কিমচন্দ্র। “**হাঁকাহাঁকিতে** একটা ভিড় জমিযা উঠিল”—শরৎচন্দ্র। “ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত **উল্লাসে**”—মোহিতলাল।

৭। **অপবর্গে** [কার্য সমাপন ও **ফল প্রাপ্তি** বুঝাইলে] **কালবাচক শব্দে** তৃতীযা; যথা—**এগার বছরে** শিক্ষা শেষ হইল। ‘**ছয় দণ্ডে** চ’লে যায ছ’মাসের পথ’। “**এতক্ষণে**…বুঝিনু, কেমনে লক্ষ্মণ পশিল আসি রক্ষঃপুরে”—মধুসূদন।

৮। **উপলক্ষণে** [যে লক্ষণ দ্বারা কাহারও স্বরূপ জ্ঞাত হওযা যায় তাহাতে] তৃতীয়া; যথা—‘বামুন চেনা যায **পৈতেয়**’। ‘শিকারী বেড়াল **গোঁফেই** চেনা যায। যে গাছটা বাড়ে তার **দু’পাতায়-ই** বোঝা যায।

---

* সহার্থক শব্দের প্রযোগ থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে, যথা—‘আমার’ সঙ্গে, ‘তোমার’ সহিত, ইত্যাদি।

৯। **ঊনার্থক, বারণার্থক ও প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে** তৃতীয়া ; যথা—(ক) **ঊনার্থক**—'দ্রাবিড়গণ আর্যদের চেয়ে **বিদ্যায়** বা **বুদ্ধিতে** 'হীন' ছিল না।' বড়ভাই ছোট ভাইযের চেয়েও **মাথায়** 'খাটো'। কাপড়টা **বহরে** 'ছোট'।

(খ) **বারণার্থক**—অনর্থক **কলহে** 'কী' হইবে? বৃথা **ক্রন্দনে** 'ফল কী'?

(গ) *প্রয়োজনার্থক—**বিবাদে** কী 'প্রয়োজন'? **বিদ্যায়** ও **অর্থে** কাহার প্রয়োজন' নাই? তোমার **ভালমানুষিতে** 'দরকাব' নাই, ইত্যাদি।

---

* প্রযোজনার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠীও হয়, যথা—'বিবাদের' কী প্রয়োজন? 'টাকার' দরকার কার না আছে? ইত্যাদি। পাণিনি-মতে এগুলি করণ কারক।

১০। **বিকৃতিসূচক শব্দের যোগে অঙ্গবাচক শব্দে** তৃতীয়া; যথা—"**রূপেতে** বাছার মোর ভেসে যায় ধরা। **কানে** কালা, **চোখে** কানা, **দু'পায়েই** খোঁড়া।"

১১। **ক্রিয়া বিশেষণের মত ব্যবহৃত সহার্থক বিশেষ্যে** তৃতীয়া; যথা—*"নবকুমার **ভীমনাদে** ডাকিলেন"—বঙ্কিমচন্দ্র। "পতঙ্গ যে **রঙ্গে** ধায়"—মধুসূদন। "ধ্যানে মগ্ন ঋষি মুদিল নয়নদ্বয বিপুল **উল্লাসে**"—হেমচন্দ্র। "**পরমানন্দে** বন্দন করি তাঁরে"—রবীন্দ্রনাথ। "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা **আহ্লাদে**"—সত্যেন্দ্রনাথ। "**পরমাগ্রহে** মৃদু হাসি দোঁহে বসাইযা **সমাদরে** বিজয়পত্রী লিখিয়া দিলেন"—কালিদাস রায।

[এই সকল স্থলে 'ক্রিযাবিশেষণার্থে তৃতীযা বলাই সমীচীন। স্থূলাকার পদগুলি মূলতঃ বিশেষ্য হইলেও উহারাও যে ক্রিযাবিশেষণের কাজ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতিবাবুও "এরূপ দৃষ্টান্তে তৃতীযা বিভক্তি ক্রিয়া-বিশেষণের অর্থে হইযাছে" বলিতে চাহিযাছেন। তবে তাঁহার ক্রিযা-বিশেষণের অর্থে বিশেষণ শব্দের উত্তর" তৃতীয়া সূত্রটি অর্থহীন বলিযাই মনে হয। ক্রিযাবিশেষণ কি বিশেষণ নহে? আর 'ক্রিয়াবিশষণে' তৃতীযা নহে 'দ্বিতীযা' 'দ্বিতীযা-বিভক্তির পাদটীকা দ্রষ্টব্য), 'ক্রিযা-বিশেষণের অর্থে বিশেষ্যে' তৃতীয়া।]

১২। **গমনার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগে পথবাচক শব্দে** তৃতীযা:—"তুমি এই **পথে** নিতি কর গতাগতি"—চণ্ডীদাস। "চলে যায় গুটি গুটি মেঠো **পথ দিয়া**—অক্ষয় বড়াল। 'গাড়ীর **রাস্তায়** না হাঁটিয়া **ফুটপাথ দিয়া** যাইবে।'

১৩। সংস্কৃতে প্রকৃতি, জাতি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে; যথা—**জাত্যা** ব্রাহ্মণঃ, **প্রকৃত্যা** চারু, **স্বভাবেন** সরলঃ, ইত্যাদি। বাঙ্‌লায় **জাতিতে** ব্রাহ্মণ, **প্রকৃতিতে** সুন্দর ['প্রকৃতই সুন্দর' অধিক ব্যবহৃত], **স্বভাবে** সরল—প্রযুক্ত হইলে **জাতিতে প্রকৃতিতে, স্বভাবে,**—কোন বিভক্তি বলিব? যদি বলি 'তৃতীয়া', তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে—'কেন তৃতীয়া হইল?' বলিতে হইবে—স্বভাবতঃ [প্রকৃত্যাদিত্বাৎ] তৃতীয়া। সংস্কৃতে তৃতীয়ার রূপ-স্বাতন্ত্র্যের জন্য তৃতীয়ান্ত পদ চিনিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বাঙলায় **এ, তে** ষষ্ঠী ছাড়া সকল বিভক্তিরই চিহ্ন হইতে পারে। তবে বাঙ্‌লায় এই সকল পদে যে তৃতীয়া বিভক্তিই হইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিব? ইহার উত্তর নাই। সংস্কৃতে **জাতি** শব্দের অর্থ **জন্ম,** কিন্তু বাঙ্‌লায় **জাতি ও জন্ম** সর্বদা সমার্থক নহে। কেহ হিন্দুর বংশে জন্মিয়া খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার **জাতি** খ্রীষ্টান বলা হয়। বাঙলায়, **জাতিতে, প্রকৃতিতে, স্বভাবে** সত্তা বোধক 'হয়' ক্রিয়ার বিষয়-সূচক আধার বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং, এই গুলিতে **বিষয়াধিকরণে সপ্তমী** বলাই সমীচীন।

"বাঙলায় এইক্ষেত্রে সপ্তমী বলিলেও ক্ষতি হয় না বলিয়া মনে করি"—অধ্যাপক শ্যামাপদ।

চতুর্থী

১। **সম্প্রদান কারকের** স্বকীয় বিভক্তি চতুর্থী। চতুর্থী ও দ্বিতীয়ার চিহ্ন যে অভিন্ন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উদাহরণ—**দরিদ্রকে** অন্নদান কর। "সন্ধ্যাবেলায় **ঠাকুরকে** ভোজ্য করেন নিবেদন"—রবীন্দ্রনাথ। "প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই, তাই দিই **দেবতারে**"—রবীন্দ্রনাথ। "কী দিব **তোমায়** বল কী আছে আমার? —কবিরত্ন।

২। ***নিমিত্তার্থে** চতুর্থী; যথা—"বেলা যে পড়ে এলো, জলকে [জলের নিমিত্ত] চল"—রবীন্দ্রনাথ। "নিত্য আমি থাকি তারি **খোঁজে** [খোঁজের নিমিত্ত]"—রবীন্দ্রনাথ। "কোন্ **সুখে** [সুখের নিমিত্ত] মোর সহ হইবে ব্যাথিনী"—কবিকঙ্কন। "অনন্ত আঁধার ভেদি কোথা কোন আলোর **সন্ধানে**"—হুমায়ুন কবীর। **পুরুষোত্তম দর্শনে**

[দর্শনের নিমিত্ত] যাইব, মনে করিয়াছি"—বঙ্কিমচন্দ্র। "ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে [লোভের নিমিত্ত] ও যেন প্রাণটা দিলে"—শরৎচন্দ্র।

৩। **রুচ্যর্থক ক্রিয়ার যোগে** চতুর্থী; যথা—এমনই অরুচিতে ধ'রেছে যে কোন ছাই পোড়া **মুখে** রোচে না। **বিকল্পে ষষ্ঠী**; যথা—**পোড়ার মুখে** রোচে না। "দিনের অন্ন সেদিন **কারো** না রোচে"—কালিদাস রায়।

* নিমিত্তার্থক শব্দের [নিমিত্ত' জন্য, কারণে, লাগিয়া, তরে, প্রভৃতি] প্রয়োগে চতুর্থী না হইয়া ষষ্ঠী হইবে, যথা—ইহারই নিমিত্ত আসিয়াছি। 'এতশ্রম কার 'জন্য'? "পরের 'কারণে' স্বার্থ দিয়া বলি।" "সুখের লাগিয়া' এঘর বাঁধিনু"—চণ্ডীদাস। "কারো 'তরে' তার নাই আহ্বান" —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৪। **ধার্‌-ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণে** চতুর্থী; যথা—সে **আমাকে** একশ' টাকা ধারে। আমি **কাউকে** কাণা কড়িটিও ধারি না, ইত্যাদি।

৫। **নিবৃত্তি বুঝাইলে নিবর্তনীয়ে** চতুর্থী; যথা—**রোগে** ঔষধ, **পিপাসায়** জল, **ক্ষুধায়** অন্ন, ইত্যাদি। **বিকল্পে ষষ্ঠী** বিভক্তিও হয়; যথা—**রোগের** ঔষধ, **পিপাসার** জল, **ক্ষুধার** অন্ন, ইত্যাদি।

৬। প্রয়োজনার্থে চতুর্থী; যথা—'**ছাতাকে** [ছাতার প্রয়োজনে] ছাতা, **লাঠিকে** [লাঠির প্রযোজনে] লাঠি; আমার **ঠাকুরকে** ঠাকুব **চাকরকে** চাকর; ইত্যাদি।

৭। **নমস্কারার্থক শব্দযোগে** চতুর্থী; যথা—"বারংবার **তারে** নমস্কার"—সত্যেন্দ্রনাথ। **গুরুকে** প্রণাম, ইত্যাদি।

কিন্তু **নমস্কারার্থক ক্রিয়া** প্রযুক্ত হইলে উহার **কর্মে দ্বিতীয়া** ধরিতে হইবে; যথা—"প্রণামি **চরণে**, তাত"; 'মোরা তোমারে প্রণাম করি। [প্রণাম করি—যৌগিক ক্রিয়া]; "**তাহারে** কর না নমস্কার"—রবীন্দ্রনাথ।

৮। **উদ্দেশ্যবোধক শব্দে** চতুর্থী; যথা—সীমান্তরক্ষী **বীরগণকে** [=বীরগণের উদ্দেশে] উপহার পাঠাও। "দ্রৌপদীকে লইয়া পঞ্চভ্রাতা **বনে** চলিলেন।' আজ রাত্রেই রাজধানী [=রাজধানীর উদ্দেশে, বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] যাত্রা কবিব। "আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে **দেবীগড়** [=দেবীগড়ের উদ্দেশে, বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত] পাঠাইয়াছি"—বঙ্কিমচন্দ্র।

দ্রষ্টব্য—ঘোড়ার ঘাস, **ভাতের** চাল—নিমিত্তার্থে ষষ্ঠীর উদাহরণ। **ঘোড়ার, ভাতের—চতুর্থী**বিভক্তিযুক্ত পদ নহে।

পঞ্চমী

১। **অপাদানে** পঞ্চমী ; যথা—**আকাশ থেকে** একটা তারা খ'সে প'ড়ল। এই দস্যুর **হাত হইতে** আমাদিগকে রক্ষা করুন। অপাদানের বিভিন্ন ক্ষেত্র **পূর্বেই** আলোচিত হইয়াছে।

২। **অনুক্ত কর্তায়** পঞ্চমী ; যথা—"**আমা হতে** এই কার্য হবে না সাধন"। এই **পুত্র হইতে-ই** তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

৩। **'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত সকর্মক ক্রিয়ার অপ্রয়োগে** (১) **কর্মে** ও (২) **অধিকরণে** পঞ্চমী বিভক্তি হয় ; যথা—(১) রাজা **দুর্গশীর্ষ হইতে** [='দুর্গশীর্ষে আরোহণ করিয়া'] সৈন্যসজ্জা অবলোকন করিলেন। (২) সে **বিছানা থেকেই** [=**বিছানাতে** 'থাকিযাই'] ব'লে উঠল—"চা চাই"।

৪। **কাল ও দূরত্বের অবধিবোধক শব্দে** পঞ্চমী ; যথা—**আজ থেকে** তিন দিন পরে আসবে। ***সাগর হইতে** বিশ ক্রোশ দূরে আছি। খ্রীষ্টের **জন্ম হইতে** প্রায় দুই হাজাব বৎসব অতীত হইতে চলিল। ***শহর থেকে** 'দূরে' বা 'কাছে'।

* 'সাগরের' বিশ ক্রোশ দূবে আছি
'শহরের' দূরে বা কাছে } —এইরূপ 'ষষ্ঠী'-র প্রযোগও চলে।

৫। **'উৎকর্ষ'** বুঝাইলে (১) **নিকৃষ্টে** এবং 'নিকৃষ্টতা' বুঝাইলে (২) **উৎকৃষ্টে** পঞ্চমী ; যথা—

(১) "তারা কিন্তু শতগুণে ভাল **আমা হ'তে**"—ধাত্রী পান্না। "**প্রাণের চেয়ে** যে মান বড আমি বুঝাব শাহানশাহে"—রবীন্দ্রনাথ। জননী ও জন্মভূমি **স্বর্গ হইতেও** শ্রেষ্ঠ।

(২ **মায়ের চেয়ে** বড় কে আছে? **নরক হইতে** বীভৎস, **আমার চেয়ে** ছোট, ইত্যাদি।

(ক) কখনও কখনও **পঞ্চমীদ্যোতক অনুসর্গটি উহ্য** থাকে ; যথা—"বয়সে **বাপের** [চেয়ে] বড়"—ভারতচন্দ্র।

(খ) 'উৎকর্ষ' বা 'নিকৃষ্টতা' জ্ঞাপক পদের প্রয়োগ না থাকিলেও উহাদের আভাসেই যথাক্রমে নিকৃষ্টে ও উৎকৃষ্টে পঞ্চমী হয় ; যথা—"**ইহার চেয়ে** হ'তেম যদি আরব বেদুইন"—রবীন্দ্রনাথ।

৬। **পৃথক্-অর্থবোধক শব্দের যোগে** পঞ্চমী ; যথা—ভক্ত সাধক **কালী হইতে** কালাকে, **শ্যামা হইতে** শ্যামকে, **শক্তি হইতে** শিবকে, **হরি হইতে** হরকে 'পৃথক' বা 'স্বতন্ত্র' বা 'ভিন্ন' বা 'আলাদা' মনে করেন না। **ভা'য়ে** ভা'য়ে [=**ভাই হইতে** ভাই] 'আলাদা' হ'য়ে গেছে।

৭। **হেতু অর্থেও** পঞ্চমী হয় ; যথা—সেই **রোগেই** বা **রোগ থেকেই** [=রোগ হেতু] সে মারা গেল। **আনন্দে** বা **আনন্দ হইতেই** [=আনন্দ হেতুই] তাহারা নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল।

৮। (১) **দিগ্বাচক শব্দের যোগে** পঞ্চমী ; যথা—**গ্রাম হইতে** 'পূর্বদিকে' চলিলে একটা মাঠ দেখিতে পাইবে। আমাদের বাড়ী **শহর থেকে** উত্তরে।

বিকল্পে ষষ্ঠীও হয় ; যথা—***গ্রামের** 'পূর্বদিকে', **সহরের** উত্তরে, ইত্যাদি।

*'গ্রামের পূর্বদিকে' দ্বারা 'গ্রামের অন্তর্বর্তী পূর্বাঞ্চলে' বুঝাইলে 'গ্রামের'—অঙ্গি-অঙ্গ বা অংশি-অংশ সম্বন্ধে ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদ হইবে।

৯। **বহিরর্থক শব্দের যোগে** পঞ্চমী ; যথা—**ঘরথেকে** 'বাইরে', **দৃষ্টি হইতে** 'অন্তরালে', **সীমানা হইতে** 'বাহিরে', ইত্যাদি।

বিকল্পে ষষ্ঠীও হইতে পারে ; যথা—**ঘরের** 'বাইরে', **দৃষ্টির** 'অন্তরালে', **সীমানার** 'বাহিরে' ইত্যাদি।

ষষ্ঠী

১। **সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।** বিভিন্নপ্রকার সম্বন্ধের উদাহরণ ও উহাতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধপদ প্রসঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্ত অকারক বিভক্তির

বিকল্পেও ষষ্ঠীর প্রযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ষষ্ঠীর প্রয়োগের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল **অব্যয়যোগে ষষ্ঠী** লক্ষণীয় ; যথা—**তোমার** 'প্রতি', **সবার** 'পানে', **ইন্দ্রের** 'তুল্য', **রাজার** 'সমীপে', "**ইহার** 'অধিক' [**ইহা হইতে**—পঞ্চমীও হয়] ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক।"—বিদ্যাসাগর।

সপ্তমী

১। **অধিকরণে** সপ্তমীবিভক্তি হয়। অধিকরণের প্রকারভেদ এবং প্রত্যেক প্রকারের উপযুক্ত উদাহরণ পূর্বে কারক-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই।

২। **ভাবে** সপ্তমী ; যথা—**বসন্ত সমাগমে** বা বসন্তের [কৃদ্‌যোগে কর্তায় ষষ্ঠী] **সমাগমে** আনন্দ হিল্লোল বহিযা যায। [কর্তার প্রকারভেদ—ভাব-কর্তা দ্রষ্টব্য]।

৩। **প্রশংসা-বাচক** বা **নিন্দাসূচক বিশেষ্য** বা **বিশেষণ শব্দের যোগে** সপ্তমী ; যথা—**বিশেষণ যোগে—ব্যাকরণে** 'পণ্ডিত' [প্রশংসা-বাচক] বা 'অজ্ঞ' [নিন্দা-সূচক] ; **রণে** 'নিপুণ' বা 'অনভিজ্ঞ' ; **আহারে** 'পটু' ; **শাস্ত্রে** 'পণ্ডিত' বা 'মূর্খ' ; **কর্মে** 'দক্ষ' বা 'অপারগ' ; **বুদ্ধিতে** 'বিচক্ষণ' ; **জ্ঞানে** 'প্রবীণ' ; **ঝগড়ায়** 'ওস্তাদ' ; **সর্বশাস্ত্রে** 'বিশারদ ;

বিশেষ্যযোগে—ব্যাকরণে 'পাণ্ডিত্য' বা 'অজ্ঞতা' ; **রণে** 'নৈপুণ্য' বা 'অনভিজ্ঞতা' ; **আহারে** 'পটুতা' ; **কর্মে** 'দক্ষতা' ; **বুদ্ধিতে** 'বিচক্ষণতা' ; **গানবাজনায়** 'ওস্তাদি' ইত্যাদি।

৪। **সাক্ষী, জামিন প্রভৃতির প্রয়োগে** সপ্তমী ; যথা—**মামলায়** 'সাক্ষী' বা 'জামিন' ; **বিবাদে** 'সাক্ষী' ইত্যাদি।

৫। **প্রতিলোপে, বিশ্বাস, স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি ভাববাচক বিশেষ্যের প্রয়োগে** সপ্তমী ; যথা—**তোমাতে** 'বিশ্বাস' নাই। [=তোমার প্রতি বিশ্বাস নাই]।

ধর্মে, পরকালে, ঈশ্বরে [=ধর্মের প্রতি, পরকালের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি যাহার 'শ্রদ্ধা' নাই সে নাস্তিক। **সন্তানে** 'স্নেহ' ; **গুরুবাক্যে** 'আস্থা' ; **অধ্যয়নে** 'অনুরাগ' বা

'বিরাগ'; **"জীবে** 'প্রেম', স্বার্থত্যাগ, 'ভক্তি' **ভগবানে**—সকল ধর্মের সার রাখিও স্মরণে।"

৬। **নির্ধারণে** সপ্তমী; যথা—'**কবিকুলে** শ্রেষ্ঠ তুমি, হে রবীন্দ্র! ভারতের ধন!' "সেই ধন্য **নরকুলে** লোকে যারে নাহি ভুলে"—মধুসূদন। '**পশুকুলে** ধূর্ত তুই আরে রে জম্বুক!' দেবগণের **মধ্যে** নারদ ধূর্ততম। [নির্ধারনে ষষ্ঠীও দ্রষ্টব্য]।

৭। **বিশেষ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য জাতিবাচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার যোগে** সপ্তমী বিভক্তি হয়; যথা—**রূপে**'লক্ষ্মী' [=লক্ষ্মীর মত রূপবতী নারী], **গুণে** 'সরস্বতী' [=সরস্বতীর মত গুণশালিনী নারী]; **বিদ্যায়** 'বৃহস্পতি'; **শক্তিতে** 'ভীম'; **বীরত্বে** 'অর্জুন'; **সহিষ্ণুতায়** 'ধরিত্রী'; **ধর্মে** 'যুধিষ্ঠির'; **নিদ্রায়** 'কুম্ভকর্ণ', **বিচারশক্তিতে** 'দানিয়েল'; **ধনে** 'কুবের'; ইত্যাদি।

বিশেষসংজ্ঞাবাচক অথবা জাতিবাচক বিশেষ্যের সহিত তুল্যার্থক অব্যয ব্যবহৃত হইলেও, সংশ্লিষ্ট গুণ, ক্রিয়া, বিষয় বা ব্যাপার বোধক বিশেষ্যে সপ্তমীবিভক্তি হইয়া থাকে; যথা—**ক্রূরতায়** 'সর্পসম'; "**পরাক্রমে** 'ভীমাসমা!'"—মধুসূদন; **কপটতায়** 'শকুনির মত'; **রূপে** 'কার্তিকেয়ের তুল্য'; **রূপে** 'যেন রতিপতি বা 'কন্দর্পসমান'; ইত্যাদি।

৮। সহার্থক শব্দের অপ্রযোগে তৎসংশ্লিষ্ট বিশেষ্যে সপ্তমী; যথা—এরা **দুধে** [=দুধের সহিত] জল মিশায় না, জলে [=জলের সহিত] দুধ মিশায়। **তেলে** [=তেলের সহিত] জলের (কর্তায 'এ') মিশ খায় না।

৯। **অবচ্ছেদে** [অঙ্গবিশেষের পৃথক্‌গ্রহণ বুঝাইলে] সপ্তমী; যথা—দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক **কেশে** আকৃষ্টা হইলে; সাপটা তাহাকে **পায়ে** কামড়াইয়াছে; ইত্যাদি।

লক্ষণীয—ব্যক্তিবাচক **কর্মটি** অবচ্ছিন্ন অঙ্গের সম্বন্ধপদে পরিণত হইলে অঙ্গবাচকপদটিতে কর্মে দ্বিতীয়াও বলা যাইতে পারে; যথা—দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশে বা কেশে আকর্ষণ করিলেন; সাপটা তাহার **পা** অথবা পায়ে কামড়াইযাছে।

যেমন সর্বত্র ষষ্ঠীবিভক্তির লক্ষণে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বলা যায তেমনি 'ভাবে সপ্তমী' ব্যতীত আর সকল স্থানেই অধিকরণে সপ্তমী বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের উক্তি প্রণিধান যোগ্য—'অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রে, ক্রিযার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অপরিহার্যও নহে। দ্রষ্টব্য: "কর্তৃকর্মব্যবহিতাম সাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। উপকুর্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।" (বাক্যপদীয়)'

অনুশীলনী

১। বিভক্তি কাহাকে বলে? অনুসর্গ কাহাকে বলে? বিভক্তি ও অনুসর্গে প্রভেদ কী?

২। কারক কাহাকে বলে?

৩। কারক কতপ্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটি কারকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক নহে কেন?

৫। কর্তা কতপ্রকারের হইতে পারে উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬। প্রযোজ্য কর্তা ও প্রযোজক-কর্তার পার্থক্য নির্ণয় কর।

৭। কর্ম কতপ্রকার ও কী কী? প্রত্যেকপ্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৮। কর্ম-সম্বন্ধী অনুসর্গ কাহাকে বলে উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৯। কর্মকারকে কোন্ কোন্ বিভক্তি হইয়া থাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১০। সম্প্রদানকারক কাহাকে বলে? বাঙ্‌লায় কর্ম হইতে সম্প্রদানকে পৃথক করিবার প্রয়োজন কী?

১১। অধিকরণ কাহাকে বলে? অধিকরণ কতপ্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১২। সংজ্ঞানির্ণয় কর ও উদাহরণ দাও:—

অনুক্ত কর্তা, কালাত্তায়ী কর্তা; উক্তকর্ম, ভাব-কর্ম, উপাদানাত্মক করণ, যন্ত্রাত্মক করণ, সামীপিক অধিকরণ; ভাবাধিকরণ, অনুসর্গ সম্বন্ধী, প্রকৃতি-বিকৃতি সম্বন্ধ।

১৩। কারক-সম্বন্ধ ও শেষ-সম্বন্ধের পার্থক্য নির্ণয় কর।

১৪। শেষ-সম্বন্ধের পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রকারের নাম কর এবং উদাহরণ দাও।

১৫। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে অধোরেখ পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(i) আমা হ'তে একাজ হবে না। (ii) "নিজমনে গাহি গান"। (iii) ওকে আর না মেরে পুলিশের হাতে দাও। (iv) তাকে কত বাবা-বাছা ব'লাম। (v) "যাও না নন্দ, করগে ভা'য়ের সেবা।" (vi) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল। (vii) কড়িতে বাঘের দুধ মেলে। (viii) কালো মেঘে বৃষ্টি হয়। (ix) ছোট ছোট ছেলেগুলি রাস্তায় খেলে গুলি। (x) চক্ষুদিয়া পড়ে জল দরদর অবিরল। (xi) যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। (vii) বেত মারা চলে না। (viii) ঠাকুরের ভোগ দাও। (xiv) বাবা বাড়ী নেই। (xv) ঘ'রকে যেতে মন সরে না। (xvi) দীনে প্রসন্না হও, দেবি! (xvii) ধনে জনে সুখে থাক। (xviii) "বিপদে যেন না করি আমি ভয়।" (xix) তোমার খাওয়া হ'ল? (xx) রামকে ডাকার দরকার নাই।

৪। **গতি বাচক**—খটমট (করে চলা), খটাৎ খটাৎ (খড়ম নিয়ে চলেন তিনি খটাৎ খটাৎ), গুটিগুটি (আসা), চট্ (করে আসা), দুড্দাড করে (এল দলে দলে ছুটে), ধাঁ (করে আসা,) সাঁ (করে চলে যাওয়া), সড্সড্ (করে সাপ চলে), সুড়সুড় (করে পিঁপড়ে চলে), হন্হন্ (করে ছুটে চলেছে), গট্গট্ বা গট্মট্ (করে চলা), থপ্থপ্ বা থপাস্ থপাস্ (করে বেঙ চলে)।

৫। **কঠোরতা বাচক**—কটমট (রাগে কটমট করে চাওয়া), কনকনে (শীত), খটখটে (রোদ) খলখল (অট্টহাসি), চকচকে (তীব্র স্রোত যেন চক্চকে খড়্গের মতো)।

৬। **চঞ্চলতা বাচক**—আঁকুপাঁকু (ছেলেটা মার কাছে যাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে), উশখুশ (বাড়ি যাবার জন্যে উশখুশ করছে), কিলবিল (বিলের জলে সাপ কিলবিল করছে), চুলবুল ('চঞ্চল চুলবুল পাখনায় নির্ভর') টলমল (করছে পুকুরের জল), লক্লক্ (বেত, লাউডগা, জিহ্বা—লক্লক্)।

৭। **লালিত্য ও কোমলতাবাচক**—ছলছল (দুইবিন্দু অশ্রুজল দুই চক্ষে ছলছল), টল্টল্ (জলে গাছের ছায়া টল্‌টল্ করে দুলছে) তুলতুলে (গাল), ফিনফিনে (জামা), ফিসফিস (কথা), মিটমিটে (প্রদীপ)।

৮। **শরীরের বা মনের অনুভূতি বাচক**—আইঢাই (প্রাণ আইঢাই করা), আনচান ('মা বলিতে প্রাণ করে আনচান'), কট্‌কট্ (ব্যথায় কান কট্কট্ করছে), কন্‌কন্ (ব্যথায় দাঁত কন্‌কন্ করা), ঘড্ঘড্ (শ্লেষ্মায় গলা ঘড্ঘড্), ঘিন্‌ঘিন্ (ঘেন্নায় গা ঘিন্ ঘিন্ করছে), চিন্‌চিন্, ছম্‌ছম্ (ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করা)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে স্বরবর্ণের বিভিন্নতা অর্থের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে; যথা,—কুচ্ বা কুচুৎ (ছোট জিনিস কাটা); কচাৎ (বড জিনিস কাটা)। কচকচ (সাধারণ ভাবে কাটা); কচাকচ (প্রথমে বড টুকরা অথবা অপেক্ষাকৃত আস্তে এবং পরে ছোট টুকরা অথবা অতি দ্রুত কাটা)। এইরূপ—টপ্টপ্, টপাটপ টুপ টুপ টুপুরটুপুর, টাপুর টুপুর। ঝিরঝির, ঝরঝর ইত্যাদি।

আরও কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ—আমতা-আমতা, কটকটে, কড়কড়ে, খস্‌খসে, খুঁতখুঁত, গনগনে (আগুন), গবগব (রাগে গর্‌গর্‌), গিশ্‌গিশ্‌ (লোকে গিশ্‌গিশ করছে), ঘুট্‌ঘুটে (অন্ধকার), ঘুস্‌ঘুসে (জ্বর), ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ চক্‌মকে, চিক্‌মিক্‌, চন্‌চন্‌ (রোদ), চট্‌চটে (আঠা), চিট্‌চিটে (তেল চিট্‌চিটে) ছপ্‌ছপ্‌ (দাঁড় ফেলে চলেছে), ছিপছিপে (গড়ন), জল্‌জ্বল্‌ (তারা), ঝক্‌ঝকে, ঝলমলে, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঠন্‌ ঠন্‌, তক্‌ তক্‌, থক্‌থকে (কাদা), (পচা) থস্‌থসে, দপ্‌দপে, দাউদাউ, ধড়্‌মড়্‌, ধেইধেই, নড়বড়ে, পিলপিল, ফুরফুরে (হাওয়া), বন্‌বন্‌, বিড়্‌বিড়্‌, বৈ-বৈ, হাঁসফাঁস, হিম্‌সিম্‌, হুস্‌হুস্‌, হৈহৈ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের মধ্যে কি পার্থক্য, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :—

পিলপিল্‌। ঠুংঠুং। ঝাঁ ঝাঁ। টিপ্‌টিপ্‌। সন্‌সন্‌। ফিক্‌ফিক। হন্‌হন্‌। কট্‌মট্‌। কিল্‌বিল্‌। লক্‌লক্‌। টল্‌টল্‌। ঘিন্‌ঘিন্‌। টপাটপ্‌।

৩। উপযুক্ত বিশেষ্য পদ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :—

গনগনে—। ফুটফুটে—। ফুরফুরে—। খিট্‌খিটে—। টিম্‌টিমে—। স্যাঁতসেঁতে—। তক্‌তকে—। ছিপ্‌ছিপে—। খন্‌খনে—। ঝল্‌মলে—। লিক্‌লিকে—। প্যাচ্‌পেচে—। হলহলে—।

৪। অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—

শীত, শীত-শীত। টপ্‌টপ্‌, টপাটপ্‌। ধূধূ, হুহু। ছম্‌ছম্‌। ঘট্‌ঘট্‌ ঘুট্‌ঘুট। দগ্‌দগ্‌ দপ্‌ দপ্‌। মশ্‌মশ, মড়্‌মড়্‌। সপাসপ্‌ সপ্‌সপ। তল্‌তল, তুল্‌তুলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাগ্‌ধারা

শব্দের অর্থ তিন প্রকার—(১) **বাচ্যার্থ**, (২) **লক্ষ্যার্থ** ও (৩) **ব্যঙ্গ্যার্থ**।

(১) বাচ্যার্থঃ শব্দের উচ্চারণ-মাত্র যে অর্থ-বোধ হয়, তাহাকে শব্দের **বাচ্যার্থ** বলে। সমার্থক শব্দ (অঙ্গ, দেহ, শরীর, গাত্র), বিপরীতার্থক শব্দ (অন্ধকার—আলোক, আপন—পর), প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (লক্ষ্য—লক্ষ, বর্শা—বর্ষা), নানার্থক শব্দ (কাল—আগামী দিন, সময়, মৃত্যু, যম) প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দই বাচ্যার্থ প্রকাশ করে।

২। **লক্ষ্যার্থঃ** কোনও শব্দ যখন বাচ্যার্থকে ছাড়াইয়া আনুষঙ্গিক অন্য অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাহাকে **লক্ষ্যার্থ** বলা হয়। যথা,—

রায় মশাই এই গাঁয়ের **মাথা**। এই ছেলে বংশের **মুখ** রাখবে।

এ ব্যাপারে তার **হাত** আছে।

এই তিনটি বাক্যে—মাথা, মুখ, হাত—এই শব্দগুলির অর্থ 'মস্তক' 'বদন' ও 'হস্ত' না বুঝাইয়া যথাক্রমে 'প্রধান' 'সম্মান' ও 'প্রভাব' বুঝাইতেছে। শব্দের এইরূপ অর্থই **লক্ষ্যার্থ**।

৩। **ব্যঙ্গ্যার্থঃ** কখনও কখনও শব্দ বা শব্দসমষ্টি বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থকেও অতিক্রম করিয়া গভীর ব্যঞ্জনাময় অর্থের ইঙ্গিত দেয়; এইরূপ অর্থকেই **ব্যঙ্গ্যার্থ** বলে। যথা—ঐ নাতিটিই বৃদ্ধের **অন্ধের যষ্টি**। এই বাক্যে, নাতিটি যে অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে। এইরূপ অর্থই **ব্যঙ্গ্যার্থ**।

বাগ্‌ধারাঃ লক্ষ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থবিশিষ্ট শব্দ বা শব্দসমষ্টি অথবা বাক্যাংশকেই **বাগ্‌ধারা** বা **ভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ** বা

আলংকারিক প্রয়োগ বলে। বাগ্‌ধারাই ভাষার প্রাণ। ইহা দ্বারা মনের ভাব যত সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। নিম্নে বাগ ধারার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

বিভিন্ন পদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য পদের

কথা

(১) কথা (প্রতিশ্রুতি)—কথা দিলে কথা রাখতে হয়।

(২) কথা (বিবরণ)--চুরির কথা শুনেই দারোগাবাবু তদন্তে বেরোলেন।

(৩) কথা (প্রসঙ্গ)—ও কথা থাক, অন্য কথা বল।

(৪) কথা শোনা (মান্য করা)—গুরুজনের কথা শুনতে হয়।

(৫) কথা পাড়া (প্রসঙ্গ উত্থাপন করা)—তার কাছে বিয়ের কথাটা পেড়ে দেখো।

(৬) কথায় থাকা (আলোচনায় যোগ দেওয়া)—আমি ভাই তোমাদের কোনো কথায় থাকতে চাইনে।

(৭) কথায় বলে (প্রবাদ)—কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

গা

(১) গা করা (চেষ্টা করা)—কোনো কাজেই সে গা করে না।

(২) গা তোলা (গাত্রোত্থান করা)—খাওয়ার জায়গা হয়েছে, এবার আপনার গা তুলুন।

(৩) গা-সহা (অভ্যস্ত)—লোকনিন্দা তার গা-সহা হয়ে গেছে।

(৪) গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)—পুলিসের ভয়ে আসামী গা ঢাকা দিলে।

(৫) গায়ের ঝাল ঝাড়া (আক্রোশ মিটানো) শাশুড়ী ঝি-কে বকে বউয়ের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়লেন।

(৬) গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (বিনা দায়িত্বে চলা)—মাথার উপর বাবা আছেন কি না, তাই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ।

(৭) গায়ে কাঁটা দেওয়া (ভয়ে রোমাঞ্চ হওয়া)—সেই নৃশংস খুনের কথা মনে হলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।

চোখ

(১) চোখ রাখা (নজর রাখা)—ষ্টেশনে নিজের মালের উপর চোখ রেখো

(২) চোখ উঠা (রোগ বিশেষ)—ছেলেটার চোখ উঠেছে।

(৩) চোখ ফোটা (জ্ঞান হওয়া)—তার দুর্দশা দেখেও তোমার চোখ ফুটল না ?

(৪) চোখ টাটানো (ঈর্ষা হওয়া)—তার শ্রী দেখে তোমার চোখ টাটাচ্ছে কেন ?

(৫) চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকানো)—মাস্টার-দা পুলিসের চোখে ধূলা দিয়ে অদৃশ্য হইলেন।

(৬) চোখের বালি (চক্ষুশূল)—সতীন-পোটি সৎমার চোখের বালি।

(৭) চোখ টেপা (ইশারা করা)—তাকে আসতে দেখেই রমেশ বাবু চোখ টিপলেন।

(৮) চোখের চামড়া (লজ্জা)—সুদখোরটার চোখের চামড়া নেই।

মাথা

(১) মাথা (প্রধান মুরুব্বি)—তিনিই এই সমিতির মাথা।

(২) মাথা (বুদ্ধি)—ছেলেটির অংকে বেশ মাথা আছে।

(৩) মাথায় উঠা (প্রশ্রয় পাওয়া)—কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে।

(৪) মাথা ঘামানো (চিন্তা করা)—সামান্য বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

(৫) মাথায় ঢোকা (বোধগম্য হওয়া)—এই সোজা কথাটা তোমাব মাথায় ঢুকছে না ?

(৬) মাথা খাওয়া (সর্বনাশ বা ক্ষতি কবা)—অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমি ছেলেটিব মাথা খেয়েছ।

(৭) মাথা খাওয়া (নাবীজন সুলভ দিব্য)—"মাথা খাও। ভুলিও না, খেযো মনে কবে।"

(৮) মাথা কাটা যাওয়া (অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া বা অপমানিত হওযা)—ছেলেব দুর্ব্যবহাবে সভাব মাঝখানে বাবাব মাথা কাটা গেল।

(৯) মাথায় হাত বুলানো (প্রবঞ্চনা দ্বাবা কার্য সিদ্ধি)—পরেব মাথায় হাত বুলিযে সে দিব্যি সংসাব চালিয়ে যাচ্ছে।

(১০) মাথায কাঁঠাল ভাঙা (পবেব অনিষ্ট কবিযা কার্য সিদ্ধি)—পবেব মাথায় কাঁঠা'ল ভেঙে আব ক'দিন চলে ?

(১১) মাথায হাত দিযে বসা (নৈবাশ্যে ভাঙিয়া পডা)—ব্যাঙ্ক ফেলেব সংবাদ শুনেই সাধনবাবু মাথায় হাত দিযে বসলেন।

(১২) মাথাব ঘাম পাযে ফেলা (গুরুতব পবিশ্রম কবা)—মাথাব ঘাম পাযে ফেলেও সে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না।

(১৩) মাথা গবম কবা (চটা)—মিথ্যে মাথা গবম কবো না।

মুখ

(১) মুখ বাখা (মান বাখা)—এই ছেলেটি তোমাব বংশেব মুখ রাখবে।

(২) মুখ (বাহিরাচবণ)—তোমাব পেটে এক মুখে আব।

(৩) মুখ চুন হওয়া (লজ্জায় বা নৈরাশ্যে পাংশুমুখ)—এই জবাব শুনে তাব মুখ চুন হয়ে গেল।

(৪) মুখ নাড়া (ভর্ৎসনা)—পরেব গলগ্রহ হলেই মুখ নাডা সইতে হয়।

(৫) মুখ পোডানো (সম্মান নষ্ট করা)—সামান্য ক'টা টাকার লোভে তুই বায়বংশের মুখ পুড়িয়ে এলি ?

(৬) মুখ সামলানো (সংযত হওয়া)—মুখ সামলে কথা বলিস্।

(৭) মুখ তুলে চাওয়া (প্রসন্ন হওয়া)—ভগবান, এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না, একবার মুখ তুলে চাও।

(৮) মুখ চাওয়া (অপবের উপব নির্ভব)—পরেব মুখ চেয়ে কি আব দিন চলে।

(৯) মুখ কবা (তিবস্কাব কবা)—অকারণ সে আমায় মুখ কবে।

(১০) মুখ ভাব কবা (বিষণ্ণ হওয়া)—মুখ ভাব কবে বসে আছ কেন ?

(১১) মুখ দেখানো (সমাজে চলা)—এই কেলেঙ্কাবিব পব আর মুখ দেখাবে কী কবে ?

(১২) মুখ খাবাপ কবা (অশ্লীল বাক্য বলা)—ইতবেব মতো মুখ খাবাপ কবছ কেন ?

(১৩) মুখচোবা (লাজুক)—জামাই ভাবী মুখচোবা।

(১৪) মুখ ফোটা (নীববতা ভাঙিয়া কথা বলা)—এতক্ষণ বোবা সেজেছিল, খোঁচা খেয়েই মুখ ফুটেছে দেখছি।

(খ) বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাঁচা

(১) ছেলেমানুষ কি না, বুদ্ধি এখন কাঁচা (অপবিণত)

(২) কাঁচা আম নুন-লঙ্কা দিয়ে খেতে উপাদেয়। (অপক্ক)

(৩) বর্বব যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত। (আরাঁধা)

(৪) কাঁচা কাজ কবাব ছেলে সে নয়। (অনিপুণ বা অসাবধানে কৃত)

(৫) খুকু কাঁচা ঘুমে জেগে উঠেছে। (অগভীব বা অপূর্ণ)

(৬) গাঁয়ের অধিকাংশ বাড়িই কাঁচা। (মাটির)

(৭) কাঁচা কাঠে প্রচুব ধোঁয়া হয়। (অশুষ্ক)

(৮) চোরা কারবাবে সে খুব কাঁচা পয়সা জমিয়েছে। (অনায়াসলভ্য)

(৯) একটা কাঁচা ফর্দ কবে ফেল। (প্রাথমিক, পবে পরিবর্তনীয়)

(১০) শিল্পোন্নতির জন্য কাঁচা মালেব দরকার। (অবিকৃত উৎপন্ন দ্রব্যাদি)

পাকা

(১) মাছটিব ওজন পাকা দশ সের হবে। (পূবাপূবি)
(২) শাড়িটির পাড়ের রং পাকা। (স্থায়ী)
(৩) পাকা রাস্তার ধাবে আমাদের বাড়ী। (বাঁধানো)
(৪) বলরাম পাকা খেলোয়াড। (নিপুণ)
(৫) পাকা সোনায় খাদ মিশিয়ে গিনি হয়। (খাঁটি)
(৬) তাঁকে আমি পাকা কথা দিয়াছি (চূডান্ত)
(৭) পাকা দলিলের মার নাই। (আইন অনুসারে সিদ্ধ)
(৮) পাকা মাথায় সিঁদুর পরিও। (শুভ্রকেশে)
(৯) মাছটা বেশ পাকা। (পুষ্ট)

(গ) ক্রিয়া পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উঠা

(১) উঠা (জাগরিত হওয়া)—"উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।"
(২) উঠা (উদিত হওয়া)—পূর্ব দিকে সূর্য উঠে।
(৩) উঠে যাওয়া (বজায় না থাকা)—কাববাবটি উঠে গেল।
(৪) উঠে আসা (বাসা পরিবর্তন করা)—এ বাড়ি থেকে তাবা অনেকদিন উঠে গেছে।
(৫) জাতে উঠা (সামাজিক মর্যাদালাভ)—আগেকার দিনে সমুদ্র পেরোলে দেশে ফিবে গোবর গেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কবে তবে জাতে উঠতে হত।
(৬) মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)—এততেও তাব মন উঠছে না।
(৭) উঠে যাওয়া (বমি হওয়া)—যা খেয়েছিলুম সব উঠে গেল।
(৮) চোখ উঠা (নেত্ররোগ হওয়া)—ছেলেটার চোখ উঠেছে।
(৯) নেচে উঠা (আনন্দে মত্ত হওয়া)—নিমন্ত্রণের নাম শুনলেই সে নেচে উঠে।

(১০) রব উঠা (জনরব প্রচারিত হওয়া)—রব উঠল, একদল ডাকাত এ গাঁয়ে লুকিয়ে আছে ছদ্মবেশে।

কাটা

(১) কাটা (সময় অতিবাহিত হওয়া)—দুঃখের দিন আর কাটতে চায় না।

(২) কাটা (বিক্রয় হওয়া)—বইগুলো কাটছে ভালো।

(৩) কথা কাটা (খণ্ডন করা)—আমার কথা কাটবে, এমন সাধ্যি কারো নেই।

(৪) ছড়া কাটা (আবৃত্তি করা)—সে কথায় কথায় ছড়া কাটে।

(৫) দুধ কাটা (জলনিঃসরণহেতু দুধ জমিয়া যাওয়া)—দুধটা কেটে গেল।

(৬) গলাকাটা (অত্যাধিক)—বাজারে আজকাল মাছের গলাকাটা দাম।

(৭) নাককান কাটা (জব্দ করা)—এ পাড়ায় এলে এবার নাক কান কেটে ছাড়ব।

(৮) জিভ কাটা (লজ্জায় জিবে দাঁত চাপা)—অপকর্ম করেই সে জিভ কাটলে।

(৯) কাটা-কাটা (স্পষ্ট)—ঠোঁটকাটা [স্পষ্টবক্তা] লোক যে, কাটা-কাটা কথা ত' বলবেই।

চলা

(১) চলা (সময় নির্দেশ করা)—ঘড়িটা ঠিক চলছে।

(২) চলা (মৃত্যুপথে পা বাড়ানো)—আমি তো চললাম, ছেলেটার কোনো হিল্লে করে যেতে পারলাম না।

(৩) চলা (কুলনো)—এত কম আয়ে কি সংসার চলে ?

(৪) হাত চলা (প্রহারে হাতের ব্যবহার)—সামন্য কারণেই তার হাত চলতে শুরু করে।

(৫) মুখ চলা (জবাব করা, গালি দেওয়া)—একটা কথা বলেছি কি অমনি কুঁদুলে বুড়ীব মুখ চলতে শুরু হল।

(৬) চলে যাওয়া (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া)—এই টাকাতেই আমাব চলে যাবে।

(৭) বাজারে চলা (বিক্রীত হওয়া)—প্রবন্ধেব বই বাজাবে চলে কম।

তোলা

(১) চাঁদা তোলা (সংগ্রহ কবা)—ছেলেবা সরস্বতী পূজাব চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে।

(২) কথা তোলা (উত্থাপন করা)—সময় বুঝেই কথাটা তুলবে।

(৩) পটল তোলা (মারা যাওয়া)—বুড়ি কাল রাতে পটল তুলেছে।

(৪) জাতে তোলা (উন্নত কবা)—প্রায়শ্চিত্তেব পব তাকে জাতে তোলা হল।

(৫) শিকেয় তোলা (দূব ভবিষ্যতেব জন্য স্থগিত বাখা)—আত্মাব কথা শিকেয় তোলা থাক্‌, আত্মবক্ষাব ব্যবস্থা আগে কর।

(৬) মাথা তোলা (উন্নতি করা)—বিঘ্নবিপদকে তুচ্ছ কবেই সংসাবে মাথা তুলতে হয়।

(৭) গাছে তোলা (অতিবক্ত প্রশংসা করা)—লোককে গাছে তোলা চাটুকাবেব স্বভাব।

(৮) হাত তোলা (প্রহাব)—অকাবণে তার গায়ে হাত তুলতে গেলে কেন?

(৯) মাথায় তোলা (প্রশ্রয় দেওয়া)—ছেলেদের মাথায় তুলতে নেই।

ধরা

(১) বৃষ্টি ধবা (বন্ধ হওয়া)—এ ধারা-শ্রাবণ আর ধববে না।

(২) ধরা (বন্ধনকালে পুড়িয়া যাওয়া)—ডালটা আজ ধরে গেছে।

(৩) গোঁ ধরা (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া)—মেয়ে গোঁ ধরেছে, এম. এ. পাস না করে বিয়ে করবে না।

(৪) দোর ধরা (আশ্রয় করা)—ঠাকুরের দোর ধরে তার রোগ ভালো হয়েছে।

(৫) ধামা ধরা (খোশামোদ করা)—উপরওয়ালার ধামা ধরেই সে চাকরি বজায় রাখছে।

(৬) হাতে-পায়ে ধরা (অনুনয়-বিনয় করা)—তাঁর হাতে-পায়ে ধরে দেখ, যদি তিনি তোমাকে বাঁচাতে পারেন।

(৭) রোগ ধরা (ঠাওরানো)—কোনো ডাক্তারই তার রোগ ধরতে পারলেন না।

(৮) পথ ধরা (অবলম্বন করা)—ধর্মের পথ ধর, নির্ভয়ে থাকবে।

(৯) মনে ধরা (পছন্দ হওয়া)—কথাটা আমার মনে ধরেছে।

(১০) ম্যাও ধরা (দায়িত্ব লওয়া)—প্রস্তাবটি ভালো, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে?

(১১) ধরে দেওয়া (অতিরিক্ত দেওয়া)—আর দু'টো টাকা ধরে দিন, সব মালই দিয়ে দিই।

লাগা

(১) মনে লাগা (পছন্দ হওয়া)—নতুন লোকটিকে খুব মনে লেগেছে।

(২) পিছনে লাগা (শত্রুতায় প্রবৃত্ত হওয়া)—দিনরাত পিছনে লেগে রয়েছ কেন?

(৩) ঘাটে লাগা (সংলগ্ন হওয়া)—নৌকা ঘাটে লেগেছে।

(৪) লাগা (আরম্ভ হওয়া)—গ্রহণ লেগেছে।

(৫) লাগা (বোধ হওয়া)—আজ শরীরটা কেমন লাগছে?

(৬) প্রাণে লাগা (কষ্ট হওয়া)—দুর্বাক্য বললে সবারই প্রাণে লাগে।

(৭) লাগা (তুল্য হওয়া)—এর কাছে ও জিনিস লাগে না।

(৮) লাগা (দরকার হওয়া)—চায়ে আর চিনি লাগবে কি?

বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

অকালকুষ্মাণ্ড (অপদার্থ)—একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড, কোন কাজই করতে পারে না।

অকূল পাথার (নিঃসহায় অবস্থা)—পিতার মৃত্যুতে নাবালক পুত্র অকূল পাথারে পড়িল।

অগ্নিশর্মা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ)—তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

অন্ধের যষ্টি (অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন)—একমাত্র পুত্রটিই বিধবার অন্ধের যষ্টি।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ দর্শন ব্যক্তি)—ছ'মাস পরে এলে, অমাস্যার চাঁদ হয়ে উঠলে না কি ?

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)—তার কাছে হাত পাতা অরণ্যে রোদন মাত্র।

অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা)—ভিখারিটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দিলে দরোয়ান।

অহি-নকুল সম্বন্ধ (চিরশত্রুতা)—রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ।

আকাশ-কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)—আকাশ-কুসুম রচনা করলেই কার্যসিদ্ধি হয় না।

আকাশ থেকে পড়া (বিস্ময়ের ভাব প্রদর্শন)—ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আক্কেল গুড়ুম (বুদ্ধি লোপ)—সব বাসনপত্র চুরি হয়েছে দেখে তাঁর তো আক্কেলগুড়ুম।

আক্কেলসেলামী (নির্বুদ্ধিতার বা অনভিজ্ঞতার দণ্ড)—তোমার কথা শুনে এতগুলো টাকা আক্কেলসেলামী দিতে হল !

আঙ্গুলফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক)—যারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়, তারা তো দেমাকে হবেই।

আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা)—আজকাল ডাক বিভাগের

আঠারো মাসে বছব, দুদিনে যে চিঠি পাবাব কথা, প্রাপক তা পায় পঁচিশ দিন বাদে।

আদাজল খেয়ে লাগা (দৃঢসংকল্প হইয়া কাজ কবা)—গতবাবে ফেল্ কবে সৌমিত্র এবার আদাজল খেয়ে পডতে শুরু কবেছে।

আদায়-কাঁচকলায় (বিরূপ সম্পর্ক)—কংগ্রেস আব বামপন্থী দলেব সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে আদায়-কাঁচকলায়।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকর্মণ্য ব্যক্তি)—সে তো আমড়া কাঠেব ঢেঁকি, তাকে দিয়ে কি গ্রামোন্নয়নেব কোনো কাজ সম্ভবপব ?

উত্তম-মধ্যম (প্রহাব)—চোবটাকে ধবে বেশ উত্তম-মধ্যম দেওয়া হল।

উভয়-সংকট (উভয় দিকেই বিপদ)—আপিসে কাজেব চাপ, আব বাডিতে ছেলেব টাইফয়েড্—তাঁব এখন উভয়-সংকট।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (উত্তম বস্তুব অপব্যবহাব, অথবা অপাত্রে উপদেশ দান)—ছেলেদের সভায় রবীন্দ্রনাথেব নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওযা উল্বনে মুক্তা ছডানো মাত্র।

একাদশে বৃহস্পতি (অত্যন্ত সুসময়)—ধূলোমুঠো ধবলে সোনামুঠো হচ্ছে, তাব এখন একাদশে বৃহস্পতি।

কড়ায়-গণ্ডায় (পুবাপুবি)—সুদখোর মহাজন কি কডায়গণ্ডায় পাওনা আদায় না করে ছাডে ?

কলুর বলদ (অন্ধভাবে চলা)—কলুব বলদ হযে আমরা কেবলি সংসারের ঘানিতে ঘুবপাক খাচ্ছি।

কেঁচো গণ্ডুষ (পুনবারম্ভ)—অংক একেবাবেই ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাইভেট টিউশন করতে গিয়ে আবাব কেঁচে গণ্ডুষ কবতে হল।

কূপমণ্ডুক (গণ্ডিবদ্ধ জীবন)—একটা বাঙ্গালী কুপমণ্ডুক ছিল বটে, আজ ঘা খেয়ে সে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুরুক্ষেত্র বেধে যাওয়া (নিদারুণ কলহের সূত্রপাত)—পুকুরের দুটো মাছ নিয়ে দু'শরিকে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল।

ক-অক্ষর গোমাংস (নিরক্ষর)—তাকে দিয়েছ 'সঞ্চয়িতা' পড়তে? তার তো একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস।

খয়ের খাঁ (খোশামুদে)—খয়ের খাঁর দলই সরকারী খেতাব লাভ করে থাকে।

খাল কেটে কুমীর আনা (বিপদ ডাকিয়া আনা)—পৃথ্বীরাজকে জব্দ করবার জন্য জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরীকে আমন্ত্রণ ক'রে খাল কেটে কুমীর আনলেন।

গড্ডলিকা-প্রবাহ (অন্ধভাবে অনুসরণ)—গড্ডলিকা-প্রবাহে গা না ভাসাইয়া মৌলিক হইতে শিক্ষা কর।

গণেশ উলটানো (ব্যবসায় ফেল্ পড়া)—অল্প দিনেই দোকানটি গণেশ উলটেছে।

গোকুলের ষাঁড় (নিশ্চিন্ত নিষ্কর্মা)—সে খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়, যেন গোকুলের ষাঁড়।

গোলে হরিবোল (গণ্ডগোলের মধ্যে কাজে ফাঁকি)—পাঠশালায় নামতা পড়বার বেলায় অনেক ছেলেই গোলে হরিবোল দেয়।

গৌরচন্দ্রিকা (ভণিতা)—গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটা বল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (দুশ্চিন্তা দূর হইলে স্বস্তিবোধ)—আপদটা বিদেয় হয়েছে, না ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে।

চিনির বলদ (ভারবাহী, কিন্তু ফলভোগী নয়)—আমরা ব্যাঙ্কের কেরানী শুধু চিনির বলদ, টাকা নাড়াচাড়া করেই জীবনটা কাটে; অভাব ঘোচে না।

চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা)—কী করে বলি বল? একটা চোখের চামড়া তো আছে?

ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা)—লোকটা ছিনে জোঁক, টাকা না নিয়ে উঠবে না।

ছাইচাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা)—দারিদ্র্যের চাপে ওর প্রতিভা ছাইচাপা আগুন হয়েই রইল, প্রকাশ পেল না।

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)—লোকটা সুবিধের নয়, ওর মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (সকল কাজে সমান পটু)—লোকটা চৌকস, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই জানে।

ঝাঁকের কই (দলগত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন)—শখ করে দু'দিন এদলে এসেছে, দেখবে—দু'দিন পরে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশবে।

ঝ'ড়ো কাক (রুক্ষ মূর্তি)—তিন দিন ধরে ট্রেনে, চেহারাটা ঝড়ো কাক হবে না তো কী?

ঝোপ বুঝে কোপ (সুযোগ বুঝিয়া আঘাত হানা)—ক'দিন অপেক্ষা কর, তারপর একেবারে ঝোপ বুঝে কোপ মারবে।

টাইটুম্বুর (পরিপূর্ণ)—বর্ষার পুকুর জলে টইটুম্বুর।

টাকার কুমীর (বিপুল অর্থের অধিকারী)—তাঁকে চেন না, তিনি একটি টাকার কুমীর।

টাকার গরম (অর্থের অহংকার)—ধনীর বলে টাকার গরম দেখানো ভাল নয়।

ঠোঁট কাটা (অপ্রিয় সত্যবাদী)—সে ঠোঁটকাটা লোক রূঢ়, সত্য বলতে তার বাধবে কেন?

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য)—খাঁটি জিনিস আজকাল ডুমুরের ফুল হয়েছে।

ঢাকের বাঁয়া (ব্যক্তিত্বহীন অনুবর্তিতা)—প্রতি স্কুলেই প্রধান শিক্ষকই তো অনন্য, আর সব তো ঢাকের বাঁয়া।

তালকানা (মাত্রাজ্ঞানহীন)—তালকানা লোককে দিয়ে কাজ করাতে গেলে এমনি গোল পাকায়।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)—জীবনটা তাসের ঘর, যে-কোনো মুহূর্তেই মৃত্যুর দমকা হাওয়া শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

তিলকে তাল করা (সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা)—"যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার অন্তঃপুরে তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে।"

তীর্থের কাক (নিশ্চেষ্ট ও অপরের সাহায্যপ্রত্যাশী)—তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকলে কী হবে ? নিজে গিয়ে তদ্বির করতে হবে।

তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড)—গোস্বামী-প্রভু তুলসী বনের বাঘ, সেদিন দেখলাম—রেস্তোরাঁয় বসে চপ-কাটলেট ওড়াচ্ছেন।

তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী শোক)—পুত্রশোক তার বুকে তুষের আগুন জ্বেলে দিয়েছে, সহজে নিববে না।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া (অপ্রয়োজনীয় পাত্রে দান)—গরিবের কথা কে আর ভাবে ? সবাই তো তেলা মাথায় তেল দিতে ব্যস্ত।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠা (সহসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া)—কথাটা শুনবার আগেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

দক্ষযজ্ঞ (লণ্ডভণ্ড কাণ্ড)—"জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া বরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

দু'নৌকোয় পা (উভয় দিক রক্ষার চেষ্টা)—দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোনো কূলই বজায় থাকে না।

ধনুকভাঙ্গা পণ (কঠোর প্রতিজ্ঞা)—সমীর এবার ধনুকভাঙা পণ করে বসেছে, পরীক্ষায় প্রথম সে হবেই।

ধরাকে সরা দেখা (অহংকারে সকলকে তুচ্ছ করা)—হঠাৎ বড়লোক কি না, দম্ভে তাই ধরাকে সরা দেখছে।

ধর্মের ষাঁড় (অকর্মণ্য ভবঘুরে)—দিলীপ একটি ধর্মের ষাঁড়, কেবল পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, আর বাড়িতে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করে।

ধামা ধরা (চাটুকারিতা)—তুমি তো কেবল বড়বাবুর ধামা ধরতেই আছ।

ধামা চাপা দেওয়া (ইচ্ছাপূর্বক এড়াইয়া যাওয়া)—পুলিস এতবড় একটা খুনের ব্যাপার বেমালুম ধামা চাপা দিলে !

নখদর্পণে (উত্তমরূপে জ্ঞাত) সমগ্র পাণিনিই শাস্ত্রী মশাইয়ের নখদর্পণে।

৬। বাঙ্‌লায় বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের উপায় কী? দৃষ্টান্তদ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের স্থূল পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ: "**অতি বড় বৃদ্ধ** পতি সিদ্ধিতে নিপুন"—ভারতচন্দ্র। "**পরম কুলীন** স্বামী **বন্দ্যবংশ-খ্যাত**"—ঐ। "**হঠাৎ উপরে** অঙ্গুলি নির্দেশ **করিয়া** ব্যগ্রস্বরে কহিল"—শরৎচন্দ্র। "দৈবই দেখছি, **সর্বত্র প্রবল**"—রাজশেখর। "**এ বিষম** বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমন?—মধুসূদন। "**অসার** সংসারচক্র ঘোরে **নিরবধি**"—নবীনচন্দ্র। "তপস্যাবলে **একের** অনলে **বহুরে** আহুতি দিয়া"—রবীন্দ্রনাথ। "**এমনি যখন দুই** সন্ধ্যা গেল কেটে"—ঐ। "লেখে যত তার **দ্বিগুণ** ঘুমায়"—দ্বিজেন্দ্রলাল। "আমাদের এই নবীন সাধনা **শবসাধনার** বাড়া"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। "**ছোটো** যে হায় **অনেক সময় বড়োর** দাবি দাবিয়ে চলে"—কুমুদমল্লিক। "সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, **তৃতীয়** প্রহর বেলা"—কালিদাস রায়। "তরু হতে যে বা হয় **সহিষ্ণু**, তৃণ হতে **দীনতর**"—ঐ। "উদিবে **সে** রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া **পুনর্বার**"—নজরুল। "জানিয়াছি **সার** তত্ত্বসব মায়া, তুমি সত্য"—করিবত্ন। "কিন্তু পশুরা **অধিকতর ধর্মশীল**"—"**তোমার চেয়ে** হাঁড়ি চাঁচা ভালো"—বঙ্কিমচন্দ্র।

৮। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির উৎকর্ষাপকর্ষ—জ্ঞাপক তৎসমরূপ প্রদান কর:— অল্প, গুরু, ক্ষুদ্র, মহৎ, বৃদ্ধ, অল্প, তীব্র, বৃহৎ, যুবা, বহু, লঘু, প্রিয়, প্রশস্য, বলবান্।

৯। শুদ্ধাশুদ্ধিবিচার কর:—

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পথ আছে কি? ভীমের চেযে অধিকতর বলিষ্ঠ কেহ ছিল না। অশোক প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজা। জননী জন্মভূমি সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। রাম শ্যাম অপেক্ষা এক বৎসরের কনিষ্ঠ। এখন সবচেয়ে গুরুতর বিপদ্ চীনা-আক্রমণ। তিনি ছিলেন সে যুগের সর্বাধিক মহীয়সী নারী।

ক্রিয়াপদ

বাক্যে ব্যবহৃত যে পদদ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান উপলব্ধ হয় তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে।

"আমরা যথা হইতে **আসি** আবার তথায় ফিরিয়া **যাই**" আচার্য জগদীশচন্দ্র।

'একটা প্রবন্ধ **লিখিলাম**' আমি ত' **রহিলাম**; কোনও বিপদ্ **ঘটিবে** না'। উপরের বাক্যসমূহে স্থূলাক্ষর পদগুলি **ক্রিয়াপদ**; কেন না উহাদের দ্বারা যথাক্রমে 'আগমন' 'গমন', 'লিখন', 'অবস্থান'ও 'ঘটন' কার্যের অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যায়।

ক্রিয়াপদ-ধাতু-ক্রিয়া

বাঙ্‌লায় **ক্রিয়াপদ** অর্থে **ক্রিয়া** কথাটি প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইলেও উহারা **সমার্থক নহে**।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে শব্দজননী **প্রকৃতি 'প্রাতিপদিক'** ও**'ধাতু'**—এই **দুই** ভাগে বিভক্ত। **ধাতু-ই মুখ্য প্রকৃতি** কারণ **ধাতু**-হইতে বহু প্রাতিপদিকেরও **উদ্ভব** হইয়া থাকে। **√ঈশ্** হইতে জাত **ঈশ্বর** [√ঈশ্+বরচ্] **প্রাতিপদিক** অর্থাৎ শব্দ বিভক্তিযোগে ইহার পদে পরিণত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে। **'গম্'** একটি ধাতু, কিন্তু উহা হইতে গঠিত **গমন** [√গম্+ল্যুট্ বা অনট্] একটি প্রাতিপদিক; আবার **আসি, যাই** প্রভৃতি বাঙ্‌লা **ক্রিয়াপদ** বিশ্লেষণ করিলেও দেখিতে পাই √আস্, √যা এর সঙ্গে **ধাতুবিভক্তি 'ই'** যুক্ত হইয়া উক্ত ক্রিয়াপদে পরিণত হইয়াছে।

"ঈশ্বরীরে **জিজ্ঞাসিল** ঈশ্বরী পাটনী"—ভারতচন্দ্র। এখানে **'জিজ্ঞাসিল'** ক্রিয়াপদটির গঠনপ্রণালী লক্ষনীয়। স্পষ্টতঃ **জিজ্ঞাস্**-ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তি **'ইল'** যোগে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু **জিজ্ঞাস্** প্রকৃতি হইলেও মূলে প্রকৃতি নহে; **ইহা 'জ্ঞা'** ধাতুর সহিত **সন্** প্রত্যয়যোগে গঠিত। তাই, **ধাতুই** হইল **মূল** বা **মুখ্য প্রকৃতি**।

ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে **বর্ণ** বা **বর্ণসমষ্টি** পাওয়া যায়। বর্ণগুলি স্বভাবতঃ অর্থহীন হইলেও **ধাতু**-রূপে প্রযুক্ত **একক বর্ণেরও অর্থ** রহিয়াছে; যেমন √**ই**= যাওয়া। একাধিক বর্ণের মিলনে গঠিত **ধাতুটিই অর্থযুক্ত,** বর্ণগুলি স্বতন্ত্রভাবে অর্থহীন; যেমন—√গম্=যাওয়া; কিন্তু গ্, অ, ম্-এর পৃথক্‌ভাবে কোন অর্থ নাই। **ধাতুর** এই **অর্থ-ই ক্রিয়া** এবং **ক্রিয়া-প্রতিপাদক বর্ণ** বা **বর্ণসমষ্টি**-ই **ধাতু**। **ধাতুর** সহিত **বিভক্তিযোগে** যে পদের সৃষ্টি হয় তাহাই **ক্রিয়াপদ**। ক্রিয়া-ভাবক বা ক্রিয়াপ্রতিপাদক ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে উহাতে কাল-পুরুষ বচন বোধের যোগ্যতা

উৎপন্ন হয় এবং এইরূপেই ইহা বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যা—একটি **ধাতু**; উহার 'যাওয়া' **অর্থটি** হইল **ক্রিয়া**, এবং '**ই**' বিভক্তিচিহ্নের যোগে 'আমি **যাই**' বাক্যে ব্যবহৃত '**যাই**' একটি **ক্রিয়াপদ**; এই ক্রিয়াপদটিতে 'বর্তমান কাল', 'উত্তম-পুরুষ' ও 'এক-বচনের' বোধ জন্মিতেছে। এই আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—

(ক) **ক্রিয়াপ্রতিপাদক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে *ধাতু বলে** অথবা **প্রাতি-পদিক ব্যতীত অন্য বিভক্তিবিহীন সার্থক বর্ণ** বা **বর্ণসমষ্টিই ধাতু**; যথা—√ই, √যা, √খা, √কৃ, √শ্ব, √জিজ্ঞাস্, √জাজ্বল্য, ইত্যাদি।

(খ) **ধাত্বর্থকে ক্রিয়া বলে** অর্থাৎ **ধাতুতে যে অর্থটি নিহিত থাকে তাহাই ক্রিয়া**; যথা 'ই'-ধাতুর **যাওয়া**, 'খা'-ধাতুর **খাওয়া**, 'জাজ্বল্য' ধাতুর '**অতিশয় জ্বলা**' প্রভৃতি ভাবময় **অর্থই ক্রিয়া**। ["ধাতুতে যে ভাবময়ী ক্রিয়া ছিল Potential energy রূপে ক্রিয়াপদে তাহা Dynamic রূপ ধরিল"—অধ্যাপক শ্যামাপদ।]

(গ) **ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া কাল-পুরুষ বচন বোধকরূপে যে পদের সৃষ্টি করে তাহাই ক্রিয়াপদ** অথবা **ধাতুতে নিহিত ভাবময়ী ক্রিয়াকে ব্যাপারে পর্যবসিত করিবার নিমিত্ত ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিয়া যে পদ গঠন করা হয় তাহাকে ক্রিয়াপদ** বলে; যথা—[আমি বা আমরা] **যাই** [√যা+ই]; [তুমি বা তোমরা] খাইলে [√খা+ইলে]; [সে বা তাহারা] করিবে [√কৃ+ইবে]; ইত্যাদি।

* "ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ"—মহাভাষ্য। ধাতুঃ ক্রিয়াং বক্তি—ধাতু ক্রিয়ার কথা বলিয়া দেয়, কিরূপে? 'অর্থদ্বারা'। অতএব ধাত্বর্থই ক্রিয়া। পাণিনির "ভাবে"—সূত্রের টীকা [বালমনোরমা]—"ভাবে ভাবনা ক্রিয়া, সা চ ধাতুত্বেন সকল ধাতুবাচ্যা, সর্বধাতুবাচ্যং ক্রিয়াসামান্যম্"—ক্রিয়া ভাবময়ী বা ভাবনামাত্র ধাতুদ্বারা উক্ত। এখানেও ধাত্বর্থ-ই ক্রিয়া। "ক্রিয়া ভাবে ধাতুঃ"—কলাপ। উহার ব্যাখ্যা—"যঃ শব্দঃ ক্রিয়াং ভাবয়তি প্রতিপাদয়তি স ধাতুসংজ্ঞো ভবতি"—যে 'শব্দ' ক্রিয়াকে প্রতিপন্ন করে তাহারই নাম হয় ধাতু। 'শব্দ' দ্বারা সূচিত হইতেছে 'সার্থক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি', ইহা পারিভাষিক 'শব্দ' নহে। সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিপাদক সার্থক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিই ধাতু।

ধাতু : প্রত্যয় : বিভক্তি

'যা', 'যাওয়া', 'যাই'—এই তিনটির রূপ-বৈচিত্র্য ও যোগ্যতা বিচার করিলে ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তির প্রভেদ বুঝিতে ক্লেশ হইবে না। 'যাওয়া' ভাবের ধারক **'যা'** একটি ধাতু। **'যাওয়া'** ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং **প্রাতিপদিক** ; √যা-এর সহিত **'আ'** যুক্ত হওয়ায় **ব-শ্রুতিতে 'যাওয়া'** শব্দটি প্রস্তুত হইয়াছে। এই **'আ'** একটি প্রত্যয়। **'যাই'**-এর বিশ্লেষণেও **√যা+ই** পাওয়া যায় ; কাজেই **'ই'**-ও একটি প্রত্যয়।

উপরিলিখিত **'আ'** এবং **'ই'** দ্বারা ধাতু-সহযোগে নূতন শব্দ উৎপন্ন হইযাছে বলিয়া উভয়েই প্রত্যয, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উভয়েব কার্যের ফল এক নহে। **'যাওয়া'** **শব্দমাত্র,** উহার সহিত আবার বিভক্তি যুক্ত হইলে তবে উহা **পদে** পরিণত হইয়া বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অপর পক্ষে **'যাই'** শব্দমাত্র নহে, উহা একটি পদ, ক্রিয়াপদ। 'আমি' বা 'আমরা' কর্তৃপদের সঙ্গে মিলিত হইয়া **'যাই'** বাক্য-গঠন করে। **'ই' √যা**-র সহিত যুক্ত হইয়া নূতন **শব্দ** নহে, **নূতন পদ** গঠন করিয়াছে। আর পদ-গঠনের ক্ষমতার জন্যই **'ই'** একটি বিভক্তি।

আবার **ধাতু**-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে—**√জিজ্ঞাস্‌=√জ্ঞা+সন্‌** ;—এখানে **'সন্‌'** একটি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া আর একটি নূতন ধাতুর উদ্ভব ঘটাইয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে—

যাহা ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ বা নূতন ধাতু গঠন করে তাহাকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে ; যথা—**'আ'** [√যা+আ=যাওয়া, √কর্‌+আ=করা] ; **'সন্‌'** [√জ্ঞা+সন্‌=√জিজ্ঞাস্‌, √পা+সন্‌=পিপাস্‌], ইত্যাদি।

যাহা ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে তাহাকে ধাতু-বিভক্তি বলে ; যথা—**'ই'** [√যা+ই=যাই, √কর্‌+ই=করি], **'এ'** [√কর্‌+এ=করে, √খেল্‌+এ=খেলে] ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—ধাতু-বিভক্তিকে কৃৎপ্রত্যয় বলা যায় ; কিন্তু কৃৎপ্রত্যয়-মাত্রই ধাতু-বিভক্তি নহে।

ধাতু চিনিবার সহজ উপায়—বর্তমান বাঙ্‌লায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের [তুই বা তোরা] **অনুজ্ঞা**-তে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তাহাতে বিভক্তি-**চিহ্ন** না থাকায়

তাহাতেই ধাতুর রূপটি ধরা পড়ে ; (তুই বা তোরা) **যা** [√যা] ; (তুই বা তোরা) **খা** [√খা] ; (তুই বা তোরা) **চল্‌** [√চল্‌] ; (তুই বা তোরা) **পড়্‌** [√পড্‌] ; (তুই বা তোরা) **দে** [√দে] ; ইত্যাদি।

কচিৎ সামান্য পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা—(তুই বা তোরা) **আয়** *(**আস্‌** স্থানে) [√আস্‌] ; (তুই বা তোরা) **শোন্‌** [**শুন্‌** স্থানে, √শুন্‌] ; (তুই বা তোরা) **ওঠ্‌** [**উঠ্‌** স্থানে, √উঠ্‌] ; (তুই বা তোরা) **বোঝ্‌** [**বুঝ্‌** স্থানে, √বুঝ্‌] ; তুই বা তোরা) **ওড়্‌** [**উড়্‌** স্থানে, √উড্‌] ; ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ধাতুর 'উ-কার গুণে '**ওকার**' হইয়াছে। ধাতু বুঝাইবার চিহ্ন—'√'।

*সংস্কৃত আ বিশ হইতে বাঙ্‌লা √আস্‌ এর উদ্ভব ; 'আয' এই অনুজ্ঞর রূপটির সহিতই সংস্কৃত 'অ-যা' ধাতুর সম্পর্ক অধিক।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু **দুই** প্রকার—(১) **সিদ্ধ** বা **মৌলিক** ধাতু এবং (২) **সাধিত** বা **যৌগিক** ধাতু।

(১) **যে সকল ধাতুর ব্যুৎপত্তিনির্ণয় সম্ভবপর নহে** অর্থাৎ **যাহাদিগকে প্রকৃতি-প্রত্যয়ে বিশ্লেষিত করা যায় না,** এক কথায় **যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ তাহাদিগকে মৌলিক** বা **সিদ্ধ ধাতু বলে** ; যথা—যা, **খা** , **চল্‌, বস্‌,দেখ্‌, শুন্‌,** ইত্যাদি।

মৌলিক বা **সিদ্ধ ধাতু**-কে আবার **চারি**ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) **তৎসম** ধাতু—যে সকল ধাতুর বাঙ্‌লা রূপ সংস্কৃত রূপের সমান অর্থাৎ বাঙ্‌লায় ও সংস্কৃতে একই রূপ তাহাদিগকে **তৎসম** ধাতু বলা যায় ; যেমন—**লিখ্‌, চর্‌, চল্‌, জ্বল্‌, ফল্‌, ঘট্‌, সহ্‌,** ইত্যাদি।

(খ) **তদ্ভব** ধাতু—তৎ অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে যে সকল ধাতুর উদ্ভব তাহাদিগকে **তদ্ভব** ধাতু বলিতে হয়। মূল সংস্কৃত ধাতুর সহিত ইহাদের পার্থক্য স্থলবিশেষে সামান্য মাত্র ; যথা—**পড়্‌** [সং 'পত্‌' ও 'পঠ্‌' হইতে], **মর্‌** [সং 'মৃ' হইতে], **কর্‌** [সং 'কৃ' হইতে], **যুঝ্‌** [সং 'যুধ্‌' হইতে], **বুঝ্‌** [সং 'বুধ' হইতে], **দেখ্‌** [সং 'দৃশ্‌' হইতে],

আন্‌ [সং 'আ-নী' হইতে], **উড়্‌** [সং 'উৎ-ডী' হইতে], **থাক্‌** [সং 'স্থা' হইতে] **উঠ্‌** [সং 'উৎ-স্থা' হইতে] ; ইত্যাদি।

(গ) **খাঁটি বাঙ্‌লা** ধাতু :যে সকল ধাতুকে বাঙ্‌লা অন্য কোনও ভাষা হইতে গ্রহণ করে নাই, তাহারাই বাঙ্‌লার স্বকীয় সম্পদ্‌ এবং **খাঁটি বাঙ্‌লা** ধাতু ; যথা—**ডুব্‌** ["ঐ গঙ্গায় **ডুবিয়াছে** :হায় ভারতের দিবাকর"—নজরুল] ; **হাঁক্‌** ["**হাঁকিছে** ভবিষ্যৎ"—নজরুল] ; **হাঁট্‌** ['আর কত **হাঁট্‌ব**, বাবা, এ ডাল-ভাঙ্গা ক্রোশ কি আর শেষ হবে না ?'] ; **ডাক্‌** ["এত ক'রে **ডাকি** শ্যামা"—রামপ্রসাদ] ; **টান্‌** ["**টান্‌** রে সবাই **টান্‌**"—রবীন্দ্রনাথ] ; **ঢুক্‌** ["কবি ভিতরে **ঢুকলেন** না"—কবিরত্ন] ; **খুঁজ্‌** ["**খুঁজে** তোরে হলাম সারা"—গান] ; ইত্যাদি।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক** ধাতু—**বাস্তব ধ্বনি দ্যোতনার জন্য উহার অনুকরণে গঠিত ধাতুকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে** ; যথা—**ঠুক্‌** ['লোকটা কপাল **ঠুক্‌ছে** কেন' ?] ; **ফুঁক্‌** ['ছেলেটা একটা তাল পাতার বাঁশী ফুঁকছে'] ; **হাঁচ্‌** ['আমি কি ইচ্ছে ক'রে হেঁচেছি ?'] ; **ফুঁস্‌** ["**ফুঁসিছে** গর্জিছে নিত্য"—রবীন্দ্রনাথ] ; ইত্যাদি।

[এই শ্রেণীর ধাতুগুলি ধ্বন্যাত্মক হইলেও প্রকৃতি-প্রত্যয়ে অবিভাজ্য বলিয়া উহারা সিদ্ধধাতু।]

(২) প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের যোজনাকে ব্যাকরণেব পরিভাষায় **'সাধন'** বলা হয়। সুতরাং **প্রকৃতির** [প্রাতিপদিকের ও ধাতুর] **সহিত প্রত্যয়ের যোগে যে সকল ধাতুর উদ্ভব** অথবা **যে সকল ধাতুকে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে বিশ্লেষিত করা যায় তাহাদিগকে সাধিত ধাতু বলে** ; যথা—**√দেখা** [√দেখ্‌+আ, 'মা ছেলেকে চাঁদ **দেখান**] ; **√জিজ্ঞাস্‌** [√জ্ঞা+সন্‌, "**জিজ্ঞাসি** তোমারে"] ; **√জাজ্বল্য** [√জ্বল্‌+যঙ্‌, 'আজিও তাঁহার স্মৃতি **জাজ্বল্যমান**] ; **√শন্‌শন্‌** [শন্‌শন্‌+আ (লুপ্ত), "বায়ু বহে শন্‌শনিয়া"] ; **√উত্তর্‌** [উত্তর+আ (লুপ্ত),"উত্তরিলা বিভীষণ"—মধুসূদন]।

সাধিত ধাতু প্রধানতঃ **চারিভাগে** বিভক্ত—(ক) **প্রযোজক** (ণিজন্ত), (খ) **সনন্ত**, (গ) **যঙন্ত** ও (ঘ) **নামধাতু** [ধ্বন্যাত্মক ধাতুও নামধাতু]।

(ক) **প্রযোজক ধাতু**—**'প্রবর্তন'** বা **'প্রেরণা'** বুঝাইতে **মৌলিক** বা **সিদ্ধ ধাতুর উত্তর 'আ'** প্রত্যয় যোগে যে **সকল ধাতুর উদ্ভব হয় তাহাদিগকে প্রযোজক ধাতু বলা হয়।**

[সংস্কৃতে এই উদ্দেশ্যে 'ণিচ্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় বলিয়া প্রযোজক ধাতুকে ণিজন্ত (ণিচ্ অন্তে যাহার) ধাতু বলে। প্রযোজক ধাতু গঠনে বাঙ্‌লা ও সংস্কৃতে প্রত্যয় স্বতন্ত্র হইলেও অর্থতঃ এক বলিয়া অনেকে প্রযোজক ধাতুকে 'ণিজন্ত' বলিয়া থাকেন, কিন্তু 'ণিজন্ত' নামটি অর্থগত নহে, উহা গঠনগত। সুতরাং বাঙ্‌লায় 'ণিজন্ত' না বলিয়া প্রযোজক ধাতুই বলা উচিত।]

যথা—√**দেখা** [√দেখ্+আ ; বইখানা **দেখাও**]; √**করা** [√কর্+আ, মজুর দিয়ে কাজ **করাচ্ছি**]; √**পড়া** [√পড়্+আ, শিক্ষক ছাত্রগণকে **পড়াইতেছেন**] ; √**নাচা** [√নাচ্+আ, "**নাচায়** পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে, **নাচাও** তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে"—নবীনচন্দ্র] ; √**খাওয়া** [√খা+আ, ব-শ্রুতিতে, 'এ রাবণের গোষ্ঠীকে **খাওয়াবে** কে?']; √**পাড়া** [√পাড়্+আ]; √**মারা** [√মার্+আ] ; ইত্যাদি।

(খ) **সনন্ত ধাতু—সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় যুক্ত হয় ; এইরূপ ধাতুকে** [সন্ অন্তে যাহার] **সনন্ত ধাতু বলে** ; যথা—√**জিজ্ঞাস্** [√জ্ঞা +সন্, "কিবা নাম, কোথা ধাম, জিজ্ঞাসি তোমারে"]; √**জিঘাংস্** [√হন্+সন্, জিঘাংসা=√জিঘাংস্+অ (ভাবার্থে)+আ (স্ত্রী)]; √**পিপাস্** [√পা+সন্, পিপাসু=√পিপাস্+উ (শীলার্থে)] ; ইত্যাদি।

[বাঙ্‌লায় ক্রিয়াপদ গঠনে 'সনন্ত' ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সনন্ত ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে গঠিত বহুশব্দ সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাই সনন্ত ধাতুর বিষয় জানিবার প্রয়োজন আছে।]

(গ) **যঙন্ত ধাতু—পৌনঃপুনিকতা ও আতিশয্য বুঝাইতে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় যুক্ত হয় ; এইরূপ ধাতুকে** [যঙ্ অন্তে যাহার] **যঙন্ত ধাতু বলে** ; যথা —√**রোরুদ্য** [√রুদ্+যঙ্, রোরুদ্যমান=√রোরুদ্য+শানচ্ (ঘটমান-অর্থে)], √**দেদীপ্য**=[√দীপ্+যঙ্, দেদীপ্যমান], √**জাজ্বল্য**=[√জ্বল্+যঙ্, জাজ্বল্যমান] ; ইত্যাদি।

['যঙন্ত ধাতু' হইতে জাত ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাঙ্‌লায় নাই, কিন্তু ঐ ধাতুর সহিত শানচ্ প্রত্যয় যোগে প্রস্তুত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধু বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হয়।]

(ঘ) **নামধাতু—বাঙ্‌লায় 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ' ও 'অব্যয়' শব্দের সহিত 'আ' প্রত্যয় যোগে যে সকল ধাতুর উদ্ভব হয় তাহাদিগকে নামধাতু বলে** ; যথা—√**আগলা** [আগল+আ, 'এগুলো ব'সে ব'সে কে **আগলাবে**?];

√ঘোলা [ঘোল+আ ; 'অনর্থক জল **ঘোলাও** কেন ?] ; √**দগ্ধা** [দগ্ধ+আ, ছেলের শোক তাকে দিন-রাত **দগ্ধাচ্ছে**] ; ইত্যাদি।

১। সংস্কৃতে √পাতি ণিজন্ত ধাতু হইলেও বাংলায় উহা হইতে জাত √পাড়্ সিদ্ধ ধাতু (তদ্ভব)। মালি ডাব 'পাড়ে' (মৌলিক) ; কিন্তু আমি মালিকে দিয়া ডাব 'পাড়াই' (প্রযোজক)। হিন্দীতে ১ম প্রেরণার্থক ও দ্বিতীয় প্রেরণার্থক—মৌলিক ধাতুর এই দুইটি সাধিত প্রযোজকরূপ আছে ; যথা—দেখ্‌না (মৌলিক)—দিখানা (১ম প্রেরণার্থক)—দিখ্‌লানা (২য় প্রেরণার্থক) : রাম দেখে (মৌলিক), শ্যাম রামকে দেখায় (দিখাতা—১ম প্রেরণার্থক), যদু শ্যামের দ্বারা রামকে দেখায় দিখ্‌লাতা (—২য় প্রেরণার্থক), বাঙ্‌লায় একপ পদ্ধতি নাই, সুতরাং একমাত্র √পড়্ ধাতুর ক্ষেত্রে এই রীতি গ্রহণের প্রযোজন নাই। √পড়্‌-√পাড়্‌-√পাড়া না করিয়া √পাড়্ সিদ্ধ তদ্ভব ধাতু—বলাই যুক্তিযুক্ত।

২। সংস্কৃত √মারি (ণিজন্ত) হইতে বাঙ্‌লা সিদ্ধধাতু √মার্ (তদ্ভব)। রাম শ্যামকে মারে (মৌলিক) ; কিন্তু যদু রামকে দিয়া শ্যামকে মারায় (প্রযোজক)।

নামধাতুকে আবার প্রধানতঃ **তিন** শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—(/০) **সপ্রত্যয়,** (৵০) **অপ্রত্যয়,** ও (৶০) **ধ্বন্যাত্মক**।

(/০) **সপ্রত্যয় নামধাতু**—'বিশেষ্য', 'বিশেষণ' ও 'অব্যয়'-এর সহিত **'আ'**-প্রত্যয়যোগে নামধাতুর উদ্ভবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। **যে সকল নাম ধাতুর সহিত ধাতু বিভক্তি যুক্ত হইলেও 'আ' প্রত্যয়টি বর্তমান থাকে তাহাদিগকে সপ্রত্যয় নামধাতু বলা যায়** ; যথা—**√জুতা** [জুতা+**আ** ; জুতাইব, জুতাইল, ইত্যাদি] ; √**আটকা** [আটক+আ ; আটকায়, আটকাও, আটকাইয়াছি, ইত্যাদি] ; **√আঁচড়া** [আঁচড+**আ** ; আঁচডায় আঁচডাইল, ইত্যাদি] ; **বিষা** [বিষ+**আ** ; "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু" রবীন্দ্রনাথ] ; ইত্যাদি।

(৵০) **অপ্রত্যয় নামধাতু—যে সকল নামধাতুর অন্ত্য 'আ'-প্রত্যয়ের চিহ্নটি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহাদিগকে অপ্রত্যয় নামধাতু বলে** ; যথা—√কম্ [কম+আ, কমে (কম্+এ], কমুক(√কম্+উক), ইত্যাদি ; কিন্তু **কমা** (√কম্+আ)—প্রযোজক ধাতু] ; √**পাক্** [পাক+আ, আম পাকে (√পাক্ +এ) ; কিন্তু √ **পাকা** (√পাক্+আ)—প্রযোজক ধাতু] ; **√মাত্** [মাত+আ, তোমরা মাতো (মাত্+ও), আমরা মাতি (√মাত্+ই), ইত্যাদি ; কিন্তু **√মাতা** (√মাত্+আ)—প্রযোজক ধাতু, 'সারা ভারত **মাতায়** গোরা'] ; ইত্যাদি।

(৵০) **ধ্বন্যাত্মক নামধাতু**—অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দে 'আ', 'ড়া', 'রা', 'লা' প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে যে সকল ধাতুর সৃষ্টি হয় তাহাদিগকে **ধ্বন্যাত্মক নামধাতু বলে**; যথা—√**কোঁপা** [ফোঁপ্‌+আ, 'খুকু **কোঁপাইতেছে** কেন ?']; √**হাঁফা** [হাঁফ্‌+আ, 'অত **হাঁফাচ্ছিস্‌** কেন ?']; √**চুম্‌ড়া** [চুম+ড়া]; √**হাম্‌লা** [হাম্‌+লা, **চুম্‌ড়াবে** কেন ? আ-দেখ্‌লের মতো **হাম্‌লাবে**]; √**কনকনা** [কন্‌কন্‌+আ, টক্‌ লাগলেই দাঁত **কনকনায়**]; √**ঝন্‌ঝনা** [ঝন্‌ঝন্‌+আ, 'বাসনগুলি **ঝন্‌ঝনাইয়া** উঠিল']; √**ঠুক্‌রা** বা **ঠোকুরা** [ঠুক্‌+রা বা ঠোক্‌+রা, 'কাঠ-ঠোক্‌রা কাঠ ঠুক্‌রায় বা ঠোক্‌রায়]; ইত্যাদি।

বাঙ্‌লার ধাতু-বৈচিত্র্য

১। বাঙ্‌লা কবিতায় বহু বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে প্রস্তুত নামধাতুর ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ঘটিয়াছে। মধুকবির কাব্যে এইরূপ ক্রিয়াপদের বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথও স্থানে স্থানে এই ধরণের নামধাতুর ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা—"**রোধিলা**" বিধি কর্ণপথ যার" ; "**মলিনিতে** মনের মিলনে" ; "**নিবাসে** দেবতা" ; "ইন্দ্রে **নিঃশঙ্কিলা**" ; "**শুকাইছে** ফুল এবে" ; "**কড়মড়ি** ভীমদন্ত" ; "সমর-তরঙ্গ **উথলিল**" ; "সিন্ধু যথা **দ্বন্দ্বি** বায়ুসহ" ; "**নাদিল** কম্বু" ; "**সাবাসি** দূত" ; "**বাহিরিল** রক্ষোরাজ" ; "**ঘর্ঘরিল** রথচক্র" ; "তুরঙ্গম **হ্রেষিল** উল্লাসে" ; ইত্যাদি—মধুসূদন। "রাত্রি **প্রভাতিল**" ; "**চাপিছে** দৃঢ়বলে" ; "**রাঙাইছে** আঁখি" ; "**ঝর্ঝরিয়া** ঝরিযা পড়ুক" ; "**বাহিরায়** ফল" ; "হিল্লোলিয়া দোলে"; ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথ।

২। '**স্থাপিলা** বিধুরে বিধি"—**স্থাপিলা** নামধাতুর ক্রিয়াপদ নহে ; উহা √**স্থাপি** [স্থা+ণিচ্‌]-জাত **অপ্রযোজক ক্রিয়াপদ**। '**রোষিল**'—**অপ্রত্যয় নামধাতুর** ক্রিয়াপদ, কিন্তু '**রুষিল**'—'**রুষ্‌**'-ধাতুজাত ক্রিয়াপদ। '**রোধিবে**'—**অপ্রত্যয় নামধাতুর** ক্রিয়াপদ, কিন্তু '**রুধিবে**'—**রুধ্‌**-ধাতুজাত ক্রিয়াপদ। '**প্রণমি**', '**উচ্চারিল**', '**প্লাবিয়াছে**', '**রঞ্জিয়াছ**', '**আমোদিল**', '**বিনোদিয়া**', '**প্রলোভিয়া**', প্রভৃতিকে **নামধাতুর ক্রিয়াপদ** বলা সঙ্গত **নহে**। উহাদিগকে যথাক্রমে 'প্র-নম্‌

'উৎ-চারি [√চর্‌+ণিচ্‌]', 'রঞ্জ্‌', 'আ-মোদি [√মুদ্‌+ণিচ্‌]', 'বি-নোদি [√নুদ্‌+ণিচ্‌]', 'প্লাবি [√প্লু+ণিচ্‌]', 'প্র-লোভি [√লুভ্‌+ণিচ্‌]', প্রভৃতি **তৎসম ধাতুজাত বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদ** বলিতে হয়।

৩। "কতকগুলি 'আ'-প্রত্যয়ান্ত ধাতু আছে, সেগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত ; যেমন—'গজা' (গজায়) ; 'গুটা' (গুটায়) ; 'গুঁড়া' (গুঁড়ায়) ; 'জিরা' (জিরায়) ; 'জুড়া' (জুড়ায়) ; 'বিলা' (বিলায়) ; 'লেলা' ('কুকুর লেলাইয়া দিল') ; ইত্যাদি"—অধ্যাপক সুনীতিকুমার।

কিন্তু উদাহৃত সব ধাতুর উৎপত্তি অজ্ঞাত নহে। বীজ হইতে উদ্‌গত **অঙ্কুর**-কে পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে **'গজ'** বলে ; বিশেষ্য **'গজ'** হইতে **সপ্রত্যয় নামধাতু 'গজা** [গজ+আ]'-র উৎপত্তি। তন্ত্রে বিবিধ মণ্ডল অঙ্কণের জন্য পঞ্চবর্ণ **গুণ্ডিকা**-র ব্যবস্থা আছে ; এই **'গুণ্ডিকা'** হইতে বাঙ্‌লা 'গুঁড়ি'-শব্দের উদ্ভব ; 'গুঁড়ি' হইতে **সপ্রত্যয় নামধাতু ' গুঁড়া** [গুঁড়ি+আ]'-র উৎপত্তি। সংস্কৃত বি-তৃ—বিত্‌রি (উচ্চারণে)—বিত্‌লি (র-লয়োরভেদত্বাৎ)—বিল্‌লি (অন্তঃসন্ধিতে)—**বিলি** (উচ্চারণ-দোষে), এই **'বিলি'** হইতে **সপ্রত্যয় নামধাতু 'বিলা** [বিলি+আ]'-র উৎপত্তি। পূর্ববঙ্গে অদ্যাপি কাহারও পশ্চাৎদ্ধাবনের জন্য কুকুরকে 'লে—লে—লে' বা 'ছোঃ—লে—লে' ধ্বনিদ্বারা প্ররোচিত করা হয়। এই **ধ্বন্যাত্মক** শব্দ **'লে-লে'** হইতে **সপ্রত্যয় নামধাতু 'লেলা** [লে-লে+আ]'-র উৎপত্তি। 'গুটি [√গু+টিক্‌]' হইতে **'গুটা'** এবং 'যুক্ত করা'-অর্থে **'যুক্ত'**-শব্দজ **'জুড়'** ও 'শীতল করা'-অর্থে **'জড়'**-শব্দজ 'জুড়' হইতে **'জুড়া'**-র উৎপত্তি। সম্ভবতঃ, আরবী **'জিরিয়ান'** শব্দ হইতে বাঙ্‌লা **'জিরান'** শব্দ এবং **'জিরা'**-ধাতুর উৎপত্তি হইযাছে।

৩। অধ্যাপক সুনীতিকুমার-প্রমুখ বৈযাকরণগণ **সংযোগ-মূলক ধাতু** নামে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে ধাতুর এক নূতন প্রকার (kind) প্রদর্শন করিয়াছেন।

" 'কর্‌, হ, দে, পা' প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর সহিত নানা বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিযা, বাঙ্‌লাতে 'সংযোগ মূলক ধাতু' গঠিত হয, ... 'পুছ্‌' ও 'শুধা', উভয় স্থলে, সংযোগমূলক 'জিজ্ঞাসা-করা' (চলিত ভাষাতে 'জিগ্‌গেস-করা') আজ-কাল সমধিক প্রচলিত, 'কর্‌'-ধাতুর সহিত বিশেষ্য-শব্দ 'জিজ্ঞাসা সংযুক্ত করিযা এই ধাতু গঠিত হইযাছে। এইরূপ ধাতুকে বলা হয় 'সংযোগ-মূলক ধাতু' ।]"

এখন প্রশ্ন হইল—'জিজ্ঞাসা'-র **সংযোগ** ['সম্‌' অর্থাৎ সম্যক্‌ যোগ] কি 'কর্‌'-ধাতুর সঙ্গে না 'করি, কর, করে' প্রভৃতি **ক্রিয়াপদের** সঙ্গে ? ইহার সুনিশ্চিত উত্তর—ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য **'জিজ্ঞাসা'**-র **সম্যক্‌** যোগ বাক্যে প্রযুক্ত **'কর্‌'-ধাতুজাত ক্রিয়াপদের** সঙ্গে। 'জিজ্ঞাসা'-র মধ্যেও একটি ধাতু রহিয়াছে—'জ্ঞা'-ধাতু ; এই √জ্ঞা-র সহিত 'সন্‌' ও 'অ' দুইটি কৃৎপ্রত্যযের এবং 'আ' স্ত্রী-প্রত্যয়ের **সংযোগ** ঘটিয়াছে ; ফলে 'জিজ্ঞাসা'—ভাববাচক বিশেষ্যের উৎপত্তি। ইহার পরে আবার 'কর্‌'-ধাতুর সঙ্গে **সংযোগ** এবং শব্দ-ধাতু-সংযোগে 'সংযোগ-মূলক ধাতু'র উদ্‌ভব। **'জিজ্ঞাসা কর্‌'** কি অবিভাজ্য ক্রিয়ামূল ? **অবিভাজ্য নহে**—তাহা এইমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। **কাজেই, 'সংযোগ-মূলক ধাতু' বলিয়া কোনও ধাতু হইতে পারে না। 'জিজ্ঞাসা করি', 'দান করি', 'শ্রবণ করি'** প্রভৃতি **সংযোগ-মূলক** বা **যৌগিক ক্রিয়াপদের** উদাহরণ।

বিশেষণের সহিত 'হ্‌'-ধাতু-যোগে সংযোগ-মূলক ধাতু বলিয়া যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে **'সংযোগ'** দূরের কথা, **যোগসূত্রই** খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। **'সমর্থ-হ্‌', 'একমত-হ্‌', 'রাজী-হ্‌'** ইত্যাদি যে কখন ও কিভাবে ধাতুতে পরিণত হইল বলা যায় না। ইংরেজী 'Verb 'to be' এবং সংস্কৃত √অস্‌ বা √ভূ ধাতুর যে কাজ, হিন্দী **'হো'** এবং বাঙ্‌লা **'হ্‌'** ধাতুর দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। ইংরেজীতে 'to be' অবস্থা বুঝাইতে Intransitive Verb of Incomplete Predication [অসম্পূর্ণার্থক অকর্মক ধাতু], সুতরাং বাক্যার্থ-পূর্তির জন্য উহার পরে একটি Noun [বিশেষ্য] বা Noun equivalent [বিশেষ্য-স্থানীয় পদ]-এর ব্যবহার আবশ্যক। অর্থপূর্তির জন্য প্রযুক্ত পদটিকে Subjective Complement বলা হয। সংস্কৃতে সমার্থক √অস্‌ বা √ভূ-এর পরে ব্যবহৃত এইরূপ পদ বিধেয়াংশে থাকিয়া উদ্দেশ্যকে বিশেষিত করে বলিয়া ইহাকে **বিধেয়-বিশেষণ** বলে। বাঙ্‌লাতেও **অবস্থা-বোধক, অসম্পূর্ণার্থক ও অকর্মক** 'হ্‌'-ধাতু-জাত ক্রিয়াপদের **অর্থপূর্তির জন্য প্রযুক্ত বিশেষ্য** বা **বিশেষণ** বা **তৎস্থানীয় বাক্যাংশ** (phrase)-কে **বিধেয় বিশেষণ** বা **কর্তৃসম্বন্ধী অনুপূরক** বলিতে হইবে। বাঙ্‌লায় বর্তমানকালে বিহিত অবস্থা-বোধক **'হ্‌'**-ধাতুর ক্রিয়াপদ প্রায়শঃ উহ্য থাকে ; যথা—তাহারা ইহা করিতে **সমর্থ** ['হয়' উহ্য] ; আমরা এই বিষয়ে **একমত** ['হই' উহ্য] ; সে আমার কথায় **রাজী**

'হয়' উহ্য] ; ইত্যাদি। উল্লেখিত বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত **'সমর্থ', 'একমত'** ও **'রাজী'** সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে) **বিধেয় বিশেষণ** বা (ইংরেজী ব্যাকরণ অনুসারে) **কর্তৃসম্বন্ধী অনুপূরক**। 'সত্তা' বা 'অবস্থা' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত **'হ্'**-ধাতুর সহিত **কর্তৃসম্বন্ধী অনুপূরক** মিলাইয়া **ধাতু**-গঠনের প্রয়াস অভিনব সন্দেহ নাই। ইহার পরে হয়ত দেখিতে বা শুনিতে পাইব—**'ভাল-ছেলে-হ্', 'প্রধান-মন্ত্রী-হ্', 'স্বাধীন-ভারতের-রাষ্ট্রপতি-হ্'** প্রভৃতি 'সংযোগ-মূলক ধাতু'। ব্যাকরণ এ ব্যবস্থা মানিতে পারে না।

'দে'-ধাতু-যোগে—'উত্তর-দে', 'শাস্তি-দে', ইত্যাদি 'পা'-ধাতু যোগে—'লজ্জা-পা', যন্ত্রণা-পা' ইত্যাদিও সংযোগ-মূলক ধাতু হইতে পারে না। 'উত্তর দেওয়া' না বলিয়া যদি উত্তর দান করা' বলা হয়, তখন কি 'উত্তর-দান-কর্' ধাতু হইবে ? কেহ হয়ত বলিবেন —'ক্ষতি কী ?' কিন্তু কথা হইল—যদি কর্মকে ক্রিয়ামূলের সহিত জুড়িয়া দিয়া ধাতু দেখাইতে হয় তাহা হইলে অন্য কারকগুলিই বা বাদ যায় কেন ? **'মাত্র তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও'**—বাক্যে ক্রিয়াপদ কোন্‌টি ? **'দাও'** না **'উত্তর দাও'** ? 'উত্তর-দে' ধাতু হইলে 'উত্তর-দাও' ক্রিয়াপদ হইবে। তাহা হইলে **'মাত্র তিনটি প্রশ্নের'**—অংশের সহিত ক্রিয়াপদের **সম্বন্ধ**টা কী হইবে ? বিচারের কী প্রয়োজন ? 'মাত্র-তিনটি-প্রশ্নের-উত্তর-দে' ধাতু ধরিলে ক্ষতি কী ? চমৎকার ব্যবস্থা !

আবার **'উত্তর'**—এই বিশেষ্য পদটির উপর আরও কয়েকটি ধাতুর লোভ দেখা যায়। √লিখ্, √বল্, √কর্ প্রভৃতি ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়াপদও **উত্তর**-কে লইয়া চলিতে চাহে। **'উত্তর লিখ', 'উত্তর কর', 'উত্তর বল'**—এই ধরণের প্রয়োগও বহুল পরিমাণে দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রেও 'উত্তর-লিখ্', 'উত্তর-কর্', 'উত্তর-বল্' ধাতু বলিতে হয়। এইরূপ ধাতু-ব্যবস্থা হইলে 'ধাতু'-নামক পারিভাষিক সংজ্ঞাটিকে তুলিয়া দিবার বন্দোবস্ত করাই উচিত। ইংরেজীতে 'to answer' যেমন Verb, তেমনই 'Answer' Noun ও রহিয়াছে 'to give **an answer**', 'to write down **an answer**' প্রভৃতি ক্ষেত্রে **'an answer'** transitive Verb to give', 'to write down' প্রভৃতির **object** (কর্ম) বলিয়া বিবেচিত হয়। সংস্কৃতে **'উত্তরো' দীয়তাম্, 'উত্তরো' লিখ্যতাম্** প্রভৃতি বাক্যে **'উত্তরঃ'** কর্ম [উক্তে কর্মণি প্রথমা]। বাঙ্‌লার সহোদরা-স্থানীয়া হিন্দীতে **'উত্তর্ দো'** বা **'জওয়াব্ দো'** প্রভৃতি ক্ষেত্রে

'উত্তর' বা '**জওআব্‌**' **কর্ম**কারক। বাঙ্‌লাতেও **নববিধি-র** প্রযোজন নাই। **√দে, √কর্‌, √লিখ্‌, √বল্‌ প্রভৃতি ধাতুজ সকর্মক ক্রিয়ার কর্মরূপেই বিশেষ্য 'উত্তর' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।**

বাঙ্‌লায **পা**-ধাতু **অনুভূতি**-অর্থেও ব্যবহৃত হয; যথা—'লজ্জা' **পাওয়া** [অনুভব করা]; 'দুঃখ' **পাওয়া**; 'আনন্দ' **পাওয়া**; 'যন্ত্রণা' **পাওয়া**; ইত্যাদি। এখানেও 'লজ্জা', 'দুঃখ', 'আনন্দ', 'যন্ত্রণা' প্রভৃতি **√পা-জাত সকর্মক ক্রিয়াপদের কর্ম**।

সিদ্ধান্ত—'সংযোগ-মূলক' ধাতু বলিয়া কোন ধাতু হইতে পারে না। ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যে নিহিত ধাত্বর্থ বা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝাইবার জন্য √কর্‌ প্রভৃতি ধাতুজাত ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং উভয়ে মিলিয়া 'সংযোগ-মূলক' বা 'যৌগিক' ক্রিয়াপদ রচনা করে।

ক্রিয়ার পুরুষ

১। **পুরুষ**-প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পুরুষ তিনপ্রকার—**উত্তম** পুরুষ, **মধ্যম** পুরুষ ও **প্রথম** পুরুষ বা **নাম** পুরুষ। **পুরুষ**-অনুসারে **ক্রিয়াপদের রূপান্তর** ঘটে। **উক্ত কর্তা** ও **উক্ত কর্ম**কেই ক্রিয়াপদ অনুসরণ করে। সুতরাং ক্রিয়াপদের রূপান্তর **উক্ত কর্তা** ও **উক্ত কর্মে**-র উপর নির্ভরশীল; যথা—(ক) 'আমি' **পড়ি**; 'তুমি' **পড়ো**; 'সে' **পড়ে**; (খ) 'আমরা' উহাদের **দ্বারা** প্রবঞ্চিত **হইয়াছি**; 'তোমরা' উহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত **হইয়াছ**; 'রাম' উহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত **হইয়াছে**; ইত্যাদি। (ক)-তে **উক্ত কর্তা** এবং (খ)-তে **উক্ত কর্মে**-র **পুরুষ** অনুসারে ক্রিয়াপদে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিযাছে, অতএব বলা যায় যে—**উক্ত কর্তা ও উক্ত-কর্মের পুরুষদ্বারা ক্রিয়ার পুরুষ বিবেচিত হয়।**

২। **উক্ত কর্তা** ও **উক্ত কর্ম** উহ্য থাকিলেও ক্রিযাপদ দেখিয়া উহাদের **পুরুষ** নির্ণাত হইতে পারে।

(ক) **'পড়ি', 'খাই', 'দেখিলাম'**—কর্তা 'আমি' বা 'আমরা'; অতএব উহারা **উত্তম পুরুষের** ক্রিয়াপদ।

(খ) **'পড়ো, 'খাও', 'দেখিলে'**—কর্তা তুমি' বা 'তোমরা'; অতএব উহার **মধ্যম পুরুষের** ক্রিয়াপদ।

(গ) **'পড়ে', 'খায়', 'দেখিল'**—কর্তা 'সে' বা 'তাহারা' [অর্থাৎ আমি-আমরা-তুমি-তোমরা ছাড়া যে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা]; অতএব উহারা **প্রথম পুরুষের** বা **নাম পুরুষের** ক্রিয়াপদ।

৩। পুরুষভেদেই ক্রিয়ার রূপভেদ হয়; বচনভেদে নহে। উত্তম পুরুষ একবচন ও বহুবচনে একই ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়; যথা—'আমি' **যাই'**, 'আমরা' **যাই**; 'আমি' **দেখিলাম**, 'আমরা, **দেখিলাম**, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ ও **প্রথম** পুরুষের ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসৃত হইবে; যথা—'তুমি' বা 'তোমরা' **যাও**; 'সে' বা 'তাহারা' **যায়**; ইত্যাদি।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

সকর্মক (দ্বিকর্মক) ও অকর্মক ক্রিয়া

প্রয়োগ-বিচারে ক্রিয়া ['ধাতু', 'ক্রিয়া' ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 'ক্রিয়া'ও 'ক্রিয়াপদের' অর্থপার্থক্য থাকিলেও সাধারণভাবে 'ক্রিয়াপদ' অর্থেই 'ক্রিয়া'-কথাটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে] **দ্বিবিধঃ—(ক) সকর্মক** ও (খ) **অকর্মক**।

(ক) বিবিধ কর্মের বিষয় কর্মকারক-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। **যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া বলা হয়**; যথা—'কী' **বলিতেছ**? সে 'ছবি' **দেখে**; 'তোমার 'ভাত' **খাওয়া** হ'ল? 'কাকে' 'কী' **বলছি**? খুব এক 'ঘুম' **ঘুমাইলাম**; ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়ার 'কর্ম' থাকিতেই হইবে। **ক্রিয়ার** নিকট **'কী?'** বা **'কাহাকে?'** প্রশ্ন করিলে **যে উত্তর** পাওয়া যাইবে তাহাই **কর্ম**। যদি ঐ **দুই** প্রশ্নের উত্তরে **দুইটি পদ** পাওয়া যায় তবে **দুইটি-ই কর্ম** হইবে। এইরূপ দুইটি-কর্মযুক্ত ক্রিয়ার নাম **দ্বিকর্মক**। **যে সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাহাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে**; যথা—আমি 'তাহাকে' এই 'কথা' **বলিয়াছি**। 'কী' **'বলিয়াছি'**?

—'কথা'; 'কাহাকে' **বলিয়াছি**?—'তাহাকে'; অতএব **'বলিয়াছি' দ্বিকর্মক ক্রিয়া**। আরও উদাহরণ—'আর এক 'প্রশ্ন' আমি **শুধাব** 'তোমায়'; "হেথা মৈলে কিবা হয়' 'ব্যাসে' **জিজ্ঞাসিল**"; 'তাহাকে' 'পত্র' **লিখিয়াছ** কি? বাঙ্‌লায় **দ্বিকর্মক ক্রিয়ার** সংখ্যা খুবই কম।

(খ) **যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে**; যথা—কে **আসে**? ছেলেরা **ঘুমাইতেছে**; আমরা চক্ষুদ্বারা **দেখি**; ইত্যাদি।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে **প্রয়োগ**-বিবেচনায় ক্রিয়া **সকর্মক** বা **অকর্মক** স্থিরীকৃত হইবে। **সকর্মক ক্রিয়ার** উদাহরণে 'ঘুম' কর্ম রহিয়াছে বলিয়া **'ঘুমাইলাম' সকর্মক**; কিন্তু **অকর্মক ক্রিয়ার** উদাহরণে **'ঘুমাইতেছে' অকর্মক**। আবার "সে 'ছবি' **দেখে**"—বাক্যে **'দেখে' সকর্মক**; কিন্তু "আমরা চক্ষুদ্বারা **দেখি**" —বাক্যে **'দেখি' অকর্মক**। **কর্ম থাকা**-ও **না-থাকা**-র উপর ক্রিয়ার **সকর্মকত্ব** ও **অকর্মকত্ব** নির্ভর করে; সুতরাং **'সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক প্রয়োগ'** বা **'অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক প্রয়োগ'**—এইরূপ বলা **উচিত নহে**।

প্রযোজক ক্রিয়া

১। **ধাতু** প্রসঙ্গে **প্রযোজক ধাতু**-র কথা বলা হইয়াছে। এই **প্রযোজক ধাতু**-নিষ্পন্ন ক্রিয়া **প্রযোজক ক্রিয়া** অর্থাৎ **একজনের প্রেরণা, প্রবর্তনা বা প্রযোজনায় অপর একজনের দ্বারা যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে**; যথা—'মা' 'শিশুকে' চাঁদ **দেখান**। **'দেখে'** 'শিশু'; কিন্তু 'মা'-এর **প্রেরণায়**। 'মা'—**প্রযোজক কর্তা** এবং শিশু—**প্রযোজ্য কর্তা**। যিনি কাহাকেও কোনও কার্যে প্রেরিত, প্রবর্তিত বা প্রযোজিত করেন, তিনি **প্রযোজক কর্তা**; আর কাহারও দ্বারা কোনও কার্যে যিনি প্রেরিত, প্রবর্তিত বা প্রযোজিত হন, তিনি **প্রযোজ্য কর্তা** [কর্তার প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য]। আরও কয়েকটি উদাহরণ—"জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধুপানে যায়, **ফিরাব** কেমনে"—মধুসূদন; [প্রযোজক কর্তা—'আমি' এবং **প্রযোজ্য** কর্তা 'তাহাকে' উহ্য]। "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে **বাড়ায়** মাত্র আঁধার"—

মধুসূদন ; [প্রযোজক—'ক্ষণপ্রভা' এবং প্রযোজ্য—'আঁধার']। "চাষি ক্ষেতে **চালাইছে** হাল'—রবীন্দ্রনাথ ; [প্রযোজক—'চাষি,' প্রযোজ্য—'হাল']। "পা **পোড়ায়** খরতর রবির কিরণ"—মুকুন্দরাম ; [প্রযোজক—'কিরণ' এবং প্রযোজ্য—'পা']। "**ঘুচাইব** অমরের সমরের সাধ"—হেমচন্দ্র ; [প্রযোজক—'আমি' উহ্য, প্রযোজ্য—'সাধ']। "এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন **মিলায়** আনি"—সত্যেন্দ্রনাথ ; [প্রযোজক—'বারাণসী' এবং প্রযোজ্য—'স্বপন']। "আপনাকে কর **দেখাইবার** জন্য আসিযাছে" —বঙ্কিমচন্দ্র ; [প্রযোজক—'সে' উহ্য এবং প্রযোজ্য—'আপনি']। "সে হাতমুখ **নাড়িয়া জানাইল**"—শরৎচন্দ্র ; [**'নাড়িয়া'**-র ক্ষেত্রে প্রযোজক—'সে', প্রযোজ্য —'হাতমুখ' এবং **'জানাইল'**-র ক্ষেত্রে প্রযোজক—'সে', প্রযোজ্য—'উপস্থিত সকলকে' উহ্য]।

২। **প্রযোজক** কর্তা **প্রযোজ্য** কর্তাকে কার্যে প্রবর্তিত করেন। কিন্তু কখনও কখনও **তৃতীয় ব্যক্তির** নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া **দ্বিতীয় ব্যক্তি** অর্থাৎ, পূর্বোক্ত **প্রযোজক** কর্তা **প্রথম ব্যক্তিকে** বা **প্রযোজ্য** কর্তাকে কার্যে প্রযোজিত করিতে পারেন ; যেমন—

(ক) **ছেলে** পড়িতেছে।

(খ) **গৃহশিক্ষক** 'ছেলেকে' পড়াইতেছেন।

(গ) **তিনি** 'গৃহশিক্ষকের দ্বারা' **ছেলেকে** পড়াইতেছেন।

(ক) —বাক্যে **ছেলে** 'পড়িতেছে'-ক্রিয়ার কর্তা। (খ) —বাক্যে **প্রযোজক কর্তা** 'গৃহশিক্ষক' **প্রযোজ্য কর্তা** 'ছেলেকে' **পড়া**-র কাজে প্রযোজিত করিতেছেন। (গ) —বাক্যে পূর্বের **প্রযোজক কর্তা**-'গৃহশিক্ষক'কে তাঁহার প্রযোজনা কার্যে পরিচালিত বা প্রবর্তিত করিতেছেন—**'তিনি'** ; অতএব **তিনি**-ও **প্রযোজক কর্তা** ; কিন্তু **দ্বিতীয় প্রযোজক**। অনুরূপ—**গ্রামবাসীরা** 'শিকারীকে দিযা' **বাঘটাকে** মারিল। 'মারিল' **বাঘ, বাঘ**—প্রকৃত কর্তা ; কিন্তু 'শিকারীর দ্বারা' মরা-কার্যে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া 'শিকারী' **প্রথম প্রযোজক** কর্তা ; আর **গ্রামবাসীরা** 'শিকারী'কে **'বাঘ'**-এর মরণ-কার্যে প্রবৃত্তির ব্যাপারে প্রযোজিত করিয়াছে বলিয়া **দ্বিতীয় প্রযোজক কর্তা** হইল।

৩। **কারক-বিভক্তি** প্রকরণে **প্রযোজ্য** কর্তা ও **প্রযোজক** কর্তার বিভক্তির

কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রযোজক ক্রিয়ার প্রসঙ্গেও উহাদের কথা না বলিলেই নয়। নিম্নের সূত্রকয়টি লক্ষণীয় :

(ক) কর্তৃবাচ্যে প্রযোজক কর্তায় প্রথমা এবং *প্রযোজ্য কর্তায় সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—নন্দিতা [প্রযোজক কর্তায় প্রথমা] সুস্মিতাকে [প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া] অঙ্ক কষাইতেছে [প্রযোজক ক্রিয়া]।

(খ) কখনও কখনও *প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা—নন্দিতা সুস্মিতাকে দিয়া অঙ্ক 'কষাইতেছে'। গিন্নী ঝিকে দিয়ে বাসন 'মাজাচ্ছেন'।

(গ) যেখানে প্রযোজক এবং প্রযোজকের প্রযোজক থাকিবে, সেখানে প্রথম প্রযোজকে তৃতীয়া, দ্বিতীয় প্রযোজকে অর্থাৎ প্রযোজকের প্রযোজকে প্রথমা এবং প্রযোজ্যে দ্বিতীয়া হইবে। যথা—মা [২য় প্রযোজকে ১মা] নন্দিতাকে দিয়া [১ম প্রযোজকে ৩য়া] সুস্মিতাকে [প্রযোজ্যে দ্বিতীয়া] অঙ্ক কষাইতেছেন [প্রযোজক ক্রিয়া]।

---

* সংস্কৃত-ব্যাকরণের 'গমনাহারাদি'-ধাতুর 'অণিজন্তেষু যঃ কর্তা স্যাণ্ণিজন্তেষু কর্ম তৎ' বিধি বাঙ্‌লাতেও আছে। সুনীতিকুমারপ্রমুখ বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন—'ক্রিয়ার অ-প্রযোজক (বা অ-ণিজন্ত) অবস্থাতে কোনও কর্ম না থাকিলেও প্রয়োজক (বা ণিজন্ত)-রূপে তাহার কর্ম থাকিতে পারে। যেমন—'মা খোকাকে হাসান'—এখানে খোকাকে 'কর্ম' (সংস্কৃত-মতে 'প্রযোজ্য কর্তা')। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মতে যাহা 'প্রযোজ্য কর্তা', ইংরেজী-মতে তাহাকে 'কর্ম' বলিবার কোনও সার্থকতা আছে কি? ইংরেজী Causative Verbs-প্রভৃতির সাধারণ নিয়ম—প্রধান Verbরূপে 'to make'-এর ব্যবহার করিয়া মূল Verbটিকে Infinitive করিতে হয়। যেমন—He sings. I make him (to) sing. 'sing'-verb-এর কর্তা 'make' verb-এর কর্ম হইয়া গিয়াছে; 'to sing' বিশেষণ হইয়া কর্মসম্বন্ধী অনুপূরকরূপে (Objective Complement) ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে স্বতন্ত্র Causative Verb-form আছে, যেমন—'rise'—raise', 'sit—set', সেখানে 'raise', 'set' প্রভৃতি স্বতন্ত্র Transitive Verbs-রূপে গৃহীত। বাঙ্‌লাতে অন্যের প্রেরণায় ক্রিয়াসম্পাদন করিলেও সম্পাদকের কর্তৃত্ব লুপ্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতে যেখানে অন্য কারকের কর্মসংজ্ঞা-প্রাপ্তি বিহিত হইয়াছে, সেখানেও অন্য কারকটি কর্মকারক আখ্যা পাইবে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রের মর্মার্থ নহে। "সম্যক্ জ্ঞায়তে অনয়েতি সংজ্ঞা।" সুতরাং 'কর্মসংজ্ঞা'র অর্থ হইল 'কর্ম সম্যক্ জ্ঞায়তে যয়া সা, 'দ্বিতীয়া বিভক্তিরিতি'। অতএব 'প্রযোজ্য কর্তার 'কর্মসংজ্ঞাপ্রাপ্তি' দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে।

প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়ার ক্ষেত্রেও সুনীতিবাবু বলিয়াছেন—'ক্রিয়া-অনুষ্ঠাতা যদি প্রযোজক কর্তার কার্য-সিদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ হয় (অর্থাৎ প্রযোজক কর্তা যদি তাহাকে দিয়া নিজের স্বার্থে কার্যটি করাইয়া লয়—এইরূপ বুঝায়), তাহা হইলে সেইরূপ ক্রিয়া-অনুষ্ঠাতা প্রযোজক ক্রিয়ার করণরূপে পরিণত হয়। যেমন—'আমি ঝিকে দিয়া (করণ) ঘর ধুয়াইব' ইত্যাদি।"

ক্রিয়া-অনুষ্ঠাতা কিরূপে সেই ক্রিয়ার করণে পরিণত হয়, দুর্বোধ্য নহে, তাহা অবোধ্য। ক্রিয়া-অনুষ্ঠাতা নিশ্চিতরূপে কর্তা; কিন্তু অপরের দ্বারা প্রযোজিত হয় বলিয়া সে প্রযোজ্য কর্তা। সুতরাং 'ঝিকে দিয়া' 'করণ' নহে, 'প্রযোজ্য কর্তা'য় তৃতীয়া।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

(ক) রাম বাড়ী যায়। (খ) রাম বাড়ী গিয়া ......।

উপরিলিখিত (ক) এবং (খ) লক্ষ্য করিলে অনুভূত হইবে যে, যায় ক্রিয়াপদটি দ্বারা বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গিয়া পদটি বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটাইতে পারে নাই। ফলতঃ (ক) একটি বাক্য; কিন্তু (খ) বাক্য নহে। অনুরূপ—আমি লোকটিকে দেখিয়া—বাক্য নহে; কিন্তু 'আমি লোকটিকে দেখিয়াছিলাম, একটি সার্থক বাক্য। অতএব 'যায়' ও 'দেখিয়াছিলাম' সমাপিকা ক্রিয়া এবং 'গিয়া' ও 'দেখিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া। অতএব বলা যায়—

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যার্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। আর—

যে পদে ক্রিয়া বুঝাইলেও তাহা দ্বারা বাক্যার্থ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। বাক্যার্থ-পূর্তির জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া একটি সমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। আরও কয়েকটি উদাহরণ—

"আশার ছলনে 'ভুলি' কি ফল লভিনু, হায়!
"যেথায় মাটি 'ভেঙে' ক'রছে চাষা চাষ;"
"আমার অধিকারে সীমা 'দিতে' চাও?"
"মৃতপতিদেহ 'আবরি' বেহুলা চলে—"
'ভুলিলে' বিপদ্ হবে।"

উপরে লিখিত বাক্যগুলিতে উদ্ধরণ-চিহ্নের অন্তর্গত পদগুলি **অসমাপিকা** ক্রিয়া এবং স্থূলাক্ষর পদগুলি **সমাপিকা** ক্রিয়ার উদাহরণ। ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সহিত **ইয়া, ইলে** ও **ইতে** যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়াপদ কিনা, তাহা সবিশেষ বিবেচ্য। '—ইয়া', '—ইতে' এবং '—ইলে'—কৃৎপ্রত্যয় ; সুতরাং 'করিয়া', 'খাইতে', 'আসিলে' প্রভৃতি কৃদন্ত পদ। ইংরেজীতে Verb, adjective বা participle এবং Verb-noun বা gerund এই প্রকার double parts of speech-এর ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু বাংলায় সেরূপ পদদ্বৈত বিহিত হয় নাই বলিয়া '—ইয়া', '—ইতে' এবং '—ইলে'-প্রত্যয়ান্ত পদকে অসমাপিকা ক্রিয়া না বলিলে পদ-পরিচয়ে যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ঘটে। (ক) 'খাইয়া' ফেল (খ) 'খাইয়া' ঘুমাও—বাক্য দুইটিতে '—ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত 'খাইয়া' সমার্থক নহে। (ক)-বাক্যের 'খাইয়া' সমগ্র ক্রিয়াপদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'খাইয়া ফেল' যৌগিক ক্রিয়া , ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'eat up'। ইংরেজীতে group-verb হইলেও কর্মপদটি (object) 'eat'-এর পরে বসে। যেমন eat **it** up, কিন্তু বাংলায় তাহা চলে না। অপর পক্ষে (খ)-বাক্যে 'খাইয়া' বাক্যার্থ সমাপ্ত না করিলেও উহা দ্বারা একটি ক্রিয়ার সমাপ্তি বুঝায়। 'খাইয়া' ঘুমাও—'খাওয়া শেষ করিয়া' ঘুমাও। সংস্কৃতে এইরূপ ক্ষেত্রে 'ক্ত্বাচ্‌' বা 'ল্যপ্‌'-প্রত্যয়যোগে গঠিত কৃদন্ত পদ অব্যয়-পদবাচ্য ; আর ইংরেজীতে 'after eating' এইরূপ Verb-noun দ্বারা কাজ চলে।

আমি তাহাকে **যাইতে** দেখিলাম—I saw him (to) go—অহং তং গচ্ছন্তম্‌ অপশ্যম্‌। 'যাইতে'-এর স্থলে ইংরেজীতে ব্যবহৃত 'to go' Gerundial Infinitive এবং adjective-রূপে ব্যবহৃত, সংস্কৃতের গচ্ছন্তম্‌ কর্ম 'তম্‌'-এর কৃদন্ত-বিশেষণ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ইংরেজী ও সংস্কৃত-ব্যাকরণে যাহা বিশেষণ নয়, তাহার বাংলা প্রতিশব্দকে বাংলায় বিশেষণ বলিব। **যাইতে** কর্মপদ 'তাহাকে'-র বিশেষণ নয় কি ? তাহা হইলে আমি যাইতে চাই—I want **to go**—অহং গন্তুম্‌ ইচ্ছামি—এখানে কি হইবে ? ইংরেজীমতে 'to go' Noun-Infinitive, সংস্কৃতে 'গন্তুম্‌'—তুম্‌-প্রত্যয়ান্ত অব্যয়। বাংলায় 'যাইতে' পদটি কি অব্যয়, না ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য [না ক্রিয়া-বিশেষণ (সুনীতিবাবুর Gerundial Infinitive)] ?

সে আসিলে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম—He having come, ····· —তস্মিন্ আগতে···। '—ইলে'-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তপদ 'আসিলে'-র স্থানে ইংরেজীতে Verb-Adjective—'having come' এবং সংস্কৃতে কৃদন্ত-বিশেষণ 'আগতে' পাইতেছি। অতএব 'আসিলে'-কে বাংলায় কৃদন্ত-বিশেষণ বলিতে হয় না কি ?

দেখা যাইতেছে যে, '—ইয়া', —'ইতে' ও '—ইলে'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলিকে সংস্কৃত-ব্যাকরণ-অনুসারে কখনও অব্যয়, কখনও বা বিশেষণ বলিতে হয়; ইংরেজী-ব্যাকরণ-অনুসারে কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ, কখনও বা ক্রিয়া-বিশেষণ বলিতে হয়। আবার খাইয়া ফেল, 'শুইয়া পড প্রভৃতি স্থলে খাইয়া ও শুইয়া-কে অপদ ও ক্রিয়াঙ্গ বলা প্রয়োজন। এই জটিলতার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সবগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতেছে। অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে, অসমাপিকা ক্রিয়া স্থান-বিশেষে বিশেষ্য ও বিশেষণের [ক্রিয়া-বিশেষণ বিশেষণেরই উপ-বিভাগ] কার্য করিয়া থাকে।

মৌলিক ও যৌগিক ক্রিয়া

সিদ্ধ বা সাধিত ধাতুর সহিত প্রত্যয় বা ধাতুবিভক্তির যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে মৌলিক ক্রিয়া বলে। যথা—করে, যাইব, খাইতেছে, দেখিলাম, জিজ্ঞাসিব ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক মৌলিক ক্রিয়ার যোগে অথবা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত এক বা একাধিক মৌলিক ক্রিয়ার যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যথা—চলিয়া যাও, চেখে দেখে নে, খাইতে যাও, পড়তে বস গে, দর্শন কর, দর্শন করিয়া লও ইত্যাদি।

(ক) মৌলিক ক্রিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা দুই-ই হইতে পারে। যথা—খাইল (মৌলিক সমাপিকা); খাইয়া (মৌলিক অসমাপিকা) ইত্যাদি।

(খ) যৌগিক ক্রিয়ার গঠন-প্রণালী—

(/০) দুইটি মৌলিক ক্রিয়ার যোগে [একটি অসমাপিকা অপরটি সমাপিকা]—চলিয়া যাও, দেখো গে (গিয়া), নাইতে যাব ইত্যাদি।

(৵০) দুইটি সমাপিকা মৌলিক ক্রিয়ার যোগে—পড়ে শুনে [ছেলেটি বেশ পড়ে শুনে], আসে যায় (তা'তে কি আসে যায় ?] ইত্যাদি।

(৶০) তিনটি মৌলিক ক্রিয়ার যোগে [দুইটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা]—চেখে (চাখিয়া) দেখে (দেখিয়া) নে (লও), প'ড়তে (পড়িতে) বস গে (গিয়া) ইত্যাদি।

(।০) ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও একটি মৌলিক ক্রিয়ার যোগে—দর্শন করি, শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি।

(।/০) ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও একাধিক মৌলিক ক্রিয়ার যোগে—দর্শন করিয়া লও, শিক্ষা করিতে থাক ইত্যাদি।

(।৵০) একই ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা ও সমাপিকা মৌলিক ক্রিয়াদ্বয়ের যোগে— দিয়া দে, নিয়া নে ইত্যাদি।

১। অধ্যাপক সুনীতিকুমার মৌলিক ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাঁহার মতে 'মৌলিক ধাতু হইতে সিদ্ধ ক্রিয়াকে সাধারণভাবে 'মৌলিক ক্রিয়া' বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে 'মৌলিক ক্রিয়া' বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না; ......'মৌলিক ক্রিয়া' হইতেছে যৌগিক ক্রিয়ার একটি অংশ। ... .'মৌলিক ক্রিয়া' বলিতে বিশেষভাবে 'যৌগিক ক্রিয়া'র প্রথমাংশ অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে বুঝায়।" আমরা যৌগিক ক্রিয়ার গঠন-প্রণালী দেখাইয়াছি। উহাতে সর্বদাই যে দুইটি অংশ থাকিবে, তাহা নহে এবং প্রথমাংশ যে একটিমাত্র অসমাপিকা ক্রিয়া হইবে, তাহাও নহে। আবার যেখানে একটিমাত্র অসমাপিকা ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া লইয়া একটি যৌগিক ক্রিয়া গঠিত, সেখানেও অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থ প্রধান হইল কিরূপে ? 'খাইতে লাগিল'—উদাহরণটিতে 'লাগিল'-এর গুরুত্ব খাইতে'র চেয়ে কম নহে। অপরপক্ষে 'খাওয়া' ও 'লাগা' এই দুইটি ক্রিয়ার সংযোগে একটি 'খাইতে লাগা' ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়াছে বলিয়াই 'খাইতে লাগিল' যৌগিক ক্রিয়া হইয়াছে। 'খাইতে' (√খা+ইতে) মৌলিক ক্রিয়া, 'লাগিল' (√লাগ্‌+ইল) মৌলিক ক্রিয়া; কিন্তু 'খাইতে লাগিল' যৌগিক ক্রিয়া।

(গ) বিভিন্ন অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ—

(৴০) সম্পূর্ণতা— খাইয়া ফেল ; দর্শন করিয়া লও ; দিয়া দিলাম ; সরিয়া পড়িবে ; সারিয়া উঠিল ইত্যাদি।

(৵০) সামর্থ্য—দেখিতে পায় ; চলিতে পারে ইত্যাদি।

(৶০) পরীক্ষা—খাইয়া দেখ ; চাহিয়া দেখ ইত্যাদি।

(।০) নিরন্তরতা—পড়িতে থাকে ; ধরিয়া রাখা ; করিয়া যাই ইত্যাদি।

(।০৴) অনুমতি—যাইতে দাও ; ঢুকিতে দিবে ইত্যাদি।

(।৵০) অভ্যাস—হইয়া থাকে ; দিয়া থাকে ইত্যাদি।

(।৶০) আরম্ভ—কাঁদিয়া উঠিল ; পড়িতে লাগিলাম ইত্যাদি।

(॥০) অনুষ্ঠান—শ্রবণ কর ; চাখিয়া দেখিয়া লও ; দর্শন করি ; পাঠ করিতেছে ইত্যাদি।

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়াও সমাপিকা ও অসমাপিকা—এই দুই প্রকারের হইতে পারে।

আমরা মন্দির 'দর্শন করিয়া' (অসমাপিকা) 'চলিয়া আসিলাম' (সমাপিকা)।

পোঁটলা 'বেঁধে নিয়ে' (অসমাপিকা) 'চ'লে যা' (সমাপিকা)।

ক্রিয়ার প্রকার*

(১) "চরে বক নদী-বাঁকে।" (২) "দয়া করি কহ, দয়াবতি!"

(৩) "চলিত না হায়, মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।"

*সংস্কৃতে ক্রিয়ার এই স্বতন্ত্র প্রকার বুঝাইবার জন্য রূপান্তরের ব্যবস্থা থাকিলেও ইংরেজীতে Mood বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আলোচিত হয় নাই। বাংলায় রামমোহন রায়ই প্রথম ইংরেজী Moodএর অনুসরণে বাংলাতে ক্রিয়ার প্রকার-স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা করেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার 'প্রকার'-এর পরিবর্তে 'ভাব' পরিভাষার প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'ভাব' সংস্কৃত-ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ; উহা দ্বারা 'ক্রিয়ার্থ' বুঝায় এবং 'ভাব'-শব্দ এই অর্থেই 'ভাববাচ্য' পদটিতে প্রযুক্ত। Mood-এর স্বরূপ বুঝাইতে 'প্রকৃতি' শব্দটিও গ্রহণ করা চলিত; কিন্তু ব্যাকরণে 'প্রকৃতি'-ও একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা। তাই রামমোহন-প্রবর্তিত প্রকার কথাটিই আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি।

উপরিলিখিত বাক্য তিনটি লক্ষ্য করিলে উহাদের স্থূলাক্ষর ক্রিয়াপদগুলির প্রকৃতি যে এক নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম বাক্যে চরে ক্রিয়াপদটি দ্বারা কর্তৃসম্বন্ধে একটি কার্য [চরা] অবধারিত, নির্দেশিত বা নির্ণীত হইয়াছে ; দ্বিতীয় বাক্যে কহ পদে কর্তৃসম্বন্ধে অনুরোধ বা অনুজ্ঞা সূচিত হইয়াছে এবং তৃতীয় বাক্যে' না ঘুরাতে যদি' অন্য একটি ঘটনা বা ঘটনান্তর 'চলিত না' এর অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ সম্ভাবনা দ্বারা উহা আর একটি ঘটনার সহিত সংযোজিত। ক্রিয়াপদের এই তিনটি স্বতন্ত্র অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উহাদের জন্য তিনটি স্বতন্ত্র নাম স্থিরীকৃত হইয়াছে— (১) অবধারক বা নির্দেশক বা নির্ণায়ক প্রকার, (২) অনুজ্ঞা বা নিয়োজক প্রকার, (৩) সম্ভাবক বা ঘটনান্তরাপেক্ষ বা সংযোজক প্রকার।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কর্তৃসম্বন্ধে একটি কার্য অবধারিত, নির্দেশিত বা নির্ণীত হয়, তাহার প্রকৃতিকে অবধারক, নির্দেশক বা নির্ণায়ক প্রকার বলে। যথা—"আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা।"

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কর্তৃসম্বন্ধে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি সূচিত হয়, তাহার প্রকৃতিকে নিয়োজক বা অনুজ্ঞা প্রকার বলা হয়। যথা—"দাও গো অমৃতদীক্ষা।" "যাও-না নন্দ, করো-না ভা'য়ের সেবা।"

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা সূচিত ঘটনা অন্য একটি ঘটনার অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ যে ক্রিয়া সম্ভাবনার্থে অন্য একটি ক্রিয়ার সহিত সংযোজিত, তাহার প্রকৃতিকে সম্ভাবক, ঘটনান্তরাপেক্ষ বা সংযোজক প্রকার বলে। যথা—"কি হবে দেশের, গলা-টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই।" "থাকে যদি কোথা অশোক-নিলয়, ভিখ্‌ মাগি আনো সর্ষপচয়।"

ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বচন

ক্রিয়ার কাল

(ক) আমি খাই ; তুমি খাও ; সে খায়।

(খ) আমি খাইলাম ; তুমি খাইলে ; সে খাইল।

(গ) আমি খাইব ; তুমি খাইবে ; সে খাইবে।

প্রত্যেক সারিতে ৩টি বাক্যে ৩টি ক্রিয়াপদ রহিয়াছে। (ক)-সারির বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত **খাই, খাও** ও **খায়** ক্রিয়াপদগুলি 'খাওয়া' কথাটির অনুষ্ঠান বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান-কালটিরও বোধ জন্মায়। স্থূলভাবে চিরবহমান কালস্রোতের উপস্থিত কয়েকটি মুহূর্তে যেন উক্ত কার্যটির অনুষ্ঠান। (খ)-সারির বাক্যস্থিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের মুহূর্তগুলি কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। (গ)-সারির বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদসমূহে যে অনুষ্ঠান-সময়ের দ্যোতনা করে, তাহা স্পষ্টতঃ অনাগত।

তিন সারির বাক্যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালের পার্থক্যবোধের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের প্রভেদও লক্ষণীয়। (ক)-তে মূলধাতু 'খা'-এর সহিত -ই, -ও এবং -এ [>য়ে >য় ধাতুবিভক্তি এই যোগে ক্রিয়াপদ **খাই, খাও** এবং **খায়** গঠিত হইয়াছে; (খ)-তে **-ইলাম, -ইলে** ও **-ইল** এবং (গ)-তে **-ইব** ও **-ইবে** যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদগুলি গঠন করিয়াছে। মোটকথা ক্রিয়াপদের **রূপভেদ** দ্বারা **অনুষ্ঠান-সময়ের** পার্থক্য সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে—

ক্রিয়াপদের অর্থগত ও রূপগত বৈচিত্র্যের দ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠানের যে সময় সূচিত হয়, তাহাকেই ক্রিয়ার কাল বলে।

'খাই', 'খাও', 'খায়'—**বর্তমান** কালের ক্রিয়াপদ;

'খাইলাম', 'খাইলে', 'খাইল'—**অতীত** কালের ক্রিয়াপদ;

'খাইব', 'খাইবে'—**ভবিষ্যৎ** কালের ক্রিয়াপদ।

১। "প্রত্যয় ও বিভক্তিযোগে যে **রূপান্তর** ঘটিলে ক্রিয়ার ব্যাপারটি সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, বা এখনও ঘটিতেছে, বা অতীতে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে, এই প্রকার সময়ের বোধ হয়, তাহাকে ক্রিয়ার কাল বলে।"—আচার্য সুনীতিকুমার। 'রূপান্তর'-এর পূর্বে 'যে' বিশেষণটি থাকায় উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা 'রূপান্তর'কেই ক্রিয়ার কাল বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নহে। 'রূপান্তর' কালের অন্যতর দ্যোতকমাত্র, কাল নহে।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়—ক্রিয়াপদের **অর্থভেদ** এবং **রূপভেদ** দ্বারা **ক্রিয়ার কাল** নির্ণীত হয়; তাই বৈয়াকরণগণ ক্রিয়ার কাল-নির্ণয়-ব্যাপারে **অর্থ** ও **রূপ** উভয়েরই উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। "কদা গমিষ্যসি? এষ গচ্ছামি।" প্রশ্নটি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকাল সূচিত হইতেছে। কিন্তু উত্তরের 'গচ্ছামি' ক্রিয়া-

পদটি যে বর্তমানকালের রূপবিশিষ্ট, তাহাতেও সন্দেহ নাই। [√গম্‌+লট্ 'মি']। যে ক্রিয়াপদের অর্থ দ্বারা ভবিষ্যৎকালের এবং রূপ দ্বারা বর্তমানকালের বোধ জন্মে, তাহার কাল-নির্ণয় কিরূপ হইবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে পাণিনি বলিয়াছেন— 'বর্তমান-সামীপ্যে বর্তমানবদ্ বা' অর্থাৎ বর্তমানকালের সমীপবর্তী ভূত ও ভবিষ্যৎকালের দ্যোতনায় বিকল্পে ক্রিয়াপদের বর্তমানকালের রূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। "আগামী সোমবার পুরী যাচ্ছি।"—এই বাক্যে বর্তমানকালের ক্রিয়া রূপ 'যাচ্ছি' দ্বারা **সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ** কালের বোধ জন্মিতেছে। আবার "কাল **এসেছি**"-বাক্যে **এসেছি**-রূপে **বর্তমান** কালের ক্রিয়াপদ, কিন্তু অর্থে **সমীপবর্তী ভূত**। কাজেই **যাচ্ছি** ও **এসেছি**-কে যথাক্রমে **ভবিষ্যৎসামীপ্যে** বা **অদূর-ভবিষ্যদর্থে বর্তমান** এবং **ভূতসামীপ্যে অদূর-ভূতার্থে বর্তমান** বলিতে হইবে।

ক্রিয়ার কালভেদ

স্থূলভাবে কালের মুখ্যবিভাগ অনুসারে ক্রিয়ারও মুখ্য কালভেদ তিনটি—**অতীত** [বা ভূত], **বর্তমান** এবং **ভবিষ্যৎ**। কিন্তু এই তিনটি কালেরই আবার অনেকগুলি সূক্ষ্ম বিভাগ রহিয়াছে।

(ক) বর্তমান কাল [ইহার ৪টি উপবিভাগ]

১। **সাধারণ বা নিত্য বর্তমান** [ইহা দ্বারা সাধারণভাবে বর্তমান কালে ক্রিয়ানুষ্ঠান বুঝাইয়া থাকে]—আমি **যাই**, তুমি **পড়**, তাহারা **খেলে** ইত্যাদি।

২। **ঘটমান বর্তমান** [যে ক্রিয়াপদ দ্বারা 'বর্তমানে কোনও কার্যের অনুষ্ঠান চলিতেছে এইরূপ বুঝায়, তাহার কালকে **ঘটমান** বর্তমান বলে]—আমি **পড়িতেছি**; তোমরা **হাসিতেছ**; শিশুটি **ঘুমাইতেছে** ইত্যাদি।

৩। **পুরাঘটিত বর্তমান** [যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 'অতীতে আরব্ধ হইলেও বর্তমানে সমাপ্ত' এইরূপ বুঝায়, তাহার কালকে **পুরাঘটিত বর্তমান** বলা হয়]—আমরা **খাইয়াছি**; তুমি **পড়িয়াছ**; ছেলেরা **ঘুমাইয়াছে** ইত্যাদি।

৪। **অনুজ্ঞা বর্তমান**' [বর্তমানে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি বুঝাইতে

যে-সকল ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়, তাহাদের কালকে **অনুজ্ঞা বর্তমান** বলে]—"বেরিয়ে যা, ভিক্ষুক!" সে বলুক; এখান থেকে সর ইত্যাদি।

১। 'অনুজ্ঞা'-কে 'ক্রিয়ার প্রকার' বলিয়া ধরিলেও অনুজ্ঞা-বিশেষে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের বোধ জন্মে এবং স্থলবিশেষে ক্রিয়াপদের রূপভেদও দৃষ্ট হয়। তাই 'অর্থভেদ' এবং 'রূপভেদ' উভয়কে অবলম্বন করিয়াই অনুজ্ঞা বর্তমান ও অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কালভেদ-প্রকরণে গৃহীত হইয়াছে।

৫। ***আভ্যাসিক** বা **নিত্যবৃত্ত বর্তমান**—যে যৌগিক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্তমানে একটি ক্রিয়াসম্পাদনের অভ্যাস সূচিত হয়, তাহার কালকে **আভ্যাসিক** বা **নিত্যবৃত্ত বর্তমান** (Habitual Present) বলা যাইতে পারে। যথা—আমরা একাজ **করিয়া থাকি**। তুমি প্রায়ই একথা **বলিয়া থাক**। সে দুপুরে ঘণ্টাখানেক **ঘুমাইয়া থাকে**। ইত্যাদি।

৬। ***প্রবাহাত্মক বর্তমান**—যে যৌগিক ক্রিয়াপদে ক্রিয়ার 'বহমানতা' সূচিত হয়, তাহার কালকে **প্রবাহাত্মক বর্তমান** বলা যায়; [এইরূপ ক্রিয়াপদ দ্বারা 'বর্তমানে কোন কার্য সম্পাদিত হইতেছে' বুঝায় না বলিয়া ইহাকে 'ঘটমান' বলা যায় না। আবার সর্বদা ইহাতে অভ্যাসও বুঝায় না; তাই 'নিত্যবৃত্ত' বলাও ঠিক নহে।] যথা—আমরা যখন **পড়িতে থাকি**, তোমরা তখন **ঘুমাইতে থাক**, অবশ্য কয়েকজন বৃদ্ধ তখন **বেড়াইতে থাকেন**। তুমি **দিতে থাক** [অনুজ্ঞায় বহমানতা], আর আমি **খাইতে থাকি**। ইত্যাদি।

* বস্তুতঃ ৫ ও ৬নংকে বর্তমানকালের স্বতন্ত্র উপ-বিভাগ না বলিলেও চলে। সমাপিকা ক্রিয়াংশে থাক্-এর নিত্য বর্তমানের রূপ রহিয়াছে। 'অভ্যাস' বা 'প্রবাহ' বুঝাইতে '-ইয়া' ও '-ইতে'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত থাক্-ধাতুর সমাপিকা নিত্য বর্তমানের রূপযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে। উহাদের কাল **নিত্য বর্তমানের** বলিলেও চলে না কি?

উপরন্তু যখন ইংরেজী-অনুসারে এখানে ['to happen' ও 'continue'-অর্থে] থাকা-টাই প্রধান ক্রিয়া (Principal Verb), তখন উহার কালই গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

(খ) অতীত [বা ভূত] কাল [ইহার উপবিভাগ ৮টি]

১। **সাধারণ অতীত** বা **সামান্য ভূত** [সাধারণভাবে বিগত সময়ে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত, তাহার কাল]—আমি বইখানি **পড়িলাম**। "তুই কাল ফাঁদে **পড়িলি**।" "রাজা এলেন, মন্ত্রী এলেন।" ইত্যাদি।

২। **ঘটমান অতীত** [অতীতে যে কার্যের অনুষ্ঠান চলিতেছিল এইরূপ বুঝায়, তাহার কাল]—আমরা **খেলিতেছিলাম**, তুমি **কাঁদিতেছিলে**, "**বাঁধিতেছিল** সে দীর্ঘ চিকুর। ইত্যাদি।

৩। **নিত্যবৃত্ত[১] অতীত** [অতীত অভ্যাস বুঝাইতে যে ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়, তাহার কালকে **নিত্যবৃত্ত অতীত** বলে]—"**কহিতাম** কত কথা"; "নিত্য তুমি **বলিতে** আমায়"; "কেহ বা **হাসিত**, **নাচিত** বা কেহ" ইত্যাদি।

৪। **পুরাঘটিত অতীত** বা **পূর্ণভূত** [সুনিশ্চিতরূপে দূর অতীতে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত, তাহার কাল]—আমি **দেখিয়াছিলাম**, তোরা **বলিয়াছিলি**; তাহারা **গিয়াছিল** ইত্যাদি।

১। অধ্যাপক সুনীতিকুমার 'ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত' এবং 'পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত' নামে আরও দুইটি ক্রিয়ার কালের সন্ধান দিয়াছেন। উদাহরণ—করিতে থাকিতাম,—থাকিতে,—থাকিত ইত্যাদি (ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত) এবং করিয়া থাকিতাম,—থাকিতে,—থাকিত ইত্যাদি (পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত); কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, এইগুলি কি যৌগিক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত নয়? এখানে স্পষ্টতঃ '-ইতে' ও '-ইয়া'-প্রত্যয়যোগে গঠিত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সহিত √থাক্-এর নিত্যবৃত্ত অতীতের সমাপিকার রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং 'নিত্যবৃত্ত অতীত'-এর আবার কয়েকটি অন্তর্বিভাগ গঠন করিলে ক্রিয়ার কালনির্ণয় ব্যাপারটি জটিলতর হইবে। উপরন্তু বর্তমান কালের ৫নং ও ৬নং বিভাগে যাহা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহাই প্রযোজ্য অর্থাৎ 'to continue' ও 'to happen,-অর্থে √থাক্-ই Principal Verb.

(গ) ভবিষ্যৎকাল [ইহার উপবিভাগ ৪টি]

১। **সামান্য বা সাধারণ ভবিষ্যৎ** [যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার কাল]—"মুক্ত **হইব** দেবঋণে মোরা।" "বিধাতার বরে **ভরিবে** ভুবন বাঙালীর গৌরবে।" "তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী **হইবে**।" ইত্যাদি।

২। **ঘটমান ভবিষ্যৎ** [যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আগামী কালে চলিতে থাকিবে, তাহার কাল। মূলতঃ অসমাপিকা ক্রিয়াটি মুখ্য; √থাক্-জাত সাধারণ ভবিষ্যৎকালের সমাপিকা ক্রিয়াপদ উহার সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যতে ক্রিয়ার ঘটমানতা বুঝাইয়া থাকে]—আমরা তখন **ঘুমাইতে থাকিব**। তোমরা **খেলিতে থাকিবে**। ভারত চিরদিনই শান্তির বাণী **বলিতে থাকিবে**। ইত্যাদি।

৩। **সন্দিগ্ধ ভূতার্থক ভবিষ্যৎ**[১]—'-ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা মুখ্য ক্রিয়াপদের হিত √থাক্-জাত সাধারণ ভবিষ্যৎকালদ্যোতক সমাপিকা ক্রিয়াপদ মিলিত হইলে যে ৗগিক ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহার কাল]—তোমরা ইহা **শুনিয়া থাকিবে**। তাহারা য়া **দেখিয়া থাকিবে**। ইত্যাদি।

৪। **অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ**[২] [যে ক্রিয়াপদ দ্বারা পরবর্তী সময়ে উক্ত ক্রিয়া-সম্পাদনের াদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি সূচিত হয়, তাহার কাল]—"আগামী বৎসরে তুমি মার নিকটে **আসিও**।" কাল একবার **আসিস্**। ইত্যাদি।

১। আচার্য সুনীতিকুমার প্রথমে ইংরেজীর Future Perfect-এর অনুকরণে **পুরাঘটিত** বিষ্যৎ আখ্যা দিয়াছিলেন। পরে **পুরাঘটিত সম্ভাব্য** বা **সম্ভাব্য অতীত** বলিয়াছেন। চার্য শ্যামাপদ সুবিস্তৃত আলোচনায় 'করিয়া থাকিবে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের অর্থগত বৈশিষ্ট্যের উপর র্ণ জোর দিয়া ইহাদিগকে **সন্দিগ্ধ অতীত** কালের ক্রিয়া বলিয়াছেন। হিন্দীতে এই প্রকার ার কালকে 'সন্দিগ্ধ ভূত' বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ক্রিয়ার কাল-নির্ণয় কেবল গত নহে, রূপগত বৈশিষ্ট্যও অবশ্যই গ্রহণীয়। নতুবা 'আগামী কল্য পুরী **যাইতেছি**'—বাক্যে ইতেছি'-কে **ভবিষ্যৎ-সমীপ্যে বর্তমান**-কালের ক্রিয়া বলা যায় না, উহাকে **সাধারণ** বিষ্যৎ বলিতে হয়। অনুরূপ—কাল 'এসেছি'—বাক্যে 'এসেছি'-কে ভূতসামীপ্যে বর্তমান না বলিয়া ারণ অতীতের ক্রিয়াপদ বলিতে হয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই অর্থগত ও রূপগত দুইটি বৈশিষ্ট্যই যখন গত হইয়াছে, তখন 'করিয়া থাকিবে', 'শুনিয়া থাকিবে'র ক্ষেত্রেই বা হইবে না কেন? তাই **অর্থ** রূপ—উভয়কেই মানিয়া লইয়া আমরা উল্লিখিত **সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ**-নামটিই বিজ্ঞান-ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। পুরা (পূর্বে ঘটিয়াছে) কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই 'পুরাঘটিত' তে পারি না।

২। অনুজ্ঞা ভবিষ্যতের কেবল মধ্যমপুরুষ '-ইও' এবং '-ইস্' বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ দেখা যায়। ম পুরুষে এবং অনেক সময় মধ্যম পুরুষেও সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ দ্বারাই অনুজ্ঞার কাজ । যথা—সদা সত্যকথা **বলিবে**। দয়া করিয়া পত্রখানি সঙ্গে **আনিবেন**। এরা তোমার **যাবে**। ইত্যাদি।

মৌলিক ও যৌগিক কাল

মুখ্যধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তির যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হ তাহাদের কালকে মৌলিক কাল বলে।

সামান্য, সাধারণ বা নিত্য (১) বর্তমান—করি (√কর্+ই);
" (২) অতীত—করিলাম (√কর্+ইলাম);
" (৩) ভবিষ্যৎ—করিব (√কর্+ইব);
(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত—করিতাম (√কর্+ইতাম);
(৫) অনুজ্ঞা বর্তমান—করুক (√কর্+উক);
(৬) " ভবিষ্যৎ—করিস্ (√কর্+ইস্)।

মুখ্যধাতুর সহিত -'ইতে' ও -'ইয়া'-প্রত্যয়-যোগে গঠিত 'অসমাপিক ক্রিয়ারূপের সহিত √আছ্ বা √থাক্-এর সমাপিকা ক্রিয়ারূপ যুক্ত করি যে-সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাদের কালগুলিকে যৌগিক কা বলা হয়।

মৌলিক কাল-এর উদাহরণে উল্লিখিত ৬টি কাল ব্যতীত পূর্বে আলোচি অবশিষ্ট সবগুলি কালই যৌগিক।

যথা—(১) ঘটমান বর্তমান — করিতেছি (=করিতে আছি);
(২) " অতীত — করিতেছিলাম (=করিতে আছিলাম);
(৩) " ভবিষ্যৎ — করিতে থাকিব;
(৪) পুরাঘটিত বর্তমান — করিয়াছি (=করিয়া আছি);
(৫) " অতীত — করিয়াছিলাম (=করিয়া আছিলাম);
(৬) সন্দিগ্ধ ভূতার্থক ভবিষ্যৎ — করিয়া থাকিব।

প্রধানতঃ ১২টি কালের ৬টি মৌলিক ও ৬টি যৌগিক। ইহা ছাড়া ক্রিয়ার কা যে-সকল উপবিভাগের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই যৌগিক কা এর অন্তর্গত।

ক্রিয়ার পুরুষ ও বচন

বিশেষ্য ও সর্বনাম-প্রসঙ্গে **পুরুষের** কথা আলোচিত হইয়াছে। এই পুরুষ পারিভাষিক নাম-বিশেষ এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দ্যোতক। সংস্কৃতে এবং হিন্দীতেও এই প্রকার পুরুষ রহিয়াছে; ইংরেজীতে ইহাকে Person বলা হয়। আমি, আমরা—**উত্তম পুরুষ**; তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা—**মধ্যম পুরুষ**; সে, তাহারা, তিনি, তাঁহারা এবং যাবতীয় বিশেষ্য—প্রথম-পুরুষ, কিন্তু ইংরেজীর First Person নহে। ইংরেজীর First Person এখানে উত্তম পুরুষ এবং Third Person এখানে প্রথম পুরুষ; Second Person সর্বত্র মধ্যম পুরুষ। ক্রিয়াপদ যাহার অনুগামী, তাহার পুরুষ-অনুসারেই ক্রিয়াপদের পুরুষ নির্ধারিত হইবে। পুরুষ-অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটে। যথা—

আমি বা আমরা করি (উত্তম পুরুষ)।

তুমি বা তোমরা কর
তুই বা তোরা করিস্
আপনি বা আপনারা করেন } (মধ্যম পুরুষ)।

সে বা তাহারা করে
তিনি বা তাঁহারা করেন
রাম বা লোকেরা করে } (প্রথম পুরুষ)।

করি—উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ; কর, **করিস্** [তুচ্ছার্থে], করেন [সম্ভ্রমার্থে]—**মধ্যম** পুরুষের ক্রিয়াপদ এবং করে, করেন [সম্ভ্রমার্থে]—**প্রথম** পুরুষের ক্রিয়াপদ।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, কর্তা একবচনেরই হউক বা বহুবচনেরই হউক ক্রিয়াপদের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার রূপ অপরিবর্তিত। সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজীর সহিত বাঙ্‌লার এখানে সবিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। বাঙ্‌লাতে কেবল **কাল**-ভেদে ও **পুরুষ**-ভেদে **ক্রিয়াপদের রূপভেদ** ঘটিয়া থাকে।

বিভিন্ন কাল-রূপের বিশিষ্ট প্রয়োগ

নিত্য বর্তমানের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

(ক) **বিশ্বজনীন সত্য** বুঝাইতে—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে **ঘুরে**।

(খ) **প্রবচনে**—রাখে কেষ্ট **মারে** কে? ভাগের মা গঙ্গা **পায়** না।

(গ) **অনুজ্ঞা বর্তমানে উত্তম পুরুষে**—তা'হ'লে আমি **আসি**? আমরা তবে **যাই**, কি বলো?

(ঘ) **অনুজ্ঞা ভবিষ্যতে উত্তম ও প্রথম পুরুষে** এবং কখনও কখনও **সম্ভ্রমার্থক মধ্যম পুরুষে**—আমি যেন সফলকাম **হই**! তাহারা যেন না **আসে**! আপনারা যেন মনে **রাখেন**!

(ঙ) **ঘটমান বর্তমানের** স্থলে—"অনুচরগুলি **চলে** [চলিতেছে] তার পাছে পাছে।" "ঐ **আসে** [আসিতেছে] ঐ অতি ভৈরব হরষে।"

(চ) **অতীত ঘটনা** বা **ঐতিহাসিক কাহিনীর** বর্ণনায় **অতীত কালের** ক্রিয়াপদের পরিবর্তে কখনও কখনও **নিত্য বর্তমানের** ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়; এইরূপ ক্রিয়ার কালকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** বলে। যথা—রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনগমন **করেন**। [=করিয়াছিলেন]। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কীরা বঙ্গদেশ আক্রমণ **করে** [=করিয়াছিল]। পুরু আলেক্‌জান্দারকে বাধা **দেন** [=দিয়াছিলেন]; কিন্তু যুদ্ধে পুরুর পরাজয় **ঘটে** [=ঘটিয়াছিল]। ইত্যাদি।

(ছ) **যখন, যতক্ষণ** প্রভৃতির যোগে কখনও কখনও **অতীত ও ভবিষ্যৎ** কালের পরিবর্তে—আমি 'যখন' **আসি** [=আসিলাম] তখন কেহ ছিল না। আমি 'যতক্ষণ' না ফিরিয়া **আসি** [=আসিব], ততক্ষণ একপা'ও নড়িবে না।

ঘটমান বর্তমানের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

(ক) **সমীপবর্তী অতীত** বুঝাইতে—এই **আসিতেছি** [=আসিলাম]।

(খ) **সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ** বুঝাইতে—কবে দিল্লী **যাচ্ছ** [>যাইতেছ=যাইবে]?

পুরাঘটিত বর্তমানের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

সমীপবর্তী অতীত বুঝাইতে—কাল **এসেছি** [>আসিয়াছি=আসিলাম]।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

(ক) **অবিলম্ব ভবিষ্যদর্থে**—ঝড় **এল** বলে [=অবিলম্বে আসিবে]; প্রাণ **গেল** [=অবিলম্বে যাইবে], বাঁচাও!

(খ) **পুরাঘটিত বর্তমান-অর্থে**—এত যে **খাট্‌লে** [=খাটিয়াছ], **পেলে** [=পাইয়াছ] কি?

(গ) **সাধারণ ভবিষ্যদর্থে**—ছেলেটা **রইল** [=রহিবে], একটু দেখবেন।

(ঘ) **পুরাঘটিত অতীতার্থে**—চাণক্য নন্দবংশ-ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা **করিলেন** [=করিয়াছিলেন]।

(ঙ) **ভবিষ্যতে সম্ভাবনা** বুঝাইতে—ধর, সে এখানে **এল** [=আসিবে] বা আমিই সেখানে **গেলাম** [=যাইব], কিন্তু তা'তে আসল কাজটা কি হবে?

অনুজ্ঞার বিশিষ্ট প্রয়োগ

অনুজ্ঞাকে ক্রিয়ার প্রকার [Mood] বলা হইয়াছে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্‌লার অনুজ্ঞা ইংরেজীর **Imparative Mood** এবং সংস্কৃতের **লোট্‌** হইতে স্বতন্ত্র। ইংরেজীর **Optative** এবং সংস্কৃতের **লিঙ্‌** বাঙ্‌লাতে **অনুজ্ঞা**-র অন্তর্ভুক্ত। **কাল**-বিচারেও **অনুজ্ঞা**-র ক্রিয়াতে **বর্তমান** ও **ভবিষ্যৎ** এই দুইটি রূপ রহিয়াছে।

অনুজ্ঞা-বর্তমান

(১) **আদেশ** বুঝাইতে—'**শোন্‌** যা বলি'; '**বেরিয়ে যা**, ভিক্ষুক!'

(২) **অনুরোধ** „ —আমারটা আমায় **দাও**, তোমারটা তুমি **নাও**!

(৩) **প্রার্থনা** „ —'আমায় **দাও** মা ত'বিলদারি!' দুর্গা, **রক্ষা কর**!

(৪) **ভিক্ষা** „ —'একটি পয়সা **দাও** গো বাবু!'

(৫) **অভিশাপ** „ —গোল্লায় **যা**, তোর সর্বনাশ **হউক**!

(৬) **আবেদন** „ —'একবার তোরা মা বলিয়ে **ডাক**, জগৎ-জনের শ্রবণ **জুড়াক**।'

(৭) আমন্ত্রণ " —আস্‌তে আজ্ঞা হোক্; ভিতরে এসে বস্থন!

(৮) আশীর্বাদ " —আমার মাথায় যত চুল, তত পরমাই হোক্; চিরায়ুষ্মতী হও, মা।

(৯) উপদেশ " —উদার হও, সঙ্কীর্ণতা পরিহার কর।

অনুজ্ঞা-ভবিষ্যৎ

(১) আদেশ বুঝাইতে —এক-পা এগুবিনে [রূপে সাধারণ ভবিষ্যৎ কিন্তু অর্থে অনুজ্ঞা]।

(২) অনুরোধ বুঝাইতে —সময় মত আসিও; চলিয়া যাইও না যেন।

(৩) প্রার্থনা " —ভুলিস্‌নে মা, সন্তানে তোর; দিস্‌নে দাগা বুকে।

(৪) অভিশাপ " —গোল্লায় যাস্; তিলে তিলে জ্বলে মরিস্।

(৫) আবেদন " —'হে ভারত, ভুলিও না তোমার আদর্শ সর্বত্যাগী শঙ্কর!

(৬) আমন্ত্রণ " —যথাসময়ে আসিও।

(৭) আশীর্বাদ " —চিরজীবী হইও; সুখে থাকিস্।

(৮) উপদেশ " —সদা সত্যকথা বলিও; কখনও কারও প্রাণে ব্যথা দিস্‌নে।

ধাতু-বিভক্তি

পদপ্রকরণের ১ম অধ্যায়ে ধাতু-বিভক্তির সংজ্ঞা আলোচিত হইয়াছে; এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ক্রিয়ার বিভিন্ন কালরূপ প্রস্তুত করিবার জন্ম ধাতু-বিভক্তিগুলির সহিত পরিচিতির আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাই প্রথমে সাধু পদে চলিত ধাতু-বিভক্তির নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইল। যেখানে কোনও সহায়িকা (Auxiliary) সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়, সেখানে উক্ত সহায়িকা ও সমাপিকা ক্রিয়াংশটুকুও বিভক্তির সহিত জুড়িয়া

ধাতুবিভক্তির নির্ঘণ্ট

সাধুরূপ

কাল বিভাগ		উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ সাধারণ	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে	মধ্যম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে)	প্রথম পুরুষ (সাধারণ)	প্রথম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে)
বর্তমান	সাধারণ বা নিত্য (১)	ই	অ [ও]	ইস্ [স]	এন [ন]	এ [য়]	এন [ন]
	ঘটমান (২)	ইতেছি	ইতেছ	ইতেছিস	ইতেছেন	ইতেছে	ইতেছেন
	পুরাঘটিত (৩)	ইয়াছি	ইয়াছ	ইয়াছিস	ইয়াছেন	ইয়াছে	ইয়াছেন
	অনুজ্ঞা (৪)	ই	ও [সংবৃত অ]	• (শূন্য)	উন [ন]	উক [ক]	উন [ন]
অতীত	সাধারণ (৫)	ইলাম	ইলে	ইলি	ইলেন	ইল	ইলেন
	ঘটমান (৬)	ইতেছিলাম	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলেন	ইতেছিল	ইতেছিলেন
	পুরাঘটিত (৭)	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলেন	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন
	নিত্যবৃত্ত (৮)	ইতাম	ইতে	ইতি (স)	ইতেন	ইত	ইতেন
ভবিষ্যৎ	সাধারণ (৯)	ইব	ইবে	ইবি	ইবেন	ইবে	ইবেন
	ঘটমান (১০)	ইতে থাকিব	ইতে থাকিবে	ইতে থাকিবি	ইতে থাকিবেন	ইতে থাকিবে	ইতে থাকিবেন
	সন্দিগ্ধভূতার্থক (১১)	ইয়া থাকিব	ইয়া থাকিবে	ইয়া থাকিবি	ইয়া থাকিবেন	ইয়া থাকিবে	ইয়া থাকিবেন
	অনুজ্ঞা (১২)	(যেন) ই	ইও [ইয়ো]	ইস	(যেন) এন ইবেন	(যেন) এ	(যেন) এন ইবেন
আভ্যাসিক বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান (৴০)		ইয়া থাকি	ইয়া থাক	ইয়া থাকিস	ইয়া থাকেন	ইয়া থাকে	ইয়া থাকেন
প্রবাহাত্মক বর্তমান (৵০)		ইতে থাকি	ইতে থাক	ইতে থাকিস	ইতে থাকেন	ইতে থাকে	ইতে থাকেন
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত (৶০)		ইতে থাকিতাম	ইতে থাকিতে	ইতে থাকিতি (স)	ইতে থাকিতেন	ইতে থাকিত	ইতে থাকিতেন
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (।০)		ইয়া থাকিতাম	ইয়া থাকিতে	ইয়া থাকিতি (স)	ইয়া থাকিতেন	ইয়া থাকিত	ইয়া থাকিতেন

(৴০) হইতে (।০) পর্যন্ত শেষের চারিটি পঙ্‌ক্তিতে যে রূপগুলি দেওয়া হইয়াছে উহাদিগকে স্বতন্ত্র কালবাচক বিভক্তি না ধরিলেও চলে। ঘটমান ও সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ-এর ক্ষেত্রে √থাক-জাত থাকিব, থাকিবে ইত্যাদি মুখ্য ক্রিয়ার কালরূপের সহায়িকা ক্রিয়া [Auxiliary Verbs] কিন্তু (৴০) হইতে (।০) অবধি ক্ষেত্রে √থাক্-জাত ক্রিয়াপদ মুখ্য [Principal Verbs 'happen' ও 'continue'র সমার্থক], কাল বিভাগের আলোচনা কালে ইহাদের কথা আলোচিত হইয়াছে।

ধাতুবিভক্তির নির্ঘণ্ট

চলিতরূপ

কাল বিভাগ		উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থে)	মধ্যম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে)	প্রথম পুরুষ (সাধারণ)	প্রথম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে)
বর্তমান	সাধারণ বা নিত্য (১)	ই	অ [ও]	ইস [স]	এন [ন]	এ [য]	এন [ন]
	ঘটমান (২)	ছি [চি]	ছ [চ]	ছিস [চিস]	ছেন [চেন]	ছে [চে]	ছেন [চেন]
	পুরাঘটিত (৩)	এছি [এচি]	এছ [এচ]	এছিস [এচিস]	এছেন [এঁচেন]	এছে [এচে]	এছেন [এচেন]
	অনুজ্ঞা (৪)	ই	ও	• (শূন্য)	উন [ন]	উক [ক]	উন [ন]
অতীত	সাধারণ (৫)	লাম, লুম, • লেম	লে	লি	লেন	ল • লে	লেন
	ঘটমান (৬)	ছিলাম, ছিলুম • ছিলেম	ছিলে	ছিলি (স)	ছিলেন	ছিল	ছিলেন
	পুরাঘটিত (৭)	এছিলাম এছিলুম • এছিলেম	এছিলে	এছিলি	এছিলেন	এছিল	এছিলেন
	নিত্যবৃত্ত (৮)	তাম, তুম. • তেম	তে	তিস	তেন	ত [তো]	তেন
ভবিষ্যৎ	সাধারণ (৯)	ব [বো]	বে	বি	বেন	বে	বেন
	ঘটমান (১০)	তে থাকব	তে থাকবে	তে থাকবি	তে থাকবেন	তে থাকবে	তে থাকবেন
	সন্দিগ্ধভূতার্থক (১১)	এ থাকব	এ থাকবে	এ থাকবি	এ থাকবেন	এ থাকবে	এ থাকবেন
	অনুজ্ঞা (১২)	(যেন) ই	ও	ইস	বেন	(যেন) এ	বেন
নিত্যবৃত্ত বর্তমান (/০)		এ থাকি	এ থাক	এ থাকিস	এ থাকেন	এ থাকে	এ থাকেন
প্রবাহাত্মক বর্তমান (৶০)		তে থাকি	তে থাক	তে থাকিস	তে থাকেন	তে থাকে	তে থাকেন
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত (৷৵০)		তে থাকিতাম	তে থাকতে	তে থাকতিস	তে থাকতেন	তে থাকত	তে থাকতেন
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (৷০)		এ থাকতাম	এ থাকতে	এ থাকতিস	এ থাকতেন	এ থাকত	এ থাকতেন

* লেম, লে, ছিলেম, এছিলেম, তেম—এই কয়টি বিভক্তির যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের রবীন্দ্র-কাব্যে প্রয়োগ রহিয়াছে। স্বরান্ত ধাতুর যোগে বিভক্তির আদ্য 'ছ'-স্থানে 'চ্ছ' হইয়া থাকে; যথা √যা+ছ=যাচ্ছ, | খা+ছিল=খাচ্ছিল ইত্যাদি।

দেওয়া হইল। কারণ উহার পূর্বে মাত্র ধাতুটিকে যুক্ত করিলেই সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদটি পাওয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে :

√আছ্ + ই [নিত্য বর্তমানে উত্তম পুরুষের বিভক্তি] = আছি। এই আছি একটি সমাপিকা (Finite) ও সহায়িকা (Auxiliary) ক্রিয়া ; কিন্তু ইহা ঘটমান ও পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ-রচনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মূলধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ারূপের ইতে ও ইয়া-প্রত্যয়ের সহিত এই আছিকে যুক্ত করিয়া ইতেছি [ইতে + আছি] ও ইয়াছি [ইয়া + আছি] ধাতু-বিভক্তি লিখিত হইল।

ক্রিয়ারূপাদর্শ (সাধু)

নিত্য বর্তমান

	√কর্	√হ	√আছ্
*উঃ—	করি	হই	আছি
*মঃ—(১)	কর	হও	আছ
—(২)	করিস্	হইস্ (হস)	আছিস্
—(৩)	করেন	হ'য়েন (হ'ন)	আছেন
*প্রঃ—(১)	করে	হয়	আছে
—(২)	করেন	হ'য়েন (হ'ন)	আছেন

ঘটমান বর্তমান

উঃ—	করিতেছি	হইতেছি	—
মঃ—(১)	করিতেছ	হইতেছ	—
—(২)	করিতেছিস্	হইতেছিস্	—
—(৩)	করিতেছেন	হইতেছেন	—
প্রঃ—(১)	করিতেছে	হইতেছে	—
—(২)	করিতেছেন	হইতেছেন	—

* উঃ = উত্তম পুরুষ ; মঃ—(১) = মধ্যম পুরুষ (সাধারণ), মঃ—(২) = মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থে), মঃ (৩) = মধ্যম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে) ; প্রঃ—(১) = প্রথম পুরুষ (সাধারণ) প্রঃ—(২) = প্রথম পুরুষ (সম্ভ্রমার্থে)।

পুরাঘটিত বর্তমান

উঃ—	করিয়াছি	হইয়াছি	—
মঃ—(১)	করিয়াছ	হইয়াছ	—
—(২)	করিয়াছিস্	হইয়াছিস্	—
—(৩)	করিয়াছেন	হইয়াছেন	—
প্রঃ—(১)	করিয়াছে	হইয়াছে	—
—(২)	করিয়াছেন	হইয়াছেন	—

অনুজ্ঞা বর্তমান

উঃ—	করি	হই	—
মঃ—(১)	কর [করো]	হও	—
—(২)	কর্	হ	—
—(৩)	করুন	হউন [হ'ন]	—
প্রঃ—(১)	করুক	হউক [হ'ক]	—
—(২)	করুন	হউন [হ'ন]	—

সাধারণ অতীত

	√কর্	√হ	√আছ্
উঃ—	করিলাম	হইলাম	[আ]-ছিলাম
মঃ—(১)	করিলে	হইলে	[আ]-ছিলে
—(২)	করিলি	হইলি	[আ]-ছিলি
—(৩)	করিলেন	হইলেন	[আ]-ছিলেন
প্রঃ—(১)	করিল	হইল	[আ]-ছিল
—(২)	করিলেন	হইলেন	[আ]-ছিলেন

ঘটমান অতীত

উঃ—	করিতেছিলাম	হইতেছিলাম	—
মঃ—(১)	করিতেছিলে	হইতেছিলে	—
—(২)	করিতেছিলি	হইতেছিলি	—
—(৩)	করিতেছিলেন	হইতেছিলেন	—
প্রঃ—(১)	করিতেছিল	হইতেছিল	—
—(২)	করিতেছিলেন	হইতেছিলেন	—

নিত্যবৃত্ত অতীত

উঃ—	করিতাম	হইতাম	—
মঃ—(১)	করিতে	হইতে	—
—(২)	করিতি [স্]	হইতি [স্]	—
—(৩)	করিতেন	হইতেন	—
প্রঃ—(১)	করিত	হইত	—
—(২)	করিতেন	হইতেন	—

পুরাঘটিত অতীত

উঃ—	করিয়াছিলাম	হইয়াছিলাম	—
মঃ—(১)	করিয়াছিলে	হইয়াছিলে	—
—(২)	করিয়াছিলি	হইয়াছিলি	—
—(৩)	করিয়াছিলেন	হইয়াছিলেন	—
প্রঃ—(১)	করিয়াছিল	হইয়াছিল	—
—(২)	করিয়াছিলেন	হইয়াছিলেন	—

সাধারণ ভবিষ্যৎ

	√কর্	√হ	√আছ্
উঃ—	করিব	হইব	—
মঃ—(১)	করিবে	হইবে	—
—(২)	করিবি	হইবি	—
—(৩)	করিবেন	হইবেন	—
প্রঃ—(১)	করিবে	হইবে	—
—(২)	করিবেন	হইবেন	—

ঘটমান ভবিষ্যৎ

উঃ—	করিতে থাকিব	হইতে থাকিব	—
মঃ—(১)	করিতে থাকিবে	হইতে থাকিবে	—
—(২)	করিতে থাকিবি	হইতে থাকিবি	—
—(৩)	করিতে থাকিবেন	হইতে থাকিবেন	—
প্রঃ—(১)	করিতে থাকিবে	হইতে থাকিবে	—
—(২)	করিতে থাকিবেন	হইতে থাকিবেন	—

সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ

উঃ—	করিয়া থাকিব	হইয়া থাকিব	—
মঃ—(১)	করিয়া থাকিবে	হইয়া থাকিবে	—
—(২)	করিয়া থাকিবি	হইয়া থাকিবি	—
—(৩)	করিয়া থাকিবেন	হইয়া থাকিবেন	—
প্রঃ—(১)	করিয়া থাকিবে	হইয়া থাকিবে	—
—(২)	করিয়া থাকিবেন	হইয়া থাকিবেন	—

অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

উঃ—	(যেন) করি	(যেন) হই	—
মঃ—(১)	করিও	হইও	—
—(২)	করিস্	হইস্ (হ'স্)	—
—(৩)	(যেন) করিবেন	(যেন) হয়েন	—
প্রঃ—(১)	(যেন) করে	(যেন) হয়	—
—(২)	(যেন) করেন	(যেন) হয়েন (হ'ন)	—

আভ্যাসিক বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান

	√কর্	√হ	√আছ্
উঃ—	করিয়া থাকি	হইয়া থাকি	—
মঃ—(১)	করিয়া থাক	হইয়া থাক	—
—(২)	করিয়া থাকিস্	হইয়া থাকিস্	—
—(৩)	করিয়া থাকেন	হইয়া থাকেন	—
প্রঃ—(১)	করিয়া থাকে	হইয়া থাকে	—
—(২)	করিয়া থাকেন	হইয়া থাকেন	—

প্রবাহাত্মক বর্তমান

উঃ—	করিতে থাকি	হইতে থাকি	—
মঃ—(১)	করিতে থাক	হইতে থাক	—
—(২)	করিতে থাকিস্	হইতে থাকিস্	—
—(৩)	করিতে থাকেন	হইতে থাকেন	—
প্রঃ—(১)	করিতে থাকে	হইতে থাকে	—
—(২)	করিতে থাকেন	হইতে থাকেন	—

ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত

উঃ—	করিতে থাকিতাম	হইতে থাকিতাম	—
মঃ—(১)	করিতে থাকিতে	হইতে থাকিতে	—
—(২)	করিতে থাকিতি [স্]	হইতে থাকিতি [স্]	—
—(৩)	করিতে থাকিতেন	হইতে থাকিতেন	—
প্রঃ—(১)	করিতে থাকিত	হইতে থাকিত	—
—(২)	করিতে থাকিতেন	হইতে থাকিতেন	—

পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত

উঃ—	করিয়া থাকিতাম	হইয়া থাকিতাম	—
মঃ—(১)	করিয়া থাকিতে	হইয়া থাকিতে	—
—(২)	করিয়া থাকিতি [স্]	হইয়া থাকিতি [স্]	—
—(৩)	করিয়া থাকিতেন	হইয়া থাকিতেন	—
প্রঃ—(১)	করিয়া থাকিত	হইয়া থাকিত	—
—(২)	করিয়া থাকিতেন	হইয়া থাকিতেন	—

ক্রিয়ারূপাদর্শ (চলিত)

নিত্য বর্তমান

	√কর্	√হ	√আছ্
উঃ—	করি	হই	আছি
মঃ—(১)	কর (রো)	হও	আছ
—(২)	করিস্	হ'স্	আছিস্
—(৩)	করেন	হ'ন	আছেন
প্রঃ—(১)	করে	হয়	আছে
—(২)	করেন	হ'ন	আছেন

ঘটমান বর্তমান

উঃ—	*কর্‌ছি	হচ্ছি	—
মঃ—(১)	কর্‌ছ	হচ্ছ	—
—(২)	কর্‌ছিস্‌	হচ্ছিস্‌	—
—(৩)	কর্‌ছেন	হচ্ছেন	—
প্রঃ—(১)	কর্‌ছে	হচ্ছে	—
—(২)	কর্‌ছেন	হচ্ছেন	—

চলিত বাংলায় 'র'-এর লোপপ্রবণতার ফলে 'যাচ্ছি', 'কচ্ছেন' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

পুরাঘটিত বর্তমান

উঃ—	করেছি	হয়েছি	—
মঃ—(১)	করেছ	হয়েছ	—
—(২)	করেছিস্‌	হয়েছিস্‌	—
—(৩)	করেছেন	হয়েছেন	—
প্রঃ—(১)	করেছে	হয়েছে	—
—(২)	করেছেন	হয়েছেন	—

অনুজ্ঞা বর্তমান

উঃ—	করি	হই	—
মঃ—(১)	করো	হও	—
—(২)	কর্‌	হ	—
—(৩)	করুন	হ'ন	—
প্রঃ—(১)	করুক	হ'ক	—
—(২)	করুন	হ'ন	—

সাধারণ অতীত

	√কর্	√হ	√আছ্
উঃ—	কর্‌লাম	হ'লাম	ছিলাম
মঃ—(১)	কর্‌লে	হ'লে	ছিলে
—(২)	কর্‌লি	হ'লি	ছিলি
—(৩)	কর্‌লেন	হ'লেন	ছিলেন
প্রঃ—(১)	কর্‌ল	হ'ল	ছিল
—(২)	কর্‌লেন	হ'লেন	ছিলেন

ঘটমান অতীত

উঃ—	কর্‌ছিলাম *	হচ্ছিলাম	—
মঃ—(১)	কর্‌ছিলে	হচ্ছিলে	—
—(২)	কর্‌ছিলি	হচ্ছিলি	—
—(৩)	কর্‌ছিলেন	হচ্ছিলেন	—
প্রঃ—(১)	কর্‌ছিল	হচ্ছিল	—
—(২)	কর্‌ছিলেন	হচ্ছিলেন	—

১। 'কচ্ছিলাম', কচ্ছিলে' প্রভৃতি পদেরও প্রয়োগ রহিয়াছে।

নিত্যবৃত্ত অতীত

উঃ— †	কর্‌তাম	হ'তাম	—
মঃ—(১)	কর্‌তে	হ'তে	—
—(২)	কর্‌তি [স্]	হ'তি [স]	—
—(৩)	কর্‌তেন	হ'তেন	—
প্রঃ—(১)	কর্‌ত	হ'ত	—
—(২)	কর্‌তেন	হ'তেন	—

২। 'ক'ত্তাম', 'ক'ত্তে' প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

পুরাঘটিত অতীত

উঃ—	ক'রেছিলাম	হ'য়েছিলাম	—
মঃ—(১)	ক'রেছিলে	হ'য়েছিলে	—
—(২)	ক'রেছিলি	হ'য়েছিলি	—
—(৩)	ক'রেছিলেন	হ'য়েছিলেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রেছিল	হ'য়েছিল	—
—(২)	ক'রেছিলেন	হ'য়েছিলেন	—

সাধারণ ভবিষ্যৎ

	√কর্‌	√হ	√আছ্‌
উঃ—	কর্‌ব	হব	—
মঃ—(১)	কর্‌বে	হবে	—
—(২)	কর্‌বি	হবি	—
—(৩)	কর্‌বেন	হবেন	—
প্রঃ—(১)	কর্‌বে	হবে	—
—(২)	কর্‌বেন	হবেন	—

ঘটমান ভবিষ্যৎ

উঃ—	কর্‌তে থাক্‌ব	হ'তে থাক্‌ব	—
মঃ—(১)	কর্‌তে থাক্‌বে	হ'তে থাক্‌বে	—
—(২)	কর্‌তে থাক্‌বি	হ'তে থাক্‌বি	—
—(৩)	কর্‌তে থাক্‌বেন	হ'তে থাক্‌বেন	—
প্রঃ—(১)	কর্‌তে থাক্‌বে	হ'তে থাক্‌বে	—
—(২)	কর্‌তে থাক্‌বেন	হ'তে থাক্‌বেন	—

সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ

উঃ—	ক'রে থাক্‌ব	হ'য়ে থাক্‌ব	—
মঃ—(১)	ক'রে থাক্‌বে	হ'য়ে থাক্‌বে	—
—(২)	ক'রে থাক্‌বি	হ'য়ে থাক্‌বি	—
—(৩)	ক'রে থাক্‌বেন	হ'য়ে থাক্‌বেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রে থাক্‌বে	হ'য়ে থাক্‌বে	—
—(২)	ক'রে থাক্‌বেন	হ'য়ে থাক্‌বেন	—

অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

উঃ—	(যেন) করি	(যেন) হই	—
মঃ—(১)	ক'রো	হ'য়ো	—
—(২)	করিস	হ'স্‌	—
—(৩)	(যেন) ক'রেন	(যেন) হ'ন	—
প্রঃ—(১)	(যেন) করে	(যেন) হয়	—
—(২)	(যেন) করেন	(যেন) হ'ন	—

আভ্যাসিক বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান

	√কর্‌	√হ	√আছ্‌
উঃ—	ক'রে থাকি	হ'য়ে থাকি	—
মঃ—(১)	ক'রে থাক	হ'য়ে থাকে	—
—(২)	ক'রে থাকিস্‌	হ'য়ে থাকিস্‌	—
—(৩)	ক'রে থাকেন	হ'য়ে থাকেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রে থাকে	হ'য়ে থাকে	—
—(২)	ক'রে থাকেন	হ'য়ে থাকেন	—

প্রবাহাত্মক বর্ত্তমান

উঃ—	ক'রতে থাকি	হ'তে থাকি	—
মঃ—(১)	ক'রতে থাক	হ'তে থাক	—
—(২)	ক'রতে থাকিস্‌	হ'তে থাকিস্‌	—
—(৩)	ক'রতে থাকেন	হ'তে থাকেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রতে থাকে	হ'তে থাকে	—
—(২)	ক'রতে থাকেন	হ'তে থাকেন	—

ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত

উঃ—	ক'রতে থাক্‌তাম	হ'তে থাক্‌তাম	—
মঃ—(১)	ক'রতে থাক্‌তে	হ'তে থাক্‌তে	—
—(২)	ক'রতে থাক্‌তি [স]	হ'তে থাক্‌তি [স]	—
—(৩)	ক'রতে থাক্‌তেন	হ'তে থাক্‌তেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রতে থাক্‌ত	হ'তে থাক্‌ত	—
—(২)	ক'রতে থাক্‌তেন	হ'তে থাক্‌তেন	—

পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত

উঃ —	ক'রে থাক্‌তাম	হ'য়ে থাক্‌তাম	—
মঃ—(১)	ক'রে থাক্‌তে	হ'য়ে থাক্‌তে	—
—(২)	ক'রে থাক্‌তি [স্‌]	হ'য়ে থাক্‌তি [স্‌]	—
—(৩)	ক'রে থাক্‌তেন	হ'য়ে থাক্‌তেন	—
প্রঃ—(১)	ক'রে থাক্‌ত	হ'য়ে থাক্‌ত	—
—(২)	ক'রে থাক্‌তেন	হ'য়ে থাক্‌তেন	—

ধাতুর গণ-বিভাগ

সংস্কৃতে ক্রিয়ারূপের বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া ধাতুগুলিকে ১০টি শ্রেণীতে বা গণে বিভক্ত করা হইয়াছে। ধাতু হইতে ক্রিয়ারূপ-গঠনে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য জানিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে বলিয়া গণবিভাগের সার্থকতা রহিয়াছে।

কিন্তু সাধু বাংলায় সকল ধাতুর সহিত কেবল ধাতুবিভক্তি যুক্ত হইলেই ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায় বলিয়া গণবিভাগের সার্থকতা নাই।

এই ব্যাপারে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"চলতি ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতির ফলে ধাতুরূপে যে পরিবর্তন, তাহারই বিচারে ধাতুগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাম দেওয়া হইয়াছে গণ।* এগুলিকে গণ না বলিয়া শ্রেণী বলাই ভাল; কারণ গণলক্ষণ বাংলায় নাই।

মোটামুটি সূক্ষ্মবিভাগের দিকে দৃষ্টি না দিয়া শ্রেণী (গণ) সংখ্যা সাত বলা যাইতে পারে।

(১) ধাতুর স্বরধ্বনি অ—হ, কর্ ইত্যাদি।

(২) ধাতুর স্বরধ্বনি আ—খা, কাঁদ্ ইত্যাদি। প্রেরণার্থক চাল্, সার্ (চল্, সর্ হইতে) ইত্যাদি।

(৩) স্বরধ্বনি ই, ঈ,—পি, জী (পদ্যে), গিল্, শিখ্, লিখ্ ইত্যাদি।

(৪) ধাতুর স্বরধ্বনি এ—দে, নে, খেল্, ফেল্ ইত্যাদি। প্রেরণার্থক খেলা, ফেলা ইত্যাদি।

(৫) ধাতুর স্বরধ্বনি উ—শু, ঘুচ্, ছুট্, শুন্, উঠ্ ইত্যাদি। প্রেরণার্থক শুনা, উঠা ইত্যাদি।

(৬) ধাতুর স্বরধ্বনি ও—ধো, শো, ছোঁ ইত্যাদি।

(৭) নামধাতু ও প্রেরণার্থক ধাতু (সাধারণতঃ একাধিক স্বরব্যঞ্জনবিশিষ্ট)।

---

* ৺রাজশেখর বসু মহাশয় ধাতুর ২০টি গণ স্থির করিয়াছেন (১) হ-আদি, (২) খা-আদি, (৩) দি-আদি, (৪) শু-আদি, (৫) কর্-আদি, (৬) কহ্-আদি (৭) কাট্-আদি, (৮) গাহ আদি, (৯) লিখ্-আদি, (১০) উঠ্-আদি, (১১) লাফা-আদি, (১২) নাহা-আদি, (১৩) ফিরা-আদি, (১৪) ঘুরা-আদি, (১৫) ধোয়া-আদি, (১৬) দৌড়া-আদি, (১৭) চট্‌কা-আদি, (১৮) বিগ্‌ড়া-আদি, (১৯) উল্‌টা-আদি, (২০) ছোবলা-আদি।

অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতু

বাঙ্‌লায় এমন কতকগুলি ধাতু আছে, যাহাদের সমস্ত কালের ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায় না; অন্য সমার্থক ধাতুর ক্রিয়ারূপ দ্বারা উহাদের শূন্য ভাণ্ডার ভরিয়া দিতে হয়। এই সকল ধাতুকে অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতু বলে। যেমন—

√আছ্ √থাক্ দ্বারা ইহার অভাব মিটাইতে হয় অর্থাৎ √আছ্-এর ঘটমান বর্তমানের রূপ আবশ্যক হইলে √থাক-এর ঐ কালের রূপ থাকিতেছি, থাকিতেছে প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। অবশ্য একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই √থাক-এর অর্থ ইংরেজীর 'to be' বা to 'exist'-এর অনুরূপ। √থাক্-এর অর্থে ইংরেজী to stay; ইহা সংস্কৃত বস্ বা স্থা-এর অনুরূপ হইলে √থাক্ সম্পূর্ণ ও মুখ্য ধাতু। Verb 'to be' এর অর্থে √থাক সহায়ক (Auxiliary) ধাতু।

√যা ও √গ [√গম্ হইতে জাত]—ইহারা বাঙ্‌লায় পরস্পরের পরিপূরক অসম্পূর্ণ ধাতু; যেমন—নিত্য বর্তমানে—যাই, যাও, যায় ইত্যাদি; কিন্তু সাধারণ অতীতে—গেলাম, গেলে, গেল ইত্যাদি। পুরাঘটিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ-এর গমনার্থক ক্রিয়ারূপেও √গ ব্যবহৃত হয়।

√আ [সংস্কৃত 'আ-√যা' হইতে] ও √আস্ [বা √আইস্ সংস্কৃত 'আ-√বিশ্' হইতে]—ইহারাও পরস্পরের পরিপূরক পঙ্গু ধাতু। অবশ্য সাধু বাঙ্‌লায় আ-√যা-এর প্রয়োগ কম; অনুজ্ঞা বর্তমানে মধ্যমপুরুষে তুচ্ছার্থে 'আয়' ব্যবহৃত হয়; আইল, আইনু (কবিতায়), এলাম, এলে (চলিত বাংলায়) প্রভৃতি পদ। আ-√যা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই মনে হয়। √আস্ [আ-√বিশ্] হইতে 'স্'-লোপে উৎপন্নও বলা যাইতে পারে।

√বট্—মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতায় √বট্-জাত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। বাংলাদেশের অঞ্চল-বিশেষে কথ্যভাষায় অদ্যাপি ইহার ব্যবহার শ্রুত হয়।

"একা দেখি কুলবধূ, কে বট [=হও] আপনি?" হোথায় কে বটে [=হয় বা আছে] ?—ভারতচন্দ্র

নঞর্থক √নহ্—√হ [হওয়া-অর্থে]-এর পূর্বে নঞর্থক ['না'-বাচক] ন এর

যোগে *√নহ্ [চলিত ভাষায় √ন] উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল নিত্য বর্তমান কালেই ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। যথা—

	সাধু	চলিত
উঃ পুঃ—	নহি	নই
মঃ পুঃ—(১)	নহ	নও
—(২)	নহিস্	ন'স্
—(৩)	নহেন	ন'ন
প্রঃ পুঃ—(১)	নহে	নয়
—(২)	নহেন	ন'ন

অসমাপিকা—নহিলে, নইলে [মাত্র ইলে-প্রত্যয়ান্ত]।

---

* এই 'নহ্'-ধাতুর সহিত নাহি অব্যয়টিকে এক করিয়া ফেলিলে ভুল হইবে। প্রাচীন ভাষায় এই 'নাহি'-র সহিত স্বার্থে 'ক'-প্রত্যয় যুক্ত 'নাহিক'-পদেরও ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক বাংলায় 'নাহি'-র স্থলে নাই ব্যবহৃত হয়, ইহার চলিত রূপ নেই ও নি। সংস্কৃত অব্যয় 'ন [ইংরেজী 'not'] এর স্থলে বাংলায় না প্রযুক্ত হয়। নাই এবং না-এর প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

পুরাঘটিত বর্তমানে 'ক্রিয়ার অস্বীকৃতি' বুঝাইতে নিত্য বর্তমানের ক্রিয়ারূপের সহিত নাই ব্যবহৃত হয়। যথা—আমি 'করি' নাই। [চলিতে—নি], তুমি 'দেখ' নাই [চলিতে—নি]; সে 'যায়' নাই [চলিতে—নি] ইত্যাদি। 'আমি করিয়াছি না, তুমি দেখিয়াছ না, সে গিয়াছে না' ইত্যাদি হয় না।

অন্যান্য কালে 'ক্রিয়ার অস্বীকৃতি' বুঝাইতে সেই সেই কালের ক্রিয়ারূপের সহিত না ব্যবহার করিতে হয়। যথা—আমি যাই না [চলিতে—যাইনে]। সে গেল না। তুমি খেলিবে না ইত্যাদি।

নিত্য বর্তমানে প্রথম পুরুষে 'অবিদ্যমানতা'-অর্থে √আছ্-জাত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয় না; কেবল নাই-দ্বারাই কাজ চলে। যথা—সে এখানে নাই [চলিতে—নেই]। "দেবতা নাই ঘরে"—রবীন্দ্রনাথ।

'ক্রিয়ার অস্বীকৃতি' বুঝাইতে না-এর সহিত √পার্-এর যোগে গঠিত √নার্-এর ক্রিয়ারূপও (বাঙ্লা-কবিতায় ও অঞ্চল-বিশেষের কথ্যভাষায়) দেখা যায়। 'যারে দেখ্তে নারি [= না পারি] তার চলন বাঁকা'—প্রবচন। "নারিলি [=না

পারিনি] হরিতে মণি"—মধুসূদন। কেবল নিত্য বর্তমান, সাধারণ ও নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সাধারণ ভবিষ্যতে √নার্‌-এর ক্রিয়ারূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাও একটি **অসম্পূর্ণ** ধাতু।

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ

অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্‌লায় **-ইয়া,-ইলে** ও **-ইতে**-প্রত্যয়ের যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয় এবং **ক্রিয়া** হইলেও ইহারা সময়ে সময়ে **বিশেষ্য, বিশেষণ** [**ক্রিয়া-বিশেষণ**]-এর কাজও করিয়া থাকে—ইহাও বলা হইয়াছে।

এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, **কাল**-ভেদে বা **পুরুষ**-ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপের **কোন পরিবর্তন হয় না**।*

---

*সংস্কৃতে অব্যয়ের সংজ্ঞার সহিত ক্ত্বাচ্‌, ল্যপ্‌, তুমুন্‌ ও নমুল্‌ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত পদসমূহের ঐক্য লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকেও অব্যয় বলা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্‌লায় উহাদিগকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলাই সঙ্গত (সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া দ্রষ্টব্য)।

আমরা **পড়িতে** যাই; তোমরা **পড়িতে** যাও; তাহারা **পড়িতে** যায়। আমরা **খাইয়া** ঘুমাইলাম; তোমরা **খাইয়া** ঘুমাইলে; তাহারা **খাইয়া** ঘুমাইল। আমি, তুমি বা সে এক ঘণ্টা পরে **গেলে** ভাল হয় ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বদা সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত উহার এককর্তৃকতা থাকে না অর্থাৎ **কখনও কখনও একই বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কর্তা থাকে। এইরূপ অসমাপিকা ক্রিয়াকে অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা—"লঘু বৃষ্টি **হইলে** কুঁড়েতে আইসে বান"—কবিকঙ্কন।

['হইলে'র কর্তা 'বৃষ্টি' এবং 'আইসে'-র কর্তা 'বান']।

"সত্যমূল্য না **দিয়েই** সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়"—রবীন্দ্রনাথ। "কাল বিগুণ **হইলে** সবই লোপ পায়"—বঙ্কিমচন্দ্র। "বলিতে **বলিতে** ঝড় উঠিল"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাক্যস্থিত অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন হইলে সেই

অসমাপিকা ক্রিয়াকে কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল 'লভিনু' হায়"—মধুসূদন। [উভয় ক্রিয়ারই কর্তা 'আমি উহ্য']। "কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদছায়া তব 'লভিয়াছে' অমরতা"—নবীনচন্দ্র। "হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে 'নমি' নরদেবতারে"—রবীন্দ্রনাথ।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগরীতি

-ইয়া—এই প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়ার (১) পূর্বকালীন অথবা (২) 'পূর্বকালীন' অথবা 'সমকালীন' ক্রিয়ানুষ্ঠান বুঝাইয়া থাকে। যথা—

(১) "পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে 'ব'সলেন'—অবনীন্দ্রনাথ (আগে গেলেন, পরে ব'সলেন)।

"তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন" —রবীন্দ্রনাথ (আগে ডাকিলেন, পরে বলিলেন)

(২) "পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া ; টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে 'লাগিলেন'"—রবীন্দ্রনাথ। (ছাড়া, নাড়া, লাগা—সমকালীন ক্রিয়া)। অনুরূপ—"অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে"—কবিশেখর। "দেউলে দেউলে কাঁদিয়া 'ফিরি' গো দুলালে আগলি বক্ষে"—করুণানিধান।

দ্রষ্টব্য— -ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি সমাপিকা ক্রিয়াকে বিশেষিত করিয়া দেয়। 'তাড়'তা'ড়ি গিয়ে' 'ব'সলেন'-এর কালবাচক বিশেষণ। ক্রিয়ারূপে ডাকিয়া, ছাড়িয়া, নাড়িয়া সকর্মক ; যথাক্রমে 'ভাগিনাকে', 'গলা' ও 'টিকি' উহাদের কর্ম। কিন্তু কর্মসহ উহারা ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ (Adverbial phrase—অধ্যাপক সুনীতিকুমার)। -ইয়া-প্রত্যয়ান্ত যে অসমাপিকা ক্রিয়াকে ক্রিয়াবাচক নাম-বিশেষণ বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ইংরেজীর রীতি অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন। ইংরেজীতে Participle Verb Adjective, কিন্তু বাংলায় ক্রিয়া অসমাপিকা হইলেও তাহাকে কর্তার বিশেষণ না বলাই সঙ্গত মনে হয়। কর্তা ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা, ক্রিয়াপদ যাহাকে বলিব, তাহাকে কর্তার বিশেষণ বলি কি করিয়া? উহাকে সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ বলাই সমীচীন মনে হয়।

-ইলে—এই প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ দ্বারা (১) 'সম্ভাবনা' অথবা (২) সমাপিকা ক্রিয়ার 'পূর্বকালীনতা' বুঝাইয়া থাকে। ইহা কর্তৃনিষ্ঠ বা অন্যাশ্রয়ী দুই-ই হইতে পারে।

(১) "বৃষ্টি **হইলে** কুঁড়্যায় ভাসিয়া যায় বান।" [হইলে=যদি হয়, তবে; অন্যাশ্রয়ী।]—মুকুন্দরাম। "অন্তর **মিশালে** তবে তার অন্তরের পরিচয়।" [মিশালে=মিশাইলে=যদি মিশান হয়, তবে; কর্তৃনিষ্ঠ।]—রবীন্দ্রনাথ।

(২) "ধ্যানভঙ্গ **হইলে** [=হইবার পর; অন্যাশ্রয়ী] গঙ্গাধরস্বামী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র। "এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব **করিলে** [=করিবার পর; অন্যাশ্রয়ী] আমায় সংবাদ দিবে।"—বিদ্যাসাগর।

লক্ষণীয়—পদপরিচয়ে [Parsing] কর্তা-কর্ম-সহ -**ইলে**-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অবচ্ছি বাক্যাংশ পরবর্তী **সমাপিকা ক্রিয়ার** বিশেষণরূপে গণ্য হইবে।

-ইতে—এই প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদে (১) 'নিমিত্ত', (২) 'উক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য', (৩) সমাপিকা ক্রিয়ার 'সমকালীনতা' বা (৪) 'পূর্বকালীনতা' বুঝাইয়া থাকে।

(১) "ইচ্ছা **সাজাইতে** [=সাজাইবার নিমিত্ত] বিবিধ ভূষণে ভাষা।"—মাইকেল। "ধাইছে উধাও **গ্রাসিতে** [=গ্রাস করিবার নিমিত্ত] মিহিরে।"—মোহিতলাল।

(২) "**হানিতে** [=হানা, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, (Verb-noun) পরবর্তী 'লাগিল' ক্রিয়ার কর্ম; আবার সকর্মক ক্রিয়া 'প্রশ্নবাণ' উহার কর্ম] লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ।"—কবিশেখর। "**জীয়াতে** চাহিনা তনয়ে আমার।"—করুণানিধান।

(৩) "**যাইতে যাইতে** মহর্ষি কহিতে লাগিলেন।" ['যাওয়া' ও 'কহা' সমকালীন ক্রিয়া।]—বিদ্যাসাগর। "সুখে **থাকতে** ভূতে কিলোয়।" ['থাকা' ও 'কিলান' সমকালীন ক্রিয়া]—প্রবচন।

(৪) সভাপতি সভায় **আসিতেই** [=আসার পরক্ষণেই] সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুর্ভিক্ষ দেখা **দিতে** [=দিবার পর] লোকেরা গ্রাম ছাড়িতে লাগিল।

লক্ষণীয়—'-ইতে'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াও **কর্তৃনিষ্ঠ** বা **অন্যাশ্রয়ী** হইতে পারে। (১) ও (২)-এর অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি কর্তৃনিষ্ঠ; কিন্তু (৩)-এর **থাক্‌তে**, (৪)-এর **আসিতে, দিতে** অন্যাশ্রয়ী।

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি দ্বারা সময়ে সময়ে সমাপিকা ক্রিয়ার 'পরকালীনতা' সূচিত হয়। "তোরা কে কে 'যাবি' লো জল আন্‌তে" [=আনিবার নিমিত্ত]—এখানে আগে 'যাওয়া'

পরে 'আনা' বুঝায়। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে সবিশেষ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। 'আমি মাহিনা **পাইলে** তোমার টাকা দিব।' [পাইলে=যদি বা যখন পাই তবে বা তখন]। 'আমি মাহিনা **পাইয়া** ......'—এখানে **পাইয়া**=পাইবার পর; অতএব সমাপিকা ক্রিয়ার 'পূর্বকালীনতা' বুঝাইতেছে। "আমি মাহিনা **পাইতেই** তোমার টাকা দিব।'—অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া প্রায় সমকালীন।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

(Participles)

(ক) **বর্তমান-কালিক**—সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয়ান্ত ও শানচ্-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদের মত এবং কখনও কখনও তাহাদেরই স্থানে বাঙ্‌লাতে **-অন্ত-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ** ব্যবহৃত হয়। যথা—**জ্বলন্ত** আগুন ['জ্বলদগ্নির'র স্থানে]; **বাড়ন্ত** গাছ ['বর্ধমান বৃক্ষ'-এর স্থানে]; **ফুটন্ত** ফুল ['ফুটিতেছে এমন' অর্থে 'ফুটৎ'-এর স্থানে]; **চলন্ত** গাড়ি। অনুরূপ—**ডুবন্ত, ভাসন্ত, ছুটন্ত, জীবন্ত** [>জীয়ন্ত>জ্যান্ত], **অফুরন্ত** ইত্যাদি।

(খ) তৎসম ক্রিয়াবাচক বিশেষণেও (১) বর্তমান কালিক ও (২) ভূতকালিক বিভাগ রহিয়াছে। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর **-শতৃ** ও **শানচ্**-প্রত্যয়-যোগে বর্তমান-কালিক এবং **-ক্ত**-প্রত্যয়-যোগে ভূতকালিক বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন—**জীবৎ-কাল** (√জীব্+শতৃ); **বিদ্যমান** [√বিদ্+শানচ্]; **বর্তমান** [√বৃৎ+শানচ্]; **গত** [√গম্+ক্ত]; **মৃত** [√মৃ+ক্ত] ইত্যাদি।

(গ) **ভূতকালিক**—বাংলা সিদ্ধ ধাতুর সহিত **-আ**-প্রত্যয় এবং সাধিত ধাতুর উত্তর **-আন** [বা **আনো**], **-আনিয়া** [>-আন্যা >-আনী]-প্রত্যয়ের যোগেও **ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ** গঠিত হয়। যথা—'তোর **বাড়া** [√বাড্+আ] ভাতে পড়ুক ছাই।' **শোনা** [√শুন্+আ] কথায় কান দিও না। হাতে-**গড়া** পুতুল; আধ-**মরা** পাখী; ঘা-**খাওয়া** [√খা+(ব-শ্রুতি) আ] ইত্যাদি।

(ঘ) **উভকালিক** [বর্তমান ও ভূত]—**জমানো** [√জমা=√জম্+আ প্রযোজক ধাতু)+আনো] টাকা; **হারানো** [√হারা+আনো] ছেলে; ছেলে-**ভুলানো** ছড়া; ঘুম-**পাড়ানিয়া** [< -পাড়ান্যা < -পাড়ানী] গান; 'ঘুম-**ভাঙানিয়া**; 'দুখ-

জাগানিয়া'—রবীন্দ্রনাথ। **কাঁদুনে-কাঁদাইন্যা-কাঁদানিয়া** [√কাঁদা (√কাঁদ্+আ)+আনিয়া] গ্যাস ইত্যাদি।

(ঙ) **-ইতে, -ইলে** ও **-ইয়া**-প্রত্যয়ের যোগে গঠিত *অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহারের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

* আচার্য সুনীতিকুমার-এর **ক্রিয়াবাচক নাম-বিশেষণ** এবং আচার্য শ্যামাপদর **ক্রিয়াবাচক অব্যয়** মানিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। বালকটি উর্ধ্ববাহু **হইয়া** নাচিতেছে—বাক্যে **হইয়াকে নাম-বিশেষণ** বলিতে পারিব না। সংস্কৃত 'ভূত্বা' অব্যয়; বাঙ্‌লার **হইয়া** 'নাচিতেছে' ক্রিয়ার বিশেষণ। তাহাকে **আসিতে** বল—বাক্যে **আসিতে**-কেও **ক্রিয়াবাচক অব্যয়** বলিব না; বাঙলায় উহাকে **নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া** বলাই আমাদের মতে সমীচীন।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
(Verb-Nouns)

ক্রিয়ার নামমাত্র বুঝাইবার জন্য ধাতুর সহিত কয়েকটি প্রত্যয়ের যোগে যে-সকল বিশেষ্যপদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে।

(ক) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌, অল্‌, অনট্‌, ক্তি প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে **তৎসম ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** গঠিত হয়। যথা—**ভাব** [√ভূ+ঘঞ্‌], **পাঠ** [√পঠ্‌+ঘঞ্‌], **জয়** [√জি+অল্‌], **ক্ষয়** [√ক্ষি+অল্‌], **গমন** [√গম্‌+অনট্‌], **শ্রবণ** [√শ্রু+অনট্‌], **গতি** [√গম্‌+ক্তি], **স্মৃতি** [√স্মৃ+ক্তি] ইত্যাদি।

(খ) বাংলা সিদ্ধ ধাতুর সহিত-আ, -ই, -অন, -না, -উনি, -তি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত করিয়া **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** গঠন করা হয়। যথা—**লেখা** [√লিখ্‌+আ]; **পড়া** [√পড়্‌+আ], **চলা** [√চল্‌+আ]; **হাসি** [√হাস্‌+ই], **খাই** [খা+ই ; ওর **খাই** সহজে মিটবে না]; **চলন** [√চল্‌+অন], **নাচন** [√নাচ্‌+অন]; **কান্না** [√কাঁদ্‌+না], **রান্না** [√রাঁধ্‌+না]; **জ্বলুনি** [জ্বল্‌+উনি], **গাঁথুনি** [√গাঁথ্‌+উনি]; **কাটতি** [√কাট্‌+তি], **বাড়তি** [√বাড়্‌+তি] ইত্যাদি।

(গ) বাংলা সাধিত ধাতুর সহিত -আন [-আনো], -আনি-প্রত্যয়ের যোগে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** গঠিত হয়। যথা—**নাচান** বা **নাচানো** [√নাচা+আন বা আনো], **দেখান** বা **দেখানো** [√দেখা+আন বা আনো]; **ধমকানি** [√ধমকা+আনি], **শুনানি** [√শুনা+আনি] ইত্যাদি।

(ঘ) বাংলা ধাতুর সহিত -ইবা-প্রত্যয় যুক্ত করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য প্রস্তুত করা হয়। -ইবা-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য কেবল ষষ্ঠী বিভক্তিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং কখনও কখনও মাত্র শব্দটির পূর্বে বসিয়া নিত্যসমাসবদ্ধ পদ গঠন করে। যথা—**খাইবার** [√খা+ইবা+ষষ্ঠী] জন্য; **মরিবার** [√মর্+ইবা+ষষ্ঠী] তরে; **যাইবা**-মাত্র, **আসিবা**-মাত্র ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ক্রিয়া, ক্রিয়াপদ ও ধাতুতে প্রভেদ কি? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

২। ধাতু কত প্রকারের ও কি কি? প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। সংজ্ঞা নির্ণয় কর ও উদাহরণ দাও—প্রযোজক ক্রিয়া; প্রযোজ্য কর্তা, নামধাতু; যৌগিক ক্রিয়া; পঙ্গুধাতু; সাধিত ধাতু; পুরাঘটিত বর্তমান, ঐতিহাসিক বর্তমান; নিত্যবৃত্ত অতীত, ভূতসামীপ্যে বর্তমান, সন্দিগ্ধভূতার্থক ভবিষ্যৎ; ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমান; প্রবাহাত্মক বর্তমান; সহায়ক ধাতু; অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা ক্রিয়া; কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া; ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত; আভ্যাসিক বর্তমান; ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া।

৪। উপযুক্ত উদাহরণসহ পার্থক্য বুঝাইয়া দাও—

সিদ্ধ ও সাধিত ধাতু; মৌলিক ও যৌগিক ক্রিয়া; প্রযোজ্য কর্তা ও প্রযোজক কর্তা; সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া; সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া; সহায়ক ও মুখ্য ক্রিয়া, নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া; মৌলিক ও যৌগিক কাল।

৫। ক্রিয়ার প্রকার কাহাকে বলে? প্রকার কয়টি ও কি কি? প্রত্যেকের উদাহরণ দাও।

৬। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কাহাকে বলে? ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কিভাবে গঠিত হয়?

৭। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির ক্রিয়ারূপ রচনা কর—

√দে, √পা, √শুন্, √দেখ্, √কহ্, √শো।

৮। মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর—

"**নাচ্‌তে** না **জান্‌লে** উঠান বাঁকা।" 'কোথা হ'তে **এলি** তুই **মরিবার** তরে।" "তরুতল

নাহি মোর করিতে পসরা।” “পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।” “কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ।” “ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।” “তার রান্না খেলে কান্না পায়।” “যমালয়ে জীবন্ত মানুষ।” “ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়।” “মাইনে পেলে ধার শুধ্‌ব।” মাইনে পেয়ে ধার শুধ্‌ব।” “ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে।” “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।” “পিখানে ঝন্‌ঝনিল অসি।” “অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।” ‘সেদিন আর নাই।” “ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী। একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।” “কহিতাম কত কথা।” “আমি খেতে থাকি, তুই দিতে থাক্‌।”

অব্যয়ের শ্রেণী-বিভাগ ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য

পদ-প্রকরণে অব্যয়ের সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। ইংরেজী Preposition, Conjunction ও Interjection-এর কাজ বাংলায় এক অব্যয় দ্বারাই চলে। মুখ্যতঃ অব্যয় দ্বিধা বিভাজ্য—(১) সমন্বয়ী এবং (২) অনন্বয়ী।

(১) সমন্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদ দ্বারা দুইটি পদ বা দুইটি বাক্যের অন্বয় বা সংযোগ বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহাকে সমন্বয়ী অব্যয় বলে। যথা—রাম এবং শ্যাম; বৃত্রাসুর ও রুদ্রাপীড; “এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি।” “সেই অভিমান থাকে যদি মনে বৈষ্ণব মোরা নই।” ইত্যাদি। কাজেই সমন্বয়ী অব্যয়ও দুইভাগে বিভক্ত—(ক) পদান্বয়ী এবং (খ) বাক্যান্বয়ী। পূর্বের উদাহরণগুলিতে এবং, ও দুইটি পদের সংযোগ সাধন করিয়াছে বলিয়া পদান্বয়ী অব্যয়; আর তথাপি, যদি বাক্যান্বয়ী অব্যয়। কারণ উহাদের দ্বারা দুইটি বাক্য অন্বিত হইয়াছে। বাক্যান্বয়ী অব্যয়কেও দুইভাগে ভাগ করা চলে—(/০) সাপেক্ষ বাক্যান্বয়ী ও (৵০) নিরপেক্ষ বাক্যান্বয়ী।

যখন দুইটি অব্যয় এরূপ সম্পর্কযুক্ত যে, একটি অব্যয় কোনও বাক্যে ব্যবহৃত হইলেই

তদন্বিত অন্য বাক্যের পূর্বে অপর অব্যয়টির প্রয়োগ করিতে হয়, তখন উক্ত অব্যয়-দুইটিকে **সাপেক্ষ** বা **নিত্যসম্বন্ধী বাক্যান্বয়ী** অব্যয় বলিতে হয়। যথা—

বটে····কিন্তু [তারা ধনী বটে, কিন্তু সুখী নয়]।

যদি ·· তো ["ল'ড়তেই যদি চাও, তো বড়ভায়ের সঙ্গে না ল'ড়ে·· শত্রুদের জব্দ করো গে।"]

যদি · তবে ["যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।]

যদিও···তবু ["যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ-মন্থরে ·····তবু বিহঙ্গ, বন্ধ করো না পাখা।]

যেমনি · অমনি ["যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে, অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপ-বাণে বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে।"]

একে ··তায় ["একে মা মনসা তায় ধূপ-ধূনোর গন্ধ।"]

হয়·· না হয় (নয়) [হয় করো, না হয় মরো।] ইত্যাদি।

পদান্বয়ী এবং বাক্যান্বয়ী অব্যয় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—

(১) **সমুচ্চয়** বুঝাইতে—এবং, ও, আর ইত্যাদি।

(২) **বিকল্প** বুঝাইতে—বা, অথবা, কিংবা, কি, না, কিনা, অর্থাৎ ইত্যাদি।

(৩) **প্রতিষেধ, প্রতিপক্ষ** বা **সঙ্কোচ** বুঝাইতে—কিন্তু, অপিচ, তত্রাচ, পরন্তু, বরং, অধিকন্তু, তবু, তবুও, তথাপি ইত্যাদি।

(৪) **ব্যতিরেক** বুঝাইতে—নতুবা, নচেৎ (নোচেৎ), না হইলে (নহিলে > নইলে), যদি না ইত্যাদি।

(৫) **কারণ** বুঝাইতে—কারণ, যেহেতু, বলিয়া ইত্যাদি।

(৬) **ব্যবস্থা ও অনুধাবন** বুঝাইতে—তবে, তাই, এইজন্য, সেইজন্য ইত্যাদি।

(৭) **প্রশ্ন** বুঝাইতে—কি, নাকি, কেন, কখন, কেমন, কোথায়, কোথা ইত্যাদি।

(৮) **উপমা** বুঝাইতে—মতো, ন্যায়, মতন, তুল্য, যেন, হেন ইত্যাদি।

(৯) **স্থান, কাল** প্রভৃতি বুঝাইতে [ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত]—হেথা, অচিরাৎ, অকস্মাৎ, হোথা, সেথা, উপরি (উপর, উপরে) ইত্যাদি।

(১০) **নিশ্চয়** বুঝাইতে—ই, ও, তো।

(১১) **পরিহার** বুঝাইতে—বিনা, ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, বাদে, বাদ ইত্যাদি।

(১২) **অনুসর্গ-রূপে**—[১১৫—১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।

ইহা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে এবং বিচিত্ররূপে বাঙ্‌লায় অব্যয়পদের ব্যবহার রহিয়াছে ; যেমন—সহ, সহিত, সনে [সহার্থক], প্রতি, পানে ইত্যাদি।

(২) অনন্বয়ী অব্যয়

যে-সকল অব্যয়ের সহিত বাক্যের বা বাক্যস্থিত কোনও পদের প্রত্যক্ষ অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে না, তাহাদিগকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলে। যথা—"খাইলি অবোধ, **হায়**।" "**আহা**, কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা-উদয় !" ইত্যাদি।

অনন্বয়ী অব্যয়েরও কয়েকটি উপবিভাগ রহিয়াছে—

(ক) **মনোভাব-বাচক** [অন্তর্ভাবার্থক—রামমোহন]—

(১) **সম্মতি-অর্থে**—হ্যাঁ, হাঁ, হুঁ, আচ্ছা, যে-আজ্ঞে, বেশ ইত্যাদি।

(২) **অসম্মতি-অর্থে**—না, উঁহুঁ, একদম না, মোটেই না ইত্যাদি।

(৩) **অনুমোদন** [আনন্দ, প্রশংসা]-অর্থে—বাঃ, বাহবা, বেশ বেশ, সাবাস, বলিহারি, চমৎকার, বহুৎ আচ্ছা, মরি মরি ইত্যাদি।

(৪) **ঘৃণা বা বিরক্তি-অর্থে**—ছি(ঃ), ছি(ঃ)ছি(ঃ), দূর দূর, থু, ওয়াক্ থু, রামো, রাম রাম, ধিক্, আঃ, ধ্যেৎ, দুত্তোর, দূর, ছাই, আ ম'লো, আঃ, ম'লো যাঃ ইত্যাদি।

(৫) **ভীতি বা দুঃখ-অর্থে**—ও মা, ও বাবা, ওঃ (ওফ্), মাগো, বাবাগো, ওরে বাবারে, হায় হায়, হায়, ইশ্, উঃ (উফ্), এঃ, অ্যাঁ ইত্যাদি।

(৬) **বিস্ময়-অর্থে**--অ্যাঁ, ও মা, ও বাবা, বাপ্‌রে বাপ্ ইতাদি।

(৭) **আহ্বান-অর্থে**—এ, এই, ঐ (অয়ি), ওরে, ও, গো, ওগো, লো, ওলো, হে, ওহে, হেদে, হেদেগো, হ্যাঁগা, হ্যাঁগো, তু-তু (কুকুরকে আহ্বান), চৈ-চৈ (হাঁসকে আহ্বান) ইত্যাদি।

(খ) **অনুকার** [বা ধ্বন্যাত্মক]—হাঃ-হাঃ, হো-হো, হি-হি, ভোঁ-ভোঁ, পোঁ-পোঁ, ভন্-ভন্, চোঁ-চোঁ, শন্-শন্ ইত্যাদি।

বাস্তব ধ্বনি বা ভাবের অনুকরণে গঠিত বলিয়া ইহাদিগকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।

(গ) বাক্যালঙ্কার-সূচক—যে-সকল অব্যয়ের সহিত বাক্যের প্রত্যক্ষ অন্বয় নাই অর্থাৎ বাক্যের পক্ষে ইহারা অপরিহার্য নহে, অথচ ইহাদের দ্বারা নিঃসন্দেহে বাক্যের সৌষ্ঠব ও সাবলীলতা বর্ধিত হয়, তাহাদিগকে বাক্যালঙ্কার-সূচক অব্যয় বলে। যথা—

"কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু।" ব'ললাম তো; বলি যাচ্ছ কোথা? এমন আর কখনও দেখিনি রে বা দেখিনি ক'; তুমি যে বড় চ'লে গেলে? ছেলেটা ঘুমায় না যে; তা তোমার যে বড্ড তাড়া দেখ্‌ছি। ইত্যাদি।

অব্যয়ের শ্রেণী-বিভাগের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—
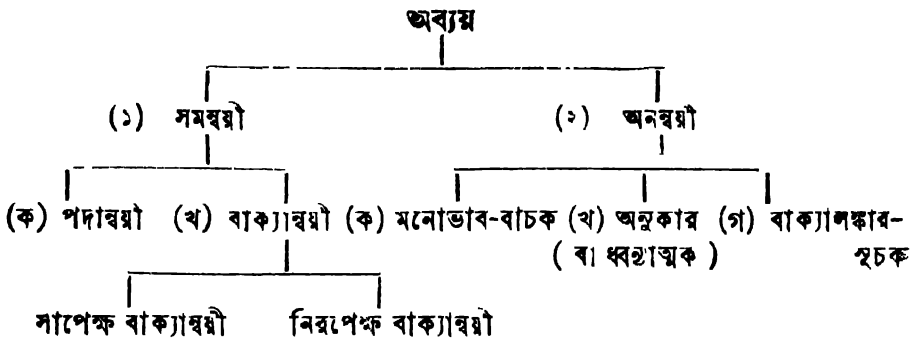
কয়েকটি অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ

এবং, ও, আর—সংস্কৃত 'চ' [ইংরেজী and]-এর অর্থে বাঙলায় এই তিনটি অব্যয়ই ব্যবহৃত হয়; [যদিও সংস্কৃতে এবং = এইরূপ]; তখন ইহারা সমন্বয়ী অব্যয়। নিশ্চয়ার্থক 'ও'[১] ইংরেজী 'too'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—তুমিও একথা ব'লছ? এই 'ও' 'তুমি'র বিশেষণের কাজ করিতেছে। আর-এর অতিরিক্ত দুইটি প্রয়োগ রহিয়াছে—একটি 'অতিরিক্ত' [more]-অর্থে, অপরটি 'পুনরায়'-অর্থে। যেমন—"আর কত কাল রইব ব'সে"; "আরও দেরি হ'ল ফিরিতে জীবের" [আর = অতিরিক্ত]; আর কবে দেখা হবে, জানি না [আর = পুনরায়]। এই সকল ক্ষেত্রে

আর নাম-বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্বচিৎ বাক্যালঙ্কারেও আর-এর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—"আর এতই যখন শুনেছ, তখন আর তোমার কাছে কিছু গোপন ক'রব না"—এখানে প্রথম আর-কে পূর্বের কথার যোজক অব্যয়রূপে ধরিলেও ধরা যাইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় আর-কে বাক্যালঙ্কার অব্যয়ই বলিতে হয়।

কি—(১) প্রশ্নরচনায়—"আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?"

(২) 'কিংবা'-অর্থে—সে আছে কি নেই, গিয়ে তাকে দেখতে পাবো কি পাবো না, কে জানে?

---

(১) এই ও সংস্কৃতের 'অপি'-অব্যয়জাত, সংযোজক 'ও' ফার্সি 'ব' (উয়) হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত 'উত' হইতেও ইহার উৎপত্তি অসম্ভব নহে।

ই—(১) ইহা সংস্কৃত 'এব' অব্যয়টির মত নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। "প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে।" "তোমাকেই আমার প্রয়োজন।" কেউ যদি না-ই আসে, ক্ষতি কি? [এই-ই সংস্কৃত 'হি' অব্যয় হইতে জাত হইতে পারে]।

(২) মাত্র [only]-অর্থে—মেঘ গর্জনই ক'রে গেল, বৃষ্টি আর হ'ল না। মুখেই হ্যাঁ বলল মনে হয়।

ই-না · ও—ইংরেজী "not only .... but also"-অর্থে কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। যথা—তার শুধু সর্দিই হয়নি, জ্বরও হ'য়েছে। ই এবং ও-এর অর্থ-পার্থক্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ও দেয় জুড়ে, ই ছিঁড়ে আনে।"

ই, ও, তো—এই তিনটি অব্যয়ের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কখনও কখনও যৌগিক কালের ক্রিয়াপদকে মুখ্য ও সহায়ক এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ইহারা নিজেদের স্থান করিয়া লয়। যেমন—আমি তো বলে-ই-ছিলাম, তুমি শুনে-ও-ছিলে। সে এসে-তো ছিল, কিন্তু গেল কোথায়? ইত্যাদি।

তো—(১) তাহা হইলে অর্থে—যদি ও থাকতে না চায় তো [= তাহা হইলে] ওকে ছেড়ে দাও।

(২) 'যদি...তবে'-অর্থে—যাবে তো [= যদি তবে] যাও।

(৩) নিশ্চয়ার্থে—তুমি তো জান্‌তে, তুমি বলনি কেন?

(৪) বাক্যালঙ্কারে—শুন্‌লে তো?

যেন—(১) উৎপ্রেক্ষায়—"পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।"

(২) অনুজ্ঞায়—"তোমার চরণে নাথ যেন থাকে মতি।"

(৩) বাক্যালঙ্কারে—বল না কি যেন ব'ললে।

গো—(১) "তুমি-অর্থবাচক" লোকদের প্রতি সম্বোধনে—

কি গো। কোথা যাচ্ছ? ওগো, শুনছ?

(২) দুঃখ ভয় প্রভৃতি প্রকাশের নিমিত্ত—

মা গো, বাবা গো ইত্যাদি।

(৩) ক্রন্দনে—আমার কি হবে গো, কোথায় বা যাবে গো ইত্যাদি।

(৪) মিনতি বা অনুনয়ে—"চরণে রাখ গো মোরে।"

না—(১) অসম্মতিতে বা ক্রিয়ানাশে—"রাগ করিও না"; "গুরুরেও সে না চিনে" "চলে না চরণ"; "আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না" ইত্যাদি।

(২) 'কিংবা'-অর্থে—যাবে, না থাক্‌বে? আমিষ না, নিরামিষ? তুমি যাবে, আমাকে যেতে হবে? [অবশ্য এখানেও না "একেকে নষ্ট করিয়া অপরকে বহাল" না করিতেছে]।

(৩) সংশয়াত্মক প্রশ্নে—কে গেল? রাম না? খোকা ফিরেছে না কি?

(৪) অনুজ্ঞার ক্রিয়াকে নষ্ট না করিয়া তাহাকে বলবৎ করিবার জন্য—"যাও না নন্দ, করো না ভায়ের সেবা; ['যাওয়া' এবং 'করা'র অনুরোধের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে না দ্বারা]। "কর কি, ছাড়ো না ছাই"; ['ছাড়া'র অনুরোধকে বলবৎ করিয়াছে না]।

(৫) (ক) হ্যাঁ বুঝাইতে—কহিনু কত না [=অনেক] কথা। (খ) প্রশ্নে—একথা কে না জানে [=সকলেই জানে]? আমি তার জন্যে কী না ক'রেছি [=সবই ক'রেছি]? (গ) দ্রুততায়—ভাত না খেয়ে দে ছুট্‌। [(ক) ও (গ) বাক্যালঙ্কারে বলা যাইতে পারে]।

লক্ষণীয়—অনিশ্চিত ক্রিয়াফল বুঝাইতে ক্রিয়ার পূর্বে না বসে। যেমন—সে না আসে, না আসবে। তুমি না গেলে আমি যাব। ইত্যাদি।

হইতে—(১) 'অপেক্ষা'-অর্থে—সত্য **হইতে** বড় ধর্ম নাই।

(২) 'অবধি'-অর্থে—সোমবার **হইতে** ছুটি চলিতেছে।

আবার—(১) 'পুনরায়'-অর্থে—**আবার** সে কাজ ক'রলি ?

(২) 'উপরন্তু'-অর্থে—দু'হাজার টাকা পণ, **আবার** বরসজ্জা !

বাক্য বা ব্যাক্যাংশের মনোভাব-বাচক অব্যয়রূপে প্রয়োগ

"**অবাক কাণ্ড একি** ! এমন কথা মানুষ শুনেছে কি ?"—রবীন্দ্রনাথ। "বিবেচনা করুন গিয়ে, আমি তো আগেই বলেছিলাম ··।" **এ কী এ কাণ্ড**! গুরুজির ভিক্ষা ভাণ্ড !"—রবীন্দ্রনাথ। "তখন সকলে বলিল—'**বাহবা, বাহবা, বাহবা,** বেশ !'—দ্বিজেন্দ্রলাল। ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত কথার আগে, মাঝখানে বা পরে মুদ্রাদোষবশতঃ ব্যবহৃত এই ধরণের বহু অব্যয় রহিয়াছে। যেমন—মনে করুন, হ্যাঁ-তা-ইয়ে, তা-বই-কি, ওর-নাম-কি, মানে-কথা-হচ্ছে, কথা-হ'ল-গিয়ে, বুঝেছেন-কিনা, দেখুন-কেন্‌না, ভাল-কথা-মনে-পড়েছে, বুঝেছ, বুঝেছ-তোমার, তারপর-কি-হ'ল, তারপর-তোমার, তারপর-কি-হ'য়ে'ছ—না, হ্যাঁ-মানে ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। অব্যয়ের প্রধান বিভাগগুলির নাম কর এবং উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর—সাপেক্ষ অব্যয় ; সমন্বয়ী অব্যয় ; অনুকার অব্যয় ; বাক্যালঙ্কার অব্যয়।

৩। স্থূলাক্ষর পদগুলির ব্যকরণগত টীকা লিখ—

একটা গল্প বলুন **না**। "**তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া** পিশাচ নাচিছে।" জামা, জুতো, আংটি, বোতাম তো আছেই, **আবার** ঘাড় চাই। "কত **না** অজানা জীব।" **বলি**, তোর আক্কেলটা কি রকম। বরং শাক-ভাত খাবে, **তবু** ধার করবে না। **না** গেলে **তো** না-**ই** গেলে। **তা** যাচ্ছ কবে ?

৪। স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর—উপমাদ্যোতক অব্যয় ; **অতিরিক্ত-অর্থে আর** ; কিংবা-অর্থে কি ; 'মাত্র'-অর্থে-**ই** ; নিশ্চয়ার্থে **তো** ; বাক্যালঙ্কারে **যেন** ; 'কিংবা'-অর্থে এবং হ্যাঁ-অর্থে **না**।

সমাস

রাজার পুত্র = রাজপুত্র।

উপরের উদাহরণটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—(১) **রাজার** এবং **পুত্র** দুইটি পদ ; (২) উহারা পরস্পরের সহিত অর্থসম্বন্ধযুক্ত ; উহারা মিলিত হইয়া রাজপুত্র এই একটি পদে পরিণত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়াটিকেই ব্যাকরণে **সমাস** বলা হয়।

চাল ও ডাল ও তেল ও নুন = চাল-ডাল-তেল-নুন—এখানে চারিটি পদ **চাল, ডাল, তেল, নুন** (খাদ্য-প্রস্তুতির চারিটি উপকরণ) পরস্পরের সহিত ও-দ্বারা **অর্থ**-সম্বন্ধে অন্বিত এবং উহাদের মিলনে **চাল-ডাল-তেল-নুন** পদটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাই সমাস।

তাহা হইলে বলা যায় যে—**পরস্পর অন্বিত বা অর্থ-সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণতিকে সমাস বলে।**

(একপদীভাবঃ সমাসঃ—অনেকপদের একপদ হওয়াই সমাস)

যে যে পদে সমাস হয়, তাহাদিগকে **সমস্যমান পদ** বলে। প্রথম উদাহরণে **রাজার** এবং **পুত্র**—এই দুইটি **সমস্যমান পদ।**

সমাসে প্রাপ্ত একপদটিকে **সমস্তপদ** বলা হয়। **রাজপুত্র** একটি **সমস্তপদ।**

যাহাতে সমাসের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয় অর্থাৎ সমস্যমান পদগুলির অন্বয় প্রদর্শিত হয়, তাহাকে **ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** বলে। **রাজার পুত্র—এইটি ব্যাসবাক্য।**

দুইটি পদে সমাস হইলে প্রথমটিকে **পূর্বপদ** এবং পরেরটিকে **উত্তরপদ** বলা হয়। প্রথম উদাহরণে **পূর্বপদ—রাজার** এবং **উত্তরপদ—পুত্র।**

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	পূর্বপদ	উত্তরপদ
রাজার পুত্র	রাজপুত্র	রাজার	পুত্র

যে **প্রক্রিয়ায়** 'রাজার পুত্র 'রাজপুত্র'তে পরিণত হইল তাহাই সমাস।

[**ব্যাস বাক্য** বা **বিগ্রহ** বাক্যের ভিত্তিতে সমাস **তিন** ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ; যথা—(ক) (ক) **অবিগ্রহ**, (খ) **অস্বপদবিগ্রহ** এবং (গ) **স্বপদবিগ্রহ।**

(ক) যে সমাসে বিগ্রহবাক্য বা ব্যাসবাক্য হয় না অর্থাৎ সমস্তপদকে বিশ্লিষ্ট করিয়া পূর্বপদ ও উত্তর-পদের সম্পর্ক দেখান যায় না তাহাই **অবিগ্রহ নিত্যসমাস**, যথা—**কাঁচকলা** (=কাঁচা এমন কলা'

নহে, একপ্রকার কলা) ; **রাজসাপ** (=একপ্রকার সাপ, 'সাপের রাজা' নহে) ; ইত্যাদি।
(খ) যে সমাসে সমস্তপদের বিগ্রহ বা বিশ্লেষণ তাহার স্বকীয় পদগুলির দ্বারা সাধিত হয় না, বিগ্রহবাক্যে বা ব্যাসবাক্যে অন্য পদের সাহায্য লইতে হয়, তাহাকে **অস্বপদবিগ্রহ** সমাস বলিতে হয়। একশ্রেণীর **নিত্যসমাস** ('দেশান্তর'=অন্য দেশ), **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** ('সিংহাসন'=সিংহ চিহ্নিত আসন) **উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি** ('পেঁচা মুখো'=পেঁচার মুখের মত মুখ যাহার), **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** ('দেখনহাসি'=দেখনমাত্র হাসি যাহার) ; **ব্যতীহার বহুব্রীহি** ('মারামারি'=পরস্পরের মার-এর ক্রিয়া), **অব্যয়ীভাব** ('যথাশক্তি'=শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া) এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(গ) যে সমাসে সমস্তপদের অন্তর্গত পূর্বপদ ও উত্তরপদের সম্পর্ক-স্থাপন দ্বারাই বিগ্রহ বা বিশ্লেষণ সাধিত হয়, তাহাকে **স্বপদবিগ্রহ** বলে। **তৎপুরুষ** (বিদ্যালয়=বিদ্যার আলয়) ; **দ্বন্দ্ব** (সুরাসুর' সুর এবং অসুর), **অব্যয়ীভাব** (উপকূল'=কূলের উপ অর্থাৎ সমীপে) ইত্যাদি অবশিষ্ট সমাসগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।)

সমস্যমান পদ সমূহের অর্থ প্রাধান্য-বিবেচনায় সমাস প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত :

(১) পূর্বপদার্থপ্রধান অব্যয়ীভাব ; যেমন—যথাশক্তি।

(২) উত্তরপদার্থপ্রধান তৎপুরুষ ; যেমন রাজপুত্র।

(৩) উভয়পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব ; যেমন—রামশ্যাম

(৪) অন্যপদার্থপ্রধান বহুব্রীহি ; যেমন—বীণাপাণি (বীণা পাণিতে যাহার।)

কর্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষের অন্তর্গত, কারণ উভয়ত্র উত্তরপদের অর্থই প্রধান হইয়া থাকে। যেমন—পূর্ণচন্দ্র (কর্মধারয়) ; ত্রিভুবন (দ্বিগু)।

(১) অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সংস্কৃতে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে।

(সমস্তপদটির অব্যয়ে পরিণতির জন্যই এই সমাসের এইরূপ নাম হইয়াছে। কিন্তু তাহার বহুক্ষেত্রে এইরূপ সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বিভক্তি যোগে রূপান্তর-পরিগ্রহ এবং বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ দেখিয়া আচার্য সুনীতিকুমার প্রমুখ বৈয়াকরণগণ উহাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি মানিতে চাহেন নাই।

"উপদ্বীপ, উপনদ, উপকূল, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, দুর্ভিক্ষ, নির্বিঘ্ন প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাসান্ত পদ বাঙলাতে নাম-পদরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের বিধান বাঙলাতে প্রযোজ্য নহে।"

—আচার্য সুনীতিকুমার।

"ব্যাসবাক্য যেখানে অব্যয়ীভাবের, সমাসকেও সেখানে অব্যয়ীভাব বলা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু কাজে যখন সমস্তপদটি বিশেষ্য হইয়া বিভক্ত্যন্ত, এমনকি কারকও হইতেছে, তখন মনে হয়, আগে অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া পরে বলা উচিত যে-কোন স্বার্থে প্রত্যয়-যোগে শব্দটি বিশেষ্য হইয়া বিভক্ত্যন্ত হইয়াছে।" —আচার্য শ্যামাপদ।

'যাহা অব্যয় ছিল না তাহার অব্যয় হওয়াই অব্যয়ীভাব (অব্যয়+চ্বি 'অভূততদ্ভাবে'-√ভূ+ঘঞ্)। 'অব্যয়ীভাব' শব্দটির এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু যে সংস্কৃত-ব্যাকরণে এই সমাসটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহাতেই আবার ইহার সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে—পূর্বপদার্থ-প্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ। আবার সংস্কৃতেও অব্যয়ীভাব সমাসে নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দের প্রাতিপদিকত্ব-লাভ এবং বিশেষ্যরূপে কারকত্বপ্রাপ্তি দেখা যায়। যেমন—"...দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে"; "পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্", ইত্যাদি।

বাংলাতেও 'উপদ্বীপ', 'উপবন,' 'প্রত্যক্ষ', 'দুর্ভিক্ষ' প্রভৃতি শব্দের সমাস-নির্ধারণ-কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিতে ব্যাসবাক্য দেখাইয়া সমাসকে অব্যয়ীভাব সমাসই বলিতে হইবে। সমাসান্তে স্বার্থে 'অ' প্রত্যয়যোগে উহারা বিশেষ্যে পরিণত হইয়াছে—এইরূপ বলা যাইতে পারে।]

বিভিন্ন অর্থে* অব্যয়ীভাব সমাস হয়—

(ক) 'বীপ্সা'-অর্থে—প্রতিদিন (=দিনে দিনে); অনুক্ষণ বা প্রতিক্ষণ (=ক্ষণে ক্ষণে); প্রত্যহ (=অহে অহে) ইত্যাদি।

(খ) 'অনতিক্রম'-অর্থে—যথাশক্তি (=শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া); যথারীতি (=রীতিকে অতিক্রম না করিয়া); যথাবিধি ; যথাসম্ভব ইত্যাদি।

(গ) 'অবধি'-অর্থে—আ-কণ্ঠ (=কণ্ঠ অবধি); আ-কর্ণ; আ-সমুদ্র; আ-পাদ-মস্তক (=পাদ হইতে মস্তক অবধি) ইত্যাদি।

(ঘ) 'সামীপ্য-অর্থে—উপকূল (কূলের সমীপে); সমক্ষ বা প্রত্যক্ষ (=অক্ষির সমীপে); উপকণ্ঠ ইত্যাদি।

(ঙ) 'সাদৃশ্য'-অর্থে—উপবন (=বনের সদৃশ); উপদ্বীপ ; উপনগর ইত্যাদি।

(চ) 'অভাব'-অর্থে—দুর্ভিক্ষ (=ভিক্ষার অভাব); নির্বিঘ্ন ইত্যাদি।

(ছ) 'যোগ্যতা'-অর্থে—অনুরূপ (=রূপের যোগ্য); অনুকূল ইত্যাদি।

(জ) 'বিভক্তি'-র অর্থে—প্রভূ্যষ (=উষায়, ৭মী বিভক্তি) ইত্যাদি।

*:কোন সংস্কৃত-ব্যাকরণে অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে—'সুপাব্যয়ং সমীপাদ্যৌ' অর্থাৎ 'সমীপ' প্রভৃতি অর্থে সুবন্তপদের (বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যের) সহিত অব্যয়ের যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অতৎসম অব্যয়ীভাব

পূর্বপদ অব্যয়—ফি-সন (সনে সনে, বীপ্সার্থে); হর-রোজ (রোজ রোজ); ভর-পেট (পেটের সকল স্থান পূর্ণ করিয়া, সাকল্য-অর্থে); গর-মিল (মিলের অভাব ; অভাব-অর্থে) ইত্যাদি।

উত্তরপদ অব্যয়—চৈত্র-তক (=চৈত্র পর্যন্ত, 'অবধি-অর্থে); বৈশাখ-নাগাদ ; মাথা-পিছু (মাথায় মাথায়, বীপ্সা, অর্থে); মণ-প্রতি; জন-প্রতি; আইন-মাফিক (আইনকে অতিক্রম না করিয়া, অনতিক্রম-অর্থে); কায়দা-মাফিক; দিন ভর (সমগ্র দিন ব্যাপিয়া, সাকল্য-অর্থে); রাত ভর ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—'আগা হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়া পর্যন্ত'—এই অর্থে আগাগোড়া-তে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে ; কিন্তু 'আগা এবং গোড়া'—এইরূপ অর্থ হইলে দ্বন্দ্ব-সমাস বলিতে হইবে।

(অধ্যাপক সুনীতিকুমারের মতে 'মাঠ-কে-মাঠ, গ্রাম-কে-গ্রাম', 'শহর-কে-শহর' প্রভৃতি খাঁটি বাংলার অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণরূপে গ্রহণীয়। কিন্তু কথা হইল যে, উহাদের পূর্বপদ বা উত্তরপদ কোথাও অব্যয়ের গন্ধমাত্র নাই, উপরন্তু উহাদের প্রয়োগ বিশেষ্যরূপে। সুতরাং উহাদিগকে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ বলিবার কোনও হেতু আছে কি ?)

বাঙ্‌লায় যখন অব্যয়ীভাব সমাসে সমস্তপদে উত্তরপদরূপেও অব্যয় যুক্ত হয়, তখন 'পূর্বপদার্থপ্রধান অব্যয়ীভাব' বলা ঠিক হইবে না। সুতরাং বলিতে হয়—**সামীপ্যাদি অর্থে অব্যয়ের সহিত নামপদের যে সমাস হয় এবং যাহাতে অব্যয়ের অর্থ ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।**

(২) তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে উত্তরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীত হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। [উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ।]

যেমন—**বিস্ময়াপন্ন** (বিস্ময়কে আপন্ন); **ঢেঁকিছাটা** (ঢেঁকি দ্বারা ছাটা); **দেবদত্ত** (দেবকে দত্ত); **পদচ্যুত** (পদ হইতে চ্যুত); **রাজপুত্র** (রাজার পুত্র); **গাছপাকা** (গাছে পাকা) ইত্যাদি।

ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে যে বিভক্তি থাকে, তাহাকে লইয়াই সাধারণতঃ তৎপুরুষের উপবিভাগের নামকরণ হয়। পূর্বের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে যথাক্রমে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ** হইতে **সপ্তমী তৎপুরুষ** পর্যন্ত ৬টি উপবিভাগ পাওয়া যাইবে।

(ক) দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ

(১) গত, প্রাপ্ত, অতীত, আপন্ন, আরূঢ়, আশ্রিত প্রভৃতি উত্তরপদের সহিত দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস হয়। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয়, যথা—**স্বর্গগত** (স্বর্গকে গত); **বয়ঃপ্রাপ্ত** (বয়সকে প্রাপ্ত); **সংখ্যাতীত** (সংখ্যাকে অতীত); **মরণাপন্ন** (মরণকে আপন্ন); **বৃক্ষারূঢ়** (বৃক্ষকে আরূঢ়); **চরণাশ্রিত** (চরণকে আশ্রিত); **ধর্মসংক্রান্ত, গৃহপ্রবিষ্ট** ইত্যাদি।

(২) সংস্কৃত-ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাপ্তি-অর্থে কালবাচক পূর্বপদের সহিত এবং ভাব বা অবস্থা বুঝাইতে বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত পূর্বপদের সহিত **দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা—**মাসাশৌচ** (মাস ব্যাপিয়া অশৌচ); **চিরশত্রু** (চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু); **অর্ধপক্ক** বা **আধপাকা** (অর্ধ-অবস্থায় পক্ক); **ঘন-সন্নিবিষ্ট** (ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট)। অনুরূপ—অর্ধমৃত বা আধমরা, চিররুগ্ন, চিরসুখী, ক্রোশবিস্তৃত, পূর্ণবিকশিত, অর্ধস্ফুট বা আধফোটা ইত্যাদি।

বাঙলা উদাহরণ—রথ-দেখা, কলা-বেচা, পকেট-মারা, ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা, জল-তোলা, কাঠ-কাটা, ভাত-রাঁধা, লোক-দেখান, গা-ঢাকা, গা-ধোওয়া, মাছ ধরা, ফুল-তোলা, জাল-বোনা, সুতো-কাটা ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—সংস্কৃতে কৃদ্‌যোগে কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় বলিয়া 'রথ-দর্শন' (রথের দর্শন); 'কদলী-বিক্রয়' (কদলীর বিক্রয়) প্রভৃতি ক্ষেত্রে **ষষ্ঠীতৎপুরুষ** সমাস হয়। কিন্তু বাঙ্‌লায় সকর্মক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত উহার কর্মের সমাসকে **দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ** সমাস বলাই যুক্তিযুক্ত।

(খ) তৃতীয়া-তৎপুরুষ

(১) তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত পূর্বপদের সহিত এই সমাস হইবে। যথা—**মধুমাখা** (মধু দিয়া মাখা); **সর্পদিষ্ট** (সর্প দ্বারা দষ্ট); **শ্রীযুক্ত** (শ্রী দ্বারা যুক্ত); **পাথর-চাপা** (পাথর দিয়া চাপা); **মনগড়া** (মন দিয়া গড়া); **জল কাচা** (জল দিয়া কাচা)। অনুরূপ—শ্রমলব্ধ, কষ্টার্জিত, বজ্রাহত, ঝাঁটাপেটা, বাদুড়চোষা, মোহান্ধ, জরাজীর্ণ, মন্ত্রপূত, রোগাক্রান্ত, শোকাকুল, রবাহূত ইত্যাদি।

(২) ঊন, হীন, শূন্য, রহিত, বর্জিত, পূর্ণ প্রভৃতি বা ইহাদের সমার্থক উত্তরপদের সহিত সর্বদা তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা—**একোন** (এক দ্বারা ঊন)-বিংশতি; **জ্ঞান-হীন** (জ্ঞান দ্বারা হীন); **জন-শূন্য** (জন দ্বারা শূন্য); **বুদ্ধি-রহিত** (বুদ্ধি দ্বারা রহিত); **পাণ্ডব-বর্জিত** (পাণ্ডব দ্বারা বর্জিত); **জল-পূর্ণ** (জল দ্বারা পূর্ণ); **লক্ষ্মী-ছাড়া** (লক্ষ্মী দ্বারা ছাড়া); **ছটাক-কম** (ছটাক দ্বারা কম); **গৃহহারা** (গৃহ দ্বারা হারা); **ডিম-ভরা** (ডিম দ্বারা ভরা) ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি যে-কোনও কারণেই হউক না কেন, সমাসটি তৃতীয়া তৎপুরুষই হইবে।

(গ) চতুর্থী-তৎপুরুষ

চতুর্থীবিভক্তিদ্যোতক পূর্বপদের সহিত অর্থপ্রধান উত্তরপদের সমাস হইলে তাহাকে চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যথা—**দেবদত্ত** (দেবকে দত্ত); **ভূতবলি** (ভূতার্থে বলি); **চরণার্পিত** (চরণকে অর্পিত); **দেবপ্রণাম** (দেবকে প্রণাম) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—বাঙ্‌লায় এই সমাসের ব্যাপারে সংস্কৃত-ব্যাকরণের একান্ত অনুসরণ সম্ভবপর নহে। লোকহিত, যূপকাষ্ঠ ইহাদিগকে বাঙ্‌লায় চতুর্থী-তৎপুরুষ বলিতে পারিব না; কারণ উহাদের 'লোকের (নিমিত্ত) হিত,' 'যূপের (নিমিত্ত) কাষ্ঠ'—এইরূপ ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; সুতরাং সমাসও এখানে ষষ্ঠীতৎপুরুষ*। অনুরূপ—ডাক-মাশুল, জীয়ন-কাঠি, হিন্দু-ইস্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, অনাথ-আশ্রম, পাগলা-গারদ, মাল-গুদাম, খেয়ানৌকা, মাপকাঠি, ছাত্রাবাস, রান্নাঘর, শিবমন্দির, কৃষিবিভাগ, বিয়ে-পাগলা, মড়াকান্না ইত্যাদি।

ধানজমি (ধান-ফলান জমি); ধর্মপত্নী (ধর্মসহায়িকা বা ধর্মানুমোদিতা পত্নী); তীর্থযাত্রা (তীর্থনিমিত্তকা যাত্রা) প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসও বলা যাইতে পারে।

*অধ্যাপক সুধীর কুমার দাসগুপ্ত তাঁহার "বাণী-দীপ"-এ এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

(ঘ) পঞ্চমী-তৎপুরুষ

পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লুপ্ত করিয়া এই সমাস গঠিত হয়। যথা—মৃত্যুভয় (মৃত্যু হইতে ভয়); পদচ্যুত (পদ হইতে চ্যুত); মেঘমুক্ত (মেঘ হইতে মুক্ত)। অনুরূপ—জলাতঙ্ক, দস্যুভয়, বিপন্মুক্ত, বিদেশাগত, স্থানভ্রষ্ট, জনশ্রুতি, জন্মান্ধ, শ্রমবিমুখ, স্নাতকোত্তর, যুদ্ধোত্তর, মানবেতর, পাশমুক্ত, শৃঙ্খলমুক্তি, আদর্শচ্যুত, ভয়ত্রস্ত ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা উদাহরণ—বিলাত-ফেরত, জেল-খালাসী, ইস্কুল-পালানো, ঝুলি-ঝাড়া (ঝুলি হইতে ঝাড়া, 'ঝুলিকে ঝাড়া' হইলে ২য়াতৎ); দলছাড়া, পাঠশালা-পলায়ন, পথ-কুড়ানো, চাকভাঙা ইত্যাদি।

(ঙ) ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস

এই সমাসে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকে। যথা—রাজকন্যা (রাজার কন্যা); দেবমন্দির (দেবের মন্দির)। ঠাকুর-পো (ঠাকুরের পো) ইত্যাদি।

(১) সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; আর সম্বন্ধও বহুপ্রকার (পৃঃ ১৫৮—১৬১ দ্রঃ;

কাজেই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসও সম্বন্ধভেদে বহুপ্রকার হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ প্রকার-ভেদ দেখাইয়া জটিলতার সৃষ্টি করা অনাবশ্যক।

কারক-সম্বন্ধে: ব্রাহ্মণভোজন, দেবাদেশ, সরস্বতীপূজা, কেশাকর্ষণ, বিদ্যালয়, সুরেন্দ্র, নরাধম, দেশসেবা, বৈষ্ণবগুরু, রণমদ ইত্যাদি

বাঙ্‌লা—ভালুক-নাচ, ঠাকুর-পূজা, ঘোড়দৌড়, পাটচাষ ইত্যাদি।

শেষ-সম্বন্ধে: তৎসম—রাজগৃহ, নদীতীর, সংসারপথ, নির্মাণকর্তা, মানবজীবন, দেবমন্দির, বন্ধুবর্গ, গঙ্গাজল, জপমালা, সমুদ্রসৈকত ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা—ফুলঝুড়ি, যুদ্ধজাহাজ, ধানক্ষেত, শ্বশুর-বাড়ি, বামুন-পাড়া, গাছ-তলা, মৌ চাক, পুকুর-ঘাট, জাহাজ-ঘাটা, সর্ষে-ফুল ইত্যাদি।

মিশ্র—মহিলা-মহল, ফুল-বাগিচা, সাহেব-বাগান, স্টিমার-ঘাট, রাজা-বাজার, জল-পুলিশ, গোরা-বাজার ইত্যাদি।

(২) তৎপুরুষ সমাসে 'রাজন্' শব্দের 'ন্' সর্বদা লুপ্ত হয়। যথা—রাজপুত্র, রাজকন্যা, দেবরাজ, কাশীরাজ ইত্যাদি।

(৩) শ্রেষ্ঠার্থক 'রাজন্' শব্দের **পূর্বনিপাত** হয় অর্থাৎ উত্তরপদ পূর্বপদ হইয়া যায়; যথা—হংসের রাজা=রাজহংস, পথের রাজা=রাজপথ, মিস্ত্রীদের রাজা=রাজমিস্ত্রী, যক্ষ্মার রাজা=রাজযক্ষ্মা ইত্যাদি।

(৪) এই সমাসে 'ন্'-কারান্ত শব্দে 'ন্' লুপ্ত হয় এবং 'ঋ'-কারান্ত শব্দের 'ঋ' থাকিয়া যায়। যথা—গুণিগণ (গুণিন্+গণ); জ্ঞানিগণ (জ্ঞানিন্+গণ); যুব-সঙ্ঘ (যুবন্+সঙ্ঘ); পিতৃতুল্য (পিতার তুল্য, পিতৃ+তুল্য); মাতৃসমা (মাতার সমা, মাতৃ+সমা); পিতৃস্নেহ; মাতৃভূমি।

নাম বুঝাইলে 'কালী', 'চণ্ডী', 'দেবী' প্রভৃতি শব্দের পর দাস থাকিলে পূর্বপদস্থ ঈ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ইকারান্ত হইয়া যায়। নাম না বুঝাইলে হয় না। যথা—কালীরদাস=কালিদাস; চণ্ডীর দাস=চণ্ডিদাস; দেবীর দাস=দেবিদাস ইত্যাদি। অন্যত্র কালীদাস, চণ্ডীদাস, দেবীদাস ইত্যাদি।

(৫) 'অণ্ড' প্রভৃতি উত্তরপদ হইলে 'হংসী' প্রভৃতি পূর্বপদ পুংলিঙ্গ হইয়া যায়। যথা—হংসাণ্ড (হংসীর অণ্ড); ছাগদুগ্ধ (ছাগীর দুগ্ধ); কুক্কুটশাবক (কুক্কুটীর শাবক); কাকশাবক (কাকীর শাবক) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—এই রীতির অনুসরণেই বাঙ্‌লায় 'হাঁসীর ডিম' না হইয়া 'হাঁসের ডিম' চলিত হইয়াছে।

(৬) একবচনান্ত অংশীর সহিত অংশবাচক বা একদেশবাচক পদের ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হইলে তাহাকে একদেশী সমাস বলে। বাঙ্‌লায় ইহাতে অংশবাচক পদের পূর্বনিপাত হয়। যথা—কায়ের (শরীরের) পূর্ব (সম্মুখের অংশ) পূর্বকায়; রাত্রির মধ্য [ভাগ] মধ্যরাত্র; 'অহ'-এর (দিনের) মধ্য মধ্যাহ্ন; 'অহ'-এর অপর (শেষাংশ) অপরাহ্ণ; 'অহ'-এর সায় (রাত্রিমিলনাংশ) সায়াহ্ন ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—১। এই সমাসে 'রাত্রি' ও 'অহন্' শব্দের স্থানে যথাক্রমে 'রাত্র' ও 'অহ্ন' হইয়া থাকে।

২। এই রীতি বাঙ্‌লা শব্দের সমাসেও আসিয়া গিয়াছে। যথা—দরিয়ার মাঝ=মাঝদরিয়া; গাঙের মাঝ=মাঝগাঙ ইত্যাদি।

(৭) নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ—

তৎসম—বিশ্বের মিত্র=বিশ্বামিত্র (নাম বুঝাইলে); বনের পতি=বনস্পতি; বৃহদ্‌গণের (দেবগণের) পতি=বৃহস্পতি।

(চ) সপ্তমী-তৎপুরুষ

ইহার ব্যাসবাক্যে পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি থাকে। যথা—

তৎসম—বন-জাত (বনে জাত); রৌদ্র-পক্ব (রৌদ্রে পক্ব); জলবিহার (জলে বিহার); আকাশ-ভ্রমণ (আকাশে ভ্রমণ); নরোত্তম (নরগণেতে উত্তম); কবিশ্রেষ্ঠ (কবিদিগেতে শ্রেষ্ঠ); বিশ্ববিখ্যাত (বিশ্বে বিখ্যাত); মাতৃভক্তি (মাতাতে ভক্তি); জলমগ্ন (জলে মগ্ন); রণনিপুণ (রণে নিপুণ); নাট্যসম্রাট্ (নাট্যে সম্রাট্)।

অনুরূপ—পানাসক্ত, ঈশ্বরানুরক্ত, কার্যকুশল, কর্মদক্ষ, কাব্যবিশারদ, রণদুর্মদ, সত্যাগ্রহ (সত্যে আগ্রহ), যুদ্ধনিপুণ, অকালমৃত্যু, পল্লীভুক্ত, সংখ্যালঘিষ্ঠ ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা—গাছপাকা (গাছে পাকা); রাতকাণা (রাতে কাণা); ঘর-পাতা (ঘরে পাতা); মনমরা (মনে মরা); কোলকুঁজা (কোলে কুঁজা)।

অনুরূপ—বাক্সবন্দী, বস্তাপচা কোণ-ঠাসা, ঘর-পোষা, মাথা-ব্যথা, ইংরেজী-শিক্ষিত, ঘর-পোড়া (ঘরে পোড়া) ইত্যাদি।

(ছ) নঞ্‌তৎপুরুষ

[সংস্কৃতে নঞ্‌-এর অর্থ ৬টি (সাদৃশ্য, অভাব, অন্যত্ব, অল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ); কিন্তু বাঙ্‌লায় নিষেধের অর্থটিই প্রবল অর্থাৎ বাঙ্‌লায় ইহার অর্থ প্রধানতঃ 'না, নহে (নয়)।]

যে সমাসে পূর্বপদে নঞ্‌ বা তাহার 'সমার্থক অব্যয়' থাকে এবং পরপদের অর্থই প্রধান হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস বলে।

সংস্কৃতে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্‌-স্থানে 'অ' এবং স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্‌-স্থানে অন্‌ হয় এবং স্থানবিশেষে ন-ও হয় (ইহা নঞ্‌তৎপুরুষে না হইয়া সুপসুপা সমাসে হয়)।

বাঙ্‌লায় নঞ্‌-এর স্থানে অ, আ, অনা, না, বি, বে, গর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত উদাহরণ—নঞ্‌=অ—**অব্রাহ্মণ** (নহে ব্রাহ্মণ, 'ব্রাহ্মণসদৃশ'-অর্থে); **অসুখ** (নহে সুখ, 'সুখের অভাব'-অর্থে); **অমানুষ** (নহে মানুষ, 'মানুষেতর' বা 'মানুষের গুণ অল্পই আছে'-অর্থে); **অবৃক্ষ** (নহে বৃক্ষ, 'বৃক্ষের গুণ অল্পই আছে'-অর্থে); **অকাল** (নহে কাল, 'অপ্রশস্ত কাল'-অর্থে); **অসুর** (নহে সুর, 'সুর-বিরোধী'-অর্থে)। অনুরূপ—অসৎ, অভয়, অক্ষয়, অব্যর্থ, অদৃষ্ট, অসময়, অধর্ম, অপ্রিয়, অদম্য, অজেয় ইত্যাদি।

নঞ্‌=অন্‌—অনাচার, অনুক্ত, অনিষ্ট, অনিচ্ছা, অনাদর, অনভ্যাস, অনুচিত, অনেক, অনৈক্য ইত্যাদি।

নঞ্‌=ন—নগণ্য, নপুংসক, নাতিদীর্ঘ, নাতিশীতোষ্ণ ইত্যাদি।

[প্রকৃতপক্ষে এইগুলিকে নঞ্‌তৎপুরুষ না বলিয়া সুপ্‌সুপা সমাস বলাই বিধেয়।]

বাঙ্‌লা উদাহরণ—

নঞ (=অ)—অ-মিল (নয় মিল); অ-জানা (নয় জানা)।

অনুরূপ—অ-কেজো, অ-দেখা, অ-পয়া, অ-হিন্দু, অ-চেনা ইত্যাদি।

নঞ্‌ (=আ)—আ-ধোয়া; আ-ঘাটা; আ-ছোলা; আ-গ ছা (নয়-গাছা অর্থাৎ গাছের গুণ অল্পই আছে); আ-কাল; আ-ফোটা (নয় ফোটা বা ঈষৎ ফোটা); আ-লুনি (নয় লুনি বা ঈষৎ লুনি) ইত্যাদি।

নঞ্‌ (=অন্)—অনাদায়ী (নয় আদায়ী); অনাবাদী (নয় আবাদী) ইত্যাদি।

নঞ্‌ (=অনা—অনাসৃষ্টি [নয় সৃষ্টি, 'নয় আসৃষ্টি (উত্তম সৃষ্টি)' -ও হইতে পারে]; অনামুখো ইত্যাদি।

নঞ্‌ (=না)—না-বলা (নয় বলা, 'না বলা কথাটি মোর'); না-দেখা (ছবি); না-হক (কথা); না-চেনা (রাস্তা); না জানা (ব্যাপার); না-মঞ্জুর (দরখাস্ত); না-রাজ (নয় রাজী) ইত্যাদি।

নঞ্‌ (=নি, বি, বে, গর)—নি-খরচা (=অ খরচা, নয় খরচা); নি-খাউনি (নয় খাউনি বা অত্যল্প খাউনি=যে খায় না বলিলেই চলে); বি-ভুঁই (=বে ভুঁই, নয় ভুঁই, 'অস্থান'-অর্থে); বি-জোড় (=বে-জোড়); বে-আইনি ; বে-মানান ; বে-দরদী ; বে-সরকারী ; বে-ঠিক ; বে-হিসাবী ; গর-রাজী (নয় রাজী); গর-হাজির ইত্যাদি।

(জ) উপপদ তৎপুরুষ

ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত যে শব্দটির স্বার্থ প্রকাশের সময় পদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে তাহাই উপপদ। উপপদ তখন উক্ত ধাতুজাত ক্রিয়া পদের সহিত কর্ম, করণ বা অধিকরণ কারকরূপে অন্বিত হয়। জল 'দেয়' যে=জলদ (জল-দা-ক) 'দা'-ধাত্বর্থ দ্যোতক ক্রিয়াপদ দেয়'-এর সহিত 'জল' পদের কর্ম-সম্বন্ধ ; জল 'দা'-ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে বসিয়া 'ক' (অ)-প্রত্যয়যোগে জলদ পদটি গঠন করিয়াছে। অতএব জল একটি উপপদ।

উপপদের সহিত ধাতুর সমাস হইলে তাহাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। ধাতুর সহিত কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত পরপদের অর্থই এখানে প্রধানরূপে প্রতীত হয় বলিয়া ইহা তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত।

দ্রষ্টব্য—উপপদের পরবর্তী কৃদন্ত শব্দটির একই অর্থে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র প্রয়োগ থাকিতে

পারিবে না; যথা—'দিবাকর'—হইতে 'করে যে'—অর্থে 'কর'-কে টানিয়া লইতে পারি না ('হাত' বা 'খাজনা' বা 'রশ্মি'-অর্থে 'কর' শব্দের স্বাধীন প্রয়োগ আছে); অতএব এখানে উপপদ তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। কিন্তু 'মনমরা'—হইতে 'মরা'-কে স্বতন্ত্র পদরূপে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং 'মনে মরা' ব্যাসবাক্য হইতে 'মনমরা'-তে সপ্তমী-তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

তৎসম উদাহরণ—

সর্বজ্ঞ (সর্ব [সব] জানে যে); পঙ্কজ (পঙ্কে জন্মে যাহা); পাদপ (পাদদ্বারা পান করে যে); গৃহস্থ (গৃহে থাকে যে)।

অনুরূপ—কর্ম সম্বন্ধী উপপদ—মধুপ (মধু পান করে যে); ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্রকে জয় করে যে); শত্রুঘ্ন (শত্রুকে হত্যা করে যে); নীরদ (নীর দান করে যে); টীকাকার (টীকা করে যে); সূত্রধর (*); গঙ্গাধর (*); সূত্রধার ইত্যাদি।

করণ-সম্বন্ধী উপপদ—পাদপ; ধ্যানজ্ঞ (ধ্যান দ্বারা জানে যে); ভুজগ—ভুজঙ্গ—ভুজঙ্গম (ভুজদ্বারা গমন করে যে), ইত্যাদি।

অধিকরণ-সম্বন্ধী উপপদ—জলচর (জলে চরে যে); অণ্ডজ (অণ্ডে জন্মে যে)

কেহ কেহ 'অণ্ড হইতে জন্মে যে'—অর্থ করিয়া 'অণ্ড'-কে অপাদান-সম্বন্ধী বলিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু অণ্ড 'জন্মে' ক্রিয়ার আধার বলিয়া উহাকে অধিকরণসম্বন্ধী বলাই যুক্তিযুক্ত।

অতৎসম উদাহরণ—

লুচিভাজা (লুচি ভাজে যে, যাহাতে "কড়াই" এবং "ঘি"-এর বিশেষণ); ভাতরাঁধা (ভাত রাঁধে যে বা যাহাতে—যথাক্রমে "বামুন" ও "হাঁড়ির" বিশেষণ); পকেটমার (পকেট মারে যে); সবহারা (সব হারাইয়াছে যে); কাপড় কাচা (কাপড় কাচে যাহার দ্বারা); বর্ণচোরা (বর্ণ চুরি করে যে)।

অনুরূপ—যাদুকর, হাড়ভাঙা, ছেলেধরা, গাঁটকাটা, প্রাণমাতানো, মানুষখেকো, ছাপোষা, পাচাটা, পাড়াবেড়ানি, বাটাভরা, আকাশছোঁয়া, ঘুমপাড়ানি ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—(১) ধানভরা (গোলা)=ধান দিয়া ভরা (পূর্ণ), ৩য়া তৎপুরুষ; জলভরা (চোখ বা নদী)=জল দ্বারা ভরা (পূর্ণ), ৩য়া তৎপুরুষ।

(২) কারিগর, হালুইগর ইত্যাদি ফার্সী শব্দ বাংলায় কারিকর, হালুইকর প্রভৃতি রূপে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণরূপে গণ্য হইতে পারে।

(৩) ছেলেভুলানো=ছেলেকে ভুলান হইলে ২য়া তৎপুরুষ (এ কী ছেলেভুলানো মনে ক'রেছ ?); কিন্তু ছেলেকে ভুলায় যাহা-অর্থে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বুঝিতে হইবে (ছেলেভুলানো ছড়া)। অনুরূপ লেখাপড়া-জানা লোক (উপপদ তৎপুরুষ), মাষ্টারির চেয়ে মজুরীতে বেশী পয়সা পাওয়া গেলে লেখাপড়া-জানায় লাভ কি ? (২য়া তৎপুরুষ)।

প্রাদি তৎপুরুষ

'প্র' আদিতে যাহার তাহাই প্রাদি। সংস্কৃত উপসর্গের আদিতে 'প্র' অর্থাৎ 'প্র' প্রথম উপসর্গ। **সুতরাং যে সমাসে 'প্র' প্রভৃতি উপসর্গ পূর্বে বসে এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাহাকে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলে**; যথা—

'প্র' (প্রকৃষ্ট) যে বোধ=প্রবোধ; 'প্র' (প্রকৃষ্ট) এমন বচন=প্রবচন; 'সু' (উত্তম) এমন ফল=সুফল; 'বি' (বিপরীত) যে বাদ=বিবাদ; 'প্র' (প্রগত) এমন পিতামহ=প্রপিতামহ ('পিতামহ'-র পূর্ববর্তী পুরুষ); 'অতি' (অতিরিক্ত শক্তি গুণাদি সম্পন্ন) এমন মানব=অতিমানব ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—'অতীন্দ্রিয়', 'উদ্বেল', 'উৎবেন্দ্র', 'প্রত্যক্ষ' প্রভৃতিকে প্রাদিতৎপুরুষ বলা চলে না; কারণ এখানে পরপদের অর্থ প্রধান নহে। এই সকল ক্ষেত্রে পূর্বপদ 'অতি', 'উৎ' ও 'প্রতি' অব্যয়ের অর্থই প্রধান বলিয়া উহাদিগকে অব্যয়ীভাব সমাস বলিতে হইবে।

সুপ্‌সুপা (তৎপুরুষ) সমাস

'সুপ্'-এর সহিত 'সুপ্'-এর অর্থাৎ পদের সহিত পদের সমাসকে সুপ্‌সুপা সমাস বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—সকল সমাসেই ত' পদের সহিত পদের সমাস, তবে এই নূতন প্রকারভেদ ও নামকরণ কেন ? উত্তরে বলিতে হয়—অন্য সমাসের বিধিব্যবস্থায় যেগুলি পড়ে না, অথচ, ভাষায় সেই সব সমস্ত-পদের

প্রয়োগ রহিয়াছে তাহাদিগকে সুপ্‌সুপা সমাস বলিতে হইবে। যেমন বিশেষণীয় বিশেষণের সহিত বিশেষণের সমাস অন্য সমাস ব্যবস্থায় পড়ে না; কিন্তু এইরূপ দুইপদের মিলনে গঠিত বহু সমস্ত-পদের ব্যবহার দেখা যায়। এইগুলিকে এই সমাসের অন্তর্গত বলিতে হয়। যথা—চির (চিরকাল) ব্যাপিয়া স্থায়ী=চিরস্থায়ী; 'বি' (বিশেষরূপে) চ্যুত=বিচ্যুত।

[কেহ কেহ ইহাকে 'প্রাদিতৎপুরুষ' বলিয়াছেন; কিন্তু 'বি' উপসর্গ হইলেও এখানে 'বিশেষণীয় বিশেষণ' এবং 'চ্যুত' বিশেষণ পদ। অতএব ইহা নিয়মবহির্ভূত সমাস বলিয়া ইহাকে 'সুপ্‌সুপা' সমাসই বলিতে হইবে।]

পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব [পরের পদ পূর্বে নিপাতিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সমাসে পূর্বনিপাত বলে]। অনুরূপ—অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতিপূর্ব ইত্যাদি।

[পূর্বনিপাতের পরে আবার 'নঞ্‌ তৎপুরুষ' সমাস হইয়াছে]।

আরও কয়েকটি সুপ্‌সুপা-সমাসান্ত পদের প্রয়োগ—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে?" "চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে!" "সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে....।" "জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়।"

কর্মধারয় সমাস

(i) 'নীল' যে 'উৎপল'=নীলোৎপল; 'নীল' এমন 'মণি'=নীলমণি; 'হেড্‌' এমন 'মাস্টার'=হেড্‌মাস্টার; 'মহান্‌' যে 'রাজা'=মহারাজ।

(ii) পূর্বে 'সুপ্ত' পশ্চাৎ 'উত্থিত'=সুপ্তোত্থিত; যাহা 'কান্ত' তাহাই 'কোমল'=কান্ত-কোমল; যাহা 'কাঁচা' তাহাই 'মিঠে'=কাঁচা-মিঠে।

(iii) যিনি 'রাজা' তিনিই 'ঋষি'=রাজর্ষি; যিনি 'ঠাকুর' তিনিই 'দাদা'=ঠাকুরদাদা; যিনি 'মৌলভী' তিনিই 'সাহেব'=মৌলভীসাহেব।

উপরের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সর্বত্র পরপদের প্রাধান্ত বর্তমান এবং পূর্বপদ ও পরপদে একই বিভক্তি প্রথমা রহিয়াছে। তাই প্রশ্ন হইতে পারে যে এইগুলিকে প্রথমা তৎপুরুষ সমাস বলা হইবে না কেন? উহারা

বাহ্যবিচারে প্রথমা তৎপুরুষই বটে; কিন্তু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে তৎপুরুষতা ছাড়াও আর একটি গুণ ধরা পড়ে। (i) -এর উদাহরণগুলির পূর্বপদসমূহ উত্তর-পদরাজির বিশেষণ। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও উত্তরপদ মিলিয়া একটি পদার্থ সূচিত হয়। (ii) -এর উদাহরণে পূর্বপদ ও উত্তরপদ দুইটিই বিশেষণ কিন্তু একই পদার্থে উহাদের অবস্থানের পৌর্বাপর্য বা যৌগপদ্য (সমকালীনতা) সূচিত হইতেছে। (iii) -এর উদাহরণে দুইটিই বিশেষ্যপদ এবং যৌগপদ্যে একই পদার্থের বোধ জন্মায়। সাধারণ তৎপুরুষে এই বৈশিষ্ট্য নাই। 'রাজপুত্র'-তে পুত্রের প্রাধান্য থাকিলেও 'রাজা'র স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র হইতে 'ত্যাজ্য'-কে স্বতন্ত্র কল্পনা করা যায় না, পূর্বপদ ও উত্তরপদ একই আধারে রক্ষিত এবং অবিচ্ছেদ্য। ইহাই কর্মধারয়-এর বৈশিষ্ট্য। অতএব বলা যায়—সমানাধিকরণ তৎপুরুষ সমাসই কর্মধারয়। অথবা—প্রথমা বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন দুই পদে যে সমাস হয় এবং যাহাতে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য সূচিত হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলে। পৌর্বাপর্য বা যৌগপদ্য বুঝাইতে দুইটি বিশেষণ পদে বা দুইটি বিশেষ্য পদে এই সমাস হইতে পারে।

অতিরিক্ত উদাহরণ

(i) নীলাকাশ, সদাচার, নবপল্লব, মহাজন, পুণ্যতীর্থ, পরমেশ্বর, নব-মেঘ, মৃতপতি, হরিৎক্ষেত্র, বামহস্ত, পূর্ণচন্দ্র, প্রিয়জন, কাণাকড়ি, খাসতালুক, বড়াপাক, রক্তজবা, শুভবিবাহ ইত্যাদি।

(ii) অম্লমধুর, ভয়ঙ্কর সুন্দর, সতীসাধ্বী, মিঠেকড়া, চালাক-চতুর, জীবন্মৃত, গণ্যমান্য, হৃষ্টপুষ্ট, ওতপ্রোত, পণ্ডিত-মূর্খ, সহজ-সরল, সাদাসিধে ইত্যাদি।

(iii) দেবর্ষি, পণ্ডিতমহাশয়, দাদাবাবু, বৌদিদি, মা-গোঁসাই, খুড়শ্বশুর, পিসেমশাই, মাসশাশুড়ী, পিতৃদেব, গুরুঠাকুর, মাঠাকরুণ, গণ্ডদেশ, জ্ঞাতিশত্রু ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসের নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

(ক) **মহাদেব**—'মহান্' যে 'দেব ; **মহামাস**—মহৎ যে মাস (মাংস)।

['মহৎ' শব্দের স্থানে মহা হইয়া যায়।]

(খ) **মহারাজ্ঞী**—'মহতী' এমন 'রাজ্ঞী'; **শুক্লত্রয়োদশী**—'শুক্লা' যে 'ত্রয়োদশী' ; **মহাষ্টমী**—'মহতী' এমন 'অষ্টমী'।

[কর্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ-পূর্বপদের পুংবদ্ভাব হয়; কাজেই 'মহতী'-স্থলে 'মহান্' এবং পরে 'মহা' হইয়াছে।]

(গ) **পটোল ভাজা**—'ভাজা' এমন 'পটোল'; **বেগুন-পোড়া**—'পোড়া' এমন 'বেগুন' ; **তাপসবৃদ্ধ**—'বৃদ্ধ' এমন 'তাপস' প্রভৃতি স্থলে উত্তরপদের **পূর্বনিপাত** হয়। অনুরূপ—হলুদ-বাটা[১], মতিচ্ছন্ন[২], জল-পড়া, জনচারেক[৩], মাসদুয়েক, নরাধম[৪], পুরুষোত্তম প্রভৃতি।

দ্রষ্টব্য ঃ ১। হলুদ-বাটা='বাটা' এমন হলুদ' হইলে কর্মধারয়ে পূর্বনিপাত, কিন্তু 'বাটা' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ হইলে 'হলুদের বাটা' অর্থে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে; যেমন—হলুদ-বাটা শেষ হ'ল? অনুরূপ—বেগুন-পোড়া, মাছ ভাজা ইত্যাদি।

(ঘ) **মহারাজ**—'মহান্' যে 'রাজা' [যেমন 'মহৎ' শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশ হয় তেমনি 'রাজন্' শব্দের স্থানে 'রাজ' হইয়া থাকে]; কিন্তু 'মহান্ রাজা যেখানে'= মহারাজা [দেশ]।

(ঙ) সংস্কৃতে যাহাকে কু-তৎপুরুষ বাংলায় তাহাকে কর্মধারয় বলা হয়; যথা—**কাপুরুষ**—'কু' যে 'পুরুষ' ; **কদাচার**—'কু' যে 'আচার' ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ 'কুৎসিত' যে পুরুষ' অর্থে **কুপুরুষ** হইবে। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'কু'-স্থানে 'কৎ' হয়।

(চ) **পূর্বাহ্ন**—'পূর্ব' যে 'অহ্ন' [কর্মধারয় সমাসে 'অহন্' শব্দের স্থানে 'অহ্ন' হইয়া থাকে]; অনুরূপ—**পরাহ্ন**, পুণ্যাহ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ **পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ,** প্রভৃতিকে সংস্কৃত ব্যাকরণে **একদেশী** সমাস বলে এবং 'অহন্'-শব্দের স্থানে 'অহ্ন' হইয়া যায়, কারণ অহের পূর্বভাগ' বা 'অপর ভাগ' দ্বারা উহার একদেশ বা একাংশ বুঝায়; কিন্তু বাংলায় ইহাদিগকে **ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে পূর্বনিপাত বলা যাইতে পারে।**

উপমাত্মক কর্মধারয়

দুইটি ভিন্নজাতীয় পদার্থের মধ্যে কোন বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হইলে আমরা একের সহিত অন্যের তুলনা করিয়া থাকি। যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহাকে উপমান, যাহার তুলনা করা হয় তাহাকে উপমেয় বা উপমিত বলে। এবং যে বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাকে সাধারণ ধর্ম বা সামান্য গুণ বলা হয়।

কাজল এর কালো রঙ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে লক্ষ্য করিয়া কাজল-এর সহিত আকাশ-এর তুলনা করা হয় কাজল উপমান এবং আকাশ উপমেয় হইবে, আর কালো হইবে সাধারণ ধর্ম।

(ক) উপমান-পদের সহিত সাধারণ ধর্ম-বাচক পদের সমাস হইলে তাহাকে উপমান-কর্মধারয় সমাস বলে ; যথা—

'কাজলের' মত 'কালো' = কাজল-কালো বা কজ্জল-কৃষ্ণ [কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ]; ঘনের [মেঘের] ন্যায় কৃষ্ণ = ঘনকৃষ্ণ। অনুরূপ— রক্তরক্তিম, মিশকালো [মিশির মত কালো], জলদগম্ভীর, শশব্যস্ত [শশের ন্যায় ব্যস্ত], কুন্দশুভ্র, শঙ্খধবল, ভ্রমর-কৃষ্ণ, কুসুম কোমল, শিরীষ-পেলব, ফুটি-ফাটা, গো-বেচারী, সিঁদুর-রাঙা, হস্তি-মূর্খ ['হস্তীর ন্যায় 'মূর্খ' হস্তিন্ শব্দের 'ন্'-লোপ], বক-ধার্মিক, বিড়াল-তপস্বী ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—উপমান কর্মধারয় সমাসে বিশেষ্য উপমান পূর্বপদ হয় এবং সাধারণ ধর্ম-বাচক বিশেষণটি উত্তরপদ হইয়া থাকে। 'বক-ধার্মিক', 'বিড়াল-তপস্বী'কে উপমিত-কর্মধারয় বলিলে ভুল হইবে।

(খ) যে সমাসে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না এবং এই অনুল্লেখিত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপমেয়কে পূর্বপদ ও উপমানকে উত্তরপদ করিয়া সমাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে উপমিত-কর্মধারয় সমাস বলে; যথা— পুরুষ সিংহ—'পুরুষ' 'সিংহে'র ন্যায়; নর-শার্দূল—'নর' শার্দূলের ন্যায়। অনুরূপ—নরসিংহ[১], ঋষি-পুঙ্গব—ঋষি পুঙ্গবের ন্যায় [পুঙ্গব = বৃষ ('শ্রেষ্ঠ' অর্থে)]; ভরতর্ষভ—ভরত ঋষভের ন্যায় [ঋষভ = বৃষ "শ্রেষ্ঠ' অর্থে)], মুখ-চন্দ্র[২], বাহু-লতা, ভুজ-বল্লরী, অধর-পল্লব, চরণ-কমল, পাদ-পদ্ম ইত্যাদি।

বাংলায় কখনও কখনও উপমান-কে পূর্বপদ এবং উপমেয়-কে উত্তরপদ করিয়াও এই উপমিত-কর্মধারয় সমাস হয়; যথা—সোনামুখ—সোনার মত মুখ; সোনামুগ—সোনার মত মুগ; চাঁদমুখ—চাঁদের মত মুখ; চন্দ্র-বদন; *ফুল-বাতাসা [সাধারণ-ধর্ম 'হালকা'-ত্ব; ফুল-কুমার [সাধারণ-ধর্ম 'সৌন্দর্য']; আম-সন্দেশ; গাধাবোট; চন্দ্রপুলি ইত্যাদি।

১। সিংহ'-শব্দে 'শ্রেষ্ঠ' বুঝাইলেই 'নরসিংহ' উপমিত-কর্মধারয় হইবে; 'যিনি নর তিনিই সিংহ' [হিরণ্যকশিপুর সংহারকর্তা] বুঝাইলে সাধারণ কর্মধারয় সমাস হইবে। অনুরূপ—নৃসিংহ।

২। মুখ, বাহু, ভুরু, অধর, চরণ, পাদ যথাক্রমে 'চন্দ্র', 'লতা', বল্লরী', 'পল্লব,' 'কমল' ও পদ্ম'-এর সদৃশ কিন্তু একটি অপরটি হইতে অভিন্ন নহে অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানে বিশেষ গুণে সদৃশ হইলেও তাহারা স্বতন্ত্র পদার্থ।

এইরূপ বুঝাইলেই উপমিত কর্মধারয় হইয়া থাকে। উপমেয়-কে উপমান হইতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া সমাস করিলে রূপক-কর্মধারয় হইবে; যথা—'মুখ রূপ চন্দ্র' মুখচন্দ্র [মুখচন্দ্রে আলোকিত অন্ধকার ঘর]।

৩। 'ফুল-বাবু' উপমিত-কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ নহে। 'ফুলের ন্যায় বাবু' অর্থহীন। ফুল (full) যে বাবু—কর্মধারয় সমাস হইবে।

(গ) যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় অভিন্ন কল্পিত হয় (সুতরাং সামান্য-পদের প্রশ্নই উঠিতে পারে না), তাহাকে রূপক কর্মধারয় বলে। এই সমাসে 'পূর্বপদ' হয় 'উপমেয়' এবং 'উত্তরপদ', 'উপমান'; দুইটিই বিশেষ্য; যথা—

জীবন উদ্যান—'জীবন'-রূপ 'উদ্যান' বা 'জীবন'ই 'উদ্যান'; যৌবন-কুসুম—'যৌবন'-রূপ 'কুসুম' ["জীবন উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতদিন রবে?"—মাইকেল]; মনমাঝি—'মন'-রূপ 'মাঝি' বা 'মন'-ই 'মাঝি' ["মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বইতে পারলাম না"—বাউল সঙ্গীত]। অনুরূপ—ক্রোধাগ্নি, বিষাদসিন্ধু, শোকানল, সংসার-সাগর, ভব-সিন্ধু, প্রাণ পাখী, দেহ-পিঞ্জর, সমর-বহ্নি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—উপমান-উপমেয়ের 'অভেদ' কল্পিত না হইলে রূপক-কর্মধারয় হইবে না; কেবল 'সাদৃশ্য' সূচিত হইলে উপমিত-কর্মধারয় হইবে। "মাতৃ-

পাদ-পদ্মে প্রণাম কর"—এখানে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে 'পাদ পদ্মের ন্যায়'; সুতরাং উপমিত-কর্মধারয় সমাস হইয়াছে, কিন্তু, "মা তোর পাদ-পদ্মে যেন ভ্রমর হ'য়ে রই" বলিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে 'পাদ' এবং 'পদ্ম' অভিন্ন কল্পিত হইয়াছে। মুখচন্দ্র—'মুখ চন্দ্রের ন্যায়'—অর্থে উপমিত-কর্মধারয়; কিন্তু 'মুখ-রূপ চন্দ্র' বুঝাইলে রূপক-কর্মধারয় হইবে। অতএব ইহাদের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিয়া সমাস নির্ণয় করিতে হয়। "চুম্বিত মুখ-চন্দ্র"—উপমিত-কর্মধারয়; 'উজল ভবন মুখ-চন্দ্রে"—রূপক-কর্মধারয়; "মুখ-চন্দ্র েহারিয়া আনন্দ অপার"—উপমিত-কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় দুইই হইতে পারে।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহাসন—সিংহ-'চিহ্নিত' আসন; পলান্ন—পল-'মিশ্রিত' অন্ন; ছায়া-তরু—ছায়া'-প্রধান' তরু; স্বর্ণ-মুদ্রা—স্বর্ণ-'নির্মিত' মুদ্রা; জন্মোৎসব—জন্ম-'স্মারক' উৎসব; স্মৃতি সৌধ—স্মৃতি-'রক্ষক' সৌধ; ভিক্ষান্ন—ভিক্ষা-'লব্ধ' অন্ন; বটবৃক্ষ—বট-'নামক' বৃক্ষ; গন্ধ-বণিক্—গন্ধ-'বিক্রেতা' বণিক্। উপরি-লিখিত উদাহরণ গুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ব্যাস-বাক্যে পূর্বপদ গুলি সমাসবদ্ধ বিশেষণ পদ এবং উহার ব্যাস-বাক্যে উত্তরপদ রূপে যে পদগুলি পাওয়া যায় স্থূলাক্ষর সমস্তপদে তাহাদের লোপ ঘটিয়াছে। কিন্তু বিশেষণ বিশেষ্যে নিষ্পন্ন কর্মধারয়ের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ব্যাস্‌বাক্যে তাহাদের প্রয়োগ অনিবার্য। এইপদগুলি পূর্বপদ ও উত্তরপদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই জন্য এইরূপ সমাসকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

বলে। এখানে সবিশেষ লক্ষণীয়—

(৵০) পূর্বপদটি একটি সমাসবদ্ধ বিশেষণ পদ হইবে; যথা—

'সিংহ-চিহ্নিত' ['সিংহ'দ্বারা 'চিহ্নিত'], 'পল-মিশ্রিত' ['পল'দ্বারা 'মিশ্রিত']

(৵৹) উত্তরপদ বিশেষ্য হইবে এবং তাহার অর্থই প্রধান হইবে।

(৵৹) মধ্যবর্তী যে পদটিকে লুপ্ত করিয়া সমাস করিতে হইবে তাহা ব্যাস-বাক্যে স্বতন্ত্রপদরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না; তাহা সমস্ত-বিশেষণ-পূর্বপদের অন্তর্ভূত।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য কয়েকটি স্মরণ রাখিলে ব্যাসবাক্য নিরূপণে বা সমাস নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হইবার কারণ থাকিতে পারে না।

আরও কয়েকটি তৎসম উদাহরণ:

স্বর্ণাক্ষর—স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষর [স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল অক্ষর বলিলে ভুল হইবে]; **বিম্বাধর**—বিম্ব-রক্তিম অধর ['বিম্বসদৃশ রক্তিম অধর' বলিলে ভুল হইবে]; **জলহস্তী**—জলে-বাসী হস্তী; **বরযাত্রী**—বরসহ যাত্রী; **যমযন্ত্রণা**—যমদত্ত যন্ত্রণা; **খ্রীষ্টধর্ম**—খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম; **অর্থনীতি**—অর্থ-বর্দ্ধনী নীতি; **স্বাধীনতা দিবস**—স্বাধীনতা-স্মারক দিবস; **প্রীতি-উপহার**—প্রীতিপূর্ণ উপহার [সংস্কৃতে সমাসে সন্ধি অবশ্যকরণীয় বলিয়া 'প্রীত্যুপহার' হইয়া থাকে]; **অশ্বসৈন্য**—অশ্বারূঢ় সৈন্য; **একাদশ**—একাধিক দশ; **ষোড়শ**—ষড়ধিক দশ ইত্যাদি।

কয়েকটি অতৎসম উদাহরণ:

ঘি ভাত—ঘি-মিশান বা ঘিয়ে রাঁধা ভাত; **ডাক-গাড়ী**—ডাক-বাহী গাড়ী; **সিঁদুর-কৌটা**—সিঁদুর-রাখা কৌটা; **পা-জামা**—পায়ে-পরা জামা; **মনি-ব্যাগ**—মনি-রাখা ব্যাগ; **হাত-ঘড়ি**—হাতে-পরা ঘড়ি; **দই-বড়া**—দই-মাখা বড়া; **ঘর-জামাই**—ঘর-পোষা জামাই; **দুধ-সাগু**—দুধ-মিশান সাগু; **তুফান-মেল**—তুফান-বেগ মেল; **দুধ-ভাত**—দুধ-মাখা ভাত; **চালকুমড়া**—চালে-ফলা কুমড়া; **আক্কেল-দাঁত**—আক্কেল-সূচক দাঁত; **হাসিমুখ**—হাসিমাখা বা হাসিভরা মুখ; **কাঠ-কয়লা**—কাঠ-পোড়া বা কাঠ-পোড়ানো কয়লা*; **হাঁটু-জল**—হাঁটু-ডোবা বা হাঁটু-গভীর জল* ইত্যাদি।

* " 'কাঠ-কয়লা,' কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। 'হাঁটু-জল', হাঁটু পর্যন্ত গভীর যে জল সেই জল"—রবীন্দ্রনাথ। এরূপ ব্যাসবাক্য যে হইতে পারে না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার—'ঘর-জামাই' (=শ্বশুরের ঘরে থাকে যে জামাই)। বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ শব্দটির অর্থমাত্র, ব্যাসবাক্য নহে।

কবিশেখর কালিদাস রায় উপমাত্মক মধ্যপদলোপীর উদাহরণ দেখাইয়াছেন—"শ্যেনের দৃষ্টির মত দৃষ্টি—শ্যেনদৃষ্টি। কাঠের মত শুষ্ক হাসি—কাষ্ঠহাসি।" কিন্তু এরূপ

ব্যাসবাক্যে কর্মধারয় সমাস হইতে পারে না। প্রথম উদাহরণে 'দৃষ্টি'র অর্থ প্রধান হইলে ব্যাসবাক্য হইবে 'শ্যেনের দৃষ্টি' এবং সমাস হইবে ষষ্ঠীতৎপুরুষ। কাহারও দৃষ্টির প্রসঙ্গে "শ্যেনদৃষ্টি' প্রযুক্ত হইলে একটি অলঙ্কারের সৃষ্টি করিবে, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের নহে, আর ২য় উদাহরণে ব্যাসবাক্য হইবে 'কাষ্ঠশুষ্ক হাসি'।

দ্বিগু সমাস

যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে; যথা—সপ্ত অহ (-এর সমষ্টি)=সপ্তাহ।

সংস্কৃতে দ্বিগু-সমাসকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) তদ্ধিতার্থ, (২) উত্তরপদ এবং (৩) সমাহার। (১) 'দ্বি' (দুই) 'গো' (গরু)-র দ্বারা ক্রীত অর্থাৎ যাহার মূল্য দুইটি গরুর মূল্যের সমান বা যাহা 'দুইটি গরুর বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়াছে' =দ্বিগু। বাংলায় অনুরূপ উদাহরণ নামবাচক—এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, ন কড়ি ইত্যাদি।

'উত্তরপদ দ্বিগু' বাংলায় চলে না; কিন্তু সমাহার দ্বিগুর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। সমাহার শব্দের অর্থ 'সমষ্টি' বা 'সমবায়'; সুতরাং 'সমষ্টি' বা 'সমবায়' অর্থেই সমাহার দ্বিগু সমাস হইবে।

সমাহার দ্বিগুর তৎসম উদাহরণ:

সপ্তাহ—সপ্ত অহের সমাহার; পঞ্চভূত—পঞ্চ ভূতের সমাহার। অনুরূপ—ত্রিভুবন, সপ্তর্ষি, নবগ্রহ, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, অষ্টবসু, ষড়্‌ঋতু, চতুর্বর্গ, পঞ্চপ্রদীপ, চতুরঙ্গ, দশচক্র, অষ্টপ্রহর ইত্যাদি।

কখনও কখনও সমাহার দ্বিগু সমাসে অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত উত্তরপদ ঈ কারান্ত হইয়া যায়; যথা—শতাব্দী—শত অব্দের সমাহার; পঞ্চবটী—পঞ্চ বটের সমাহার। অনুরূপ—ত্রিলোকী।

[বাংলায় 'ত্রিলোক' চলে; যেমন—"হথায় ত্রিলোক-নাথ বলদে চড়িয়া"—ভারতচন্দ্র।], ত্রিপদী, চতুষ্পদী, সপ্তশতী ইত্যাদি।

অতৎসম উদাহরণ :

ত্রিফলা—ত্রি [তিন] ফলের সমাহার ; সাতঘাট—সাত ঘাটের সমাহার ; পাঁচফোড়ন ; পাঁচজন ; দশজন [পাঁচজনে যা বলে শোন, দশজনে যাকে মানে সে-ই ত মানুষ ।] আটকলাই ; দুইবেলা ; বারমাস ; চৌহদ্দী ; দুয়ানী ; দশ-আনী ; পশুরী [>পাঁচসেরী] ইত্যাদি ।

লক্ষণীয়—সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদ হইলেই দ্বিগুসমাস হয় না । 'দশ আনন যাহার'—অর্থে দশানন শব্দে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে [পরে বহুব্রীহি সমাসের আলোচনা দ্রষ্টব্য] ।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদদ্বয়ের উভয়ের অর্থ ই প্রধানরূপে প্রতীত হয় [দুইটির অধিক পদ থাকিলে প্রত্যেকটির অর্থ ই সমান প্রাধান্য পায়] তাহাকে দ্বন্দ্ব* সমাস বলে । †এবং, ও, আর—সংযোজক অব্যয় দ্বারা ব্যাসবাক্যে পদনিচয়ের সম্পর্ক প্রদর্শিত হয় ; যথা—মাতাপিতা—মাতা ও পিতা ; দেবাসুর—দেব ও অসুর ; দাসদাসী—দাস ও দাসী ; চাল-ডাল-তেল নুন—চাল আর ডাল ও তেল এবং নুন ইত্যাদি ।

(ক) সাধারণতঃ বিশেষ্যে বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব সমাস হইলেও বিশেষণে বিশেষণেও দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারে ; যথা—'সিত' ও 'অসিত'—সিতাসিত ["সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি"—কবিকঙ্কণ] ; 'হিত' এবং 'অহিত'—হিতাহিত ; 'ভাল' ও 'মন্দ'—ভালমন্দ ; ন্যূনাধিক ; ন্যায্যান্যায্য ; স্থাবর-অস্থাবর ইত্যাদি ।

(খ) দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষর পদটি পূর্বে বসে ; যথা—'ঝী' ও 'জামাই'—ঝী-জামাই ; 'রুই' ও 'কাতলা'—রুই-কাতলা ; 'মুড়ি' ও 'মুড়কী'—মুড়ি-মুড়কী ; 'পাপ' ও 'পুণ্য'—পাপ-পুণ্য ; 'গ্রহ' এবং 'নক্ষত্র'—গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি ।

---

* উভয়পদার্থ প্রধানো দ্বন্দ্বঃ । † চার্থে দ্বন্দ্ব. ।

(গ) অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষর না হইলেও স্ত্রীবাচক পদ এবং যে পদের গৌরব অধিক তাহা পূর্বে বসিবে; যথা—'মাতা' এবং 'পিতা'—মাতাপিতা [বাংলায় 'পিতা-মাতা'ও বলে]; 'স্ত্রী' এবং 'পুরুষ'—স্ত্রী-পুরুষ; 'রাধা' এবং 'কৃষ্ণ'—রাধাকৃষ্ণ; 'সীতা ও 'রাম'—সীতারাম; 'লক্ষ্মী' এবং 'নারায়ণ'—লক্ষ্মীনারায়ণ; 'গুরু' ও 'শিষ্য'—গুরুশিষ্য ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—হর-গৌরী; ভাই-বোন; শ্বশুর-শাশুড়ী; বাপ-মা ইত্যাদি।

(ঘ) 'রাত্রি' ও 'নিশা' দ্বন্দ্ব সমাসে অ-কারান্ত হইয়া যায়; যথা—'অহঃ' এবং 'রাত্রি'—অহোরাত্র; 'অহঃ' এবং 'নিশা'—অহর্নিশ ইত্যাদি।

(ঙ) কয়েকটি দ্বন্দ্ব সমাস-নিষ্পন্ন পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়; যথা—'কুশ' ও 'লব' —কুশীলব; 'দ্যৌ' ও 'পৃথিবী'—দ্যাবাপৃথিবী।

(চ) সংস্কৃত সমাহার দ্বন্দ্বের ব্যবস্থা থাকিলেও বাংলায় উহার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। 'হাত' ও 'পা'—হাত পা; 'ঢাক' ও 'ঢোল'—ঢাক-ঢোল; 'রথ' ও 'অশ্ব'—রথাশ্ব; 'গঙ্গা' ও 'ব্রহ্মপুত্র'—গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতিকে সংস্কৃত-ব্যাকরণে সমাহার দ্বন্দ্ব বলা হয়; কিন্তু বাংলায় মাত্র দ্বন্দ্ব বলিলেই চলে।

(ছ) সাপে-নেউলে; আদায়-কাঁচকলায়; চালে ভেঁতুলে প্রভৃতিকেও সমাহার দ্বন্দ্ব বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ত্র বিভক্তি অলুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে অলুক্ দ্বন্দ্ব বলা যায়।

(জ) অর্থের সম্প্রসারণ বা ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় দুইটি 'সমার্থক' বা 'প্রায়-সমার্থক' বিশেষ্য পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয়; এইরূপ সমাসকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলিতে হয়। কেন না, এক্ষেত্রে উত্তর পদ যেমন পূর্বপদের অর্থকে সম্প্রসারিত করে, পূর্বপদও তেমনি উত্তরপদের অর্থকে ব্যাপকতর করে। উভয় পদের অর্থই প্রধান এবং তাই এইগুলি নিঃসন্দেহে দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ; যথা—আত্মীয়-স্বজন, জন-মানব, মাথা-মুণ্ড, রাজা-বাদশা, ছেলে-ছোকরা, ভয়-ডর, লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, সোর-গোল, ডাক্তার-বৈদ্য, কাগজ-পত্র, খেত-খামার, গা-গতর, শাক-সব্জী, খোঁজ-খবর, চাল-চলন, মাল-মসলা, ফন্দি-ফিকির, মান-ইজ্জৎ, সাজ-সরঞ্জাম, ভাগ-বাঁটোয়ারা, ধন-দৌলত, ইত্যাদি।

(ঝ) কখনও কখনও বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয় ; যথা—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ; চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ ; জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম ; দারা-পুত্র পরিবার ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ ; যম-জামাই-ভাগনে ইত্যাদি।

লক্ষণীয় :

(/০) মাতা এবং পিতা=মাতা-পিতা, তাহাদের দ্বারা হীন—মাতাপিতৃহীন, সুতরাং 'যাহার মাতা এবং পিতা (জীবিত) নাই' বুঝাইতে পদ হইবে মাতাপিতৃহীন। মাতৃ-পিতৃহীন—যাহার মাতার পিতা বা মাতামহ নাই এবং পিতৃমাতৃহীন—যাহার পিতার মাতা বা পিতামহী নাই।

(৵০) কাপড়-চোপড়, ভাত টাত ভাত-ফাত, বাসন-কোসন প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সমাসের উদাহরণ হইতে পারে না ; কারণ উত্তরাংশের (চোপড়, টাত প্রভৃতি) স্বতন্ত্র পদরূপে ব্যবহার নাই।

বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি—বহু (অনেক) ব্রীহি (ধান) যাহার। উপরের উদাহরণটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় বহুব্রীহি এই সমস্তপদটিতে পূর্বপদ 'বহু', বা উত্তরপদ 'ব্রীহি'-র—অর্থকে প্রাধান্য না দিয়া ইহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্যপদের অর্থকেই প্রধানরূপে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ 'বহুব্রীহি'র অর্থ হইল 'এমন এক ব্যক্তি যাহার অনেক ধান আছে।' এইজন্য এই শ্রেণীর সমাসের নাম দেওয়া হইয়াছে বহুব্রীহি। তাই বলা যায়—

যে সমাসে সমস্যমান পদদ্বয়ের কোনটির অর্থকে প্রধানরূপে না বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

(ক) মহাত্মা—মহান্ আত্মা যাহার ; দৃঢ়চিত্ত—দৃঢ় চিত্ত যাহার। অনুরূপ—সদাশয় ; কৃতবিদ্য [কৃতা বিদ্যা যৎকর্তৃক] ; নীলকণ্ঠ ; গৌরাঙ্গ ; জিতেন্দ্রিয় ; কৃতকার্য ; দীর্ঘকায় ; মহাবাহু ; তীক্ষ্ণধী ; সরু-পাড় (ধুতি), কালো বরণ ইত্যাদি।

(খ) বীণাপাণি—বীণা পাণিতে যাহার ; ধর্মবুদ্ধি—ধর্মে বুদ্ধি যাহার ; পদ্মনাভ—পদ্ম নাভিতে যাহার। অনুরূপ—শূলপাণি ; রত্নগর্ভা (নারী) ; গোঁফ খেজুরে

[গোঁফে খেজুর যাহার]; জুতো-পায়ে; কোঁচা-হাতে; চশমা-চোখে; মাথায় টেরি ইত্যাদি।

(ক)-এর উদাহরণগুলিতে পূর্বপদ 'বিশেষণ' এবং উত্তরপদ 'বিশেষ্য'; আর উহাদের আধার বা বিভক্তি এক অর্থাৎ দুইটি পদই প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত বা সমানাধিকরণ। এইরূপ 'বহুব্রীহি সমাস'-কে সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি বলে।

(খ)-এর উদাহরণগুলিতে দুইটি পদই 'বিশেষ্য' এবং উহাদের আধার বা বিভক্তি-ও স্বতন্ত্র। এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস-কে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। বহুব্রীহি-সমাস প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতে-ই বিভক্ত—সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ। ইহা ছাড়াও বহুব্রীহি সমাসের নানা প্রকারভেদ রহিয়াছে কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে সেগুলিও এই দুইটির অন্যতর বিভাগের অন্তর্গত হইবে।

(গ) পারস্পরিকতা বুঝাইতে একই শব্দকে পূর্বপদ ও উত্তরপদ করিয়া যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাহাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে। সাধারণতঃ পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই, যুক্ত করিয়া সমস্তপদ গঠন করিতে হয়; যথা—দণ্ডাদণ্ডি—দণ্ডে দণ্ডে যে যুদ্ধ; লাঠালাঠি—লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ। অনুরূপ—কেশাকেশি, হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি [স্বরসঙ্গতিতে 'ঘুষোঘুষি'], গালাগালি [গালিতে গালিতে অর্থাৎ পরস্পরকে গালি দিয়া যে লড়াই] ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—(৵০) মূলতঃ যুদ্ধ বুঝাইতে এইরূপ সমস্তপদ গঠিত হইলেও পরে অন্যান্য ক্রিয়ার পারস্পরিকতা-দ্যোতনায়ও ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা—কাণাকাণি [কাণে কাণে যে মন্ত্রণা]; গলাগলি [গলায় গলায় যে মিল]; কোলাকুলি [কোলে কোলে যে মিলন]

(৵০) পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়ার বোধ জন্মাইতে করণবাচক পদের দ্বারা ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হয়। মারামারি, কামড়া-কামড়ি, খুনাখুনি প্রভৃতিতে 'মার', 'কামড়' ও 'খুন' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হইলেও যুদ্ধের করণ-রূপে গ্রহণীয়। সুতরাং ইহাদিগকে ব্যতিহার-বহুব্রীহির উদাহরণ বলা যায়। কিন্তু 'দেখাদেখি', 'গড়াগড়ি', 'ঘোরাঘুরি' প্রভৃতি পদে ক্রিয়ার পারস্পরিকতা সূচিত হয় না এবং উহাদের 'করণত্বের' প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহাদিগকে শব্দ-দ্বৈতের নিদর্শন বলিতে হয়।

(ঘ) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যে সমাসে মধ্যবর্তী পদ লুপ্ত হয়, সমস্যমান পদদ্বয়ের কোনটিরই অর্থ প্রাধান্য থাকে না এবং তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদের অর্থ সূচিত হয়, তাহাকে **মধ্যপদলোপী** বহুব্রীহি বলে ; যথা—

(১) বি'গত' ধব যাহার (স্ত্রী)—**বিধবা** ; নি'র্গত' মল যাহা হইতে—**নির্মল** ; বি'চলিত' মন যাহার—**বিমনা** ; প্র'কৃষ্ট' বল যাহার—**প্রবল** ; উ'ন্নমিত' মুখ যাহার—**উন্মুখ** ; বি'গত' অর্থ যাহার—**ব্যর্থ** ; বি'গত' জন যথা হইতে—**বিজন** ইত্যাদি।

(২) চন্দ্র-'সুন্দর' মুখ যাহার (স্ত্রী) **চন্দ্রমুখী** ; বিম্ব-'রক্তিম' অধর যাহার (স্ত্রী)—**বিম্বাধরা** ; অশ্রু-'সিক্ত' মুখ যাহার (স্ত্রী)—**অশ্রুমুখী** ; সোনা-'চক্‌চকে' মুখ যাহার (স্ত্রী)—**সোনামুখী** ; কমল-'বর্ণ' অক্ষি যাহার—**কমলাক্ষ** ইত্যাদি।

(৩) সিংহের 'বিক্রমের' মত 'বিক্রম' যাহার—**সিংহবিক্রম** ; হয়ের (ঘোড়ার) 'গ্রীবার' মত 'গ্রীবা' যাহার—**হয়গ্রীব** ; মৃগের 'অক্ষি'র মত 'অক্ষি' যাহার (স্ত্রী)—**মৃগাক্ষী** ; বিড়ালের 'চোখ-এর মত 'চোখ' যাহার—**বিড়ালচোখো** ; পেঁচার 'নাক'-এর মত নাক যাহার (স্ত্রী)—**পেঁচানাকী** ; ডাক (ডাকাত)-এর 'বুকের মত বুক যাহার—**ডাকাবুকো** ইত্যাদি।

(৪) পাঁচ হাত [দৈর্ঘ্য] যাহাতে—**পাঁচহাতী** ; দশ গজ [পরিমাণ] যাহার—**দশগজী** ; বার বছর [বয়স] যাহার—**বার-বছুরে** ইত্যাদি।

(১) এখানে 'প্রাদি' অর্থাৎ প্র-প্রভৃতি উপসর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট ধাতুজ-মধ্যপদ লুপ্ত হইয়া বিশেষ্য-উত্তরপদের সহিত বহুব্রীহি সমাস সাধিত হইয়াছে। **বিধবা, প্রবল, উন্মুখ** প্রভৃতিতে পূর্বপদ যথাক্রমে **বি প্র, উৎ**—উপসর্গ, উত্তরপদ **ধব, বল, মুখ**—বিশেষ্য, ধাতুজ-মধ্যপদ **গত, কৃষ্ট, নমিত** লুপ্ত হইয়াছে ; এইজন্য এইরূপ সমাসকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে **প্রাদি বহুব্রীহি** বলিতে চাহেন।

(২) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের** আলোচনায় **মধ্যপদের** যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে এখানেও সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান অর্থাৎ পূর্বপদটি একটি **সমস্ত বিশেষণ পদ** এবং **মধ্যপদটি** ইহার উত্তরপদ। ইহারা **সমানাধিকরণ** বহুব্রীহির উপবিভাগ মাত্র।

(৩) এখানে ব্যাস-বাক্যে উপমা পরিস্ফুট করিতে একটি পদ দুইবার প্রযুক্ত হইলেও সমস্তপদে মাত্র একবারই তাহার প্রয়োগ ঘটিয়াছে। সিংহের বিক্রম=**সিংহবিক্রম** (ষষ্ঠীতৎ), সিংহবিক্রমতুল্য

বিক্রম যাহার=সিংহবিক্রম; পেঁচার নাক=পেঁচানাক (ষষ্ঠীতৎ), পেঁচা নাকতুল্য নাক যাহার (স্ত্রী) =পেঁচানাকী। এই সকল ক্ষেত্রে মধ্যপদ লোপের প্রশ্ন না তুলিয়া 'উত্তরপদ বা শেষপদ লুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। সুতরাং এইরূপ সমাসকে উত্তরপদলোপী বা শেষপদলোপী বহুব্রীহি বলা যাইতে পারে।

(৪) পাঁচহাত, দশগজ প্রভৃতিকে সমাহার দ্বিগুর উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরিমাণার্থে 'ঈ'-প্রত্যয় যোগে পাঁচহাতী, দশগজী পদ হইয়াছে বলা যায়।

(ঙ) নঞ্-বহুব্রীহি

অ-'বিদ্যমান' মল যাহাতে—অমল; অ-'বিদ্যমান' আদি যাহার—অনাদি; অ-বিদ্যমান' বোধ যাহার—অবোধ; অনুরূপ—অজ্ঞান*, অমূল্য, অনন্ত, অপুত্রক, অনর্থ†, অনর্থক ইত্যাদি। অতৎসম—অপয়া, অবুঝ, অভাগা, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এইগুলিকেও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির অন্তর্গত বলা যায়; কেননা অস্ত্যর্থক ধাতুজ মধ্যপদ এখানেও বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্বে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির (১) উদাহরণে নির্মল উল্লেখিত হইয়াছে। 'নির্' একটি নঞর্থক উপসর্গ অর্থাৎ উহাদ্বারাও 'অনস্তিত্ব' বা 'অবিদ্যমানতা' সূচিত হয়। নঞ্-তৎপুরুষ অধ্যায়ে নঞ্-এর বিভিন্ন অর্থের কথা আলোচিত হইয়াছে। নঞ্ বহুব্রীহি-প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এখানে কেবল 'অবিদ্যমান'-বা 'নাই'—অর্থেই নঞ্-পূর্বপদের প্রয়োগ হয় এবং অ (ব্যঞ্জনের পূর্বে), অন্ (স্বরের পূর্বে), নির্ (স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের পূর্বে), আ, না, নি, বে পূর্বপদ রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—

অ—অতুল, অসীম, অনাথ, অসংশয়, অশোক, অতল ইত্যাদি।

অন্—অনঘ [অবিদ্যমান অঘ (পাপ) যাহার], অনঙ্গ, অনন্য, অনুপম ইত্যাদি।

নির্—নির্দয়, নিরঙ্কুশ, নির্বোধ, নির্ভুল, নির্ধন, নিরন্ন, নিঃশঙ্ক, নিস্তরঙ্গ, নিশ্চিন্ত, নির্লজ্জ, নিরন্তর, নিরাকার, নির্দোষ, নিঃসন্দেহ ইত্যাদি।

আ—আ-নাড়ী [নাই নাড়ী (জ্ঞান) যাহার], আ-বাগা ইত্যাদি।

না—না-চার।

নি—নি-খরচা [নিখরচিয়া—নিখরইচ্যা—নিখরচে], নি-নাই [নাই না (নৌকা) যাহার]।

বে—বে-আক্কেল, বে-ইমান, বে-ইজ্জত, বে-কসুর, বে-পরোয়া, বে-হায়া, বে-হেড্ ইত্যাদি।

অতএব বলা যাইতে পারে যে—

যে সমাসে নঞর্থক বা নাই-বাচক অব্যয় পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীত হয় তাহাকে নঞ্-বহুব্রীহি সমাস বলে।

লক্ষণীয়—নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে 'উত্তরপদ' সর্বদা 'বিশেষ্য' হইবে; সুতরাং **নিঃসন্দিগ্ধ, নিরাসক্ত, নিরুৎসুক, নিরুদ্বিগ্ন বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদ হইতে পারে না। কিন্তু কেবল বাংলায় নহে, সংস্কৃতেও ইহাদের প্রয়োগ রহিয়াছে, তবে সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণগণ ইহাকে আর্যপ্রয়োগ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শুদ্ধ নঞ্তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন পদ হইবে যথাক্রমে অসন্দিগ্ধ, অনাসক্ত, অনুৎসুক ও অনুদ্বিগ্ন। বাংলায় উক্ত পদগুলিকে শিষ্টপ্রয়োগ-সিদ্ধ বলিলে ক্ষতি নাই। এবিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"এরূপ স্থলে 'নির্ (নিঃ)'-অর্থে 'নাই' না বুঝিয়া 'না, নহে' বুঝিতে হইবে; 'নিঃ-সন্দিগ্ধ'=না সন্দিগ্ধ, সন্দিগ্ধ নহে=অ-সন্দিগ্ধ: 'নিরাসক্ত'=না আসক্ত, আসক্ত নহে=অনাসক্ত; ইত্যাদি। এই অর্থে শব্দগুলি নঞ্তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন।"

(চ) সহার্থক বা তুল্যার্থক বহুব্রীহি—বিশেষ্য উত্তরপদের সহিত সহার্থক পূর্বপদের সমাস হইলে এবং তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্যপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীত

---

*নহে জ্ঞান=অজ্ঞান (বিশেষ্য), নঞ্তৎপুরুষ; অবিদ্যমান জ্ঞান যাহার—অজ্ঞান (বিশেষণ), নঞ্-বহুব্রীহি।

†নহে অর্থ (সৌভাগ্য)—অনর্থ (=অসৌভাগ্য, বিপৎ—বিশেষ্য), নঞ্তৎপুরুষ; অবিদ্যমান অর্থ (সার) যাহাতে—অনর্থ, অনর্থক, বহুব্রীহি।

**......মৃগয়াং প্রতি নিরুৎসুকং চেতঃ, (কালিদাস)। "......নিরাকুল-বকুল কলাপে" (জয়দেব)। "......যয়া তব নিরুৎসুকাঃ" (বাল্মীকি)। "নিরুৎসুকানামভিযোগভাজাম্" (ভারবি)।

হইলে সেই সমাসকে সহার্থক বা তুল্যার্থক বহুব্রীহি বলে। 'সহ'-ও 'সমান'-এর স্থলে প্রায়শঃ 'স' হইয়া যায়; যথা—স-লজ্জ—লজ্জার সহিত বর্তমান; স-শঙ্ক—শঙ্কার সহিত বর্তমান; স-পুত্র, স-পুত্রক—পুত্রের সহিত বর্তমান; সমান (এক) উদর যাহার—সহোদর, সোদর; সমান (এক) গোত্র যাহার—সগোত্র। অনুরূপ—সজল, সফল, সবান্ধব, সপরিবার, সস্ত্রীক, সকৌতুক, সার্থক, সাকার, সচিত্র, সবাক্, সবর্ণ, সতীর্থ* ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—সহার্থক বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ বিশেষ্য হইবেই। তাহা হইলে সকৃতজ্ঞ, সকাতর, সশঙ্কিত, সচকিত, সক্ষম সঠিক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ বলিতে হয়; অথচ ভাষায় ইহাদের বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন—'দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিল'—শরৎচন্দ্র; 'রজনী সকাতরে বলিল,—বঙ্কিমচন্দ্র; 'কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন'—রবীন্দ্রনাথ; ইত্যাদি। সংস্কৃত মহাভারত, কথাসরিৎসাগর, গীতগোবিন্দ, প্রভৃতি গ্রন্থেও এইসকল পদের প্রয়োগ দেখা যায়। আচার্য ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'শব্দ-কথা' নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। নঞ্‌—বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদের বিপরীতার্থক পদ সহার্থক বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; যেমন—অ-নাথ—স-নাথ; নিরা-কার—সা-কার; অ-চেতন—স-চেতন ইত্যাদি। ইহা হইতেই নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসজাত পদের বিপরীতার্থক পদরূপে বিশেষণ পদের পূর্বে স-এর ব্যবহার আসিয়া গিয়াছে; যেমন—অ-কৃতজ্ঞ—স-কৃতজ্ঞ; অ-কাতর—স-কাতর; অ-ক্ষম—স-ক্ষম ইত্যাদি। আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের মতে এইসকল স্থলে স-এর অর্থ 'অত্যন্ত' (intensive)। 'স'-কৃতজ্ঞ='অত্যন্ত' কৃতজ্ঞ; 'স'-কাতর='অত্যন্ত' কাতর।

(ছ) **অলুক্ বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি সমস্তপদেও অলুপ্ত থাকে তাহাকে অলুক বহুব্রীহি বলে; যথা—মাথায়-পাগ্—(পাগড়ি যাহার মাথায়); হাতে-ছড়ি (ছড়ি হাতে যাহার); গলায়-মালা (মালা গলায় যাহার); ছাতা-মাথায় (ছাতা মাথায় যাহার);

*সমান (এক) তীর্থ্য (গুরু, শিক্ষক) যাহার—সতীর্থ্য; সংস্কৃতে য-ফলা-বিহীন 'তীর্থ'—পুণ্যস্থান, কিন্তু বাংলায় 'সতীর্থ্য'-অর্থেই 'সতীর্থ' ব্যবহৃত হয়।

কোঁচা-হাতে (কোঁচা হাতে যাহার); হাতে-ছড়ি, মাথায়-টেরি, বুকে-ঘড়ি ফুলবাবু হেলে-দুলে বেড়ান পথে হাওয়ার ভারে হন কাবু ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—গায়ে হলুদ, হাতে-খড়ি, মুখে-ভাত প্রভৃতিকে আচার্য সুনীতিকুমার প্রমুখ বৈয়াকরণগণ অলুক্ বহুব্রীহি-র উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ইহাদের সমাসকে অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহি বলিয়াছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ মন্তব্য করিয়াছেন—"বাঙলা 'গায়ে-হলুদ' এবং সংস্কৃত 'গাত্র-হরিদ্রা' অনুষ্ঠানবিশেষের নামবাচক বিশেষ্য। কাজেই সমাস সপ্তমীতৎপুরুষ।"

সংস্কৃতে 'অবূঢ়ান্ন'-তে সমাস মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (অবূঢ় ভোজ্য অন্ন) এবং 'নবান্ন'-তে সমাস কর্মধারয় (নব যে অন্ন) অথচ বাংলায় ব্যাকরণ নামধারী গ্রন্থে দেখা যায় 'আইবুড়ো-ভাত', 'নবান্ন', 'বৌভাত', 'ভাইফোঁটা' প্রভৃতিকে অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণরূপে দেখান হইয়াছে। সমাসের নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। 'অনুষ্ঠান'-কে বুঝাইলে যদি 'অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহি' বলিতে হয়, তবে 'ব্যক্তি'-কে বুঝাইলে 'ব্যক্তিবাচক' এবং 'বস্তু' বুঝাইলে 'বস্তুবাচক' বহুব্রীহি বলিতে হইবে। প্রধান প্রশ্ন হইল—বহুব্রীহির লক্ষণ কী? 'অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ' সংস্কৃত ব্যাকরণের এই সূত্রটিকে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অন্য পদটি যে সমস্যমান পদদ্বয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সে কথাটি সকলে মনে রাখিয়াছেন কি? 'গায়ে-হলুদ' অনুষ্ঠানের নাম বটে, কিন্তু সমস্তপদটিতে কি উত্তরপদ 'হলুদ'-এর প্রাধান্য নাই? উপরন্তু, অনুষ্ঠানের 'গায়ে হলুদ'-এর সংশ্লেষ নাই বা অনুষ্ঠানের 'হাতে খড়ি'-ও থাকে না। "'গায়ে-হলুদ' যদি বহুব্রীহি হয় তবে তাহার গায়ে হলুদ থাকিবেই, ... বজ্র পাণিতে যাঁর সেই অন্যপদার্থ 'ইন্দ্র'-র পাণিতে বজ্র না থাকিলে যে বহুব্রীহিই হয় না।" —অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী। মোটকথা, হাতে-খড়ি, মুখে-ভাত, গায়ে-হলুদ—উত্তরপদার্থ-প্রধান তৎপুরুষ এবং পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি অলুপ্ত বলিয়া অলুক্ সপ্তমীতৎপুরুষ বলিতে হইবে।

বাঙ্লায় বহুব্রীহির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

(১) মা-মরা, ঘুণ-ধরা, মুখ-পোড়া, কাণ-কাটা, পাল-তোলা (জাহাজ), মন-মরা, পাতা-ছেঁড়া (বই), গিলে-করা, গিল্‌টি-করা, লুচি-ভাজা (কড়া, বা ঘি, কিন্তু বামুন-এর বিশেষণ হইলে উপপদতৎপুরুষ হইবে) ইত্যাদি স্থলে 'মরা', 'ধরা', 'পোড়া' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নহে ক্রিয়াজাত বিশেষণ। 'মা মরা যাহার', 'ঘুণ ধরা যাহাতে' এইরূপ ব্যাসবাক্য করিতে হইবে।

(২) সু (শোভন) গন্ধ যাহার=সুগন্ধি (গন্ধ নিজস্ব), সুগন্ধ (অপরের গন্ধে গন্ধযুক্ত); পুষ্পধন্বা, সুধন্বা গাণ্ডীবধন্বা ; পদ্মনাভ, ঊর্ণনাভ ; কমলাক্ষ, বিরূপাক্ষ, মকরাক্ষ ; ['ধনু'-র স্থলে 'ধন্বা', 'নাভি'-র স্থলে 'নাভ', 'অক্ষি'-র স্থলে 'অক্ষ' হয়]।

(৩) অন্যমনস্ক, সপুত্রক, অপুত্রক, নদীমাতৃক, বিপত্নীক, প্রাপ্তবয়স্ক, অল্পবয়স্ক, প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতিস্থলে সমাসান্ত 'ক'-প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে।

(৪) বহুব্রীহি সমাসে 'সহার্থক' ও 'সমানার্থক' পূর্বপদ 'সহ'-স্থানে বিকল্পে 'স' হয় ; যথা—সপরিবার (পরিবারের সহিত বর্তমান), সহোদর বা সোদর (সমান উদর যাহার) ইত্যাদি।

(৫) উত্তরপদ 'জায়া'-স্থানে 'জানি'—যুবজানি (যুবতী জায়া যাহার)।

(৬) উত্তরপদ 'অপ্'-স্থলে 'ঈপ'—দ্বীপ [দ্বি (দুই দিকে) অপ্ (জল) যাহার] ; অন্তরীপ [অন্তর্গত অপ্ যাহার]।

নিত্যসমাস

'নিত্য'-শব্দের অর্থ সর্বদা ; সুতরাং সর্বদাই যে 'সমাস' বর্তমান অর্থাৎ যাহার কখনও 'ব্যাস'-বাক্য বা 'বিগ্রহ'-বাক্য হয় না তাহাকেই বলে নিত্যসমাস। অন্যপদের প্রয়োগ দ্বারা সমস্তপদের অর্থ বুঝাইতে হয় ; যথা—কাচকলা—কলা বিশেষ, ইহা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয় [কাঁচা যে কলা' বলিলে ভুল হইবে] ; কৃষ্ণসর্প—কেউটে [কৃষ্ণবর্ণের একপ্রকার বিষধর সর্প, 'কৃষ্ণ যে সর্প' ব্যাসবাক্যে কর্মধারয় সমাস করিলে যে কোনও কালো সাপ বুঝাইবে]।

গ্রামান্তর, দেশান্তর প্রভৃতির অর্থ 'অন্যগ্রাম', 'অন্যদেশ' এখানেও নিত্যসমাস।

শব্দমাত্র—কেবল শব্দ; শ্রবণমাত্র—কেবল শ্রবণ ইত্যাদিস্থলে নিত্যসমাস বুঝিতে হইবে।

সংস্কৃতে তুল্যার্থক 'সঙ্কাশ', 'নিভ', 'সন্নিভ' এবং নিমিত্তার্থক 'অর্থ' উত্তরপদের সহিত নিত্যসমাস হয়; যথা—জবাকুসুম-সঙ্কাশ (জবাকুসুমের তুল্য); দুগ্ধফেন-নিভ (দুগ্ধফেনের তুল্য); ইন্দ্র-সন্নিভ; (ইন্দ্রের তুল্য); দর্শনার্থ (দর্শনের নিমিত্ত) ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজী Compound-word-এর অনুরূপ যে সকল পদ পাওয়া যায় তাহাদিগকেও নিত্যসমাস-বদ্ধ পদ বলাই সমীচীন। উদাহরণ—কী-করি-কী করি-চিন্তা; "সব পেয়েছি-র দেশ" (রবীন্দ্রনাথ); "ফুট-ফুট-ফুটন-না-মুখখানি" (বঙ্কিমচন্দ্র) ইত্যাদি।

সমাসান্ত-প্রত্যয়

সমাস হইলে সমস্তপদের অন্তে যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাদিগকে সমাসান্ত-প্রত্যয় বলে। সকল সমাসেই এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

সংস্কৃত প্রত্যয়:

অব্যয়ীভাবে: অ—অক্ষির সম্মুখে = প্রতি + অক্ষি + অ = প্রত্যক্ষ।

তৎপুরুষে: অ—পথের রাজা = রাজ + পথিন্ + অ (সংস্কৃতে ড) = রাজপথ;
দেবের রাজা = দেব + রাজন্ + অ ((টচ্) = দেবরাজ।

কর্মধারয়ে: অ - পূর্বে যে অহঃ = পূর্ব + অহন্ + অ (টচ্) = পূর্বাহ্ন;
মহান্ যে রাজা = মহা + রাজন্ + অ (টচ্) = মহারাজ;
প্রিয় যে সখা = প্রিয় + সখি + অ (টচ্) = প্রিয়সখ।

দ্বিগুতে: ঈ—পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চ + বট + ঈ = পঞ্চবটী।

দ্বন্দ্বে: অ—অহঃ এবং রাত্রি = অহঃ + রাত্রি + অ = অহোরাত্র।

বহুব্রীহিতে : অ—পদ্ম নাভিতে যাহার = পদ্ম + নাভি + অ = পদ্মনাভ ;
ধর্মে নিষ্ঠা যাহার = ধর্ম + নিষ্ঠা + অ = ধর্মনিষ্ঠ ।
ই—সু (সুন্দর) গন্ধ যাহার = সু + গন্ধ + ই = সুগন্ধি ;
কেশে কেশে আকর্ষণে যে যুদ্ধ = কেশ + আ + কেশ + ই কেশাকেশি ।
ক(প্)—স্ত্রীর সহিত বর্তমান = স(হ) + স্ত্রী = ক = সস্ত্রীক ;
প্রোষিত (বিদেশবাসী) ভর্তা যাহার (স্ত্রী) = প্রোষিত + ভর্তৃ + ক [+ আ (স্ত্রী)] = প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদি ।

বাংলা প্রত্যয় :

বহুব্রীহিতে : আ—হত ভাগ (ভাগ্য) যাহার = হত + ভাগ + আ = হতভাগা ;
নির্ (নাই) জল যাহাতে = নির্ + জল + আ = নির্জলা ;
হর (নানা) বোল যাহার = হর + বোল + আ = হরবোলা ;
অবিদ্যমান পয় (ভাগ্য) যাহার = (ন)অ + পয় + আ = অপয়া ইত্যাদি ।
ঈ—বে (নাই) হিসাব যাহার = বে + হিসাব + ঈ = বেহিসাবী ।
এ (ইয়া-জাত)—এক গোঁ যাহার = এক + গোঁ + এ (ইয়া) = একগুঁয়ে ।
ও (উয়া-জাত)—এক (দিকে) চোখ যাহার = এক + চোখ + ও (উয়া) = একচোখা ।

দ্বিগুতে : আ—ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রি + ফল + আ = ত্রিফলা ।

সমাসপঞ্জী

সমাস (প্রধান বিভাগ)
১ (পূর্বপদ-প্রধান) অব্যয়ীভাব
২ (উত্তর-পদ প্রধান) তৎপুরুষ
৩ উভয়পদ-প্রধান দ্বন্দ্ব
৪ (অন্যপদ প্রধান) বহুব্রীহি
(অপ্রধান বিভাগ)
(ক) সাধারণ (খ) নঞ্ তৎ (গ) প্রাদিতৎ (ঘ) উপপদতৎ (ঙ) অলুক্তৎ (চ) বিশেষ
সাধারণ
অলুক্
১। নিত্য ২। সুপ্সুপা
(তৎপুরুষের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে)
(।০) ২য়া (৵০) ৩য়া (৶০) ৪র্থী (।০) ৫মী (।/০) ৬ষ্ঠী (।৵০) ৭মী
কর্মধারয়
(ক) সাধারণ (খ) তুলনামূলক (গ) মধ্যপদলোপী (ঘ) বিশেষ
দ্বিগু
(।০) বিশেষণ-বিশেষ্য (৵০) বিশেষ্য-বিশেষ্য (৶০) বিশেষণ-বিশেষণে
(।০) উপমান (৵০) উপমিত (৶০) রূপক
(ক) সমানাধিকরণ
(খ) ব্যধিকরণ
(গ) ব্যতিহার
(ইহাকে সমানাধিকরণের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে)
(।০) সাধারণ (৵০) মধ্যপদ-লোপী (৶০) নঞ্ বহুব্রীহি (।০) তুল্যার্থক বহুব্রীহি (।/০) সংখ্যা বহুব্রীহি
(।০) সাধারণ (৵০) অলুক্ (৶০) উত্তরপদলোপী

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে? সন্ধি ও সমাসের প্রভেদ উদাহরণ যোগে পরিস্ফুট কর।

২। সমাস প্রধানতঃ কত প্রকারের এবং কী কী? প্রত্যেক প্রকারের ১টি করিয়া উদাহরণ লিখ।

৩। সংজ্ঞা-নির্ণয় কর ও উদাহরণ দাও: অব্যয়ীভাব, দ্বিগু, ব্যতিহার বহুব্রীহি, উপপদ-তৎপুরুষ, প্রাদি তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব।

৪। বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহির পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

৫। উদাহরণ যোগে প্রভেদ পরিস্ফুট কর: (ক) কর্মধারয় ও বহুব্রীহি; (খ) নঞ্‌ তৎপুরুষ ও নঞ্‌বহুব্রীহি; (গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি; (ঘ) উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়।

৬। অলুক্‌ সমাস কাহাকে বলে? অলুক্‌-তৎপুরুষ, অলুক্‌-দ্বন্দ্ব ও অলুক্‌-বহুব্রীহির পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৭। সমস্তপদ লিখ ও সমাসের নাম কর: শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া, বিগত অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহা হইতে; নদী মাতা যাহার; সমান উদর যাহার, দশ গজ (দৈর্ঘ্য) যাহার; ঘর পোড়ায় যে; কোলে কোলে যে মিলন; বিগতা পত্নী যাহার; স্ত্রীর সহিত বর্তমান; তিন তার যাহাতে; পঞ্চ বটের সমাহার; কূলের সমীপে; নাই হায়া যাহার; মহান্‌ যে জন; মহত্তের আশ্রয়; প্রিয় যে সখা যুবতী জায়া যাহার; নব জানা; বিড়ালের চোখের মত চোখ যাহার; ভ্রাতার পুত্র; খ্রীস্ট-প্রচারিত ধর্ম, কানে কানে যে কথা; বজ্রের ন্যায় কঠোর; গাণ্ডীব ধনুঃ যাহার; ষট্‌ আনন যাহার; গাছে পাকা; যিনি রাজা তিনিই ঋষি, বিশাল অক্ষি যাহার (স্ত্রী); পূর্বে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত; মগধের রাজা; অহঃ এবং নিশা; পথের রজো, চরণ অরবিন্দের ন্যায়, যে শান্ত সে-ই শিষ্ট।

৮। ব্যাস-বাক্য কর এবং সমাসের নাম বল: ঘিভাত, সুহৃদ্‌, দ্বীপ, অকিঞ্চন, দক্ষিণাপথ, শ্বাপদ, অবুঝ, মেয়ে-স্কুল, কাগজপত্র, গন্ধবণিক, বিলাত-ফেরত, মন-মরা, অন্তরীপ, রাজহংস, চক্রাবক্র, সপত্নী, ঘর-জামাই, বেইমান, হাতে-খড়ি, চলচ্চিত্র, সবাক্‌, মুখ-পোড়া, বসুধা, অজ, কামড়া-কামড়ি, কুরঙ্গাক্ষী, নরপুঙ্গব, বে-পরোয়া, হাভাত, শতাব্দী, ছায়াতরু, অগ্নিভয়, ভিক্ষান্ন, তেমাথা, জনমানব, ডাক্তারবাবু, চাঁদমুখ, পায়াভারী, হেড্‌-পণ্ডিত, ডাকঘর, পুষ্পধন্বা, শ্রীচরণ, শশব্যস্ত, স্বর্গত, সিংহদ্বার, সতীর্থ, বটগাছ, বিপদাপন্ন, পরাৎপর, প্রবল, উন্মুখ, পাদপদ্ম, তেপায়া, লাঠিখেলা, গরমিল, গিলে-করা, নিরর্থক, যুধিষ্ঠির, খাই-খরচ, প্রত্যহ, সায়াহ্ন, উপকথা, কাঁচা-মিঠে, সগোত্র, অন্যমনস্ক, ফুলবাবু, ফুলকুমার, হাত-পাখা, ঊর্ণনাভ, বৌ ভাত, সুগন্ধি, নির্দয়, মহাশয়, অপয়া, আলুনি, জগন-চাঁদা, হরবোলা, অহোরাত্র, নবান্ন, সুগ্রীব, পা-জামা, বক-ধার্মিক, মিশ-কালো, কাপুরুষ, আলু ভাতে, ক্রোধাগ্নি,

ধরক জল, গৌজা-মিল, বিয়ে-পাগলা, আগা-গোড়া, অন্নাম্ভ, ছাগদুগ্ধ, বিশ্বামিত্র, দম্পতী, ডাকাবুকো, পলায় ।

৯। পার্থক্য দেখাও: (ক) মহাভয় ও মহদ্ভয়, (খ) মাতা-পিতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন ও মাতৃপিতৃহীন; (গ) সজাতি ও স্বজাতি; (ঘ) অনর্থ ও অনর্থক; (ঙ) সুগন্ধ ও সুগন্ধি; (চ) কাঁচকলা ও কাঁচাকলা; (ছ) কাপুরুষ ও কুপুরুষ; (জ) ছায়াতরু ও তরুচ্ছায়া; (ঝ) কাজল-কালো ও কালো-কাজল; (ঞ) প্রাণহীন ও হীনপ্রাণ, (ট) বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক; (ঠ) চতুষ্পদ ও চতুষ্পদী; (ড) সপত্নী ও স্বপত্নী; (ঢ) মুখ পোড়া ও পোড়া-মুখ; (ণ) রক্তজবা ও জবারক্ত (ত) পদ্মনাভ ও নাভিপদ্ম; (থ) সূত্রধর ও সূত্রধার; (দ) গৃহবাস ও বাসগৃহ; (ধ) বাসন-মাজা ও মাজা-বাসন।

১০। সমাসান্ত প্রত্যয় কাহাকে বলে? কয়েকটি সমাসান্ত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

১১। নিত্যসমাস ও সুপ্‌সুপা সমাসের সোদাহরণ ব্যাখ্যা লিখ।

শব্দ-প্রকরণ

শব্দের-প্রকারভেদ

শব্দ ও পদের প্রভেদ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। গঠনের দিক্ হইতে বিচারে শব্দ দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য—(১) মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ, (২) সাধিত শব্দ।

(১) **মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ**—যে সকল শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষিত করা যায় না অর্থাৎ যে সকল অর্থযুক্ত ধ্বনি-সমষ্টি স্বরূপে ভাষায় বর্তমান, তাহাদিগকে মৌলিক বা সিদ্ধ শব্দ বলে; যথা—হাত, পা, নাক, কান, সাপ, ঘোড়া, মা, ভাই ইত্যাদি।

(২) **সাধিত শব্দ**—যে সকল শব্দ সার্থকরূপে বিশ্লেষিত হইতে পারে, তাহাদিগকে সাধিত শব্দ বলে; যথা—মৌলিক (মূল+ষ্ণিক); সিদ্ধ (সিধ্+ক্ত); সাধিত (সাধ্+ক্ত); অর্থযুক্ত (অর্থদ্বারা যুক্ত, ৩য়াতৎপুরুষ); ইত্যাদি।

গঠন বিচারে সাধিত শব্দ আবার দ্বিধা বিভাজ্য—(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয়-জাত, (খ) সমাস-নিষ্পন্ন।

[প্রকৃতি, প্রত্যয় ও সমাস-এর কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।]

(ক) **প্রকৃতি-প্রত্যয়-জাত সাধিত শব্দ**—মৌলিক, সাধিত, সিদ্ধ, প্রভেদ (প্র-ভিদ্+অ), বর্তমান (বৃৎ+শানচ্), বৈষ্ণব (বিষ্ণু+ষ্ণ), বঙ্গীয় (বঙ্গ+ষ্ণীয়), চালাকি (চালাক+ই), জানা (জান্+আ) ইত্যাদি।

(খ) **সমাস-নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ**—ধ্বনি-সমষ্টি (ধ্বনির সমষ্টি, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ); সার্থক (অর্থের সহিত বর্তমান, বহুব্রীহি) প্রকৃতি-প্রত্যয়-জাত (প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বন্দ্ব; তাহা হইতে জাত, ৫মী তৎপুরুষ); সমাস-নিষ্পন্ন (সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন, ৩য়া তৎপুরুষ); ইত্যাদি।

অর্থের দিক্ হইতে বিচারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সাধিত শব্দগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য—(৵০) যৌগিক, (৶০) রূঢ় বা রূঢ়ি, (৵৹) যোগরূঢ়।

(৵০) **যৌগিক (সাধিত) শব্দ**—সাধিত শব্দের বিশ্লেষণকে ব্যুৎপত্তিনির্ণয় বলে;

বিশ্লেষিত অংশ সমূহের সমবায়ে যে অর্থের বোধ জন্মে তাহাকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলা হয়; আর শব্দটি ভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শব্দটির যে অর্থ ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে তাহাই ঐ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ বা প্রচলিতার্থ।

যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং প্রচলিতার্থ অভিন্ন অর্থাৎ যে সকল শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে-ই ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে যৌগিক শব্দ বলে; যথা—পাঠক [পিঠ্‌ (পাঠ করা)+ণক (কর্তৃবাচ্যে)]; 'যে পাঠ করে'——ইহাই পাঠক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং এই অর্থেই পাঠক শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত; পড়ুয়া>প'ড়ো [√পড়্‌+উয়া (কর্তৃবাচ্যে)=যে পড়ে]; পঠন [√পঠ্‌+অনট্‌ (ভাবে)=পড়ার কাজ]; হাত-পা [হাত এবং পা]; ইত্যাদি।

(৵০) রূঢ় বা রূঢ়ি (সাধিত) শব্দ—যে সকল শব্দের প্রচলিতার্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যে সকল শব্দ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না তাহাদিগকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে; যথা—

রূঢ় শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
গো	যে গমন করে	গরু
শুশ্রূষা	শুনিবার ইচ্ছা	সেবা
হরিণ	হরণকারী	মৃগ
পাঞ্জাবী	পাঞ্জাবের অধিবাসী	একপ্রকারের জামা
মণ্ডপ	ফেন পান করে যে	দেব-গৃহ
কুশল	কুশ-ছেদনকারী	নিপুণ
মহাজন	শ্রেষ্ঠব্যক্তি	উত্তমর্ণ
ছোটলোক	ক্ষুদ্রব্যক্তি, বেঁটেলোক	নীচ বা হীন ব্যক্তি

ইত্যাদি।

(৶০) যোগরূঢ় শব্দ—যে সকল শব্দের প্রচলিতার্থ তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপেক্ষা সঙ্কুচিত, অর্থাৎ যে সকল শব্দে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না বুঝাইয়া তাহার অংশমাত্র বুঝায় তাহাদিগকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত যোগ রাখিয়া একটি বিশেষ অর্থে রূঢ় বা প্রসিদ্ধ ; যথা —

যোগরূঢ় শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
জলদ	জলদান-কারী	মেঘ
পঙ্কজ	যাহা পঙ্কে (পাঁকে) জন্মে	পদ্ম
সুহৃদ্	শোভন হৃদয় যাহার	মিত্র
রাঘব	রঘুর সন্তান	রাম
রাজপুত	রাজার ছেলে	ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃজাতি বিশেষ
অসুখ	সুখের অভাব	রোগ বা অসুস্থতা
জলধি	জলের আধার	সমুদ্র
পীতাম্বর	পীতবস্ত্রধারী	কৃষ্ণ
বসুন্ধরা	ধন-ধারিণী	পৃথিবী
সরোজ	সরোবরে জাত পদার্থ	পদ্ম
হস্তী, করী, হাতী	যাহার হস্ত, কর বা হাত আছে	শুণ্ডধারী প্রাণি-বিশেষ
সিংহ	হিংসা করাই যাহার স্বভাব	প্রাণিবিশেষ
আদিত্য	অদিতির পুত্র	সূর্য, ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা ভাষার শব্দ-সম্ভার

অধুনা বাঙ্‌লা ভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় স্বরূপবিচারে তাহাদিগকে প্রধানতঃ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—(১) তৎসম, (২) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম, (৩) তদ্ভব বা খাঁটি বাঙ্‌লা, (৪) দেশী, (৫) বিদেশী এবং (৬) মিশ্র।

(১) তৎসম শব্দ

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় ভাষা-সমূহের মাতামহী। কন্যারূপিণী প্রাকৃত-ভাষা যে প্রয়োজনমত মাতৃভাণ্ডার হইতে শব্দ-সম্পদ্ গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় হইল যে, প্রাকৃত-তনয়া বঙ্গভাষাও মাতামহীর 'ঝুলি' হইতে ছুইহাতে

বহু পারে রত্নাবলী তুলিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। এইভাবে বাঙ্‌লা সাধু ভাষায় অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে। পূর্বোক্ত বাক্যে 'সাধু', 'ভাষা', 'অবিকৃত', সংস্কৃত', 'শব্দ' এবং 'প্রাচুর্য'—এই ৬টি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। এইগুলিই বাঙ্‌লা ভাষার **তৎসম শব্দ**। বাঙ্‌লা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-সমূহের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ ইহাদের অধিকারে। **তৎ-সম** অর্থ 'তাহার সমান'। এই শ্রেণীর শব্দের বাঙলা-রূপ সংস্কৃত-রূপের সমান বলিয়া ইহাদিগকে **তৎসম-শব্দ** বলা হয়।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত রূপে বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে তৎসম-শব্দ বলা হয়; যথা—সূর্য, চন্দ্র, গগন, তারা, আকাশ, পবন, নক্ষত্র, বায়ু, পত্র, পুষ্প, ফল, বৃক্ষ, লতা, শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, জীব, জীবন, মৃত্যু, মরণ, কাল, সময়, মানব, দানব, দেব, দৈত্য, নর, নারী, স্ত্রী, পুরুষ, কর্ণ, কেশ, মুখ, মস্তক, হস্ত, পদ, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

(২) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ

সকল সংস্কৃত শব্দ কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় প্রবেশের পরে স্বকীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালী তাহার দৈনন্দিন জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু সংস্কৃত শব্দকে ব্যবহারিক ভাষায় কখনও ঈষৎ কখনও বা বহুল পরিমাণে বিকৃত করিয়া লইয়াছে। জীবন্ত ভাষার এইরূপ বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই শ্রেণীর শব্দকে **অর্ধ-তৎসম** বা **ভগ্ন-তৎসম** শব্দ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ এইরূপ শব্দ কেবল মুখের ভাষাতে থাকিলেও কালক্রমে মুখের ভাষা সাহিত্যে স্থান লাভ করিবার ফলে উহাদের মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এখন উহাদিগকে বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত **অর্ধ-তৎসম** বা **ভগ্ন-তৎসম** শব্দ বলিতে হইবে। **তৎসম** বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের অর্ধরূপ বা ভগ্ন-রূপ বলিয়া উহাদের এই নাম।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ-বিকারে কিঞ্চিৎ বা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ বলে।

[অনেক সংস্কৃত শব্দ তৎসম, অর্ধতৎসম উভয় রূপেই বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হয়।]

তৎসম	অর্ধতৎসম
কৃষ্ণ	কেষ্ট
ক্ষুধা	খিদে
চন্দ্র	চন্দর
সূর্য	সূর্যি (উচ্চারণ—সুজ্জি)
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
জ্যোৎস্না	জ্যোছনা
মহোৎসব	মোচ্ছব
চক্রবর্ত্তী	চক্কোত্তি
গৃহিণী	গিন্নী ইত্যাদি।

(৩) তদ্‌ভব শব্দ

এই শ্রেণীর শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের পৌত্র বা প্রপৌত্র স্থানীয়। ইহারাই বাঙ্‌লা ভাষার আত্ম-সম্পদ্ এবং বাঙ্‌লা ভাষার জন্মকাল হইতে বর্ত্তমান। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহারাই খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দ। প্রাচীনতমা আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত উচ্চারণ বিকারে প্রয়োগে-বিকারে প্রাকৃত-ভাষার রূপদান করিয়াছিল। ভারতের অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষারও রূপ-ভেদ দেখা দিল—মহারাষ্ট্রী, মাগধী, ইত্যাদি। এই মাগধী বা পূর্বী প্রাকৃত হইতে বাঙ্‌লা ভাষার উদ্‌ভব। এই পরিবর্তনের স্রোতে পড়িয়া অগণিত বৈদিক সংস্কৃত-শব্দ স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া জন্মকাল হইতেই বাঙ্‌লায় চলিয়া আসিতেছে। অধস্তন বংশধরেরা গোত্রপ্রবর্তক ঋষির স্মৃতি ধারণ করে; তাই এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে বলা হয় তদ্‌ভব শব্দ; কারণ তৎ [=তাহা] অর্থাৎ সংস্কৃত হইতেই ভব অর্থাৎ জন্ম হইয়াছে।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তরের

মধ্য দিয়া নানা পরিবর্তন বা রূপ-বিকার সহ্য করিয়া আজন্ম বাঙ্‌লা ভাষায় বর্তমান রহিয়াছে তাহাদিগকে তদ্‌ভব শব্দ বলা হয়।

নিম্নের তালিকাটি হইতে উহাদের স্বরূপ পরিস্ফুট হইবে—

মূল সংস্কৃত	প্রাকৃত ও অপভ্রংশ	বাঙ্‌লা
হস্ত	হত্থ ['হাথ' প্রাচীন বাংলা]	হাত
কর্ণ	কণ্ণ	কান
পাদ	পাঅ	পা
চন্দ্র	চান্দ	চাঁদ
গৃহ	গৃহ্—ঘর	ঘর
গৃহিণী	গ্‌রহণী	ঘরণী
তাম্র	তাম্ম	তামা
মাতা	মাঅ	মা
ভগিনী	বহিণী	বোন
অর্ধ	অদ্ধ	আধ
ভদ্রক	ভল্ল অ	ভালো
অস্মে	অম্‌হে	আমি
ত্বম্‌হি	তুম্‌হি	তুমি
চলতি	চলই	চলে
শৃণোতি	শুণই	শুনে
মৎস্য	মচ্ছ	মাছ, ইত্যাদি।

তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্‌ভব শব্দের মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। তৎসম= 'অবিকৃত সংস্কৃত' শব্দ; অর্ধ-তৎসম=উচ্চারণ দোষে 'বিকৃত সংস্কৃত' শব্দ; তদ্‌ভব=প্রাকৃত জাত সংস্কৃত-মূল শব্দ।

নিম্ন লিখিত উদাহরণ হইতে উহাদের প্রভেদ পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে—

তৎসম বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ	অর্ধতৎসম বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দ	তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ সংস্কৃত-মূল শব্দ
কৃষ্ণ	কেষ্ট	কানু, কানাই [প্রাকৃতে 'কন্হ', বাংলায় 'কান', পরে আদরে 'উ' ও 'আই' প্রত্যয়]
পত্র	পত্তর	পাত, পাতা [প্রাকৃতে 'পত্ত']
চন্দ্র	চন্দর	চাঁদ
গৃহিণী	গিন্নী	ঘরণী ইত্যাদি।

(৪) দেশী শব্দ

অনার্য ও অজ্ঞাতমূল শব্দ প্রাকৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল আবার বাঙলা ভাষার উদ্ভব কালেও বাঙ্লার আদিবাসী অনার্যগণের অনেক শব্দ বাঙ্লার গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দকে বলা হয় দেশী শব্দ। ইহাদের মধ্যে যেগুলি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে তাহাদের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু যেগুলি সরাসরি অনার্যভাষা হইতে আসিয়াছে তাহাদের বিশেষ রূপান্তর ঘটে নাই।

অনার্য	প্রাকৃত	বাঙ্লা
পোট্ট	পেট্ট	পেট
খড্ড্		খাড়ু
* মোচক	মোচিঅ	মুচি
আড্ডা		আড্ডা
ঝাণ্ডা		ঝাণ্ডা
ঝোঁপ		ঝোঁপ ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত—কাতলা, চিংড়ি, চাউল, ঢেঁকি, ধুচুনি, ডিঙ্গি, ঢোল, ঝাঁটা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি শব্দ এবং √ঢাক্ [আবৃত করা], √ঢুক্ [প্রবেশ করা], √ঝুল্ [টাঙ্গান থাকা], √মুড়্ [বাঁকান], √হাঁক্ [চীৎকার করা] প্রভৃতি ধাতু ও ধাতুজ শব্দও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

* আচার্য সুনীতিকুমারের মতে শব্দটি প্রাচীন পারসিক 'mocak' হইতে আসিয়াছে।

দ্রষ্টব্য—সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট অনার্য শব্দ অবিকৃতরূপে বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হইলে তাহাদিগকে তৎসম শব্দ বলা হয় এবং প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিতরূপে বাঙ্‌লায় আগত ঐ শ্রেণীর শব্দকে তদ্ভব বলাই সমীচীন ; যেমন—'অলাবু' (অর্থ—লাউ)—তৎসম, কিন্তু লাউ—তদ্ভব ; ঘোটক—তৎসম কিন্তু ঘোড়া—তদ্ভব।

অনার্যমূল তৎসম শব্দ—কার্পাস, কাল [black], ঘণ্টা, বক, ব্যাঘ্র, শার্দূল, ময়ূর, চিঞ্চা [বাঙ্‌লায় তেঁতুল] ইত্যাদি।

(৫) বিদেশী শব্দ

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালী তাহাদের ব্যবহৃত শব্দ নিজ ভাষায় গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত এইসকল শব্দকে বিদেশী শব্দ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক—'Drakhme' [দ্রম্‌হ] হইতে প্রাকৃতে 'দম্‌হ', তাহা হইতে বাঙ্‌লায় দাম।

পারসিক বা ফারসী (Parsian)—বাদশা(হ্), আমীর, ওমরা(হ্), দরবার, মালিক, উজীর, হুজুর, তাঁবু, কুচ-কাওয়াজ, তোপ, তালুক, খাজনা, দপ্তর, দারোগা, আসামী, ফরিয়াদী, নালিশ, আইন, আদালত, দলিল-দস্তাবেজ, হাকিম, মোক্তার, কবর, কাফের, মসজিদ, শহীদ, কেচ্ছা, আদব, কায়দা, আয়না, আঙ্গুর, আতর, কাগজ, চশমা, জামা, রুমাল, দোয়াত, শিশি, আওয়াজ, আবহাওয়া, চাঁদ, জাহাজ, নমুনা, পছন্দ, হাজার, হুকুম ইত্যাদি ফরাসী শব্দ।

তুর্কী—আলখাল্লা, কাঁচি, কাবু, গালিচা, চাকু, বাহাদুর, বিবি, বেগম, লাশ ইত্যাদি ফরাসীর মাধ্যমে আসিয়াছে।

পর্তুগীজ—ক্রুশ, চাবি, জানালা, তোয়ালিয়া [-হইতে তোয়াইল্যা, তাহা হইতে 'তোয়ালে'], নিলাম, পাউরুটী, পেঁপে, বালতি, বোতাম ইত্যাদি প্রায় ১০০টি পর্তুগীজ শব্দ বাঙ্‌লায় চলে।

ফরাসী—কুপন, কার্তুজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ইত্যাদি।

ওলন্দাজ—ইস্ক্রুপ, ইস্কাবন, তুরুপ, রুইতন, হরতন, [চিঁড়িতন—ভারতীয়]।

ইংরেজী—বাঙ্‌লায় গৃহীত ইংরেজী শব্দের অন্ত নাই, এখনও বহু শব্দ গৃহীত হইতেছে।

স্কুল, কলেজ, আফিস, পেন্সিল, চেয়ার, টেবিল, কেরোসিন, কোম্পানী, গেঞ্জী, চুরুট, স্টেশন, প্লাটফর্ম, রেল, গার্ড, টিকেট, ড্রাইভার, চেকার, শার্ট, গাউন, ব্লাউজ, ডেস্ক্, লাইব্রেরী, মাস্টার ইত্যাদি।

জাপানী—রিক্শ; **জার্মান**—নাৎসী; **আফ্রিকান**—জেব্রা; **অস্ট্রেলীয়**—ক্যাঙ্গারু; **পেরুভীয়**—কুইনাইন; **মেক্সিকান**—চকোলেট; **মালয়ী**—গুদাম, কিরিচ; **ইতালীয়**—ম্যাজেন্টা, ম্যালেরিয়া; **রুশ**—সোভিয়েৎ, বলশেভিক; **জাভানীজ**—বাতাবি ইত্যাদি।

কতকগুলি বিদেশী শব্দ আবার পরিবর্তিতরূপে বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হয়; যথা—বাক্স, কৌঁসুলী, হাসপাতাল, ডাক্তার, লাট্, আস্তাবল তোরঙ্গ, গেলাস, আর্দালী প্রভৃতি যথাক্রমে ইংরেজী box, counsel, hospital, doctor, lord, stable, trunk, glass, orderly হইতে আসিয়াছে। আলাদা, খদ্দের, জমি, মজুর প্রভৃতি ফারসী 'আলাহিদা', 'খরীদদার', 'জমীন্', 'মজ্‌দুর' হইতে আগত।

(৬) মিশ্র শব্দ

পূর্বোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের সংযোগে অথবা একশ্রেণীর শব্দের সহিত অন্যশ্রেণীর প্রত্যয় যোগে গঠিত বাঙ্‌লা শব্দগুলিকে মিশ্র শব্দ বলা হয়; যথা—

দেশী ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণে—হাট-বাজার; শাক-সবজী; হেড-পণ্ডিত [ইংরেজী—তৎসম], মাস্টার মশাই [ইংরেজী অর্ধতৎসম], ডাক্তার-বাবু, হাত বাক্স [তৎভব—ইংরেজী] স্কুল-পালানো, রাজা-বাদশা [তৎসম—ফারসী], চশ্‌মা-চোখে ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ ও বিদেশী প্রত্যয়ের মিশ্রণে—নস্য-দান; পণ্ডিত-গিরি; গুরু-গিরি; ধুপদানি ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দ ও তৎসম প্রত্যয়ের মিশ্রণে—শাহরিক [শহর+ষ্ণিক], হিন্দুত্ব [হিন্দু+ত্বল্] ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈত

'ধ্বনিই যে-শব্দের 'আত্মা' তাহাই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বাস্তব অথবা কাল্পনিক ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দাবলী এবং অক্ষর-ধ্বনির অনুকৃতির ফলে উৎপন্ন ভাবপ্রধান শব্দ-সমূহকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ বলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাব প্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোন ভাষায় আছে বলে আমার জানা নেই।"

বস্তুতঃ ভঙ্গীওয়ালা ভাষার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম পরিচয় বহন করে ধ্বন্যাত্মক বা শব্দনিচয়ের সার্থক প্রয়োগ। ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ কখনও একক ভাবে কখনও বা যুগ্মরূপে প্রযুক্ত হয়। ইহারা বস্তু, ভাব, গুণ, ক্রিয়া সবলেরই অনুকরণ করে। 'টিপ্ করিয়া- তাল পড়িল'= টিপ্ শব্দটি বাস্তব ধ্বনির অনুকারী। কিন্তু 'সে রেগে টং'—এখানে ধ্বনিটি একেবারে কাল্পনিক; তাহার মনটি যেন ধনুর জ্যা।

এইগুলি বাঙ্গালা ভাষার অতুল ও অমূল্য সম্পদ। ইহাদের সাহায্য ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রেই ধ্বনি ভাব, গুণ বা ক্রিয়ার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করা সম্ভবপর নহে। ইহারা যেমন ধ্বনির অনুকরণ করে, তেমনি পর পর দুইবার এবং কখনও বা তিনবার প্রযুক্ত হইয়া ঝঙ্কারেরও সৃষ্টি করে। মূল শব্দে ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের ঈষৎ পরিবর্তন দ্বারা অর্থের সূক্ষ্মতর ভেদের দ্যোতনা করে।

> "লটপট জটা লপটে পায়।
> ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
> ....সর সর সরে বাঘের ছাল।
> ....তাথিয়া তাথিয়া বাজায় তাল।"—ভারতচন্দ্র।

এখানে 'লটপট' শব্দে জটার চরণ-লুণ্ঠনের ভাবটি, 'ঝর-ঝর' শব্দে গঙ্গাজলের ঝরিয়া পড়ার ক্রিয়া ও ধ্বনি, 'সর সর' শব্দে পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্মের স্খলন-ধ্বনি এবং 'তাথিয়া তাথিয়া' শব্দে বাদ্যধ্বনি অনুকৃত হইয়া দৃশ্যটিকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রস্ফুট করিয়াছে।

এইগুলি অনুকার অব্যয়, সাধারণতঃ বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রয়োগ সর্বত্র রীতিসিদ্ধ।

স্থূলতঃ অনুকার-শব্দ দ্বিধা বিভাজ্য—

(১) শ্রুতি-গ্রাহ্য ও (২) অনুভূতি-গ্রাহ্য।

(১) **শ্রুতি-গ্রাহ্য অনুকার শব্দ** বাস্তব ধ্বনির অনুকরণে গঠিত ; যথা—নদী **কুল্ কুল্** করিয়া বহে। **সাঁ সাঁ** করিয়া তীর ছোটে। **শন্ শন্** বা **সোঁ সোঁ** শব্দে বাতাস বহিল। **হা হা, হি হি, হো হো, খল্ খল্, খিল্ খিল্, ফিক্ ফিক্, মুচ্‌কি মুচ্‌কি, অট্ট অট্ট** হাসি। **কচ্ কচ্, কচাকচ্, কঁ্যাচ্, খ্যাচ্, কট্** করিয়া কাটে। কোকিলের **কুহু কুহু** ; বিড়ালের **মিউ মিউ** বা **ম্যাও ম্যাও** ; কুকুরের **ঘেউ ঘেউ**। **রিণিঝিনি, রুনুঝুনু, টুংটাং, টিক্‌টিক্**, ইত্যাদি।

(২) **অনুভূতি-গ্রাহ্য** অনুকার শব্দ।

ভাব প্রকাশক ; যথা—

(ঘ) **শূন্যতা** বা **পূর্ণতা জ্ঞাপক**—শূন্য মন্দির **খাঁ খাঁ** করে ; **ধু ধু** করে মাঠ ; রোদ **ঝা ঝা** করে ; মাঠ-ঘাট জলে **থৈ থৈ** করিতেছে। 'নদী-নালা-খাল-বিল জলে **টুবু টুবু** ; ইত্যাদি।

(ক) **বর্ণের স্বরূপ-বোধক—টক্‌টকে** লাল, **দগ্‌দগে** ঘা, **ধব্‌ধবে** বা **ফুটফুটে** সাদা, **কুচ্‌কুচে** কালো ইত্যাদি।

(খ) **শরীরের অনুভূতি-সূচক**—মাথা **কন্ কন্** করে : গা **ঘিন্ ঘিন্** করে, **ঝী ঝী** করে, **ছমছম** করে, বুক **ধড়্‌ফড়্** করে : পা **সুড়্ সুড়্** করে ; ইত্যাদি।

(গ) **গতি-বাচক— খট্ খট্, খুটুস্ খুটুস্, গট্ গট্, ঘট্ ঘট্, ঘটর্ ঘটর্, থপ্‌থপ্, থপাস্ থপাস্, হন্ হন্**, ইত্যাদি। [হন্‌হন্ 'ছাড়া বাকী শব্দগুলিকে শ্রুতিগ্রাহ্য বলা যায়।]

(ঘ) **স্থিতি-সূচক—গুম** হইয়া থাকা ; **গ্যাঁট্** হইয়া বসা ; **বুঁদ্** হইয়া থাকা ; ইত্যাদি।

(ঙ) ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের ঈষৎ পরিবর্তনে **অনুকার শব্দে** অর্থের সূক্ষ্ম ভেদ সৃষ্টি করে : যথা—

জ্বল্ জ্বল্ করা—অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি দান করা।

ঝল্ মল্ করা—ইহাতেও উজ্জ্বল দীপ্তি দান বুঝায়, কিন্তু একটু পর্য্যায়-ক্রমিক দীপ্তি।

ঝক্‌ ঝক করা—নিরেট কঠিন বস্তুর অবিরাম দীপ্তি দান করা।

ঝক্‌ মক্‌ করা—ঐ পর্যায়ক্রমিক দীপ্তি।

ঝিক্‌ মিক্‌ করা—পর্যায়ক্রমিক ক্ষীণ দীপ্তি দান করা।

ঝিকি মিকি করা—পর্যায়ক্রমিক ক্ষীণতর দীপ্তি দান করা।

চিক্‌ চিক্‌ করা—একটানা অত্যল্প দীপ্তি দান করা।

তুলনীয়—টুপ্‌ টুপ্‌; টুপ্‌ টাপ্‌; টপ্‌ টপ্‌, টিপ্‌ টিপ্‌, টিপি টিপি, টপাটপ্‌।

শব্দদ্বৈত (পদ-দ্বৈত) এবং যুগ্ম শব্দ

একই শব্দ বা পদের পরপর দুইবার প্রয়োগকে সাধারণভাবে, **শব্দদ্বৈত** বলা হয়। বাক্যে প্রযুক্ত বিভক্তিযুক্ত শব্দ পদ, সুতরাং ইহাকে **পদদ্বৈত** বলাই উচিত। বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি দ্বারা নানাবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে এই কার্য সিদ্ধ হয়—

(১) একই শব্দের পুনরাবৃত্তি দ্বারা; যথা—চোরে চোরে মাসতুত ভাই; ফাগুন লেগেছে বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়, আড়ালে আড়ালে, কোণে কোণে।”

(২) অক্ষর ধ্বনির অনুকৃতি-জাত শব্দ দ্বারা; যথা—ভাত-টাত, বকা-ঝকা।

লক্ষণীয়—সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দ যোগে যে সকল যুগ্মশব্দ বা যুগ্মপদ গঠিত হয় তাহাদিগকে শব্দদ্বৈত বলা যায় না। ইহারা সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত। যথা—জোতজমা, জাকজমক, রান্নাবান্না ইত্যাদি। ইহাদিগকে বরং যুগ্মশব্দ বলা চলে।

(১) একই শব্দের পুনরাবৃত্তি

(ক) **প্রত্যেকতা অর্থে** পদে পদে বাধা; ঘরে ঘরে পূজা; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়া; বাড়ী বাড়ী ঘোরা; “দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়”; ইত্যাদি।

(খ) **ব্যতিহার বা পারম্পর্য অর্থে**—কাণে কাণে মন্ত্রণা; চোখে চোখে চাওয়া; বুকে বুকে আলিঙ্গন; কাঠে কাঠে ঘষা; মানুষে মানুষে কারবার; ইত্যাদি।

(গ) আতিশয্য অর্থে—"কেঁদে কেঁদে চোখ লাল"; হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়; চলিতে চলিতে বা হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্ত;—ইত্যাদি। এখানে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব হইয়াছে।

(ঘ) বাহুল্য অর্থে—নবনব নীতি, হাজার হাজার লোক, নূতন নূতন বই, সুন্দর সুন্দর ফুল, ঘন ঘন যাতায়াত, গাড়ী গাড়ী ইট, "আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে"; বড় বড় বানরের বড় বড় পেট; বার বার মাথা নাড়ে ঘাড় করে হেঁট; ইত্যাদি।

(ঙ) সাদৃশ্য ঈষদূনতা বা মৃদুতা অর্থে—জ্বর জ্বর লাগছে; ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে; কাঁদ কাঁদ মুখ; যাব যাব করা; পড় পড় হওয়া; চোর চোর খেলা; ঢুলু ঢুলু আঁখি; হাসি হাসি মুখ; ইত্যাদি।

(চ) আসন্নতা ও তৎক্ষণাৎ অর্থে—"সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে সেঁউতী হইলে সোণা দেখিতে দেখিতে"; ঝড় আসে আসে দেখিয়া পথিক দ্রুততর বেগে ছুটিল, কিন্তু বনপ্রান্তে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই ঝড় ছাড়িল।

(ছ) নিরন্তরতা-অর্থে—লোকটা আপনি আপনিই ব'কে যাচ্ছে; পিছু পিছু চলা; "টলে টলে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর"; ইত্যাদি।

(জ) অনিশ্চয়তা ও অবস্থা অর্থে—"মন যে আমার কেমন কেমন করে"; গরম গরম লুচি; ইত্যাদি।

অক্ষর-ধ্বনির অনুকার—

(ক) ট-যোগে তজ্জাতীয়তা-অর্থে অক্ষর (Syllable) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—চাল-টাল, চিনি-টিনি, ভাত-টাত, পয়সা-টয়সা, বই-টই, জলটল, ঘোড়া-টোড়া, গিয়ে-টিয়ে ইত্যাদি অন্য বর্ণের যোগেও তজ্জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু, ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়; যেমন—চাকর-বাকর, ছেলে পিলে, খেয়ে-দেয়ে, আন-চান, ইত্যাদি।

(খ) ফ-যোগে অবজ্ঞা অর্থে—ভাত-ফাত, লুচি ফুচি, তাস-ফাস, কাজ-ফাজ, কান্না-ফান্না সইতে পারি না; মিটিং ফিটিং-এ যাই না; ইত্যাদি।

(গ) স-যোগে একটু কোমলতা বা একটু আদর বুঝাইতে—রকম সকম, বুড়ো-সুড়ো, মোটা-সোটা, জড়-সড়, আঁট-সাঁট, ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাহাকে বলে? ইহাকে অনুকার শব্দ বলা হয় কেন? বাঙ্‌লায় ইহাদের উপযোগিতা উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

২। ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যঞ্জন বা স্বরধ্বনির পরিবর্তনে কিরূপে সূক্ষ্ম অর্থভেদের দ্যোতনা হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৩। শব্দদ্বৈত বা পদদ্বৈত কাহাকে বলে? চারিপ্রকার বিভিন্ন অর্থে উহাদের প্রয়োগ দেখাও।

৪। অর্থ-ভেদ দেখাইয়া নিম্নলিখিত শব্দদ্বৈতগুলি স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর: হাতে হাতে, মুখে মুখে, পেছনে পেছনে, চলিতে চলিতে, বস্তায় বস্তায়, ভাত-ফাত, আম-টাম, সুন্দর সুন্দর, দড়া-দড়ি, ধূ ধূ, ছল ছল, থৈ থৈ, বম্‌ বম্‌, পোঁ পোঁ, সুড়্‌ সুড়্‌, ঝিলিমিলি, ঝর্‌ ঝর্‌, চাকর-বাকর, কাঁদ-কাঁদ, পট্‌ পট্‌, ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌, ঢং ঢং, রিণিঝিনি, গর্‌গর্‌।

৫। প্রভেদ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর:—ভাত-টাত ও ভাত-ফাত; হাহা ও হিহি; জ্বল্‌জ্বল্‌ ও চিক্‌চিক্‌; ঝর ঝর ও ঝির ঝির; রান্না-ফান্না ও রান্না-বান্না; খট্‌খট্‌ ও খুট্‌খুট্‌।

প্রত্যয়—কৃৎ ও তদ্ধিত

প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও তাহার প্রধান দুইটি বিভাগের কথা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে উক্ত বিভাগদ্বয়ের সবিশেষ আলোচনা করা হইবে। প্রত্যয় দ্বিবিধ—কৃৎ ও তদ্ধিত।

কৃৎ প্রত্যয়

যে সকল প্রত্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে তাহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

ঘঞ, অল্, অনট্, ক্ত, শানচ্, তব্য, অনীয় প্রভৃতি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়; ইহারা কেবল সংস্কৃত ধাতুর সহিত যুক্ত হইবার সময়ে এই প্রত্যয়গুলির কোন কোন অংশ ইৎ যায় অর্থাৎ লোপ পায়; যেমন—'ক্ত'-এর 'ক্', 'ঘঞ্'-এর 'ঘ্' ও 'ঞ্', এবং 'অনট্'-এর 'ট্' লোপ পাইয়া অবশিষ্ট থাকে কেবল 'ত', 'অ' এবং 'অন'। প্রত্যয়ের এক এক প্রকার বর্ণ লোপ পাইলে ধাতুর স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের এক এক প্রকার পরিবর্তন হয়; যেমন—'ঘ্' লোপ পাইলে অন্ত্য 'চ্' ও 'জ্' স্থানে যথাক্রমে 'ক্' ও 'গ্' হয়; এবং 'ঞ' ও 'ণ্' লোপ পাইলে ধাতুর অন্ত্য স্বর বা উপধা আ-কারের বৃদ্ধি এবং 'ল্'-লোপে অন্ত্য-স্বরের গুণ হয়। পচ্+ঘঞ্=পাক; ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ; ভী+অল্=ভয়।

কৃৎ প্রত্যয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সংস্কৃত কৃৎ এবং বাঙলা কৃৎ। প্রত্যয় ও ধাতুর ইৎ ও নিয়মসমূহ কেবল সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বাঙলা ধাতু ও প্রত্যয়ের প্রয়োগকালে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রয়োগের সময়ে কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংস্কৃত বা বাঙলা যে কৃৎ প্রত্যয়ই হউক, তাহাদের বাচ্য নির্ণয় একই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য

প্রত্যয়ের দ্বারা যাহার অর্থ প্রধানরূপে বলা হয় সেই বাচ্যে প্রত্যয়ের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

এই বাচ্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—**ভাববাচ্য ও কারকবাচ্য।**

ভাব অর্থাৎ ধাত্বর্থ প্রধানরূপে বাচ্য হইলে প্রত্যয়ের **ভাববাচ্যে প্রয়োগ** বুঝিতে হইবে। ভাববাচ্যের প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন পদসমূহ **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verb-Noun)** হয়। গম্+ক্তি=গতি ; গম্+অনট্=গমন। ভী+অন্=ভয় ; চাহ্+নি=চাহনি ; কাট্+তি=কাট্‌তি ইত্যাদি। এখানে 'ক্তি', 'অনট্' 'অল্', 'নি', 'তি' প্রভৃতি প্রত্যয় ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রত্যয়দ্বারা **কারকের অর্থ বুঝাইলে কারকবাচ্যে** প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। কারক ছয় প্রকার, তাই কারকবাচ্যও ছয় প্রকার। কিন্তু বাঙ্‌লায় সম্প্রদানবাচ্য নাই বলিলেই চলে ; সুতরাং বাঙ্‌লায় কারকবাচ্য পাঁচপ্রকার।

(১) **কর্তৃবাচ্য**—প্রত্যয়দ্বারা কর্তৃকারকের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় ; যথা—'করে যে' অর্থে √কৃ+ণক=কারক ; 'গায় যে' অর্থে √গৈ=ণক্=গায়ক ইত্যাদি।

(৩) **কর্মবাচ্য**—প্রত্যয়দ্বারা কর্মকারকের অর্থ প্রধানরূপে বলা হয় ; যথা—'করা হয় যাহা' অর্থে √কৃ+ণ্যৎ=কার্য ; 'রাঁধা হয় যাহা' অর্থে √রাঁধ+আ=রাঁধা (রাঁধা ভাত) ইত্যাদি।

(৬) **করণবাচ্য**—করণকারকের অর্থই প্রধানরূপে বাচ্য ; যথা—'চরে (গমন করে) যাহা দ্বারা'—অর্থে √চর্+অনট্=চরণ ; শোনা যায় যাহা দ্বারা—অর্থে √শ্রু+অনট্=শ্রবণ (কর্ণ) ; 'খেলে যাহা দ্বারা'—অর্থে √খেল্+না=খেলনা ইত্যাদি।

(৪) **অপাদানবাচ্য**—অপাদানকারকের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় ; যথা—ভয় পায় যাহা হইতে—অর্থে √ভী+মক্=ভীম ; (জল) 'ঝরে যাহা হইতে'—অর্থে √ঝর+না=ঝরণা ইত্যাদি।

(৫) **অধিকরণবাচ্য**—ধাতুজ ক্রিয়ার আধারের বোধ জন্মিলে অধিকরণবাচ্যে প্রত্যয়ের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে ; যথা—'শয়ন করে যাহাতে'—অর্থে √শী+ক্যপ্=শয্যা ; 'বাস করে এখানে'—অর্থে √বস্+তি=বস্তি ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

(১) **তব্য—ঔচিত্য, যোগ্যতা বা ভবিষ্যৎ** অর্থে **কর্মবাচ্যে ও কখন কখন ভাববাচ্যে** ধাতুর সহিত এই প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—√বিচ্—বক্তব্য [বলা হইবে বা উচিত], কৃ—কর্তব্য [করা হইবে বা করা উচিত], √দা—দাতব্য, √শ্রু—শ্রোতব্য, √মন্—মন্তব্য, √গম্—গন্তব্য, √দৃশ্—দ্রষ্টব্য [দর্শনের যোগ্য, দেখা উচিত বা হইবে], স্মৃ—স্মর্তব্য, √পঠ্—পঠিতব্য ইত্যাদি।

(২) **অনীয়—ঔচিত্য, যোগ্যতা** বা **ভবিষ্যৎ** অর্থে **কর্মবাচ্যে** ও কখন কখন **ভাববাচ্যে** ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—√কৃ—করণীয় [করা হইবে বা করা উচিত], √পূজ্—√পূজনীয়, √স্মৃ—স্মরণীয়, √পা—পানীয় [পানের যোগ্য, পান করা উচিত বা হইবে], √পালি—পালনীয়, √রম্—রমণীয়, √দৃশ্—দর্শনীয়, √শুচ্—শোচনীয়, √বৃ—বরণীয়, √মানি (√মন্+ণিচ্)—মাননীয় ইত্যাদি।

(৩) ণ্যৎ (ণ্ ও ৎ লোপ পায়, য থাকে)—পূর্ববৎ অর্থে ও বাচ্যে ঋ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—√কৃ—কার্য [করা হইবে, করা উচিত বা করার যোগ্য], /ভুজ্—ভোজ্য [ভোজনের যোগ্য বা ভোজন করা হইবে], ভোগ্য [ভোগের যোগ্য বা ভোগ করা হইবে], √ভৃ—ভার্যা [ভরণ করার যোগ্যা, স্ত্রীলিঙ্গে-আ], √বচ্—বাচ্য, বাক্য, √ত্যজ্—ত্যাজ্য, √বুধ্—বোধ্য, √রুধ্—রোধ্য, বি-√চর্—বিচার্য, √ভজ্—ভাজ্য, প্র-√যুজ্—প্রযোজ্য, √ধৃ—ধার্য ইত্যাদি।

(৪) যৎ (ৎ লুপ্ত হয়, য থাকে)—পূর্বোল্লিখিত অর্থে ও বাচ্যে ইহার প্রয়োগ ; যথা—√দা—দেয় [দানের যোগ্য বা দেওয়া উচিত, √পা—পেয়, √ধ্যৈ—ধ্যেয়, √লভ্—লভ্য, /সহ্—সহ্য, √হন্—বধ্য, প্র-√নম্—প্রণম্য, বি-√ধা—বিধেয়, √ভক্ষ—ভক্ষ্য, √মা—মেয় ইত্যাদি।

(৫) **ক্যপ্** (ক্ ও প্ লোপ পায়, য থাকে)—পূর্বোক্ত অর্থে ও বাচ্যে ইহার প্রয়োগ ;

কর্মবাচ্যে—√ভৃ—ভৃত্য [ভরণের যোগ্য], √কৃ—কৃত্য [যাহা করা হইবে বা করা উচিত], √দৃশ্—দৃশ্য, √শাস্—শিষ্য [শাসনের যোগ্য] ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে—পরি-√চর্—পরিচর্যা, √বিদ্—বিদ্যা, √হন্—হত্যা ইত্যাদি।

(৬) **শতৃ** (শ্‌ ও ঋ লোপ পায়, অৎ থাকে)—ঘটমান অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয় ; যথা—√চল্‌—চলৎ (চলিতেছে এমন], √স্খল্‌—স্খলৎ, √জ্বল্‌—জ্বলৎ, √অস্‌—সৎ, √গল্‌—গলৎ, √জীব—জীবৎ, √জাগ্‌—জাগ্রৎ ইত্যাদি।

বাঙালায় শতৃ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই ; সমস্তপদে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি তৎসম শব্দের উদাহরণ—চলচ্ছক্তি, স্খলদ্‌বচন, জীবদ্দশা, জাগ্রদবস্থা জ্বলজ্জটা, গলদ্‌ঘর্ম ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ (√ভূ+স্যতৃ) বাঙ্গালায় স্যতৃ-প্রত্যয়ান্ত এই একটি শব্দই আছে।

(৭) **শানচ্‌** (শ্‌, চ ইৎ, আন থাকে, কখনও কখনও 'আন' স্থলে 'মান' হয়) কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে শানচ্‌ হয় ; ঘটমান অর্থে কর্তৃবাচ্যে—√বৃৎ—বর্তমান, √শী—শয়ান, √আস্‌—আসীন, √মৃ—মৃয়মাণ, √কম্প্‌—কম্পমান, √দীপ্‌—দীপ্যমান, √বিদ্‌—বিদ্যমান, √সেব্‌—সেব্যমান, √দুহ্‌—দুহ্যমান, √যুধ্‌—যুদ্ধমান, √লম্ব্‌—লম্বমান, √বহ্‌—বহমান, পরা-√অয়্‌—পলায়মান ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যে (ধাতুর উত্তর প্রথমে য পরে মান যুক্ত হয়)—√কৃ—ক্রিয়মাণ, √দৃশ্‌—দৃশ্যমান, √নী—নীয়মান, √সেব্‌—সেব্যমান, √ঘূর্ণ্‌—ঘূর্ণমান, √ভ্রামি (ণিজন্ত) ভ্রাম্যমাণ, আ-√লোচি—আলোচ্যমান, প্রতি-√ই—প্রতীয়মান ইত্যাদি।

[কেবল আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্‌ হয়। সুতরাং আত্মনেপদী নামধাতু এবং সকল যঙন্ত ধাতুর সহিত শানচ্‌ প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ; যথা—নামধাতু—√দণ্ডায়্‌—দণ্ডায়মান, √শব্দায়্‌—শব্দায়মান ইত্যাদি। যঙন্ত—দেদীপ্য—দেদীপ্যমান, রোরুদ্যমান, জাজ্বল্যমান ইত্যাদি।

(৮) **ক্ত** (ক্‌ লোপ পায়, ত থাকে)—অতীতকালে কর্মবাচ্যে সকর্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয় ; যথা—√দৃশ্‌—দৃষ্ট, √কৃ—কৃত, √খ্যা—খ্যাতি, √শ্রু-শ্রুত, √লভ্‌—লব্ধ, √ধা—হিত, √বচ্‌—উক্ত, √পচ্‌—পক্ব, √বন্ধ্‌—বদ্ধ, √ভিদ্‌—ভিন্ন, √গ্রহ্‌—গৃহীত, √ভুজ্‌—ভুক্ত, উৎ—√তৃ—উত্তীর্ণ, √দহ্‌—দগ্ধ, নি—√বারি (ণিজন্ত)—নিবারিত, √দা—দত্ত, √পঠ্‌—পঠিত, √জি—জিত, √ক্রী—ক্রীত, √হন্‌—হত, √গৈ—গীত, √শক্‌—শক্ত, √মুচ্‌—মুক্ত, আ—√সন্‌জ্‌—আসক্ত, √দন্‌শ্‌—দষ্ট, √স্পৃশ √স্পৃষ্ট, √প্রচ্ছ্‌—পৃষ্ট, √স্তন্ভ্‌—স্তব্ধ, √বহ্‌—উঢ়, √স্তন্‌জ্‌

—ভগ্ন, √পূর্—পূর্ণ, √চূর্—চূর্ণ, √জৄ—জীর্ণ, √তৄ—তীর্ণ, √দৄ—দীর্ণ, √দা—দত্ত, √ক্ষৈ—ক্ষাম, আ—√হ্বে—আহূত ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে অকর্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয়; যথা—√গম্—গত, √স্বপ্—সুপ্ত, √শুষ্—শুষ্ক, √মৃ—মৃত, √স্নিহ্—স্নিগ্ধ, √শী—শায়িত, √স্থা—স্থিত, √ভী—ভীত, √বৃধ্—বৃদ্ধ, √জাগৃ—জাগরিত, √লস্জ্—লজ্জিত, √পত্—পতিত, √ক্রুধ্—ক্রুদ্ধ, √জীব্—জীবিত, আ—√রুহ্—আরূঢ়, √ম্লৈ—ম্লান, √ভূ—ভূত, বি—√সদ্ বিষণ্ণ, √রুজ্—রুগ্ন, √ক্ষি—ক্ষীণ, √মস্জ্—মগ্ন, √গাহ্—গাঢ় ইত্যাদি।

মতি, বুদ্ধি ও পূজার্থক ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ক্ত হয়; যথা—√মন্—মত, প্র—√বুধ্+ক্ত—প্রবুদ্ধ, √পূজ্—পূজিত ইত্যাদি।

(৯) ক্তি (ক্ ইৎ যায়, তি থাকে)—ভাববাচ্যে ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনের জন্য ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—√গম্—গতি, √কৃ—কৃতি, √ভী—ভীতি, √হা—হানি, √গ্লৈ—গ্লানি, √ক্লম্—ক্লান্তি, √শম্—শান্তি, √বচ্—উক্তি, √মুচ্—মুক্তি, √স্বপ্—সুপ্তি, √মন্—মতি, যুজ্—যুক্তি, √মন্—মতি, √রম্—রতি ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে—প্র+সূ—প্রসূতি (প্রসব হয় যাহা হইতে, জননী)।

কর্মবাচ্যে—√শ্রু-শ্রুতি] শোনা হয় যাহা (বেদ), শ্রবণক্রিয়া বুঝাইলে ভাববাচ্যে ক্ত হইবে]।

করণবাচ্যে—√শ্রু—শ্রুতি [শোনা যায় যাহার দ্বারা, কর্ণ], √নী—নীতি [সৎ পথে নীত হয় যাহা দ্বারা] ইত্যাদি।

(১০) ণক (ণ্ ইৎ যায়, অক থাকে)—কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়; যথা—√কৃ—কারক [করে যে], √জন্—জনক, হন্—ঘাতক, √দৃশ্—দর্শক [দেখে যে], √নী—নায়ক, √যাচ্—যাচক, পরি—√অট্—পর্যটক, √দা—দায়ক, √গৈ—গায়ক, √পূ—পাবক, √পচ্—পাচক, √সেব্—সেবক, √স্মৃ—স্মারক, উৎ—√ভাব—উদ্ভাবক ইত্যাদি।

(১১) তৃচ্ (চ্ ইৎ যায়, তৃ থাকে)—এই প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে ধাতুর সহিত যুক্ত হয়; যথা—√কৃ—র্তৃ [কর্তা (করে যে) কর্তৃ শব্দের প্রথমার একবচনে], √নী—নেতৃ [নেতা], √দা—দাতৃ [দাতা], √সূ—সবিতৃ [সবিতা], √দৃশ্—দ্রষ্টৃ

[দ্রষ্টা], বি—√ধা—বিধাতৃ [বিধাতা], √যুধ্—যুদ্ধ [যোদ্ধা], √শ্রু—শ্রোতৃ [শ্রোতা], √পা—পিতৃ [পিতা) √মা—মাতৃ [মাতা], √ভৃ—ভর্তৃ [ভর্তা], √হন্—হন্তৃ [হন্তা], গ্রহীতা, রচয়িতা, পালয়িতা ইত্যাদি।

(১২) অনট্ (ট্ ইৎ, অন থাকে)—ভাববাচ্যে প্রযুক্ত এই প্রত্যয়ের সাহায্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়; যথা—√গম্—গমন, √কৃ—করণ √শ্রু—শ্রবণ [শোনা], চি—চয়ন, √শী—শয়ন, √ভ্রম—ভ্রমণ, √দৃশ্—দর্শন, √রক্ষ্—রক্ষণ, ভক্ষি—ভক্ষণ- √স্মৃ—স্মরণ, √গৈ—গান, √দা—দান, জ্ঞা—জ্ঞান, স্না—স্নান, তৃপ্—তর্পণ ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যে—বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠনে—√পা—পান [পানীয় বস্তু], √গৈ—গান [যাহা গীত হয়]।

করণবাচ্যে—√নী—নয়ন [যাহাদ্বারা নীত হয়—চক্ষু], √চর্—চরণ [চলে যদ্দ্বারা—পদ], √ভূষ্—ভূষণ [অলঙ্কার], √যা—যান, √বা—বাহন ইত্যাদি।

অধিকরণবাচ্যে—√শী—শয়ন [যাহাতে শোয়, শয্যা], √স্থা—স্থান, √ভূ—ভবন [যেখানে থাকে—গৃহ], উৎ+যা—উদ্যান ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে—ণিজন্ত ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, যথা—√নন্দি—নন্দন, √নাশি—নাশন, √শোভি—শোভন, √রমি—রমণ, √মোহি—মোহন, √সাধি—সাধন, √ভীষি—ভীষণ, প্র—√ভঞ্জ্—প্রভঞ্জন ইত্যাদি।

কৃত্য-প্রত্যয়—তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ এবং ক্যপ্ এই পাঁচটিকে একত্র কৃত্য-প্রত্যয় বলা হয়। ঔচিত্য, যোগ্যতা বা ভবিষ্যৎ অর্থে ধাতুর সহিত এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইয়া থাকে।

(১৩) ইষ্ণু (চ্)—'শীল' অর্থে কয়েকটি ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়; যথা—√বৃধ্—বর্ধিষ্ণু, স-√হ্—সহিষ্ণু, √চল্—চলিষ্ণু, √ক্ষি—ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি।

(১৪) ক্বিপ্ (সমস্তই ইৎ বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে শূন্য প্রত্যয় বলিয়াছেন)—কর্তৃবাচ্যে—√গম্—জগৎ, উৎ—√ভিদ্—উদ্ভিদ্ [ঊর্ধ্বে ভেদ করিয়া উঠে], বেদ—√বিদ্—বেদবিৎ, ইন্দ্র—√জি—ইন্দ্রজিৎ, অগ্র—√নী—অগ্রণী, সেনা—√নী—সেনানী, সভা—√সদ্—সভাসদ্, উপনিষৎ ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে—আ—√পদ্—আপৎ, বি—√পদ্—বিপৎ।

(১৫) **আলু** (চ্)—'**শীল**' অর্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয় ; যথা—√দয়্—দয়ালু [দয়া করা, শীল যাহার], নি—√দ্রা—নিদ্রালু, শ্রৎ—√ধা—শ্রদ্ধালু, তন—√দ্রা—তন্দ্রালু ইত্যাদি।

(১৬) **ণিনি** (ণ্ লোপ পায় **ইন্** থাকে প্রথমার একবচনে ঈ)- **শীলার্থে কর্তৃবাচ্য** √ভূ—ভাবী, √স্থা—স্থায়ী, √ত্যজ্—ত্যাগী, √হন্—ঘাতী, অধি—√কৃ—অধিকারী, মাংস—√অশ্—মাংসাশী, আ—√গম্—আগামী, স্তন্য—√পা—স্তন্যপায়ী, গুণ—√গ্রহ্—গুণগ্রাহী, অ—√যা—অনুযায়ী, প্র—√বস্—প্রবাস ইত্যাদি।

(১৭) **ঘিনুন্** (ঘ্ এবং উন্ **ইৎ, ইন্** থাকে, প্রথমায় ঈ)—**শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে** √যুজ্—যোগী, √রুজ্—রোগী ইত্যাদি।

(১৮) **ইত্র** (চ্)—**কর্তৃবাচ্যে**—√পূ—পবিত্র।

করণবাচ্যে—√খন্—খনিত্র [যদ্দ্বারা খনন করা যায়], √বহ্—বহিত্র।

ভাববাচ্যে—√চর্—চরিত্র।

(১৯) **বিবিধ অ প্রত্যয়**—নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির **ইৎ** অংশ বাদে **অ** অবশিষ্ট থাকিলেও উহাদের কার্য এক নহে। [বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য মাত্র **অ** প্রত্যয় ধরা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

(২১) **শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে**—√হন্‌স্—হিংস্র, √নম—নম্র [নত হওয়া **শীল** বা **স্বভাব** যাহার], √কম্প্—কম্প্র, √স্মি—স্মের ইত্যাদি।

কি (ক্ ইৎ, ই থাকে)

উপসর্গ বা **কর্ম উপপদ থাকিলে** ধাতুর **উত্তর ভাববাচ্যে ও অধিকরণবাচ্যে** এই প্রত্যয় হয়। **ভাববাচ্যে**—সম্—√ধা—সন্ধি, বি—√ধা—বিধি, নি—√ধা—নিধি, বি-আ—√ধা—ব্যাধি, উপ-আ—√ধা—উপাধি। **অধিকরণবাচ্যে**—অপ্—√ধা—অব্ধি, জল—√ধা—জলধি, বারি—√ধা—বারিধি, জল—√নি—ধা—জলনিধি ইত্যাদি।

প্রত্যয়ের বিভিন্ন বর্ণের লোপ দ্বারা ধাতুর স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয়। লোপপ্রাপ্ত বর্ণগুলি অকারণে বসান হয় নাই।

(৵০) অঙ্ (ঙ্ ইৎ, অ থাকে)

ভাববাচ্যে—এই প্রত্যয় যুক্ত হয়, পরে স্ত্রী-প্রত্যয়, আ-যোগে শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ হয়; যথা—√দয়্—দয়া, √পূজ্—পূজা, √ব্যথ্—ব্যথা, √কথ্—কথা ইত্যাদি।

(৶০) অচ্ (চ্ ইৎ, অ থাকে)

কর্তৃবাচ্যে—√চল্—চল [চলে যাহা], √চর্—চর [চরে যে], √সৃপ্—সর্প, √দিব্—দেব, √ভী—ভয়, √জি—জয়, বি—√স্মি—বিস্ময়, প্র—√নী—প্রণয়, √ক্ষি ক্ষয়, √লী—লয় ইত্যাদি।

(৷৶০) অণ্ (ণ্ ইৎ, অ থাকে)

উপপদ কর্ম থাকিলে **কর্তৃবাচ্যে**—গ্রন্থ—√কৃ—গ্রন্থকার, কুম্ভ—√কৃ—কুম্ভকার [কুম্ভ করে যে], সূত্র—√ধৃ—সূত্রধার [সূত্র ধরে যে], তন্তু—√বে—তন্তুবায় [তন্তু বয়ন করে যে], দ্বার—√পালি—দ্বারপাল, বারি—√বহ্—বারিবাহ, কর্ম—√কৃ—কর্মকার, চাটু—+কৃ—চাটুকার ইত্যাদি।

(।০) অপ্ বা অল্ (যথাক্রমে প্ ও ল্ ইৎ, অ থাকে)

সাধারণতঃ **ভাববাচ্যে**—ভূ- √ভ—ভব, √রু—রব, √হিন্—বধ, √বৃ—বর, নির্—√চি—নিশ্চয়, বি—√স্তৃ—বিস্তর, সম্—√যম—সংযম, আ—√দৃ—আদর, √স্তু—স্তব। [উ-বর্ণান্ত ও ঋ-কারান্ত ধাতুর অপ্, অন্যত্র অল্ হয়]

(।৵০) ক (ক্ ইৎ, অ থাকে)

উপপদ বা উপসর্গ পূর্বে থাকিলে **কর্তৃবাচ্যে**—গো—√পা—গোপ, বি—√জ্ঞা বিজ্ঞ [বিশেষরূপে জানে যে], ভূ—√পা—ভূপ, বি-আ—√ঘ্রা—ব্যাঘ্র, জল—√দা—জলদ, গৃহ—√স্থা—গৃহস্থ, বারি—√দা—বারিদ। অনুরূপে—ধর্মজ্ঞ, মধুপ, প্রকৃতস্থ, সুস্থ, নৃপ ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে—শত্রুঘ্ন, বিঘ্ন, প্রিয় ইত্যাদি।

(।৶০) কঞ্ (ক্, ঞ্, ইৎ, অ থাকে)

সাদৃশ্য অর্থে সর্বনাম শব্দের পরবর্তী দৃশ্ ধাতুর উত্তর **কর্তৃবাচ্যে**—ইদম্—√দৃশ্—ঈদৃশ, যৎ—√দৃশ্—যাদৃশ, মৎ—√দৃশ্—মাদৃশ, সমান—√দৃশ্—সদৃশ, কিম্—√দৃশ্—কীদৃশ, তদ্—√দৃশ্—তাদৃশ ইত্যাদি।

(।৶০) খশ্‌ (খ্‌, শ্‌ ইৎ অ থাকে)

উপপদ কর্ম থাকিলে কয়েকটি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে—বিধু—√তুদ্‌ [ব্যথা দেওয়া]—বিধুন্তুদ, অভ্র—√লিহ্‌—অভ্রংলিহ, অরু—√তুদ্‌—অরুন্তুদ ইত্যাদি।

(।।০) খচ্‌ (খ্‌ ও চ্‌ ইৎ, অ থাকে)

উপপদ কর্ম থাকিলে এবং ত্বরা [দ্রুত], বিহায়স্‌ [আকাশ], পত [পক্ষ], ভুজ [হস্ত], ও উরস্‌ [বুক] উপপদের পরবর্তী √গম্‌ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে—ত্বরা—√গম্‌—তুরঙ্গ [ত্বরা স্থানে 'তুরম্‌' অর্থাৎ বেগে গমন করে যে], বিহায়স্‌—√গম্‌—বিহঙ্গ, অনুরূপ—পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, উরঙ্গ, বিশ্ব—√ভৃ—বিশ্বম্ভর, বসুম্‌—√ধৃ—বসুন্ধরা, সর্বম্‌—√সহ্‌—সর্বংসহা, শুভ—√কৃ—শুভঙ্কর, প্রিয়ম্‌—√বদ্‌—প্রিয়ংবদা, পরম্‌—√তপ্‌—পরন্তপ, শত্রুম্‌—√জি—শত্রুঞ্জয়, মৃত্যুম্‌—√জি—মৃত্যুঞ্জয়, অনুরূপ—ধনঞ্জয়, ক্ষেমঙ্কর, ধুরন্ধর, যুগন্ধর, সয়ংবরা, ভয়ংকর ইত্যাদি। [বসুন্ধরা প্রভৃতিতে স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' যুক্ত হইয়াছে। কর্মবাচক উপপদে ২য়া বিভক্তি বর্তমান।]

(।।/০) খল্‌ (খ্‌ ও ল্‌ ইৎ, অ থাকে)

সু ও দুর্‌ উপসর্গের পর সাধারণতঃ কর্মবাচ্যে—সু—√লভ্‌—সুলভ, দুর্‌—√লভ্‌—দুর্লভ, সু—√গম্‌—সুগম, দুর্‌—√গম্‌—দুর্গম, অনুরূপে—সুকর, দুষ্কর, দুর্বহ ইত্যাদি।

(।।৵০) খশ্‌ (খ্‌ ও শ্‌ অ থাকে)

কর্তৃবাচ্যে কর্ম-উপপদ থাকিলে—পর—√তপ্‌—পরন্তপ [শত্রুকে তাপ দেয় যে], পণ্ডিত—√মন্‌—পণ্ডিতম্মন্য [নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে], নঞ্‌-সূর্যম্‌—√দৃশ্‌—অসূর্যম্পশ্যা [সূর্য দেখে না যে নারী], বিহয়স্‌—√গম্‌—বিহঙ্গম, অনুরূপ—তুরঙ্গম, ভুজঙ্গম ইত্যাদি। [কর্মের বিভক্তি অ লুপ্ত।]

(।।৶০) ঘঞ্‌ (ঘ্‌ ও ঞ্‌ লোপ পায়, অ থাকে)

ভাববাচ্যে—√ভূ—ভাব, √পচ্‌—পাক, √ত্যজ্‌—ত্যাগ, √ভুজ্‌—ভোগ, √নশ্‌—নাশ, √তপ্‌—তাপ, √শুচ্‌—শোক, √লভ্‌—লাভ, √বস্‌—বাস, √পঠ—পাঠ, √রন্‌জ্‌—রাগ, √হৃ—হার, √হন্‌—ঘাত, √ভন্‌জ্‌—ভাগ, বি—√স্তৃ—বিস্তার ইত্যাদি। [ধাতুর অন্ত্য চ্‌ জ্‌ যথাক্রমে ক্‌, গ্‌ হয় এবং উপধা স্বরের বৃদ্ধি হয়]।

কর্মবাচ্যে—√অদ্—ঘাস, আ—√হৃ—আহার [খাদ্য বুঝাইলে], √পঠ্—পাঠ [পাঠ্য বিষয় অর্থে।]

অধিকরণবাচ্যে—√বস্—বাস [গৃহ অর্থে।]

(৮০) ট (ট্ ইৎ অ থাকে)

উপপদের পরস্থিত কৃ, সৃ, চর্, হন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ট হয়, যথা—দিবা√কৃ—দিবাকর অগ্র—√সৃ—অগ্রসর, ভূ—√চর্—ভূচর (ভূ-তে চরে যে), শত্রু—√হন্—শত্রুঘ্ন। অনুরূপ—চিত্রকর, পুষ্টিকর, বলকর, স্বাস্থ্যকর, তস্কর, প্রভাকর, কিঙ্কর, পুরঃসর, নিশাচর, জলচর, কৃতঘ্ন ইত্যাদি।

(৮/০) ড (ড্ ইৎ অ থাকে)

কর্তৃবাচ্যে—তুর—√গম্—তুরগ (ত্বরা অর্থাৎ বেগে গমন করে যে)। অনুরূপ—বিহগ, ভুজগ, উরগ ইত্যাদি। পঙ্ক—√জন্—পঙ্কজ, সরস্—√জন্—সরোজ, অপ্—√জন্—অব্জ। অনুরূপ—সরসিজ, অগ্রজ, অনুজ, আত্মজ, অম্বুজ, দ্বিজ ইত্যাদি।

(৮৵০) শ (শ্ ইৎ অ থাকে)

(ক) কর্তৃবাচ্যে—বিদ্ ও ধারি উত্তর—গো—√বিদ্—গোবিন্দ, অর্—√বিদ্—অরবিন্দ, কর্ম—√ধারি—কর্মধারয়।

(খ) ভাববাচ্যে—কৃ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর—কৃ—ক্রিয়া, √ইষ্—ইচ্ছা, √মৃগ—মৃগয়া, পরি—√চর্—পরিচর্যা ইত্যাদি। সর্বত্র স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' যুক্ত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—সাধারণতঃ ধাতুর পূর্বে উপপদ থাকিলে, ক্বিপ্, অণ্, কঞ্, খঙ্, খচ্, খশ্, ট, ড প্রভৃতি প্রত্যয় অথবা উপসর্গ ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।

(৯০) ষ্ট্রন্ (ষ্, ন্ ইৎ ট্র 'ত্র' হইয়া যায়)

করণবাচ্যে—√অস্—অস্ত্র, √শস্—শস্ত্র, √শাস—শাস্ত্র।

ভাববাচ্যে—√তন্—তন্ত্র [কর্ম, করণ ও অধিকরণ বাচ্যেও হয়।]

আরও অনেক কৃৎ প্রত্যয় আছে, বাঙ্‌লায় তাহাদের প্রয়োজন অত্যল্প বলিয়া উল্লেখ করা হইল না।

বাঙ্‌লা কৃৎ প্রত্যয়

অ

উচ্চারণে ইহার অস্তিত্ব থাকে না, কেবল ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য প্রভৃতিতেই ইহার উপযোগিতা।

ভাববাচ্যে—√মার্—মার, √হার—হার, √জিত্—জিত, √ঘুর্—ঘুর, √বাড়্—বাড, √টান্—টান ইত্যাদি।

প্রয়োগ—**মারের** চোটে ভূত ভাগে, জীবনে **হারজিত** আছেই, বড্ড **বাড়্** বেড়েছে ইত্যাদি।

অ, উ

কর্তৃবাচ্যে—ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ রচনায় ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় এবং ঈষদূনার্থে পদটির দ্বিত্ব হয়, যথা—√কাঁদ্—কাঁদকাঁদ, √পড়্—পড়পড়, √মর্—মরমর, উড্—উডুউডু, √নিব্—নিবুনিবু ইত্যাদি।

অন [ওন]—(সংস্কৃতের 'অনট্' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত)

ভাববাচ্যে—√চল্—চলন, √মিল্—মিলন (সংস্কৃতে 'মেলন'), √বুন্—বুনন, √কাঁদ্—কাঁদন্ত, √সৃজ্—সৃজন (সংস্কৃতে 'সর্জন')' √দেখ্—দেখন, √বাঁচ—বাঁচন, √সিচ্—সিঞ্চন, (সংস্কৃতে 'সেচন') √মাত্—মাতন, √পড্—পডন, √হ—হওন, √যা—যাওন, √বাঁধ্—বাঁধন, √ঝুল্—ঝুলন ইত্যাদি।

করণবাচ্যে—√মাজ্—মাজন [মাজে যাহা দ্বারা, যেমন—দাঁতের মাজন] √বেল্—বেলন, √ঝাড্—ঝাডন ইত্যাদি। [√মাজ্ ও √ঝাড়্ এর সহিত ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয় যুক্ত হইলে যথাক্রমে 'মাজার কাজ' ও 'ঝাডার কাজ' বুঝাইবে।]

অন্ত (সংস্কৃতে 'শতৃ' প্রত্যয়ের অনুরূপ)

কর্তৃবাচ্যে—'ঘটমান'-অর্থে ধাতুর সহিত ইহা যুক্ত হয়, যথা—√চল্—চলন্ত [চলিতেছে এমন], √ফুট্—ফুটন্ত [ফুটিতেছে এমন], √ফল্—ফলন্ত, √ঘুম্—ঘুমন্ত, √জীব্—জীবন্ত, √নিব্—নিবন্ত, √পড্—পডন্ত, √বাড—বাডন্ত ইত্যাদি।

'অন্ত'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ইংরেজীর present participles এর মত বিশেষণ পদ।

আ

বিশেষ্যপদ গঠনে ভাববাচ্যে এবং বিশেষণ পদ গঠনে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ বাচ্যে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়।

ভাববাচ্যে—√রাঁধ্—রাঁধা, √কাঁদ্—কাঁদা, √যা—যাওয়া [বি-শ্রুতি], √খা—খাওয়া, √শো—শোওয়া, √দেখ—দেখা, √চল্—চলা ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে—ভাত—√রাধ্—ভাতরাঁধা [বামুন], হাত—√ধর্—হাতধরা [হাত ধরে যে], গলা—√কাট্—গলাকাটা [ডাকাত] ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যে—√কর্—করা [কাজ] √জান্—জানা [কথা], √দেখ—দেখা √পর্—পরা [কাপড] √রাঁধ্—রাঁধা [ভাত], √পড়্—পড়া [বই], √লেখ্—লেখা [প্রবন্ধ] √চষ্—চষা [জমি] ইত্যাদি।

করণবাচ্যে—ইঁদুর-√মার্—ইঁদুরমারা [কল], ঘুঘু—√ধর্—ঘুঘুধরা [ফাঁদ] ইত্যাদি।

অধিকরণবাচ্যে—ভাত—√রাঁধ্—ভাতরাঁধা [হাঁড়ি], জল—√রাখ্—জলরাখা [কলসী] ইত্যাদি।

আই

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ইহার প্রয়োগ।

ভাববাচ্যে—√খোদ্—খোদাই, √চড়্—চড়াই, √চাল্—চালাই, √যাচ্—যাচাই, √বাছ্—বাছাই, √বাঁধ—বাঁধাই ইত্যাদি। অনুরূপে—চোলাই, উৎরাই, ধোলাই, সেলাই, লড়াই ইত্যাদি।

আও ('আই'-এর মত প্রয়োগ)

ভাববাচ্যে—√চড়্—চড়াও, √ঘর্—ঘেরাও, √কলা—কলাও, √পাকড়া—পাকড়াও ইত্যাদি।

আন [আনো]

বিশেষ্যপদ গঠনে ভাববাচ্যে এবং বিশেষণ পদ গঠনে কর্মবাচ্যে প্রযোজক ধাতুর উত্তর ইহার প্রয়োগ।

ভাববাচ্যে—√করা—করান, খাওয়া—খাওয়ান, √চালা—চালান, √বলা—বলান, √দেওয়া—দেওয়ান, √জানা—জানান, √উড়া—উড়ান ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্যে—√দেখা—দেখান [জাঁক], বাঁধা—বাঁধান [ঘাট], √লুকা—লুকান [টাকা], √শেখা—শেখান [বুলি] ইত্যাদি।

আনি

বিশেষ্যপদ রচনায় ভাববাচ্যে কর্ত্তৃ-, কর্ম্ম-, করণবাচ্যে প্রয়োগ।

ভাববাচ্যে—√শুনা—শুনানি, [hearing], √লাফা—লাফানি, √পোড়া—পোড়ানি, √হাঁপা—হাঁপানি, √ছট্‌ফটা—ছট্‌ফটানি, √ধমকা—ধমকানি ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্যে—√বেড়া—বেড়ানি [বেড়ায় যে, পাড়া-বেড়ানি মেয়ে], √চলা—চলানি ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্যে—√জ্বালা—জ্বালানি [যাহা জ্বালান হয়, জ্বালানি কাঠ]।

করণবাচ্যে—√পারা—পারানি [যাহা দ্বারা পার হয়, পারানি কড়ি বা নৌকা]।

ই

ধাতুর উত্তর ইহার যোগে ভাববাচক বিশেষ্য প্রস্তুত হয়।

ভাববাচ্যে—√চুর্—চুরি, √মার্—মারি, √হাঁচ্—হাঁচি, √ঝুঁক্—ঝুঁকি, √বুল্—বুলি, √কাশ্—কাশি, √হাস্—হাসি, √বেড়্—বেড়ি ইত্যাদি।

ইয়ে

দক্ষ-অর্থে কয়েকটি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইহার প্রয়োগ হয়; যথা—√কহ্—কহিয়ে, √গা—গাইয়ে, √বল্—বলিয়ে, বাজ্—বাজিয়ে, √লিখ্—লিখিয়ে, √পড়্—পড়িয়ে ইত্যাদি।

উক

শীল বা স্বভাব অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে—√মিশ্—মিশুক, √খা—খাউক [=খেকো] √হিন্‌স্—হিংসুক [সংস্কৃত কৃৎ]।

উয়া

কর্ত্তৃবাচ্যে—√পড়্—পড়ুয়া [ছাত্র] বা পড়ো [অপিনিহিতি অভিশ্রুতিতে] √পড়্ (পতিত হওয়া) প'ড়ো [বাড়ী]।

উনি (উনী)

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ রচনায় ভাববাচ্যে—√খাট্—খাটুনি, √খিঁচ্—খিঁচুনি √ছা—ছাউনি, √গাঁথ্—গাঁথুনি, √বক্—বকুনি ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদ গঠনে কর্তৃবাচ্যে—√রাঁধ্—রাঁধুনি [রাঁধে যে], √নাচ্—নাচুনি, নাচুনী ইত্যাদি।

বস্তুবাচক বিশেষ্যপদ রচনায় করণবাচ্যে—√চাল্—চালুনি, √ছাঁক্—ছাঁকুনি, ছাঁক্‌নি [যাহার সাহায্যে ছাঁকা হয়], √ছেদ্—['উ' লোপে 'নি' বা 'নী' প্রত্যয় যোগে ছেদ্‌নি-নী, সমীকরণে ছেন্নি বা ছেন্নী, তাহা হইতে] ছেনি, ছেনী, √কুর্—কুরুনি, √ছেঁচ্—ছেঁচুনি ইত্যাদি।

অক (প্রসারে কা, কি)

স্বার্থে এবং সংযোগ বুঝাইতে—√চড়্—চড়ক, √ঝল্—ঝলক, √টন্—টনক, √মুড়—মোড়ক, √বৈঠ্ (হিন্দী) বৈঠক, √ফাট্—ফাটক, ফটক, √কুঁচ্—কুঁচ্‌কি, √বুঁচ্—বোচ্‌কা, বুচকি, √হেঁচ্—হেঁচকা, হেঁচকি।

অত (ইত)

বিশেষণ পদ রচনায় কয়েকটি ধাতুর উত্তর ইহা যুক্ত হইয়া থাকে।

কর্মবাচ্যে—√চল্—চলিত, √জান্—জানিত [জানিত লোক বা ব্যাপার], √মান্—মানত [-পূজা], মানিত [-সাক্ষী], √ফর্—ফিরত, ফেরত, √পার্—পারত [পারতপক্ষে] ইত্যাদি।

অধিকরণবাচ্যে—√বস্—বসত [বসত বাটী] ইত্যাদি।

তব্য—√কহ্—কহতব্য [সংস্কৃত 'বক্তব্য'-এর অনুকরণে]।

[অ-] তা

কর্তৃবাচ্যে—√ফের্—ফের্‌তা [-গাড়ী], √পড়্—পড়্‌তা, √বহ্—বহ্‌তা [-নদী], সব—√জান্—সবজান্‌তা [-লোক], ইত্যাদি।

[অ-] তি

সংস্কৃতের 'ক্তি' প্রত্যয় হইতে জাত।

ভাববাচ্যে—ভর্—ভর্তি, ঘাট্—ঘাট্‌তি, বাড়্—বাড়্‌তি, কম্—কম্‌তি, পড়্—পড়্‌তি, ফির্—ফির্‌তি ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে—√কম্—কম্‌তি, চল্—চল্‌তি [-কথা বা গাড়ী] √উঠ্—উঠ্‌তি, -বয়স], বাড়্—বাড়্‌তি [-দর] ইত্যাদি।

অধিকরণবাচ্যে—বস্—বসতি, বস্তি [যেখানে বাস করে]।

[অ-] না

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ গঠনে ইহার ব্যবহার।

ভাববাচ্যে—√কাঁদ্—কান্না, √খাট্—খাটনা, বাজ্—বাজনা, √রাঁধ্—রাঁধ্‌না-রান্না [সমীকরণে], √ধর্—ধর্‌না [সমীকরণে 'ধন্না'], √দে—দেনা, √পা—পাঅনা-পাওনা ইত্যাদি।

ভূতকালিক বিশেষণ—√শুখ—শুখ্‌না [শুখাইয়াছে এমন]।

বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠনে :

কর্মবাচ্যে—√কুট্—কুটনা, √দে—দেনা, √পা—পাঅনা—পাওনা √বাট্—বাট্‌না, বি—√ছা—বিছাঅনা—বিছানা ইত্যাদি।

করণবাচ্যে—√খেল্—খেল্‌না [যাহা দ্বারা খেলে], √ঢাক্—ঢাক্‌না [যাহা দ্বারা ঢাকে] ইত্যাদি।

অপাদানবাচ্যে—√ঝর্—ঝর্‌ণা [যাহা হইতে ঝরে]।

অধিকরণবাচ্যে—√দোল্—দোল্‌না [যাহাতে দোলে]।

আরি [-ী] উরি [-ী]

দক্ষ অর্থে কর্তৃবাচ্যে—√পূজ্—পূজারী [পূজারী], √ডুব্—ডুবুরি [ডুবুরী], √ধুন্—ধুনারি [-ী] ধুনুরি [-ী]।

করণবাচ্যে—√কাট্—কাটারি [যাহা দ্বারা কাটা যায়]।

ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে কৃদন্ত [কৃৎ অন্তে যাহার] শব্দ বলে।

তদ্ধিত প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয়ের মত তদ্ধিত প্রত্যয়ও দুই ভাগে বিভক্ত (ক) **সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়** এবং (খ) **বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়**।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে **প্রধান** ব্যাপার **হইল অর্থ**। একটি কৃৎ প্রত্যয় যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, **একই তদ্ধিত প্রত্যয়ও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে** শব্দের উত্তর **প্রযুক্ত হয়**।

(ক) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

অ (ষ্ণ, অণ্, অঞ্)

নিম্নোক্ত বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ; মূল শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি এবং অন্ত্যস্বরের গুণ হয়।

(১) **অপত্য**-অর্থে : কুরু+অ=কৌর+অ=কৌরব [কুরুর অপত্য অর্থাৎ পুত্র বা বংশধর]. মনু=মনো+অ=মানব, দনু—দানব, কশ্যপ—কাশ্যপ, রঘু—রাঘব, যদু—যাদব, পুত্র—পৌত্র, দুহিতৃ—দৌহিত্রী, পৃথা—পার্থ, বসুদেব—বাসুদেব, জনক—জানকী [স্ত্রীলিঙ্গে ঈ], দ্রুপদ—দ্রৌপদী [স্ত্রীলিঙ্গে ঈ] ইত্যাদি।

(২) **'সেখানে জাত'**- বা 'তৎসম্বন্ধীয়'- অর্থে : দেব+অ=দৈব [দেবসম্বন্ধীয়], চন্দ্র—চান্দ্র, পৃথিবী—পার্থিব [পৃথিবীতে জাত বা পৃথিবী-সম্বন্ধীয়], মনস্—মানস, সূর্য—সৌর, অসুর—আসুর, পশু—পাশব, শরৎ—শারদ, শরীর—শারীর, নিশা—নৈশ, জন্তু—জান্তব, বসন্ত—বাসন্তী [স্ত্রীলিঙ্গে ঈ] ইত্যাদি।

(৩) **'ভক্ত'**- বা **'উপাসক'**- অর্থে : বিষ্ণু+অ=বৈষ্ণব [বিষ্ণুর ভক্ত বা উপাসক], শক্তি—শাক্ত, শিব—শৈব, বুদ্ধ—বৌদ্ধ, স্ত্রী—স্ত্রৈণ [স্ত্রীর ভক্ত—বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ] ইত্যাদি।

(৪) **'সেই বিষয়ে বা তদ্দ্বারা রচিত বা উক্ত-'** অর্থে : ভগবৎ+অ=ভাগবত [ভগবদ্-বিষয়ে রচিত], পতঞ্জলি+অ=পাতঞ্জল [পতঞ্জলি দ্বারা রচিত], ঋষি—আর্ষ [ঋষিদ্বারা উক্ত], ভরত—ভারত, [ভরত বা ভরত-বংশবিষয়ে রচিত] ইত্যাদি।

(৫) 'বিকার-' বা 'ইহা দ্বারা নির্মিত'- অর্থে: পয়স্+অ=পায়স, হেম—হৈম, রজত—রাজত, শিল—শৈল।

(৬) 'তাহা জানে'- বা 'অধ্যয়ন করে'- অর্থে: ব্যাকরণ+অ=বৈয়াকরণ [ব্যাকরণ জানে], স্মৃতি—স্মার্ত, ব্রহ্মন্—ব্রাহ্মণ [-ব্রহ্মবিৎ] ইত্যাদি।

(৭) 'শীল বা স্বভাব'- অর্থে: তপস্+অ—তাপস [তপঃ অর্থাৎ তপস্যাই শীল যাহার], ছত্র—ছাত্র ইত্যাদি।

(৮) 'তৎস্থানবাসী বা তৎস্থানীয়'—অর্থে: মগধ+অ—মাগধ [মগধবাসী বা মগধসংক্রান্ত], পাঞ্চাল—পাঞ্চালী, [স্ত্রীলিঙ্গে ঈ], বিদেহ—বৈদেহী [স্ত্রীলিঙ্গে ঈ], মিথিলা—মৈথিল [স্ত্রী—মৈথিলী], মথুরা—মাথুর [মথুরা-সংক্রান্ত] ইত্যাদি।

(৯) 'ভাব'-অর্থে: মুনি+অ=মৌন [মুনির ভাব], শিশু—শৈশব, যুবা [যুবন্]—যৌবন, শুচি—শৌচ, গুরু—গৌরব, লঘু—লাঘব, পুরুষ—পৌরুষ, কুশল—কৌশল, সুভ্রাতা [সুভ্রাতৃ]—সৌভ্রাত্র, সুহৃদ্—সৌহৃদ, সৌহার্দ [বিকল্পে] ইত্যাদি।

(১০) স্বার্থে [অর্থাৎ অপরিবর্তিত অর্থে]: বন্ধু+অ=বান্ধব, চোর—চৌর, রক্ষস্—রাক্ষস, কুতূহল—কৌতূহল ইত্যাদি।

(১১) 'তাহার ঈশ্বর'-অর্থে: পৃথিবী+অ=পার্থিব [পৃথিবীশ্বর অর্থাৎ রাজা], সর্বভূমি—সার্বভৌম।

(১২) তাহাতে কুশল বা নিপুণ'-অর্থে: বিদ্যা+অ=বৈদ্য [বিদ্যায় কুশলী], ব্যাকরণ—বৈয়াকরণ [ব্যাকরণে নিপুণ] ইত্যাদি।

ই (ষ্ণি)

[এই প্রত্যয় যুক্ত হইলে মূল শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ও অন্ত্যস্বরের লোপ।]

'অপত্য'- অর্থে: অর্জুন+ই=আর্জুনি [অর্জুনের অপত্য] দশরথ—দাশরথি, রাবণ—রাবণি, সুমিত্রা—সৌমিত্রি ইত্যাদি।

য (ষ্ণ্য)

এই প্রত্যয়ের যোগে মূল শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি এবং অন্ত্যস্বরের লোপ হয়।]

(১) 'অপত্য'- অর্থে: চণক+য [ষ্ণ্য বা যঞ্]=চাণক্য [চণকের অপত্য], জমদগ্নি—জামদগ্ন্য, বৎস—বাৎস্য, অদিতি—আদিত্য, দিতি—দৈত্য ইত্যাদি।

(২) 'তাহার' ভাব বা কর্ম'-অর্থে: চতুর+য [ষ্ণ্য বা ষ্যঞ্‌]=চাতুর্য; অলস—আলস্য, নিপুণ—নৈপুণ্য, অধিপতি—আধিপত্য, বণিক্ [বণিজ্‌]—বাণিজ্য, দূত—দৌত্য, শূর—শৌর্য; বীর+য [যৎ ইহাতে আগ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় না]=বীর্য, সখা—সখ্য; সারথি+য [ষ্ণ্য বা যক্]=সারথ্য, সেনাপতি—সৈনাপত্য, পুরোহিত পৌরোহিত্য, ইত্যাদি।

(৩) 'সেখানে জাত বা স্থিত বা তৎসম্বন্ধীয়'-অর্থে: বন+য [যৎ, আদ্যস্বরের বৃদ্ধি নাই]=বন্য, গ্রাম—গ্রাম্য, প্রাচি—প্রাচ্য, মূর্ধ [মূর্ধন্‌]—মূর্ধন্য, আদি—আদ্য, অন্ত—অন্ত্য, গো—গব্য, ইত্যাদি।

(৪) 'সঙ্গত'-অর্থে: ন্যায়+য [যৎ]=ন্যায্য, পথ [পথিন্]—পথ্য; ইত্যাদি।

(৫) 'স্বার্থে': করুণা+য [য্য বা ষ্যঞ্‌]=কারুণ্য, সেনা—সৈন্য, ত্রিলোকী—ত্রৈলোক্য, সন্নিধি—সান্নিধ্য ইত্যাদি।

(৬) 'ভাবার্থে': অধিক+য [ষ্ণ্য বা ষ্যঞ্‌]=আধিক্য, উদার—ঔদার্য, উদাসীন—ঔদাসীন্য, কৃপণ—কার্পণ্য, গম্ভীর—গাম্ভীর্য, ধীর—ধৈর্য, পণ্ডিত—পাণ্ডিত্য, মধুর—মাধুর্য, সুভগ—সৌভাগ্য, সুজন—সৌজন্য, সুকুমার—সৌকুমার্য, ইত্যাদি।

(৭) তাদর্থ্যে: পাদ+অ [যৎ]=পাদ্য [পাদ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত (জল)]।

(৮) 'তাহাতে সাধু' অর্থে: সভা+য [যৎ]=সভ্য।

আয়ন (ষ্ণায়ন)

(মূল শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি)

(১) 'অপত্য'-অর্থে: শকট+আয়ন=শাকটায়ন ['শকট'-ঋষির পুত্র এবং অন্যতম সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা]; অশ্বল—আশ্বলায়ন ['অশ্বল'-ঋষির পুত্র ও প্রাচীন সূত্রকার]; নর—নারায়ণ [প্রাচীন ঋষি]; বদর—বাদরায়ণ [ব্যাসদেব] দক্ষ—দাক্ষায়ণী [দক্ষতনয়া সতী, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হইয়াছে] ইত্যাদি।

(২) 'সেখানে জাত' বা 'তাহার অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ' অর্থে: দ্বীপ+আয়ন=দ্বৈপায়ন [দ্বীপে জাত ব্যাসদেব]; রাম+আয়ন=রামায়ণ [রাম-চরিত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ] ইত্যাদি।

ইক (ষ্ণিক)

(মূল শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি)

(১) 'তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে' অর্থে: বেদ+ইক=বৈদিক [বেদ বেত্তা বা বেদাধ্যায়ী], ন্যায়—নৈয়ায়িক, পুরাণ—পৌরাণিক, তর্ক—তার্কিক, বেদান্ত—বৈদান্তিক, ইতিহাস—ঐতিহাসিক, অর্থনীতি—*আর্থনীতিক, রাজনীতি—*রাজনীতিক ইত্যাদি।

(২) 'সেখানে জাত'-অর্থে সমুদ্র+ইক=সামুদ্রিক প্রাণী, শৈবাল, ইত্যাদি। হেমন্ত—হৈমন্তিক [ধান্য] ইত্যাদি।

(৩) 'তৎ-সংক্রান্ত'-অর্থে: ইহ+ইক=ঐহিক, পরত্র—পারত্রিক, লোক—লৌকিক, প্রকৃতি—প্রাকৃতিক, শরীর—শারীরিক, রাজনীতি—‡রাজনৈতিক [পাণিনি-র মতে 'রাজনীতিক'] গণতন্ত্র—*'গণতান্ত্রিক [পাণিনির মতে 'গাণতন্ত্রিক'], প্রত্নতত্ত্ব—*প্রত্নতাত্ত্বিক [পাণিনি-মতে 'প্রাত্নতত্ত্বিক], অধিভূত—*আধিভৌতিক, পরলোক—*পারলৌকিক, দেহ—দৈহিক, মন [স]—মানসিক, অধুনা—আধুনিক, অসুর—আসুরিক, অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক ইত্যাদি।

(৪) 'তদ্দ্বারা সাধিত'-অর্থে: কায়+ইক=কায়িক, মুখ—মৌখিক, অন্তর—আন্তরিক, বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক, অণু—আণবিক ইত্যাদি।

(৫) 'তাহাতে নিপুণ, অর্থে: সাহিত্য+ইক=সাহিত্যিক, সংবাদ—সাংবাদিক, প্রবন্ধ—প্রাবন্ধিক, উপন্যাস—ঔপন্যাসিক।

(৬) 'তন্নিযুক্ত, ও 'তাহার হিতকর' অর্থে, দ্বার+ইক=দৌবারিক [দ্বারে নিযুক্ত প্রহরী], সর্বজন+ইক=সার্বজনিক [সর্বজনের হিতকর] ইত্যাদি।

(৭) 'ব্যাপ্তি, বৃত্তি, শীল'-অর্থে: দিন+ইক=দৈনিক [দিন ব্যাপিয়া] তিল+ইক=তৈলিক [তৈল ব্যবসায়ী], জাল—জালিক [—জালিঅ—জালিয়া—জাইল্যা—জেলে], নৌ—নাবিক [নৌ-চালনা-বৃত্তিধারী; ব্যবহার+ইক=ব্যবহারিক [ব্যবহার শীল যাহার], ধর্ম—ধার্মিক[ধর্ম শীল যাহার] ইত্যাদি।

---

*পাণিনির মতে উত্তরপদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি না থাকিলেও পরবর্তী বৈয়াকরণগণ উহার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

‡পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

(৮) **'তাহা হইতে আগত বা প্রাপ্ত'** এবং **'তথায় স্থিত'-অর্থে :** পিতা [পিতৃ] +ইক=পৈতৃক [পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত—'পৈতৃক' সম্পত্তি, স্বভাব, ঋণ প্রভৃতি] কুল—কৌলিক, বিদেশ—বৈদেশিক ; নগর+ইক=নাগরিক [নগরে স্থিত], নীতি—নৈতিক [নীতিতে স্থিত], পরিপার্শ্ব—পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি।

এয় (ঢেয়)

(মূল শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ও অন্ত্যস্বরের লোপ)

(১) **'অপত্য'** অর্থে : অত্রি+ত্রয়=আত্র্‌+এয়=আত্রেয় [অত্রির অপত্য], কৃত্তিকা—কার্তিকেয়, কুন্তী—কৌন্তেয় ; গঙ্গা—গাঙ্গেয় [ভীম], ভগিনী—ভাগিনেয়, বিমাতা [বিমাতৃ]—বৈমাত্রেয়, সরমা—সারমেয় [সরমার অপত্য কুকুর], মিত্র—মৈত্রেয় ইত্যাদি।

(২) **'তৎকৃত' বা তৎসম্বন্ধীয়'**—অর্থে : পুরুষ+এয়=পৌরুষেয় [পুরুষ-কৃত যেমন—বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়], অগ্নি—আগ্নেয় [গিরি বা শিলা], গঙ্গা—গাঙ্গেয় [উপত্যকা বা সভ্যতা] ইত্যাদি।

(৩) **'তাহাতে সাধু'**-অর্থে : অতিথি+এয়=আতিথেয় [অতিথির প্রতি সাধু]।

(৪) **'উপাসক'**—অর্থে : অগ্নি—আগ্নেয় [অগ্নির উপাসক]।

ঈয় (ছীয়, ছ)

(অন্ত্যস্বরের লোপ, কচিৎ গুণ হয়।)

(১) বিশেষণ পদ রচনায় **'তথায় জাত'**-অর্থে : ভারত+ঈয়=ভারতীয় [ভারতে জাত], জিহ্বামূল—জিহ্বামূলীয় [বর্ণ], দেশ—দেশীয়, বায়ু—বায়বীয়, ইত্যাদি।

(২) **'সম্বন্ধে,'** : মৎ+ঈয়=মদীয় [আমার], ভবৎ—ভবদীয় [আপনার], ত্বৎ—ত্বদীয় [তোমার], তৎ—তদীয় [তাহার], রাষ্ট্র—রাষ্ট্রীয় [রাষ্ট্রের], ভারত—ভারতীয় [ভারতের] ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দেও উভয় অর্থে এই প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। যেমন—আরবীয়, ইতালীয়, মিশরীয়, ইয়োরোপীয় ইত্যাদি।

ইত [চ্]

(মূল শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ)

'তাহাতে ইহা জাত'-অর্থে এই প্রত্যয়যোগে বিশেষণপদ গঠিত হয়; যথা—অঙ্কুর+ইত [অঙ্কুর্+ইত]=অঙ্কুরিত [বীজ], আনন্দ—আনন্দিত, কণ্টক—কণ্টকিত [দেহ], পুষ্প—পুষ্পিত, পল্লব—পল্লবিত, দুঃখ—দুঃখিত, গর্ব—গর্বিত, রোমাঞ্চ-রোমাঞ্চিত ইত্যাদি।

ইন্ (ইনি)

(মূল শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ)

'অস্ত্যর্থে' ['আছে'-অর্থে] এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। [ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে, 'ন্' লুপ্ত হয় এবং 'ই' ঈ হইয়া যায় বলিয়া বাংলায় ঈ-কারান্ত রূপটিই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সমাসে পূর্বপদ হইলে মাত্র 'ন্'-টি লুপ্ত হয়।]

গুণ+ইন্=[গুণ্+ইন্=গুণিন্]=গুণী [কিন্তু গুণিগণ]; পক্ষ—[পক্ষিণ] পক্ষী [কিন্তু পক্ষিরাজ]; সুখ—সুখী; দুঃখ—দুঃখী; হস্ত—হস্তী; কর—করী; মান—মানী ইত্যাদি।

[ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ন্' লুপ্ত হয় না। উহার সহিত ঈ যুক্ত হয়; যেমন—পক্ষিণী, মানিনী, প্রণয়িনী, পুষ্করিণী (পুষ্কর=পদ্ম), তটিনী, প্রবাহিণী ইত্যাদি।

বিন্ (বিনি)

ইহার প্রয়োগও ইন্-প্রত্যয়ের অনুরূপ। [পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বী', স্ত্রীলিঙ্গে 'বিনী' এবং সমাসে পূর্বপদ হইলে 'বি' হয়।] যথা—তপস্+বিন্=[তপস্বিন্] তপস্বী, স্ত্রীলিঙ্গে তপস্বিনী, সমাসে তপস্বিগণ; তেজস্—তেজস্বী [স্ত্রী—তেজস্বিনী, সমাসে—তেজস্বিগণ]; যশস্—যশস্বী, মেধা—মেধাবী, মায়া—মায়াবী, পয়স্—পয়স্বিনী [দুগ্ধবতী, মাত্র স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার] ইত্যাদি।

ইমন্ (ইমনিচ্)

(মূল শব্দের অন্ত্যস্বরের বিলোপ)

ইমন্ স্থানে 'ইমা' হয়।

'তাহার ভাব'—অর্থে: অণু+ইমন্=অণ্+ইমা=অণিমা, রক্ত—রক্তিমা,

শ্যামল—শ্যামলিমা ; লঘু—লঘিমা, গুরু—গরিমা, দীর্ঘ—দ্রাঘিমা, মহৎ—মহিমা, বহু-ভূমা [নিপাতনে সিদ্ধ] ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—সংস্কৃতে ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। বাংলায় অণিমা, নীলিমা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের নাম রূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া অধ্যাপক সুনীতি কুমার এইগুলিকে বাংলা 'ইমা' প্রত্যয়ান্ত শব্দ বলিতে চাহিয়াছেন।

ইল [চ্], ল [চ্]

অস্ত্যর্থক 'ইল' প্রত্যয়যোগে মূল শব্দের অন্ত্যস্বর লুপ্ত হয়, কিন্তু 'ল'-প্রত্যয়ে তাহা হয় না।

(ক) জটা+ইল=[জট্+ইল] জটিল [জটা আছে যাহার]; পঙ্ক—পঙ্কিল ; ফেন—ফেনিল ; পিচ্ছ—পিচ্ছিল ইত্যাদি।

(খ) পাংশু+ল=পাংশুল, মাংস+ল=মাংসল, মঞ্জু—মঞ্জুল, শীল—শীতল, শ্যাম—শ্যামল, শ্রী—শ্রীল ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—পিঙ্গল [√পিন্জ্+কলচ্ করণবাচ্যে]; পেশল [পেশ—√লা+ক, কর্তৃবাচ্যে]; কপিল [√কপ্+ইলচ্ কর্মবাচ্যে] ; কুশল [√কুশ্ কলন্ কর্তৃবাচ্যে [অথবা—√কুলা+ক, কর্তৃবাচ্যে] ইত্যাদি কৃদন্ত পদ তদ্ধিতান্ত নহে।

ঈন (খ, খঞ্)

'তথায় স্থিত বা জাত'—অর্থে : প্রাচ্+ঈন্ [খ]=প্রাচীন [পূর্বে স্থিত বা জাত] কুল—কুলীন ; অর্বাচ—অর্বাচীন [পরবর্তী কালে স্থিত বা জাত; ইত্যাদি। সম্মুখ—সম্মুখীন [সম্মুখে স্থিত]।

'তৎসম্বন্ধীয়'—অর্থে : সর্বাঙ্গ+ইন [খ]=সর্বাঙ্গীণ ; প্রাতঃকাল—প্রাতঃকালীন ইত্যাদি।

'স্বার্থে' নব+ঈন [খ]=নবীন।

'তাহার হিতকর'—অর্থে : সর্বজন+ঈন [খ]=সর্বজনীন ; বিশ্বজন—বিশ্বজনীন।

'তাহাতে সাধু'—অর্থে : সর্বজন+ইন [খঞ্]=সার্বজনীন।

লক্ষণীয়—প্রায়শঃ সর্বজনীন—অর্থে 'সার্বজনীন'—পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; ইহা অশুদ্ধ। 'সর্বজনীন' বা সার্বজনীক পূজা, কিন্তু সার্বজনীন' ব্যক্তি।

ঈয়স্ (ঈয়স্থন্), তর [প্] ; ইষ্ঠ [ন্], তম [প্]

দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে বিশেষণ শব্দের সহিত 'ইয়স্' [উন্] বা 'তর [প্] প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে একোৎকর্ষে 'ইষ্ঠ [ন্]' বা তম [প্] প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—গুরু—গরীয়স্ বা গুরুতর এবং গরিষ্ঠ বা গুরুতম। [বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বিশেষণের তারতম্য' (পৃঃ ১৮৭) দ্রষ্টব্য।]

তা, ত্ব [ল্]

'ভাবার্থে' : অলস+তা=অলসতা [অলসের ভাব], অমর—অমরতা, কৃপণ—কৃপণতা, মূর্খ—মূর্খতা, চঞ্চল—চঞ্চলতা, ইত্যাদি। অমর+ত্ব [ল্]=অমরত্ব, গুরু—গুরুত্ব, পটু—পটুত্ব, স্ব—স্বত্ব, মহৎ—মহত্ত্ব ইত্যাদি।

'সমূহার্থে' : জন+তা=জনতা [জন-সমূহ]।

'স্বার্থে' : দেব+তা=দেবতা ['দেব' এবং 'দেবতা' সমার্থক]। বাঙ্‌লা শব্দে কখনও কখনও ভাবার্থে 'ত্বল্' ও 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—নতুন—নতুন-ত্ব [নতুনের ভাব], আমি—আমিত্ব ['আমিত্বের মোহে ভুল না রে মন, জ্ঞান-খড়্গে কাট মায়ার বন্ধন'], হিন্দু—হিন্দুত্ব ; সত ['সন্ত' হইতে]—সততা, চটাল—চটালতা কঞ্জুষ—কঞ্জুষতা ইত্যাদি।

তন (টু, টুল্)

'তত্র ভব'—অর্থে কয়েকটি কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। যথা—অধুনা+তন=অধুনাতন [এখনকার], ইদানীম্—ইদানীন্তন, তদানীম্—তদানীন্তন [সেই সময়কার], প্রাচ—প্রাক্তন, চিরম্—চিরন্তন, পূর্ব—পূর্বতন, ঊর্ধ্ব-ঊর্ধ্বতন, অধঃ [স্]—অধস্তন, পুরা—পুরাতন, নব—নূতন ['নব'-স্থানে নূ ; 'নবতন' হইতে প্রাচীন বাংলা অর্ধতৎসম 'নও্ তুন', তাহা হইতে বর্তমান বাংলা 'নতুন'-পদ সিদ্ধ]।

মতুপ্ ('উপ্' ইৎ, মৎ থাকে)

অস্ত্যর্থে ['ইহা তাহার আছে,—অর্থে] এই প্রত্যয় হয়। অ বর্ণান্ত ও স্পর্শ-বর্ণান্ত শব্দের উত্তর এবং যাহাদের উপধা [অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণ] অ-কার আ-কার বা ম-কার, সেই সকল শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যয়ের 'মৎ' 'বৎ'

হইয়া যায়। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'মৎ'-স্থানে 'মান্' এবং 'বৎ'-স্থানে 'বান্' হয়। 'স্ত্রীলিঙ্গে' ঈপ্ প্রত্যয়যোগে যথাক্রমে 'মতী' ও 'বতী' হইয়া থাকে।

শ্রী+মতুপ্=শ্রীমৎ [শ্রী 'আছে যার ; পুং—শ্রীমান্, স্ত্রী শ্রীমতী] ; বুদ্ধি—বুদ্ধিমৎ : বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী ; অংশু [কিরণ]—অংশুমৎ ; অংশুমান্ [সূর্য] ; ধী—ধীমৎ ; ধীমান্, ধীমতী ; শক্তি—শক্তিমৎ ; শক্তিমান্—শক্তিমতী ; বসু [ধন]—বসুমৎ ;বসুমতী [পৃথিবী] ইত্যাদি।

গুণ—গুণবৎ ; গুণবান্, গুণবতী ; অনুরূপ—দয়াবান্, দয়াবতী ; ভাগ্যবান্, ভাগ্যবতী ; বলবান্, বলবতী ; বিদ্যাবান্, বিদ্যাবতী ইত্যাদি।

ময় [ট্]

(১) 'বিকার' [তদ্দ্বারা নির্মিত]-অর্থে : কাষ্ঠ+ময় [ট্]=কাষ্ঠময় [কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত] মৃৎ [মৃত্তিকা]—মৃণ্ময়, হিরণ্য—হিরণ্ময় ইত্যাদি।

(২) 'ব্যাপ্তি'-অর্থে : জল+ময় [ট্]=জলময় [জলদ্বারা ব্যাপ্ত], ভস্ম—ভস্মময়, সুখ—সুখময়, দুঃখ—দুঃখময় ইত্যাদি।

(৩) 'অবয়ব' [ইহাই তাহার দেহ]-অর্থে : চিৎ—চেতনা+ময়[ট্]=চিন্ময় [চেতনা-ই ইহার অবয়ব], বাক্—বাঙ্ময় ইত্যাদি।

(৪) 'সংযোগ'-অর্থে—ঘৃত+ময় [ট্]=ঘৃতময়, [ঘৃত-সংযুক্ত], শ্বাপদ—শ্বাপদময়, পুষ্প—পুষ্পময় ইত্যাদি।

(৫) 'পুরীষ'-অর্থে : গো+ময়[ট্]=গোময় [গোবর]।

বতিচ্ ['ইচ্' ইৎ যায়, বৎ থাকে]

'সাদৃশ্য'-অর্থে : আত্মন্+বৎ [ইচ্]=আত্মবৎ [নিজের মত], পিতৃ—পিতৃবৎ, মাতৃ—মাতৃবৎ, মিত্র—মিত্রবৎ, পুত্র—পুত্রবৎ, শত্রু—শত্রুবৎ ইত্যাদি।

লক্ষণীয় : 'অস্ত্যর্থক' মতুপ্-প্রত্যয়ের বৎ এবং সাদৃশ্যার্থক বতিচ্-প্রত্যয়ের বৎ এক নহে। পূর্বের বৎ-স্থানে পুংলিঙ্গ '-বান্' এবং স্ত্রীলিঙ্গে '-বতী' হয়, কিন্তু বতিচ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয়

র

অস্ত্যর্থে : উষ [লোনা মাটি]+র=উষর, কুঞ্জ [হস্তিদন্ত]—কুঞ্জর [হস্তী], পাণ্ডু [বর্ণবিশেষ]—পাণ্ডুর, মধু—মধুর, মুখ—মুখর ইত্যাদি।

শ

অস্ত্যর্থে : কর্ক [কাঠিন্য] = কর্কশ, কপি [পাংশুবর্ণ]—কপিশ, রোম—রোমশ, লোম—লোমশ ইত্যাদি।

লক্ষণীয় : গিরিশ—গিরি√শী + ড কর্তৃবা=[গিরিতে শয়ন করেন যিনি অর্থাৎ মহাদেব], কিন্তু গিরীশ='গির্' [বাক্য] এর ,ঈশ' [ঈশ্বর] = মহাদেব অথবা 'গিরি' [পর্বত]-এর ঈশ = হিমালয়।

শস্

'বীপ্সা' ও 'পরিমাণ'-অর্থে : ক্রম + শস্ = ক্রমশঃ, প্রায়—প্রায়শঃ, বহু + শস্ = বহুশঃ, সহস্র—সহস্রশঃ ইত্যাদি।

তস্ [ইল্]

সংস্কৃতে 'সার্বাবিভক্তিকস্তসিল্' [সকল বিভক্তিতেই তসিল্ (তস্) প্রত্যয় হয়] হইলেও বাঙ্‌লায় প্রধানতঃ পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির অর্থেই এই প্রত্যয় প্রয়োগ হয়।

'পঞ্চমী বিভক্তি'-অর্থে : ইদম্ + তস্ = ইতঃ [ইতঃ পূর্বে, ইতোমধ্যে], তদ্—ততঃ, [ততঃপর, ততো(হ) ধিক], অদস্—অতঃ, [অতঃপর] ; ইত্যাদি।

'সপ্তমী বিভক্তি'-অর্থে : ইতস্ততঃ [এখানে-সেখানে], অন্ত—অন্ততঃ, উভয়—উভয়তঃ, ফল—ফলতঃ, বস্তু—বস্তুতঃ, প্রধান—প্রধানতঃ ইত্যাদি।

মাত্র

'পরিমাণ'-অর্থে : অল্প + মাত্র = অল্পমাত্র [অল্প পরিমাণ], এক—একমাত্র, কণা—কণামাত্র, ক্ষণ—ক্ষণমাত্র, বিন্দু—বিন্দুমাত্র, কিম্ + চিৎ [অনিশ্চয়ার্থে] + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র ; ইত্যাদি।

ক [ষ্]

'ক্ষুদ্র'-অর্থে : বাল + ক = বালক, নৌ + ক + আ[স্ত্রী] = নৌকা ; ইত্যাদি।

স্বার্থে : এক + ক = একক, যুবন্—যুবক, কালী—কালিকা [স্ত্রী] চণ্ডী—চণ্ডিকা [স্ত্রী] ইত্যাদি।

সাৎ

'তাহাতে পরিণত'-অর্থে : ধূলি + সাৎ = ধূলিসাৎ [ধূলিতে পরিণত], ভস্ম—ভস্মসাৎ ইত্যাদি।

'তাহাতে অর্পিত'-অর্থে: উদর+সাৎ=উদরসাৎ [উদরে অর্পিত], পাত্রসাৎ [পাত্রে অর্পিত], ভূমিসাৎ [ভূমিতে অর্পিত বা পতিত] ইত্যাদি।

ধাচ্ ('চ' ইৎ, ধা থাকে)

'প্রকারে' বা 'ভাগে'-অর্থে: সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়; যথা—দ্বি +ধাচ্=দ্বিধা [দুই প্রকারে বা দুই ভাগে], ত্রি—ত্রিধা, শত—শতধা ইত্যাদি।

ত্রল্ ('ল্' ইৎ, ত্র থাকে)

'স্থানার্থে' কয়েকটি সর্বনাম শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়; যথা—ইদম্+ত্রল্= অত্র [এই স্থানে], যদ্—যত্র [যেখানে]' তদ্—তত্র [সেখানে], কিম্—কুত্র [কোথায়] উভয়—উভয়ত্র, অন্য—অন্যত্র, সর্ব—সর্বত্র, ইত্যাদি।

থাল্ ('ল্' ইৎ, থা থাকে)

'প্রকার'-অর্থে: কয়েকটি সর্বনাম শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়; যেমন—অন্য+থাল্ =অন্যথা [অন্যপ্রকার], যদ্—যথা [যে প্রকার], তদ্—তথা [সেই প্রকার], সর্ব—সর্বথা ইত্যাদি।

['যথা' 'তথা'—স্থানার্থে কবিতায় ব্যবহৃত হয়।]

চ্বি (সবই ইৎ)

'অভূত তদ্ভাব' [যাহা ছিল না তাহা হইল]-অর্থে: কৃদন্ত √কৃ ও √ভূ-এর উপপদের উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। ফলে অ-বর্ণান্ত ও ই-বর্ণান্ত উপপদ ঈ-কারান্ত হইয়া যায় এবং উ-বর্ণান্ত উপপদ ঊ-কারান্ত হয়।

বশ+চ্বি-√কৃ+অনট্=বশীকরণ [যে বশে ছিল না তাহাকে বশে আনা]; বশ +চ্বি√ভূ+ক্ত=বশীভূত [যে বশে ছিল না সে বশে আগত]; লঘু+চ্বি-√কৃ+ অনট্ =লঘূকরণ [যাহা লঘু ছিল না তাহাকে লঘু করা]; অনুরূপ—ঘনীভূত, রাশীকৃত সজ্জীকৃত, মন্দীভূত, স্তূপীকৃত, সমীকরণ, শিলীভূত ইত্যাদি।

তীয়, থ [ট্], ম [ট্], অ (=ডট্), তম

পূরণার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর এই সকল প্রত্যয় হয়; যথা—দ্বি+তীয= দ্বিতীয় [দুই-এর পূরণ]. ত্রি—তৃতীয়; চতুর্+ থ [ট্]=চতুর্থ, ষষ্—ষষ্ঠ; পঞ্চন+ ম [ট্]=পঞ্চম, দশন্—দশম; একাদশন্+অ (=ডট্)=একাদশ, বিংশতি—বিংশ

চত্বারিংশৎ—চত্বারিংশ ; পঞ্চাশৎ+তম=পঞ্চাশত্তম, অশীতি—অশীতিতম, শত—শততম ইত্যাদি।

আ

১। **অস্ত্যর্থে** ['তাহার ইহা আছে')-অর্থে : চাল+আ=চালা [যাহাতে আছে —চালা-ঘর], গোদ—গোদা, তেল—তেলা, জল—জলা, [নুন] লুন—[নোনা] লোনা, রোগ—রোগা, বাঁক—বাঁকা ইত্যাদি।

২। **সাদৃশ্য-অর্থে :** হাত+আ=হাতা [হাতের মত], বাঘ—বাঘা [বাঘের মত 'কুকুর'], কদম—কদমা [কদম ফুলের মত], চাঁদ—চাঁদা ইত্যাদি।

৩। **স্বার্থে :** গল—গলা, থাল্—থালা, এক—একা, গোয়াল—গোয়ালা, মিঠ—মিঠা, কাঁচ—কাঁচা ; ইত্যাদি।

৪। **নিন্দা, অবজ্ঞা বা কৃত্রিম অনাদর-অর্থে :** কেষ্ট—কেষ্টা, চোর—চোরা, গণেশ—গণ্‌শা, রাম—রামা, পাগল—পাগলা, চাঁদ—চাঁদা ['চাঁদা মামা, চাঁদা মামা, টিপ্ দিয়ে যা'] ; ইত্যাদি।

৫। **সম্বন্ধে অথবা তথা হইতে উৎপন্ন বা আগত-অর্থে :** চীন—চীনা [চীন সম্বন্ধীয় বা চীনে উৎপন্ন বা চীন হইতে আগত], দক্ষিণ—দক্ষিণা, পশ্চিম—পশ্চিমা ইত্যাদি।

আই

তাহার ভাব বা কার্য-অর্থে : বড+আই=বড়াই [বড'র ভাব], মিঠা—মিঠাই, বামন [বামুন]—বামনাই, খাড়া—খাড়াই, সাফ—সাফাই ইত্যাদি।

২। **সম্বন্ধে বা জাতার্থে**—মোগল+আই=মোগলাই [মোগল সম্বন্ধীয়], ঢাকা—ঢাকাই [ঢাকায় জাত], চোর—চোরাই [মাল] ইত্যাদি।

আউয়া [অভিশ্রুতিতে ওয়া], উয়া [অভিশ্রুতিতে ও]

১। **সম্বন্ধে :**—ঘর+আউয়া [ওয়া]=ঘরাউয়া [ঘরোয়া, ঘর সম্বন্ধীয়], লাগ—লাগউয়া [লাগোয়া] ; গাছ+উয়া=গাছুয়া [গেছো], মাঠ—মাঠুয়া [মেঠো], ভাত—ভেতুয়া [ভেতো] ; ইত্যাদি।

২। **অস্ত্যর্থে**—টাক+উয়া=টাকুয়া [টেকো], বাত—বাতুয়া [বেতো], ঘা—ঘাউয়া [ঘেয়ো], ছাঁদ—ছাঁদুয়া [ছেঁদো], গোঁফ—গোঁফুয়া [গুঁফো] ইত্যাদি।

৩। **জাতার্থে :** ধান+উয়া=ধানুয়া [অপিনিহিতিতে 'ধাউন্যা', অভিশ্রুতিতে—ধেনো (মদ)], কাঠ—কাঠুয়া [কেঠো], খড—খড়ুয়া [খ'ড়ো (চাল)] ; ইত্যাদি।

৪। **সংযোগ- অর্থে :** দাঁত+উয়া=দাঁতুয়া [অপিনিহিতে 'দাঁউত্যা', অভিশ্রুতিতে দেঁতো=দাঁত-সংযুক্ত (হাসি)], জল—জলুয়া [জ'লো (দুধ বা হাওয়া], ভাত—ভাতুয়া [ভেতো (বাঙ্গালী)], ঝড—ঝড়য়া [ঝড়ো (কাক)] ইত্যাদি।

আনি

'জল' বা 'জলীয়ভাব'-অর্থে : [আচাম] আম+[পানীয়] আনি=আমানি [পান্তার জল], নাক—নাকানি ; ইত্যাদি।

আমি [=মি, আম (=ম), আমো= মো)]

১। **'ভাব' বা 'কার্য'অর্থে :** চোর+আমি=চোরামি [চোরের ভাব বা কাজ, চোরাম, চোরামো], জ্যেঠা—জ্যেঠামি [জ্যেঠাম, জ্যেঠামো বা জ্যাঠামো চলতি বাংলায়], ঠক—ঠকামি, পাকা—পাকামি, ছেলে—ছেলেমি, পাগল—পাগলামি ইত্যাদি।

২। **তৎসম শব্দে :** ধূর্ত—ধূর্তামি, দুষ্ট—দুষ্টামি, নষ্ট—নষ্টামি, ভণ্ড—ভণ্ডামি ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—'কর্ম যে জানে'-অর্থে : ঘরামি বা ঘরামী [ঘর+আমি বা আমী] পদ সিদ্ধ।

আর

১। 'ব্যবসায়' বা 'বৃত্তি'-অর্থে [সংস্কৃত 'কার'-জাত]—চাম+আর=চামার [সং চর্মকার, চর্মব্যবসায়ী], দোহা—দোহার [সং ধ্রুবকার], গোঁ—গোঁয়ার, [প্রিয়-] পিঅ—পিয়ার ইত্যাদি।

২। **'স্বার্থে', 'সংযোগ'-অর্থে** [সংস্কৃত 'আকার'-জাত] **:** মাঝ+আর=মাঝার ['মাঝ' ও 'মাঝার' সমার্থক], [পদ-] পঅ+আর=পয়ার ইত্যাদি।

৩। **'আধার'-অর্থে** [সংস্কৃত 'আগার'-জাত] **:** ভাণ্ড+আর=ভাণ্ডার, কাণ্ড—কাণ্ডার, [মহা-] মেহ—মেহার, [সভ্য-] সাভ—সাভার ইত্যাদি।

আরি (আরী)

১। 'ব্যবসায়' বা 'বৃত্তি'-অর্থে : শাঁখ+আরি(-রী)=শাঁখারি(-রী), কাঁসা—কাঁসারি(-রী), জুয়া—জুয়ারি(-রী, -ড়ি, -ড়ী), ভিখ—ভিখারি(-রী) ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ রচনায় 'নির্দশকারী', 'তথায় স্থিত' অর্থে অস্ত্যর্থে : দিশা—দিশারি, দিশারী [দিঙ্‌নির্দেশকারী]; আগ—আগারি(-রী) [অগ্রে স্থিত], মাঝ—মাঝারি(-রী), পিছ—পিছারি(-রী) ; আশা—আশারী (" ......সেই সুখের আশারী" —মৈমনসিংহ গীতিকা) ইত্যাদি।

আল

১। অস্ত্যর্থে : ধার+আল=ধারাল- জোর—জোরাল, দুধ—দুধাল, শাঁস—শাঁসাল, জাঁক—জাকাল, জমক—জমকাল, আঁঠা—আঁঠাল, পেঁচ—পেঁচাল ; ইত্যাদি।

২। জাতার্থে : বঙ্গ+আল=বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙাল, পাঁক—পাঁকাল ইত্যাদি।

৩। সাদৃশ্যার্থে : ছুঁ+আল=ছুঁচাল।

৪। আতিশয্যার্থে : দাঁত+আল=দাঁতাল (বড দাঁত আছে)।

৫। শীলার্থে : মাত [সং 'মত্ত'-জাত]+আল=মাতাল [মত্ত হওয়া শীল যাহার]।

৬। 'সংযোগ'-অর্থে : আড়—আড়াল, ভাটী—ভাটীয়াল ; ইত্যাদি।

৭। 'অধিবাসী'-অর্থে : গয়া+আল=গয়াল [গয়াবাসী], ঘোষ—ঘোষাল ['ঘোষ'-গ্রামবাসী], কাঞ্জিল—কাঞ্জিলাল ['কাঞ্জিল'-গ্রামবাসী], কাশী—কাশীয়াল [-কেশেল], আগ্রা—আগরওয়াল ; ইত্যাদি।

৮। 'স্বার্থে' : ছা+আল=ছাওয়াল [-ছালিয়া—ছাইল্যা—ছেলে] ; ইত্যাদি।

৯। 'পালক'-অর্থে : কোট [সং কোট্ট-জাত]+আল=কোটাল [কোট্ট-পালক] গো—গোআল, গোয়াল ; কুঠি—কুঠিয়াল ইত্যাদি।

১০। 'বৃত্তি'-অর্থে : লাঠি—লাঠিয়াল, ঘড়ি (ড়ী)—ঘড়িয়াল, ঘড়ীয়াল [-ঘ'ড়েল] ইত্যাদি।

আলি

১। 'ভাব' বা 'কার্য'-অর্থে : ঘটক+আলি=ঘটকালি, চতুর—চতুরালি, ঠাকুর—ঠাকুরালি, মিতা—মিতালি ইত্যাদি।

২। 'সাদৃশ্য'-অর্থে: রূপা+আলি=রূপালি [রূপার মত], সোণা—সোণালি, সুতা—সুতালি-সুতলী ইত্যাদি।

৩। 'সম্বন্ধীয়'-অর্থে: মাইয়া [সং—'মাতৃকা'-জাত]+আলি=মাইয়ালি [মেয়েলী]।

ই

১। বৃত্তি বা কার্য' অর্থে: আমীর+ই=আমীরি [আমীরের কার্য], পণ্ডিত—পণ্ডিতি [পণ্ডিতের বৃত্তি বা কার্য]; অনুরূপ—চালাকি, কবিরাজি, মাষ্টারি, ডাক্তারি, জমিদারি, ডাকাতি, চোর+ই,=চুরি, বজ্জাতি, মুন্সেফি, ছিনালি [ছেনালি], শয়তানি, মজুরি, রাখালি ইত্যাদি।

২। ক্ষুদ্রার্থে: কাঠ+ই=কাঠি [ক্ষুদ্র কাঠ], ঘট—ঘটি, ছোরা—ছুরি, ছাতা—ছাতি, বোঁচকা—বুঁচকি, পোথা [বড় বই]—পুথি, পুঁথি [ছোট বই] গোলা—গুলি, বড়—বড়ি, যাঁতা—যাঁতি, জাতি, পোঁটলা—পুঁটলি, [পুঁটুলি], কলস—কলসি, কোষা—কুষি, দড়া—দড়ি, খোন্তা [খন্তা]—খুন্তি ইত্যাদি।

৩। বর্ণ—অর্থে: গোলাপ+ই গোলাপি [গোলাপ বর্ণ], বাদাম—বাদামি, আসমান—আসমানি, ময়ূরকণ্ঠ—ময়ূরকণ্ঠি, কাল—কালি, জাফরাণ—জাফরাণি, ; ইত্যাদি।

৪। স্বার্থে: ফাঁস—ফাঁসি, হাস—হাসি

ঈ

১। বৃত্তি [জীবিকা সংস্থানের উপায়]-অর্থে: কারবার+ঈ=কারবারী [কারবার যাহার বৃত্তি বা জীবিকার উপায়] ব্যাপার—ব্যাপারী; জহর—জহুরী, ঢাক—ঢাকী, ঢোল—ঢুলী, ঢাল—ঢালী, তেল—তেলী, মালা—মালী, চাষ—চাষী, দোকান—দোকানী, ভাণ্ডার—ভাণ্ডারী, কাণ্ডার—কাণ্ডারী, দপ্তর—দপ্তরী ইত্যাদি।

২। জাতি 'সম্বন্ধ' ও ভাষা অর্থে [দেশবাচক শব্দের উত্তর] পাঞ্জাব+ঈ=পাঞ্জাবী [জাতি, ভাষা, পাঞ্জাব-সম্বন্ধীয়], আরব—আরবী, তুর্ক—তুর্কী, ইরাণ—ইরাণী, জাপান জাপানী, তিব্বত—তিব্বতী, নেপাল—নেপালী, গুজরাট—গুজরাটী ইত্যাদি।

৩। 'তথায় জাত' বা 'উৎপন্ন' বা 'তথা হইতে আগত' অর্থে [দেশবাচক শব্দের উত্তর] . বেনারস+ঈ=বেনারসী, শান্তিপুর—শান্তিপুরী, রাঢ়—রাঢ়ী, নেপাল—

নেপালী [তামাক], মণিপুর—মণিপুরী, বিলাত—বিলাতী, দেশ—দেশী, পাহাড়ী—পাহাড়ী—ইত্যাদি।

৪। **অস্ত্যর্থে**: দাগ + ঈ = দাগী [যাহাতে দাগ আছে], রাগ—রাগী, দাম—দামী, ভার—ভারী, দরদ—দরদী, হিসাব—হিসাবী, কয়েদ—কয়েদী; ইত্যাদি।

৫। **সম্বন্ধ** অর্থে—প্রণাম—প্রণামী, দর্শন—দর্শনী, সেলাম—সেলামী, মজুর—মজুরী, রেশম—রেশমী, পশম—পশমী, ধান—ধানী [জমি], নাক—নাকী [সুর] সরকার—সরকারী ইত্যাদি।

ইয়া (অভিশ্রুতিতে এ)

১। **অস্ত্যর্থে**: আমোদ + ইয়া = আমোদিয়া—আমুইদ্যা (অপিনিহিতি)—আমুদে (অভিশ্রুতি); পোড়কপাল—পোড়াকপালিয়া—[পোড়া কপালে]; বালি—বালিয়া [+ বেলে]; দেমাক—দেমাকিয়া [+ দেমাকে]; লালপাড়—লালপাড়িয়া [লালপেড়ে]; কাঁদন—কাঁদনিয়া [—কাঁদুনে], অলক্ষণ—অলক্ষণিয়া [—অলক্ষুণে]; কুঁড় [কুষ্ঠ]—কুঁড়িয়া [কুঁড়ে]; এক গোঁ—এক-গোঁইয়া [একগুঁয়ে]; ইত্যাদি।

২। বৃত্তি [জীবিকার উপায়]-অর্থে: জাল + ইয়া = জালিয়া [—জেলে, জালই যাহার জীবিকা সংস্থানের উপায়]; যজমান—যজমানিয়া [—যজমেনে বামুন]; হাল—হালিয়া [—হেলে (চাষী)]; মোট—মোটিয়া [—মুটে]।

৩। তথায় জাত বা তথা হইতে আগত বা তৎসম্বন্ধীয় অর্থে শান্তিপুর + ইয়া = শান্তিপুরিয়া [—শান্তিপুরে 'শাড়ী']' নাগপুর—নাগপুরিয়া [—নাগপুরে 'লেবু'], পাড়াগাঁ—পাড়াগাঁইয়া [—পাড়াগেঁয়ে 'লোক'], পাহাড়—পাহাড়িয়া [—পাহাড়ে 'সাপ'], শহর—শহরিয়া [—শহুরে]; হাল—হালিয়া [—হেলে 'গরু'], শহর—শহুরে]; নাটক—নাটকিয়া [—নাটুকে], ছোঁয়াচ—ছোঁয়াচিয়া [—ছোঁয়াচে], আষাঢ়—আষাঢ়িয়া [—আষাঢ়ে] ইত্যাদি।

৪। বিকার' [তদ্দারা নির্মিত]—অর্থে: মাটি—মাটিয়া [—মেটে]।

৫। অনুভূতিগ্রাহ্য বা ভাবপ্রধান ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ রচনায়: কন্‌কন্‌ + ইয়া = কনকনিয়া [—কন্‌কনে 'শীত']; শন্‌শন্‌—শন্‌শনিয়া [—শনশনে 'বাতাস']; দগ দগ্‌—দগদাগিয়া [—দগদগে ঘা] টক্‌টক্‌—টক্‌টক্‌ করা [—'টক্‌টকে 'লাল'];

ফুরফুর—ফুরফুরিয়া [—ফুরফুরে 'হাওয়া']; লক্‌লক্—লক্‌লকিয়া [—লক্‌লকে 'জিভ'] ইত্যাদি।

৬। 'তারিখ' বয়স, তৎসম্বন্ধীয় ও 'তৎকালজাত' অর্থে: বিশ+ইয়া=বিশিয়া [—বিশে 'কার্তিক'], পঁচিশ—পঁচিশিয়া [—পঁচিশে]; বাহাত্তর+ইয়া=বাহাত্তরিয়া [—বাহাত্তুরে 'বুড়ো'], বারমাস+ইয়া—বারমাসিয়া [—বারমেসে 'ব্রত',—'ফল' 'বাসমাস সম্বন্ধীয় কাহিনী' বুঝাইতে 'বারমোসী' ও .বারমাস্যা']; 'আটমাসে জাত'—অর্থে আটমাস+ইয়া=আটমাসিয়া—আটাসিয়া [ম্-কার লোপে] —আটাইস্যা [অপিনিহিতি-তে]—আটাসে [অভিশ্রুতিতে]

৭। অনাদর 'অর্থে: কালি+ইয়া=কালিয়া—কাইল্যা—কেলে, হরি—হরিয়া [—হরে], মানিক—মানিকিয়া [—মান্‌কে] ইত্যাদি।

উ

১। 'আদর' অর্থে: কান+উ=কানু, শিব—শিবু, হর—হরু, পঞ্চ—পঞ্চু, খোকা, খুকু, দুষ্ট—দুষ্টু, চুম—চুমু; ইত্যাদি।

২। দক্ষ—অর্থে: সাতার+উ=সঁাতারু [সাঁতারে দক্ষ], কল—কলু ইত্যাদি।

৩। স্বার্থে: উচা+উ=উঁচু, নীচ—নীচু, আগ—আগু ইত্যাদি।

৪। অস্ত্যর্থে: ঢাল+উ=ঢালু [ঢাল আছে যাহাতে], চাল—চালু, ইত্যাদি।

উক

'শীল' অর্থে বিশেষণ শব্দ রচনায়: লাজ+উক=লাজুক [লজ্জাশীল], মিথ্যা—মিথ্যুক [মিথ্যা কথা বলাই শীল বা স্বভাব যাহার], পেট—পেটুক ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'হিংসুক' পদ হয় না; √হিন্‌স্ হইতে কৃদন্ত বিশেষণ পদ হইবে 'হিংসক'।

ক, কি, কী, কিয়া (কে)

১। স্বার্থে: ঢোল+ক=ঢোলক, ধনু—ধনুক, সড়—সড়ক, ফুট+কি=ফুটকি ইত্যাদি।

২। 'অন্ত্যর্থে': দম+ক=দমক, ছল—ছলক, মড়—মড়ক, মোড—মোডক, হোঁৎ+ক+আ [অনাদরে]=হোঁৎকা, ইত্যাদি।

৩। ভ্রাতৃজায়া অর্থে: বড়+কী=বড়কী, মেজ—মেজকী, ছোট—ছোটকী, ইত্যাদি।

৪। গণনা অর্থে: বুড়ি+কিয়া=বুড়িকিয়া, শত—শতকিয়া [—শতকে', শট্‌কে'], পণ—পণকিয়া [—পনকে, পুনকে], ইত্যাদি।

কার (কের)

সম্বন্ধে অর্থে: এখান+কার=এখানকার [এইস্থান সম্বন্ধীয়], সব—সবাকার উপর—উপরকার, নীচা, নীচু—নীচাকার [নীচুকার, নীচেকার] বছর—বছরকার ইত্যাদি।

ট

স্বার্থে: গুম+ট=গুমট, জমা—জমাট, দাপ—দাপট, ঝাপ—ঝাপট, ভরা—ভরাট, ইত্যাদি।

টিয়া (টে)

১। সাদৃশ্য ও ঈষদূণ—অর্থে: ঘোলা [ঘোল+আ সাদৃশ্যার্থে]+টিয়া=ঘোলাটিয়া [—ঘোলাইট্যা—ঘোলাটে (ঘোলার চেয়ে একটু কম)], রোগা—রোগাটিয়া [—রোগাটে], তামা—তামাটিয়া [— তামাটে], লম্বা—লম্বাটিয়া [—লম্বাটে], বখা—বখাটিয়া [বখাটে]; আঁশ+টিয়া=আঁশটিয়া [আঁশটে (আঁশের মত)], ইত্যাদি।

২। শীল অর্থে: ঝগড়া+টিয়া=ঝগড়াটিয়া [—ঝগড়াটে (ঝগড়া-ই শীল বা বা স্বভাব যাহার)], ভাড়া—ভাড়াটিয়া [—ভাড়াটে (ভাড়া করা বা ভাড়ায় খাটা শীল বা স্বভাব যাহার; যেমন—ভাড়াটে লোক, ভাড়াটে বাড়ী বা গাড়ী)] ইত্যাদি।

ড়া, ড়ি (ড়ী), রা, রি (রী)

১। স্বার্থে: চাম+ড়া [চামড়া ['চাম' ও 'চামড়া' সমার্থক], লঙ্গ [=খোঁড়া (ফার্সী শব্দ)]—লাঙড়া [—লেঙড়া], হিজ [=ক্লীব (ফার্সী শব্দ)] হিজড়া, খাগ—খাগড়া, রাজা—রাজড়া, চাঙ্গ—চাঙড়া; আঁক+ড়ি (ড়ী)=আঁকড়ি [আকড়ী], শাশ—শাশুড়ী।

বহু [সং-'বধূ' হইতে] —বহুড়ি [ড়ী]; গাঁঠ+রী [রি]=গাঁঠরী [রি]।

২। সাদৃশ্য অর্থে : ভাই+রা=ভায়রা, টুক—টুকরা, [পেন্ট] পেট—পেটরা ; গাছ+ড়া=গাছড়া, পাত—পাতড়া ; ঝি [ঝী]+ড়ি [ড়ী রী=ঝিয়াড়ি, ঝিয়াড়ী, ঝিয়ারী, ঝিউড়ী, [পর্ব] পাব—পাবড়ি [পাপড়ি], ইত্যাদি।

৩। অবয়ব-অর্থে : কাঠ+ড়া [রা] কাঠড়া [-রা—কাঠই ইহার অবয়ব] ; বাঁশ+রি [রী] বাঁশরি [রী] ; ইত্যাদি।

ড়িয়া [অভিশ্রুতিতে ড়ে], রিয়া [অভিশ্রুতিতে রে]

১। সাদৃশ্য অর্থে : চাষা+ড়িয়া–চাষাড়িয়া—চাষাইড়্যা (অপিনিহিত)—চাষাড়ে [অভিশ্রুতি]।

২। বৃত্তি ও শীল অর্থে : ঘাস+ড়িয়া ঘাসাড়িয়া—ঘাসাইড়্যা—ঘেসেড়া, যোগ—যোগাড়িয়া—যোগাইড়া—যোগাড়ে, সাপ—সাপড়িয়া—সাপুড়িয়া—সাপুইড়্যা—হাত—হাতড়িয়া—হাতুইড়া—হাতুড়ে, [খেল]—[খেলা—খেলুড়ে ; কাঠ+রিয়া, ড়িয়া=কাঠুরিয়া, কাঠরিয়া, কাঠড়িয়া—কাঠুরিয়া, কাঠুড়িয়া,—কাঠুইর‍্যা [ড়্যা]—কাঠুরে, কাঠুড়ে ; হাট—হাটারিয়া [—হাটুরে] লুঠ—লুঠরিয়া—লুঠইর‍্যা—লুঠেরা, ইত্যাদি।

তো, তুতো

অপত্য অর্থে : খুড়া+তো, তুতো=খুড়াতো, খুড়তুতো ; জ্যেঠা—জ্যেঠাতো বা জেঠাতো, জ্যেঠতুতো বা জেঠতুতো ; পিসা—পিসাতো, পিসতুতো, মামা—মামাতো, [মামার সহিত তুতো হয় না] ; মাসুয়া—মাসুতো, মাসতুতো, সতা—সতাতো [—সত্‌—সৎ] ; ইত্যাদি।

অতি

কার্য অর্থে : উকিল+অতি=ওকালতি, জজ—জজিয়তি

পনা

ভাব বা কার্য অর্থে : কাঙাল+পনা=কাঙালপনা, গিন্নি—গিন্নীপনা, দুরন্ত—দুরন্তপনা, ন্যাকা—ন্যাকাপনা ; অনুরূপ : বেহায়াপনা, বীরপনা, হ্যাংলাপনা, ইত্যাদি।

পানা, পারা

সাদৃশ্য—অর্থে : কাল+পানা=কালপানা, কুলো—কুলোপানা ; অনুরূপ—চাঁদপানা, রোগাপনা, লম্বাপানা, ইত্যাদি।

পাগল+পারা=পাগলপারা, বেঁটে—বেঁটেপারা, ইত্যাদি।

আইত [আত, এত]

শীল বা বৃত্তি অর্থে : ডাক+আইত=ডাকাইত [—ডাকাত (হ্যাঁ রে-রে-রে ! ডাকুই যাহার শীল বা অভ্যাস], সেবা—সেবাইত [—সেবায়েত] পঞ্চ—পঞ্চাইত [—পঞ্চায়েত]

আচ

স্বার্থে : কোণ+আচ=কোণাচ, কান—কানাচ, ছোঁয়া—ছোঁয়াচ।

আচি

'তজ্জাত' অর্থে : ঘাম+আচি=ঘামাচি, বেঙ—বেঙাচি।

ল, লা, লি

১। **স্বার্থে :** ফাট+ল=ফাটল, দীঘ—দীঘল, আদ—আদল ; এক+লা= একলা, [নব—নঅ্-নহ্ —নহলা [-নওলা], পো—পোলা, [সখী—সহী—] সহি— সহিলা [-সহেলা, সয়লা] ইত্যাদি।

২। **'সাদৃশ্য'-অর্থে :** পাত+ল=পাতল, পাত+লা=পাতলা, হাত+ল=হাতল ইত্যাদি।

৩। **'যুক্ত'-অর্থে :** পাক+ল=পাকল, ["কোপেতে লহনা চক্ষু করয়ে পাকল" —কবিকঙ্কণ চণ্ডী]; মেঘ+লা=মেঘলা, রঙ্গ+(ই)লা=রঙ্গিলা, রঙিলা ["আরে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি"—পল্লীগীতি]।

৪। **'পরিমাণ'-অর্থে :** আধ+লা=আধলা, [অর্ধপরিমাণ, আধপয়সা], আধ +লি আধলি, আধুলি [অর্ধতঙ্কা]।

৫। **'ভাব', 'অধিবাসী'-অর্থে :** [সখী—সহী-]সহি+লি=সহিলি—সহেলি— সয়েলি [সখ্য]; গয়া+লি=গয়ালি [গয়ার অধিবাসী, 'গয়ালী-ও হয়] ইত্যাদি।

আরও কয়েকটি বাঙ্‌লা তদ্ধিত

তা—(১) **'যুক্ত'-অর্থে :** নুন [-লুন]+তা= নোনতা [-লোনতা], পানি— পানিতা—পাইন্‌তা (অপিনিহিতি)—পান্তা [ই-কার লোপ]; (২) **'সাদৃশ্য'-অর্থে :** রাঙ [রাং]+তা=রাঙতা, [রাংতা], মাছি—মাছিতা—মেছেতা।

তি—(১) 'ক্ষুদ্র'-অর্থে : চাক+তি=চাকতি ; (২) 'নিবারক'-অর্থে : বর্ষা+তি=বর্ষাতি।

চা—ঈষদর্থে : কালি+চা=কালিচা—কাইল্‌চা (অপিনিহিতি)—কালচে, লাল—লালচা—লালচে।

ছা—'সাদৃশ্য'-অর্থে : [অভ্র-]আব+ছা=আবছা।

শ, স, সা—'সাদৃশ্য'-অর্থে : মুখ+শ=মুখশ, মুখোশ, [মুখস, মুখোসও ব্যবহৃত হয়], খোল—খোলস, খোলোস ; খোল+সা=খোলসা, আলি-[ঈষদুচ্চ বাঁধ]—আলিসা—আইল্‌সা—আলসে, কুয়া [প্রাকৃত 'কুহা']—কুয়াসা, চাম্—চামসা, চামসে, ঝাপ—ঝাপসা, পানি—পানিসা—পাইন্‌সা—পান্‌সা, পান্‌সে, পাই+সা=পয়সা।

অস্ত্যর্থে : রূপ+স+ঈ(স্ত্রী)=রূপসী [রূপবতী]।

মন—'সাদৃশ্য'—অর্থে [সর্বনামীয় বিশেষণপদ রচনায়] : যা+মন=যেমন [যাহার সদৃশ], তা'—তেমন, এ'—এমন, ও—অমন, কে—কেমন।

বন্ত, মন্ত—'অস্ত্যর্থে' [সং 'মতুপ্'-এর অর্থে] : গুণ+বন্ত=গুণবন্ত ; শ্রী+মন্ত=শ্রীমন্ত; অনুরূপ—পয়মন্ত, ভাগ্যমন্ত, ভাগ্যবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত ইত্যাদি।

উর, আরু—স্বার্থে : [সং 'বৎস'-হইতে জাত] বাছ+উর [সং 'রূপ'-জাত]=বাছুর ; শশ+আরু=শশারু [শশক]।

'সাদৃশ্য'-অর্থে : [সং 'শল্যক'-জাত] শেজা, শজা+আরু=শেজারু, শজারু [সেজারু, সজারু]।

বিদেশী [ফার্সী] তদ্ধিত প্রত্যয়

আন্দাজ—'নিক্ষেপক'-অর্থে : গোলা+আন্দাজ=গোলন্দাজ, তীর—তীরন্দাজ।

আনা, আনি, গিরি—'ভাব' বা 'কার্য'-অর্থে : বাবু+আনা, আনি, গিরি=বাবুয়ানা, বাবুয়ানি, বাবুগিরি ; হিন্দু—হিন্দুয়ানি [-হিঁদুয়ানি] ; গরীব—গরীবানা, মুন্সী—মুন্সীয়ানা, মুন্সীগিরি ; বিবি—বিবিয়ানা, বিবিয়ানি ; গুরু—গুরুগিরি, কেরাণী—কেরাণীগিরি, দারোগা—দারোগাগিরি [-দারোগগিরি] ইত্যাদি।

ওয়ান—'রক্ষক', 'চালক'-অর্থে : দার [সং দ্বার]+ওয়ান=দারোয়ান

[দরোয়ান, তৎসম রূপ করা হইয়াছে 'দ্বারবান্'=দ্বাররক্ষী]; গাড়ী [গাড়ি]+ওয়ান =গাড়োয়ান [গাড়ীর চালক]; [ইংরেজী Coach—] কোচ+ওয়ান=কোচোয়ান [Coachman, কোচের চালক]।

খানা—'কর্মস্থল' ও 'আগার'-অর্থে: কসাই+খানা=কসাইখানা [=কসাই-এর কর্মস্থল]; চিড়িয়া—চিড়িয়াখানা [চিড়িয়ার আগার]; অনুরূপ—বৈঠকখানা, তোষাখানা, পিলখানা ডাক্তারখানা, গোসলখানা, কারখানা, জেলখানা, ছাপাখানা ইত্যাদি।

খোর—'আসক্ত'-অর্থে: আফিম+খোর=আফিমখোর [=আফিমে আসক্ত]; অনুরূপ—চশমখোর, গাঁজাখোর, গুলিখোর, ছাতুখোর, তামাকখোর, নেশাখোর, ভাঙ্‌খোর [-ভাঙোর] ইত্যাদি।

গর—'কর্তা'-অর্থে: বাজি+গর=*বাজিগর [=বাজির কর্তা বা প্রস্তুতকারক]; অনুরূপ—*কারিগর, সওদাগর ইত্যাদি।

* বাজিকর, কারিকর—বাঙ্‌লা উপপদতৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন পদ—বাজি করে যে, কারি করে যে।

ইচা—'ক্ষুদ্র'-অর্থে: বাগ+ইচা=বাগিচা [=ক্ষুদ্র বাগ বা ছোট বাগান], নল—নলিচা—নইলচা—ন'লচে।

চি—'আধার'-অর্থে: ধুনা+চি=ধুনাচি [—ধুনোচি—ধুনুচি]।

—'বৃত্তিধারী'-অর্থে: তবলা+চি=তবলচি, মশাল—মশালচি, খাজনা—খাজাঞ্চি, বাবর্—বাবুর্চি ইত্যাদি।

তর ['তরহ্'-জাত] 'প্রকার'-অর্থে: এমনতর, যেমনতর, কেমনতর [-তরো] ইত্যাদি।

দান, দানি—'আধার'-অর্থে: আতরদান [-দানি], কলম-দান [-দানি], ধূপ-দান [-দানি], পা-দান [-দানি], ফুল-দান [-দানি] ইত্যাদি।

—'দক্ষতা' অর্থে: কার-দানি [-কেরদানি]।

দার—'বৃত্তিধারী'-অর্থে: চৌকি+দার=চৌকিদার [চৌকি যার বৃত্তি]; অনুরূপ—ব্যবসাদার, বাজনদার [বাজনাদার], দোকানদার, জমাদার, ঠিকাদার, খবরদার, [শুমার—সুমার—] সমাদ্দার ইত্যাদি।

—'অস্ত্যর্থে' : চুড়িদার [জামা], বুটিদার, দানাদার, সমঝদারছ, ড়িদার ইত্যাদি।

'প্রভু'-অর্থে : চাকলাদার [চাকলা-র মালিক], জমি [জমী]-দার, জুমলাদার, জোয়ারদার, দফাদার, ফৌজদার, মজুম ['মজমুআ'-জাত]-দার, হাবিলদার ইত্যাদি।

নবিশ—'অভিজ্ঞ'-অর্থে : নকল-নবিশ, মহলা-নবিশ, সেহা [খাজনার জাবেদা]-নবিশ, হিসাব-নবিশ ইত্যাদি।

—'রত'-অর্থে : শিক্ষা-নবিশ।

বাজ—'অভ্যস্ত' বা দক্ষ-অর্থে : গুলবাজ, চালবাজ, ফন্দিবাজ, ফাঁকিবাজ, ফুর্তিবাজ, দাঙ্গাবাজ, ধাপ্পাবাজ, ধোঁকাবাজ, ধড়ীবাজ, লাঠিবাজ, মামলাবাজ ইত্যাদি।

[সহি-] সই—'যোগ্য-অর্থে : মানানসই [=মানানযোগ্য], পছন্দসই, টেকসই, প্রমাণসই ইত্যাদি।

—'অবধি'-অর্থে : গলাসই, বুকসই, জলসই ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয় কাহাকে বলে? কৃৎ ও তদ্ধিতে প্রভেদ কি?

২। কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত পদ কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—চরিত্র, উদ্ভিদ্, ব্যবসায়, দেনা, ছাউনি, যাচাই, বিজ্ঞাপন, রান্না, গাইয়ে, পড়ো, মোড়ক, সম্রাট্, পিপাসা, শ্রদ্ধা, চোর, বিস্তর, বিদীর্ণ, বিহঙ্গ, বধ, শ্বাস, হত্যা, মুমূর্ষু, বিঘ্ন, জিজ্ঞাসা, ব্যাধি, গায়ক, অধ্যয়ন, দয়ালু, সহিষ্ণু, প্রভু, দগ্ধ, ত্যাগী, স্নিগ্ধ, সিংহ, হিত, গ্লানি, ধ্যান, পূর্ণ, গাঢ়, শান্ত বাঞ্ছা, গৃধ্নু, ধর্ম, শিষ্য, বক্ষ্যমাণ, ভীরু, ঈশ্বর, জিষ্ণু, ফেরত, যজ্ঞ, ব্যাঘ্র, পতি, পুণ্য, ভৃত্য, ভার্যা, অজেয়, রোরুদ্যমান, স্বপ্ন, পিতা, সুপ্ত, শীর্ণ, আসীন, আরূঢ়, খ্যাতি, সৃষ্টি, লিপ্সু, স্থায়ী, পবিত্র, শয্যা, শয়ান জিঘাংসা, রজক, তস্কর, দুর্লভ, প্রিয়, তুরঙ্গম, প্রজ্ঞা, স্তব, বিপদ্, ঘাতক, জগৎ, চড়াও, ভাবী, বসুন্ধরা।

৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর এবং কি অর্থে কোন্ প্রত্যয় হইয়াছে বল :

বড়াই, ভিখারী, ভাড়াটে, আধুলি, একলা, ধারাল, কাঠরা, মেধাবী, জটিল, ভুমা শ্রেষ্ঠ, যুবক, অর্বাচীন, দাক্ষিণাত্য, ষষ্ঠ, একদা, মেটে, কদমা, জেলে, ন্যাকামি, বখাটে, বাগিচা, পয়সা, পানসে, নওলা, মিতালি দানব, গাঙ্গেয়, দ্বৈপায়ন, বৈষ্ণব, লেঠেল, শিক্ষানবিশ, দানাদার, মানানসই, দরোয়ান, গোলন্দাজ, মামলাবাজ, ধুনুচি, বাবুগিরি, কারিগর, পিলখানা, চশমখোর, হিঁদুয়ানি, লোমশ, মধুর, ধৈর্য, বাণিজ্য, চৌকিদার, সখ্য, ন্যায্য, সৈন্য, হিরণ্ময়, বসুমতী, নূতন, জনতা ভাগিনেয়, সর্বজনীন, মাংসল, কুলীন, শ্যামল গরিমা, তেজস্বী, পক্ষী, নাবিক, দাক্ষায়ণী, সৌমিত্রি, আধুনিক, একাকী, মৌন, দ্রৌপদী, আর্য, কাহবকো

জ্যেষ্ঠ, পথ্য, পৌরোহিত্য, মুখর, কানাই, চাতুরী, ন'ল্‌চে, এমন, ডাকাত, হাতা, হাতল, সেবায়েত, টেকসই, চড়ন্দার, চাকী, পাখারী, কাঠুরে, ঢুলী, সাপুড়ে, মাঝারি, দাপট ঝগড়াটে, চাঁদা, মিঠাই, গেঁয়ো, ছেলেমি, চামার, দাঁতাল, লেঠেল, ডাক্তারি, আটাসে, মিথ্যুক, চামড়া, মাতাল, কুলোপানা, পাতলা, মুখোস, বাছুর, পান্‌তা, ঘামাচি, রূপসী, কানাচ, শ্রীমন্ত, পজার কাঁদুনে, চাকাই, মেয়েলি, ঢেঙ্গু, ঘটকালি, কোটাল, ঘরামি, জাগোয়া, ঝাপটা, ছোঁয়াচে, সাঁতার, লেঙড়া, হাতুড়ে, ভাবনা, কুয়াসা, চাকতি।

৫। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও :—শীলার্থ প্রত্যয়, অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়, কৃদন্ত বিশেষণ, ঔচিত্যার্থে কৃৎ, স্বার্থে তদ্ধিত।

৬। কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত পদদ্বারা এককথায় প্রকাশ কর : বাস করা হয় যেখানে, বাধার কাজ ; ঘিরিয়া ফেলার কাজ, ডুবে দক্ষ ; যে গাইতে জানে, ইন্দ্রকে জয় করে যে, জয় করবার ইচ্ছা ; পানের অযোগ্য, কষ্টে আরোহণ করা যায় যাহাতে ; লাভ করিতে ইচ্ছুক ; উপকারে ইচ্ছা ; ত্বরায় গমন করে যে, যাহা বলা হইতেছে ; জলের সংযোগ আছে যাহাতে, বড় দাঁত আছে যাহার ; ঘটকের কার্য, শক্তির উপাসক ; ছোট বই ; আট মাসে জন্ম যাহার ; বাহাত্তর (বৎসর) বয়স যাহার, দ্বীপে জাত ; বিমাতার গর্ভজাত ; ভাগিনীর পুত্র, পাতের মত ; গ্রাম হইতে জাত ; ব্যাকরণ জানেন যিনি ; ইহকাল সম্বন্ধীয় ; মহতের ভাব ; সর্বজনের হিতকর ; জনের সমূহ, শিক্ষায় প্রবৃত্ত ; খাজনা আদায় করা যাহার পেশা।

নির্দেশক ও অনির্দেশক

বাঙ্‌লায় যে সকল শব্দ বা শব্দাংশ বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া উহাদের সংখ্যা, পরিমাণ, আকার, প্রকার প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, তাহাদিগকে **নির্দেশক** বলা হয়। **খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি, টা, টি, টু, টুক, টুকুন** প্রভৃতি বাঙ্‌লা **নির্দেশক।**

প্রত্যয় যাহার সহিত যুক্ত হয় তাহার সহিত জমাট বাঁধিয়া যায়; স্বাধীনভাবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। কিন্তু নির্দেশকের স্বতন্ত্র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তখন আর উহাকে প্রত্যয় বলা চলে না। আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন—

["...দুই একটি (নির্দেশক), প্রত্যয়রূপে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেই অর্থই স্বতন্ত্র শব্দ রূপেও ব্যবহৃত

হয় ; কিন্তু প্রধানতঃ এগুলি প্রত্যয়-রূপেই ব্যবহৃত হয়। যে-শব্দ সাধারণতঃ স্বতন্ত্র শব্দ-রূপেই ব্যবহৃত হয় এবং কখনও কখনও (সমাসে) অন্য-শব্দের সহিত জোট বাঁধিলেও তাহার সহিত জমাট বাঁধিয়া অর্থাৎ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যায় না, সেইরূপ শব্দ 'প্রত্যয়-বাচ্য' নহে। এই হেতু 'নির্দেশক শব্দ'-মাত্রই 'নির্দেশক-প্রত্যয়'-রূপে গণ্য হইতে পারে না।"]

সকল নির্দেশক যখন 'প্রত্যয়-বাচ্য' নহে, তখন কতকগুলিকে 'নির্দেশক শব্দ' এবং অপরগুলিকে 'নির্দেশক-প্রত্যয়' না বলিয়া সবগুলিকে সাধারণভাবে **নির্দেশক** বলাই সঙ্গত মনে হয়।

বিভিন্ন অর্থে নির্দেশকের প্রয়োগ

টা

১। পদের পূর্ণতা নির্দেশে—

(৵০) ঔদাসীন্যে বা অনাদরে—"এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।" "ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে"—শরৎচন্দ্র। "জয়মলটা উঠলোও না।"—অবনীন্দ্রনাথ। "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"—রবীন্দ্রনাথ।

(৶০) ঘনিষ্ঠতায়, আদরে—"শ্যামাটা ভারি দুষ্টু। শৈলটা ভারি ভালো মেয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(৷৴০) অবস্তু-বাচক বিশেষ্যের সহিত—"বাঁচাটা আমার অতি দরকার।" —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। "রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন।"—রবীন্দ্রনাথ।

২। (৵০) সংখ্যাবাচক বিশেষণপদের উত্তর সাধারণভাবে : বড়ো বড়ো চার-পাঁচটা ধানের গোলা।"—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৶০) ঘণ্টা বুঝাইতে : তখন রাত বারোটা। বেলা চারটে (স্বরসঙ্গতি-তে টে) ইত্যাদি।

(৷৴০) পরিমাণ অর্থে—অনেকটা পথ যেতে হবে। অর্ধেকটা খাও, অর্ধেকটা রেখে দাও।

৩। ভাববাচক বিশেষ্যের অর্থদ্যোতনায় বিশেষণপদের সহিত—অনেক বাপ-মা নিজের ছেলের ভালোটা-ই শুধু দেখেন, মন্দটা দেখেও দেখেন না।

টি

পদার্থের পূর্ণতা নির্দেশে—

(/০) আদরে: বেশ ছেলেটি। "মূর্তিটি দেখিলেই ভক্তির উদয় হয়।"

(৵০) ক্ষুদ্রতায়: এমন লোকটির অমন ধূমসী স্ত্রী!

'টা-টি'-র প্রভেদ লক্ষণীয়: টা-তে আকার ও পরিমাণের আধিক্য। টি-তে স্বল্পতা—"পড়শীর ছেলেটা ভাত খায় এতটা, যেন হুলো বেড়ালটা; আমাদের ছেলেটি ভাত খায় এই ক'টি, যেন কেষ্ট ঠাকুরটি।

টু, টুক, টুকু, টুকুন

যাহার পরিমাণ হয় তেমন জিনিসের বা ক্রিয়ার স্বল্পতা-নির্দেশে—টু, টুক, টুকু, টুকুন, ব্যবহৃত হয়:

একটু জল দাও; একটু বুঝে-সুঝে চল; দুধটুক বা দুধটুকু দুধ টুকুন খেয়ে ফেল; পয়সা নেই বটে, সখটুকু আছে; এইটুকুন ছেলের সাহস দেখ না!

লক্ষণীয়ঃ একটু হয়, কিন্তু দুইটু', 'তিনটু', হয় না। সংখ্যা নির্দেশে ইহাদের প্রয়োগ নাই।

খান, খানা, খানি

বস্তুবাচক বিশেষ্যের-একত্ব-নির্দেশে ইহাদের প্রয়োগ ঘটিলেও ব্যবহারে কিঞ্চিৎ প্রভেদ বর্তমান। আচার্য সুনীতি কুমারের ভাষায়—" -'খান' কতকটা তুচ্ছার্থে বা অবজ্ঞায়, '-খানা' নির্বিশেষে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনাদরে, '-খানি' হ্রস্বার্থে বা আদরে বা অনুকম্পায় ব্যবহৃত হয়।"

"ধরিলা ধনুক-খান।" "বেহালা-খানা বাঁকায়ে ধ'রে বাজাও ওকী সুর?" "পড়িয়া দেখিলা পত্র-খানি"; —রবীন্দ্রনাথ।

যে ব্যাপার-খানির বিকট গন্ধে মূর্ছিত হইতে ছিলেন, সেইখানি····"

শরৎচন্দ্র।

[কাণ্ডখানা দেখ! "বলি তোমার মতলব-খানা কী?" "ভাব-খানা সুবিধের মনে হচ্ছে না"—প্রভৃতি স্থলে অবস্তুবাচক বিশেষ্যের নির্দেশনে খানা প্রযুক্ত হয়।

এক+টু [বা টুক]+খানি-র প্রয়োগে দেখা যায়; যেমন—একটুখানি ব'স। একটুকখানি ফলের রস বেশ খেতে পারবে। "অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে"—শরৎচন্দ্র।

গাছ, গাছা, গাছি

ইহারা এক-সংখ্যক লম্বা ও সরু জিনিসের নির্দেশক—একগাছ, একগাছা, বা একগাছি পাকাচুল ; মালা-গাছি ; হার-গাছা ; বেত-গাছ ; ইত্যাদি।

লক্ষণীয়ঃ ১। পাঁচজন ব্রাহ্মণ, দশজন মজুর, কতজন লোক, প্রভৃতি স্থলে জন 'ব্যক্তি' সংখ্যক'-অর্থে ব্যবহৃত ; উহা নির্দেশক নহে, প্রত্যয়ও নহে। পাঁচজন=পাঁচজন (ব্যক্তি বা সংখ্যা) যাহাতে (বহুব্রীহি)। জন বা জনা সংখ্যা-বাচক বিশেষণের পূর্বেও বসে—জন দুই লোক বা জনা দুই লোক হ'লেই চলবে।

২। অনেক সময় নির্দেশক-যুক্ত বিশেষ্যটি সম্বন্ধপদের পর উহ্য থাকে এবং কেবল নির্দেশকটিই সম্বন্ধপদের সহিত যুক্ত হইয়া বিশেষ্যের অর্থদ্যোতনা করে ; যেমন—তিনি দু'টি, দু'টো বা দু'খানা গান করলেন ; কিন্তু আগের-টি, [আগের-টা বা আগের-খানা] যেমন জমেছিল পরের-টি [পরের-টা বা পরের-খানা] তেমন জমল না। ['আগের' এবং 'পরের' সম্বন্ধ পদের পরে বিশেষ্যপদ 'গান' উহ্য রহিয়াছে ; 'টি' বা 'টা' বা 'খানা'-দ্বারা সনির্দেশক বিশেষ্যের কার্য সাধিত হইয়াছে।]

অনুরূপ—গয়লার কালকের দুধ-টা ভাল ছিল, আজকের-টা ভাল নয়। বিজ্ঞাপনটা তিন রঙে লেখা—উপরের-টা লাল, মাঝের-টা কালো এবং নীচেকার-টা সবুজ ; ইত্যাদি।

অনির্দেশক

ইহা নির্দেশকের বিপরীত কার্য করে অর্থাৎ অনির্দিষ্টতা বা অনিশ্চয়তার বোধ জন্মায়। অবশ্য বাঙ্‌লায় অনিশ্চয়তা সূচনার উপায় বিবিধ, কিন্তু অনির্দেশক শব্দ মাত্র একটি। ইহাকেও প্রত্যয় না বলিয়া শুধু অনির্দেশক বলাই ভাল। 'দশজন লোক' বলিলে লোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট দশ বুঝায় ; কিন্তু 'জন দশেক লোক' বলিলে লোকের সংখ্যা অনির্দিষ্ট ; দশের কমও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। 'দশ'-এর সহিত 'এক' যুক্ত হওয়ায় এই অনির্দিষ্টতার উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং এই 'এক'-কে অনির্দেশক বলিতে হইবে।

১। 'সংখ্যা-'বাচক ও 'পরিমাণ' বাচক শব্দের উত্তর-ই অনির্দেশক যুক্ত হইয়া থাকে—

"মণ দেড়েক দুধ, গোটা পঁচিশেক আম, সের দশেক মিষ্টি, জনা তিনেক লোকের মাথায় চাপিয়ে ক্রোশ দুয়েক রাস্তা হেঁটে মুখুজ্জে মশাই বাড়ী পৌছুলেন।"

২। 'পরিমাণ'-বাচক শব্দের পরে 'নির্দেশক' -এর সহিতও 'এক' যুক্ত হইলে অনির্দিষ্টতা সূচিত হয়—

সের-টাক [-টা+এক], মণ-টাক [-টা+এক], পোয়া-টেক [-টা+এক], ক্রোশ-খানেক [খান+এক], বিঘা-খানেক, ঘণ্টা-খানেক, ইত্যাদি।

লক্ষণীয়—'ক্ষণেক', 'বারেক', 'তিলেক', ইত্যাদি স্থলে 'এক' অনির্দেশক নহে।

অনুশীলনী

১। 'নির্দেশক' কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। তিনটি বিভিন্ন অর্থে 'নির্দেশক'-এর প্রয়োগ দেখাও।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরে দেখা পদে কী অর্থে কোন্ নির্দেশক প্রযুক্ত হইয়াছে বল

(ক) "কারো মনে নাহি হয় দয়া **একটুকু**।"—(ঈশ্বরগুপ্ত)

(খ) "তোমরা কেবল **মন্দটাই** দেখো"।—(রবীন্দ্রনাথ)

(গ) "আমাদের পুরোনো **ঝড়গাটা** তা হলে আজ তোলা থাক্।"—(অবনীন্দ্রনাথ)

(ঘ) "বাঁ হাতে ছোট্ট **একটি** বেতের ঢাল, আর ডান হাতে···**একখানি** লকড়ি।"—(প্রমথ চৌধুরী)

(ঙ) "দুজনে কি **এটুকুনি** করিবে গ্রহণ?"—(মানকুমারী)

(চ) "কী জানি কখন উল্টায় **গাড়িখানি**।"—(দ্বিজেন্দ্রলাল)

(ছ) "**তরীখানা** বাইতে গেলে, মাঝে মাঝে তুফান মেলে।"—(রবীন্দ্রনাথ)

(জ) "এতো বড়ো **কাজটা** খারাবি হল—"—(বঙ্কিমচন্দ্র)

(ঝ) "আমার যে **র‍্যাপারখানির** বিকট গন্ধে···মূর্ছিত হইতেছিলেন, **সেইখানি** গায়ে দিয়া, ···ইন্দ্র **খানি** পরিধাণ করিয়া তিনি···বাটী গেলেন।"—(শরৎচন্দ্র)

(ঞ) "**একগাছি** মুক্তার বালা"—(বঙ্কিমচন্দ্র)

৪। উদাহরণ দাও: একই পদে দুইটি নির্দেশক: অবস্তুবাচক বিশেষ্য 'খানা',-খানি'-র যোগ; আদরে-'টা'; ঘণ্টা-অর্থে -'টা'; 'ক্ষুদ্রতা' বুঝাইতে -'টি'।

৫। 'অনির্দেশক' কাহাকে বলে? বাঙলায় 'অনির্দেশক' কয়টি ও কী কী? উদাহরণদ্বারা 'অনির্দেশক'-এর কার্য পরিস্ফুট কর।

৬। প্রভেদ দেখাও:—একটা লোক ও লোকটা; পাঁচ সের ও সের পাঁচেক; ঘোড়াটা ও ঘুড়িটি দাড়িগাছা ও দড়িগাছি; ক্রোশটাক ও এক ক্রোশ।

উপসর্গ

√হৃ ধাতুর অর্থ 'হরণ করা'; কিন্তু 'প্র-√হৃ'-এর অর্থ 'প্রহার করা'; 'অপ-√হৃ' —অপহরণ বা চুরি করা, 'সম্-√হৃ'—সংহার বা হত্যা করা, 'বি-√হৃ'—বিহার করা, 'উৎ-√হৃ'—উদ্ধার করা, 'উপ-√হৃ'—উপহার দেওয়া' 'পরি-√হৃ—পরিহার বা পরিত্যাগ করা, 'আ-√হৃ'—আহার করা।

উপরি লিখিত উদাহরণ গুলিতে প্র, অপ, সম্, বি, উৎ, উপ, পরি, ও আ √হৃ-এর পূর্বে বসিয়া উহার অর্থকে সবলে অন্যত্র টানিয়া লইয়ছে। এইজন্য প্র-প্রভৃতিকে উপসর্গ বলা হয়।

যে সকল অব্যয় ধাতুর পূর্বে বসিয়া তাহার অর্থের পুষ্টি, বৈপরীত্য ও নূতনত্ব সাধন দ্বারা অর্থের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটায়, তাহাদিগকে উপসর্গ বলে।

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার-সংহার বিহার-পরিহারবৎ॥
(উপসর্গ যোগে ধাতুর নবার্থ-সঞ্চার
দেখ—প্রহার, আহার, বিহার, সংহার পরিহার।)

অথবা

[মূলেতে অব্যয় ছিল, ধাতুর আগে বসে। ধাতুর অর্থটি ধ'রে টান মারল ক'ষে॥
অর্থ কোথায় ছিট্‌কে গেল, দেখ চমৎকার। প্রহার, আহার, বিহার আর সংহার, পরিহার।]
পাণিনি—"উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" হেমচন্দ্র—"উপসৃজ্য ধাতুরমর্থবিশেষং সৃজতীত্যুপসর্গ।"

সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে উপসর্গ গৃহীত। অসংখ্য তৎসম-শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে উপসর্গ-বোধের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উপরন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তৎসম-ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বসাইয়া নবশব্দ গঠনেও উপসর্গের উপযোগিতা। এই জন্যই বাঙ্‌লা ব্যাকরণেও উপসর্গ আলোচনা আবশ্যক।

সংস্কৃতে উপসর্গ ২০টি:—প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ।

"প্র-পরাপ-সমন্বব-নির্দুর্‌ভি ব্যধি-সূদতি-নি-প্রতি-পর্যপয়ঃ।
উপ-আঙিতি বিংশতিরেষ সখে, উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা॥"

মূলতঃ এই কুড়িটি-ই অব্যয়; যখন ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থকে বিশেষিত

বা পরিবর্তিত করে, তখনই তাহারা 'উপসর্গ' হইয়া থাকে অর্থাৎ উপসর্গের কার্য হইল ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থান্তর-সাধন দ্বারা নবশব্দ গঠন।

উপসর্গ-যোগে বিভিন্ন ধাতুর অর্থান্তর গ্রহণ ও নবশব্দ-বিরচন

[একই ধাতু-জাত শব্দাবলী একই কৃৎপ্রত্যয়যোগে গঠিত]

√অস্—অভ্যাস, ন্যাস, ব্যাস, সমাস।

√আপ্—পর্যাপ্ত, প্রাপ্ত, ব্যাপ্ত, সমাপ্ত।

√ই—অপায়, আয়, উপায়, নিবয়, পর্যায়, ব্যয়, সময়।

√ঈক্ষ্—অপেক্ষা, উৎপ্রেক্ষা, নিরীক্ষা, পরীক্ষা, প্রতীক্ষা, প্রেক্ষা, সমীক্ষা।

√কাশ্—অবকাশ, আকাশ, প্রকাশ, বিকাশ, সঙ্কাশ।

√কৃ—অধিকার, অনুকার, অপকার, আকার, উপকার, প্রকার, প্রতিকার, বিকার, সংস্কার।

√ক্রম্—অতিক্রম, অণুক্রম, উপক্রম, পরাক্রম, বিক্রম, সংক্রম।

√ক্ষিপ্—অভিক্ষেপ, আক্ষেপ, উৎক্ষেপ, নিক্ষেপ, প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, সংক্ষেপ।

√গম্—অধিগত, অনুগত, অপগত, অবগত, অভ্যাগত, আগত, উদ্গত, দুর্গত, নির্গত, বিগত, সংগত।

√গ্রহ্—অনুগ্রহ, আগ্রহ, উপগ্রহ, নিগ্রহ, পরিগ্রহ, পতিগ্রহ, বিগ্রহ, সংগ্রহ।

√চর্—অত্যাচার, অভিচার, আচার, উপচার, প্রচার, বিচার, ব্যভিচার, সঞ্চার।

√চি—অপচয়, উপচয়, নিচয়, নিশ্চয়, প্রচয়, পরিচয়, সঞ্চয়, সমুচ্চয়।

√ছিদ্—অনুচ্ছেদ, অবচ্ছেদ, উচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ।

√জ্ঞা—অনুজ্ঞা, অবজ্ঞা, অভিজ্ঞা, আজ্ঞা, প্রজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, সংজ্ঞা।

√তন্—উত্তান, বিতান, সন্তান।

√তপ্—অনুতাপ, উত্তাপ, পরিতাপ, প্রতাপ, সন্তাপ।

√দা—অপাদান, অবদান, আদান, উপাদান, নিদান, প্রদান, প্রতিদান, ব্যাদান, সম্প্রদান।

√দিশ্‌—আদেশ, উদ্দেশ, উপদেশ, নিদেশ, নির্দেশ, [প্রদেশ, বিদেশ, সন্দেশ ।

√ধা—অবধান, অভিধান, আধান, উপাধান, নিধান, পরিধান, [অ] পিধান, [প্রধান], প্রাণিধান, বিধান, ব্যবধান, সন্ধান, অনুসন্ধান, সমাধান ।

√নম্‌—আনত, উন্নত, পরিণত, প্রণত, বিনত, সন্নত ।

√নী—অনুনীত, অপনীত, অভিনীত, আনীত, উন্নীত, উপনীত, নির্ণীত, পরিণীত, প্রণীত, বিনীত ।

√পত্‌—অণুপাত, উৎপাত, নিপাত, প্রণিপাত, প্রপাত, সম্পাত ।

√বদ্‌—অনুবাদ, অপবাদ, অভিবাদ [ন], পরিবাদ, প্রতিবাদ, প্রবাদ, বিবাদ, বিসংবাদ, সংবাদ ।

√বস্‌—অধিবাস, আবাস, উপবাস, নিবাস, প্রবাস ।

√বহ্‌—অভিবাহ, অববাহ, উদ্বাহ, প্রবাহ, বিবাহ ।

√বিশ্‌—অনুপ্রবিষ্ট, আবিষ্ট, উপবিষ্ট, বিবিষ্ট, পরিবিষ্ট, প্রবিষ্ট, সমাবিষ্ট ।

√বৃ—আবৃত, পরিবৃত, বিবৃত, সংবৃত, সমাবৃত ।

√বৃৎ—অতিবর্তন, অনুবর্তন, আবর্তন, নিবর্তন, পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন, প্রবর্তন, বিবর্তন, সংবর্তন ।

√ভূ—অনুভূত, অভিভূত, উদ্ভূত, পরাভূত, প্রভূত, সম্ভূত ।

√মা—অনুমান, অপমান, অবমান, অভিমান, নির্মাণ, পরিমাণ, প্রমাণ, বিমান, সম্মান ।

√যুজ্‌—অনুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযোগ, দুর্যোগ, নিয়োগ, প্রয়োগ, বিনিযোগ, বিয়োগ, সংযোগ, সুযোগ ।

√রুধ্‌—অনুরোধ, অবরোধ, উপরোধ, নিরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ, ।

√লপ্‌—অপলাপ, আলাপ, প্রলাপ, বিলাপ, সংলাপ ।

√লী—আলয়, নিলয়, প্রলয়, বিলয় ।

√শী—অতিশয়, আশয়, সংশয় ।

√শ্বস্‌—আশ্বাস, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, বিশ্বাস ।

√সদ্‌—অবসন্ন, আসন্ন, উচ্ছন্ন, বিষণ্ণ, প্রসন্ন, নিষণ্ণ ।

√সৃ—অভিসার, অনুসার, [অনুসরণ] অপসার, [অপসরণ], [অবসর], অভিসার, আসার, উৎসার, নিঃসান [নিঃসরণ], [পরিসর], প্রসার, সংসার, সুসার।

√সৃজ্‌—অনুসর্গ, উৎসর্গ, উপসর্গ, নিসর্গ, বিসর্গ, সংসর্গ।

√স্থা—অধিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, অবস্থিত, অভ্যুত্থিত, উত্থিত, উপস্থিত, প্রস্থিত, প্রতিষ্ঠিত, ব্যবস্থিত, সংস্থিত, সমুপস্থিত ।

√হৃ—অপহার, [অপহরণ,] আহার, উদ্ধার, উপহার, পরিহার, প্রহার, প্রতিহার, প্রত্যাহার, বিহার. ব্যবহার, সংহার, সমাহার, সমভিব্যাহার।

উপসর্গের বিভিন্ন অর্থ

(১) অতি—'অতিশয়, বিপরীত, অতিক্রান্ত'-অর্থে :
অতিবৃষ্টি, অতীত, অত্যাচার, অতিভক্তি, ইত্যাদি।

বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপেও বাঙ্গালায় 'অতি' ব্যবহৃত হয়—কিছুরই, 'অতি' ভাল নহে ; তার 'অতি' বাড-বেড়েছে]।

(২) অধি—'উপরে, অথবা মধ্যে-অর্থে :—অধিকার, অধিগত, অধিবাসী ইত্যাদি।

(৩) অনু—'পরে বা কিছুর দিকে'-অর্থে : অনুগত, অনুবাদ, অনুনয়, অনুরোধ ইত্যাদি।

(৪) অপ—'দূরে, বিপরীত'-অর্থে : অপক্রান্ত, অপগত, অপমান, ইত্যাদি।

(৫) অপি—'ভিতরে-উপরে, নিকটে,-অর্থে : পিধান, অপিনিহিতি ইত্যাদি।

(৬) অভি—'প্রতি' উপরে, দিকে, চতুর্দিকে-অর্থে : অভিভাষণ, অভিভূত, অভিমান, অভিনিবেশ, অভিব্যক্তি, ইত্যাদি।

(৭) অব—'নিম্নে'-অর্থে : অবগাহন, অবমান, অবরোধ, অবনমন ইত্যাদি।

(৮) আ—'প্রতি' ঈষৎ সম্যক্‌-অর্থে : আগমন, আক্রমণ, আভাস, আনন্দ ইত্যাদি।

(৯) উৎ—'উপরের দিকে, বাহির-অর্থে : উদ্বোধন, উদ্দেশ, উদ্ধার, উদয়, ইত্যাদি।

(১০) উপ—'দিকে, প্রতি নিকট-অর্থে : 'উপবেশন, উপস্থিত, উপকার, উপহার, ইত্যাদি।

(১১) দুর্‌—'মন্দ বা কু-অর্থে : দুর্গত, দুষ্প্রাপ্য, দুস্তর ইত্যাদি।

(১২) নি—'নিম্নে' মধ্যে, পূর্ণরূপে'-অর্থে : নিপাত, নিবাস, নিপীড়িত ইত্যাদি।

(১৩) নির্—বাহিরে বা সম্যক্-অর্থে : নির্গত, নির্মথিত, নির্ণয় ইত্যাদি।

(১৪) পরা—'দূরে, বাহিরে',-অর্থে : 'পরাজিত, পরাভূত, পরাবর্তিত ইত্যাদি।

(১৫) পরি—'চতুর্দিকে বা ব্যাপক-ভাবে'-অর্থে : পরিক্রমা, পরিচালনা, পরিভ্রমণ পরিবেষ্টন, ইত্যাদি।

(১৬) প্র—'সম্মুখে, শ্রেষ্ঠ-অর্থে : 'প্রগতি, প্রয়োগ, প্রভাব, ইত্যাদি।

(১৭) প্রতি—'বিরুদ্ধে, উত্তরে'-অর্থে : প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিনমস্কার প্রতিদান ইত্যাদি।

(১৮) বি—'দূরে, বাহিরে'-অর্থে : 'বিগত, বিহিত, সম্যক ইত্যাদি।

(১৯) সম্—'সহিত'-অর্থে : সংলাপ, সংবাদ, সঙ্গতি, সম্ভব, সম্মোহন, ইত্যাদি।

(২০) সু—'মঙ্গল, উৎকর্ষ'-অর্থে : সুজাত, সুজিত, সুচিন্তিত, ইত্যাদি।

উপসর্গ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

উপসর্গ সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। উহার সংজ্ঞা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী-ই হইবে' উহার ব্যবহারও সংস্কৃত শব্দে। খাঁটি বাঙ্‌লাতে উপসর্গ নাই. হইতে পারে না। বাঙ্‌লায় স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ, গঠনের জন্য স্বতন্ত্র ধাতু; আর যেখানে তাহা জোটে না, সেখানে 'সংযোগমূলক' ক্রিয়াপদের ব্যবহার। কাজেই বাঙ্‌লা উপসর্গের প্রশ্নই উঠে না। তথাপি অনেক বাঙ্‌লা-ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা 'বাঙলা উপসর্গ' এমন কি বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত 'বিদেশী উপসর্গ'-ও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য উদ্ধৃত হইল—

"অধিকাংশ বাঙলা ব্যাকরণেই খাঁটি বাঙলা উপসর্গের একটি করিয়া তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণগুলি প্রায় সমস্তই ধাতুসম্পর্কহীন কতকগুলি অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি, নঞ্ তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসে নিষ্পন্ন শব্দের পূর্ব্বপদ। এগুলি উপসর্গ নয়, বিশুদ্ধ অব্যয় অর্থাৎ উপসর্গরূপ অব্যয়গণ্ডীর বহির্ভূক্ত সাধারণ অব্যয়। এই তথাকথিত উপসর্গগুলিকে অব্যয় বলাই সঙ্গত।

... ...

"ভিক্ষের চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া (নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস)
অনাবৃষ্টি ঐ
আকাঠ মূর্খ ঐ (সাদৃশ্যার্থক)
অনামুখো (বহুব্রীহি)
নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, ঐ
বেটাইম (নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস), বেহেড (বহুব্রীহি)
ভরসাঁঝ, ভরাযৌবন, ভরাবাদল (কর্মধারয়)
সবুট, সজোর, সতৃষ্ণ (বহুব্রীহি)
সুনজর (কর্মধারয়), সুডৌল (বহুব্রীহি), সুপুরুষ (শোভন পুরুষ—কর্মধারয়) —এইসকল উদাহরণের 'আ, অনা, নি, বে, ভর, ভরা, স, সু'-কে কেন 'বাঙলা উপসর্গ' বলা হইয়াছে, জানি না।

'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্‌লা ব্যাকরণে'—(i) কুকাজ, কুবচন, কুনজর, (ii) নিখুঁত নিখোঁজ, নিদয়, নিলাজ, (iii) সুজন, সুছাঁদ, সুডৌল, সুদিন, সুনাম ইত্যাদির 'কু'- 'নি,' 'সু'-কে বলা হইয়াছে উপসর্গ। আশ্চর্য! সু প্রভৃতি উপসর্গ তো হইতেই পারে না, অব্যয় পর্যন্ত বলা যায় না (ii) চিহ্নিত কথাগুলিতে বহুব্রীহি সমাস, বাকী দুটিতে কর্ম্মধারয়।"

শ্যামাপদ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত, খাঁটি বাঙ্‌লাতে উপসর্গ নাই, বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দেও উপসর্গ নাই।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাহাকে বলে ?

২। উপসর্গ কয়টি ও কী কী ?

৩। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা বিভিন্নার্থে তিনটি উপসর্গ যোগে তিনটি করিয়া শব্দ গঠন কর :—√গম্, √কৃ, √ভূ, √স্থা, √সৃ, √হৃ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কী অর্থে কোন্ উপসর্গ যুক্ত হইয়াছে লিখ :—

সমাস, ব্যাস, নিরীক্ষা, উৎক্ষেপ, বিগ্রহ, আচার, প্রতিদান, উপাদান, পরিণতি অনুগত, প্রবর্ত্তন নিঃশ্বাস, অভিসার, আয়োজন।

—○—

বাক্যপ্রকরণ

পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত পূর্ণ-ভাব-প্রকাশক পদ-সমবায়কে বাক্য বলে।

বাক্যই ভাষার পরিমাপের একক।

'রাম বই পড়ে'—একটি বাক্য। ইহাতে তিনটি পদ রহিয়াছে—'রাম', 'বই' এবং 'পড়ে'। 'রাম' কী করে? 'পড়ে'; 'রাম' কী 'পড়ে'?—'বই'। 'বই' কে 'পড়ে'?—'রাম'; 'রাম' 'বই' লইয়া কী করে?—'পড়ে'। 'পড়ে' কে?—'রাম'; 'পড়ে' কী?—'বই'। দেখা যাইতেছে যে—'রাম,' 'বই' এবং 'পড়ে' তিনটি পদই পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধ-যুক্ত, যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট এবং উহাদের সমবায় একটি পূর্ণ ভাবের প্রকাশক। অতএব 'রাম বই পড়ে' একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

সার্থক পূর্ণাঙ্গ বাক্যের লক্ষণ

বাক্যের পূর্ণাঙ্গতা ও সার্থকতা তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ১। যোগ্যতা ২। আসত্তি বা নৈকট্য এবং ৩। আকাঙ্ক্ষা বা কাঙ্ক্ষতা।

১। যোগ্যতা—ইহার অর্থ হইল প্রকৃতিগত বা ভাবগত বিশুদ্ধি। কেবল আকৃতিগত বিশুদ্ধতা থাকিলেই সার্থক বাক্য হয় না। নেশায় মত্ত, পাগল বা বিকারগ্রস্তের মুখ-নিঃসৃত আকারে সুসঙ্গত কিন্তু প্রকৃতিতে বা ভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ পদসমবায়কে প্রলাপ বলা হয়। 'বক [হয়] একটি কৃষ্ণকায় চতুষ্পদ জন্তু' অথবা 'গরুগুলি গাছে গাছে লাফালাফি করিতেছে'—পদ-সমবায় আকারে শুদ্ধ বাক্য [Formally true) কিন্তু ভাব, প্রকৃতি বা অর্থের দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না। কারণ 'বক'-এর 'কাল রং' ও 'চারি পা', এবং 'গরু'কে প্রলাপ ছাড়া 'গাছে চড়িয়া লাফালাফি করিতে' যিনি দেখিয়াছেন তিনি যে বস্তুতঃ পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া তৎকালে অন্যত্র বিহার করিতেছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাক্যের বাস্তব ও যৌক্তিক-সঙ্গতি থাকা চাই (Material truth)। ইহাই যোগ্যতা এবং সার্থক বাক্যের অন্যতম লক্ষণ।

২। **আসত্তি** বা **নৈকট্য**—বাক্যে কোন্ পদ কোথায় বসিবে ভাষার প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহা সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থগত সঙ্গতি বা পারস্পরিক অন্বয় সাধনের জন্য পদনিচয়ের সন্নিবেশে এই রীতি অবশ্য পালনীয়। নতুবা অন্বয় ব্যাহত হয় এবং অর্থবোধ দুঃসাধ্য হয়। পদসন্নিবেশের সুনির্দিষ্ট ক্রম-ই **আসত্তি** বা **নৈকট্য**।

'একটা মাথার উপরের ভয়ে তোয়ালে লাগবার তেল বিছান আরামকেদারার দিকটায়' বলিলে **আসত্তি**-ভঙ্গে বক্তার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে; কারণ এই পদসমবায় নিরর্থক। কিন্তু পদসমূহের পারস্পরিক **নৈকট্য** রক্ষিত হইলে উহাদের দ্বারাই যে বাক্য গঠিত হয় তাহার অর্থবোধে কাহারও অসুবিধা হইতে পারে না। **আসত্তি** রক্ষা করিয়া পদসন্নিবেশে বাক্যটি দাঁড়াইবে—'মাথার তেল লাগবার ভয়ে আরাম-কেদারার উপরের দিকটায় একটা তোয়ালে বিছান।'

লক্ষণীয়—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কবিতায় পদসন্নিবেশের প্রচলিত রীতির স্বল্পব্যত্যয় ঘটিলেও **আসত্তি** [অর্থবোধের জন্য কোন্ পদ কোন্ পদের নিকটে বসিবে] অক্ষুণ্ণ থাকে। "চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল"-এর গদ্যরূপ হইবে 'চাষী ক্ষেতে হাল চালাইতেছে' —ক্রিয়া এবং কর্ম স্থান বিনিময় করিলেও আসত্তি-ভঙ্গ হয় নাই বলিয়া অর্থবোধে অসুবিধা হয় না।

৩। **আকাঙ্ক্ষা** বা **কাঙ্ক্ষতা**—একটি বিশেষ ভাব বা ধারণা একটি বাক্যে পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করাই বক্তার **আকাঙ্ক্ষা**। আবার বক্তার ভাব বা ধারণার অভিব্যক্তির পূর্ণ অর্থবোধই শ্রোতার **আকাঙ্ক্ষা**। যে পদসমবায়ে বক্তা ও শ্রোতার এই **আকাঙ্ক্ষার** পরিতৃপ্তি ঘটে তাহাই সার্থক বাক্য। 'তাঁহার ব্যাকরণ-রচনা বলিয়াই যদি বক্তা উক্তি শেষ করেন, তবে বক্তার ভাবটি পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় বক্তা বা শ্রোতা কাহারও **আকাঙ্ক্ষা** তৃপ্ত হইতে পারে না। উহার সহিত 'এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই' যুক্ত করিলে **আকাঙ্ক্ষা** তৃপ্ত হয়। অতএব 'তাঁহার ব্যাকরণ-রচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই' একটি সার্থক বাক্য।

ক। বাক্যের প্রকারভেদ

[গঠন-অনুসারে]

বাক্য নানা প্রকারের হইতে পারে। তাহাদের গঠনের প্রকৃতি হিসাবে তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

[ক] একটি মাত্র কর্তৃপদ ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা যে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে **সরল** বাক্য বলে।

বিদ্যাসাগর দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। পাখী গান গাহিতেছে। "মা আর প্রতিবাদ করিল না।" সত্যবাদী ব্যক্তি সকলের বিশ্বাসভাজন।

"গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে।"

[খ] বৃহত্তর বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর বাক্যকে উপবাক্য বলে। যে বাক্য একটি প্রধান উপবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান উপবাক্যের সাহায্যে গঠিত হয় তাহাকে **মিশ্র** বা **জটিল** বাক্য বলে। অপ্রধান উপবাক্যটি বা উপবাক্যগুলি প্রধান উপবাক্যটির উপর বা অপর অপ্রধান উপবাক্যের উপর নির্ভরশীল হয়।

"বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।"

"এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু ?"

"কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে।"

[গ] দুই বা ততোধিক প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্য সমন্বয়ী অব্যয় [নিরপেক্ষ-বাক্যান্বয়ী] দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যে বাক্য গঠন করে তাহাকে **যৌগিক** বাক্য বলে; কখনও কখনও অব্যয় পদ উহ্য থাকে।

"স্ত্রী তাহা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল।" "কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না।"

সত্যকথা বল, নতুবা শাস্তি পাইবে।

তোমার ঘর হইতে জিনিসটি পাওয়া গিয়াছে, অতএব তুমি চোর।

বাক্যান্তরীকরণ

একপ্রকার বাক্যেকে অন্য প্রকার বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়। রচনায় যেখানে যেরূপ বাক্যের ব্যবহার সুন্দর হইবে সেইরূপই করিতে হইবে, কিন্তু অর্থের যাহাতে কোনরূপ পরিবর্তন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ক) সরল বাক্যের জটিল বা মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন :

[সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে সেই বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা বাক্যাংশকে অপ্রধান উপবাক্যে পরিণত করিতে হয়।]

সরল বাক্য	মিশ্র বা জটিল বাক্য
১। বিপন্ন ব্যক্তিটিকে সকলেই সাহায্য করিল।	যে ব্যক্তিটি বিপদে পড়িয়াছিল তাহাকে সকলেই সাহায্য করিল।
২। মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।	যে মিথ্যাকথা বলে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।
৩। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।	আমার যতদূর সাধ্য, আমি ততদূর চেষ্টা করিয়াছি।
৪। তিনি বাড়ী ফিরিয়াই পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।	তিনি যেই বাড়ী ফিরিলেন অমনি পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
৫। শহরবাসীদের সুখ সীমাবদ্ধ।	যাহারা শহরে বাস করে তাহাদের সুখ সীমাবদ্ধ।
৬। অন্ধ ব্যক্তিকে সকলেরই দয়া করা উচিত।	যে ব্যক্তি অন্ধ তাহাকে সকলেরই দয়া করা উচিত।
৭। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে গরু সর্বাপেক্ষা উপকারী।	যে সকল জন্তুর চারি পা আছে, তাহাদের মধ্যে গরু সর্বাপেক্ষা উপকারী।
৮। ধনহীনের জীবনে সুখ কোথায় ?	যাহার ধন নাই, তাহার জীবনে সুখ কোথায় ?
৯। গীতাঞ্জলির কবির নাম রবীন্দ্রনাথ।	যে কবি গীতাঞ্জলি রচনা করিয়াছেন তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথ।
১০। উদ্যোগী পুরুষেরাই লক্ষ্মী লাভ করেন।	যাঁহারা উদ্যোগী পুরুষ তাঁহারাই লক্ষ্মী লাভ করেন।
১১। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না।	তুমি মনে যাহা কামনা করিয়াছ তাহা সিদ্ধ হইবে না।

১২।	"পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।"	আধুনিক হিন্দু যেমন অঙ্গহীন পুতুলগুলাও তেমনি হইয়াছে।"
১৩।	"প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না।"	প্রথম সমাগমে যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা দেয়, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না।

(খ) সরল বাক্যের যৌগিক বাক্যে পরিণমন :

[সরল বাক্যের মধ্যস্থ কোন বাক্যাংশকে নিরপেক্ষ উপাদান বাক্যে পরিণত করিয়া সমন্বয়ী অব্যয় দ্বারা মূলবাক্যের সহিত যুক্ত করিতে হয়। মূল বাক্যের অর্থ যাহাতে অণুমাত্র পরিবর্তিত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।]

	সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১।	সে গ্রামে গিয়া কলিকাতায় সংবাদ দিল।	সে গ্রামে গেল এবং কলিকাতায় সংবাদ দিল।
২।	তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব নাই।	তাহার অন্নের অভাব নাই কিম্বা বস্ত্রেরও অভাব নাই।
৩।	বিনা পরিশ্রমে সুখলাভ হয় না।	পরিশ্রম কর নতুবা সুখলাভ হইবে না।
৪।	সত্য কথা না বলিলে শাস্তি পাইবে।	সত্য কথা বল, নতুবা শাস্তি পাইবে।
৫।	অসুস্থতাবশতঃ স্কুলে আসিতে পারি নাই।	আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই স্কুলে আসিতে পারি নাই।
৬।	হনুমান্ বিশল্যকরণী লইয়া আসিলে রামচন্দ্রের মনে উৎসাহ দেখা দিল।	হনুমান্ বিশল্যকরণী লইয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের মনে উৎসাহ দেখা দিল।
৭।	দরিদ্র হইলেও লোকটি নীচমনাঃ নয়।	লোকটি দরিদ্র, কিন্তু নীচমনাঃ নয়।
৮।	সর্বস্ব হারাইয়াও তিনি আশা ছাড়েন নাই।	তিনি সর্বস্ব হারাইয়াছেন, তথাপি আশা ছাড়েন নাই।
৯।	শরীরে বল থাকিলেও তিনি অত্যন্ত ভীরু।	তাঁহার শরীরে বল আছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীরু।
১০।	এখনি গিয়া সব কথা তাঁহাকে বল।	এখনি যাও ও সব কথা তাঁহাকে বল।
১১।	"বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন।"	বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধানের কারবার ছিল এবং তাহাতেই তিনি অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন।
১২।	"শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল।"	শ্রীতখন নিকটে আসিল এবং আবার প্রণাম করিল।

(গ) মিশ্রবাক্যের সরল বাক্যে রূপান্তর-সাধন :

[মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তিত করিতে হইলে মিশ্র বাক্যটির অন্তর্গত অপ্রধান বা সাপেক্ষ উপবাক্যকে একপদ বা বাক্যাংশে পরিণত করিতে হয়।]

মিশ্র বাক্য	সরল বাক্য
১। যে ব্যক্তি বিদ্বান্, সে এমন কাজ করে না।	বিদ্বান্ ব্যক্তি এমন কাজ করে না।
২। যদি পরিশ্রমী না হও তোমার দ্বারা কোন কার্যই হইবে না।	পরিশ্রমী না হইলে তোমার দ্বারা কোন কার্য হইবে না।
৩। যে লোক শ্রদ্ধার পাত্র তাহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিবে।	শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিবে।
৪। যে মিথ্যাকথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।	মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।
৫। এমন যন্ত্রণা হইতেছে যে সহ্য করা যায় না।	অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে।
৬। তাহার যাহা বলিবার ছিল সকলই ত' বলিয়াছে।	তাহার বক্তব্য সকলই ত' বলিয়াছে।
৭। তুমি যে ভূমিতে জন্মিয়াছ তাহা তোমার মাতার ন্যায়।	জন্মভূমি তোমার মাতার ন্যায়।
৮। যে ঈর্ষা করে তাহার প্রাণে সুখ নাই।	ঈর্ষীর প্রাণে সুখ নাই।
৯। পরের শ্রী দেখিয়া যে ব্যক্তি কাতর হয় তাহাকে ধিক্!	পরশ্রীকাতর ব্যক্তিকে ধিক্।
১২। "কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।"	ক্ষুদ্রতম কণ্টকেরও বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

(ঘ) যৌগিক বাক্যের সরল বাক্যে পরিবর্তন :

[যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যান্বয়ী অব্যয়গুলি উঠাইয়া দিতে হইবে এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া রাখিয়া অন্য সমাপিকা ক্রিয়াগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়াতে পরিবর্তিত করিতে হইবে।]

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
১। দিন থাকিতে আল বাঁধ নতুবা চিরকাল দুঃখ পাইবে।	দিন থাকিতে আল না বাঁধিলে চিরকাল দুঃখ পাইবে।
২। সে রাত্রে বাড়ী গেল না, এবং খোলা মাঠে রাত কাটাইল।	সে রাতে বাড়ী না গিয়া খোলা মাঠে রাত কাটাইল।
৩। আমার সর্বস্ব আছে, কিন্তু চাবি-কাঠি নাই।	সর্বস্ব থাকিতেও আমার চাবিকাঠি নাই।
৪। তিনি বলবান্ কিন্তু অত্যন্ত ভীরু।	তিনি বলবান্ হইলেও অত্যন্ত ভীরু।
৫। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, এজন্য বেশী লেখাপড়া করিতে পারেন নাই।	অত্যন্ত দরিদ্রতা নিবন্ধন তিনি বেশী লেখাপড়া করিতে পারেন নাই।
৬। "কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না।"	ইহার অর্থ বুঝিলেও কাঙালীর মা'র ভয়ই হইল না।

(ঙ) যৌগিক বাক্য হইতে মিশ্র বাক্য গঠন :

[যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত স্বাধীন উপবাক্যগুলির মধ্যে একটিকে প্রধান উপবাক্য রাখিয়া অপর উপবাক্যগুলিকে সাপেক্ষ অব্যয় যোগে অপ্রধান বা অধীন বা সাপেক্ষ উপবাক্যে পরিণত করিতে হয়।]

যৌগিক বাক্য	মিশ্রবাক্য
১। মন দিয়া লেখাপড়া কর, ভবিষ্যতে ভাল হইবে।	যদি মন দিয়া লেখাপড়া কর তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে।
২। তুমি অপরাধ করিয়াছ, কাজেই শাস্তি পাইবে।	যেহেতু তুমি অপরাধ করিয়াছ, সেই হেতু তুমি শাস্তি পাইবে।

৩। পিতামাতার উপদেশমত কাজ কর, পরিণামে সুখী হইবে।	যদি পিতামাতার উপদেশমত কাজ কর তাহাহইলে পরিণামে সুখী হইবে।
৪। "তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী।"	যেহেতু তাহাকে······মরিয়াছিল, সেইজন্য বাপ···········অভাগী।
৫। "শ্রী তাহা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল।"	যেহেতু শ্রী তাহা কিছুই বুঝিল না, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।
৬। সে পত্র লিখিয়াছে, কাজেই সে নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসিবে।	সে যখন পত্র লিখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসিবে।
৭। (আগে তুমি) ছোট হও, তবে বড হইবে।	বড যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।
৮। ঠিক সময়ে ষ্টেশনে পৌছাও, নিশ্চয় ট্রেন পাইবে।	যদি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে পৌছাইতে পার, তবে নিশ্চয়ই ট্রেন পাইবে।
৯। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি————ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।	রবীন্দ্রনাথ যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।
১০। সে বিদ্বান বটে, কিন্তু নিরহঙ্কার।	যদিও সে বিদ্বান, তথাপি সে নিরহঙ্কার।

খ। বাক্যের প্রকারভেদ

[অর্থানুসারে]

বাক্যের গঠন-গত প্রকারভেদের কথা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। **প্রত্যক্ষ উক্তি** বা স্বকীয় উক্তি এবং **পরোক্ষ উক্তি** বা পরকীয় উক্তি হিসাবে বাক্য দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য। **বাচ্য** হিসাবেও বাক্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় এবং বাচ্যান্তর ঘটাইয়া বাক্যের পরিবর্তন করা যায়। সকল ক্ষেত্রেই বাক্যের ভাবটি অবিকৃত থাকে—শুধু প্রকাশভঙ্গিমারই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়।

অর্থানুসারে বাক্যকে আরো কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **বিবৃতিমূলক**

বা নির্ণায়ক বা নির্দেশক বাক্য ; (২) **প্রশ্নবোধক বাক্য** ; (৩) **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য** ; (৪) **ইচ্ছার্থক বাক্য** এবং (৫) **আবেগসূচক বাক্য।**

(১) বিবৃতিমূলক বা নির্ণায়ক বা নির্দেশক বাক্য (Declaratory or Assertive Sentences or Statements)—এই শ্রেণীর বাক্য আবার দ্বিধা বিভাজ্য—(ক) অস্ত্যর্থক বা সদর্থক [বা হ্যাঁ-বাচক, ইতিবাচক]

(খ) নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক [বা না-বাচক, নেতিবাচক, অপোহনাত্মক ইত্যাদি]

(ক) অস্ত্যর্থক (Affirmative) বাক্য—

(/০) কাপুরুষেরা মৃত্যুকে ভয় করে। (৵০) জন্মভূমি সকলের প্রিয়। (৶০) মহাপুরুষেরাই সকলের পথপ্রদর্শক। (।০) ঐক্যই কার্যসিদ্ধির উপায়। (।/) বীরের পক্ষে অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্লাঘ্য। (।৵) সকলেই বীরের পূজা করে। (।৶০) "কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়।"

(খ) নাস্ত্যর্থক (Negative) বাক্য—

(/) আমার সময় নাই। (৵০) বিদ্যাসাগরের তুল্য মানুষ নাই। (৶) এমন লোক নাই, যে, স্বদেশকে ভালবাসে না। (।০) বিপদে ঈশ্বরের তুল্য বন্ধু নাই। (।/০) "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এভারত আর জাগে না জাগে না।" (।৵০) "শ্রী তাহার একবর্ণ বুঝিল না।"

(২) প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক (Interrogative) বাক্য—

(/০) "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে, কে বাঁচিতে চায় ?" (৵০) অর্থের জন্য এত হীনতা স্বীকার কেন ? (৶/) এই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মুখে এক অঞ্জলি জল দিয়া কে ইহার প্রাণ বাঁচাইবে ? (।০) এত অল্প পরিশ্রম করিয়া কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় ? (।/০) ওখানে কে রে ? (।৵০) "পর্বতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায় ?" (।৶০) "শচী কি সে সূর্য-আদি দেবে অবিদিত ?"

অনুজ্ঞাসূচক (Imperative) বাক্য—

(/০) সদা সত্য কথা বলিবে। (৵০) কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লিখিবে। (৶) রাস্তার বাম ধার ধরিয়া চলিও। (।০) বাড়ী যাও। (।/০) উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাক ; (।৵০) "এস কবি।" (।৶০) "গুহার বাহিরে আইস।"

ইচ্ছার্থক (Optative) বাক্য—

(৴৹) বেঁচে থাক বাছা ! (৵) আমার মাথায় যত চুল, তত বৎসর তোমার পরমায়ু হোক্ ! (৶৹) ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন ! (।৹) তোমার সুমতি হোক্ (।৴৹) "সেটা সত্য হোক্ শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ ।"

আবেগসূচক (Exclamatory) বাক্য

(৴৹) মরি, মরি ! কী দেখলাম ! (৵) উঃ ! কি ভয়াবহ দৃশ্য ! (৶) আহা প্রাণ জুড়াইয়া গেল ! (।৹) হোঃ হোঃ ! কী মজা !

বাক্যান্তরীকরণ

(৴৹) অস্ত্যর্থক হইতে	নাস্ত্যর্থক
১। ধনীরাই চিরকাল সুখভোগ করে।	১। ধনী ছাড়া অপর কেহই চিরকাল সুখভোগ করে না।
২। কাপুরুষেরাই মৃত্যুভয়ে কাতর হয়।	২। কাপুরুষ ছাড়া অপর কেহই মৃত্যুভয়ে কাতর হয় না।
৩। ঐক্যই কার্যসিদ্ধির উপায়।	৩। ঐক্য ছাড়া কার্যসিদ্ধির উপায় নাই।
৪। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্।	৪। ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহ সর্বশক্তিমান্ নহে।
৫। স্বদেশকে সকলেই ভালবাসে।	৫। স্বদেশকে কে না ভালবাসে ?
৬। পৌরুষ অকলঙ্ক রাখিও।	৬। পৌরুষকে কলঙ্কিত করিও না।
৭। "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।"	৭। ····বেশির ভাগই [বা প্রায় কিছুই] জানি না।
৮। "অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন।"	৮। ফুল্লরা-ছাড়া আর কেহ শীতের ভাজন নয়।

(৵৹) নাস্ত্যর্থক হইতে	অস্ত্যর্থক
১। কে না জানে ?	১। সকলেই জানে।
২। তাহার শক্তি নাই।	২। সে শক্তিহীন।
৩। সে দুইটি চোখেই দেখিতে পায় না।	৩। সে অন্ধ।

৪। সত্যকথা বলা সব সময়ে নিরাপদ্ নহে। — ৪। সত্যকথা বলা মাঝে-মাঝে বিপজ্জনক।

৫। "মাটিয়া পাথর বিনা না আছে সম্বল।" — ৫। মাটিয়া পাথরই একমাত্র সম্বল।

৬। সুশীল সুবোধের মত বুদ্ধিমান্ নয়। — ৬। সুশীল সুবোধের চেয়ে কম বুদ্ধিমান্।

৭। "তখন এমন ছিল না।" — ৭। তখন অন্যরূপ [বা রকম] ছিল।

৮। "সেদিন আর নাই।" — ৮। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

৯। "সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।" — ৯। সেটুকু বোঝাও তাঁহাদের শক্তির অতীত ছিল।

বিবৃতিমূলক হইতে প্রশ্নবোধক

১। সকলেই জন্মভূমিকে ভালবাসে। — ১। জন্মভূমিকে কে না ভালবাসে?

২। "অন্তর মেশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।" — ২। অন্তর না মেশালে কি তার পরিচয় মেলে?

৩। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যের রূপকার। — ৩। বঙ্কিমচন্দ্র কি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের রূপকার নন?

প্রশ্নাত্মক হইতে বিবৃতিমূলক

৭। "কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?" — ৭। কেশরী কভু ক্ষুদ্র শশককে বধ করে না।

১। এ ভূমণ্ডলে কে চিরকাল বাস করিতে আসিয়াছে? — ২। এ ভূমণ্ডলে কেহই চিরকাল বাস করিতে আসে নাই।

২। "কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?" — ২। সকলেই জানে যে, অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি।

৩। "নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে?" — ৩। নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য ঝল্‌মল্ করে না।

৪। "কাহারে বলিব, বল?" — ৪। কাহাকেও বলিবার নয় বা বলিতে পারি না।

৫। "হবে না প্রতিবিধান?" — ৫। প্রতিবিধান হইবে-ই।

৬। "সুদূরে কেন করি অন্বেষণ?" — ৬। সুদূরে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

অনুজ্ঞা	হইতে নির্দেশক
১। সদা সত্যকথা বলিও।	১। সদা সত্যকথা বলা উচিত।
২। কাগজের দুই পৃষ্ঠেই লিখিবে।	২। কাগজের দুই পৃষ্ঠেই লিখিতে হইবে।
৩। রাস্তার বাম ধার ধরিয়া চলিও।	৩। রাস্তার বাম ধার ধরিয়া চলা কর্তব্য।
৪। দিনান্তে একবার ভগবানের নাম লইও।	৪। দিনান্তে একবার ভগবানের নাম লওয়া উচিত।

ইচ্ছার্থক	হইতে নির্দেশক
১। বেঁচে থাক, বাছা।	১। ঈশ্বরের নিকট তোমার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।
২। আমার মাথায় যত চুল, তত বৎসর তোমার পরমায়ু হোক্!	২। আশীর্বাদ করি, আমার মাথায় যত চুল, তুমি যেন তত বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পার।
৩। তোমার সুমতি হোক্!	৩। ঈশ্বরের নিকট তোমার সুমতি প্রার্থনা করি।
৪। "যাও-না নন্দ?"	৪। নন্দ, তোমার যাওয়া একান্ত কর্তব্য।

আবেগসূচক	হইতে বিবৃতিমূলক
১। মরি, মরি! কী দেখিলাম!	১। যাহা দেখিলাম, তাহার মত অপূর্ব বস্তু আর দেখি নাই!
২। উঃ! কী ভয়াবহ দৃশ্য!	২। এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য অসহনীয়।
৩। আহা! প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল!	৩। প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া গিয়াছে।
৪। আঃ! আপদ্ গেলেই বাঁচি!	৪। আপদ্ না গেলে বাঁচা দায়।
৫। "মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!"	৫। ...সান্ত্রীদের সাবধান হইতেই হইবে [বা না হইলে চলিবে না]।

বাক্যের অন্য প্রকার রূপান্তর

অর্থ ঠিক রাখিয়া বাক্যের আরও নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটানো যায়। প্রতিশব্দ বসাইয়া এবং নানাপ্রকার শিল্পচাতুর্য দ্বারা বাক্য রূপান্তরিত করা যায়। যেমন— "তিনি মারা গেলেন",—এই বাক্যটিকে কতরূপে পরিবর্তিত করা যায় দেখ—

তিনি মারা গেলেন

১। তাঁহার মৃত্যু হইল। ২। তিনি শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ৩। তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। ৪। তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধরণীর মায়া কাটাইলেন। ৫। তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ৭। তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। ৮। তিনি পরলোকগমন করিলেন। ৯। তিনি স্বর্গে গেলেন। ১০। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ১১। তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১২। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। ১৩। তিনি কাল-কবলিত হইলেন।

প্রভাত হইল

১। রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেল। ২। দিনের আরম্ভ হইল। ৩। সূর্য উঠিল। ৪। পূর্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইল। ৫। দিনমণি পূর্বগগনে উদিত হইলেন। ৬। প্রাতঃকাল হইল। ৭। রাত কেটে গেল। ৮। রাত পোহাল।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন

উক্তি দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার মুখের ভাষা অবিকৃত ও অবিকল প্রকাশিত হয়; যেমন—দশরথ বলিলেন "আমার রামের যে ষোল বছর বয়স পূর্ণ হয় নাই!" এখানে দশরথের উক্তি হুবহু উদ্ধৃত করা হইয়াছে অর্থাৎ দশরথ যেমন বলিয়াছেন তেমনটিই লেখা হইয়াছে। ইহাকে **প্রত্যক্ষ উক্তি** বলে।

আর এক প্রকারে উক্ত উক্তিটি লেখা যায়। দশরথের উক্তি বক্তা নিজের ভাষায়ও প্রকাশ করিতে পারেন। এই উক্তিকে **পরোক্ষ উক্তি** বলে। এই পরোক্ষ উক্তিতে দশরথের কথার ভাব দেওয়া হয়, ভাষাটি নহে; যেমন—দশরথ বলিলেন যে, তাঁহার (পুত্র) রামের যে ষোল বছর বয়স পূর্ণ হয় নাই।

বাংলা ভাষায় উভয় প্রকারের উক্তিই ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ উক্তি " " এইরূপ উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে থাকে এবং বচনার্থক ক্রিয়া পদের পর একটি (,) কমা বা (—) ড্যাস চিহ্ন দেওয়া হয়।

পরোক্ষ উক্তি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ উক্তি বাংলা ভাষায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত। তথাপি ইংরেজী ভাষার অনুকরণে পরোক্ষ উক্তিরও চলন হইতেছে। তাই উক্তি-পরিবর্তনের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষ উক্তি গঠন করিবার নিয়মগুলি মোটামুটি জানা দরকার।

উক্তি-পরিবর্তনের নিয়ম

(১) প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন বা ড্যাস ব্যবহৃত হয়, পরোক্ষ উক্তিতে উহা উঠাইয়া ঐ স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

(২) প্রত্যক্ষ উক্তির বচনার্থক ক্রিয়া উক্তির ভাবানুযায়ী পরিবর্তিত করিতে হয়, অথবা ভাব প্রকাশের সহায়ক নূতন শব্দ চয়ন করিতে হয়।

(৩) প্রত্যক্ষ উক্তিতে উক্তিবাচক ক্রিয়াটি যে কালের হইবে পরোক্ষ উক্তির ক্রিয়াটি সেই কালের করা উচিত, কিন্তু বাংলায় তাহা সব সময়ে হয় না।

(৪) প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনামপদ অনুসারে পরোক্ষ উক্তির সর্বনাম পদের পুরুষ পরিবর্তিত হয়।

(৫) প্রত্যক্ষ উক্তির অদ্য, আগামীকল্য, গতকল্য, এখন, এখানে ইত্যাদি পরিবর্তিত করিয়া সেইদিন, পরদিন, পূর্বদিন, তখন, সেখানে ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়।

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
১। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ সকলেই সঙ্গীত শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীত আরম্ভ হউক।" —বিদ্যাসাগর	১। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে, সকলেই সঙ্গীত শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। রামচন্দ্র অনুমতি করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হইতে পারে।

২। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারারা সব মরিয়া গিয়াছে, গরু আছে ত গাড়োয়ান নাই গাড়োয়ান আছে ত গরু নাই।"
—বঙ্কিমচন্দ্র

২। মহেন্দ্র (তাহাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে পথ হাঁটিতে পারিবে কিনা। তিনি (মহেন্দ্র) জানাইলেন যে বেহারারা....নাই।

৩। হরি বলিল, "ছি, রাম, তুমি একি করিয়াছ! তোমার নাম শুনিলেও ঘৃণা হয়।"
—(C. U. 1934)

৩। হরি রামকে ধিক্কার দিয়া কহিল যে, সে যাহা করিয়াছে তাহা ঘৃণার্হ; তাহার (রামের) নাম শুনিলেও ঘৃণা হয়।

৪। আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার আশা করেন?"

৪। আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি (পুরু) তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার আশা করেন।

(খ) পুরু সগর্বে উত্তর দিলেন, "আমি রাজার মত ব্যবহার পাইতে আশা করি।" —(C.U.1934)

(খ) পুরু সগর্বে উত্তর দিলেন যে, তিনি (পুরু) রাজার মতন ব্যবহার পাইতে আশা করেন।

৫। রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছ? তুমি রুগ্ন, এখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে এই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ বাড়িবে। তুমি আজিকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাও।"
—(C. U. 1951)

৫। শ্যাম নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে কিনা রাম তাহা জানিতে চাহিল। রাম আরও বলিল যে সে (শ্যাম) রুগ্ন এবং তখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে সেই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার অসুখ বাড়িবে। সে যেন সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া যায়।

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
৬। হেমাঙ্গিনী বলিল, আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা আমার কোলে ছেলে পিলে আছে। মাথার উপর ভগবান আছেন। —(C. U. 1952)	৬। হেমাঙ্গিনী জবাব দিল যে তাহার স্বভাব মরণ হইলে যাইবে, তাহার পূর্বে নহে। তিনি তাহাকে (শ্রোতাকে) মনে করিয়া দিলেন যে তিনি মা তাঁহার কোলে ছেলে পিলে আছে এবং মাথার উপর ভগবান আছেন।
৭। রাণার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরে বললেন, 'দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।" পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, "এত বড়ো ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে! জানে না তুই রাণার মেয়ে! ওকে কুকুরের ন্যায় চাবুক মেরে সিধে করতে হয়!" —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭। রাণার মেয়ে তাঁর দাদা পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরে তাঁকে থামতে বললেন। অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে প্রাণে মারা না হয়। পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন যে তার সাহস বড়ো বেশী, তাঁর (রাণার মেয়ের) গায়ে হাত তোলা তার পক্ষে বিস্ময়কর দুঃসাহস। তিনি রাণার মেয়ে একথা না জানা তার পক্ষে হঠকারিতা এবং এর জন্য তাকে চাবুক মেরে সিধে করা উচিত।
৮। পৃথ্বীরাজ তার ঘাড ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, "নে, আমার বোনের জুতো-জোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা—তবে রক্ষে পাবি।—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮। পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে তাচ্ছিল্যভরে তাকে তাঁর বোনের জুতো জোড়া মাথায় করে তাঁর বোনের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন এবং জানালেন যে তাহলেই সে রক্ষা পাবে।

*কেহ কেহ মনে করেন উক্তি-পরিবর্তনে সাধুভাষা ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু এই মত যুক্তিগ্রাহ্য নহে। বক্তার্থক ক্রিয়ার ভাষা প্রযোজ্য।

৯। নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ভয়! আমরা দর্জি পাড়ার ছেলে যমকেও ভয় করিনে, তা জানিস্? কিন্তু, তা বলে ছোট লোকদের dirty পাডার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।" —শরৎচন্দ্র

৯। 'ভয়' শব্দটি পুনরায় উচ্চারণ করিয়া নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বাহাদুরির ভঙ্গীতে জাহির করিলেন যে, তাহারা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকেও ভয় করেন না একথা বোধ হয় তাহার জানা নাই। তিনি জানাইলেন যে, তাহা হইলেও ছোটলোকদের dirty পাডার মধ্যেও তাঁহারা যান না কারণ, সে ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও তাঁহাদের ব্যামো হয়।

১০। বাবা বললেন, তা বলে আমায় ও রকম বলে কেন?
ঠাকুরমা বললেন, তুই কাকে কি বলিস্ সাঁতে; তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ক্ষেপ্‌লি?
—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। বাবা তাঁকে সে রকম বলার কৈফিয়ৎ দাবী করলেন।
ঠাকুরমা বাবাকে নাম ধরে ডেকে ধমকে বললেন যে, কাকে কী বলা উচিত সে কাণ্ডজ্ঞান বাবা বোধহয় হারিয়েছেন। তিনি ক্ষেপেছেন কিনা তাই ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন।

১১। স্মিত আস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্চে কৃত্তিবাসের রামায়ণ।
আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয়নি।"—এস, ওয়াজেদ আলি

১১। স্মিত আস্যে বৃদ্ধ জানালেন যে সেটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ।
তার ঠাকুরদাদা যখন সেটি বটতলায় কিনে-ছিলেন সে অনেক দিনের কথা, তখন তাঁর জন্ম হয়নি।

১২। নতুনদা "তোর নাম কি রে?" ভয়ে ভয়ে বলিলাম,—'শ্রীকান্ত।' তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত শুধু কান্ত, নে, তামাক সাজ্ ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে —তামাক সাজুক।"
—শরৎচন্দ্র

১২। নতুনদা তাচ্ছিল্যভাবে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।
ভয়ে ভয়ে বলিলাম যে আমার নাম শ্রীকান্ত। তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন যে, কান্তর শ্রীটি বাহুল্য মাত্র। শুধু কান্ত নামটি পছন্দ করিয়া তিনি আমাকে তামাক সাজিতে হুকুম করিলেন। তারপর হুঁকো কল্‌কে কোথায় রাখিয়াছে ইন্দ্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তামাক সাজিবার জন্য নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরে আমাকে সেগুলি দিবার আদেশ করিলেন।

বাক্য-সংযোজন ও বাক্য বিযোজন

রচনা নানা ভাবের হইতে পারে। ভাষার নানারূপ পরিপাট্য করা যায়। এক এক জন লেখক এক এক প্রকারের বাক্য দ্বারা বক্তব্য পরিস্ফুট করেন। কেহ বা ছোট ছোট বাক্য দ্বারা ক্রমশঃ বক্তব্য প্রকাশ করেন। কেহ বা দীর্ঘায়িত বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করেন। ছোট ছোট হাল্‌কা বাক্য রচনায় পরিপাট্যে নিখুঁতভাবে, সুন্দরভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। তাহাতে ভাষার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি হয়। লেখকের বক্তব্য যুক্তির দ্বারা ক্রমশঃ ব্যক্ত হয় বলিয়া লেখকের ভাব পাঠক সুন্দররূপে বুঝিতে পারে। আবার কোন কোন লেখক উত্তম উত্তম শব্দ যোজনা করিয়া দীর্ঘ অথচ শ্রুতিমধুর বাক্যের মালা গ্রথিত করেন। সেরূপ লেখা যেমন শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক আবার সেইরূপ লেখা পাঠ করার সময়ে পাঠকের চিন্তাশক্তিরও বিশেষ প্রয়োজন হয়।

যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেইরূপভাবে বাক্য গঠন করিতে হয়। ইচ্ছা করিলেই যাহাতে উভয় রীতিতে রচনা করা যায় সেজন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে সংযুক্ত করা এবং সুবৃহৎ বাক্যের বক্তব্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করার দক্ষতা অনুশীলন-সাপেক্ষ।

ছোট ছোট বহু বাক্যকে একটি বাক্যে গ্রথিত করার নাম **বাক্য-সংযোজন**। বাক্য-সংযোজনে যাহাতে মূল বক্তব্যের কিছুমাত্র হানি না হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

একটি বৃহৎ বাক্যকে ভাঙ্গিয়া আবার ছোট ছোট বহু বাক্য রচনা করা যায়। এক্ষেত্রে বৃহৎ মূল বাক্যটির ভাবগুলি অন্য ভাষায় রূপান্তর করিলেও কোন অংশ যাহাতে বাদ না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন।

সংযোজন

বিযুক্ত বাক্য	সংযুক্তবাক্য
১। রাম অতি ভাল ছেলে। তার বয়স আট বছর। সে রোজ বিদ্যালয়ে যায়। সে মাতাপিতার কথা শোনে।	১। আট বৎসর বয়স্ক অতি ভাল ছেলে রাম রোজ বিদ্যালয়ে যায় ও মাতা-মাতাপিতার কথা শোনে। (যৌগিক)

বিযুক্ত বাক্য	সংযুক্ত বাক্য
২। লোকটির কোন অভিমান নাই। সর্বদা তিনি ঈশ্বরচিন্তা করেন। তিনি ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিয়াছেন। এইরূপ লোককে সকলেই সম্মান করে।	২। নিরভিমান জিতেন্দ্রিয় লোকটি সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন বলিয়া সকলেই তাহাকে সম্মান করে। —সরল
৩। কোথা হইতে এই সঙ্গীতের সুর আসিতেছে? এরূপ সঙ্গীত পূর্বে শুনি নাই। এ সঙ্গীত কিন্নরদের সঙ্গতের ন্যায়। এ সঙ্গীত মনুষ্য ছাড়া অন্য কাহারও কণ্ঠ নিঃসৃত।	৩। এই অশ্রুতপূর্ব মনুষ্যেতর-কণ্ঠ-নিঃসৃত কিন্নর-সঙ্গীতের ন্যায় সঙ্গীতের সুর কোথা হইতে আসিতেছে? —সরল
৪। মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকশিত হইল। চ্যুত-কলিকা অঙ্কুরিত হইল। মলয় মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে কোকিল আহ্লাদিত হইল। কোকিল সহকার শাখায় উপবেশন পূর্বক সুস্বরে কুহু রব করিল। অশোক, কিংশুক প্রস্ফুটিত হইল। বকুলমুকুল উদ্গত হইল। ভ্রমরের ঝঙ্কারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে আমি মাতার সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। (C. U. Inter, 1927)	৪। "একদা মধুসমাগমে কমলবন বিকশিত হইলে, চ্যুত-কলিকা অঙ্কুরিত হইলে, মলয় মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকারশাখায় উপবেশন পূর্বক সুস্বরে কুহু রব করিলে অশোক, কিংশুক এবং ভ্রমরের ঝঙ্কারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে আমার মাতার সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিলাম।" —(সরল) —কাদম্বরী
৫। রামচন্দ্র পিতাকে ভক্তি করিতেন। তিনি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন।	৫। অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনোদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের

	বিযুক্ত বাক্য		সংযুক্ত বাক্য
	পিতৃসত্য পালন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। রামচন্দ্র বনগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সীতাদেবী গমন করিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।		সমভিব্যাহারে বনগমন করিলেন। —সরল
৬।	আমরা বঙ্গ মাতার সন্তান। তিনি জল সম্পদে সমৃদ্ধা। তিনি বহুফল দায়িনী। তাহা স্বত্বেও আজ তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক। ক্ষুধায় উদর জ্বলিতেছে।	৬।	আমরা সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার সন্তান হইয়াও আজ আমাদের কণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষ্ক এবং ক্ষুধায় আমাদের উদর জ্বলিতেছে। —যৌগিক
৭।	তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্বতের তুষার রাশি সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।	৭।	তিনি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করতঃ সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল তুষার রাশি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। —সরল
৮।	এই সেই প্রস্রবণ গিরি। ইহা জনস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই গিরির শিখরদেশ নিরন্তর জলধর-পটলের সংযোগ হয়। সে কারণ ইহা সর্বদা নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত থাকে। ইহার অধিত্যকা প্রদেশ বিবিধ বন পাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকে। উহারা ঘন সন্নিবিষ্ট। এজন্য এই স্থানটি সর্বদা স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। ইহার পাদদেশে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী	৮।	"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরিপাদদেশ নিরন্তর জলধর পটল সংযোগে নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী নদী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে।" —(যৌগিক) —সীতার বনবাস

বিযুক্ত বাক্য	সংযুক্ত বাক্য
প্রসন্ন সলিলা। ইহা তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে বহিতেছে।	
৯। বালকটি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। গুরু মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন; তিনি বালককে মারিলেন না। সে ভয় পাইয়াছিল কিন্তু সে সত্যকথা বলিয়াছিল। এজন্য গুরু মহাশয় তাহাকে সে-বারের মত মার্জনা করিলেন।	৯। বালকটি গুরুতর অপরাধ করিলেও গুরু মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই বালকটির নির্ভীক সত্যকথা বলার দরুন তাহাকে না মারিয়া সেবারের মত মার্জনা করিলেন। —সরল
১০। অনেক শৈবাল আন্দোলিত হইতেছে। এই শৈবালগুলি সমুদ্রজাত। ইহারা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহাদের বর্ণ অপূর্ব। ইহারা নৃত্যচ্ছন্দে আন্দোলিত হইতেছে। ইহারা প্রবাল-প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া আছে।	১০। সমুদ্রজাত অপূর্ব বর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শৈবালগুলি প্রবাল-প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া নৃত্যচ্ছন্দে আন্দোলিত হইতেছে। —সরল
১১। আকবর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। ভারতের রাজাদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি হুমায়ুনের পুত্র। তিনি প্রজাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।	১১। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর হুমায়ুনের পুত্র ভারত বিখ্যাত দিল্লীশ্বর প্রজাবৎসল, বিদ্যোৎসাহী সম্রাট অকবরের মৃত্যু হয়। —সরল
১২। অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব হইল। সমস্ত বনভূমি পুলকিত হইয়া	১২। অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত পুলকিত বনভূমি ও কুসুমাভরণে

বিযুক্ত বাক্য	সংযুক্ত বাক্য
উঠিল। তরুলতা কুসুমাভরণে সজ্জিত হইল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল। (P. U. 1926)	সজ্জিত তরুলতা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। —সরল
১৩। তখন ভর-সন্ধ্যে। গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে। সেই সময়ে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকলেন। তার হাতে প্রদীপ ছিল। ঢুকেই তিনি দেখেন, চার মূর্তি।	১৩। "ভরসন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে সিদ্ধিকরী প্রদীপ হাতে গুহাতে ঢুকেই দেখেন চার মূর্তি।" —অবনীন্দ্রনাথ
১৪। কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হলেন। তিনি বিদুরকে বললেন, গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন। গান্ধারী দূরদর্শিনী ছিলেন।	১৪। "কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন, দূরদর্শিনী গান্ধারীকে ডেকে আন।" —রাজশেখর
১৫। অদ্য শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন করো। ইনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না। ইনি ভূষণপ্রিয়া। ইনি স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না। তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে ইঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।	১৫। "যিনি, তোমাদের জল সেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা অনুমোদন করো।" —বিদ্যাসাগর

বিযোজন

সংযুক্ত বাক্য	বিযুক্ত বাক্য
১। "সেই কষায়বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ পরিবৃত, ব্রত অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।" —দীনেশ সেন	২। (ক) এই রাজকুমার চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। (খ) ইনি ত্যাগী ছিলেন। (গ) ব্রত ও অনশনে ইঁহার অঙ্গ কৃশ হইয়াছিল। (ঘ) ইনি কষায়বস্ত্র পরিধান করিতেন। (ঙ) ইনি সচিববৃন্দ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। (চ) ইনি পাদুকার উপর রাজছত্র ধরিতেন।
২। "বোঝাই গাড়ীসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন।" —রবীন্দ্রনাথ	৩। (ক) রামকানাই অনেকক্ষণ সহ্য করিলেন। (খ) তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। (গ) তাঁহার অবস্থা হতভাগ্য বলদের মত ছিল। (ঘ) বলদ যেমন বোঝাইগাড়ী-সমেত খাদের মধ্যে পড়ে। (ঙ) সে গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খায়।
৩ "এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।" —রামেন্দ্রসুন্দর	৪। (ক) বিদ্যাসাগরের মূর্তি শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে। (খ) ইহা ধবলগিরির মত। (গ) ধবলগিরি চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

সংযুক্ত বাক্য	বিযুক্ত বাক্য
	(ঘ) সে চূড়া অতিক্রম করা বা স্পর্শ করার সাধ্য কাহারও নাই।
৬। "আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল।" —শরৎচন্দ্র	৬। (ক) আমরা গেলাম। (খ) তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ধরিয়াছিলেন। (গ) সেই সঙ্গীতচর্চাতেই গ্রামের কুকুরগুলা আকৃষ্ট হইল। (ঘ) এইরূপ হওয়াই খুব সম্ভবপর ছিল। (ঙ) তাহারা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। (চ) এইরূপ গীত তাহারা পূর্বে শোনে নাই। (ছ) এইরূপ পোশাক তাহারা পূর্বে দেখে নাই। (জ) ইহার ছটায় তাহারা বিভ্রান্ত হইল। (ঝ) এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাহারা তাড়া করিয়াছিল।

বাচ্য

(১) রাম ব্যাকরণ অধ্যয়ন-করিতেছে।

(২) রাম-কর্তৃক ব্যাকরণ অধীত হইতেছে।

(৩) রামের ব্যাকরণ-অধ্যয়ন চলিতেছে।

(৪) এই ব্যাকরণ পুস্তকখানি বাজারে বেশ বিকাইতেছে।

(১) নং বাক্যে 'অধ্যয়ন-করিতেছে' ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা বা কর্তা 'রাম' প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত পদ; কর্ম 'ব্যাকরণ' দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত [অপ্রাণিবাচক শব্দে হওয়ার একবচনে বিভক্তিচিহ্ন থাকে না]; এবং ক্রিয়াপদ পুরুষ ও কর্তাকেই অনুসরণ করিতেছে। এই বচন-ভঙ্গীতে কর্তাই প্রধানরূপে বাচ্য অর্থাৎ তাহার কথাই বাক্যটিতে উক্ত হইয়াছে; তাই তাহাকে বলা হয় কর্তৃবাচ্য।

(২) নং বাক্যে (১) নং বাক্যের কর্ম 'ব্যাকরণ'-এর কথাই প্রধানরূপে উক্ত; তাই উহা প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত পদ। (১) নং বাক্যের কর্তা 'রাম'-এ এখানে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে এবং ক্রিয়াপদ পুরুষ ও বচনে কর্মপদ 'ব্যাকরণ'-কেই অনুসরণ করিতেছে। সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ 'অধ্যয়ন করিতেছে'-এর প্রথমাংশের বিশেষ্য 'অধ্যয়ন' এখানে বিশেষণে [অধীত] পরিণত হইয়াছে। এই বচন-ভঙ্গীতে কর্মই প্রধানরূপে বাচ্য অর্থাৎ কর্মের কথাই উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বলা হয় কর্মবাচ্য।

(৩) নং বাক্যে 'অধ্যয়ন'-এই ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যের প্রাধান্য; 'অধ্যয়ন'-এই ক্রিয়াটি বা ভাবটির কথাই এখানে বাচ্য। অপ্রধান কর্তা 'রাম' এখানে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত এবং অপ্রধান কর্ম 'ব্যাকরণ' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'অধ্যয়ন'-এর সহিত সমাস-বদ্ধ; 'চলিতেছে'-ক্রিয়াপদটি প্রধান-ভাববাচক বিশেষ্য 'অধ্যয়ন'-কে অনুসরণ করিতেছে। এইপ্রকারের বচন-ভঙ্গীকে বলা হয় ভাববাচ্য।

(৪) নং বাক্যটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। প্রত্যক্ষতঃ 'বিকাইতেছে'-ক্রিয়াপদের কর্তা যেন 'পুস্তকখানি'। অথচ অর্থবিচারে দেখা যায় 'পুস্তকখানি'-র বিকাইবার ক্ষমতা নাই, কর্তার বিক্রয়-ব্যাপারে উহা কর্মমাত্র। কিন্তু বাক্যে কর্তার উল্লেখ নাই এবং প্রকৃত কর্তার সন্ধানও মিলে না। এইরূপ বচন-ভঙ্গীকে বলা হয় কর্মকর্তৃবাচ্য।

অতএব বলা যাইতে পারে:

যে বচন-ভঙ্গীতে 'কর্তা'র কথাই প্রধানভাবে উক্ত হয় অর্থাৎ 'কোন্ কর্তা কোন্ ক্রিয়া সম্পাদন করে'—তাহা পরিব্যক্ত হয় তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে; যথা—"নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে",—মধুসূদন; "চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।"—নবীনচন্দ্র; "তব রাজ্যে তুমি এসো চ'লে।"—রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

যে বচন-ভঙ্গীতে কর্মের প্রাধান্য অর্থাৎ কর্মের কথাই প্রধানরূপে উক্ত হয়, কর্মানুগা ক্রিয়া এবং অপ্রধান কর্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, তাহাকে কর্মবাচ্য বলে; যেমন—আমি "জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।"—বিদ্যাসাগর; "বঙ্কিম নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?"—মোহিতলাল; "দুই দণ্ডেই হ'ল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক।"—কবিশেখর।

যে বচন-ভঙ্গীতে ক্রিয়া বা ভাবের প্রাধান্য থাকে, অপ্রধান কর্তায় [উল্লেখিত থাকিলে] **ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং সমাপিকা ক্রিয়া-পদটি সর্বদা প্রথম পুরুষ একবচনের হইয়া থাকে, তাহাকে ভাববাচ্য বলে**, যথা—"মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র: "কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না";—অবনীন্দ্রনাথ; "আমাদের ফিরতে হবে।" "জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?"—শরৎচন্দ্র; "আহার হল না সেদিন।" "আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?" —রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

যে বচন-ভঙ্গীতে কর্মের উপর কর্তৃত্ব আরোপিত হয় অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি-যুক্ত কর্ম-ই ক্রিয়া-সম্পাদন করিতেছে বলিয়া মনে হয় এবং প্রকৃত কর্তার সন্ধান মিলে না, তাহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে; যথা—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"; "শঙ্খ বাজে মন্দিরে মন্দিরে"; "চলে না চরণ",—নবীনচন্দ্র; "ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে।"—রবীন্দ্রনাথ; "খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে";—কালিদাস রায়; "যখন নসীবাবুর তালুকে খাজনা আসে",—বঙ্কিমচন্দ্র।

দ্রষ্টব্য: কর্তৃবাচ্যে কর্তার কথা বলা হয়; অতএব **কর্তা** এখানে **উক্ত** [উহ্য থাকিলেও; যেমন—যাও (কর্তা 'তুমি' **উহ্য** কিন্তু **উক্ত**), "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" (কর্তা 'আমি' **উহ্য** কিন্তু **উক্ত**)], **কর্ম অনুক্ত**। কর্মবাচ্যে কর্মের কথা এবং ভাববাচ্যে ক্রিয়ার্থ বা ভাবের কথা বলা হয়; তাই এই দুই বাচ্যে **কর্তা অনুক্ত**। কর্মবাচ্যে **কর্ম উক্ত**। **অনুক্ত কর্তা ও উক্তকর্মের বিভক্তি লক্ষণীয়** [কারক ও বিভক্তি অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

সংস্কৃতে মাত্র অকর্মক ক্রিয়াই ভাববাচ্য হয়; ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হইতে পারে অথবা কৃদন্ত বিশেষ্যের প্রয়োগে কর্তার তৃতীয়া এবং কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করিতে হয়; যেমন—কর্তৃবাচ্যে: শিশু দুগ্ধং পিবতি, কর্মবাচ্যে: শিশুনা দুগ্ধং পীয়তে; অথবা শিশুনা দুগ্ধস্য পানং [ইহার সহিত আবার 'ভবতি' যোগ করিলে কর্তৃবাচ্য হইবে]। কিন্তু বাঙ্‌লায় সকর্মক ক্রিয়ারও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়; তখন কর্মপদটি হয় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত সমাসবদ্ধ থাকে না হইলে দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত অবস্থায় স্বরূপেই বর্তমান থাকে; যথা—তোমাদের ক'নে দেখা বা ক'নেকে দেখা হ'ল? আমার—হ'ল না তোমায়-পাওয়া বা তোমায় পাওয়া।' প্রসঙ্গ হইতে বক্তার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া বাঙ্‌লায় বাচ্যনির্ণয় করিতে হয়। 'তোমার কথা বলা হ'ল? এবং তোমার কথা বলা হ'ল? বাক্য দুইটিতে বক্তার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। প্রথম বাক্যে কৃদন্ত বিশেষ্য 'বলা' প্রধানভাবে উক্ত হওয়ায় ভাববাচ্য এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'কথা' উক্ত কর্ম আর 'বলা' কৃদন্ত বিশেষণ বলিয়া কর্মবাচ্য বলিতে হয়।

বাচ্যপরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
১। "তোমরা সকলে অনুমোদন করো।" —বিদ্যাসাগর	তোমাদের সকলের দ্বারা অনুমোদিত হউক।
২। "আমি তাহা দেখি নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র	আমার তাহা দেখা হয় নাই।
৩। "সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন।" —রাজকৃষ্ণ মুখো:	সৃষ্টিকর্তার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দত্ত [বা দেওয়া] হইয়াছে।
৪। "আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।" —জগদীশচন্দ্র	আমাদের দ্বারা....করিয়া নির্মিত হউক।
৫। "বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন।"—রবীন্দ্রনাথ	বঙ্কিমের নিজের দ্বারা....বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পিত হইয়াছে অন্যের নিকট সে সেইরূপ শ্রদ্ধা পাইবে ইহাই তাঁহার প্রত্যাশা ছিল।

কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্য

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
১। "জেলে ঘরে যায়।"—অক্ষয় বড়াল	জেলের ঘরে যাওয়া হয়।
২। "জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা।"—যতীন্দ্রমোহন বাগচী	জটলা চলে [বা হয়] .... বালকদের।
৩। "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পারবি ?"	মাঝি, আজ কতদূর যাওয়া যাবে ?
৪। "অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।"—রবীন্দ্রনাথ	..............বাড়ি ফেরা হইল।
৫। "আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে।"—শরৎচন্দ্র	.. .. একটু বেড়িয়ে আসা হবে।

কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১। [আমি] জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি।"বিদ্যাসাগর	[আমাকে জড়তা নিতান্ত অভিভূত করিতেছে।
২। "নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইল।"—বঙ্কিমচন্দ্র	নবকুমারকে.......বিসর্জন করা হইল।
৩। "কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।" —রবীন্দ্রনাথ	কারও তা ঠাহর হয় নাই।
৪। "বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে।"—বিবেকানন্দ	....সংঘর্ষ ভারতকে . বিনিদ্র করিতেছে।
৫। "এসকল তাহার পরের কাছে কত-দিনের শোনা।"—শরৎচন্দ্র	এ সকল সে পরের কাছে কতদিন শুনিয়াছে।

ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে

	ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১।	"খাবার সময় বুঝা যাবে।" —(বঙ্কিমচন্দ্র)	খাবার সময় বুঝিব।
২।	"হয়তো বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না।"	.... হইতে পারিব না।
৩।	"জানোয়ারের মতো ব'সে থাকা হ'চ্ছে কেন?" —(শরৎচন্দ্র)	... ব'সে র'য়েছ [বা আছ বা থাকছ] কেন?
৪।	"[তাঁর] আহার হ'ল না সেদিন।"	[তিনি] আহার ক'রলেন না ..।
৫।	"আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?" —(রবীন্দ্রনাথ)	আমি বাস করি ....।

কর্মকর্তৃবাচ্যের বাচ্যান্তর

সময়ে সময়ে কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াপদকে কর্মবাচ্যের বা [কর্তার সন্ধান করিতে পারিলে] কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করিয়া প্রয়োগ করা হয়।

	কর্মকর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১।	শঙ্খ বাজে মন্দিরে মন্দিরে।	শঙ্খ বাজান হয় মন্দিরে মন্দিরে।	[ভক্তেরা] শঙ্খ বাজায় মন্দিরে মন্দিরে।
২।	পা আর চলে না	পা আর চালান যায় না	পা আর চালাতে পারে না [সে বা তারা] অথবা পারি না [আমি বা আমরা]।

বাক্য বিশ্লেষণ

সরল বাক্য

[সরল বাক্যের সংজ্ঞা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।]

সরল বাক্যে একটিমাত্র কর্তা ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। এই কর্তাই হইলে উদ্দেশ্য-পদ। বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয় তাহাকে উদ্দেশ্য বলে এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয় তাহাকে বিধেয় বলে।

"আমি তাহা দেখি নাই"—(বঙ্কিমচন্দ্র) একটি সরল বাক্য। ইহাতে আমি সম্বন্ধে 'তাহা দেখি নাই'—কথা কয়টি বলা হইয়াছে; অতএব 'আমি' উদ্দেশ্য এবং 'তাহা দেখি নাই' বিধেয়। বিধেয়-অংশে 'দেখি নাই' সমাপিকা ক্রিয়া এবং 'তাহা' সকর্মক-ক্রিয়া 'দেখি নাই'-এর কর্ম। উদ্দেশ্যের সহিত উহার সম্প্রসারক [Adjuncts] পদ বা পদ সমূহ থাকিতে পারে। বিশেষণ বা বিশেষণ-স্থানীয় পদ বাক্যাংশ দ্বারা সম্প্রসারণ কার্য সাধিত হয়। বিধেয়াংশে সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক হইলে উহার কর্ম থাকে এবং কর্ম ও ক্রিয়া উভয়েরই সম্প্রসারক পদ বা বাক্যাংশ থাকিতে পারে। সমাপিকা ক্রিয়াটি অসম্পূর্ণার্থক হইলে অনুপূরক থাকিবে; অকর্মক ক্রিয়ার অনুপূরক হইবে কর্তৃসম্বন্ধী, আর সকর্মক ক্রিয়ায় হয় কর্মসম্বন্ধী। নিম্নে সরল বাক্য বিশ্লেষণের একটি তালিকা দেওয়া হইল:

উদ্দেশ্য		বিধেয়			
উদ্দেশ্য-পদের সম্প্রসারক [Adjuncts to the Subject word]	উদ্দেশ্য-পদ [Subject word]	সমাপিকা ক্রিয়া [Finite-Verb]	সম্প্রসারকসহ কর্মপদ [Subject with Enlargement	সম্প্রসারকসহ অনুপূরক [Complements with Enlargements]	বিধেয় সম্প্রসারক বা ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় সম্প্রসারক [Adjunct to the Predicate বা Adverbial Adjuncts]
১। "আমার	স্বামী	হইয়াছেন		রাজা"	
২।	"আমরা	ভুলিয়া যাই	তাহা		আত্মাভিমানে সর্বদা"
৩। "ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী	স্ত্রী	মারা গেলেন			সাতদিনের জ্বরে"
৪।	"বিধি	করিল	তোমারে	ভিক্ষুকের প্রতিনিধি।"	

জটিল বাক্য

একটি প্রধান উপবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা অধীন বা সাপেক্ষ উপবাক্য লইয়াই জটিল বাক্য গঠিত হয়। সাপেক্ষ উপবাক্য তিন শ্রেণীতে

বিভাজ্য—(১) বিশেষ্য উপবাক্য, (২) বিশেষণ উপবাক্য এবং (৩) ক্রিয়া-বিশেষণ-উপবাক্য। জটিল বাক্যের সাধারণ বিশ্লেষণে [Simple Analysis or Clause-Analysis] 'উপবাক্য'গুলিকে পৃথক করিয়া তাহাদের পারস্পারিক সম্পর্ক দেখাইতে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণে [Detailed Analysis] প্রত্যেকটি উপবাক্যকে আবার সরল বাক্যের মত বিশ্লেষিত করিতে হইবে। নিম্নে নমুনা দেওয়া হইল :

বাক্যেরপ্রকার — জটিল সবিশেষ বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য			বিধেয়				
উপ-বাক্য সমূহ	উদ্দেশ্য-পদের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য-পদ বা বাক্যাংশ	সমাপিকা ক্রিয়া	সম্প্রসারক-সহ কর্মপদ	সম্প্রসারক-সহ অনুপূরক	বিধেয়-সম্প্রসারক বা ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয়-সম্প্রঃ	উপবাক্যের স্বরূপ
(ক)	—	ইহা…করা	[হয়]-উহ্য	—	বিশেষ ক্ষমতার-'কার্য'	—	প্রধান-উপবাক্য
(খ)		শিক্ষিত ব্যক্তির [অনুক্ত কর্তা]	করা যাইতে পারে	তাহাকে	সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে 'নিযুক্ত'		সাপেক্ষ বিশেষ্য-উপবাক্য, (ক) এর অন্তর্গত 'ইহা'-র সমকারক।
(গ)		বঙ্গভাষা	ছিল			তখন, যে-অবস্থায়	সাপেক্ষ বিশেষণ-উপবাক্য, (খ) এর অন্তর্গত 'তাহাকে' বিশেষণ

"তখন বঙ্গভাষা যে-অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাব-প্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য।" —(রবীন্দ্রনাথ)

সাধারণ বিশ্লেষণ

প্রদত্ত **জটিল** বাক্যটি নিম্নলিখিত উপবাক্য সমূহে বিভাজ্য :

(ক) ইহা বিশ্বাস .... কার্য—**প্রধান** উপবাক্য [Principal clause]।

(খ) তাহাকে যে .... যাইতে পারে—**সাপেক্ষ** বিশেষ্য-উপবাক্য [Subordinate Noun clause], (ক)-এর অন্তর্গত 'ইহা'র সম-কারক।

(গ) তখন বঙ্গভাষা ... ছিল—**সাপেক্ষ** বিশেষণ-উপবাক্য [Subordinate Adjective Clause], (খ)-এর অন্তর্গত সর্বনাম 'তাহাকে'-র বিশেষণ।

যৌগিক বাক্য

১। "সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না।" —শরৎচন্দ্র

সাধারণ বিশ্লেষণ

প্রদত্ত যৌগিক বাক্যটি নিম্নলিখিত **স্বাধীন** বা **নিরপেক্ষ** উপবাক্য-সমূহে বিভাজ্য :

(ক) সেদিন দিনের ... কাটিল।

(খ) [সেদিন] প্রথম....কাটিল। —সমন্বয়ী অব্যয় উহ্য।

(গ) প্রভাতের জন্য ... পারিল না। —সমন্বয়ী অব্যয় 'কিন্তু'।

[সবিশেষ বিশ্লেষণে জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণের নমুনা দ্রষ্টব্য।]

লক্ষণীয় : অনেক সময়ে জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে গঠিত বৃহত্তর যৌগিক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে প্রথমে যৌগিক বাক্যের নিয়মে বিশ্লেষিত করিয়া পরে জটিল অংশকে জটিল বাক্যের নিয়মে বিশ্লেষিত করিতে হয়।

"পরে তিনি যখন প্রত্যাগত হইলেন তখন সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল ; শ্রীও তাহাই করিল।" —বঙ্কিমচন্দ্র

এই যৌগিক বাক্যটির ২টি অংশ ; যথা—

(ক) পরে তিনি .... গ্রহণ করিল ;

(খ) শ্রী-ও তাহাই করিল ; সমন্বয়ী অব্যয়—উহ্য।

(ক) একটি জটিল বাক্য এবং নিম্নলিখিত উপবাক্যে বিভাজ্য :

(ক)-১। তখন সন্ন্যাসিনী ··· গ্রহণ করিল — প্রধান উপবাক্য।

(ক)-২। পরে তিনি ··· হইলেন—সাপেক্ষ ক্রিয়াবিশেষণ উপবাক্য, (ক)-১-এর অন্তর্গত 'গ্রহণ করিল' ক্রিয়াপদের কালবাচক বিশেষণ।

অনুশীলনী

১। উক্তি পরিবর্তন কর :—

(ক) "দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন অপরাধই দেখতে পাই না।" —রাজশেখর

(খ) "কাঙালী জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা ?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি। কই দেখি তোর হাঁড়ি ?" —শরৎচন্দ্র

(গ) 'ইন্দ্র বলিল, "তুই ক্ষেপেচিস্, শ্রীকান্ত ? তোর দোষ কি ? তুই কেন যাবি ?"

আমি বলিলাম, "তোমারই বা দোষ কী ইন্দ্র ? তুমিই বা কেন যাবে ?"

ইন্দ্র কহিল, "আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুন-দাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।" —শরৎচন্দ্র

(ঘ) 'মিছু সর্দার বললে. "হুজুর, আগেই বলেছিলাম, ও বেটা যাদু জানে, এখন তো দেখলেন যে আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে ?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে !" —প্রমথ চৌধুরী

(ঙ) 'নিন্দুক বলিয়া উঠিল, "মহারাজ পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি ?"

রাজার চমক লাগিল ; বলিলেন, "ঐ যাঃ ! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।" ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।" —রবীন্দ্রনাথ

(চ) "নতুন-দা [ইন্দ্রকে]—তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক্, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমাকে থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধ'রেচে।

ইন্দ্র—তাদের বাজাবার লোক আছে, নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।"

—শরৎচন্দ্র

(ছ) "ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপর ব'সে। তেনার আঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখ্‌লে রে।" —শরৎচন্দ্র

(জ) "স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্মানুমত আদেশ করুন।" —বঙ্কিমচন্দ্র

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বিশ্লেষিত কর :—

(ক) "প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।" —বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) "যিনি, তোমাদের জল সেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।" —বিদ্যাসাগর

(গ) কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।" —আচার্য জগদীশ চন্দ্র

(ঘ) "ভীষ্মাদি তোমার অন্নে পালিত, সেজন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখতে পারবেন না।" —রাজশেখর

(ঙ) "ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই।" —রবীন্দ্রনাথ

(চ) বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।" —রবীন্দ্রনাথ

(ছ) "জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।" —শরৎচন্দ্র

(জ) "অধিক দিনের কথা নয়, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সাধারণের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে মরা ও বাঁচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থা আছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।" —জগদানন্দ রায়

৩। গঠন-প্রণালী অনুসারে বাক্য কত প্রকারে বিভক্ত ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণীভেদ উদাহরণযোগে পরিস্ফুট কর।

৫। 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬। বাচ্য কাহাকে বলে? উহা কতপ্রকারের ও কী কী? প্রত্যেকটি বাচ্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর এবং উদাহরণ দাও।

৭। অর্থ অপরিবর্তিত রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে নির্দেশানুসারে রূপান্তরিত কর:—

(ক) "বিশেষ চিন্তা ক'রেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন অপরাধই দেখতে পাই না।" —রাজশেখর

(বাচ্যান্তরিত কর।)

(খ) "ইন্দ্র আভাস দিলেও আমি.......রাজি হইলাম না।" —শরৎচন্দ্র

(মিশ্রবাক্যে পরিণত কর।)

(গ) "নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।" —রবীন্দ্রনাথ

(যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত কর।)

(ঘ) "উচ্চ-নীচ নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তমধ্যে পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।" —রবীন্দ্রনাথ

(নাস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত কর।)

(ঙ) "শৃঙ্খলাকে তারা শৃঙ্খল বলিয়া মনে কর না।" —কালিদাস রায়

('শৃঙ্খলা' কে কর্তৃপদরূপে ব্যবহার কর।)

(চ) "কমলাকান্তের মনের কথা আর এ জন্মে বলা হইল না —বঙ্কিমচন্দ্র
(বাচ্যান্তরিত কর।)

(ছ) "এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।" —রামেন্দ্রসুন্দর (জটিল বাক্যে পরিবর্তিত কর।)

(জ) "যেখানে গম্ভারভাবের কোন আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।" —রবীন্দ্রনাথ (সরল বাক্যে রূপান্তরিত কর।)

(ঝ) "ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না।"
—কালিদাস রায় (মিশ্র বাক্যে পরিবর্তিত কর।)

(ঞ) "সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে।" —রবীন্দ্রনাথ (বাচ্যান্তর সাধন কর)।

(ট) "সুরজমল হেসে বললেন—বেশ আজকের মত ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্, কিন্তু কাল সকালে আমি প্রস্তুত থাকব।" —অবনীন্দ্রনাথ (পরোক্ষ উক্তি দিতে হইবে।)

(ঠ) উহা "কোনও কালে সজীব ছিল না।" —জগদানন্দ
(অস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত কর।)

(ড) "কাহারও সাধ্য হয় নাই যে সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।" —রামেন্দ্রসুন্দর
(সরল বাক্যে পরিণত কর।)

(ঢ) "অন্ধকার ঢেকে নিল চারজনকেই।"—অবনীন্দ্রনাথ (বাচ্যান্তর করিতে হইবে।)

(ণ) "সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল।" —শরৎচন্দ্র (নাস্ত্যর্থক কর।)

(ত) "আমাদের নৈরাশ্য উপস্থিত হয়।" —রবীন্দ্রনাথ
('আমাদের স্থলে 'আমরা' ব্যবহার কর।)

(থ) "ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।"—শরৎচন্দ্র (নেতিবাচক কর।)

(দ) "তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না।" —রবীন্দ্রনাথ (সদর্থক কর।)

(ধ) "এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই।" —জগদানন্দ
(জটিল বাক্যে রূপান্তরিত কর।)

(ন) "আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন।" —রাজশেখর
(বাচ্যান্তর কর।)

(প) "বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?"—বঙ্কিমচন্দ্র (প্রশ্ন পরিহার কর।)

(ফ) "বালির উপর দৌড়ান যায় না।" —শরৎচন্দ্র (বাচ্যান্তর কর।)

(ব) "যাঁদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না"—প্রমথ চৌধুরী (অস্ত্যর্থক কর।)

(ভ) "আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।" —রাজশেখর
(কর্মবাচ্যের রূপ দাও।)

(ম) "হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।" —বঙ্কিমচন্দ্র
(বাচ্যান্তর কর।)

শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

১। শব্দের যে শক্তিবলে তাহার মূলগত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি প্রকাশিত হয় তাহাই **অভিধা**। এই **অভিধা**-বলে প্রকাশিত অর্থকে **অভিধেয়ার্থ** বা **মুখ্যার্থ** বা **বাচ্যার্থ** বা **শক্যার্থ** বলা হয়; যেমন—চোখ = **দর্শনেন্দ্রিয়**; '**দর্শনেন্দ্রিয়**', অর্থটিই হইল বাচক 'চোখ'-শব্দের **অভিধেয়ার্থ** বা **বাচ্যার্থ** বা **মুখ্যার্থ** বা **শক্যার্থ**।

২। কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ভাবরাশি অভিব্যক্ত করিতে হইলে প্রায়শঃ **বাচ্যার্থের** উপর নির্ভর করা চলে না; বাচ্যার্থ-দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষিত নূতন অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। শব্দের যে শক্তিবলে এই নূতন অর্থটি লক্ষিত হয় তাহারই নাম **লক্ষণা** এবং **লক্ষণা**-বলে পরিব্যক্ত অর্থটিকে বলা হয় **লক্ষ্যার্থ**। ছেলেটির দিকে **চোখ** রেখ—এখানে 'চোখ' = '**দৃষ্টি**' বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য। এই অর্থ 'চোখ'-এর **বাচ্যার্থ দ্বারা লক্ষিত** বলিয়া ইহাকে বলা হয় **লক্ষ্যার্থ**। ভাষায় এইরূপ অনেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের **লক্ষ্যার্থে** প্রয়োগ রহিয়াছে। সূক্ষ্মতর ভাবের প্রকাশ বলিয়া **লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থ** অপেক্ষা সুন্দরতর।

৩। অনেক স্থলে আবার শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সূক্ষ্মতায়, নূতনত্বে ও সৌন্দর্যে উহার **লক্ষ্যার্থ**-কেও অতিক্রম করে। শব্দের এই অর্থকেই বলা হয় **ব্যঙ্গ্যার্থ** এবং যে শক্তিবলে শব্দের ঈদৃশ অর্থ দ্যোতিত হয় তাহারই নাম **ব্যঞ্জনা**। 'চোখের চামড়া = **লজ্জা**; **অভিধা** বা **লক্ষণা** দ্বারা এই অর্থ পাওয়া যাইবে না। কেননা 'চোখের চামড়া'-র মূলগত অর্থের সহিত লজ্জার কোন সম্বন্ধ নাই এবং দূরগত কোন বন্ধনও লক্ষ্য করা যায় না। অনুভব-বিশ্লেষণে এই অর্থের ব্যঞ্জনা। চোখের উপর চামড়ার পরদা আছে বলিয়াই আমরা চোখ বন্ধ করিতে পারি এবং লজ্জার অনুভূতিতে আমরা মাথা নোয়াই ও চোখ বন্ধ করি। চোখের চামড়ার পরদাটি না থাকিলে চোখ দুইটি ড্যাব্-ড্যাব্ করিত। লজ্জানুভবের ব্যঞ্জনা ঘটিত না। তাই 'চোখের চামড়া' **ব্যঞ্জক** এবং '**লজ্জা**' ব্যঙ্গ্যার্থ।

বাঙলায় **লক্ষ্যার্থে** ও **ব্যঙ্গ্যার্থে** অগণিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ রহিয়াছে।

ইহাতেই ভাষার অর্থগৌরব এবং সাহিত্যের সুষমা সাধিত হয়। বাঙ্‌লা বাগ্‌ভঙ্গী ও প্রবচনে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখিত হইল :—

অন্ধের যষ্টি (অন্ধের একমাত্র সাহায্য), অরণ্যে রোদন (ব্যর্থ চেষ্টা), অগস্ত্য যাত্রা (চিরতরে প্রস্থান), আকাশ-কুসুম (অলীক), আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড), আমড়াগাছি (তোষামোদ), ইঁচড়ে পাকা (অকাল-পক্ক), কাণ-পাতলা (যা শোনে তাই বিশ্বাস করে), কাণ-ভারী করা (লাগানো), কুম্ভকর্ণ (অতিনিদ্রা), খয়ের-খাঁ (=ধামাধরা), খই ফুটান (অনর্গল বকা), গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ত্রুটি), গোবরগণেশ (অপদার্থ, জড), অমাবস্যার চাঁদ=ডুমুরের ফুল (দেখা পাওয়া যায় না), অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা), আকাশ থেকে পড়া (বিস্ময়ের ভাণ করা), আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ (ছোট থেকে হঠাৎ বড়লোক), আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা), আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বশক্তি প্রয়োগ করা), আদায়-কাঁচকলায়=সাপে-নেউলে (পরস্পর প্রবল শত্রু), আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকর্মণ্য বাচাল), আলালের ঘরের দুলাল (ধনীর আদরের সন্তান), উত্তম-মধ্যম (বিলক্ষণ প্রহার), একাদশে বৃহস্পতি (চরম সৌভাগ্যকাল), কলুর বলদ (অন্ধ শ্রমী), কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা), কেঁচে গণ্ডূষ (পুনরায় আরম্ভ), গোকুলের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী ও পরের অনিষ্টকারী), গোবরে পদ্মফুল (অস্থানে উত্তম বস্তু ও নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি), গোঁফ-খেজুরে=পি-পু-ফি-শু (অত্যন্ত অলস), চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়), চুনো-পুঁটি (নগণ্য লোক), জিলিপির প্যাঁচ (কুটবুদ্ধি), টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া), ঠোঁট-কাটা (লজ্জাহীন স্পষ্টবাদী), তাল-কাণা (মাত্রাজ্ঞান-হীন), তাসের ঘর (ভঙ্গুর), তীর্থের কাক (প্রত্যাশী), ধরাকে সরা জ্ঞান (অতিগর্ব প্রকাশ), ননীর পুতুল=মোমের পুতুল (শ্রম বা কষ্ট সহনে অক্ষম), পায়া ভারী (গর্ব), পোয়া-বারো (চরমসৌভাগ্য), পুকুর চুরি (অসম্ভব চুরি), বক-ধার্মিক=বিড়াল-তপস্বী=তুলসীবনের বাঘ (ভণ্ড), বর্ণচোরা (বাহ্যরূপে যার অন্তর অজ্ঞেয়), বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (অকস্মাৎ অভাবিত বিপৎপাত), বুকের পাটা (সাহস), ব্যাঙের আধুলি (কষ্টের স্বল্প সঞ্চয়), মগের মুলুক (অরাজক দেশ), মাটির মানুষ (নিরীহ শান্তপ্রকৃতির ব্যক্তি), মুখচোরা (লাজুক), যমের অরুচি=যমের কৃমি (যাহার মরণ কাম্য), রাঙ্গা মূলা =শিমুল ফুল (নির্গুণ রূপবান্‌), শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট), সাত-পাঁচ (নানা কথা) সাত-সতেরো (ঘোরপ্যাঁচ), সোণায় সোহাগা=মণি-কাঞ্চন যোগ (এক ভালোর সঙ্গে

আর এক ভালোর যোগ), হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খল), হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা (গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা), হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল অথবা করায়ত্ত বস্তু), হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (আয়ত্ত সুযোগ উপেক্ষা করা)।

অর্থসঙ্কোচ—শব্দের ব্যাবহারিক অর্থের পরিধি মৌলিক অর্থের পরিধি অপেক্ষা ক্ষীণতর হইলে, শব্দার্থের এই পরিবর্তনকে **অর্থসঙ্কোচ** বলে ; যথা—**মন্দির** [মৌলিক অর্থ 'গৃহ'-র পরিধি অপেক্ষা ব্যাবহারিক অর্থ 'দেবগৃহ'-র পরিধি ক্ষীণতর]। সকল যোগরূঢ় শব্দে **অর্থসঙ্কোচ** রহিয়াছে।

অর্থের প্রসার—শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ মৌলিক অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর হইলে, শব্দার্থের এই পরিবর্তনকে **অর্থের প্রসার** বলা হয় ; যথা—গাঙ্‌ [মৌলিক অর্থ 'গঙ্গা' অপেক্ষা ব্যাবহারিক অর্থ 'বড নদী' ব্যাপকতর]। বিভীষণ [মৌলিক অর্থ 'রাবণের অনুজ' অপেক্ষা ব্যাবহারিক লক্ষ্যার্থ 'গৃহশত্রু' ব্যাপকতর।

অর্থোৎকর্ষ বা **অর্থের উন্নতি**—শব্দের মৌলিক অর্থ অপেক্ষা ব্যাবহারিক অর্থে মহত্তর বা অধিক রুচিকর পদার্থ বুঝাইলে শব্দের **অর্থোৎকর্ষ** বা **শব্দার্থের উন্নতি** ঘটিয়াছে বলিতে হয় ; যথা—মন্দির [মৌলিক অর্থ 'গৃহ' অপেক্ষা ব্যাবহারিক অর্থ 'দেবগৃহ'-র মাহাত্ম্য অধিক], সন্দেশ [মৌলিক অর্থ 'সংবাদ' হইতে 'মিষ্টি খাবার' অধিক রুচিকর]।

অর্থাপকর্ষ বা **অর্থের অবনতি**—শব্দের ব্যাবহারিক অর্থে উহার মৌলিক অর্থ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পদার্থ বুঝাইলে **শব্দার্থের অবনতি** বা **অর্থাপকর্ষ** ঘটিয়াছে বলা হয় ; যথা—গাঙ্‌ [ব্যাবহারিক অর্থ 'বড নদ' হইতে মৌলিক অর্থ 'গঙ্গা'-র মাহাত্ম্য অধিক]।

লক্ষণীয় : শব্দার্থের 'সঙ্কোচ' ঘটিলে 'উন্নতি' এবং 'প্রসার' ঘটিলে 'অবনতি' হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

১। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কাহাকে বলে ?

২। শব্দের বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রভেদ উদাহরণযোগে পরিস্ফুট কর।

৩। শব্দার্থের সঙ্কোচ, প্রসার, উন্নতি ও অবনতি কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

অলঙ্কার-প্রকরণ

সাহিত্য সৃষ্টির বা রচনা শ্রুতিমধুর এবং বাক্য ও ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ করার কয়েকটি উপায় আছে। যুগে যুগে সাহিত্যিকদের লেখনী হইতে কতপ্রকার লিপিকৌশল প্রকাশিত হইযাছে। সেই সকল কৌশলকে বলে **অলঙ্কার**। গহনা যেমন শরীরের সৌন্দর্য সাধন করে, এই সকল অলঙ্কাব তেমনি রচনাকে শ্রীসম্পন্ন করে।

তবে মনে রাখিতে হইবে, অলঙ্কার পরিধান করা আর রচনায অলঙ্কার প্রয়োগ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিযাছে। ভাব অলঙ্কার গ্রহণ করিযাই লেখকদের লেখনীমুখে প্রকাশিত হয। লেখকের মনের মধ্যে নেপথ্যে সাজঘরে অলঙ্কারের ব্যবস্থা থাকে। আগে রচনা করিয়া পরে অলঙ্কার যোগ করা যায না। কাজেই অলঙ্কার প্রয়োগ লেখকেব রচনাভ্যাসের অঙ্গীভূত ব্যাপার।

বক্তব্য বিষয় সুন্দর করিয়া বলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা, যত্ন ও প্রতিভার প্রয়োজন। একটি গল্প আছে, একবার বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসকে বিব্রত করিবার জন্য একটি ব্যবস্থা হয। রাজসভার সম্মুখে একটি শুষ্ক কাষ্ঠ রাখিয়া তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কালিদাসকে সুন্দর একটি উক্তি করিতে বলা হয়। যিনি এই প্রস্তাব করেন তিনি বক্তব্য এইভাবে ব্যক্ত করেন—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" তাঁহাব কৌশলে ঐ তিষ্ঠতি ও অগ্র এই দুই শব্দের সন্ধি দ্বারা তৈয়ারী—"তিষ্ঠত্যগ্রে"-শব্দের প্রয়োগ পর্যন্ত। কালিদাস কিন্তু তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "নীরস তরুবর পুরতো ভাতি।" তাঁহার শব্দ প্রযোগে অনুপ্রাস আসিযা বক্তব্য সুললিত করিয়া দিল। 'র' ও 'ত' বর্ণের বহুল প্রযোগ দ্বারা এই মাধুর্য কবির মনের ভাণ্ডারেই সৃষ্ট হইযা বাহিরে প্রকাশিত হইল।

বচনা মাধুর্য-মণ্ডিত ও সুখপাঠ্য করার বহু রীতি আছে। সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে।

> "উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌববম্।
> নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রযোগুণাঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে কালিদাস উত্তম উপমা-প্রয়োগে নিপুণ, ভাববি যাহা লেখেন তাহার অর্থগৌরব আছে অর্থাৎ তাঁহার রচনা সুন্দর সুন্দর অর্থ ব্যক্ত করিয়া পাঠকের মন

ভুলায়। নৈষধ-চরিতের রচনাকারের রচনায় শ্রুতিমধুর শব্দ-যোজনা থাকে, আর মাঘের রচনায় এই তিন প্রকার বিশেষত্বই দেখা যায়। অর্থাৎ মাঘের রচনা বৈচিত্র্যময় ও এই তিনজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাক্‌পটুতার জন্য সামান্য বিষয়ও কেমন রসাল ও সুন্দর হয় তাহার উদাহরণস্বরূপ আরেকটি বাক্য উদ্ধৃত করিব। বামাভিষেকে হেমঘট তরুণীর বক্ষচ্যুত হইয়াছিল, উহা সোপান হইতে পড়িবার সময়ে "ঠনননং ঠঠং ঠং ঠনননং ঠঠং" শব্দ করিয়া শেষে "ছঃ" এই শব্দ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটু কৌশল আছে। 'ছঃ' শব্দ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ। কাজেই উক্তিটি যথেষ্ট চাতুর্যপূর্ণ ও আনন্দজনক।

অলঙ্কার দুই প্রকার

শব্দ ও অর্থভেদে অলঙ্কার দুই প্রকার; **শব্দালঙ্কার** ও **অর্থালঙ্কার**। শব্দের বৈচিত্র্য দ্বারা শব্দালঙ্কার সৃষ্ট হয়। শব্দের প্রয়োগ, ধ্বনি বা উচ্চারণের উপরই এই অলঙ্কার নির্ভরশীল। আর অর্থের বিচিত্রতা সম্পাদন, অর্থের দ্বারা চিত্র-অঙ্কন, অর্থকে প্রস্ফুট করার বিবিধ কৌশলকে অর্থালঙ্কার বলে।

শব্দালঙ্কার

১। **ধ্বনি-বৃত্তি**ঃ—শব্দের বা বাক্যের উচ্চারণের ধ্বনি দিয়া অর্থের আভাস দেওয়া হইলে তাহাকে **ধ্বনিবৃত্তি অলঙ্কার** বলে। হেমঘট পতনের যে শব্দের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহাতে ধ্বনিবৃত্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ করা হইয়াছে :—"**ঠনননং ঠঠং ঠং ঠনননং ঠঠং ছঃ**"—হেমঘট সোপানে গড়াইয়া কিভাবে শেষে জলে গিয়া পড়িল তাহার আভাসই দেওয়া হইয়াছে।

> "চরকার ঘর্ ঘর্ পল্লীর ঘর ঘর।
> ঘর ঘর খির দীপ—আপনার নির্ভর।"

এখানে চরকা ঘোরার শব্দের অবিকল ধ্বনি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

> "ঘড়িতে বারোটা বাজে
> বরোফ, বরোফ—লোপ।"

নিস্তব্ধ রজনীতে বরোফওয়ালার আকস্মিক ধ্বনি ও তাহার পর নিস্তব্ধতা কাব্যে অবিকল অনুকৃত হইয়াছে।

"চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিযা।
কচব মচর চব্য চিবিযা॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিযা।
চুমুকে চক্ চক্ পেয পিয়া॥"

উদ্ধৃতিতে ক্ষুধার্ত শিবের অন্নপূর্ণা কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ খাদ্য ভক্ষণের শব্দ সুন্দর ভাবে অনুকৃত হইযাছে।

*২। **অনুপ্রাস** :—একই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির পুনঃপুনঃ প্রযোগ একটি ধ্বনি-মাধুর্যের সৃষ্টি করে—ইহাকেই **অনুপ্রাস** বলে।

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে"
"তৈল তূলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপনে।" —মুকুন্দরাম

এখানে 'গ' বর্ণটির ও 'ত' বর্ণটির পুনঃপুনঃ প্রযোগে পঙ্ক্তিদ্বয শ্রুতিমধুর হইযাছে।

"মধুমাসে মলয-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিযে মকরন্দ॥ —মুকুন্দরাম

'ম'-এর অনুপ্রাস।

অনুপ্রাস রচনা মাত্রেই প্রায়শঃ দেখা যায, ইহার অতিরিক্ত ব্যবহার রচনার সৌন্দর্য নাশ করে, রচনাকে আড়ষ্ট করে ; এজন্য ইহার পরিমিত ব্যবহার প্রয়োজন।

*৩। **যমক** :—একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারে বা প্রায সমোচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগে এই অলঙ্কারের সৃষ্টি হয।

—"কুসুমের **বাস** ছেড়ে কুসুমের **বাস**।
বাযুভরে এসে করে নাসিকায **বাস**॥"

এখানে প্রথম 'বাস' কথাটির অর্থ বাসস্থান, দ্বিতীয় 'বাস' কথাটির অর্থ গন্ধ, তৃতীয় 'বাস' কথাটির অর্থ থাকা। "মনে করি করি করি, কিন্তু হয হয না"—এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয 'করি'-র অর্থ করিবার উদ্যোগ—এবং 'হয় হয়' কথা দুইটির দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা

বুঝাইতেছে। কিন্তু অপর একটি অর্থেরও প্রতীতি হইতেছে। দ্বিতীয়বার 'করি' উচ্চারণে দীর্ঘ করিলে হয় 'করী' অর্থাৎ হাতী। এবং প্রথম 'হয' শব্দের অপর একটি অর্থ 'ঘোড়া' —তাহা হইলে বাক্যটিব অর্থ হইল, মনে করি হাতী করি, কিন্তু ঘোড়াই হয না যে।

যমক বিন্যাসের কৌশল সত্যই ভাষাব মাধুর্য সৃষ্টি করে। লঘু রচনায ইহা অত্যন্ত হাস্যরসেব সৃষ্টি করে।

*৭। **শ্লেষ** ঃ—এই অলঙ্কার প্রযোগে বাক্যের অন্তর্গত কোন শব্দ একবার মাত্র প্রযুক্ত হইযা বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে। উক্তিটির একটি সবল অর্থ হয় আবাব একটি নূতন অর্থও তাহা হইতে উঁকি মাবে।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায প্রভা পায প্রভাকর।"

উদ্ধৃতিটির মধ্যে 'ঈশ্বর', 'গুপ্ত', 'প্রভা' ও 'প্রভাকর' এই চারিটি শব্দ-প্রয়োগে শ্লেষ-অলঙ্কারের উদ্ভব হইযাছে। ঈশ্বর (ভগবান্), গুপ্ত (লুক্কাযিত), প্রভায (জ্যোতিতে), প্রভাকর (সূর্য)—এই অর্থে উদ্ধৃতির অর্থ ঃ—কে বলে ভগবান লুক্কাযিত। তিনি চরাচরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতিতে সূয জ্যোতিষ্মান। আবার 'ঈশ্বর' (উক্তনামা কবি), 'গুপ্ত' (অখ্যাত), প্রভায (প্রতিভায), 'প্রভাকব' (উক্তনামা পত্রিকা)—এই অর্থে উদ্ধৃতিটির অর্থ দাঁডায ঃ—কে বলে ঈশ্বব গুপ্তের খ্যাতি নাই? তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত, তাঁহার প্রতিভায় প্রভাকব সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

"**গোত্রের প্রধান** পিতা **মুখবংশ-জাত**
পরম **কুলীন** স্বামী **বন্দ্যবংশ-খ্যাত**।"

আমার পিতার অতি উচ্চ গোত্রে জন্ম। পক্ষান্তরে 'গোত্র' শব্দে পর্বত বুঝায—আমার পিতা সকল পর্বতের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'হিমালয'। 'মুখ-বংশে'র এক অর্থ মুখোপাধ্যায বংশ, অপব অর্থ (মুখ=শ্রেষ্ঠ), শ্রেষ্ঠ বংশ। 'বন্দ্যবংশ'=বন্দ্যোপাধ্যায বংশ, 'বন্দ্য'=বন্দনীয, পূজনীয। অর্থাৎ দেবগণেব মধ্যে খ্যাতিমান্। 'কুলীন'=উচ্চবংশীয়, আবার 'কুলীন'= আগম-নিগম প্রভৃতিতে মগ্ন।

অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর নিকট এইভাবে নিজ পরিচয শ্লেষ দ্বারা গুপ্ত ও প্রকাশিত করেন।

৫। **শ্লেষ-বক্রোক্তি** ঃ এই অলঙ্কার কথোপকথনে প্রযুক্ত হয়। একজন যে

অর্থ করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন অপরে তাহা ছাড়া অন্য অর্থে শব্দটি গ্রহণ করিলে শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

অতিথি। আজ্ঞে, অতিথি **সৎকার** যে মহাপুণ্য কর্ম।

দুর্বৃত্ত। এই যষ্টি দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া যাবতীয় ধন অপহরণ করিয়া ঐ শ্মশানে তোমার **সৎকার** করিব।

এখানে 'সৎকার' শব্দ দুই অর্থে দুইজন গ্রহণ করিতেছে।

শ্লেষ-বক্রোক্তির আর একটি সুন্দর উদাহরণ দিব। এক চতুর ব্রাহ্মণ একটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজার নিকট পুরস্কারের জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজা শ্লোক পাঠ করিতে বলায় ব্রাহ্মণ কহিলেন—

"ক্ষীরং পিবতি বিড়ালঃ"—ব্রাহ্মণের মূর্খতা দেখিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন শ্লোকের চারি চরণ কোথায়—ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আজ্ঞে ঐ বিড়ালের চারি চরণ রহিয়াছে।" রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, "তা ত হইল, কিন্তু রস কোথায়?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কেন মহারাজ 'ক্ষীরং'—উহাপেক্ষা মিষ্ট রস আর কি?" রাজা তখন কহিলেন, "কিন্তু অর্থ? অর্থ কৈ?" ব্রাহ্মণ করজোড়ে কহিলেন, "হুজুর উহার অভাবেই ত আপনার সম্মুখে হাজির।" ব্রাহ্মণের চাতুর্যে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণটি শ্লেষ-বক্রোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে বড় নিপুণ ছিলেন।

৬। **কাকু-বক্রোক্তিঃ**—কণ্ঠস্বরের দ্বারা বক্রোক্তির অর্থ প্রতিপন্ন করিলে তাহাকে কাকু-বক্রোক্তি বলে। এরূপ স্বরে কথা বলা হয় যে উচ্চারণ মাত্রই বক্তব্য বোঝা যায়—সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?"

এই বক্রোক্তির উত্তর,—কেহ বাঁচিতে চাহে না।

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?"

কণ্ঠস্বরেই প্রতীয়মান হইবে যে দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা বা ক্লেশ কিছুমাত্র নাই।

অর্থালঙ্কার

অর্থগত বা ভাবগত অলঙ্কার বহুপ্রকার। প্রধান অলঙ্কারগুলি আলোচিত হইল।

*১। **উপমা**—সমান গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য উল্লেখপূর্বক তুলনা দ্বারা যে সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় তাহাকে বলে **উপমা**, যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহাকে **উপমান** এবং যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে **উপমেয়** বলে। প্রায়, ন্যায়, যেমন, যথা, যেরূপ, তেমন, সদৃশ, সম, তুল্য, সমান প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলা হইলে **উপমা অলঙ্কার** হয়।

"মানবদেহ জলবিম্ব-প্রায় ক্ষণবিধ্বংসী।"

"এই অশ্ব বায়ুর তুল্য গমন করে।"

"পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়
ধাইলি অবোধ হায।" —মধুসূদন

উপমা আবার নানাপ্রকারের হয়। **পূর্ণোপমা**, **লুপ্তোপমা**, **মালোপমা** ইত্যাদি।

(৵০) **পূর্ণোপমা** ঃ—এই উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম বা সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দ—সকলই থাকে।

—"বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিযাছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।" —রবীন্দ্রনাথ

"নাচায পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।" —নবীন সেন

(৶০) **লুপ্তোপমা** ঃ—যদি উপমেয়, উপমান বা সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের কোন একটি বা একাধিক লুপ্ত থাকে তাহা হইলে **লুপ্তোপমা** হয।

"ঐ যে মৃগাক্ষী যাইতেছে দেখিতেছ, ও অতি সুশীলা।"

'মৃগাক্ষী' এই পদটি মৃগের অক্ষির ন্যায় চঞ্চল অক্ষি যাহার এইরূপ বাক্য সিদ্ধ হইয়া সমাসে উপমান 'অক্ষি', তুলনাবাচক 'ন্যায়' ও 'সাধারণ' ধর্ম চঞ্চলতা এই তিনেরই লোপ হইয়াছে।

"বন্তেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে"—এখানে 'যেমন' এই তুলনাবাচক কথাটি লুপ্ত আছে।

(৴০) **মালোপমা** ঃ—একটি উপমেয়ের যদি একের অধিক উপমান থাকে তাহাকে **মালোপমা** বলে।

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে।
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।" —বাসবদত্তা

এখানে 'নরপতি'রূপ উপমেয়ের 'চাতকিনী', 'কুমুদিনী' ও 'কমলিনী' তিনটি উপমান থাকাতে **মালোপমা** হইয়াছে।

"নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে;
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে;
মরীচিকা মরুদেশে
নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে
এ তিনের ছল সম ছল রে, এ
কু-আশার"

—মধুসূদন

এখানে উপমেয় 'আশা'. এবং 'নিশার স্বপন', 'ক্ষণপ্রভা' ও 'মরীচিকা'—উপমান।

২। **প্রতীপ** ঃ—"প্রসিদ্ধ উপমাকে উত্তমরূপে নির্দেশ বা উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণনাকে প্রতীপ অলঙ্কার বলে।

"দুর্জন যথায় তথা কেন হলাহল?
জ্ঞাতি যথা কেন তথা প্রদীপ্ত অনল?"

*৩। **রূপক** ঃ—যে বস্তুকে তুলনা করা হয় সেই উপমেয়কে যখন উপমান অর্থাৎ যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহার সহিত অভিন্ন বা একরূপ পরিব্যক্ত করা হয় তখন **রূপক অলঙ্কারের** সৃষ্টি হয়। রূপকের বাচক 'রূপ' ও কোন কোন স্থলে 'ময়' শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"জ্ঞানরূপ সূর্যের উদয়ে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অপসৃত হয়।"

"জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?" —মধুসূদন

*৪। **উৎপ্রেক্ষা** ঃ—উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য বিষয়ে সন্দেহ দ্যোতিত হইলে **উৎপ্রেক্ষা** অলঙ্কার হয়।

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোযার।" —রবীন্দ্রনাথ

"সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।"

*৫। **ব্যতিরেক** ঃ—"উপমান অপেক্ষা উপমেযের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনায় **ব্যতিরেক অলঙ্কারের** সৃষ্টি হয।

"কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা॥" —ভারতচন্দ্র

—"যৌবন বসন্ত কালের ন্যায় ঝলমল সৌন্দর্য আনয়ন করে। পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ বসন্তাগম হয়, যৌবন কিন্তু আর ফিরে না।"

৬। **দৃষ্টান্ত** ঃ—পরস্পর সমান-ধর্মাক্রান্ত দুই বস্তুর সাদৃশ্য বর্ণনাকে দৃষ্টান্ত বলে। **'যথা, যেমন'** প্রভৃতি শব্দ থাকিলে ইহাকে **উপমা** বলে।

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার"

—ভারতচন্দ্র

চাঁদ ও 'সুন্দরের' অর্থাৎ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের নায়কের সাদৃশ্য এবং রাহু ও কোটালের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদৃশ্য বর্ণনা হইয়াছে।

৭। **অপহ্নুতি** :—বর্ণনীয় বস্তুকে অপ্রকাশিত রাখিযা অপ্রকৃত বস্তুর স্থাপনাকে অপহ্নুতি বলে। উপমেয়কে গোপন করিয়া উপমানের প্রকাশ।

"বৃষ্টি-ছলে মেঘ কাঁদে"

"ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'লে মাৎসর্য।" —যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

৮। **অতিশয়োক্তি** :—যেখানে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেযরূপে নির্দেশ করা হয সেখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি হয।

"বসিযা চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যাব দরবার॥
তড়িৎ ধরিযা রাখে কাপড়ের ফাঁদে;
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ
মাণিকেব ছটা কি কাপড়ে হয বন্ধ।" —ভারতচন্দ্র

এখানে উপমেয সখিগণ ও বিদ্যা উপমান মাণিক, তড়িৎ, তারাগণ, পূর্ণচন্দ্র ও কমলের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইযাছে এবং উপমেয দ্বযের একবারও উল্লেখ করা হয নাই।

৯। **নিশ্চয়** :—কোন বস্তুর সহিত তাহার বিরোধী গুণসম্পন্ন অন্য বস্তুর তুলনা করিযা প্রথম বস্তুব গুণকে প্রতিষ্ঠিত কবার কৌশলকে 'নিশ্চয' অলঙ্কার বলে।

"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" —দ্বিজেন্দ্রলাল

১০। **বিরোধ** :—যেখানে সত্যই বিবোধ বা অসামঞ্জস্য নাই অথচ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধের মত মনে হয় এবং পরে বক্তব্য সুন্দব ও সুস্পষ্ট হয সেখানে বিরোধালঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"সীমার মাঝে অসীম! তুমি বাজাও আপন সুর।" —ববীন্দ্রনাথ

"ঈশ্বরই সেই অমূল তরুর মূল।"

*১১। **সমাসোক্তি** :—সমান কার্য বা সমান বিশেষণাদির অবস্থানহেতু যেখানে বর্ণনীয বস্তুতে অপ্রস্তুত বস্তুর জীবন, গতি, ভাব ইত্যাদির ব্যবহার আরোপ করা হয় এবং অপ্রস্তুত বস্তু মানব ধর্মযুক্ত হইয়াছে জ্ঞান করা হয়, সেখানে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারেব সৃষ্টি হয়।

"অয়ি ইতিহাস, ওগো মিথ্যাময়ী"—

এখানে ইতিহাসকে মানব ধর্মযুক্ত ভাবে কল্পনা করা হইয়াছে।

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।"

এখানে নদীর এপারকে মানুষের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুণসম্পন্ন জ্ঞান করা হয়।

১২। **ব্যাজস্তুতি :**—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি; অথবা স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে।

"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"—একথার দ্বারা নিন্দা করার ছলে শিবকে প্রশংসা করা হইতেছে—'তিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের অতীত ও ত্রিনয়ন'—এইরূপ বলা হইয়াছে।

লক্ষণীয় : মাত্র (*) তারকা-চিহ্নিত অলঙ্কার কয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

ছেদ-বিন্যাস

বাক্যের শেষে 'দাঁড়ি' বা 'পূর্ণচ্ছেদ-চিহ্ন' অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃতে ও বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পদ্যে এক দাঁড়ি (।)-চিহ্ন ও দুই দাঁড়ি (॥) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না। কাজেই গদ্যে দাঁড়ি ছাড়া অপর কোন বিরাম-চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না। ইহাতে বাক্যের অর্থবোধের কিছু অসুবিধা বোধ করিতে হইত। বাক্যটির বিভিন্ন অংশকে বিরাম-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিযা দিলে পাঠের ও অর্থবোধের সুবিধা হয়। এজন্য বর্তমান বাংলায় ইংরেজী বিরাম-চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইতেছে।

সংক্ষেপে সকল প্রকার ছেদচিহ্নের পরিচয় এবং তাহাদের ব্যবহার উদাহরণসহ দেওয়া হইল।

কমা (,) সবচেয়ে কম বিরতি বুঝাইতে কমার (,) ব্যবহার হইয়া থাকে।

(১) হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত, আজ আর ইহা অপরাজিত নয়।

(২) জওহরলাল নেহরুকে দেখিবার জন্য ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, কংগ্রেসী, কম্যুনিস্ট সকলেই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৩) পিতঃ, অপরাধীকে ক্ষমা করুন।

(৪) সে হাসিয়া বলিল, "তাতে আর দোষ কি।"

(৫) ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

(৬) শ্রীযুক্ত অরুণাংশুপ্রকাশ ধর, এফ, আর, সি. এস, (লণ্ডন)

(৭) মোটকথা, আমাদের কাহারও উত্তর নির্ভুল হয নাই।

(৮) "গ্রন্থাগার শুধু জ্ঞান বিতরণ করে না, জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল ও প্রণালীবদ্ধভাবে আযত্ত করিতেও শিক্ষা দেয।"

সেমিকোলন (;)—কমা অপেক্ষা আরও বেশীক্ষণের বিরতি বুঝাইতে সেমিকোলনের (;) ব্যবহার হয়। এই চিহ্ন দ্বারা বাক্যাংশের কথঞ্চিৎ বিরতি বা বাক্যের আংশিক বিরতি বুঝায।

ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর নাই ; আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।"

কোলন (:) পূর্ববর্তী উক্তি স্পষ্টতর করার জন্য উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা অন্য বাক্যাংশের প্রয়োগের পূর্বে কোলন-চিহ্ন বসে।

দশরথের তিন প্রধানা মহিষী : কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী।

ড্যাস (—) (১) কোলন-স্থলে বসে। দশরথের চারি পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

(২) উক্তির পূর্বে বসে। রাম—কোথায যাইতেছ ?

শ্যাম—তোমার বাড়ী কোথায় ?

(৩) বাক্যমধ্যে প্রক্ষিপ্ত বাক্য আগে ও পরে 'ড্যাস' দিয়া লিখিতে হয়।

"তখন সেইরূপ আর একটি ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ,
উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোলন ও ড্যাস (:—)—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, বিবরণ ইত্যাদির পূর্বে বসে।

(১) নীচের অঙ্কগুলির মধ্যে যে-কোন দুইটি কর :—

(২) ক্রিয়ার তিনটি কাল :—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

প্রশ্নবোধক (?)—প্রশ্নাত্মক বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে ?

বিস্ময়বোধক (!)—বিস্ময়, ভয় প্রভৃতি মনের প্রবল ভাব এবং সম্বোধন বুঝাইতে বাক্যশেষে বিস্ময়বোধক (!)-চিহ্ন দেওয়া হয়।

(১) মরি ! মরি ! ঈশ্বরের কী অনন্ত মহিমা !

(২) পিতঃ ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

দাঁড়ি (।)—বাক্যের সমাপ্তি বা সম্পূর্ণতা বুঝাইতে দাঁড়ি-চিহ্ন দেওয়া হয়।

—ব্যাস্! ব্যাস্! এইখানে এইবার দাঁড়ি দাও।

লোপচিহ্ন (')—লোপ চিহ্ন দিয়া অক্ষরের বা বর্ণের লোপ বুঝান হয়।

অপমানে **হ'তে হ'বে তা'দের** সবার সমান।

'হইতে', 'হইবে', 'তাহাদের' এই তিনটি পদের যথাক্রমে 'ই' ও 'হা' (') লোপচিহ্ন দ্বারা লোপ করা হইয়াছে।

হাইফেন (-)—ইহা যোগচিহ্ন। দুই বা ততোধিক শব্দ একপদে পরিণত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। রূপ-রস-স্পর্শ।

উদ্ধরণ, উদ্ধৃতি, উদ্ধার (" ")—প্রত্যক্ষ বা স্বকীয় উক্তি (" ") এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়।

অপর গ্রন্থকারের লেখাও এই চিহ্নমধ্যে স্থাপিত করিয়া শেষে ড্যাসচিহ্ন দিয়া গ্রন্থকার বা লেখকের নাম লেখা হয়।

ভক্ত কহে, "প্রভু ! মোরে কি ছল ছলিলে ?"—রবীন্দ্রনাথ

"যতই প্রেমের বৃদ্ধি, ততই মাৎসর্যের নাশ।"—অশ্বিনী দত্ত

উদ্ধরণ চিহ্ন হিসাবে—যখন একটি উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে অপর একটি উদ্ধৃতি বা প্রত্যক্ষ উক্তি চিহ্নিত করিতে হয়, তখন দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির আগে ও পরে (' ') এইরূপ চিহ্ন দিতে হয়।

"ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, 'এই তো চাই' !"

ডট-চিহ্ন (....) এইরূপ চিহ্ন দিয়া বাক্যাংশের আংশিক বর্জন জানানো হয়।

"তোমার মত মূর্খ, অপদার্থ.... ।"

পরিশিষ্ট

অশুদ্ধি-সংশোধন

রচনার সময়ে সতর্কতা ব্যতীত অশুদ্ধি এড়ানো যায় না। বাংলাভাষায় **ই, ঈ**-জ্ঞান সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। তৎপরে **উ, ঊ** জ্ঞান। ইহা ছাড়া **শ, ষ, স** তিনটি সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার হইতে হইবে। **ণত্ব** ও **ষত্ব**-বিধানে **ন, ণ** এবং পরে **স, ষ** সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম দেওয়া আছে, সেগুলি ভুলিলে চলিবে না। অন্তঃস্থ **য** ও **জ** প্রচুর বর্ণাশুদ্ধির হেতু হয়। ইহা ছাড়া সন্ধির ভুল, যুক্তাক্ষরেব ভুল, য ফলার উচ্চারণ ও সাধারণ উচ্চারণ-ঘটিত বানান-ভুল, বিসর্গের রূপ পরিবর্তনের অনিয়ম ঘটিত অশুদ্ধি, ং স্থানে **ম** প্রযোগ-ঘটিত অশুদ্ধি, পদ-ব্যবহারের অশুদ্ধি, প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের অপপ্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি ও সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি প্রাযই দেখা যায়। শুদ্ধ রূপটি যাহাতে মনে চির মুদ্রিত থাকে, তজ্জন্য উদাহরণগুলিতে শুদ্ধ শব্দগুলি মোটা হরফে মুদ্রিত করা হইল। পুনঃ পুনঃ শুদ্ধ রূপটি লিখিযা অভ্যাস করিতে হইবে।

ই-ঈ-ঘটিত বানান

শুদ্ধরূপ

আগে **ই** পরে **ঈ**—

পৃথিবী, কিরীট, নিশীথ, বিকীর্ণ, নিপীড়িত, বিভীষিকা, পিপীলিকা, নিমীলিত, কৃষিজীবী, আমিষাশী, নিরীহ, নির্ভীক।

আগে **ঈ** পরে **ই**—

বাল্মীকি, উন্মীলিত, পীড়িত, শারীরিক, দধীচি।

আগে **ই** পরে **ই**—

অতিথি, নিশিত (ধারাল), **বিকিরণ।**

আগে **ঈ** পরে **ঈ**—

ভাগীরথী।

উ-ঊ-ঘটিত বানান

শুদ্ধরূপ

উ-কার—পুণ্য, অদ্ভুত, কৌতুক, স্ফুরণ, ভুল।

ঊ-কার—কৌতূহল, ঊর্ধ্ব, বিদ্রূপ, সিন্দূর, উদ্ভূত, বধূ, ক্রূর, মূষিক, স্ফূর্তি, দূষিত, লঘূকরণ, প্রতিকূল, ভূত, স্তূপ।

আগে উ পরে ঊ ঃ—মুহূর্ত, অনুভূতি, শুশ্রূষা, মুমূর্ষু।

আগে ঊ পরে উ ঃ—নূপুর।

ন-ণ-ঘটিত বানান

শুদ্ধরূপ

ণ—গণনা, অণু, কণিকা, রামায়ণ, প্রাঙ্গণ, কল্যাণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ন—কনক, দুর্নাম, আহ্নিক, মুনি, শূন্য, রসায়ন, সংকীর্তন।

শ, ষ, স-ঘটিত বানান

শুদ্ধরূপ

শ—কৃশ, বিশল্যকরণী।

ষ—পরিষ্কার, আবিষ্কার, গোষ্পদ, শিষ্য, চাষ।

স—ভস্ম, ধ্বংস, মানসিক, শস্য, নিস্পন্দ, আসক্তি, পুরস্কার বৃহস্পতি, সান্ত্বনা।

আগে স, পরে ষ—সুষুপ্তি, সর্ষপ, সুষেণ।

আগে স, পরে স—সসাগরা।

আগে শ, পরে শ—শ্মশান, শশব্যস্ত।

আগে ষ, পরে স—পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা।

যুক্তাক্ষর-ঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
পক্ব	পক্ক	আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্খা
পার্শ্ব	পার্শ	উজ্জ্বল	উজ্জল
ধ্বংস	ধংস	কজ্জ্বল	কজ্জল
ইয়ত্তা	ইযত্বা	প্রজ্বলিত	প্রজ্জ্বলিত
সামর্থ্য	সামর্থ	ব্যুৎপত্তি	বুৎপত্তি
জ্যেষ্ঠ	জেষ্ঠ	সাহায্য	সাহার্য্য
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ	বিদ্বান্	বিদ্যান্
লক্ষ্মী	লক্ষী	লক্ষ্মণ	লক্ষণ

[রামানুজ অর্থে]

উচ্চারণ-ঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ব্যবহার	ব্যাবহার	ষষ্টি	ষষ্ঠি
ব্যবধান	ব্যাবধান	সম্মান	সন্মান
ব্যথিত	ব্যাথিত	সম্মুখ	সন্মুখ।

সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
মনোহর	মনহর	মনঃসাধ	মনোসাধ
মনোযোগ	মনযোগ	ইতঃপূর্বে	ইতিপূর্বে*
মনোমোহন	মনমোহন	ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে*
যশোলাভ	যশঃলাভ	সদ্যোজাত	সদ্যজাত
শিরোমণি	শিরঃমণি	শিরউপরি	শিরোপরি*

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অধোগতি	অধগতি	স্রোতোবেগ	স্রোতবেগ
মনোন্তর	মনান্তর*		
পৃথগন্ন	পৃথকান্ন	অনটন	অনাটন
ভবিষ্যদ্বাণী	ভবিষ্যৎবাণী	পশ্বধম	পশ্বাধম
বিদ্যুদালোকে	বিদ্যুতালোকে	অত্যধিক	অত্যাধিক
হৃৎপিণ্ড	হৃদ্‌পিণ্ড	দুরদৃষ্ট	দুরাদৃষ্ট
ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুধাপিপাসা	দুরবস্থা	দুরাবস্থা
নিষ্কাম	নিস্কাম	অনুমত্যনুসারে	অনুমত্যানুসারে
আস্পদ	আষ্পদ	জাত্যভিমান	জাত্যাভিমান
কিংবদন্তী	কিম্বদন্তী	চক্ষুর্দ্বয়	চক্ষুদ্বয়
বারংবার	বারম্বার	স্বয়ংবর	স্বয়ম্বর
কিংবা	কিম্বা	মুখচ্ছবি	মুখছবি
সংবাদ	সম্বাদ	তরুচ্ছায়া	তরুছায়া
যদ্যপি	যদ্যাপি	জগদ্বন্ধু	জগবন্ধু

লিঙ্গ-ঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
বিহঙ্গী	বিহঙ্গিনী †	ননদ	ননদিনী
ত্রিনয়না	ত্রিনয়নী	চন্দ্রবদনা	চন্দ্রবদনী
অপ্সরা	অপ্সরী*	গায়িকা	গায়কী
অধীনা	অধিনী	রূপবতী	রূপসী*
অনাথা	অনাথিনী †		

* চিহ্নিত শব্দগুলির ব্যবহার বাংলাভাষায় বহু প্রচলিত হইয়াছে।

† লিঙ্গ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
কালিদাস	কালীদাস	**কালীপদ**	কালিপদ
চণ্ডীদাস	চণ্ডিদাস	**শশিভূষণ**	শশীভূষণ
নিরপরাধ	নিরপরাধী	**নির্দোষ**	নির্দোষী
নীরোগ	নিরোগী	**গুণিগণ**	গুণীগণ
প্রাণিহত্যা	প্রাণীহত্যা	**পক্ষিশাবক**	পক্ষীশাবক
নির্ধন	নির্ধনী	**মহিমময়**	মহিমাময়
যোদ্ধৃগণ	যোদ্ধাগণ	**মহারাজ**	মহারাজা
ক্রেতৃগণ	ক্রেতাগণ	মাতাপিতৃহীন	মাতৃপিতৃহীন

প্রত্যয়-প্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অসহ্য, অসহনীয়	অসহ্যনীয়	**আলস্য, অলসতা**	আলস্যতা
প্রফুল্ল	প্রফুল্লিত	**আধিক্য**	আধিক্যতা
আবশ্যক	আবশ্যকীয়	**উৎকর্ষ**	উৎকর্ষতা
একত্র	একত্রিত	**প্রসার**	প্রসারতা
পৌরুষ	পৌরুষত্ব	**দূষণীয়**	দোষণীয়
অস্তায়মান	অস্তমান	সেচন	সিঞ্চন
সর্জন, সৃষ্টি	সৃজন	ঘূর্ণ্যমান	ঘূর্ণায়মান

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের প্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১। একথা **প্রমাণ** করিতে পার ?	প্রমাণিত, সপ্রমাণ
২। তোমাদ্বারা এই বংশের গৌরব **লোপ** হইয়াছে।	লুপ্ত (অথবা 'হইযাছে' স্থানে পাইযাছে)।

৩।	ছেলেটি পাশ হইয়াছে শুনিয়া তিনি পরম **সন্তোষ** হইলেন।	সন্তুষ্ট (অথবা 'হইলেন' স্থানে করিলেন)।
৪।	**অপমান** হইবার ভযে কোন কথা বলি নাই।	অপমানিত
৫।	তুমি কি আমার মামলায **সাক্ষী** দিবে ?	সাক্ষ্য
৬।	**গোপন** কথাটি কি ?	গোপনীয়
৭।	তাহার কাজের কি **সাবকাশ** আছে ?	অবকাশ
৮।	এই পুস্তকের **আবশ্যক** নাই।	আবশ্যকতা
৯।	চন্দ্র **উদয়** হইল।	উদিত (অথবা 'চন্দ্র'-স্থানে 'চন্দ্রের')
১০।	মেয়েটি **অপ্সরীর** ন্যায **রূপসী**।	অপ্সরার, রূপবতী।

সাধারণ অপপ্রয়োগ—সুপ্রয়োগ

অন্তঃশীলা—অন্তঃসলিলা। আরক্তিম—আরক্ত। হসন্তচিহ্ন— হসচিহ্ন। শব্দকুশলী—শব্দ-কুশল। অধিকাংশ লোক—অধিকসংখ্যক লোক। মুষ্টিমেয লোক—অতি অল্পসংখ্যক লোক। স্বজাতিগণ—সজাতিগণ বা স্বজাতীয়গণ। সজাতীয লোক—স্বজাতীয লোক। দেবতার উদ্দেশ্যে—দেবতার উদ্দেশে। আগোপান্ত—আগুন্ত, আদ্যোপান্ত। স্তোকবাক্য—স্তোভবাক্য। আবহমান কাল হইতে—আবহমান কাল। সফল হওয়া—সফলকাম হওয়া। সে-জাতীয—তজ্জাতীয। একালীন—এই কালের। বীতস্পৃহা (বিশেষ্য)—বীতস্পৃহতা। হতশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাহানি, শ্রদ্ধাহীনতা। শয়নান্তর—শয়নানন্তর। বিশ বাঁশ জল—বিশবাঁও (ব্যাম) জল। আলোচ্য গ্রন্থ—আলোচ্যমান গ্রন্থ। সাহিত্যপারিষদ্—সাহিত্যপরিষদ্। চরিতার্থের জন্য—চরিতার্থতার জন্য। বর্ধিষ্ঠ গ্রাম—বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জ্ঞাতার্থে—জ্ঞাপনার্থে। অত্র পত্রে—এই পত্রে। কালকর্তন—কাল কাটান। নিরাপদেষু—নিরাপৎসু। পূজ্যাস্পদ—পূজাস্পদ। ইহা ব্যতিরিক্ত—এতদ্‌ব্যতিরিক্ত, ইহা ছাড়া। কৃতকার্যতার সহিত—কৃতিত্বের সহিত। জলছত্র—জলসত্র। সমৃদ্ধশীল—সমৃদ্ধিশালী, সমৃদ্ধ। শয়নে পদ্মলাভ—শয়নে পদ্মনাভ। গৃহিণী রোগ—গ্রহণীরোগ। সভাভগ্ন হইলে—সভাভঙ্গ হইলে।

সূর্য-অস্ত যাইবার আগে—সূর্যের অস্তগমনের পূর্বে। সৃজনী শক্তি—সৃষ্টি-শক্তি। নিরপরাধে নিন্দিত—বিনা অপরাধে নিন্দিত। প্রতিমার নিরঞ্জন—প্রতিমার নীরমজ্জন (নীরাজনা)। আব্যুধিক—আভ্যুদয়িক। কাণ্ডজ্ঞানশীল—কাণ্ডজ্ঞানশালী। চাক্ষুষ দুর্ঘটনা—প্রত্যক্ষদৃষ্ট দুর্ঘটনা। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি—সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মহৎ ব্যক্তি—মহাপুরুষ। বদভ্যাস—কদভ্যাস। লজ্জাস্কর—লজ্জাকর।

সুষ্ঠুতর প্রয়োগ—আচ্ছন্নের মত—মোহাচ্ছন্নের মত। নাম স্বাক্ষর করা—নাম স্বাক্ষরিত করা। উচ্চপ্রশংসিত—মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। সাংসারিকবুদ্ধিহীন—সংসারবুদ্ধিহীন। অপরাজেয় কথাশিল্পী—অদ্বিতীয় বা অপরাজিত কথাশিল্পী।

পুনরুক্তি দোষ—অশ্রুজল, আযত্তাধীন, করা কর্তব্য, ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ, পশ্চাৎ অনুসরণ, স্বত্বাধিকারী, সমতুল্য, সদাসর্বদা, কেবলমাত্র, গিরিপর্বত, পত্রপল্লব, বিহিতবিধান, অন্যের পরাধীন, সজ্জন ব্যক্তি, আতিথ্যসৎকার, নিজস্বধন, উপরে উল্লিখিত, রোগে নিরাময়, প্রত্যক্ষগোচব।

লক্ষ্যার্থক পদের ব্যবহারে ভুল—তেলে বেগুনে রেগে (জ্বলে) উঠা, ধোঁকা খাওয়া (লাগা), পবলোক যাইলেন (গমন করিলেন)। একাদশ বৃহস্পতি—(একাদশে বৃহস্পতি)। হামাগুড়ি খাওয়া—(হামাগুড়ি দেওয়া)। ডানাকাটা অপ্সরী—(ডানাকাটা পরী)।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন

(১৯৬০)

প্রথম পত্র

১। "ললিত গিরি নিবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ক্ষুদ্র পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বময় ভাবাবেগ, শিল্পানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম ও জ্যোতিষ-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।"—এই উক্তিটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইযাছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।" এই গুরুতর ভার কি? ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

"প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষা-নিরপেক্ষ।" তোমার নিজের মন্তব্য সহ সংক্ষেপে এই উক্তির বিচার কর।

অথবা

'নতুন-দা' রচনাটি বিশ্লেষণ করিযা দেখাও, শরৎচন্দ্র ইহাতে কি কৌশলে কৌতুক-রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩। প্রসঙ্গসূত্র নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা কর—

(ক) বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্য দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ।

অথবা

(ক) কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট কাঙালীর জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

(খ) দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতাকে বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

অথবা

(খ) সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে তখন কার সাধ্য যে সে প্রবাহ রোধ করে!

৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লিখ :

(ক) "শুনেছি বিরাটনগরে বহুজনেব সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ।" কোন্ যুদ্ধের কথা এখানে বলা হইয়াছে? কাহার কোন্ উক্তির ইহা যথেষ্ট প্রমাণ?

অথবা

(ক) "সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে; বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?" এখানে 'বর্ষা' ও 'বসন্তেব কোকিল' কি উপলক্ষে কোন্ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে?

(খ) "যে সব প্রাণীর রক্ত শীতল তাগাদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিযা লক্ষ্য করা যায।" ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দাও। 'অব্যক্ত জীবনে'ব অর্থ কি?

অথবা

(খ) "(আলবেরুণী) সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক লিখিলেন।"—আলবেরুণী কে? তাঁহার কোন্ শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের কথা এখানে বলা হইয়াছে?

৫। বারমাস্যা বলিতে কি বুঝায? 'ফুল্লরার বারমাস্যা'য দারিদ্র্যের চিত্রটি ব্যাধ-জীবনের সঙ্গে কতটা সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস তাহার বিচার কর।

'ভারত-তীর্থ' কবিতায ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তোমার মন্তব্য সহ তাহা ব্যক্ত কর।

৬। প্রসঙ্গসূত্র নির্দেশ পূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে
এ তিনের ছল সম ছলরে এ কু-আশার।

অথবা

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।

৭। অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পূরণ কর—

তব সনে — আছে — কত হাহাকার
কত — অঙ্গার কত —।
শোকের — যুগ যুগ ধরি'
— আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত — কত চিতা — নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।

অথবা

যে-কোন **চারিটির** সংক্ষেপে উত্তর লিখ :—

(ক) 'সগরবংশের যথা সাধিলা মুকতি',—কে কেমন করিয়া সগরবংশের মুক্তি সাধন করিয়াছিল ?

(খ) ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল আকার
'তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ',—কাহার ইন্দ্রজালে মানবসকল ঘুরিতেছে ? ইন্দ্রজাল কাহাকে বলে ?

(গ) 'হেরি যে হেথায় আকাশ কটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা',—'আকাশ কটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা' কথাটা বুঝাইয়া দাও।

(ঘ) 'সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে ?
—এখানে সিংহ কে ? শৃগালের দল কাহাদিগকে বলা হইয়াছে ?

(ঙ) 'চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে মৃত পুত্রেব সে বদন'—চণ্ডালবেশী নৃপতি কে ? মৃত পুত্র কে ?

(চ) 'সন্তান তব করিতেছে আজি তোমার অসম্মান।'—তোমার বলিতে এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে ? কোন্ সন্তান অপমান করিতেছে ?

৮। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে কোনও **ছয়টিকে** নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর :

(ক) এই ঘটনার সত্যতায সন্দিহান হইবার কারণ নাই। (মিশ্রবাক্যে পরিবর্তিত কর)

(খ) রাজা ভাগিনাকে বলিলেন,—"একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।" (উক্তি-পরিবর্তন কর)

(গ) সেই পূর্বস্মৃতি আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। (আলোচনাকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর)

(ঘ) কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে আর বলা হইল না। ('না' বাদ দাও)

(ঙ) এরূপ বলিনা যে ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। ('শিক্ষানিরপেক্ষ' শব্দটির সমাস ভাঙ্গিয়া ব্যবহার কর)

(চ) ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ('ইন্দ্রকে সম্বন্ধপদ রূপে ব্যবহার কর)

(ছ) বালির উপর দৌড়ান যায় না। (বাচ্যান্তরিত কর)

(জ) আপনি তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। ('পুত্রের ন্যায়' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ ব্যবহার কর)

(ঝ) সূচীর অগ্রভাগে যে-পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও আমি ছাড়ব না।

(নিম্নরেখ শব্দগুলি একপদে পরিণত কর)

(ঞ) ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে। (নেতিবাচক কর)

অথবা

নিম্নলিখিত শব্দগুলির **ছয়টিকে** বাক্যে প্রয়োগ কর:

সব্যসাচী, অতলস্পর্শ, প্রকৃতিস্থ, অশনবসন, রাসায়নিক, বাহ্যাড়ম্বর, প্রগল্‌ভ, ব্যাপকতা, পুরুষানুক্রমে, সন্তর্পণে।

৯। (ক) স্থূলাক্ষর পদগুলির **ছয়টির** সম্বন্ধে ব্যাকরণগত টীকা লিখ—

(i) তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা **অন্তঃশীলা** হইয়া বহিতে থাকে।

(ii) **অণুবীক্ষণ** নমে একটি যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়।

(iii) তুমি কেবল **গলাবাজিতে** জিতিয়া গেলে।

(iv) হুজুর, আমি **মন্তর তন্তর** কিছুই জানি না।

(v) হউক বসন্তরাণী **গৌরাঙ্গিণী**, হে শ্যামা বরষা।

(vi) শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি **পঞ্চবটী**।

(vii) **নদী জপমালাধৃত** প্রান্তর।

(viii) সন্ন্যাসিনী শ্রীকে **সমভিব্যাহারে** লইয়া আসিলেন।

(ix) আমাদের ডিঙিকে **যাচ্ছেতাই** বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিলেন।

(খ) কবিতায় ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির **ছয়টির** গদ্যরূপ কি হইবে লিখ :—

তিতিল, জিনিবারে, নারিলি, দোঁহে, বিদারিছে, খনিনি, ধাঁধিতে, রনরনি', জীয়াতে, (বাঙালীর) হিয়া-অমিয়, কামড়ে, পরসাদ, রাঙিয়া, নেহারে।

১০। নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর—

পৃথ্বীরাজ তখন কমলমীরে, সওয়ার খবর নিয়ে সে দিকে ছুট্‌ল। মহারাণা দলবল নিয়ে চট্‌পট্‌ লড়াইএ বেরিয়ে গেলেন। সুরজমল এসে দেখা দিলেন তাঁর ফৌজ নিয়ে। রাণার ফৌজ ক্রমেই হঠ্‌তে লাগ্‌ল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারাণা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন। (ভাগ্যবিচার)

অথবা

নিম্নলিখিত অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর—

শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্‌ঝটিকা। এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিলাম। এই নদী নামিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। এই প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সমোচ্চারিত ও প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ

বাংলা ভাষায় একই উচ্চারণবিশিষ্ট বহু শব্দ আছে। তাহাদের বানান ও অর্থের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে জানা না থাকিলে ঐ সব শব্দের প্রয়োগে ভ্রম ঘটে। সেজন্য শব্দগুলির বানান ও অর্থ আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

অনু—পশ্চাৎ
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ
অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—ডালি
অশ্ব—ঘোড়া
অশ্ম—প্রস্তর
অসন—নিক্ষেপ
অশন—ভোজন
আকিঞ্চন—প্রবল আকাঙ্ক্ষা
অকিঞ্চন—যাহার কিছুই নাই
অবিরাম—নিরন্তর
অভিরাম—সুন্দর
অবগত—জ্ঞাত
অপগত—দূরীভূত
আপন—নিজ
আপণ—দোকান
আভাষ—ভূমিকা, ইঙ্গিত
আভাস—দীপ্ত
ইতি—শেষ
ঈতি—শস্যাদির রোগ
ঈশ—ঈশ্বর
ঈষ—লাঙ্গলের ফলা
অন্ত—শেষ
অন্ত্য—নিকৃষ্ট, অন্তিম
অন্য—অপর
অন্ন—খাদ্য
অংশ—ভাগ
অংস—স্কন্ধ
অবদান—সৎকার্য
অবধান—মনোযোগ
অজগর—সর্পবিশেষ
অজাগর—নিদ্রা
অন্যপুষ্ট—পরভৃত, কোকিল
অন্নপুষ্ট—ভোজন-পুষ্ট
আদি—মূল
আধি—মনঃকষ্ট
আবরণ—আচ্ছাদন
আভরণ—ভূষণ
উদ্যত—উন্মুখ
উদ্ধত—দুর্বিনীত
ওষধি—যে বৃক্ষ একবার ফল দান করিয়া মরিয়া যায়।
ঔষধি—ঔষধ, ভেষজ গাছগাছড়া
কথক—বক্তা
কতক—কিছু

করি—সম্পন্ন করি
করী—হস্তী
কড়ি—কপর্দক, আড়া, জলজ জীব বিশেষ
কূট—অসরল, জটিল
কূট—পর্বত-দুর্গ
কৃত্তি—কর্ম
কৃতী—নিপুণ
কৃত—সম্পন্ন
ক্রীত—যাহা কেনা হইয়াছে
কৃত্তিবাস—কৃত্তি (বাঘছাল) পরা (মহাদেব), কবির নাম
কীর্তিবাস—যশস্বী

কটি—কোমর
কোটী—শতলক্ষ
কুল—বংশ, ফলবিশেষ
কূল—তট
কুজন—খারাপ লোক
কূজন—পক্ষীর ডাক
বিকৃত—বিশ্রী
বিক্রীত—যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে
কল্মষ—পাপ
কল্মায—কৃষ্ণবর্ণ

গিরীশ—হিমালয়, মহাদেব
গিরিশ—মহাদেব

গোলোক—বৈকুণ্ঠ
গোলক—গোল

চির—দীর্ঘকাল
চীর—ছিন্ন বস্ত্র
তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী
দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র
দেশ—ভূখণ্ড
দ্বেষ—হিংসা
ধাতৃ—বিধাতা
ধাত্রী—ধাই
পদ্য—কবিতা
পদ্ম—কমল
পরশ্ব—আগামী দিনের পরদিন
পরস্ব—পরধন
প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা

চূত—আম্র
চ্যুত—ভ্রষ্ট
তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ
তথ্য—সংবাদ
দীপ—প্রদীপ
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ
দূত—চর
দ্যূত—পাশা
নিশিত—ধারাল
নিশীথ—মধ্যরাত্রি
পক্ষ—পনর দিবস কাল
পক্ষ্ম—চোখের রোম
পরুষ—কর্কশ
পুরুষ—নর
প্রকার—রকম
প্রাকার—প্রাচীর

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—অধ্যায়
বান—বন্যা
বাণ—তীব
বিনা—ছাড়া
বীণা—এক বকম বাদ্যযন্ত্র
বসন—বস্ত্র
ব্যসন—আসক্তি
বিশ—কুড়ি
বিষ—হলাহল
বিস—মৃণাল
জাম—একবকম ফল
যাম—প্রহব
লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—বামানুজ
সঙ্কর—মিশ্রণ
শঙ্কর—শিব
শারদা—দুর্গা
সারদা—সবস্বতী
শব—মৃতদেহ
সব—সমস্ত
শম—শান্তি
সম—সমান
শয্যা—বিছানা
সজ্জা—বেশভূষা
সুর—দেবতা, স্বর
শূর—বীর
স্বত্ব—অধিকার
সত্ত্ব—গুণ বিশেষ
শ্বশ্রূ—খাশুড়ী
শ্মশ্রু—দাড়ী

পরভৃৎ—কাক
পরভৃত—কোকিল
বলি—উপহার
বলী—বলবান
বেদ—ধর্মশাস্ত্র
বেধ—গভীরতা
বিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত
বিস্মৃত—স্মৃতিভ্রষ্ট
মেধ—যজ্ঞ
মেদ—চর্বি

যতি—মুনি, ব্রহ্মচারী
জ্যোতিঃ—দীপ্তি
লক্ষ—সংখ্যা বিশেষ, একশত হাজাব
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য
শিকার—মৃগয়া
স্বীকার—অঙ্গীকাব
শিকড়—বৃক্ষমূল
শীকর—জলকণা
শ্রবণ—কান
স্রবণ—ঝরে পড়া
শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি
শুচি—পবিত্র,
সূচী—তালিকা, ছুঁচ
সর্গ—অধ্যায়
স্বর্গ—দেবলোক
স্বর—ধ্বনি, বর্ণ
শর—তীর
সার্থ—বণিকদল
স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন

প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ দ্বারা বাক্যগঠন রীতি

আপন-আপণ—"**আপনারে** লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী' পরে।"

ভরত দেখিল অযোধ্যার **আপণ**-শ্রেণী বন্ধ, পথে লোক চলে না।

চির-চীর—"**চির**-সুখী জন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?"

"ছিন্ন**চীর**পরা বনবাসীরে বসাল নৃপ রাজাসনে।"

অশ্ব-অশ্ম—**অশ্বা**রোহণে যাইতে যাইতে আরোহী এক **অশ্ম**-নির্মিত মন্দির দেখিয়া **অশ্ব** সংযত করিলেন।

স্বত্ব-সত্ত্ব—**সত্ত্ব**গুণ সকল গুণের সেরা।

এই সম্পত্তিতে আপনার **স্বত্ব** ও স্বামীত্ব আছে কি?

সর্গ-স্বর্গ—মহাকাব্য কয়েটি **সর্গে** ভাগ করিয়া গ্রথিত হয়।

স্বর্গলাভের আশায় রাজা যাগযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

শুচি-সূচী—এই মহাপুরুষের **শুচি**-অশুচি বিচার নাই।

সূচীপত্রে দেখা যায়, এই পুস্তকে বহু আখ্যায়িকা আছে।

শ্মশ্রু-শ্বশ্রূ—**শ্বশ্রূ**ঠাকুরাণী জামাতার পক্ক **শ্মশ্রু** দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

লক্ষ্মণ-লক্ষণ—**লক্ষ্মণের** জ্ঞান-সঞ্চারের কোন **লক্ষণ** না দেখিয়া **হনুমান** বিশল্যকরণীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

নিশীথ-নিশিত—**নিশীথ** রাত্রে দুর্বৃত্তগণ **নিশিত** খড়্গ হস্তে বাহির হইল।

চ্যুত-চূত—বৃন্তচ্যুত সুপক্ক **চূত**গুলি পাইয়া পথিকের আনন্দের অবধি রহিল না।

কটি-কোটি—এরূপ ক্ষীণ**কটি** স্ত্রীলোক **কোটির** মধ্যে একটি দেখা যায়।

গোলক-গোলোক—নিষ্পাপ বালকগণ **গোলক** লইয়া খেলা করিতেছে।

মনে হয় যেন **গোলোকে** দেবশিশুরা ক্রীড়া করিতেছে।

তরণী-তরুণী—ঈশ্বর পাটনী **তরণীতে তরুণীর** ছদ্মবেশধারিণী দুর্গাকে লইতে ভয় পাইলেন।

দিন-দীন—**দীনের** কি দশা হবে? **দিন** যে আর চলে না!

দীপ-দ্বীপ—গ্রামে রাত্রে ঘরে ঘরে **দীপ** দেয়। অন্ধকারসমুদ্রে যেন মাঝে মাঝে **দ্বীপ** দেখা যাইতেছে।

প্রাসাদ-প্রসাদ—ধনীর **প্রাসাদে প্রসাদ**-লোভী চাটুকারের দল সর্বদা ভীড় করিয়া থাকে।

পরিচ্ছদ-পরিচ্ছেদ—উত্তম **পরিচ্ছদে** ভূষিত হইয়া সকলে রাজদর্শনে চলিল।
আজ অষ্টম **পরিচ্ছেদ** পর্যন্ত পাঠান্তে পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের ছুটি দিলেন।

উপাদান-উপাধান—জলের **উপাদান** কি কি?
উপাধানে মস্তক রাখিয়া সে ততক্ষণ ঘুমাক।

উদ্যত-উদ্ধত—ছেলেটি এরূপ **উদ্ধত** স্বভাবের যে একটু উত্তেজিত হইলেই প্রহার করিতে **উদ্যত** হয়।

অবদ্ধ্য-অবধ্য—দূত চিরকাল **অবধ্য**। সেই দূতকে হত্যা করা সত্যই **অবদ্ধ্য**।

অবদান-অবধান—রবীন্দ্রনাথের **অবদান** অতুলনীয়। **অবধান** সহকারে তাঁহার কাব্যগুলি পাঠ করিবে।

অপগত-অবগত—'শত্রুশ্রেণী নগর হইতে **অপগত** হইয়াছে'—এই সংবাদ **অবগত** হইয়া রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

বিপরীতার্থক শব্দ

অন্ধকার—আলোক	আবির্ভাব—তিরোভাব	ক্ষুদ্র—বৃহৎ
আদি—অন্ত	দান—গ্রহণ	ঊর্ধ্ব—অধঃ
অগ্র—পশ্চাৎ	অধমর্ণ—উত্তমর্ণ	ঋজু—বক্র
অধম—উত্তম	অতিবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি	কুটিল—সরল
অধিক—অল্প	সত্য—মিথ্যা	কঠোর—মৃদু
আদান—প্রদান	অবনত—উন্নত	কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন
অনুরাগ—বিরাগ	উচ্চ—নীচ	কৃশ—স্থূল
অন্তর—বাহির	উন্নতি—অবনতি	দেনা—পাওনা
অলস—পরিশ্রমী	আবাহন—বিসর্জন	বন্ধুর—মসৃণ
শান্ত—অনন্ত	আকুঞ্চন—প্রসারণ	বন্ধন—মুক্তি
অনুকূল—প্রতিকূল	আসল—নকল	প্রকৃতি—বিকৃতি
উৎকৃষ্ট—অপকৃষ্ট	আপন—পর	জঙ্গম—স্থাবর
কনিষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ	গরল—অমৃত	শোক—হর্ষ
সম্পদ—বিপদ	গরিষ্ঠ—লঘিষ্ঠ	সন্ধি—বিগ্রহ

ইহলোক—পরলোক	গরিমা—লঘিমা	চড়াই—উৎরাই
ইষ্ট—অনিষ্ট	গুরু—লঘু	সুশ্রী—বিশ্রী
উত্থান—পতন	গুণ—দোষ	মুখ্য—গৌণ
উদয়—অস্ত	গুপ্ত—ব্যক্ত	স্থূল—সূক্ষ্ম
উৎকর্ষ—অপকর্ষ	গ্রহণ—বর্জন	সমষ্টি—ব্যষ্টি
উন্মীলন—নিমীলন	ঘাত—প্রতিঘাত	ইতর—ভদ্র
উষ্ণ—শীতল	চঞ্চল—ধীর	চেতন—জড়
জীবন—মরণ	দাতা—গ্রহীতা	শূন্য—পূর্ণ
জন্ম—মৃত্যু	ক্ষীণ—পীন	সুয়ো—দুয়ো
জ্ঞানী—মূর্খ	পাপ—পুণ্য	হ্রাস—বৃদ্ধি
তিরস্কার—পুরস্কার	মিলন—বিরহ	ব্যর্থ—সার্থক
তস্কর—সাধু	যোগ—বিয়োগ	আস্তিক—নাস্তিক

ভিন্নার্থক শব্দ

কয়েকটি শব্দ বহু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই শব্দগুলি যত রকম অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আমাদের জানা দরকার। নীচের কয়েকটি শব্দের কত রকম বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা দেওয়া হইল :

অম্বর— (আকাশ)—**অম্বরে** মেঘডম্বরু বাজে।
(বস্ত্র)—**রক্তাম্বর** পরিধান করিয়া কাপালিক পূজায় বসিলেন।
(মুখ)—"প্রভাতে উঠিয়া রমা হেরিল **অম্বর**।
অম্বরে অম্বর দিয়া ঢাকিল **অম্বর**॥"

অঙ্ক— (গণিত)—**অঙ্কশাস্ত্রে** স্যার আশুতোষের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।
(ক্রোড়)—"এই নাটকের এই অঙ্কে আছি মাগো তব **অঙ্কে**।
(নাটকের অংশ)—হয়তো বার পর-**অঙ্কে** পর-**অঙ্কে** পুত্র সেজে।"
(চিহ্ন)—ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি অঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নে ছিল।

অর্থ— (টাকাকড়ি)—জগতে অনর্থের মূলে **অর্থ**।
(মানে)—তোমার একথার কোন **অর্থ** হয় না।
(অভিপ্রায়)—তোমার সেখানে যাওয়ার **অর্থ** কি ?

উত্তর— (জবাব)—তোমার প্রশ্নের **উত্তর** দেওয়া আমার কর্ম নয়।
(দিক্ বিশেষ)—পৃথিবীর **উত্তরে** উত্তর মেরু প্রদেশ।
(পরবর্তী)—**উত্তর**কালে এই মেধাবী বালক পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়াছিল।

অপেক্ষা—(চেয়ে)—ধন **অপেক্ষা** বিদ্যার কদর বেশী।
(প্রতীক্ষা)—তাহার জন্য **অপেক্ষা** করিয়া লাভ কি ?
(এক প্রকার খনিজ পদার্থ)—**অভ্র** অতি উজ্জ্বল ও শুভ্র পদার্থ।
(আকাশ)—**অভ্র**ভেদী হিমালয়ের চূড়াগুলি চিরতুষারাবৃত।

অচল— (অব্যবহার্য)—এ **অচল** টাকা লইয়া আমি কি করিব ?
(পর্বত)—**অচলের** মত দৃঢ় ব্যক্তির প্রয়োজন।
(উপায়হীন)—অর্থাভাবে আমার সংসার **অচল** হইয়াছে।

সুর— (সঙ্গীতের স্বর)—এ গানটির **সুর** আমার জানা নেই।
(দেবতা)—**সুরাসুরে** যুদ্ধ বাধিলে স্বর্গমর্ত আলোড়িত হইল।
(মত)—এখন হঠাৎ **সুর** বদলাইলে কেন ?

কপাল— (অদৃষ্ট)—**কপালে** নাইক ঘি ঠক্‌ঠকালে হবে কি ?
(ললাট)—কে আর বুলাবে হাত উত্তপ্ত **কপালে** ?
(মড়ার খুলি)—নর**কপালে** শ্মশানভূমি আকীর্ণ।

কলা— (চন্দ্রের কলা)—চন্দ্র আজ ষোল**কলায়** পূর্ণ হইয়াছে।
(কদলী)—ঝড়ের প্রকোপ **কলা**গাছের উপর দিয়াই গিয়াছে।
(সঙ্গীতাদি বিদ্যা)—দেশে আজকাল শিল্প**কলার** খুব কদর।

ধর্ম— (যম)—বকরূপী **ধর্ম** যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।
(কর্তব্য)—জীবের প্রকৃত **ধর্ম** স্বার্থ পরিহার।
(স্বভাব)—নিম্নগমন জলের **ধর্ম**।
(পুণ্যকাজ)—অহিংসা পরম **ধর্ম**।

তাল— (সঙ্গীতের সময় পরিমাণ)—**তাল**জ্ঞান না থকিলে সঙ্গীত শিক্ষা করা যায় না।
(ফল বিশেষ)—**তাল**বড়া দাও তাদের পাতে।
(পিশাচ)—বিক্রমাদিত্যকে তখন **তাল**-বেতাল একটি প্রশ্ন করিল।
(যুদ্ধার্থে আহ্বান)—সে **তাল**ঠুকে বলছে "আয় চলে আয় !"

জাল— (নকল)—এই উইল **জাল**।
(ফাঁদ)—মায়ার **জালে** কদাচ সন্ন্যাসী ধরা দেয় না।

বিহার— (ক্রীড়া)—গোপিনীরা জল**বিহার** করিতেছিলেন।
(ভ্রমণ)—স্বচ্ছন্দে বনে বনে **বিহার** করিয়া হরিণটি সুপুষ্ট হইয়া উঠিল।
(বৌদ্ধমঠ)—অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ চৈত্য ও **বিহারে** ভরিয়া উঠিল।

লোক— (মানুষ)—**লোকটি** অতি সজ্জন।
(ভুবন)—ত্রি**লোকের** অধিশ্বর যিনি, তাঁহার প্রশংসা আমি কি করিতে পারি!
(জনসাধারণ)—**লোকে** কি না বলে!
(ভৃত্য)—আজকাল ভাল **লোক**জন পাওয়া যায় না।

রাগ— (ক্রোধ)—**রাগের** মাথায় লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।
(অনুরাগ)—গৌরাঙ্গের **রাগে** ঢুলু ঢুলু নয়ন দুটি দেখিলে ভক্তদের মনে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হইত।
(রং)—'পূর্ব গগন বঙ্কিম হ'ল তরুণ অরুণ **রাগে**।'
(সঙ্গীতের অঙ্গ)—**রাগ**রাগিনীর আলাপ শুনিতে বড় মধুর।

পাকা— (ইষ্টকনির্মিত)—গ্রামে আর কয়টি **পাকা** বাড়ী আছে?
(খাঁটী)—**পাকা** সোণার দাম বড় বেশী।
(সাদা)—**পাকা** চুলের কাছে উপদেশ চাইবে।
(পুরাপুরি)—রাস্তাটি **পাকা** দু'ক্রোশ।
(অভিজ্ঞ)—তিনি একজন **পাকা** শিক্ষক।

ভার— (বোঝা)—**ভারে** ভারে দ্রব্যসামগ্রী আসিতেছে।
(দায়িত্ব)—এ অনাথ বালকের **ভার** লইবার কেহ নাই।
(বিষণ্ণ, ভারী)—একথা শুনিয়া তাহার মুখ **ভার** হইল।
(কঠিন)—বড়লোকের মেজাজ বোঝা **ভার**।

গাল— (গালাগালি)—ইতরের মত **গাল** দেওয়া কি তোমার উচিত হইয়াছে?
(বানানো)—এসব **গাল**গল্প ছেড়ে দাও।
(গণ্ড)—কথাটি শুনিয়া তাহার **গাল** লাল হইয়া উঠিল।

কাণ্ড— (গাছের গুঁড়ি)—এই গাছের **কাণ্ডটি** সত্য সত্যই বিরাট।
(ব্যাপার)—'এমন **কাণ্ড** দেখিনি ত' মোটে!'
(সাধারণ জ্ঞান)—এই **কাণ্ডা**কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির কথা ছেড়ে দাও।
(অধ্যায়)—রামায়ণের সাতটি **কাণ্ড** আছে।

ধারা— (প্রবাহ)—ঝরো ঝরো ঝরিতেছে নির্ঝরের **ধারা**।
(বর্ষণ)—শ্রাবণের **ধারায়** মাছগুলি যেন বাঁচিল।
(আচরণ)—সে তাহার বংশের **ধারা** পাইয়াছে।
(আইনের ভাগ)—এক আইনের আবার কত রকম **ধারা**।

বর্ণ— (জাতি)—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি **বর্ণে** হিন্দুরা বিভক্ত।
(রং)—রামধনুর **বর্ণের** বর্ণনা কে দিতে পারে?
(অক্ষর)—**বর্ণ**জ্ঞানহীন মূর্খের সহিত কি তর্ক করিব?

হরি— (জল)—"**হরির** উপরে **হরি হরি** শোভে তায়।
(সর্প)—
(ভেক)— **হরিকে** হেরিয়া **হরি হরিতে** লুকায়॥"
(পদ্ম)—
(ভগবান্)—"**হরি হরি** বল মন।"

বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াপদের ব্যবহার

বাংলা ভাষার বাগ্ধারা অতি বিচিত্র। এই ভাষায় অন্যান্য ভাষার মতই ক্রিয়া পদের বিশিষ্ট অর্থে বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। এগুলির সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে উত্তম ভাষাজ্ঞান জন্মে না। সুতরাং এই বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াপদগুলির বিশেষ অর্থ ও তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত যত্ন করিয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ না করিলে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবে না। নীচে এরূপ কয়েকটি ক্রিয়ার বিশিষ্ট অর্থ ও তাহাদের ব্যবহার দেখাইবার জন্য বাক্য রচনা করিয়া দেওয়া হইল:

কাটা— (কাটিয়া যাওয়া)—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া উচিত নয়।
(ক্ষতি করা)—নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা মূর্খতা।
(লজ্জাহীন)—নাক-কান-কাটার আবার লজ্জা কি।
(তর্ক করা)—কথা কাটাকাটির শেষ অবস্থা মারামারি।
(অতিবাহিত করা)—সময় যে আর কাটে না!
(বিক্রি বা কাটতি হওয়া)—এত মাল কি করে কাটবে তই ভাবছি।
(মুখস্থ বলা)—বৃদ্ধা বেশ ছড়া কেটে কেটে কথা কন।
(ভঙ্গ হওয়া)—উহুঁ! তাল কেটে গেল, বাজনা ভাল জমল না।

আনা—(আনয়ন করা)—তাকে বাগে আনা বড় সহজ কথা নয়।
(উপার্জন করা)—ছেলেটি বেশ দু পয়সা আনছে।
(নকল করা)—ছাবটা প্রায় এনেছে, আর দু' একটা টান দিলেই হয়।

চলা— (সচল থাকা)—ঘড়িটি ঠিক চলছে কিনা দেখত'।
(প্রচলন থাকা)—নবাবী আমলের টাকা কি এখন চলে ?
(গমন করা)—কি হে চল্‌লে না কি ?
(সঙ্কুলান হওয়া)—এত অল্প আয়ে আমার চলবে কি করে ?

নাচা— (নৃত্য করা)—আজকাল অনেক মেয়ে নাচতে শিখেছে।
(কাঁপা)—ডান চোখ নাচলে লাভ হয়।
(উত্তেজিত হওয়া)—পরের কথায় নেচো না।

ধরা— (পাকড়ানো)—যে মাটিতে পড়ে লোক তাই ধরে ওঠে।
(অনুরোধ করা)—বড় বাবুকে একটু ধরলেই ছুটি পাবে।
(পাওয়া)—সাতটার ট্রেন কি ধরতে পারবে ?
(অবলম্বন করা)—এবার ভাল ভেক ধরেছে লোকটা।
(রোগ বিশেষ)—মাথা ধরেছে ত' শুয়ে পড়না !
(গ্রহণ করা)—ছেলে জেদ ধরেছে, তাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে।
(ফল পাওয়া)—ঔষধ তা হ'লে ধরেছে !
(বন্ধ হওয়া)—বৃষ্টি ধরলে তবে যাবো।
(অনুরোধ করা)—পায়ে ধরে সাধলেও আমি যাব না।
(পছন্দ করা)—বাড়ীটা মনে ধরছে, তবে দাম বড্ড বেশী।
(আরম্ভ করা)—"গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা।"

খাওয়া—(ঘুষ দেওয়া)—পুলিশকে কিছু খাওয়ালে কার্যসিদ্ধি হবেই।
(ভক্ষণ করা)—খাও দাও বগল বাজাও—তোমার আর ভাবনা কি ?
(গোপনে কিছু করা)—ডুবে ডুবে জল খেলে শিবও জানতে পারে না।
(আঘাত পাওয়া)—ধাক্কা খেয়ে যদি তার চৈতন্য হয় তবেই ভাল।
(নাকাল হওয়া)—একটা গোল করতেই ওরা হিমসিম খেয়ে গেছে।
(নষ্ট করা)—যত রাজ্যের বদ্‌সঙ্গী ছেলেটার মাথা খেয়েছে।

লাগা— (নিযুক্ত হওয়া)—আজ থেকে কাজে লেগেছি।
(বেদনা করা)—অত কি মারতে আছে, ওর ভীষণ লেগেছে।
(ব্যথিত হওয়া)—মায়ের মৃত্যুতে ছেলেটির বড় লেগেছে।
(মনোযোগ দেওয়া)—আজ পড়ায় মন লাগ্‌ছে না।
(দরকার হওয়া)—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।
(পাওয়া)—সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা অবধি বড ভয় লাগ্‌ছে।

মারা— (হত্যা করা)- ঠ্যাঙাড়েরা হাসতে হাসতে মানুষ মারত।
(আঘাত করা)—এত এগিয়ে আসছে কেন? মারবে নাকি?
(চুরি করা)—ক্যাসিয়ার বেশ মোটা টাকা মেরেছে।
(গর্ব করা)—অত চাল মারা তা বলে ভাল নয়।
(আন্দাজে কাজ করা)—অন্ধকারে ঢিল মারলে কি হয়?

পড়া— (পাঠ করা)—পড়াশুনা না করলে আখেরে খারাপ।
(কমে আসা)—"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।"
সোনার দাম খুব পড়ে গেছে।
(খরচ হওয়া)—এ কাপড়ের দাম অনেক পড়ে গেল।
(আহার করা)—এত বেলা হ'ল তবু পেটে কিছু পডল না।
(পতন হইয়া)—তার মাথার সব চুল পড়ে গেছে।
(জমা হওয়া)—ক'দিন দাঁত মাজোনি—দাতে বিশ্রী ছেৎলা পড়েছে।

চষা— (চাষ করা)—ভাল করে চাষ করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়।
(বার বার ঘোরা)—কলকাতা শহর চষে বেড়ালুম তবু একটা বাসা পেলুম না।

গাওয়া—(গান করা)—একটা গান গাওনা ভাই।
(মত প্রকাশ করা)—এখন আবার এ উল্টো সুর গাইছ কেন?
(বলা)—আমার বক্তব্যটা আগেই গেয়ে রাখা ভাল।

ওড়া— (বিচরণ করা)—পাখীরা আকাশে ওড়ে।
(বেপরোয়া খরচ করা)—বাপের সম্পত্তি ত' সব উড়িয়ে দিলে।
(উচ্ছৃঙ্খল হওয়া)—কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে ক' দিন খুব উড়েছে লোকটা।
(তাড়াতাড়ি কেটে যাওয়া)—সময় যেন উড়ে গেল।

রাখা—(স্থাপন করা)—লোকটি মন্দির স্থাপন করে নাম রেখে গেল।
(দেওয়া)—ছেলের নাম রাখা হ'ল পদ্মলোচন।
(সম্মান রক্ষা করা)—মুখ রেখো ঠাকুর।
(সন্তুষ্ট করা)—কর্তাদের মন রাখতে পারলুম কৈ?

বলা—(জানানো)—কর্তাকে একটু বলে রেখো।
ছেলের ভাতে বেশি লোককে বলবে নাকি।
(সাবধান করা)—ওসব চালাকি চলবে না বলে দিচ্ছি।
(অনুরোধ করা)—একটা গল্প বলতে বললুম শুনলে না।

চাটা—(লেহন করা)—চেটে পুটে খেয়ে নিও।
(তোষামোদ করা)—বড় লোকের পা চাটা যাদের ব্যবসা তাদের আর মনুষ্যত্ব থাকে নাকি?
(পরস্পরের সাহায্য করা)—দু'জনের যা গা চাটাচাটির ঠেলা তা আর কি বলব।

আসা—(আগমন করা)—কাল আসা চাই
(আয়ত্ত হওয়া)—কবিতা লেখা সকালর আসে না।
(ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়া)—তুমি পাশ করলে আমার কি আসবে যাবে:
(বিদায় লওয়া)—এখন আসি, ভাই।
(আয় হওয়া)—এখন ত' দু'পয়সা আসছে।

কয়েকটি বিশেষণ পদের বিশিষ্ট ব্যবহার

বিশেষণের কাজ বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করা। বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশেষ্যের সহিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিশেষণই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সেগুলির ব্যবহার না করিলে বাক্য শ্রুতিকটু মনে হয়; এইরূপ কয়েকটি বিশেষণের উদাহরণ দেওয়া হইল:

অপ্রতিহত প্রভাব
অবশ্যম্ভাবী পরিণাম
অভ্রভেদী চূড়া
অব্যক্ত বেদনা
অপরিশোধ্য ঋণ
আগ্নেয় গিরি
আদ্যন্ত বিবরণ
আলুলায়িত কুন্তল
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা
আয়ত লোচন
অবাধ গতি
উদ্দাম প্রবৃত্তি
ঐকান্তিক বাসনা
ঐহিক সুখ
দুর্বিষহ দুঃখ

অক্ষয় স্বর্গ
অধস্তন কর্মচারী
অশরীরী আত্মা
ফেনিল সমুদ্র
প্রাণান্ত প্রয়াস
নিরপেক্ষ বিচাব
ওষ্ঠাগত প্রাণ
দিগ্বিজয়ী বীর
ভুয়সী প্রশংসা
দুরতিক্রম্য বাধা
নিষ্ফল প্রয়াস
দোর্দণ্ড প্রতাপ

অতুল ঐশ্বর্য
অন্তিম শয়ন
উৎকট ব্যাধি
পঙ্কিল সরোবব
স্তিমিত প্রদীপ
নিরাকার ব্রহ্ম
দাতব্য চিকিৎসালয়
চূড়ান্ত নম্পত্তি
অনাঘ্রাত কুসুম
দুস্তর সমুদ্র
সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি
নক্ষত্রখচিত আকাশ
আকস্মিক দুর্ঘটন।

দুর্লঙ্ঘ্য গিরি
নিষ্কাম কর্ম
নিষ্কলুষ চরিত্র
ত্রিকালজ্ঞ ঋষি
লেলিহান অগ্নিশিখা
ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া
দাম্পত্য কলহ
দেবদুর্লভ চরিত্র
অচলা ভক্তি
দুরারোগ্য ব্যাধি
প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি
অতুল ঐশ্বয

প্রবাদ-বাক্যমালা

প্রবাদ ভাষার রত্ন বিশেষ। ভাষায় প্রবাদের গৌরব অত্যন্ত বেশী। ইহার আদর সর্বসাধারণ্যে অত্যধিক। পুস্তক পাঠে অক্ষম নিরক্ষব ব্যক্তির নিকটও প্রবাদের অর্থ বোধগম্য। প্রবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া ভাষায় স্থায়ী আসন দখল করে। প্রবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজ। বিদ্বান-মূর্খনির্বিশেষে সকলেই ইহার অর্থ বুঝে; প্রবাদগুলির গঠনেব নৈপুণ্যের জন্য তাহা সহজে মুখস্থ হইয়া যায়। প্রবাদের ভাষায় ভার নাই কিন্তু ঝঙ্কার ও সঙ্গতি আছে। ইহা কবিতা-ধর্মী। কবিতার ন্যায় মিলের বাঁধনে বাঁধা ও শ্রুতিমধুর।

এই প্রবাদ ভাষার প্রাচীন অংশ। কে কবে যে প্রবাদগুলি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এখন আর নির্ণয় করা যায় না। তবে বর্তমানে বহু সাহিত্যিকের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। যেমন 'ধনুর্ভঙ্গ পণ'; 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'; 'রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে'; 'অগ্নিপরীক্ষা';

'বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার।' 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ'—বলা বাহুল এগুলো রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অহিংসা পরম ধর্ম—অহিংসা সব চেয়ে বড় ধর্ম।

অতি দর্পে হত লঙ্কা—বেশী অহঙ্কার করিতে নাই।

দশে মিল করি কাজ হারি জিতি নেই লাজ—একতাই শক্তি।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস—ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধির উপায়।

বেগার খাটবে ত বেকার থাকবে না—নিষ্কর্মা থাকা ভাল নয়।

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ—সংসর্গের ফলেই সুখদুঃখ।

বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে—বিনয় মহত্ত্বের লক্ষণ।

অতি বাড় বেড়ো নাক ছাগলে মুড়াবে—বেশী অহঙ্কার পতনের কারণ।

ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া—কাজ শেষ হইবার সময়ে উদ্যোগ আয়োজন।

যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর—কৃতঘ্নতা পীড়াদায়ক।

দশে যদি বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি—লোক নিন্দা মৃত্যুতুল্য।

পড়শীর মুখ না আর্শির মুখ—যেমন দেখাও তেমনি দেখবে।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়— ঐ

দিন থাকতে না বাঁধে আল, তার দুঃখ চিরকাল—আগে থাকতে ব্যবস্থা না করলে পরে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—প্রতিজ্ঞা করে কাজ না করলে সংসারে সাফল্য লাভ করা যায় না।

চাষা কি জানে মদের স্বাদ—অনধিকারীর কথা বলা সাজে না।

ধনের মাথায় ধর ছাতি, কুলের মাথায় মার লাথি—বংশ মর্য্যাদার চেয়ে অর্থের কদর বেশী।

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—বেশী বুদ্ধিমান কোন কাজ করতে পারে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—বেশী ভক্তি ভাল নয়, কপটতা মাত্র।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—বেশী লোভের পরিণাম খারাপ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এক কাজে বেশী লোক নামলে কাজ পণ্ড হয়।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে—দুর্জনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেই সে জব্দ থাকে

অল্পজলে পুঁটিমাছ ফর্ ফর্ করে—অল্পবিদ্যা লোকের বচন বেশি।

আকাশে থুথু ফেললে আপন গায়ে পড়ে—ভাল লোকের নিন্দা করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই তুমি বড় খস খসে—নিজে দোষে ভরা আবার অপরের দোষ দেখে।

আসর ঘরে মশাল নাই ঢেঁকি শালে চাঁদোয়া—প্রয়োজনীয় খরচ করতে পারে না, অপ্রয়োজনীয় বাজে খরচ করে।

উঠন্তি মূলো পত্তনে চেনা যায়—আরম্ভ দেখে কাজের ফল বিচার করা যায়।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা—লোকের অনুরোধে অনিচ্ছায় কিছু করা।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ান—বৃথা সদুপদেশ দেওয়া।

কচুর বেটা ঘেচু বড় বাড়েন ত মান—খারাপ লোকের ছেলে খারাপই হয়।

কতই বা দেখব আর ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অনুপযুক্ত ব্যক্তির মান বৃদ্ধি।

কপালে নাইক ঘি, ঠকঠকালে হবে কি—অদৃষ্ট ছাড়া গতি নাই।

কম্বলের লোম বাছলে হবে কি—মানুষের বেশী দোষ ধরা উচিত নয়।

ফলেন পরিচিয়তে—চিকিৎসক চিনতে পারি যার ঔষধ মজবুত।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁস ট্যাঁস—অল্প বয়সে শিক্ষা না দিলে বেশি বয়সে কিছু হওয়া ভার।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে কাড়ে রা—জাতীয় স্বভাব যায় না।

গরীবের ছেলের ঘোড়া রোগ—কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্কে আশ।

খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুব দিয়ে পার হওয়া—অপরকে পয়সা দিয়ে নিজে হেটে মরা।

গাইতে গাইতে গায়েন বাজাতে বাজাতে বায়েন—চেষ্টায় সব হয়।

চালের কত দর, না মামার ভাতে আছি—পরের ধনে পোদ্দারী।

সূচ, সোহাগা, সুজন ভাঙ্গা গড়ে তিন জন—ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়াই ভাল লোকের কাজ।

শামুক খেয়ে দাঁত কালো লোকে বলে আছে ভাল—যার দুঃখ সেই বোঝে।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল—যে দেশে গাছ নেই সেখানে ভেরাণ্ডা গাছই মহীরুহ।

যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে—যে যে কাজের উপযুক্ত তাকে সে কাজ না দিলে অনুপযুক্ত লোকের শুধু খাটাই সার হয়।

দশচক্রে ভগবান ভূত—দশজন সত্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে।

কয়লা না ছাড়ে ময়লা—স্বভাবগত দুষ্টামি প্রকাশ হবেই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়—দুঃসময়েই বিপদ আসে।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে—সত্য প্রচার না করলেও সত্য থাকে ও পরে তাহা প্রকাশিত হয়।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে—অনভ্যস্ত লোক সুখে ঠিক স্বস্তি পায় না।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—বেপরোয়া খরচ ভাল নয়।

ছেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়—ছোট কাজ করবার ক্ষমতা নেই, বড় কাজে হাত দেয়।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল—দৈহিক বল ও অর্থবল না থাকলে কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

হাতী আড়ে পড়লে চামচিকেও লাথি মারে—লোক বেকায়দায় পড়লে অনেকেই সুযোগ বুঝে তার ক্ষতি করে।

সেরকে পশুরি চুরি—খুব বেশি ঠকান।

সোনা ফেলে আঁচলে গেরো—বহুমূল্য দ্রব্যকে তুচ্ছ করিয়া সামান্য জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া।

সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না—কড়া না হলে কাজ আদায় করা যায় না।

সব শিয়ালে খেলে কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা—আসল দোষীকে ছেড়ে নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া।

শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা—নিজের মর্যাদা ছেড়ে হীন ব্যক্তির সংসর্গ।

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল মাছ পালায়—অদৃষ্ট খারাপ হ'লে তখন সবই খারাপ হয়

যার দৌলতে চুয়াচন্দন তারি পাতে খোলা ব্যঞ্জন—যাহার অর্থে উৎসব, তাহাকেই অবহেলা।

বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া—দুঃসময়েই দেবতায় ভক্তি দেখা দেয়।

কড়ায় কড়া, কাহনে কাণা—ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়, বড় ব্যাপারে উদাসীন।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি—বিনা কষ্টে সুখভোগের ইচ্ছা।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—সত্য আপনিই প্রকাশিত হয়।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না—সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আদর হয় না, যখন সে দ্রব্য নষ্ট হয় তখন তার জন্য আফশোস হয়।

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হ'ল—লোকের দ্বারা কাজ পাওয়া গেলে তার অন্য দোষ ধরা উচিত নয়।

জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়—যার গরজ সেই এগোবে।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ—হীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে না লাগাই ভাল।

ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো—অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে কাজ করানো।

চালুনি করে ঘোল বিলান—কাজে বড় বড় বক্তৃতা করা।

ঘি দিয়ে ভাজা নিমের পাতা, তবুও না যায় তার জাতের তিতা—দুষ্ট স্বভাব সহজে যায় না।

গাঁ বড়, তার মাঝের পাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া—অনর্থক ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে আড়ম্বর করা।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে—অল্পে সন্তুষ্ট না হয়ে অতি লোভে সব হারানো।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে—নীচ ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিতে নাই।

কামারকেই ইস্পাত ফাঁকি—বেশী কৃপণতা করলে সব সময়ে লাভ হয় না।

বাক্যাংশ সংকোচন

বাক্যের কতক কতক অংশ সঙ্কুচিত করিয়া একটি পদে সেই অর্থ প্রকাশ করা যায়। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা সঙ্কোচন করা যায়। আবার সন্ধি বা সমাসের দ্বারাও সঙ্কোচন করা যায়।

ভাষায় যখন যেটি শ্রুতিমধুর হইবে বা বক্তব্য বিষয়ের বাক্য-বিন্যাসে সঙ্গতি রক্ষা করিবে তখন সেইরূপ ব্যবহার করা দরকার। কখনও সংকোচনের প্রয়োজন আবার কখনও বা বিস্তৃতি-করণের প্রয়োজন হইবে। নিম্নের উদাহরণগুলি মন দিয়া লক্ষ্য কর:—

যিনি সাহিত্য চর্চা করেন—**সাহিত্যিক**

যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন—**বৈজ্ঞানিক**

যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত—**বৈয়াকরণ**

যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় না—**অশ্রুতপূর্ব**

যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই—**অদৃষ্টপূর্ব**

যাহা পূর্বে কখনও চিন্তা করা যায় নাই—**অচিন্তিতপূর্ব**

যাহা পূর্বে কখনও জানা যায় নাই—**অজ্ঞাতপূর্ব**

যাহা পূর্বে কখনও ঘটে (হয়) নাই—**অভূতপূর্ব**
যাহা পূর্বে কখনও আস্বাদিত হয় নাই—**অনাস্বাদিতপূর্ব**
যাহা পূর্বে কখনও ঘ্রাণ করা হয় নাই—**অনাঘ্রাতপূর্ব**
যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে—**জিতেন্দ্রিয়**
যে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে—**ইন্দ্রজিৎ**
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—**পণ্ডিতম্মন্য**
যে কর্তব্য স্থির করিতে পারে না—**কিংকর্তব্যবিমূঢ়**
যে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—**পরমুখাপেক্ষী**
যে পরের সৌভাগ্যে কাতর হয়—**পরশ্রীকাতর**
যে বাঁচিয়াও মরার মত—**জীবন্মৃত**
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না—**অকৃতজ্ঞ**
যে গুণীর গুণ বুঝিতে পারে—**গুণগ্রাহী**
যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না—**নাস্তিক**
যে বিদেশে থাকে না—**অপ্রবাসী**
যে পরিণাম চিন্তা করিয়া কাজ করে না—**অপরিণামদর্শী**
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—**কৃতার্থম্মন্য**
যে অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—**অগ্রজ**
যে পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—**অনুজ**
যিনি ইতিহাস লিখেন—**ঐতিহাসিক**
যে তীর নিক্ষেপ করে—**তীরন্দাজ**
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে—**প্রোষিতভর্তৃকা**
যে নারী কখনও সূর্য দেখে নাই—**অসূর্যম্পশ্যা**
যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে—**সর্বভুক**
যে পিপীলিকা ভক্ষণ করে—**পিপীলিকাভুক্**
যে শুভ অনুধ্যান করে—**শুভানুধ্যায়ী**
যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়াছে—**বিধবা**
যে স্ত্রীলোক প্রিয় (বাক্য) বলে—**প্রিয়ংবদা**
যে নারীর সন্তান হইয়া মরিয়া যায়—**মৃতবৎসা**
যে নারীর একবার সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে আর সন্তান হয় না—**কাকবন্ধ্যা**
যে নারীর সন্তান হয় না—**বন্ধ্যা**
যে বার বার কাঁদিতেছে—**রোরুদ্যমান**

যে শুনিতে ইচ্ছুক—**শুশ্রূষু**
যে জানিতে ইচ্ছুক—**জিজ্ঞাসু**
যে নারীর নূতন বিবাহ হইয়াছে—**নবোঢ়া**
যে গলায় কাপড় দিয়াছে—**গলবস্ত্র**
যে নারীর হাসি শুচি—**শুচিস্মিতা**
যে বাস্তুত্যাগ করিয়াছে—**বাস্তুত্যাগী**
যে বৃক্ষের ফুল না হইলেও ফল হয়—**বনস্পতি**
যে আদব কায়দা জানে না—**বেয়াদপ**
যে গাছ বৎসরে দুবার ফল দেয়—**দোফলা**
যে গাছ কোন কাজে লাগে না—**আগাছা**
যে সামলাইতে পারে না—**বেসামাল**
যে কিছুতেই পরোয়া করে না—**বেপরোয়া**
যে শত্রুকে বধ করিয়াছে—**শত্রুঘ্ন**
যে সহ্য করিতে পারে না—**অসহিষ্ণু**
যে স্ত্রীর বশীভূত—**স্ত্রৈণ**
যে অল্প কথা বলে—**অল্পভাষী**
যে নিরামিষ ভোজন করে—**নিরামিষাশী**
যে দার পরিগ্রহ করে নাই—**অকৃতদার**
যে বেতন গ্রহণ করে না—**অবৈতনিক**
যে উপকারীর অনিষ্ট করে—**কৃতঘ্ন**
যে কন্যার বিবাহ না দিয়া রাখা চলে না—**অরক্ষণীয়া**
যে অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—**বিপক্ষ**
যে মুক্তির ইচ্ছা করে—**মুমুক্ষু**
যে ভূমিতে ভাল ফসল জন্মে না—**অনুর্বর**
যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে—**অবিমৃষ্যকারী**
যে শক্তির উপাসনা করে—**শাক্ত**
যে শিবের উপাসনা করে—**শৈব**
যে বিষ্ণুর উপাসনা করে—**বৈষ্ণব**
যে অন্যকর্ম করে না—**অনন্যকর্মা**
যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে—**দীর্ঘজীবী**
যে পিতাকে হত্যা করিয়াছে—**পিতৃহন্তা**

যে সুপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—**উন্মার্গগামী**
যে সব জানে বলিয়া মনে করে—**সবজান্তা**
যে জামাই শ্বশুর বাড়ীতে থাকে—**ঘর-জামাই**
যাহা সহজে জীর্ণ হয়—**সুপাচ্য**
যাহা লঙ্ঘন করা যায় না—**অলঙ্ঘণীয়, অলঙ্ঘ্য**
যাহা সহজে জীর্ণ হয় ন—**দুষ্পাচ্য**
যাহা লঙ্ঘন করা কঠিন—**দুর্লঙ্ঘ্য**
যাহা নিবারণ করা যায় না—**অনিবার্য**
যাহা অনেক কষ্টে নিবারণ করা যায়—**দুর্নিবার্য**
যাহা পুনঃপুনঃ দুলিতেছে—**দোদুল্যমান**
যাহা বিনা কষ্টে লাভ করা যায়—**অনায়াসলভ্য**
যাহা কষ্টে লাভ করা যায়—**দুর্লভ**
যাহা হইতে পারে না—**অসম্ভব**
যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—**চিরন্তন**
যাহা মর্মে আঘাত করে—**মর্মন্তুদ**
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—**ভঙ্গুর**
যাহা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—**খেচর**
যাহা চিবাইয়া খাওয়া যায়—**চর্ব্য**
যাহা চুষিয়া খাওয়া যায়—**চোষ্য**
যাহা চাটিয়া খাওয়া যায়—**লেহ্য**
যাহা লাফাইয়া চলে—**প্লবঙ্গ**
যাহা উদিত হইতেছে—**উদীয়মান**
যাহা ছেদন করা যায় না—**অচ্ছেদ্য**
যাহা দহন করা যায় না—**অদাহ্য**
যাহা শোষণ করা যায় না—**অশোষ্য**
যাহা ছেদন করা কঠিন—**দুশ্চেদ্য**
যাহা ভেদ করা যায় না—**অভেদ্য**
যাহা ভেদ করা কঠিন—**দুর্ভেদ্য**
যাহা জল্ জল্ করিতেছে—**জাজ্বল্যমান**
যাহা খুব বেশী লম্বা নয়—**নাতিদীর্ঘ, অনতিদীর্ঘ**
যাহা খুব শীতও নয় খুব উষ্ণও নয়—**নাতিশীতোষ্ণ**

যাহা ডুবিয়া যাইতেছে—**নিমজ্জমান**
যাহা বেলাভূমি অতিক্রম করে—**উদ্বেল**
যাহা দেওয়া যায় না—**অদেয়**
যাহা পানের অযোগ্য—**অপেয়**
যাহা অষ্ট প্রহর পরা যায়—**আটপৌরে**
যাহা সহজে অপনয়ন করা যায় না—**দুরপনেয়**
যাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে—**প্রস্তরীভূত**
যাহা মাটি ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উঠে—**উদ্ভিদ্**
যাহা অবশ্য হইবে—**অবশ্যম্ভাবী**
যাহা ভাসিতেছে—**ভাসমান**
যাহা কোথাও নীচু কোথাও উঁচু—**উচ্চাবচ**
যাহা চিরস্থায়ী নয়—**নশ্বর**
যাহা উড়িয়া যাইতেছে—**উড্ডীয়মান**
যাহা উচ্চারণ করা কঠিন—**দুরুচ্চার্য**
যাহা পরে হইবে—**ভাবী**
যাহার দাড়ি জন্মে নাই—**অজাতশ্মশ্রু**
যাহার শত্রু জন্মে নাই—**অজাতশত্রু**
যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে—**বিপত্নীক**
যাহার অন্য গতি নাই—**অনন্যগতি**
যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না—**অতলস্পর্শ**
যাহার অন্যদিকে মন নাই—**অনন্যমনা**
যাহার পুত্র নাই—**অপুত্রক**
যাহার পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হয়—**জাতিস্মর**
যাহার জন্য কর দিতে হয় না—**নিষ্কর**
যাহার কিছুই নাই—**অকিঞ্চন**
যাহার শোনামাত্র মুখস্থ হয়—**শ্রুতিধর**
যাহার ভিতরে সার নাই—**অন্তঃসারশূন্য**
যাহার অনেক কিছু দেখা আছে—**বহুদর্শী**
যাহার সব কিছু গিয়াছে—**সর্বহারা**
যাহার সব কিছু চুরি গিয়াছে—**হৃতসর্বস্ব**
যাহার ভিতরে সার আছে—**সারগর্ভ**

যাহার স্পৃহা দূর হইয়াছে—**বীতস্পৃহ**
যাহার অন্য কোন উপায় নাই—**অনন্যোপায়**
যাহার পরিমাণ করা যায় না—**অপরিমেয়**
যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত—**মুমূর্ষু**
যাহার রসবোধ আছে—**রসিক**
যাহার দুই হাত সমান চলে—**সব্যসাচী**
যাহার অন্য কোন কর্ম নাই—**অনন্যকর্মা**
যাহার শরণ গ্রহণ করা হয়—**শরণ্য**
যাহার মমতা নাই—**নির্মম**
যাহার এখনও বালকত্ব কাটে নাই—**নাবালক**
যাহার ভাতের অভাব আছে—**হাভাতে**
যাহার গ্রীবা সুন্দর—**সুগ্রীব**
যাহার কামনা দূর হইয়াছে—**বীতকাম**
যাহার ঘরের অভাব আছে—**হাঘরে**
যাহার আদি নাই—**অনাদি**
যাহার তল নাই—**অতল**
যাহার উপমা নাই—**নিরুপম**
যাহার অভিমান নাই—**নিরভিমান**
যাহার পুত্র নাই—**অপুত্রক**
যাহার কোথা হইতে ভয় নাই—**অকুতোভয়**
যাহার চিত্ত এক বিষয়ে নিবিষ্ট আছে—**একাগ্রচিত্ত**
যাহার বুদ্ধি পরিণত হয় নাই—**অপরিণতবুদ্ধি**
যাহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিবার যোগ্য—**প্রাতঃস্মরণীয়**
যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে—**সহিষ্ণু**
যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই—**অসহিষ্ণু**
যাহার আসক্তি নাই—**অনাসক্ত**
যাহার হুঁশ নাই—**বেহুঁশ**
যাহার চলিবার শক্তি নাই—**চলচ্ছক্তিহীন**
যাহারা এক মাতার উদরে জন্মিয়াছে—**সহোদর**
যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়—**যাযাবর**
খেলায় যে পটু—**খেলোয়াড়**

কাঠের দ্বারা নির্মিত—**কেঠো**
পা হইতে মাথা পর্যন্ত—**আপাদমস্তক**
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া—**যাবজ্জীবন**
হস্ত, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার—**চতুরঙ্গ**
ইহলোকে যাহা সাধারণ নয়—**অলোকসামান্য**
কুশের অগ্রভাগের ন্যায় (সূক্ষ্ম) বুদ্ধি যাহার—**কুশাগ্রবুদ্ধি**
যিনি স্বয়ং সৃষ্ট হইয়াছেন—**স্বয়ম্ভু**
ব্যাসের পুত্র—**বৈয়াসকি**
দশরথের পুত্র—**দাশরথি**
কুন্তীর পুত্র—**কৌন্তেয়**
কোন্‌টা দিক্ কোনটা বিদিক্ যাহার এ জ্ঞান নাই—**দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য**
মুষ্টি যাহার পরিমাণ করা যায় না—**মুষ্টিমেয়**
মাথা পাতিয়া লইবার যোগ্য—**শিরোধার্য**
প্রথমে মধুর পরিণামে নয়—**আপাতমধুর**
হনন করিবার ইচ্ছা—**জিঘাংসা**
একই গুরুর শিষ্য যাহারা—**সতীর্থ**
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে—**নিদাঘ** (গ্রীষ্মকাল)
লাভ করিবার ইচ্ছা—**লিপ্সা**
বমন করিবার ইচ্ছা—**বিবমিষা**
একই সময়ে বর্ত্তমান—**সমসাময়িক**
আপনার তুল্য—**ভবাদৃশ**
শিক্ষা করিতেছে—**শিক্ষানবীশ**
নকল করা অভ্যাস করিতেছে যে—**নকলনবীশ**
অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—**অনুসন্ধিৎসা**
পান করিবার ইচ্ছা—**পিপাসা**
অপকার করিবার ইচ্ছা—**অপচিকীর্ষা**
উপকার করিবার ইচ্ছা—**উপচিকীর্ষা**
ভোজন করিবার ইচ্ছা—**বুভুক্ষা**
জানিবার ইচ্ছা—**জিগীষা**
যে জলে ও স্থলে চরে—**উভচর**
দুয়ের মধ্যে একটি—**অন্যতর**

যে পুরাকালের বিষয় জানে—**পুরাতাত্ত্বিক**
যে পংক্তিতে বসিবার অযোগ্য—**অপাংক্তেয়**
*ঋষির দ্বারা উক্ত—**আর্য**
*ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়—**ওষধি**
যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে—**প্রত্যুৎপন্নমতি**
যাহা বাক্য ও মনের অগোচর—**অবাঙমনসগোচর**
যে অপরের অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে—**নিরালম্ব**
যাহার বইন আলগা থাকে—**অসংবৃত**
যাহার অশ্রু বিগলিত হইতেছে—**গলদশ্রু**
নদী মাতা যাহার—**নদীমাতৃক**
দ্বারে থাকে যে—**দৌবারিক**
ভক্তের বাঞ্ছা যিনি পূরণ করেন—**ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু**
যাহার আহারে সংযম আছে—**মিতাহারী**
মজলিস জমাইতে যে দক্ষ—**মজলিসী**
বৈঠক জমাইতে যে দক্ষ—**বৈঠকী**
যাহার কুলশীল জানা নাই—**অজ্ঞাতকুলশীল**
আপনার রং যে লুকাইয়া রাখে—**বর্ণচোরা**
আপনাকে যে হত্যা করে—**আত্মঘাতী**
যাহার অন্য কোন সহায় নাই—**অনন্যসহায়**
*আটমাসে যে ছেলে জন্মাইয়াছে—**আটাসে**
*জানু পর্যন্ত লম্বিত—**আজানুলম্বিত**
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত—**আকর্ণবিস্তৃত**
যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না এখন ভস্ম হইয়াছে—**ভস্মীভূত**
যাহা পূর্বে দ্রব ছিল না এখন দ্রব হইয়াছে—**দ্রবীভূত**
শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া—**যথাশক্তি**
কেহ জানিতে পারে না এমন ভাবে—**অজ্ঞাতসারে**
আতপ হইতে যে ত্রাণ করে—**আতপত্র**
যে নারীর অসূয়া নাই—**অনসূয়া**
যাহাতে পাঁচ রকম জিনিস মিশান আছে—**পাঁচমিশালী**
যাহা হাতের বাহিরে—**বেহাত**
মানানের অভাব—**বেমানান**
নুনের অভাব—**আলুনি**
দ্বীপের সদৃশ—**উপদ্বীপ**

কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ

সে **হনহন্** কবিয়া চলিয়া গেল।
বালকটিব দাঁত **কন্‌কন্** কবিতেছে।
বালিকাটিব মাথা **টন্‌টন্** কবিতেছে।
আমার মাথা **বোঁ বোঁ** কবিযা ঘুবিতেছে।
পড়াগুলি **ধাঁ ধাঁ** কবিযা সাবিয়া লও।
সৈন্যবা **গট্‌গট্** কবিযা চলিয়া গেল।
বাতদিন অত **হো হো-হি-হি** কবিয়া হাসি ভাল লাগে না।
সেই অন্ধকাব প্রতিধ্বনিত কবিযা পিশাচ **খল্‌খল্** কবিযা হাসিয়া উঠিল।
মেঘেব ফাঁকে সূর্য দেখা দিয়াছে, যেন সূর্য **ফিক্ ফিক্** কবিযা হাসিতেছে।
কথাটি শুনিয়া তাহাব চক্ষু **ছল্‌ছল্** কবিতে লাগিল।
ঢাকাই মসলিনেব মত **ফিন্ ফিনে** কাপড আব কেহই বুনিতে পাবিত না।
ছিপছিপে ঐ লোকটিব নামই বামবাবু।
কন্‌কনে ঠাণ্ডায় কি বাহিব হওয়া যায়?
সাপটাব **লক্‌লকে** জিভ দেখিযা ভয়ে আমাব প্রাণ শুকাইয়া গেল।
লোকটাব কথা শুনিয়া বাগে আমাব সর্বশবীব **রী-রী** কবিযা জলিয়া উঠিল।
ফুর্ ফুরে হাওয়ায় কিছুক্ষণেব মধ্যেই আমাব জ্ঞান ফিবিল।
নদীব ধাবে গিয়ে একটু **ঝির্ ঝিরে** হাওয়া খেয়ে এস না।
কয়দিনেব বৃষ্টিতে পুকুবেব জল যেন **থৈ থৈ** করিতেছে।
শূন্য মরুভূমিতে কেহ কোথাও নাই। গাছপালা নাই—বিরাট শূন্যতা **খাঁ খাঁ** কবিতেছে।
ঝাঁ ঝাঁ বোদ্দুবে আজ আর বাহিবে যাইও না।
এই **চন্‌চনে** ক্ষিদেব সময় যা দেবে তাই খাব।
শ্মশানেব কাছ দিয়ে অন্ধকাব বাত্রে যেতে গেলে গা **ছম্‌ছম্** করে।
মহামাবীব নাম শুনেই লোকটা **চোঁ চোঁ** দৌড় দিল।
জননীর প্রাণ সন্তানেব দুঃখে **হু হু** কবে উঠে।
"**ফুটফুটে** জোছনায়, একা শুয়ে বিছানায়"।

টুক টুকে লাল পাড় শাড়ী পরলে স্ত্রীলোককে ভারী সুন্দর দেখায়।
শিমুল ফুল **টক্‌টকে** লাল।
—**দগ্‌ দগে** ঘা'টা দেখলে গায়ের ভিতরে কেমন করে।
বক যেমন **ধব্‌ধবে** শাদা কাক তেমনি **কুচ্‌কুচে** কাল।
অবেলায় খেয়ে প্রাণটা **আই ঢাই** করছে।
অত **উস্‌খুস্‌** করছ কেন? কি হয়েছে?
কড়্‌ কড়্‌ শব্দে বাজ পড়ল।
ব্যাংগুলো **কট্‌ কট্‌** করে ডাকছে।
লোকটা সারা রাত **খক্‌ খক্‌** করে কাসে।
কথা বললেই যে **খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌** কর, শরীর কি ভাল নেই?
খুঁত খুঁতে ছেলেটা রাতদিন **খুঁত খুত** করে।
রাগে **গর্‌ গর্‌** করতে করতে সে চলে গেল।
ঘুস্‌ ঘুসে জ্বর মোটেই ভাল নয়, আজই ডাক্তার দেখাও।
চট্‌পট কাজ সেরে নাও, এখনি যেতে হবে।
অন্ধকার রাত্রে আকাশে নক্ষত্রগুলো **চিক্‌চিক্‌** করে জ্বলছে।
উঠানটা **তকতকে ঝকঝকে**—কোথাও এতটুকু ময়লা নেই।
বেড়ালটার গা **তুলতুলে** নরম।
থুড়থুড়ো বুড়োটা **থরথর** করে কাঁপছে।
ভোলানাথের আঁখি দুটী নেশায় **ঢুলু ঢুলু**।
অমন **ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌** করে তাকিয়ে কি দেখছ?
মেঝেটা ভিজে **সপ সপ** করছে, মাছি **ভন্‌ ভন্‌** করছে—দেখে **আমার** গা **ঘিন্‌ ঘিন্‌** করছে।
পাতে দৈ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে **হাপুস্‌ হাপুস্‌** শব্দ উঠল।
ছেলেরা পূজার বাজনা **শুনে ধেই ধেই** করে নাচতে **শুরু** করে দিল।
সভায় লোক **গম্‌ গম্‌** করছে এমন সময়ে লাঠি হাতে পুলিশ এসে পড়ল।
অমনি চতুর্দিকে **হৈ হৈ** রৈ রৈ পড়ে গেল।
পাগলটা **বিড় বিড়** করে রাত দিন কি সব বকে।
বাজে **বক বক** কোরো না—একটু স্থির হয়ে শোদ।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা বাগ্‌ধারা

(Idioms)

প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি চিরাচরিত বাগ্‌ধারা আছে। সেগুলি সেই ভাষায় অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কথায় কথায় মানে করিয়া অর্থগ্রহণ করা যায় না। বিশেষ কতকগুলি অর্থ প্রকাশের জন্যই সেগুলি ব্যবহৃত হয়। সেই ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইলেই সেই গূঢ়ার্থ জানা যায়। ইংরেজীতে ইহাদের Idiom বলে। বাংলাভাষায় ইহাদের **বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ** বা **বাক্‌ধারা বলে।** এই বাগ্‌ধারা ভাষার প্রাণ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এরূপ বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের কয়েকটি উদাহরণ ও তাহাদের ব্যবহারের রীতি দেওয়া হইল।

অ

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)—ঐ হাড়কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (আন্দাজে কাজ করা)—যদি ঠিক জান তো বলো, অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে লাভ কি ?

অকাল কুষ্মাণ্ড (অকর্মণ্য লোক)—বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে খায়, দায় আর ইয়ার্কি করে বেড়ায়।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি)—ছেলেটি বিধবা মায়ের নয়নের মণি—অন্ধের যষ্টি ।

অর্ধচন্দ্র দেওয়া (গলাধাক্কা দেওয়া)—সভা থেকে তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিল।

অকূলে কূল পাওয়া (নিরুপায় অবস্থায় কিছু সুবিধা করা)—পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে সেই শহরে আমি যেন অকূলে কূল পেলাম।

অগস্ত্যযাত্রা (চির বিদায় নেওয়া)—দেখো যেন অগস্ত্যযাত্রা করো না—মাঝে মাঝে এসো।

অহিনকুল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা)—আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্বন্ধ যেন অহিনকুল সম্বন্ধ। **(সাপে-নেউলে)।**

অনেক (গভীর) জলের মাছ (ভীষণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক)—হরি বাবুকে অত সহজে চিনবে তুমি ? উনি অনেক (গভীর) জলের মাছ।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)—তারপর আর কি ? যেমন কর্ম তেমনি ফল—শেয়াল অক্কা গেল।

অকূল পাথার (এমন বিপদ যার থেকে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর)—চাকরিটি যখন গেল তখন আমি ছেলেপিলে নিয়ে অকূল পাথারে পড়লাম।

অথৈ জল (ভীষণ বিপদ)—এই বিদেশ বিভুঁয়ে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই—আমি যেন অথৈ জলে পড়ে গেছি।

অন্ধকারে থাকা (কিছু না জানা)—কি বলব ভাই, এখনও আমি অন্ধকারেই রয়েছি—কিছুই জানাত পারিনি।

অশ্বডিম্ব (অবাস্তব বস্তু)—এত আশা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দিলে অশ্বডিম্ব।

অমাবস্যার চাঁদ (যাহাকে দেখাই যায় না)—রাম বাবুর দেখা পাবে কোথায় ? তিনি যে অমাবস্যার চাঁদ।

আ

আহ্লাদে আটখানা (অত্যন্ত আনন্দিত)—লটারীতে টাকা পেয়ে সমীরবাবু আহ্লাদে আটখানা।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)—বসে বসে আকাশ-কুসুম না ভেবে কিছু কাজ কর।

আকাশ পাতাল ভাবা (বেশী চিন্তা করা)—আকাশ পাতাল না ভেবে কাজে লেগে যাও, বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।

আক্কেলসেলামী (খেসারৎ, বোকামির দণ্ড)—বিনা টিকিটে রেলে চড়তে বেশ আক্কেলসেলামী গেছে।

আকাশ পাতাল প্রভেদ (খুব বেশী পার্থক্য)—তুমি ধনী, আর আমি গরীব—তোমাতে আর আমাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আক্কেল গুড়ুম (হতভম্ব হয়ে যাওয়া)—ভদ্রলোকের ছেলেকে পকেট মারতে দেখে আমার ত' আক্কেল গুড়ুম।

আঠার মাসে বছর (বিলম্বে কাজ করা)—দেখে শুনে ওকে কাজের ভার দিলে ? ওর ত' আঠার মাসে বছর।

আদায় কাঁচকলায়—'অহিনকুল সম্বন্ধ' দেখ।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (সহসা ভাগ্যোন্নতি) ঘোড়দৌড়ে টাকা জিতে আজ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তাই আমাদের চিনতে পারে না।

আলালের ঘরের দুলাল (বড়লোকের ঘরের অপদার্থ)—আলালের ঘরের দুলাল দিয়ে কি কাজ হবে—ওর চেয়ে গরীবের ঘরের হরিদাস ঢের ভাল।

আদাজল খেয়ে লাগা (খুব দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগা) "আদাজল খেয়ে লাগ, পাশ কর এবারে।"

আপন কোলে ঝোল টানা (স্বার্থ সিদ্ধি করা)—আপন কোলে ঝোল না টেনে একটু আমাদের দিকে তাকিও।

আমড়াগাছি করা (খোশামোদ করা)—থাক, আর আমড়াগাছি করতে হবে না, কি চাও বলো দেখি।

আঁতে ঘা দেওয়া (মর্মান্তিক শ্লেষ করা)—লোকের আঁতে ঘা দিয়ে কথা কইতে নাই।

আড়ি পাতা (আড়াল থেকে শোনা)—আড়িপেতে তাদের সব পরামর্শ শুনেছি।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (ভঙ্গুর, অকেজো)—বড়লোকের ছেলে যেন আমড়া কাঠের ঢেঁকি—কোন কাজে লাগে না।

আষাঢ়ে গল্প (অবাস্তব গল্প)—তোমার ও সব আষাঢ়ে গল্প আমরা কেউ বিশ্বাস করব না।

আকাশ থেকে পড়া (আশ্চর্য হওয়ার ভান করা)—তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে! কিচ্ছু জানো না বুঝি?

আমতা আমতা করা (উত্তর দিতে দ্বিধা করা)—সে আমতা আমতা করতে লাগল দেখেই ত' পুলিশ সন্দেহ করে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ জিনিস পাওয়া)—অত কম পণে অত ভাল পাত্র পেয়ে হরিবাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

ই

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব)—ছেলেটি ইঁচড়ে পাকা, তা না হ'লে বুদ্ধের কথার মাঝে কথা কয়।

ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি (ঝিমঝিমে বৃষ্টি)—সকালের দিকে একটু ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি হয়ে গেল।

ইতিগজ (গোঁজামিল)—শেষটায় ইতি গজ করে ফেললে যে!

ইঁদুরে কপাল (হঠাৎ ভাগ্যোদয়)—ইঁদুরে কপাল বলেই লোকটা যা ধরে তাতেই লাভ হয়।

ইতর বিশেষ (তফাৎ)—চাঁদের আলোয় সকলেরই চোখ জুড়ায়—ধনী দরিদ্রের ইতর বিশেষ নেই।

ঈ

ঈদের চাঁদ (বহু অভীপ্সিত)—আরে আমি কি ঈদের চাঁদ? অবাক্ হয়ে সবাই যে তাকিয়ে আছিস্!

উ

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ—আমার হাতে এসে পড়েছে তাই দিয়ে দিচ্ছি—এ তো উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ হ'ল।

উভয় সঙ্কট (দুই বিপদের মধ্যে)—আমার উভয় সঙ্কট, একদিকে আত্মীয়, অপর দিকে বন্ধু—কাকে রাখি, কাকে ছাড়ি।

উড়ো কথা (জনশ্রুতি)—ও সব উড়ো কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (অপাত্রে ভাল কথা বলা)—উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি? চোরা কি শোনে ধর্মের বচন?

উত্তম মধ্যম দেওয়া (প্রহার করা)—বেশ উত্তম মধ্যম না দিলে কি চোর বামাল বার করে?

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারী সহসা অধিকার লাভ)—ক'দিন বাড়া ছেড়ে বিদেশে গেছি আর তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছ যে বড়!

উপরোধে ঢেঁকি গেলা (পরের নির্বন্ধাতিশয্যে কাজ করা)—দেখ না উপরোধে ঢেঁকি গিলে আমার কি অবস্থা—চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলতে পারি না।

উল্টো গাওয়া (বিপরীত কথা বলা)—এই বললে তুমি কংগ্রেসী, আবার এখন উল্টো গাইছ যে বড়!

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে (এক জনের দোষ অপরের উপর চাপানো)—অরুণ ক্লাশে গোলমাল করল আর বরুণকে হেড মাষ্টার মশাই মারলেন—এ তো উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপালেন।

এ

একাদশ বৃহস্পতি (খুব সু-সময়)—তার এখন একাদশ বৃহস্পতি—বড় ছেলে ভাল চাকরি পেয়েছে, আবার ছোট ছেলেটি পরীক্ষায় বৃত্তি পেল।

এক হাতে তালি বাজে না (একার দোষে ঝগড়া হয় না)—রামের উপর সবাই দোষারোপ করেছে কিন্তু একহাতে কখনও তালি বাজে না।

একচোখো (পক্ষপাতী)—ঈশ্বর একচোখো, তা না হ'লে সকলের ভাগ্য ফিরল আর আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

এক হাত নেওয়া (প্রতিশোধ নেওয়া)—এখন দুঃসময় পড়েছে তাই সে বেশ এক হাত নিল।

এক ক্ষুরে মাথা কামানো (একই মতাবলম্বী)—তোমরা সবাই যে এক সুর ধরলে, সবাই কি একক্ষুরে মাথা কামিয়ে এসেছ ?

এক ঢিলে দুই পাখী মারা (একসঙ্গে দুইটি স্বার্থ সিদ্ধি করা)—বিদেশ গিয়ে শুধু স্বাস্থ্যলাভ হয়নি, একটা চাকরীও পেয়েছে—এক ঢিলে দুই পাখী মেরে এসেছে।

এলেও নির্বংশের বেটা, পেছুলেও নির্বংশের বেটা—'উভয় সঙ্কট' দেখ।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ আবার আসতে পারে)—বিপদ কেটে গেছে বলে আমার সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করছ কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, তখন দেখা যাবে।

ও

ওজন করে কথা বলা (ভেবে চিন্তে কথা বলা)—অত ওজন করে কথা বলছ কেন ?

ওজন বুঝে চলা (অবস্থায় কাজ করা)—অত বড়মানুষী ক'রো না ওজন বুঝে না চললে শেষে পস্তাবে।

ওৎ পাতা (সুযোগের অপেক্ষায় থাকা)—তার দেখা না পেয়ে শেষটায় সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তায় ওৎপেতে বসে রইলুম।

ওষুধ ধরা (পরামর্শ শোনা)—লোকটার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি—মনে হয় এবার ওষুধ ধরেছে। আগেকার মত আর বিশ্বাস করে না।

ক

কলুর বলদ (অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পরকর্তৃক চালিত লোক)—ভাগ্যের হাতে আমরা সবাই কলুর বলদ।

কত ধানে কত চাল (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা)—কত ধানে কত চাল এবার নিজেই বুঝতে পারবে, ভাই।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (এক দুঃখের উপর আর এক দুঃখ)—আমি টাকার শোকে পাগল আবার হিত কথা বলে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও।

কান ভারী করা (আড়ালে নিন্দা করা)—আমার অসাক্ষাতে সে আমার বাবার কান ভারী করে এসেছে।

কানে তুলো দেওয়া (গ্রাহ্য না করা)—বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো।

'ক' অক্ষর গোমাংস (নিরক্ষর)—ওকে সই করতে বলছ কেন? ওর 'ক' অক্ষর গোমাংস।

কাঁটালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব ব্যাপার)—এই ঘোড়া যদি রেসের বাজী জেতে তবে কাঁটালের আমসত্ত্ব নিশ্চয়ই বাজারে পাওয়া যাবে।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা (অল্প বয়সে অলস হয়ে যাওয়া)—এই বয়সে এত আয়েসী হয়ে পড়েছ—কাঁচা বাঁশেই ঘুণ ধরল!

কেঁচে গণ্ডুষ করা (নূতন করে আরম্ভ করা)—কবে ইতিহাস পড়েছি মনেই নেই—আবার সেজন্য কেঁচে গণ্ডুষ করছি।

কূল পাওয়া (বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া)—ভগবান অকূলের কূল, নিরাশ্রয় কূল পাবেই।

কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা)—কালো বাজারে কাঁচা পয়সা যে পেয়েছ—সেই কামিয়েছে।

কালো বাজার (চোরাই কারবার)—যুদ্ধের পর থেকেই কালোবাজারের নেশা লেগেছে সকলের।

কপাল ফেরা (বরাত ভাল হওয়া)—ব্যবসা না করলে কি কপাল ফেরে?

কড়ায় গণ্ডায় (পুরোমাত্রায় আদায় করা)—কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে তবে ছাড়ব।

কথায় চিঁড়ে ভিজে না (মৌখিক স্তোকে দুঃখ দূর হয় না)—এখন আমার দারুণ দুঃসময়, এসময়ে দরকার টাকার—এখন কি শুধু কথার চিঁড়ে ভেজে?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (যা শত্রু পরে পরে)—হরি আর রাম দুইই আমার পরম শত্রু—ওদের ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতলবে আছি।

কাজির বিচার (বিচারের নামে প্রহসন)—শিউচরণ মার খেল আর তাকেই জরিমানা দিতে হবে—এ যে কাজির বিচার।

কান পাতলা (যে পরের কথায় বিশ্বাস করে)—ওরকম কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা বিপজ্জনক, পরের কানভারীতে ভুল করে আবার না ছড়িয়ে দেয়।

কান ভাঙানি (পরের কুমন্ত্রণা)—'কান পাতলা' দেখ।

কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া, আমল পাওয়া)—বড় বড় সাহিত্যিকের আসরে আমাদের মত চুনোপুঁটির কল্কে পাওয়াই ভার।

কথা কানে হাঁটে (লোক পরম্পরায় খবর সর্বত্র রটে)—কাল খবর পেয়েছি ছেলের চাকরি হয়েছে—এর মধ্যে কথা কানে হাঁটতে শুরু করেছে।

কানকাটা (নির্লজ্জ)—লোকটা কানকাটা—যতই বলো লজ্জা নেই।

কালনেমির লঙ্কাভাগ (কাজ শেষ হওয়ার আগেই লাভের কথা ভাবা)—বাপ বেঁচে থাকতেই ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে লাঠালাঠি—এ যেন কালনেমির লঙ্কাভাগ।

কাঠের পুতুল (জড় ব্যক্তি)—অমন কাঠের পুতুলের মত বসে থাকলে কি হবে—একটু কাজকর্ম কর।

কুরুক্ষেত্র বাধানো (ভীষণ ঝগড়াঝাটি করা)—দেখো, আমার পিছনে লাগলে আমি ভীষণ কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলব।

কাষ্ঠ হাসি (নকল হাসি)—কি করব বলো, রাগ হলেও কাষ্ঠ হাসি হেসে মানে মানে এলুম।

কৈ মাছের প্রাণ (অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু)—আমাদের মত গরীব লোকের প্রাণ কি সহজে বেরোয়—এ যে কৈ মাছের প্রাণ।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (**গোখরো**) (সামান্য ব্যাপার গুরুতর হওয়া)—পুলিশকে খবর দিও না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে—সকলকেই চালান দেবে।

কানু ছাড়া গীত নাই (একান্ত দরকারী লোককে বলে)—সতীশবাবু ছাড়া এসব ব্যাপার আর কি কেউ সামলাতে পারে। কথায় বলে কানু ছাড়া গীত নাই।

কূপমণ্ডূপ (যে দুনিয়ার খবর রাখে না)—লোকটি কূপমণ্ডুক গাঁয়ের—বাইরে যে বৃহৎ একটা জগৎ রয়েছে তার খবরই রাখে না।

কেষ্ট-বিষ্টু (গণ্যমান্য লোক) —সেখানে সে কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছে।

কেউ-কেটা (তুচ্ছ লোক)—আমাদের মত কেউ-কেটা লোক কি সে আসরে পায়।

কথা বেচে খাওয়া (দালালী করা)—আরে বাপু ও কথা বেচে খায়—ওর সঙ্গে কথনো তুমি পাল্লা দিতে পার ?

কল টেপা (গোপনে পরামর্শ দেওয়া) –যা ভাবছ তা হবে না, আমি কল টিপে এসেছি।

কানের পোকা বার করা (বক্তৃতা করে উত্ত্যক্ত করা)—ছাই ভস্ম কী যে বলছে—শুধু কানের পোকা বার করে ছাড়ল।

খ

খয়ের খাঁ—(মোসাহেব, তোষামুদে)—ইংরেজের খয়ের খাঁদের তখন 'রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁ সাহেব, খাঁ বাহাদুর' ইত্যাদি খেতাব দেওয়া হতো।

খাল কেটে কুমীর আনা (নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা)—ভারতের ব্যাপারে ইংরেজের সাহায্য চাওয়া, আর খাল কেটে কুমীর আনা একই কথা।

খল্‌সে পুঁটি বলে আমিও যাই (বড়দের দেখে সামান্য লোকের কোনকিছু করার সাধ)—ভাল ভাল ছেলেরা বিলেতে পড়তে যায়—ভজহরিও দেখাদেখি বিলেত যাচ্ছে—খল্‌সে পুঁটি বলে আমিও যাই।

খোঁটা দেওয়া (অনুযোগ করা)—তোমাকে আর খোঁটা দিতে হবে না, কাল নিশ্চয়ই বইটা দিয়ে যাব।

গ

গোবর গণেশ (নির্বোধ)—হরেনের ছেলেটি একটি গোবর গণেশ, কোন কাজেরই নয়।

গভীর জলের মাছ—'অথৈ জলের মাছ' দেখ।

গা-ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা)—সে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে শেষকালে কাশীতে গিয়ে টোল খুলে বসল।

গোকুলের ষাঁড় (অকর্মণ্য)—ছেলেটিকে গোকুলের ষাঁড় করে রেখেছ কেন, কোন কাজে কর্মে ভিড়িয়ে দাও।

গোঁফ খেজুরে (অত্যন্ত অলস)—এইটুকু হেঁটে সেখানে যেতে পারলে না? তুমি তো আচ্ছা গোঁফ খেজুরে!

গণেশ উল্টানো (কারবার ফেল হওয়া)—এবারে হঠাৎ যেরকম জিনিসের দাম পড়ে যাচ্ছে তাতে কত কারবারী যে গণেশ উল্টাবে তার ঠিক নাই।

গড্ডালিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ)—কি আর করব ভাই, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি—সবাই যেমন চাকরি করছে, আমিও করছি।

গুড়ে বালি (আশার মধ্যে নৈরাশ্য)—ভেবেছিলাম দু'পয়সা লাভ হবে কিন্তু সে গুড়ে বালি—জিনিসের দাম হঠাৎ পড়ে গেল।

গোবরে পদ্ম ফুল (নীচকুলে মহৎ ব্যক্তি)—দত্তবংশের এই ছেলেটি অন্যগুলোর মত অহঙ্কারী নয়,—এ যেন গোবরে পদ্মফুল—ভারী বিনয়ী।

গাল-গল্প (আজগুবি গল্প)—কাজের সময় যারা গালগল্প করে সময় কাটায় তাদের আমি ঘৃণা করি।

গৌরচন্দ্রিকা (দীর্ঘ মুখবন্ধ করা)—গৌরচন্দ্রিকাটা ভাল হয়েছে কিন্তু রচনার মূল অংশে কিছু নাই।

গোড়ায় গলদ (মূলে ত্রুটি)—পরীক্ষার ফি জমা দাও নি, শেষ তারিখ উতরে গেছে—গোড়াতে গলদ করে ফেলেছ।

গাঁ-গোল করা (ভীষণ শোরগোল তোলা)—সামান্য চুরির ব্যাপারে রায়বাবু গাঁ-গোল করে ছাড়লেন।

গরু মেরে জুতাদান (খুব অনিষ্ট করে সামান্য ক্ষতিপূরণ)—চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবার সময় সামান্য কিছু টাকা দেওয়া আর গরু মেরে জুতাদান একই কথা।

গদাই লস্করি চাল (অত্যন্ত মন্থর গতি)—গদাই লস্করি চালে কাজ করলে কি কর্তৃপক্ষের নেকনজর লাভ করা যায় ?

গোঁফে তা দেওয়া (বুক ফুলিয়ে চলা)—হেডক্লার্ক হয়ে শ্যামবাবু এখন গোঁফে তা দিয়ে ঘোরেন।

গরীবের ঘোড়া রোগ (দরিদ্র লোকের বড়মানুষী)—আমি গরীবের ছেলে, আমার কি বড় লোকের মত রোজ সিনেমা দেখা চলে—আমার মত গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন ?

গোদের উপর বিষফোঁড়া (কষ্টের উপর কষ্ট)—একে সামান্য আয়ে সংসার চালাতে পারি না, তার উপর আবার দু' তিন জনের জ্বর—এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।

ঘোড়া রোগ—'গরীবের ঘোড়া রোগ' দেখ।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া (সুযোগ বুঝে অপরের উপর দায়িত্ব চাপানো)—মাষ্টার মশাইকে পেলেই সব অঙ্ক কষিয়ে নাও, ওরকম ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া সাজলে কিছু শিখতে পারবে না।

ঘরের ঢেঁকি কুমীর (নিজেদের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক)—ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লে আর কি করি বলো ? আমার ভাই-এ সবের মূল।

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন (বড়মানুষী চাল মারা)—ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন ! তোমার সাংসারিক অবস্থা আমার জানা আছে।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে (সকলেরই যে অবস্থা হতে পারে, তা দেখে উল্লাস করা)—প্রতাপ পরীক্ষায় ফেল হয়েছে বলে তুমি হাসছ, একেই বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে—তোমারও পরীক্ষা দিতে হবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বিপদ কেটে যাওয়ায় স্বস্তি পাওয়া)—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল—ওঃ কদিন যা উদ্বেগ গেছে !

ঘাড়ে ভূত চাপা (কোন বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক চাপা)—ছেলেটাকে যতই বলি

রোজ সকাল-সন্ধ্যে লেখাপড়া কর কিছুতেই শোনে না। ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে, মেরে ভূত ভাগিয়ে দিতে হবে।

ঘাড় ভাঙা (জুলুম করে বা কৌশলে সুবিধা আদায়)—সে বড়লোকের ঘাড ভেঙে বেশ কিছু করে নিয়েছে।

ঘাই মারা (আন্দাজে বুঝে আসা)—ওদের পাড়ায় ঘাই মেরে দেখে এলুম ওদের তোড়জোড় কেমন।

ঘানি টানা (একঘেয়ে কাজ বাধ্য হয়ে করা)—কি আর কবব বলো, সংসারেয় ঘানি টানতে টানতে জীবন গেল—সুখ কাকে বলে জানলুম না।

চ

চশমখোর (চক্ষুলজ্জাহীন)—চশমখোর ডাক্তাব এক পয়সাও কমালে না।

চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়)—ব্যাঙ্কের কর্মচারীবা যেন চিনিব বলদ, বাশি রাশি টাকা ঘাঁটছে কিন্তু ঘরে হয় তো বাজাব কবাব টাকা নেই।

চক্ষুদান করা (চুবি কবা)—এই নতুন কাপড়টা মেলে দিলুম আব এরি মধ্যেই কে চক্ষুদান করেছে।

চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা)—লেখাব কাজে চুল পাকালাম আব আজ আমাকে কিনা ব্যাকবণ শেখাতে আসে!

চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া)—অত লোকেব চোখে ধূলো দিয়ে চোবটি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

চোখ টাটানো (ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া)—আমার হঠাৎ ভাগ্যোদয়ে আত্মীয়-স্বজনেব কস্তু চোখ টাটালো।

চোখে ধোঁয়া দেখা (বিশেষ বিব্রত বোধ করা)—ইতিহাসের প্রশ্ন এত শক্ত হয়েছে যে আমবা সবাই চোখে ধোঁয়া দেখলুম।

চোখে সর্ষে ফুল দেখা—'চোখে ধোঁয়া দেখা'—দেখ।

চোখের বালি (অপ্রিয় লোক)—সতীশবাবু এ বাড়ীর সকলেরই চোখে বালি—কেউ ওকে দেখতে পারে না।

চর্বিত চর্বণ করা (একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করা)—বইটা ভাল হয়নি একই ব্যাপারের চর্বিত চর্বণ খালি। কোন নতুন কিছু নাই।

চাঁদের হাট—(বহু গুণী ও রূপবানের একত্র সমাবেশ)—সভাটি যেন চাঁদের হাট—দেশের সব জ্ঞানীরা এসেছিলেন।

চোখের চামড়া—(চক্ষুলজ্জা থাকা)—লোকটার চোখের চামড়া নেই, কিছুতেই একটা পয়সা ভিখিরীকে দিলে না।

চড় মেরে গড় (অপমানের পর সম্মান দেওয়া)—থাক, আর চড় মেরে গড়ের দরকার নেই—সেদিনের অপমান আমি অত সহজেই ভুলব না।

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (একমাত্র অবলম্বন অথচ অনাদৃত)—কে আবার করবে ? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ওর এক মামা আছে সেই করছে।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ (সামান্য লাভের জন্য মান খোয়ানো)—চাকরি না পাই বসে থাকব, তবু সামান্য টাকায় ছেলে পড়িয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো না।

ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনো (প্রথমে উপকারী সেজে গিয়ে শেষে অনিষ্ট করা)—ওর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোই স্বভাব, দেখলে না হরিবাবুর কি সর্বনাশ করলে।

ছাই চাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা)—ছেলেটিকে দেখলে কে বলবে অত বিদ্বান—ঠিক যেন ছাই চাপা আগুন !

ছেলের হাতে মোয়া (সহজে ভুলিয়ে নেবার জিনিস)—টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া যে সহজে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে ?

জ

জিলাপীর প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি)—লোকটার মনে যে এত জিলাপীর প্যাঁচ তা কি আগে ভেবেছিলাম।

জলে ফেলে দেওয়া (অপব্যয় করা)—ওঃ ! এই বাজে ঘড়ি কিনে টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়ে এলে !

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (একাই সব কাজ করা)—বাড়ীর কাজের কথা আর বোলো না—আমাকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই করতে হয়।

জাত গেল কিন্তু পেট ভরল না (সম্মানহানি হ'ল কিন্তু অর্থলাভ হল না) —সেখানে চাকরি করতে গিয়ে জাত গেল কিন্তু পেট ভরল না। চাকরি তো পেলামই না শুধু লাভের মধ্যে মান গেল।

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ (উভয় সঙ্কট)—সিনেমা থেকে বেরিয়েই দেখি

রোজ সকাল-সন্ধ্যে লেখাপড়া কর কিছুতেই শোনে না। ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে, মেরে ভূত ভাগিয়ে দিতে হবে।

ঘাড় ভাঙা (জুলুম করে বা কৌশলে সুবিধা আদায়)—সে বড়লোকের ঘাড ভেঙে বেশ কিছু করে নিয়েছে।

ঘাই মারা (আন্দাজে বুঝে আসা)—ওদের পাড়ায় ঘাই মেরে দেখে এলুম ওদের তোড়জোড় কেমন।

ঘানি টানা (একঘেয়ে কাজ বাধ্য হয়ে করা)—কি আর করব বলো, সংসারের ঘানি টানতে টানতে জীবন গেল—সুখ কাকে বলে জানলুম না।

চ

চশমখোর (চক্ষুলজ্জাহীন)—চশমখোর ডাক্তার এক পয়সাও কমালে না।

চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়)—ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা যেন চিনির বলদ, রাশি রাশি টাকা ঘাঁটছে কিন্তু ঘরে হয় তো বাজার করার টাকা নেই।

চক্ষুদান করা (চুরি করা)—এই নতুন কাপড়টা মেলে দিলুম আর এরি মধ্যেই কে চক্ষুদান করেছে।

চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা)—লেখার কাজে চুল পাকালাম আর আজ আমাকে কিনা ব্যাকরণ শেখাতে আসে!

চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া)—অত লোকের চোখে ধূলো দিয়ে চোরটি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

চোখ টাটানো (ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া)—আমার হঠাৎ ভাগ্যোদয়ে আত্মীয়-স্বজনের অনেকের চোখ টাটালো।

চোখে ধোঁয়া দেখা (বিশেষ বিব্রত বোধ করা)—ইতিহাসের প্রশ্ন এত শক্ত হয়েছে যে আমরা সবাই চোখে ধোঁয়া দেখলুম।

চোখে সর্ষে ফুল দেখা—'চোখে ধোঁয়া দেখা'—দেখ।

চোখের বালি (অপ্রিয় লোক)—সতীশবাবু এ বাড়ীর সকলেরই চোখের বালি—কেউ ওকে দেখতে পারে না।

চর্বিত চর্বণ করা (একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করা)—বইটা ভাল হয়নি একই ব্যাপারের চর্বিত চর্বণ খালি। কোন নতুন কিছু নাই।

চাঁদের হাট—(বহু গুণী ও রূপবানের একত্র সমাবেশ)—সভাটি যেন চাঁদের হাট—দেশের সব জ্ঞানীরা এসেছিলেন।

চোখের চামড়া—(চক্ষুলজ্জা থাকা)—লোকটার চোখের চামড়া নেই, কিছুতেই একটা পয়সা ভিখিরীকে দিলে না।

চড় মেরে গড় (অপমানের পর সম্মান দেওয়া)—থাক, আর চড় মেরে গড়ের দরকার নেই—সেদিনের অপমান আমি অত সহজেই ভুলব না।

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (একমাত্র অবলম্বন অথচ অনাদৃত)—কে আবার করবে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ওর এক মামা আছে সেই করছে।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ (সামান্য লাভের জন্য মান খোয়ানো)—চাকরি না পাই বসে থাকব, তবু সামান্য টাকায় ছেলে পড়িয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো না।

ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনো (প্রথমে উপকারী সেজে গিয়ে শেষে অনিষ্ট করা)—ওর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোই স্বভাব, দেখলে না হরিবাবুর কি সর্বনাশ করলে।

ছাই চাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা)—ছেলেটিকে দেখলে কে বলবে অত বিদ্বান—ঠিক যেন ছাই চাপা আগুন!

ছেলের হাতে মোয়া (সহজে ভুলিয়ে নেবার জিনিস)—টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া যে সহজে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে?

জ

জিলাপীর প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি)—লোকটার মনে যে এত জিলাপীর প্যাঁচ তা কি আগে ভেবেছিলাম।

জলে ফেলে দেওয়া (অপব্যয় করা)—ওঃ! এই বাজে ঘড়ি কিনে টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়ে এলে!

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (একাই সব কাজ করা)—বাড়ীর কাজের কথা আর বোলো না—আমাকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই করতে হয়।

জাত গেল কিন্তু পেট ভরল না (সম্মানহানি হ'ল কিন্তু অর্থলাভ হল না।)—সেখানে চাকরি করতে গিয়ে জাত গেল কিন্তু পেট ভরল না। চাকরি তো পেলামই না শুধু লাভের মধ্যে মান গেল।

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ (উভয় সঙ্কট)—সিনেমা থেকে বেরিয়েই দেখি

সামনে মাষ্টার মশাই, পিছন দিক দিয়ে পালাবো কি, সেদিকে মামাবাবু—ঠিক যেন জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

জলাঞ্জলি দেওয়া (সম্পূর্ণ ত্যাগ করা)—সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তোমার কথামত কাজ করব।

ঝ

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কাজ করা)—ঝোপ বুঝে কোপ না মারলে কি হবে ? দেখলে ত' জমিদারের বাড়ি যেতেই দশ টাকা চাঁদা আদায় হ'ল।

ঝাঁকের কই (একদলের লোক)—সে কংগ্রেস ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে আবার ঝাঁকে ফিরেছে।

ঝড়ো কাক (ঝড় খাওয়া কাকের মত উস্কো খুস্কো)—ক'দিন রোদে রোদে ঘুরে তোমার চেহারা যে ঝড়ো কাকের মত হয়েছে। শেষটায় কি অসুখে পড়বে ?

ঝালঝাড়া (রাগ দেখানো)—কাউকে না পেয়ে বাবা আমার উপরেই ঝাল ঝাড়লেন।

ঝক্কি পোয়ানো (ঝঞ্ঝাট সহ্য করা)—তোমার মেয়ের বিয়ের ঝক্কি পোয়াতে গিয়ে শেষে আমার প্রাণান্ত।

ট

টনক নড়া (হুঁশ হওয়া)—শ্রমিকদের শোভাযাত্রা দেখে তবেই না কর্তৃপক্ষের টনক নড়িল।

টাকার গরম (অর্থের জন্য অহঙ্কার)—নির্ধনের ধন হলে টাকার গরমে বড়-ছোট জ্ঞান করে না।

টাকার কুমীর (প্রচুর বিত্তশালী)—আরে ওদের টাকার অভাব কি ? প্রত্যেকের বাবা এক একজন টাকার কুমীর।

টেক্কা দেওয়া (প্রতিযোগিতায় জেতার চেষ্টা)—আরে বাপু, আমি কি ওদের সঙ্গে টেক্কা দিতে গেছি—অত বোকা আমি নই।

ঠ

ঠোঁট কাটা (স্পষ্ট বক্তা)—আমি বাবা ঠোঁটকাটা লোক, স্পষ্ট কথাই বলে এসেছি।

ঠুঁটো জগন্নাথ (যে কিছু করতে পারে না)—বাপটি ঠুঁটো জগন্নাথ যা করে সব

বড ছেলে। (নিষ্কর্মা) সকলেই লিখছে আর ঠুঁটো। জগন্নাথ হয়ে তুমি বসে আছ যে !

ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় (সবাই অসৎ)—কাকে ভাল বলি আর কালে মন্দ বলি, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড।

ড

ডামাডোল (ওলট পালট)—যুদ্ধের ডামাডোলেব সময়ে কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল তার কোনও ঠিক ঠিকানা বইল না।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কুকর্ম কবা)—যতই ডুবে ডুবে জল খাও, একদিন্ না একদিন ধবা পড়বেই।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য)—কিহে ডুমুরেব ফুল হলে নাকি ? আজকাল যে বড দেখা পাই না।

ডুব মারা (আত্মনিয়োগ কবা)—সেই যে ডুব মাবলে তাবপব আর দেখা নেই --গেছিলে কোথা ?

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া)—টাকাব অভাবে আমাব ডান হাতেব ব্যাপার বন্ধ হওয়ার যোগাড।

ডাকাবুকো (খুব সাহসী)—এখন দেশে ডাকাবুকো ছেলেবই দবকাব।

ঢ

ঢাল নেই, ঢোল নেই, নিধিরাম সর্দার (কোন তোড় জোড় নেই অথচ বাক্যাড়ম্বর)—যুদ্ধেব বাজাবে যে দেশেব ঢাল নেই তলোয়াব নেই, সেও নিধিবাম সর্দার সাজে কেন জানো ?—পিছনে কোন শক্তিমান দেশেব উস্কানী থাকে তাই।

ঢিমে-তেতালা (অত্যন্ত মন্থব গতিতে)—বাড়ী তৈয়ারীব কাজ অমন ঢিমে-তেতালায় চালালে হবে না

তালকাণা (অমনোযোগী)—তুমি তো আচ্ছা তালকাণা, হেড মাষ্টারকেই দৈ দিতে ভুলে গেলে ! (তুমি এত তালকাণা যে উৎসবের মাঝেই মৃত্যু সংবাদ আনলে ! একটু রয়ে সয়ে বলতে পারলে না ?)

তালপাতার সেপাই (খুব রোগা ও দুর্বল)—ওরে বাপ., ঐ তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা লোকটার কি লম্ফঝম্ফ।

তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ)— ত্রের মৃত্যু তুষের আগুনের মত তাঁর মনে জ্বলছে !

তুলসী বনের বাঘ (ছদ্মবেশী ভণ্ড)—চোরটা নামাবলী গায়ে দিয়ে সাধু সেজেছে —ঠিক যেন তুলসী বনের বাঘ।

তিলকে তাল করা (সামান্য বিষয়কে প্রকাণ্ড করে তোলা)—দিদিমা তিলকে তাল করে বাড়ীশুদ্ধ লোককে জাগিয়ে এক কাণ্ড করে ফেললেন।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা (সহসা রেগে ওঠা)—তাকে দেখেই পণ্ডিত মশাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে কয়েক ঘা তাকে দিয়ে দিলেন।

তীর্থের কাক (কোন কিছুর প্রত্যাশী)—তাকে ধরব বলে সকাল থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছি।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া (যাহার অভাব নেই তাকে কিছু দেওয়া)—বড় লোকের ছেলের চাকরী করে দিয়ে তেলা মাথায়ই তেল ঢালছ, গরীবের ছেলেটার কথা বুঝি মনে থাকে না।

তাসের ঘর (অলীক কল্পনা)—কত আশা করে ছেলের বিয়ে দিলুম—আর ছেলেটা মরে গেল, আমার তাসের ঘরও ভেঙ্গে গেল।

তাক্ লাগানো (অবাক্ করে দেওয়া)—সে বিলেতে গিয়ে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

তাল সামলানো (শেষ রক্ষা করা, সঙ্গতি রক্ষা করা)—গোড়া থেকে যে রকম খরচ করছ শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পারলে হয়।

থ

থোড়াই কেয়ার করা (অগ্রাহ্য করা)—সে তার বাপ-মাকে থোড়াই কেয়ার করে।

থোঁতামুখ ভোঁতা করে দেওয়া (জেদ করা)—এবার অঙ্কে প্রথম হয়ে রমেনের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।

দ

দু-মুখো সাপ (যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন)—সতীশ বাবু একটি দু'মুখো সাপ—দু'মুখে দুদিকে গেয়ে বেড়ান।

দক্ষযজ্ঞ (ভয়ানক বিশৃঙ্খল ব্যাপার)—আমাদের দল হেরে যেতেই খেলার মাঠে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

দু' নৌকায় পা দেওয়া (উভয় দিক বজায় রাখার চেষ্টা)—হরি ও যদুর মামলায় উভয়েই আমাকে সাক্ষী মেনেছে—আমার দু'নৌকায় পা—কি যে করি।

দু' কান কাটা (অতিশয় নির্লজ্জ)—এক কান কাটা গাঁয়ের ধার দিয়ে যায়, দু'কান কাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়।

দম দেওয়া (বৃথা স্তোক দেওয়া)—সাত দিন ধরে সে আমাকে দম দিচ্ছে—আজ হেস্তনেস্ত করে আসব।

দুষ্ট সরস্বতী (দুর্বুদ্ধি)—পড়াশুনা ছেড়ে রাত দিন খেলে বেড়াচ্ছ যে! দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে বুঝি?

দাঁত ফোটানো (অর্থ গ্রহণ করা)—যা বই লিখেছো, তাতে দাঁত ফোটায় কার সাধ্য।

দাঁত-কপাটি লাগা (অত্যন্ত ভীত হওয়া)—মামাকে দেখে তখন ছেলেটার দাঁত কপাটি লেগে যায় আর কি?

দা-কুমড়া সম্পর্ক (শত্রুভাব)—আমেরিকা আর রাশিয়ার যেন দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার—'ডান হাতের ব্যাপার' দেখ।

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা (প্রভু)—আরে বড় বাবুই যখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তখন তাঁকে একটু খোসামোদ করতে হবে বৈকি!

দাঁও মারা (সুযোগ বুঝে বেশী লাভ করা)—বাড়ীটা বেচে বেশ দাঁও মারা গেছে।

দাগ রেখে যাওয়া (কীর্তি রেখে যাওয়া)—"যদি জন্মেছিস্ একটা দাগ রেখে যা।"—বিবেকানন্দ।

দুধের সাধ ঘোলে মেটান (বাজে জিনিস দিয়ে আসলের অভাব পূরণ)—নিজের ছেলে ত' নেই তাই দত্তক পুত্র নিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছে।

ধ

ধর্মের ষাঁড় (অকর্মণ্য ভবঘুরে)—'গোকুলের ষাঁড়' দেখ।

ধান ভানতে শিবের গীতি (অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর কথা)—রবীন্দ্রনাথের রচনায় তুমি রাজনীতির কথা লিখেছ কেন? এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে গেছে।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কার করা)—সামান্য স্কুল ফাইনাল পাশ করেই যে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ!

ধনুক ভাঙা পণ (কঠিন প্রতিজ্ঞা)—বিয়ে করব না বলে সে ধনুক ভাঙা পণ করেছিল, কিন্তু বেশী যৌতুকের লোভে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল।

ধামা ধরা (খোশামুদে)—জমিদার বাবুর ধামাধরারা জমিদার বাবুর চেয়ে এককাঠি সরেশ।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (অত্যন্ত সৎ)—কি হে একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে গেলে যে সামান্য মিথ্যে কথাটা বলতে বাধছে।

ধরাচূড়া (পোশাক-পরিচ্ছদ)—আদালত থেকে ফিরে তখনও ধরা-চূড়া ছাড়িনি, এমন সময় তুমি ডাকতে গেলে।

ধামা চাপা দেওয়া (মুলতুবী রাখা)—তোমাদের ঝগড়াটা দিন দুই ধামাচাপা দিয়ে রাখলে ভাল হয়।

ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল (আপাত নিকৃষ্ট জিনিসের তলায় শ্রেষ্ঠ মাল)—বাঃ, ছেলেটি তো বেশ ইংরেজী বলে, এ ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল দেখছি।

ধোলাই দেওয়া (প্রহার দেওয়া)—ধোলাই না দিলে কি ছেলের ব্যাদ্‌ড়ামি যায় ?

ন

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল (কোন কিছু একেবারে না থাকার চেয়ে মন্দটা থাকাও ভাল)—নতুন বই বাজারে না পেয়ে পুরানো কিনেছি—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

ননীর পুতুল (শ্রম করিতে কাতর ব্যক্তি)—দু'ঘণ্টা কাজ করেই বসে বিশ্রাম করছ যে, ননীর পুতুল নাকি ?

নেই-আঁকড়া (নাছোড় বান্দা)—সে নেই-আঁকড়া ছেলে কলমটা কিনিয়ে তবে ছাড়ল।

নাছোড়বান্দা—'নেই-আঁকড়া' দেখ।

নমো নমো করে সারা (সামান্যভাবে সম্পন্ন করা)—টাকা নেই, কড়ি নেই, কি করবে, নমো নমো করে বাপের শ্রাদ্ধ সেরে দাও।

'না রাম, না গঙ্গা' বলা (নীরবে থাকা)—চোরটাকে অত ঠ্যাঙানো হ'ল কিন্তু 'না রাম, না গঙ্গা' কিছুই বললে না।

নয় ছয় করা (বাজে অযথা খরচ করা)—টাকাগুলো নিয়ে নয় ছয় করা কি তার ভাল হয়েছে ?

নয়নের মণি (নয়নের মণি)—রাম দশরথের নয়নের মণি ছিল।

নাম ডুবানো (সুনামে কালি দেওয়া)—ছেলেটা কি শেষ পর্যন্ত বংশের নাম ডুবাবে ?

নাম রাখা (সুনাম বাড়ানো)—আমার সতীশ কিন্তু আমার নাম রাখবে।

নেক নজর (সুনজর)—চেষ্টা করো যাতে কর্তার নেক-নজরে পড়ো—তা' হলে আর দুঃখ থাকবে না।

নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো (নিশ্চিন্তে সময় কাটানো)—তবে আর কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোওগে যাও এ চাকরি তোমার বাঁধা রইল।

নখদর্পণে থাকা (বিশেষ ভালভাবে জানা)—ইতিহাস আমাব নখ দর্পণে—শুতে আমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।

নিজের ঢাক নিজে পিটানো (আত্মপ্রসংসা প্রচার কবা)—আজকালকার দিনে নিজের ঢাক নিজেই না পিটলে চলে না।

প

পরের মুখে ঝাল খাওয়া (অপবেব কথায় বিশ্বাস করা)—পরেব মুখে ঝাল খেয়ে অত উত্তেজিত হচ্ছ যে, একেবাব নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এসো তো! হয়তো ও-সব কিছুই না!

পরকাল ঝরঝরে হওয়া (ভবিষ্যৎ অন্ধকাব হওয়া)—মন্দ ছেলেব সঙ্গে মিশলে তোমার পবকাল ঝবঝবে হযে যাবে!

পরের ধনে পোদ্দারী (পবের টাকা দুহাতে খরচ কবা)—সে নাবালকেব অভিভাবক হয়ে পরের ধনে পোদ্দারী কবে বেড়াচ্ছে।

পাকা ধানে মই (সমূহ ক্ষতি)—যে আমাব এমন পাকা ধানে মই দেবার মতলবে ছিল তাকে আমি কোনদিন বন্ধু বলে গ্রহণ কববো না।

পারের কড়ি (পবকালেব পাথেয়)—দবিদ্রকে যা দেই তাই আমার পাবেব কড়ি—ও আমাব জমা হয়ে থাকছে।

পাততাড়ি গুটানো (সব ছেড়ে পালানো)—পুলিশেব নামে লোকটি বাস্তা-বাতি পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে।

পটোল তোলা (মাবা যাওয়া—শ্লেষাত্মক)—ভাই, কুকুরটা সেই দিনই পটোল তুলেছে।

পাড়া মাথায় করা (খুব চেঁচানো)—এক ঘা চড় খেয়ে লোকটা যেন পাড়া মাথায় করে তুলল—সব্বাই ছুটে এল।

পাথরে পাঁচকিল (খুব উন্নত অবস্থা)—আমার মামাব এখন পাথরে পাঁচকিল বাড়ী, গাড়ী, ফ্যান্, ফোন্—কিছুবই অভাব নেই।

পোয়াবারো (দারুণ সুযোগ)—কর্তা বিদেশে গেলে সরকাবের পোয়াবারো—খুব দু'হাতে লুটবে।

পায়াভারী (অহঙ্কারী)—কি হে! চাকবী পেয়ে আজকাল যে খুব পায়াভারী হয়েছ—না ডাকলে আর আসবে না!

প্রজাপতির নির্বন্ধ (বিবাহের যোগাযোগ)—প্রজাপতির এমনই নির্বন্ধ যে তিনবার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেলেও শেষ পর্যন্ত সেই খানেই বিয়ে হ'ল।

পুকুর চুরি (অসম্ভব চুরি)—সরকারের টাকা সোজা পথে আদায় করা ভাবী শক্ত পিছন দিক দিয়ে পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে।

পুঁটি মাছের প্রাণ (দুর্বলের ক্ষীণ শক্তি)—গরীবের পুঁটি মাছের প্রাণ, অত টাকা তারা কোথায় পাবে ?

পর্বতের মুষিক প্রসব (বিরাট তোড়জোর করে সামান্য কাজ করা)—সে কি হে, এতদিন ধরে মহড়া দিয়ে শেষে কিনা সামান্য একাঙ্ক নাটক অভিনয় করলে ? এ যে পর্বতের মুষিক প্রসব।

পালের গোদা (দলের সর্দার)—এই পালের গোদাটি হচ্ছে সেই রোগা ছেলেটি —সেই সব ছেলেদের ক্ষেপিয়েছে।

পাঁচ কান হওয়া (রাষ্ট্র হওয়া)—দেখ একথা যেন পাচকান হয় না, তুমি আর আমি জানলাম ব্যস্।

পোঁ ধরা (অন্যের দেখাদেখি কথা বলা)—রাম বাবুকে কোন রকমে বোঝাতে না বোঝাতে দেখি যতীন আবার পোঁ ধরেছে।

ফ

ফাঁপরে পড়া (মুস্কিলে পড়া)—মামার বাড়ী গিয়ে এবার ফাঁপরে পড়েছিলাম সে আর কি বলব !

ফাঁকা আওয়াজ—(অন্তঃসারশূন্য কথা)—মৌখিক সহানুভূতির ফাঁকা আওয়াজ করা এক, আর সত্য সত্য সাহায্য করা আরেক কথা।

ফাঁক্ তালে (মধ্যখান হইতে)—আবে আমি ফাঁকতালে আসল কথাটি জেনে এসেছি।

ফ্যা ফ্যা করে বেড়ানো (নিরর্থক ঘুরে বেড়ানো)—শহরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে না বেড়িয়ে যা হোক কিছু কাজ কর।

ফ্যান চাটা (হীন স্তাবকতা করা)—বড় লোকের ফ্যান চাটতে সবাইকের কি প্রবৃত্তি হয় ?

ফুস্ মন্তর (যাদু মন্ত্র)—ফুস্ মন্তরে কি পাস করা যায়, রীতিমত পড়াশুনা করতে হয়।

ফুট কড়াই করা (খরচ করা)—টাকাগুলো সব সিনেমা দেখে ফুটকড়াই করে এস না।

ফঁপর দালাল (যে অনাহুত হয়ে এসে বাজে হাঁকডাক করে)—সতীশবাবু একটি ফঁপর দালাল—শুধু চেঁচামেচি করে কাজ পণ্ড করতেই আসেন।

ফেউ লাগা (উত্যক্ত করা)—গঙ্গাস্নান থেকে ফেরবার পথে ভিখিরীরা যেন পিছনে ফেউ লাগে।

ফোড়ন দেওয়া (অপরের কথাব মাঝে কথা বলা)—বড়দের কথার মাঝে ছেলেদের ফোড়ন দেওয়া সাজে না।

ব

বারভূত (অবাঞ্ছিত লোক)—দেশে থাকি না, যা ছিল সব বার ভূতে লুটে পুটে খেয়েছে।

বালির বাঁধ (যার উপর কোন ভরসা নেই)—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"

বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য)—পয়সা দিলে বাঘের দুধও মেলে।

বাড়াভাতে ছাই (আশার জিনিস নষ্ট হওয়া)—উপযুক্ত ছেলেটি উপার্জ্জন কবছিল, হঠাৎ দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়ে গেল—যেন বাড়াভাতে ছাই পড়ল।

বামন হয়ে চাঁদে হাত (ছোট হয়ে বড় বড় আশা পোষণ করা)—অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখতে চাও—অথচ বাংলা ছন্দেব কিছুই জান না—এযে বামন হয়ে চাঁদে হাত!

বোঝার উপর শাকের আটি (অনেক ভারী বোঝার উপর সামান্য হালকা জিনিস দেওয়া)—বিক্রয় করেব বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাভ কি? জিনিসের চড়া দামতো গা সহা হয়ে গেছে—করটাকে বোঝাব উপব শাকের আঁটির মতই লোকে বইতে পারবে।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য কিছু সঞ্চয়কাবীর অর্থের উপর মায়া)—হাজার টাকা জমিয়েছে—ঐ ওর ব্যাঙের আধুলি—না করবে খরচ, না দেবে কাউকে ধার।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার)—সিনেমা-খোর বিশু সিনেমায় যেতে চাইল না—বলো কি? ব্যাঙেরও সর্দি হয়!

বিড়াল তপস্বী (কপট সাধু)—পাটের দালাল রামহরি বাবু একটি বিড়াল তপস্বী। ওরকম জুয়াচোর যদি দু'টি থাকে।

বকধার্ম্মিক (কপট সাধু)—'বিড়াল তপস্বী' দেখ।

বিদুরের ক্ষুদ (শ্রদ্ধার প্রদত্ত সামান্য দান (—গরীব লোকটি বাগানের একটি ফুলকপি এনেছে—ঐ আমার বিদুরের ক্ষুদ—মহৎ মূল্যবান উপহার।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (হঠাৎ দুঃসংবাদ)—মহাত্মা গান্ধীর হত্যার খবর বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত কবে দিল।

বুদ্ধির ঢেঁকি (নিরেট মূর্খ)—"হুঁকাটা বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।"

বানরের গলায় মুক্তার হার (অপাত্রে উৎকৃষ্ট বস্তু দান)—সতীশকে রবীন্দ্র-রচনাবলী উপহার দেওয়াটা যেন বানরের গলায় মুক্তার হার দেওয়ার মত হয়েছে। ও কি বুঝবে ওর মূল্য।

বুক দিয়ে পড়া (আন্তরিকভাবে সাহায্য করা)—আমার বিপদে পড়শীরা সবাই বুক দিয়ে পড়েছিল।

বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুস লওয়া)—বাঁ হাতের ব্যাপার ছাড়া এসব কাজে সফল হওয়া যায় না। বাঁ হাতে কিছু দাও।

বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল (দুজনে সমান জবরদস্ত —রাম যেমন বুনো ওল, হরি তেমনি বাঘা তেতুল—জব্দ হতেই হবে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো (একদিকে কড়াকড়ি, অপরদিকে প্রশ্রয়)—বাপের যেমন বজ্র আঁটুনি, মায়ের তেমনি ফস্কা গেরো—ও ছেলের কিছু হবে না।

বড় মুখ করা (খুব আশা করা)—আহা বড় মুখ করে এসেছে ওকে নিরাশ করো না।

বাজিয়ে দেখা (পরীক্ষা করা)—লোকটাকে বাজিয়ে নিও।

বাস্তু ঘুঘু (ছদ্মবেশী গৃহশত্রু)—কানাই একটি বাস্তুঘুঘু—ওর থেকে সাবধান হবে।

বিন্দু বিসর্গ (কোন কিছু)—সে এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানে না।

বিষকুম্ভ (খল স্বভাবের)—ও রকম বিষকুম্ভ লোকের কাছ থেকে সাত হাত দূরে থাকা উচিত।

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো (ফাঁকি দেওয়া)—টাকা ধার নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে তার একটুও বাধ্‌ল না।

ভ

ভোল ফিরানো (চেহারা বদলে যাওয়া)—রং করে বাড়ীটার ভোল ফিরে গেছে।

ভূতের বোঝা বওয়া (বাজে খাটা)—ছেলেটাকে মানুষ করে শুধু ভূতের বোঝা বইলুম, রোজগার করে এখন আমার ধারে আসে না।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—(দারুণ বিশৃঙ্খলা)—ও বাড়ীতে কোন কাজকর্ম হলেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—কেবল হট্টগোল, হৈ হৈ।

ভিটেয় ঘুঘু চরানো—(সর্বনাশ করা)—ওর ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে ছাড়ব।

ভাঁড়ে মা ভবানী—(শূন্য ভাণ্ডার)—ওর ভাঁড়ে মা ভবানী—ও আবার তোমায় কি সাহায্য করবে!

ভূতের ব্যাগার খাটা—'ভূতের বোঝা বওয়া' দেখ।

ভস্মে ঘি ঢালা—(অযোগ্য পাত্রে দান)—ছেলেটার জন্য অত মাষ্টার রাখা শুধু ভস্মে ঘি ঢালা—ওর কিছু হবে না।

ভরা ডুবি হওয়া—(সর্বনাশ হওয়া)—তার ভরাডুবি হয়েছে—বড় ছেলেটি তিনদিনের জ্বরে মারা গেছে।

ভুষ্টি নাশ করা—(ধ্বংস করা)—ছেলেগুলো খেয়ে সব ভুষ্টিনাশ করলে, কাজের বেলা কেউ না।

ম

মায়া কান্না—(কপট কান্না)—চিরশত্রুর সমূহ বিপদে মনে মনে খুশী হলেও একটু মায়া কান্না কাঁদলুম—নয়তো লোকে কি বলবে।

মাছের মা—(সন্তানের মৃত্যু যার কাছে গা-সহা হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্ষতি যার গা-সহা হয়ে গেছে)—আজকাল মাছের মা হয়ে গেছি—রোজ শেয়ারের দর পড়ছে কত দুঃখ করব? (ছেলে মরে যেতে সুশীলা একটুও কাঁদল না—মাছের মা বলে একেই)।

মেও ধরা—(ঝঞ্ঝাট পোয়ানো)—যতই অগ্রাহ্য করুক ঐ সতীশবাবুই আছে মেও ধরতে—সে সময় অপর কেউ নেই।

মুখ নাড়া—(বক্তৃতা করা)—আর মুখ নেড়ো না—তোমাদের মুরদ বোঝা গেছে।

মুখ নাড়া দেওয়া—(ভর্ৎসনা করা)—যেতেই যা মুখনাড়া দিলে তা আর কি বলব!

মুখ চুণ করা—(বিমর্ষ হওয়া)—পরীক্ষায় ফেল হয়েছে শুনে সে মুখ চুণ করে বসে আছে।

মনে লাগা—(পছন্দ হওয়া)—শাড়ীটা মনে খুব লেগেছে কিন্তু দামটা এত বেশী যে দিতে গেলে বুকে ধাক্কা লাগে।

মাটির মানুষ—(শান্ত লোক)—এমন মাটির মানুষটি, কিন্তু রেগে ওঠে সেদিন যে কাণ্ড করলেন তা কি আর বলব!

মাণিক জোড়—(অভিন্নহৃদয় বন্ধু)—অরুণ আর তরুণ দুটিতে যেন মানিকজোড় —কোনদিন ছাড়াছাড়ি হয় না।

মাছি মারা কেরানী—(অন্ধ নকলকারী)—মাছিমারা কেরাণীদের কথা ছেড়ে দাও, যদ্দৃষ্টংতল্লিখিতং করে রেখছে—ভুল রয়ে গেছে দেদার।

মুখ রাখা—(মান রক্ষা করা)—ঠাকুর মুখ রেখেছেন, ছেলেটি ভালভাবেই পাস করেছে।

মাথায় হাত বুলানো—(ফাঁকি দেওয়া)—ছোট ছেলে দেখে বেমালুম মাথায় হাত বুলিয়েছে—একেবারে ডবল দাম নিয়েছে।

মান্ধাতার আমল—(প্রাচীন কাল)—সে কোন মান্ধাতার আমলে একদিন উপকার করেছিল তাই আজও শোনায়।

মাথা কাটা যাওয়া—(ভীষণ অপমানিত হওয়া)—অত লোকের সামনে আমার যেন মাথা কাটা গেল—তারা কি ভাববে কে জানে!

মুখ তুলে চাওয়া—(প্রসন্ন হওয়া)—ভগবান মুখ তুলে না চাইলে হাজার চেষ্টা করলেও ভাগ্য ফিরবে না।

মট্‌কা মেরে থাকা—(নিদ্রার ভান করা)—সত্যিই কি ঘুমিয়েছিলাম, পডার ভয়ে মট্‌কা মেরে ছিলাম।

মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়া—(ব্যথিতকে আবো ব্যাথা দেওয়া)—একে মন-মেজাজ খারাপ তার উপব জ্বালাতন করে মড়ার উপর খাড়াব ঘা দিও না।

মশা মারতে কামান দাগা—(সামান্য কাজের জন্য বিরাট আয়োজন)—কববে ত' এক টুকরো জমিতে ফুল বাগান তা এত সব কৃষির বই কিনেছ কেন—এ যে মশা মারতে কামান দাগারও বেশী।

মেঘ না চাইতে জল—(হঠাৎ ভাগ্যোদয়)—এই যে, মেঘ না চাইতেও জল—এসে বসতে না বসতেই খেতে ডাকছে।

য

যত গর্জায় তত বর্ষায় না—(যত লম্ফ ঝম্প তত কাজ কবে না) —ওব লম্বাচোড়া কথা ছেড়ে দাও—ও যত গর্জায় তত বর্ষালে কি রক্ষা থাকত!

যকের ধন—(অত্যন্ত কৃপনের ধন, বা খুব আদরের সামগ্রী)—বইগুলো আমি যকের ধনেব মত আগ্‌লে আছি, কাউকে দিই না।

যজ্ঞেশ্বর—(প্রধান কর্মকর্তা)—আরে হরিবাবু আমাদের যজ্ঞেশ্বর ওঁকে বাদ দিলে কখনো হয়?

যদ্‌ভবিষ্য—(যে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকে)—আমি ভাই পুরুষকারের ভক্ত, ওসব যদ্‌ভবিষ্যেব দলে আমি নাই—কোমর বেঁধে খাটব তারপর ভাগ্যে যা থাকে হবে।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—(সামান্য ইতর বিশেষ)—দশ হাজারই যদি খরচ করবো তবে আর দু' হাজার না হয় বাঁক—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।

যা রয় সয়—(সম্ভব মত)—যা রয় সয় তাই ভাল, বেশী বাড়াবাড়ি ধর্মে সইবে কেন ?

র

রাঘব বোয়াল—(অতি লোভী)—দোকানদারটি একটি রাঘব বোয়াল, এক টাকার জিনিস দু'টাকা চায়।

রগচটা—(অল্পে ক্রুদ্ধ হয় এমন ব্যক্তি)—নতুন সরকার মশাই বড় রগচটা।

রাশভারী—(গম্ভীর ও স্বল্পভাষী)—বড় বাবু বড় রাশভারী—তাঁর কাছে গেলে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়।

রামে মারলে ও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে—(উভয় সংকট)—আমার পড়াশুনা কিছু হয়নি, কাজেই হরিবাবু খাতা দেখুন আর শ্যামবাবু খাতা দেখুন—রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে—আমার কিছু ভাবনা নেই।

রা কড়া (কথা বলা, উত্তর দেওয়া)—ছেলেটি অতি শান্ত, সাত চড়েও রা কড়ে না।

রাবণের চিতা (চির দুঃখ)—আমার দুঃখের কি ভাই শেষ আছে—রাতদিন রাবণের চিতা জ্বলছে।

রণে ভঙ্গ দেওয়া (মাঝ পথে তর্ক হইতে বিরত হওয়া, পরাজয় স্বীকার করা —কি হে চুপ করলে কেন ? তা হ'লে রণে ভঙ্গ দিলে।

রাম খোকা (বৃদ্ধ বয়সেও বালকের ন্যায় নির্বোধ)—সতীশ ত' একটি রামখোকা—ওর কথার আবার দাম কি ?

ল

লম্বা দেওয়া (পলায়ন করা)—চোরটা সুযোগ বুঝে লম্বা দিল।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার (অফুরন্ত ভাণ্ডার)—বিনয়বাবুর স্ত্রী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাই বিনয়বাবুর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—কেউ কিছু চেয়ে কোনদিন নিরাশ হয় নি।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরের সব ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রাখা)—বর্তমানে সমাজে যার যেরকম অবস্থা হোক, সবাই অনেকটা লেফাফা দুরস্ত।

লক্কা হওয়া (অত্যন্ত বাবু হওয়া)—দিন দিন সাজ পোশাকে সে একটি লক্কা হয়ে উঠছে—ব্যাপার কি ?

লঙ্কা কাণ্ড (ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থা)—বেত ধরতেই ক্লাশে যেন রীতিমত লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল—হৈচৈ, কান্নাকাটি, ছুটোপাটি।

লজ্জাবতী লতা (অতিশয় লাজুক)—অত লজ্জাবতী লতা হলে কি চলে ?

লম্বাই চৌড়াই (গর্বোক্তি)—যে যত লম্বাই চৌড়াই করে তার ভিতরে ততই ফোঁপরা।

লাল হয়ে যাওয়া (খুব লাভ করা)—যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ী সব লাল হয়ে গেল।

লুফে লওয়া (সানন্দে রাজী হওয়া)—তার প্রস্তাব আমি লুফে নিলুম।

ল্যাংবোট (পার্শ্বচর)—তোমার ল্যাংবোটটি কোথায় ?

শ

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর)—জমিদারবাবুর ঐ একটি মাত্র ছেলে—শিবরাত্রির সলতে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ)—তোমার শিরে সংক্রান্তি, পনের দিন বাদে পরীক্ষা, তবে এভাবে সময় নষ্ট করতে ভয় হয় না ?

শাঁখের করাত (উভয় দিকেই ক্ষতি)—রামহরি একটি শাঁখের করাত—দুই-পক্ষেই আছে—দুদিকেই কাটছে।

শ্মশান বৈরাগ্য (ক্ষণস্থায়ী ধর্মভাব)—ছেলে মারা যেতে রামবাবু হাসপাতাল করবার মতলব করছেন—এ শ্মশান বৈরাগ্য—দুদিন বাদে তখন হয়'ত অত টাকা বার করতে মায়া হবে।

শাপে বর (ক্ষতি থেকে লাভ)—পরীক্ষায় ফেল করে চাকরীর চেষ্টায় বাব হয়েছিলুম তাই এই ভাল চাকরীটা পেলুম—এতো শাপে বর হ'ল।

শিঙে ফোঁকা (মারা যাওয়া)—শয়তানের শয়তানি একদিন শেষ হল, কাল সেই উনপাঁজুরে শয়তান বুড়োটা শিঙে ফুঁকেছে।

শূন্যে সৌধ নির্মাণ (আকাশ কুসুম চিন্তা করা)—বড় চাকরী ছাড়া করবে না বলে বসে আছ—এ শুধু শূন্যে সৌধ নির্মাণের আশা—এ আশা ছেড়ে দাও।

শখের প্রাণ গড়ের মাঠ (শখ চাপলে মানুষ উদার হয়ে ওঠে)—তার তখন শখের প্রাণ গড়ের মাঠ—দু'হাতে টাকা উড়িয়েছে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (গুরুতর অন্যায়ের সামান্য কৈফিয়ৎ)—পরীক্ষায় ফেল হয়ে এখন বাড়িতে অসুখ-বিসুখের উল্লেখ করছে—এ শুধু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।

শালগ্রামের শোয়া বসা (সর্বাবস্থায় যার সমান দুঃখ)—অফিসের কেরাণীর আবার পদমর্যাদা বৃদ্ধি—ও শালগ্রামের শোয়া বসার সমান।

শামুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর (লোকচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত)—যাঁরা বলে

কি হরিচরণ সৎলোক—শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! ওরকম জুয়াচোর যদি দুটো থাকে!

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল (অন্যায়কারীকে অন্যায়কারীই সাহায্য করে)—তুমি একটি শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—নইলে তুমি ওব সাফাই গাও!

ষ

ষণ্ডামার্কা (বলশালী ও গোঁয়ার গোবিন্দ)—ছেলেটি দারুণ ষণ্ডামার্কা, তাই কেউ ভয়ে ঘাঁটায় না।

ষাট্ ষাট্ (বেঁচে থাক)—রামবাবু মারা গেছেন, ষাট্ ষাট্ রাহরিবাবু বলতে রামবাবু বলে ফেলেছি।

ষোল আনা (পুরাপুরি)—পাপ ষোল আনা হ'লে ভগবান সহ্য করেন না।

ষোল কলায় পূর্ণ (পরিপূর্ণ)—পাপের আর বাকি কি—ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে—হবে না, কালটা যে কলি।

স

সরিষার ফুল দেখা (অন্ধকার দেখা)—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করবেনা। দুর্দিনে যখন চোখে সরষের ফুল দেখবে, তখন আমার কথা মনে পড়বে।

সাত সতেরো (খুঁটিনাটি)—তোর অত সাত সতেরো খবরের দরকার কি?

সাত পাঁচ (ভালমন্দ)—সাত পাঁচ ভেবে দেখলুম—ও কাজে আমার যাওয়া উচিত নয়।

সাত পাঁচে না থাকা (কাহারও ঝঞ্ঝাট গায়ে না মাখা)—লোকটি সত্যিই ভালো, কারো সাতে পাঁচে থাকেন না।

সাপের পাঁচ পা দেখা (সৌভাগ্য লাভে যথেচ্ছা ব্যবহার করা)—বড লোকের জামাই হয়ে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে—ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

সবুরে মেওয়া ফলে (ধৈর্য ধারণ করলে কার্য সিদ্ধি হয়)—সবুরে মেওয়া ফলে, একটু সবুর করো, ঐ অরুণকুমার আবার আমাদের দলে ভিড়বে।

হ

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া)—সে কথা কি চাপা আছে, সে উনি কবে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন।

হরি ঘোষের গোয়াল (বিশৃঙ্খল অবস্থা)—স্কুলটাকে হরি ঘোষের গোয়াল বানাবে না ক? এত গোলমাল কিসের?

হরি ভক্তি উড়ে যাওয়া (মনে ভয় বা ঘৃণা হওয়া)—"মেয়ে, মেয়ে, মেয়ে—হরিভক্তি উড়ে যায় মেয়ের মুখ চেয়ে।"

হরিহর আত্মা (খুব ভাব)—দুজনে যেন হরিহর আত্মা—খুব জমেছে।

হরেকরকম্বা (সব উল্টো পাল্টা)—এ সব 'হরেকরকম্বা' কি লিখেছ ? একে কি রচনা বলে ?

হিতে বিপরীত (ভাল করতে মন্দ)—শাসন করতে গিয়ে যে হিতে বিপরীত হ'ল—ছেলেটি বাড়ী ছেড়ে পালালো !

হরিষে বিষাদ (দুঃখ ও আনন্দ এক সাথে)—মামার মৃত্যু সংবাদের সংগে সংগে খবর এল উইল করে মামা তাকে এক লাখ টাকা দিয়ে গেছেন—তার তখন হরিষে বিষাদ।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার (জানবার থাকতে মিছে গবেষণা)—কথাটা প্রকৃত অর্থ কি অভিধানে দেখনা, তোমার হাতে পাঁজি মঙ্গলবার !

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সুযোগ নষ্ট করা)—হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলে ও যে চাকরিটি পেয়েছ ঐতেই ঢুকে পড়ো।

হাতের পাঁচ (বিনা চেষ্টায় যেটা পাওয়া গেছে)—ছেলে পড়ানোটা ত' আমার হাতের পাঁচ—তারপর যা কাজ জোটে তাই করব।

হাতে কলমে (স্বহস্তে করে দেখা)—হাতে কলমে কর দেখি না কত লাভ কত লোকসান, পরের মুখে ঝাল খাবার দরকার কি ?

কয়েকটি বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট ব্যবহার

মুখ

মুখ রাখা (সম্মান রাখা)—মুখ রেখো ঠাকুর, মামলায় যেন আমাদের জয় হয়।

মুখ তুলে চাওয়া (প্রসন্ন হওয়া)—এবার মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন, প্রচুর ধান হয়েছে।

মুখ করা (গালাগালি দেওয়া)—দাসদাসীদের উপর রাতদিন মুখ করলে তারা বেশীদিন টিকতে পারে না।

মুখ নাড়া (অত্যন্ত কটুভাষায় ভর্ৎসনা করা)—মুখ নাড়া খেতে খেতে জীবন গেল।

মুখ সামলানো (সংযত হওয়া)—মুখ সামলে কথা না বললে সেখানে মার খেতে হবে

মুখে আগুন (মৃত্যু কামনা করা, ধিক্কার দেওয়া)—যে ছেলে বাপ মাকে ভাত দেয় না সেই ছেলের মুখে আগুন।

মুখে ফুল চন্দন পড়া (আশীর্বাদ করা)—আহা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—তোমার কথা যেন সত্য হয়।

মুখ দেখানো (সমাজে সম্মান রক্ষা করা)—এই জঘন্য কাজ করেও আবার মুখ দেখাবে কোন লজ্জায়।

মুখ চাওয়া (খাতির করা)—কারো মুখচেয়ে কথা বলার লোক আমি নই!

বুক

বুকফাটা (করুণ)—তার বুক ফাটা কান্না শুনলে পাষাণও গলে যায়।

বুকবাঁধা (মন শুদ্ধ করা)—ছেলেটির মুখ চেয়ে বুক বেঁধে সংসারে পড়ে আছি, নয়তো আমার কিসের আকর্ষণ!

বুক দশ হাত হয়ে ওঠা (গর্ব বোধ করা) ছেলের উন্নতিতে বাপের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে।

বুক ঠোকা (সাহস করা)—বুকঠুকে পরীক্ষা দিয়ে দাও, ঠিক পাশ করবে।

মাথা

মাথা পেতে নেওয়া (ভক্তিভরে গ্রহণ করা)—আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

মাথা পাতা (ভার নেওয়া)—এ দায়িত্ব ক'জন মাথা পেতে নিতে পারে?

মাথা কেনা (আজ্ঞা বহ করে ফেলা)—উপকার করেছে বলে কি আমার মাথা কিনে নিয়েছে—যা বলবে তাই করতে হবে?

মাথা কাটা যাওয়া (অপমান বোধ করা)—তুই বকামি করে বেড়াস আর লজ্জায় আমার যে মাথা কাটা যায়।

মাথা খাও (শপথ, নিষেধার্থক)—আমার মাথা খাও, কোনদিন এ কাজ করবে না।

মাথায় তোলা (প্রশ্রয় পাওয়া)—ছেলেটাকে আদর দিয়ে যে মাথায় তুলেছ।

মাথা (প্রধান)—তুমি আমাদের মাথা—তোমাকে কি আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি?

মাথা ব্যথা (দুশ্চিন্তা)—মাথা নেই তার ব্যথা! পড়ার ঝোঁক ওর নেই ভাবনাও নেই!

মাথা হেঁট হওয়া (অপমান বোধ করা)—সে কথা শুনে সভার মাঝে রামবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

হাত

হাতে খড়ি (প্রথম শিক্ষা)—আমার কাছেই ওর কবিতার হাতে খড়ি।

হাত পাকানো (দক্ষতা অর্জন করা)—এ কাজে হাত পাকিয়েছি—এখন আমার সাথে কেউ পারবে না ?

হাতে কলমে করা (নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখা)—বইএ কত কথা লেখা থাকে, হাতে কলমে করে দেখ তখন বুঝবে।

হাত করা (আয়ত্ত করা)—লোকটিকে হাত করেছি, যা বলব ও ঠিক তাই করবে।

হাত পাতা (ভিক্ষা করা)—হাতের টাকা ছেড়ে দিয়ে, শেষে কার কাছে হাত পাততে যাব ?

হাত টান (চুরি বিদ্যা)—চাকরটির হাতটান আছে, ওকে আজই বিদায় করব।

হাত গুটানো (খরচ বন্ধ করা)—বড় ছেলেটি কলিকাতায় বাসা করে একেবারে হাত গুটিয়েছে—একটা পয়সা দেয় না।

হাত না থাকা (প্রভাব না থাকা)—ভগবানের বিধানের উপর মানুষের হাত নেই।

গা

গা করা (মনোযোগ দেওয়া)—যা বলি তাতে গা করো, শেষটায় পস্তাবে।

গা ঢাকা দেওয়া (পলায়ন করে আত্মগোপন করা)—বিপ্লবীরা সেই দিনই গা ঢাকা দিলে।

গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)—কথায় কথায় ছেলেদের গায়ে হাত তুললে খঁচড়া হয়ে যায়, আর মারকে ভয় করে না।

গায়ের ঝাল ঝাড়া (প্রতিশোধ নেওয়া)—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে দাসদাসীর উপর গায়ের ঝাল ঝাড়া অন্যায়।

গায়ে ফুঁ দিয়ে চলা (আরামে কাল কাটানো)—আজ বাদে কাল পরীক্ষা আর বেশতো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ !

গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)—যা বলি গায়ে মাখো না, শেষকালে একদিন বিষম কষ্ট পাবে।

চোখ

চোখ ফোটা (জ্ঞান লাভ করা)—এতদিনে তার চোখ ফুটল যে 'বড়র পীরিত বালির বাঁধ'।

চোখে চোখে রাখা (পাহারা দিয়ে রাখা)—লোকজনকে চোখে চোখে না রাখলেই চুরি করে।

চোখের মাথা খাওয়া (অন্ধের মত হওয়া)—কি লিখতে কি লিখেছ—চোখের মাথা খেয়েছ নাকি ?

চোখ কপালে ওঠা (অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়া)— দেখে শুনে চোখ কপালে উঠেছে, ভাই কালে কালে কতই না দেখব।

চোখ ওঠা (চোখের অসুখ)—তোমার কি চোখ উঠেছে ? ওটা কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ।

কান

কান কাটা (নির্লজ্জ), **দু'কান কাটা** (অত্যন্ত নির্লজ্জ)—এক কান কাটা গ্রামের ধার দিয়ে যায়, দু'কান কাটা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়।

কান দেওয়া (গ্রাহ্য করা)—বাজে লোকের কথায় কান দিও না।

কান পাত্‌লা (যার পেটে কথা থাকে না)—কান পাত্‌লা লোকের কাছে সব কথা বলতে নাই।

কান পাত্‌লা (যে যা বলে তাতেই বিশ্বাস করা)—কান পাত্‌লা লোকের কথায় বিশ্বাস কোরো না—ওদের মত বদলাতে কতক্ষণ।

কথা

কথা রাখা (প্রতিজ্ঞা পালন করা)—হরিশ্চন্দ্র তাঁর কথা রাখার জন্য রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র সব ত্যাগ করেছিলেন।

কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)—যখন কথা দিয়েছি কথা রাখতেই হবে, তা আমার যত ক্ষতি হয় হোক্‌।

কথা কাটাকাটি করা (তর্ক করা)—কথা কাটাকাটি করে আর লাভ কি ? যা হবার সে ত' হয়েই গেছে।

কথা চালা (প্রস্তাব করা)—আমি কথাটা চেলে দেখতে পারি।

ছোট মুখে বড় কথা (সামান্য লোকের বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা)—জহরলালের কি করা উচিত ছিল না ছিল, তা তোমার পক্ষে ছোট মুখে বড় কথা বলা ঠিক সাজে না।

লাখ কথার এক কথা (উচিত কথা)—যা বলেছ লাখ কথার এক কথা—ওর উপরে আর কথা চলে না।

কথার কথা (কথার পড়নে কথা বলা)—'কাউকেই অতি বিশ্বাস করতে নেই'—এ একটা কথার কথা—তা' বলে আত্মীয়-স্বজনকে অবিশ্বাস করবো কি ?

ভাব-সম্প্রসারণ

কোনো রচনাংশে যে ভাবটি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহা বিশদভাবে লেখাকে ভাব-সম্প্রসারণ করা বলে। তাহা হইলে প্রথমত রচনাংশের অন্তর্নিহিত ভাবটি ধরিতে হইবে। অত্যন্ত মনোযোগসহকারে উদ্ধৃতিটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া ভাবটি যখন বেশ বুঝিতে পারিবে তখন তাহা বিশদভাবে লিখিতে চেষ্টা করিবে। এইজন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—একটি হইল চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতা, আর অপরটি হইল ভাষার সাবলীন গতি ও পরিপাট্য। অবাস্তব, অসংবদ্ধ কোন কথা ইহাতে লিখিবে না। রচনাটি যুক্তির শৃঙ্খলে সুন্দরভাবে বদ্ধ করিয়া দিবে।

অনেক সময়ে একটিমাত্র বাক্যে ভাবটি প্রকাশিত থাকে। সে ক্ষেত্রে বাক্যটির অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া ভাবটি আয়ত্ত করিবে। সাহিত্যিক ও লেখকেরা অল্পকথায় কৌশলে অনেক গভীর ভাব ব্যক্ত করেন। অনেক সময়ে গভীর বা গূঢ় ভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইটিকে বিশদভাবে স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই লেখাটি ভাল হইবে।

একটি কথা মনে রাখিবে যে, ইহা ব্যাখ্যা নয়। কাজেই লেখক বা কবি এই কথা বলিতে চাহেন ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ করিবে না, বা উদ্ধৃতিটির অর্থ-ব্যাখ্যা করিবে না। প্রবন্ধ বা রচনার ন্যায় ঐ ভাবটি অবলম্বন করিয়া তোমার নিজস্ব চিন্তাধারাটি লিখিয়া যাইবে (অর্থাৎ তুমি যেন লেখকের ভাবে ভাবিত হইয়া লিখিতেছ—এই ভাবে লিখিবে)।

নিম্নে কয়েকটি ভাব সম্প্রসারণের আদর্শ দেওয়া হইল। এগুলি মনোযোগসহকারে লক্ষ্য কর—

১। **কীর্তির্যস্য স জীবতি।**

সাগরে যেমন তরঙ্গ উঠে, তেমনি এই বিশ্বজগতে প্রাণের বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠিতেছে এবং সাগর তরঙ্গের মতই তাহা আবার মিলাইয়া যাইতেছে। জন্ম যেমন জগতের একটি সত্য, মৃত্যুও তেমনি একটি সত্য। 'জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে?' এ কবি উক্তির উত্তর-স্বরূপ উদ্ধৃতিটিকে বলা যায়। মানুষ জন্মায়, জীবলীলা অন্তে মরিয়া যায়: জগতে সব কিছুই নশ্বর। কিন্তু কিছু কি থাকে না? থাকে মানুষের সুকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সুকর্মের ফল থাকে, পুণ্যকাজের ধর্মবল থাকে। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেন, ভবিষ্যৎ

মানব সম্প্রদায়ের সুখের উপাদান সংগ্রহ করিয়া যান—মানুষ তাদের ভুলিয়া যায় না, তাদের স্মৃতি মানুষ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখে। সেইরূপ লোক মরিয়াও অমর, অক্ষয় যশের মন্দিরে তাঁহারা চিরস্থায়ী হইয়া বিরাজ করেন।

১৩। "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে",—সঞ্জীবচন্দ্র

সৌন্দর্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ উপযোগী না হইলে কোন জিনিসের সৌন্দর্য যথাযথ উপলব্ধি হয় না, নাম-না জানা ঘাসের ফুলেরও একটি মনোহর সৌন্দর্য আছে, তাহা মাঠের মাঝে যেমন মানায় শহরের সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের ফুলদানিতে তেমন মানায় না। মানুষকে ঈশ্বর অরণ্যের পরিবেশে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অরণ্যের অজস্র উচ্ছল সৌন্দর্যের মধ্যে, সেই সবুজ পত্ররাজির মধ্যে, সেই কঙ্কর বন্ধুর অরণ্য পথে, সেই বিরাটকায় তরুশ্রেণীর মধ্যে, তাহাদের যেমন সুন্দর দেখায় শহরে তেমন দেখায় না। শিশুর সৌন্দর্য স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে, মাতৃস্নেহের বিগলিত ঝর্ণার পরিবেশে যেমন মানায় অন্যত্র তেমন মানায় না। পরিবেশই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং বর্ধনও করে। প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে; বিশ্বনিয়ন্তা সকল বস্তুই যেটি যেখানে যেমন মানায় সেটিকে সেখানে তেমন করিয়া সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। সেই পারিপার্শ্বিকতা বা পরিবেশ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা অসুন্দর হইয়া পড়ে। কাজেই যাহা আমাদের চোখে কুৎসিত ঠেকে তাহাও তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ মধ্যে স্থাপন করিলে অপূর্ব সৌন্দর্যময় হইয়া উঠে।

১৪। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বিবেকানন্দ

ঈশ্বর আবাঙ্‌মনসগোচর—ধ্যানে তাঁহার কণামাত্র উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তিনিই আবার সব হইয়াছেন। সর্ব জীবেই তাঁহার প্রকাশ। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ঈশ্বর বহুরূপ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন। সেই সজীব, সচল ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্মকর্ম হয় না। এই জন্যই জীবে প্রেম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ঈশ্বর অনন্ত কোটি প্রাণী রূপে পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার এই অসংখ্য রূপের দ্বারা আমরা সর্বদা পরিবৃত। ইহাদের ভাল বাসিলে, ইহাদের সেবা করিলে ভগবানের আরাধনা করার সমান ফল লাভ হয়। শুধু মানব প্রেম নয়, জীবমাত্রেরই প্রতি প্রেমভাব পোষণ করা বড় সহজ কথা নয়। গৌতমবুদ্ধ এই প্রেমে বিভোর হইয়া বিম্বিসার নৃপতির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ছাগবলি রক্ষা

করিয়াছিলেন। চৈতন্য জীবে দয়া শিক্ষা দিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর মহাত্মা বিবেকানন্দ এই জীব-প্রেমের বাণী আবার ভারতের জনসাধারণ্যে প্রচার করিয়া সর্বজীবে ঈশ্বর বুদ্ধির আরোপ কবিতে শিক্ষা দেন। সর্বজীবের সহিত একাত্মত: বোধ ঈশ্বরোপলব্ধির শেষ সোপান।

৪। "ইতিহাস মানব-জাতির জীবনচরিত ; জীবনচরিত মনুষ্য বিশেষের ইতিহাস।"

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ইতিহাসে পৃথিবীর অতীতের বিবরণ থাকে। এই বববণে মনুষ্যেব কথাই প্রধান। মনুষ্য কি ভাবে বাস করিত, কি ভাবে রাজ্যশাসন করিত, কি ভাবিত, তাহাদের রীতি-নীতি, চালচলন কি রকম ছিল—এই সকল বিবরণ ইতিহাসে লেখা থাকে। মনুষ্যের সমষ্টিগত জীবনের ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাসে। কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে কি ভাবে উঠিল আবাব কি হেতু ক্রমে জলবুদ্বুদেব ন্যায বিলীন হইয়া গেল তাহাই ইতিহাসে পাঠ করা যায়। জীবনচরিত ব্যক্তিবিশেষের পতন ও অভ্যুদয়ের ইতিহাস। ঐ ব্যক্তি কি উপায়ে দুঃখকে জয় করিলেন, প্রলোভনেব মোহিনী মায়ার জাল ছিন্ন করিলেন, কিরূপ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির তুঙ্গশিখরে অধিরোহণ করিলেন, জীবনচরিতে আমরা তাহাই পাঠ কবি। ইতিহাস জাতির শিক্ষক, জীবনচবিত ব্যক্তি সাধারণের শিক্ষক।

৫। "উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়।"

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্যোগ ও চেষ্টা ব্যতীত জগতের কোন কিছুই লাভ করা যায় না। ক্ষুধার্ত সিংহের আহার বিনা চেষ্টায় জুটিতে পারে না। জগতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম, নিয়ত চেষ্টা, প্রাণান্তকর যত্ন ও অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়বলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। উন্নতির উত্তুঙ্গ সোপানাবলী কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। যত্ন ছাড়া রত্ন মিলে না, পৃথিবীর ঐশ্বর্য বীরভোগ্য—সাহসী ও অধ্যবসায়ী পুরুষেই সেই ঐশ্বর্য আহরণ করিতে পারেন। অলস কর্মকুণ্ঠ-ব্যক্তিকে সংসারে চিরকাল পরানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বিদ্যালাভ করিতে গেলেও উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যালাভের উপযোগী মানসিক বৃত্তি-সকল ঈশ্বরদত্ত ; কিন্তু সে কথা মানিলেও উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। মনের সেই বৃত্তি-

গুলিকে অনুশীলনের দ্বারা বিকশিত না করিলে বিদ্যালাভ করা যায় না। মূর্খ কালিদাস উদ্যোগ দ্বারা মহাকবি হইয়াছিলেন, মূঢ় বোপদেব চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়বলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বাণীর বরপুত্র পৃথিবীবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের প্রত্যেককেই সাধনা করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায়, ঐ অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন কবিকেও মাতৃভাষার সাধনায় কী অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল! এই সাধনার ফলেই তিনি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

৬। "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগতে কত দেশ, সেই সব দেশে কত মানুষ বাস করে। তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদের আচার, ব্যবহার, আকৃতি, ভাষা ও বেশভূষা বিভিন্ন। তাহারা ভৌগোলিক সীমা-দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় তাহাদিগকে নানা জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কতই না বৈষম্য রহিয়াছে, কিন্তু মূলতঃ সকল মানুষই সমান। নানা ভাষা, নানা ধর্মমত, নানা বেশভূষা, নানারকম চেহারা ও বর্ণবিশিষ্ট এই সব মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ব্যাপারের মিল রহিয়াছে। সেই মিলগুলির জন্যই তাহাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সকলেই মনুষ্য সাধারণের ন্যায় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, ক্রোধ-হিংসা, মায়া-মমতা দ্বারা সতত পরিচালিত হয়। একদেশের মানুষ যতখানি স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, অপর দেশের মানুষও তাহা পারে। একদেশের মানুষ যতখানি স্বদেশপ্রেম দেখাইতে পারে, অপর দেশের মানুষও ততখানি স্বদেশপ্রেম দেখাইতে পারে। কাজেই মানব প্রকৃতি মূলতঃ এক এবং সকলদিক দিয়া দেশের বাধা অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে এক জাতি হিসাবে গঠন করাও সম্ভব। কালক্রমে সকল বাধা তিরোহিত হইয়া মানুষে মানুষে মৈত্রী স্থাপিত হইবে। মানুষ একজাতিতে পরিণত হইবে, তাহাদের মধ্যে জাতিবৈর থাকিবে না। সকলে একই ধরণীর সন্তান, একই ঈশ্বরের সৃষ্ট, সকলেই পৃথিবীতে প্রবাস বাসে আসিয়াছে—এই চিন্তা তাহাদের ঐক্য আনয়ন করিবে।

৭। চিত্ত হতে বিত্ত বড়।

ধন, মান, ঐশ্বর্য, সুখ—ইহাদের আশায় মানুষ মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় জীবনের মরুভূমিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া ঘুরিয়া মরে; অথচ ইহারা তাহার তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। পার্থিব সম্পদ আপাততঃ সুখদায়ী হইলেও মানুষের চিত্তের [illegible]

তৃষ্ণা ইহাতে মেটে না। সেইজন্য বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ঐহিক সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মনের অতল তলে ডুব দিয়া সেই তৃষ্ণার বারির সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। সেইখানেই মানব মনের সেই অন্তঃস্থলে রহিয়াছে মানবের চিরন্তন তৃষ্ণা নিবারণের বারি! দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, পরোপকার-স্পৃহা, পরদুঃখকাতরতা—এইগুলিই সেই মানস সাগরের উর্মিমালা। এইজন্যই চিত্ত বিত্ত হইতে বড়। এই চিত্তের তরঙ্গে বিহ্বল হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন দয়ার সাগর, নদীয়ার নিমাই হইয়াছিলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, নরেন্দ্র হইয়াছিলেন বিশ্বপ্রেমী মানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ এই চিত্তসাগরের তরঙ্গে যীশুর প্রাণ আর্তের, ব্যথিতের, পতিতের জন্য কাঁদিয়াছিল, গৌতমবুদ্ধ জীবপ্রেমে পাগল হইয়া প্রেমমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেই জন্যই কবিগণ হৃদয়কুসুমকে অপরের জন্য প্রস্ফুটিত করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জগতের ঐশ্বর্যও একদিন নিঃশেষ হইতে পারে, কিন্তু চিত্তের মহাভাবের প্লাবন অনন্তকালস্থায়ী; মানুষমাত্রেই মনে সেই তরঙ্গান্দোলনকম্প অনুভব করিয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।

৮। আশা ছলনাময়ী।

পৃথিবী দুঃখে ভরা। পদে পদে দুঃখ, শোক, ক্ষতি, বিপদ্ ও মৃত্যু। তথাপি মানুষ এই মৃত্যুকবলিত জীবনে কিরূপে বাস করে? আশা তাহার মনে রঙীন স্বপ্নের জাল বুনিয়া দেয়। দুঃখ, শোক, ক্ষতি, বিপদ্ তখন তাহার কাছে সাময়িক বস্তু বলিয়া বোধ হয়। সে ভাবে যে এই দুঃখ দূর হইয়া সুখের প্রভাত আসবে; সে ভাবে যে শোকের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া আনন্দের সৌরদীপ্তিতে তাহার জীবন ঝলমল্ করিয়া উঠিবে। এইভাবে আশা তাহার মনে আনন্দ দেয়—তাহাকে কর্মে উৎসাহিত করে। সে ভাবে—"মেঘ দেখে ভাই কোরো না ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে"—কিন্তু ভাগ্যদেবী হয়ত রঙীন মেঘের অন্তরালে তাহার বজ্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন। আশা মানব মনে কুহক বিস্তার করিয়া তাহাকে সর্বদা কর্মের পথে ধাবমান রাখে। মানুষ ভাবে—"শীত যদি আসে তবে, বসন্ত ত' বেশী দূরে থাকিতে পারে না।" এইভাবে দুঃখের মাঝে সুখের কল্পনা, বিপদের মাঝে সম্পদের কল্পনা,—ইহাই আশার ছলনা। আশা ব্যতীত সংসার নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত।

৯। "কাজকে করবি শক্ত, কাজের হবি ভক্ত।"

শক্ত কাজ দেখিয়া অনেকে ভয় পায়। শ্রমকুণ্ঠ ব্যক্তির নিকট আবার সকল কাজই শক্ত বোধ হয়। শক্ত কাজ ছাড়া শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। যাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে সে কাজকে ভালবাসে। এই কর্মপ্রীতিই কার্যসম্পাদনের

প্রকৃষ্ট উপায়। দূর হইতে সকল কার্যই কঠিন বোধ হয়, কিন্তু যে আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তাহার নিকট কাজ খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আনন্দময় কর্ম-প্রেরণা ব্যতীত কোন দুরূহ কার্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না। কার্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের মধ্যে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা আনিয়া দেয়। এই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে। মানবাত্মা ক্ষুদ্র নহে, মহাশক্তিমান্ বিশ্বাত্মারই ইহা অঙ্গ। এইরূপ বোধ জাগিলে মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। সেই অসীম ক্ষমতা তখন অবলীলায় কার্যসম্পাদন করে। জগতের কর্মী লোকদের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কাজকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাভরে কার্য করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের কণ্ঠে বিজয়মালা দোদুল্যমান হইয়াছে।

১০। "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে।"

অন্যায়কারী অমানুষ, সে বিধাতার বিধান তথা মানুষের বিধান লঙ্ঘন করে। এইজন্য তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে। এই ঘৃণা তাহার কৃতকর্মের ফল। আবার এই অন্যায় সহ্য করাও সমান ঘৃণ্য অপরাধ। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষমাত্রেরই কর্তব্য—শুধু প্রতিবাদ নহে, তাহা সমূলে ধ্বংস করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য। কেন না অন্যায় সহ্য করিয়া গেলে অন্যায়কারীর সাহস বাড়িয়া যায়। সে উত্তরোত্তর গর্হিতম অন্যায় কার্য করিয়া জগতে মহা অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করে। মানুষ অন্যায় সহ্য করে সে অক্ষম বলিয়া! কিন্তু দুর্বলতাই পাপ। ভীরু কাপুরুষেরা নির্বিবাদে অন্যায়কে প্রশ্রয় করিয়া বর্ধিত করে। তাহার ফলে সমাজে অন্যায়কারীর দ্বারা বহু অনর্থ সাধিত হয়। আত্মিক বলই বল, বাহুবল প্রকৃত বল নহে। অন্যায়ের প্রতিষেধক ঘৃণা। এই ঘৃণার ভাব মনে আনিয়া যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, সে বিষবৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া জগতের মহা অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। কাজেই অন্যায় করা যেমন পাপ, অন্যায় সহ্য করাও তেমনই পাপ—এই উভয়বিধ পাপের ফলেই সমাজ এবং সংসার আজ অন্যায় ও অত্যাচারে ভরিয়া গিয়াছে। এই উভয়কে ঘৃণা দ্বারা জর্জরিত করিয়া আত্মিক শক্তিবলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেই ইহারা আর মানব-মনে স্থায়ী আবাস স্থাপন করিতে পারিবে না। এই উভয়বিধ পাপকে ভস্মীভূত করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

১১। "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি সেথা
তোমার আদেশে।"

ক্ষমার মধ্যে একটা মহত্ত্বের ভাব আছে। সে ক্ষমা শক্তিমানের ক্ষমা—প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অন্তরের ঔদার্যবশতঃ অন্যায়কারীকে বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের নমস্য। কিন্তু শক্তিমান অন্যায়কারীর ভয়ে যে ভীরু কপট ক্ষমার ভান করে সে পশুরও অধম। তাহার এই ক্ষমা মিথ্যাচার, কপটাচার মাত্র। এই মিথ্যাচার আমাদের বিবেককে কলুষিত করে—আমাদিগকে হীনতার গর্ভে নিক্ষেপ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরবাসী ভগবান আমাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে অন্যায়কারী ও তাহার প্রশ্রয়কারীকে দমন করিতে প্রেরণা দেন। দুর্বলের ক্ষমা প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা মাত্র। ইহা অন্যায়কে লালন করে, পোষণ করে, বর্ধিত করে। সেইজন্য এই কপটাচারীও দণ্ডের যোগ্য। নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়া অন্যায় ও অন্যায়ের আশ্রয়স্থল এই সকল দুর্বলচেতা ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করাই ভগবানের নির্দেশ। অন্যায় এবং অসত্যকে মার্জনা করাও অন্যায়।

৬৫।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
"ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।"
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে;
কহে, "যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।"

সন্তোষই সুখের মূল। ঈর্ষা দুঃখের জ্বালা বহন করিয়া জীবনকে বিষময় করে। যে নিজের অবস্থার মধ্যে সুখ অনুভব করে না—তাঁহার কপালে সুখ জোটা ভার। অভাব-বোধই যত দুঃখের নিদান। যাহা নাই, তাহার জন্য সর্বদা হা-হুতাশ করিলে যাহা আছে, তাহার সুখভোগ করা যায় না। ঈর্ষী ভাবে—দুনিয়ার যত কিছু সব সুখ অপরে সম্ভোগ করিয়া লইল, আমার জন্য কিছুই রাখিল না। যে সন্তুষ্ট, সে সামান্য সুখ পাইয়াই আহ্লাদে গদ্‌গদ—সেই সামান্য সুখই তাহার অন্তরে পরিপূর্ণ সুখ বহন করিয়া আনে। দুঃখ সকলের জীবনেই আছে—ইহা সংসারের নিয়ম। সেই দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া চলাই আনন্দলাভের উপায়। অপরে কি পাইল, তাহা না ভাবিয়া নিজের কথা ভাবিলে আমাদের জীবন দুঃখময় হয় না। যত দুঃখ সবই অপরের সহিত তুলনা হইতে আসে। শত মুদ্রা যে পাইয়াছে, সে অকিঞ্চন অপেক্ষা সুখী—কিন্তু তাহার সহস্র মুদ্রালাভের বাসনা বিদ্যমান; কাজেই সে দুঃখী, অসন্তুষ্ট। আবার সহস্র মুদ্রা যাহার আছে, সে লক্ষমুদ্রার আকাঙ্ক্ষায় অসন্তুষ্ট। এইজন্য শিষ্টবাক্য আছে যে,—

"ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষমী হতে।
লক্ষাধিপস্ততো রাজ্যং রাজ্যেশঃ স্বর্গমীহতে।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষাই যত নষ্টের মূল। তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা দমন না করিলে সন্তোষ লাভ করা যায় না—আর সন্তোষ লাভ না করিলে মন কোনদিনই সুখী হইতে পারে না। মনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দমন করিতে না পারিলে সুখলাভ হয় না। উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাগুলি দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাদের মনকে চির অতৃপ্তির অনন্ত পথে টানিয়া লইয়া যায়। সেইজন্য প্রায় সর্বাবস্থার লোকের মধ্যে এত দুঃখ, এত হাহাকার, এত অতৃপ্তির বেদনা, এত আকাঙ্ক্ষার আকুতি।

১২। "কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটীর প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

ক্ষুদ্রব্যক্তিও মহৎ কর্তব্যের ভার লইতে পারে। শক্তি ক্ষুদ্র হইলেও যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে সেই শক্তি মহৎকার্যের প্রেরণা দিয়া জগতে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে। দায়িত্ব গ্রহণ করা শক্ত ব্যাপার। শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতেও অনেকে দায়িত্ব এড়াইতে চায়। কিন্তু দায়িত্ববোধ মানুষকে অসীম শক্তি প্রদান করে। যথার্থ দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে মানুষ যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া আপাত অসম্ভবকেও বহুক্ষেত্রে সম্ভব করিয়া তোলে।

মহতের ঐকান্তিক আহ্বানে বহু ক্ষুদ্রব্যক্তিও মহৎকার্যে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। সূর্য প্রোজ্জ্বল কিরণসম্পাতে বিশ্বচরাচর আলোকিত করে, কিন্তু দিনান্তে তাহার মনটী অন্ধকার পৃথিবীর কথা ভাবিয়া দুঃখে বিগলিত হয়। অন্ধকার পৃথিবীতে তাহার হইয়া তাহার অবর্তমানে কে আলো দিবে, সেইজন্য সে আকুল আহ্বান জানায়। তাহার সেই ঐকান্তিক ডাকে ক্ষুদ্র প্রদীপ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। যদিও তাহার শিখা ক্ষীণ, দীপ্তি সামান্য, তথাপি সে মহতের আহ্বানে সাড়া দিয়া সেই কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহার পক্ষে ইহা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু সে নিজের ক্ষুদ্রশক্তিকে—স্নিগ্ধ কিরণে গৃহকোণটুকু আলোকিত করিয়া সূর্যের আলোর অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করে।

মহতের আহ্বানে এইরূপ মহত্ত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া ক্ষুদ্রশক্তি মানুষও এই ধূলি মলিন পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত করিতে পারে।

১৩। "রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে সবে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

(C. U. 1934)

জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে সহস্র সহস্র ভক্ত একত্র জমায়েত হইয়া বিশ্ববিধাতা মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে। পথের ধূলি হইতে রথস্থ ভগবানের প্রতীক পর্যন্ত সকলেই মহাপবিত্র হইয়া উঠে। ভক্তের প্রণাম কাহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তাহার সঠিক বোধ সকলের নাই। যে সকল উপলক্ষ্য একত্র হয় সকলেই মনে মনে ভাবে যে তাহার উদ্দেশেই প্রণাম নিবেদন করা হইতেছে। তাহাদের এই হাস্যকর মূঢ়তা দেখিয়া অন্তর্যামী হাস্য করেন। তিনি সর্বকর্মের নিয়ন্তা ও কর্তা। তাঁহার ইচ্ছার অনন্ত কোটি বিশ্ব সৃষ্টি হইতেছে আবার তাঁহার ইচ্ছায় জলবুদ্বুদের মতই তাহারা কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতেছে। জগতে সব কিছু কার্য ও কৃতিত্বের কর্তা যে ভগবান্—একথা অল্পবুদ্ধি মানুষ সর্বদা মনে রাখিতে পারে না। মানুষের মহত্ত্বে, মানুষের কৃতিত্বে যখন অপরে শ্রদ্ধা জানায়, তখন সে শ্রদ্ধা মানুষের সৃষ্টিকর্তা ভগবানের উদ্দেশেই যে নিবেদিত হয়, তাহা যে জানে না, সে মহামূর্খ। সেই বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত শক্তির তরঙ্গই মহাপুরুষদের জীবনকে আমাদের চক্ষে মহীয়ান্ করিয়া তুলে। কাজেই মানুষের এই মহত্ত্ব পূজা প্রকৃত প্রস্তাবে লীলাময় ভগবানেরই পূজা।

১৪। "কেরোসিন-শিখা বলে মাটীর প্রদীপে—
'ভাই বলি ডাক যদি, দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা।'"

পদমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের একটা দুর্দমনীয় টান আছে। ইহার কারণ অন্তরে অন্তরে প্রত্যেকেই চায় যে সকলে তাহাকে সম্মান করুক, সকলে তাহার অধীন হউক। এই বিকৃত রুচির ফলেই মানুষ নিজের আত্মীয়-স্বজন বা সগোষ্ঠি, সহকর্মী ও সমপদস্থ অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থার আত্মীয়স্বজনের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া পদমর্যাদা সম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তিদের হীন চাটুকারিতা এবং স্তাবকতা করিতেও ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করে না। মনে করে, তাহাদের সান্নিধ্যে তাহার গৌরব বাড়িবে।

হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চির শিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি। —স্বদেশ, রবীন্দ্রনাথ

ভাবার্থ :—বাঙালী নিরীহ, নেতিবাচক গুণের আধার কিন্তু মনুষ্যত্বহীন, বৃহত্তর জগতের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া চারিত্রিক দার্য অর্জন না করিলে কেহ মানুষ হইতে পারে না। বাঙালী কূপমণ্ডুক, বাঙালী সংগ্রাম বিমুখ। জীবনের বিচিত্র বিপথে ভ্রমণ করিয়া বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ব্যতীত বাঙালীর মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কবি বাঙালী ছেলেদের সকল বাধাবন্ধনহীন হইয়া সর্বকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুঃখ সুখের সহিত সংগ্রাম করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে উপদেশ দিতেছেন।

১৭। পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি বংশ বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু মূলে
সখী ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে।
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি। —কাব্য মঞ্জুষা

ভাবার্থ :—সীতা পঞ্চবটীবনে রামের সহিত অতি সুখে, অতি আনন্দে বাস করিতেন। সে বনের শোভা নিরুপম। বনের-শব্দ বীণার শব্দের মত মধুর। সরোবরের তীরে বসিয়া পদ্মবনে আলোর খেলা দেখিতেন। কখনও বা ঋষিবধূরা সীতাকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহারা গাছের ছায়ায় মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আলা

করিতেন। সীতা হরিণের সহিত কখনও নাচিয়া বেড়াইতেন। কখনও বা কোকিলের ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেন।

১৮ কিয়ে মানুষ পশু পাখীকুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃপুনঃ
মতি রহু তুযা শরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুযা পদ-বল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥ —কাব্য মঞ্জুষ

ভাবার্থঃ—সংসারে যে যেমন কর্ম করে, তেমন ফল পায। কর্মফলেই মানুষকে নানা জন্ম গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে আসিতে হয। কর্মফল অনুযায়ী মানুষ, পাখী, কীট, পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভক্ত সব সমযে সর্ব জন্মে ভগবানে ভক্তি ও অনুরাগ প্রার্থনা করে। ভক্ত ভগবানকে সব সমর্পণ করে বলিযা তাহার মন সম্পূণ নির্ভীক হইয়া তদ্গত হইযা যায়।

১৯। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্ব দিকে মেঘ নাই। সূর্য কিরণ যেন বষাব জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টি বিন্দু সূর্য কিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভ আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায পরিস্ফুট হইয় উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিযা ভাসিযা যাইতেছে। ইন্দ্রধনুর তোরণের নাচে দিয়া বকের শ্রেণী উডিযা চলিযাছে। কাঠবিডালিরা গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোশ সচকিত ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগ-শিশুরা দুর্গম পাহাডে ঘাস ছিঁডিযা খাইতেছে। গোরুগুলি আজ ...নের আনন্দে মাঠময ছডাইযা পডিযাছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলস কক্ষ মাযের আঁচল ধরিযা আজ ছেলেমেযেরা বাহির হইযাছে। শুদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। ...নের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইযাছে। কল কল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢের প্রভাতে এই জীবমযী আনন্দময়ী ...ণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা জযসিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। —রাজর্ষি

ভাবার্থঃ—বর্ষণক্লান্ত আষাঢেব প্রভাত। সূর্যকিরণে বৃষ্টিস্নাত পৃথিবী ঝলমল করিতেছে। সর্বত্র আনন্দের দীপ্তি। আকাশে রামধনু। বক উডিতেছে, কাঠবিড়ালী খেলা করিতেছে, খরগোশ উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। মাঠে গরু চরিতেছে—ছেলেরা মায়ের সহিত বাহির হইয়াছে। নদীতে বহু স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে। তাহাদের কোলাহল ও নদীর কলতানে একাকার। সর্বত্র এই আনন্দের ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

প্রবন্ধ রচনা

রচনা

প্রবন্ধ বা রচনা

ভাবসম্প্রসাবণ ও অনুচ্ছেদ রচনা কি ভাবে করিতে হয তাহা তোমরা শিখিয়াছ। ভাব-সম্প্রসারণে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ বা গদ্যাংশের ভাবটি নিজ ভাষায সজ্জিত করিয়া প্রকাশ কবিতে হয এবং সেই ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাব সুন্দরভাবে ও বিশদভাবে লিখিতে হয। আর অনুচ্ছেদ রচনায কোন একটি উদ্ধৃত বাক্য বা বিষয় সম্বন্ধে তোমার যাহা কিছু জানা আছে তাহা সংক্ষেপে গুছাইযা লিখিতে হয।

এইবাব **প্রবন্ধ** বা **রচনা** কি ভাবে লিখিতে হয তাহা তোমাদের শিখিতে হইবে। প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, নিবন্ধ বা রচনা বলিতে কোন বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে যাহা কিছু জানা আছে তাহা সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে লেখাকে বুঝায। রচনা কথাটির অর্থ নির্মাণ বা তৈযারী করা। সুতরাং রচনা বলিলে সাধারণতঃ সুবিন্যস্ত লেখাকেই বুঝায়। এজন্য রচনাব বিন্যাস অত্যন্ত প্রযোজনীয অংশ। যাহা কিছু আমরা নির্মাণ কবি সকলই সুন্দরভাবে করি না। যাহা সুন্দরভাবে নির্মাণ করি তাহা অপরেব মনোবঞ্জন করে। তাহাতে রচনার বা নির্মাণেব কতকগুলি কৌশল প্রকাশ পায়। এই কৌশলগুলি অনাযাসে আপনা-আপনি আযত্ত হয না। ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। সাহিত্য রচনায় যাঁহারা সিদ্ধহস্ত তাঁদের রচনা-রীতির অনুকরণ করিলে স্বভাবতঃই লেখা সুন্দর হয। এইভাবে অনুকরণ দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থী ক্রমশঃ আপনার রচনারীতি গঠন করিয়া লয।

প্রবন্ধ রচনার পূর্বে বিষয়টি লইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভাবগুলিকে সাজাইয়া লইতে হয। সাজাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যে ভাবগুলি যেন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয। সেজন্য এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইবার সূত্র থাকে। সেই সূত্রগুলি যেন মালার সূত্র বা সূতা, আর ভাবগুলি যেন ফুল। সমগ্র রচনাটি একটা মালার ন্যায় হইবে। তাহাতে যেন কোন ভাব প্রধান বিষয়েব সহিত সম্বন্ধ শূন্য না থাকে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

রচনার মূল বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই লেখা শুরু না করিয়া তাহা যে বিষয়ের সহিত

সংযুক্ত তাহা ভূমিকা বা প্রারম্ভ হিসাবে অবতারণা করিয়া লইবে। তাহাতে রচনার প্রারম্ভ সুন্দর হইবে। এই প্রারম্ভ বা সূচনা অতি দীর্ঘ না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে এবং সেই প্রারম্ভ বিষয় হইতে আলোচ্য রচনার প্রথম ও প্রধান সঙ্কেতসূত্র আবিষ্কার করিয়া লইবে। রচনার শেষে মূল প্রবন্ধের বক্তব্য সমাপ্ত করিয়া শেষ বক্তব্য লিখিবে। রচনা যেন সহসা শেষ হইয়া না যায়।

রচনার মধ্যে বহু গৌণ বিষয় প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িবে কিন্তু তাহাদের যেন প্রাধান্য দেওয়া না হয়। মূল প্রবন্ধের বক্তব্য যেন অস্পষ্ট হইয়া না যায় তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতি দেওয়ার ঝোঁক প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলি যাহাতে যথাযথ লিপিবদ্ধ হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবে। তাছাড়া উদ্ধৃতিগুলি যেন অবাস্তব এবং হালকা ধরণের না হয়। উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রথমে কিছু উদ্ধৃতি মুখস্থ রাখা প্রয়োজন। উদ্ধৃতি—বিশেষতঃ কবিতা ঠিকমত মুখস্থ না থাকিলে তাহার ভাবার্থ দেওয়া ভাল।

সাধু ও চলিত দুই প্রকারের ভাষা আজকাল প্রচলিত। ইহার মধ্যে কোন্ ভাষায় লিখিবে তাহা পূর্বে স্থির করিয়া সেই ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবে। কখনও সাধু ভাষা কখনও চলিত ভাষা এইরূপ করিবে না। চলিত ভাষা যদি পছন্দ কর ত' আগাগোড়া চলিত ভাষায় লিখিবে এবং চলিত ভাষায় সৌষ্ঠব সাধনের জন্য চলিত ভাষায় লেখা কয়েকটি সুন্দর নমুনা মুখস্থ করিয়া তাহার রচনারীতি নকল করিবে। তাহাতে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। আর যদি সাধু ভাষা পছন্দ কর তাহা হইলে সাধু ভাষার উত্তম রচনাগুলি নকল করিবার চেষ্টা করিবে।

যাহা জানা নাই তাহার অবতারণা রচনার মধ্যে একেবারেই করিবে না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবে না—বিদ্যা থাকিলে আপনিই প্রকাশিত হইবে। সংস্কৃত বা ইংরেজী উদ্ধৃতি ঠিকমত জানা না থাকিলে দিবে না। অযথা অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতা করিবার চেষ্টা বর্জন করিবে। মনে রাখিও যে, সরলতা রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। বক্তব্য সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইলেই রচনা সুন্দর হয়।

প্রবন্ধের বিষয় অগণিত। যে-কোন বিষয় সম্বন্ধেই প্রবন্ধ লেখা যায়। শুধু অভ্যাসের প্রয়োজন। রচনার অভ্যাস থাকিলে সকল বিষয়ই সুন্দরভাবে লেখা যায়।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'প্রবন্ধ' কথাটির অর্থ সাধারণভাবে যাহা কিছু জানা আছে তাহাই সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ। যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবে সেই সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দিলে প্রথমে মনে হয় যে, এ বিষয়ে সে রকম কিছু আমাদের জানা নাই। এ ধারণা দূর করিয়া যাহা জানা আছে তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিতে পারিলে চমৎকার প্রবন্ধ হইবে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রবন্ধগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **বর্ণনামূলক**, (২) **ঘটনামূলক** ও (৩) **চিন্তামূলক**। বর্ণনামূলক বলিতে যে সকল বিষয়ের শুধুমাত্র বর্ণনা করিলেই চলে তাহাদের বুঝায়, যেমন—প্রাণীবিষয়ক, উদ্ভিদবিষয়ক, স্থানবিষয়ক এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য-বিষয়ক। ঘটনামূলক বলিতে ঐতিহাসিক ঘটনা, মহাপুরুষদের জীবনী, কোন উৎসব বা মেলা বা পূজা-পার্বণ, ভ্রমণ কাহিনী এবং সাময়িক কোন ঘটনা সম্বন্ধে রচনাকে বুঝায়। চিন্তামূলক বলিতে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া রচনা করিতে হয় তাহাদের বুঝায়। এগুলি সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারকম চিন্তা জমা আছে। সেগুলি যুক্তিপূর্ণভাবে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া লিখিতে হয়।

কোন বিষয়ে রচনা লিখিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিবে তাহার সঙ্কেত প্রথমে এক জায়গায় লিখিবে। তারপর সঙ্কেতগুলি পরপর সাজাইয়া এক-একটি সঙ্কেত এক-একটি অনুচ্ছেদে লিখিলেই সুন্দর প্রবন্ধ হইবে।

এই পুস্তকে এইবার কয়েকটি প্রবন্ধের আদর্শ দেওয়া হইবে। এই আদর্শ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে প্রবন্ধ লেখার নিয়মগুলি তোমরা জানিতে পারিবে। এইভাবে রচনাগুলি পাঠ করার পর নিজে নিজেই রচনা করিবে, কদাচ নকল করিবার চেষ্টা করিবে না। আদর্শ রচনাগুলি পাঠ করিয়া পরে নিজে লিখিলে অভ্যাস হইবে এবং ক্রমশঃ নিজেরাই সুন্দর রচনা লিখিতে পারিবে।

কয়লা

'অঙ্গার: শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' কয়লার এ বড় অপযশ। কিন্তু রং কালো হইলে কি হয়, বর্তমান জগতে কয়লার মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য খুব বিরল। কয়লা সহসা অদৃশ্য হইলে এই কর্মচঞ্চল সভ্যতার গতি মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

ভূমিকা

মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে অনুসন্ধান চালাইয়া আপনাদের প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য আহরণ করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে প্রকৃতি নিজ হস্তে মানুষের জন্য যাহা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে তাহা বুঝায়। কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, খনিজ ধাতু, অরণ্যের কাষ্ঠ এবং সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্ত মুক্তাদি এই প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। কয়লা বা পাথুরে কয়লা বর্তমান যুগে মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে কয়লা বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

পাথুরে কয়লা বৃক্ষাদির রূপান্তর। বিশাল অরণ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া বহুকাল মাটিচাপা থাকিয়া এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। ইহা উত্তম জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়। মাটির তলায় বহু মাইল ব্যাপী স্থানে কয়লার খনি থাকে। সেই কয়লার খনি হইতে কয়লা সংগৃহীত হয়।

কয়লা কি?

খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। ইঞ্জিনীয়ারগণ প্রথমে খনি আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষা দ্বারা কোথায় কয়লার চাপ সব চেয়ে বেশী গভীর স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহা স্থির করেন। তৎপরে মাটি খুঁড়িয়া সুড়ঙ্গের ন্যায় করিয়া কয়লা কাটিয়া পথ তৈয়ারী করা হয়। উপরের চাপ যাহাতে ধ্বসিয়া না পড়ে সেজন্য বড় বড় মোটা মোটা থামের ন্যায় কয়লার স্তূপ মাঝে মাঝে রাখিয়া সুড়ঙ্গ কাটা হয়। সেই সুড়ঙ্গ-পথে কয়লা বহনের জন্য রেল-লাইন পাতা হয় ও মালবাহী ট্রেনে কয়লা খনির মধ্য হইতে বহন করিয়া সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথে পৌঁছাইয়া দেয়। সেখান হইতে 'ক্রেন' দ্বারা কয়লা উপরে তোলা হয়।

কয়লা সংগ্রহের উপায়

সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথে বিরাট লৌহের খাঁচার মত থাকে। সেই খাঁচায় করিয়া ভিতরে শ্রমিকদের নামাইয়া দেওয়া হয়। শ্রমিকরা সুড়ঙ্গ-পথ ধরিয়া ইঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশমত চাপ চাপ কয়লা কাটিয়া ফেলে। কয়লা-খনির শ্রমিকদের জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যে কাজ করিতে হয়। উপরের চাপ ধ্বসিয়া পড়িলে শ্রমিকদের জীবন্ত সমাধি হইতে পারে। এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমানে বিরল, তথাপি মধ্যে মধ্যে যে না ঘটে তাহা নহে। তাছাড়া খনিতে বিষাক্ত গ্যাস থাকে। সেজন্য শ্রমিকরা গ্যাসমুখোস পরিধান করে, এবং অন্ধকারে পথ দেখার জন্য 'মাইনার্স ল্যাম্প' নামক একপ্রকার ঢাকা-দেওয়া বিশেষভাবে প্রস্তুত আলো ব্যবহার করে। এ ছাড়া কয়লা খনিতে-বিস্ফোরণ ঘটে—তাহার ফলে শত শত শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে যাহাতে খনিতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য বহু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কয়লা উত্তোলনের পর যে সব স্থান খালি হয় তাহার উপর মাটির স্তর যাহাতে ধ্বসিয়া না পড়ে সেজন্য সেই খালি জায়গা পূরণ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই শূন্য স্থান পূরণ করার নাম 'ষ্টোয়িং'। এইভাবে খনিতে দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় করা হয়।

ভারতের কয়লা সম্পদ

জগতের কয়লা সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান সপ্তম। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ, আসাম, রাজস্থান এবং অন্ধ্র প্রদেশে কয়লার খনি আছে। ইহাদের মধ্যে বাংলা ও বিহারের কয়লা-খনিতে সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জে ভারতের কয়লা-সম্পদের শতকরা সত্তর ভাগ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বর্তমানে একহাজার কয়লাখনি আছে।

কয়লার প্রয়োজনীয়তা

কয়লা শুধু রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয়, একথা ভাবিলে খুবই ভুল ভাবা হইবে। কয়লা দ্বারা ভারতে রেল ও জাহাজ চলে। তাছাড়া লোহার কারখানা ও অন্যান্য কারখানা কয়লা ব্যতীত অচল হইয়া যাইত। কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহু দ্রব্য তৈয়ারী হয়। কয়লার গ্যাস রন্ধনের জন্য এবং কারখানার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে আলকাতরা, পিচ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। আলকাতরা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ন্যাপথোলিন প্রস্তুত হয়। বর্তমান জগতে কয়লা না হইলে একদিনও চলে না। প্রকৃতি মাটির সুগভীর গর্ভে এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু মানুষের

অনুসন্ধানী দৃষ্টি সেখানেও পৌঁছিয়াছে। সে এই অমূল্য সম্পদ দুই হাতে অপহরণ করিতেছে। কিন্তু এই বস্তুটির ব্যবহার বর্তমানে এত বাড়িয়াছে যে ভয় হয় যদি কোনদিন প্রকৃতির এই সঞ্চিত ভাণ্ডারগুলি শূন্য হইয়া যায় তখন কি উপায় হইবে! মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী, তখন আবার অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবে। অভাব হইলেই তাহার প্রতিকার মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং বর্তমানে ভাবনার কিছু নাই।

প্রকৃতির এই মহামূল্য সম্পদ মানুষ নিজ অত্যাবশ্যক কাজেই ব্যয করিতেছে। কযলা নানাজাতীয় আছে। বিশেষজ্ঞরা সেই নানা জাতীয কযলার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া কাজে লাগাইতেছেন। কয়লার কিছুই নষ্ট হয় না। গ্যাস তৈযারীর পর পোড়া কযলা আবার জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনের এবং কারখানার পোড়া কযলার ঘেঁষ বা চূর্ণ দিয়া বাড়ী তৈযারীর মশলা প্রস্তুত হয। যতক্ষণ কাজ চলে ততক্ষণ কযলাকে কাজে লাগাইযা তবে মানুষ তাহাকে অব্যাহতি দেয। তাছাড়া এই মহামূল্যবান সম্পদের লুক্কাযিত খনি আবিষ্কারেব চেষ্টাবও বিরাম নাই।

উপসংহার

একটি ফুটবল ম্যাচ

ফুটবল গোলাকার—ইহা অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মত আকৃতিবিশিষ্ট। তাই বোধহয আজ সারা পৃথিবীর লোকের কাছে এই খেলা আনন্দদাযক ও উত্তেজনাকর। পথে ঘাটে সর্বত্র বালকদিগকে এই খেলায মাতিযা উঠিতে দেখা যায।

'ফুটবল' শব্দের খাঁটি বাংলা 'পাদগোলক' অর্থাৎ যে গোলাকাব খেলার বস্তু পদাঘাতে চালিত কবা যায। এই খেলা আমাদের জাতীয খেলা নয। ইহা বিদেশী খেলা। কিন্তু ভারতীযগণ এই খেলায বেশ দক্ষতা অর্জন করিযাছে এবং বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদশন করিতেছে। ফুটবলের খোল চামড়ার দ্বারা তৈয়ারী, ইহার মধ্যে রবারের 'ব্লাডার' থাকে। তাহা বায়ু দ্বারা পরিপূরিত করিলে পদাঘাতে বহু দূর চালিত করা যায়। বর্তমানে যতপ্রকার খেলা আছে তন্মধ্যে ইহা অত্যন্ত আমোদজনক ও জনপ্রিয়।

সাধারণ বর্ণনা

দুই দলে এগার জন করিয়া খেলোয়াড় লইয়া এই খেলা হয়। দুই দিকের প্রান্তে দুইটি করিযা চারিটি খুঁটি পুঁতিয়া 'গোল' এলাকা করা হয়। এই গোল-রক্ষাকারীকে 'গোলকীপার' বলে। বিপক্ষ এই গোলের মধ্যে বল প্রবেশ করাইলে তাহাদের জয় সূচিত হয়। প্রতি দলের দ্বারা কৃত এইরূপ গোলের দ্বারা খেলার জয়-পরাজয় সূচিত হয। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গোল করিতে পারে প্রতিযোগিতায় তাহাদেরই জয় হয়। প্রতিতোগিতামূলক ফুটবল খেলাকে 'ফুটবল ম্যাচ' বলে।

গত বৎসর আমাদের পাড়ায় হঠাৎ খুব হৈ হট্টগোল বাধিযা গেল। পাড়ার একটি সংঘ বা সমিতি ছিল। তাহাদের কয়েকজন একটি খোলা মাঠে ফুটবল খেলা অভ্যাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলায যোগদান করিত। গত বৎসর

দুই দলের বর্ণনা

তাহারা সংঘের নামে একটি শীল্ডের প্রতিযোগিতায় নাম দিযা বসিল। তাই লইয়াই এই হৈ হট্টগোল। প্রথম রাউণ্ডেব খেলায আমাদের কল্যানসংঘের সহিত বোসপাড়ার তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা পড়িযাছিল। কে কোন্ স্থানে বা 'পজিসনে' খেলিবে তাহা লইয়াই এত হট্টগোল।

কল্যান-সংঘেব দলপতি বিষ্ণুপাল খেলোযাড়দের লইযা সভা করিল এবং দলের সকলের পটুতা বিবেচনা করিযা 'পজিসন' ঠিক করিযা দিল। সেই 'পজিসন' অনুসারে প্রথম রাউণ্ডে খেলিতে হইবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল যে একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও একজন গোলকীপার অন্য কোন ক্লাব হইতে ধার করবার জন্য। বিষ্ণুপাল ঘৃণাভরে

দলপতি বিষ্ণুপাল

সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। সে বলিল, "খেলায় আমাদের নিজস্ব কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে—ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ সাজিতে আমি রাজি নই।" তাহার দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানবোধ সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হইল। কাজেই খেলোয়াড় ধার করবার কথা চাপা পড়িয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা সদলবলে 'মার্কাস স্কোযারে' হাজির হইলাম। সেদিন আমাদের পাড়ার সকলেই প্রায় সেখানে গেলেন। বিপক্ষ দলেরও এক বিরাট ফৌজ জমা হযেছিল। তাদের পোশাক নেভিব্লু ও লাল রঙের। আমাদের দলের পোশাক

খেলার বর্ণনা

গৈরিক। সাড়ে পাঁচটায খেলা সুরু হইল। আমরা 'টসে' জয়ী হইলাম। বিষ্ণুপাল সেণ্টার খেলিতেছিল, সে বল নরেশের দিকে ঠেলিয়া দিল। নরেশ রাইট-ইনে ছিল, সে দিল লেফট্-ইন রঞ্জিতের দিকে

রঞ্জিত বল লইয়া ছুটিল কিন্তু বিপক্ষ দলের একজন তাহাকে অনুসরণ করিয়া বল কাড়িতে উদ্যত হইলে সে বল সেণ্টার করিতে উদ্যত হইল—কিন্তু বল ততক্ষণে বিপক্ষ দলের আয়ত্তে গিয়া পড়িয়াছে। সে বলটা পাইয়া তাহাদের একজন ফরোয়ার্ডকে পাশ করিয়া দিল। ফরোয়ার্ড বিদ্যুৎগতিতে বলটি আমাদের গোলের সম্মুখে আনিয়া এক সটে গোল করিয়া বসিল। আমাদের বুক দমিয়া গেল। বিপক্ষের উল্লাসে আমাদের কানে তালা লাগার জোগাড়। কি করিব! মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। তেত্রিশ কোটি দেবতাব কাহাকেও বাদ দিলাম না। আবার খেলা চলিতে লাগিল। এবার খেলা খুব জমিয়া গেল। কেহ কাহাকেও হটাইতে পারে না। এইভাবে প্রথম হাফ অর্থাৎ খেলার অর্ধেক সময় কাটিল। বিশ্রামের পর আবার খেলা শুরু হইল। এবারে কল্যান সংঘ যেন যাদুমন্ত্রে বলশালী হইয়াছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিষ্ণুপাল একটি গোল করিল। তার দশ মিনিটের মধ্যেই রঞ্জিত আব একটি গোল করিল। এবাব হৈ চৈ করার পালা কল্যান-সংঘের। ছাতা উড়াইয়া, নাচিয়া, কাগজ উড়াইয়া, গাহিয়া কল্যান-সংঘের পৃষ্ঠপোষকেরা ভীষণ উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি করিল। এবার বোসপাড়ার তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব আগুনের ন্যায় হইয়া উঠিল। চর্কিবাজির মত তাহাদের খেলোয়াড়েরা মাঠময় বল লইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু গোল করার সুযোগ আর তাহারা পাইল না। সহসা দেখা গেল 'রেফারী' ঘড়ি দেখিতেছেন। আর মাত্র দুই মিনিট বাকী। বোসপাড়ার সেণ্টার ফরোয়ার্ড বল ধরিয়াছে। ঝড়ের গতিতে সে বল লইয়া আমাদেব গোলের দিকে ছুটিতেছে। রঞ্জিত বল ধরিতে গেল। সে বল পাশ করিয়া দিয়াছে। দারুণ উত্তেজনা—আমাদের গোলকীপার দ্রুত বেগে গোলে পদচারণা করিতেছে। 'ফ্রূরুরু'....রেফারীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। খেলা শেষ হইয়া গেল। কল্যান-সংঘ (২—১) গোলে বোসপাড়া তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারাইয়া শীল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠিল।

এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা কল্যান-সংঘের ন্যায় নূতন ক্লাবের পক্ষে বড রকম কৃতিত্বের কথা নয়! পাড়ায় দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। সন্ধ্যায় ক্লাবকক্ষে সে কী ভীড! পাড়ার রত্নেশ্বর বাবু সংঘকে ২৫৲ (পঁচিশ) টাকা দান করিলেন। সবচেয়ে আনন্দ বিষ্ণুপালের। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া সে যেন সংঘকে নূতন প্রাণশক্তি আনিয়া দিল। এই

উপসংহার

খেলার মাধ্যমে বালকগণ ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাময় ও নিয়মানুগ হইয়া কাজ করিতে শেখে। প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, দৈহিক বল ও সাহস, জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির অনুশীলন এই খেলার দ্বারা লাভ করা যায়।

দেশ-ভ্রমণ

আজকের মানুষ সভ্য হইয়া সমাজ গড়িয়াছে, নগর গড়িয়াছে। স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় মানুষ যেন এই কায়েমী ব্যবস্থার মধ্যে আগাগোড়াই বাস করিতেছে। কিন্তু এরকম অবস্থা মানুষের চিরকাল ছিল না। মানুষ আদিম কালে গুহায় বাস করিত, বৃক্ষকোটর বা বৃক্ষের শাখা তাহার বাসস্থান ছিল। কাঁচা মাংস আর বুনো ফলমূল ছিল তাহার আহার—কাপড়-চোপড়ের বালাই ছিল না, খাদ্য অন্বেষণে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আজ এদেশ, কাল ওদেশ, আজ এ অঞ্চল কাল অন্য অঞ্চল। এইভাবে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে মানুষ এক-এক স্থানে ঘাটি করিল,—ঘরবাড়ী বানাইল, পশুপালন শিখিল, চাষাবাদ করিতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ সভ্যতার ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া দুনিয়ার অধীশ্বর হইয়া বসিল। কিন্তু তাহার রক্তের মাঝে আদিম কালের সেই ভবঘুরে বৃত্তি লোপ পাইল না। সেই যাযাবর বৃত্তির নিদর্শন আমাদের দেশ-ভ্রমণ-স্পৃহা। প্রত্যেকটি মানুষকে বিদেশ যেন হাতছানি দিয়া ডাকে—

ভূমিকা: মানুষের আদিম অবস্থা যাযাবর বৃত্তি

> "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
> প্রবাল দিয়ে ঘেরা
> শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
> সাগর বিহঙ্গেরা।
> নারিকেলের শাখে শাখে
> ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে—"

মানুষের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে, বলিয়া উঠে—

"আমি চঞ্চল, আমি সুদূরের পিযাসী"।

মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়। যাহা চায় তাহা পাইলেও আরো আকাংক্ষায় সে ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতা তাহার স্বভাব ও কৌতূহলসঞ্জাত। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার, অপরিচযের সাথে পরিচয় স্থাপনের আগ্রহই তাহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছে। সে পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তে পৌছিযাছে, সু-উচ্চতম পর্বত-চূডায উঠিয়াছে, ভয়ংকর আগ্নেযগিরির অভ্যন্তরে নামিযাছে, আকাশে উডিয়াছে, মঙ্গলগ্রহে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কৌতূহলই মানুষকে দেশ-ভ্রমণে বাহির করে।

মানুষের স্বভাব ও কৌতূহল

দেশ-ভ্রমণ না করিলে পৃথিবীর যথাযথ পরিচয লাভ করা যায না। পুস্তকে নানা দেশের বিবরণী পাঠ করা যায কিন্তু প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ছাডা আমাদের যথাযথ জ্ঞান লাভ হয না। বসুধার সকলের পরিচয প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিলে মনের প্রসারতা জন্মে এবং তাহাদের সহিত আত্মীযতাবোধ জাগে। ভ্রমণ ছাডা প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পূর্বকালে শিক্ষার্থীরা পদব্রজে ভ্রমণ কবিয়া নানা দেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ সুদূব তিব্বতে গিযা ধর্মপ্রচার করেন। ফাহিয়েন, হুয়েনসাঙ চীন দেশ হইতে ভাবতবর্ষে আসিযা এদেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। রামমোহন অতি অল্প বযসে তিব্বতে পাডি জমান। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিযা ভারতবাসীকে সার্থক জীবন যাপনের পথ দেখাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ বহু দেশ ভ্রমণ করিযা ভারতীয সংস্কৃতির সংগে সেই সব দেশেব পরিচয স্থাপন করেন। ভ্রমণ শিক্ষার অংগ হিসাবে গ্রহণ না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এজন্য বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান বা উত্তম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইযাছে।

দেশ-ভ্রমণে মনের খোরাক মেলে ইহা শিক্ষার অংগ

পূর্বে পথঘাট ভাল ছিল না। যানবাহনেরও অভাব ছিল। পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও ছিল। সেজন্য তখন ভ্রমণের এরূপ সুবিধা ছিল না। তথাপি ভ্রমণকারীরা

পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বাদ দেয় নাই। মার্কোপোলো চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

বর্তমান কালে দেশভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা

আজ সেই তুলনায় ভ্রমণের কত সুবিধা হইয়াছে। মোটর, বাস, ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন—বড় বড় পাকা সড়ক, পান্থশালা প্রভৃতি বর্তমান ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য সদা প্রস্তুত। ট্রেনে অল্প ভাড়ায় ভ্রমণেরও সুবিধা মধ্যে মধ্যে দেওয়া হয়। ছাত্রদের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

দেশ-ভ্রমণ করিলে আমাদের কূপমণ্ডুকতার নাশ হয়। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিয়ত বাস করিলে মানুষের মন সংকীর্ণ হইয়া যায়। উদারতা ছাড়া মনের প্রসার হয় না। দেশ-ভ্রমণে বিচিত্র মানুষ ও তাহাদের জীবনযাত্রার সহিত পরিচয় ঘটায়, আমাদের মনের সংকীর্ণতা দূর হইয়া যায়। আমরা তাহাদের উত্তম গুণগুলি আয়ত্ত করিতে পারি এবং নিজেদের দোষগুলি বর্জন করিতে পারি। ভ্রমণের ফলে অন্য দেশের ভাবধারার সহিত আমাদের যোগাযোগ হয়। তাহাদের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, কর্মকৌশল ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করি। ভ্রমণের ফলে পৃথিবীর মানুষের সহিত আমাদের সৌহার্দ জন্মে—সমস্ত মানুষ যে এক পরিবারের লোক ক্রমশঃ এই বোধ জন্মে। পৃথিবীর মনোরম স্থানগুলি দেখিলে আমাদের হৃদয় ও নয়নের তৃপ্তি জন্মে। মানুষের কীর্তিগুলি যেমন আমাদের মনে মানুষের মহত্বের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করে তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানগুলি দেখিলে ঈশ্বরের কথা মনে হইয়া আমাদের মন ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে।

দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা

পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিচয় দুঃসাহসী দেশ-ভ্রমণকারীরা আনিয়া দিয়াছেন। কলম্বাস আমেরিকা দেশের খবর পৃথিবীকে দিয়াছেন। ডেভিড লিভিংস্টোন আফ্রিকার বহু দুর্গম স্থানের পরিচয় পৃথিবীর জনগণের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন কুক, স্কট, আমনসেন, পেয়ারী প্রভৃতি আবিষ্কারকদের দুঃসাহসিক ভ্রমণ ব্যতীত ভূগোল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইত না। ভ্রমণের নেশা মানুষের উন্নতির সহায়ক।

ভ্রমণের ফলেই মানুষ পৃথিবীর পরিচয় লাভ করিয়াছে

ভারতবর্ষ এককালে দুনিয়ার হাট চষিয়া বেড়াইত, তাহার বাণিজ্যতরী জাভা, বোর্ণিও, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতিতে পণ্য লইয়া যাইত। তখন ছিল ভারতের

সুদিন। তারপর যখন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইল তখন হইতেই ভারতবাসী কূপমণ্ডুক হইল—বাহিরের জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। তখন হইতেই তাহার দুর্দিনের সূচনা।

দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা বহু। দেশ-ভ্রমণ করিতে হইলে চক্ষু দুইটিকে সদা সতর্ক রাখিতে হয়। তাহার সহিত মনকে যুক্ত রাখিতে হয। খোলা মনে দেশ-বিদেশের

উপসংহার

দৃশ্য, কর্মধারা ও মানুষের হালচাল লক্ষ্য করিলে আমরা বহু বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। দেশ-ভ্রমণে আমাদের মন প্রসারিত হয়—মনে উদার ভাব জাগে। আমরা আমাদের কুসংস্কারগুলি ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইযা উঠিতে পারি।

তোমার দেখা মেলা

আমি পল্লীগ্রামের ছেলে। কিন্তু বাল্যকালেই পল্লীপরিবেশ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিযা শহরের বিদ্যালযে ভর্তি করা হইযাছিল। সেজন্য শৈশবস্মৃতিতে পল্লীর

ভূমিকা

একটি সবুজ মনোরম চিত্র উজ্জ্বল হইযা বিরাজ করিত। পল্লীর কথা কল্পনায রঙ্গীন করিযা আঁকিতাম আর শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের বন্দীশালায রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের ন্যায দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতাম।

একদা সহসা পিতৃদেব আমাকে কযেকদিনের জন্য পল্লী আবাসে আনিলেন। তখন বর্ষাকাল। স্টেশনে নামিযাই এক পশলা বৃষ্টি পাইলাম। স্টেশনে দাঁড়াইয়া সে চমৎকার দৃশ্যটি নয়ন ভরিযা দেখিলাম। বড বড তালগাছ, নারিকেলগাছ যেন শাখা দুলাইযা বৃষ্টিকে আহ্বান করিল। বাবলা, আম, জামগাছ মাথা নত করিযা বৃষ্টির ধারা গ্রহণ করিল। পুকুরে, ডোবায় কুমুদ ফুলের হাসি মুখ—মধ্যে মধ্যে ব্যস্ত হংস-হংসী বিচরণ করিতেছে। বৃষ্টিতে টোকা মাথায় গো-চারণ হইতে রাখাল ফিরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গোবৎসগণ হাম্বা হাম্বা রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আকাশে মেঘের দল জটলা করিতেছে। ভারী চমৎকার

লাগিল। বৃষ্টি থামিলে মেঠো পথ দিয়া পল্লীভবনে পৌছিলাম। পথের দুইধারে নূতন ধান্যের চারা সবুজ গালিচার ন্যায শোভা পাইতেছে। কতক কতক স্থানে রোপন কার্য চলিতেছে। সারি বাঁধিয়া চারি পাঁচজন কৃষক দ্রুত চারা বুনিয়া চলিতেছে।

বাডীতে আসিয়া শুনিলাম, বাবা আমাকে পবের দিন পার্শ্ববর্তী গ্রামে রথের মেলা দেখাইতে লইযা যাইবেন। কলিকাতায রথের মেলা দেখিযাছি। নিজেরা টিনের রথ কিনিযা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মাটিব মূর্তি বসাইযা, মোমবাতি জ্বালিযা পত্র-পুষ্প দিযা সাজাইযা শাঁক-ঘণ্টা বাজাইয়া আনন্দ কবিযাছি। কোন দিন পল্লীগ্রামের কোন মেলা দেখি নাই। কাজেই বথযাত্রার মেলা দেখিবাব উৎসাহ আমাকে খুব খানিকটা উত্তেজিত করিল। শুনিলাম পাঁচ ছয মাইল পথ হাঁটিযা সেখানে যাইতে হইবে। কত কী দেখিবার উৎসাহে অধীর হইযা উঠিলাম। আমার সমবয়সী আরো দুই একটি ছেলে আমার সঙ্গ লইল। পল্লীগ্রামে আমাদের আত্মীয ও আত্মীযারা আমাকে কিছু পার্বণী দিলেন। আমাব জামার দুই পকেট পার্বণীর পয়সায ভরিয়া গেল। কত কী কিনিবার আগ্রহে অধীর হইযা অবশেষে যাত্রা শুরু হইল বেলা দ্বিপ্রহরের পর।

বাবার হাত ধরিযা খুব দ্রুত হাঁটিতে লাগিলাম। ইচ্ছাটা তখনই মেলার স্থানে পৌছাই। আমাদেব সাথে বাডীর পুবাতন কৃষাণ গোপাল যাইতেছিল। সে কহিল, "দাদাবাবু, আমার কাঁধে চড়ে যাবে?" আমি লজ্জা পাইয়া বলিলাম, "ধ্যেৎ!" কিন্তু দেখিলাম পথ দিয়া আরো বহু লোক দলবদ্ধ হইযা মেলার উদ্দেশ্যে যাইতেছে। অনেক ছেলে পিতার স্কন্ধে চডিয়াছে—একটি ছোট ছেলে তাহার বাবার মাথার উপরে একটা ধামার মধ্যে বসিয়া রহিযাছে। তাহার ভাব দেখিয়া ভারি হাসি পাইল। মেঠোপথ ধরিযা চলিলাম। বর্ষার জলে চারিদিক থৈ থৈ করিতেছে। গাছপালা কী সুন্দর ঘন সবুজ রং ধারণ কবিয়াছে। খড়ের কুঁড়ে ঘর, পুকুরে ঝি-বৌরা বাসন মাজিতেছে। কোথাও বা খালের ধারে পাঁচ সাতটা ছিপ ফেলিয়া এক একজন বুডী মাছ ধরিতেছে। ঘরের দাওয়ায় দশ বারোজন গোল হইযা বসিয়া তাস খেলিতেছে....মেলার যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই পথে লোকজন বাড়িতে লাগিল। গরুর গাডী ভর্তি মা[illegible]

মেলার স্থান, উদ্দেশ্য, পথশ্রম ও পথের মেলার দৃশ্য ও আনন্দ

মেলায় চলিয়াছে—চুবড়ি, ঝোড়া, কুলো লইয়া লোক মেলায় বেচিতে যাইতেছে.... সহসা আমরা একটা বড পাকা রাস্তায় উঠিলাম। বাবা এখানে আমাদের অপেক্ষা করিতে বলিলেন। একটু বাদে বাস আসিল। আমরা বাসে উঠিয়া পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে মেলার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মেলার প্রবেশ-পথটা লোকে গিজ গিজ করিতেছে। কেহ ডুমডুমি বাজাইতেছে —কেহ সরা-ঢোল টানিতেছে আর ডুম্‌ডুম্‌ ডুম্‌ডুম্‌ শব্দ উঠিতেছে—কেহ তালপাতার বড় বাঁশী বাজাইতেছে—ভেঁা—ভেঁা—পোঁ—পোঁ। পথের দুই ধারে পুতুলের দোকান—মাটির পুতুল, দেশী পটুযার তৈযারী—কিন্তু কী সুন্দর—তাহার বিচিত্রবর্ণ আমার চোখে ঘোর লাগাইয়া দিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলাম, "বাবা, পুতুল!" বাবা বলিলেন, "এখন কেন? আগে সব মেলা দেখি—রথ দেখি—তারপর কেনা-কাটা—"। বাবার কথাটা ভাল লাগিল। মেলার মধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে লাগিলাম। বাঙালী গৃহস্থের প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কত কি জিনিস আসিয়াছে! ইহাদের অধিকাংশই গ্রামের শিল্পীদের তৈযারী—তাহারা মেলায় বেচিবার জন্য অবসর সময়ে তৈযারী করিয়া রাখিয়াছে। কৃষকদের ক্ষেতের ফসলও আসিয়াছে—টাট্‌কা সবুজ, সদ্য বোঁটা-ভাঙা। একটা দোকানে বেগুনী, আলুর চপ ও পাঁপর বিক্রি হইতেছে। ওঃ কী অসম্ভব ভিড—ছেলেরা কিনিতেছে আর গো-গ্রাসে গিলিতেছে। পল্লীর জল-খাবার এইগুলি। আমাদের পেটে সহ্য হয না, ইহাদের কিন্তু সহ্য হয।

মেলার দৃশ্য ও আনন্দ

গোপালদাদা আমাকে হঠাৎ কোলে করিয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদাবাবু, নাগরদোলায় উঠবে?"

ওরে বাবা! কি বিরাট নাগরদোলা—আকাশ থেকে পাতাল স্পর্শ করিয়া যেন ঘুরিতেছে। কত লোক আনন্দে হাসিতে হাসিতে ঘুরিতেছে। এক জায়গায় একটা উঁচু ঘেরা ঘরের মধ্যে পুতুল-নাচ হইতেছে। ভিতর হইতে অভিনেতা পুতুলের বক্তব্য বলিতেছে—গান গাহিতেছে। ভারী সুন্দর লাগিল। উপরে কাপড়ে লেখা—"দশভুজা টকি পুতুল নাচ পার্টি," স্বত্বাধিকারী—নকুলচন্দ্র দাস। পালার নাম "অজামিলের বৈকুণ্ঠ-লাভ।" অনেকক্ষণ শুনিলাম। তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। বাবা কহিলেন, "রথ দেখবি না?" বলিলাম, "হ্যাঁ দেখব,—কোথায়?" এবার

আবার ভিড় ঠেলিতে হইল। মেলার একধারে কাঠের বিরাট রথ সাজানো রহিয়াছে। টানা হইবে সেই সন্ধ্যায়। রথের সাজসজ্জা অতি চমৎকার—উপরে নিশান উড়িতেছে—সম্মুখে চারিটি কাঠের ঘোড়া পা উঠাইয়া ছুটিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে —তাহার সম্মুখে কাছি দড়ি। এই দড়িতে শত শত লোক টান দিয়া রথ চালাইবে। ....কিছুক্ষণ রথ দেখিয়া পুতুল, খেলনা কিনিয়া আমরা মেলা হইতে যখন বাহির হইলাম; তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। দোকানে দোকানে আলো জ্বালা হইয়াছে। বাহির হইতে মেলাটি যেন আলোর মেলার মত মনে হইতেছে। ক্রমশঃ আমাদের বাস আসিল। আমরা বাসে চড়িলাম।

মেলার ছবিটি, তাহার আনন্দের সুরটি যেন সারা মন ভরাইয়া দিয়াছে। আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বাস হইতে নামিয়া আর হাঁটিতে পারিলাম না।

গৃহ প্রত্যাবর্তন

গোপালদার কোলে চড়িলাম। সারা পথ কেবল মেলার দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। পুতুলের দোকান, খেলনার দোকান, পুতুল-নাচ, রথ, পাঁপরভাজার গন্ধ যেন নাকে লাগিয়া রহিয়াছে। যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পুতুল ও খেলনাগুলি ঘরের মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বাংলার নদ-নদী

নদী পর্বত-দুহিতা। বর্ষার মেঘমালা মৌসুমী বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া অজস্র বারিধারায় ঝরিয়া পড়ে। সেই বিপুল

নদীর জল

জলরাশি পর্বতগাত্র বাহিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতে নীচের দিকে নামিতে থাকে। কঠিন পাহাড়ের গাত্র হইতে বিপুলকায় প্রস্তর স্থানচ্যুত করিয়া উপলের খণ্ডগুলিকে নাচাইয়া সেই ধারা সমতল ভূমিতে গড়াইয়া আসে। তৎপরে বিপুল বেগে আপনাদের খাত তৈরী করিয়া বহিয়া চলে। ক্রমশঃ সাগরে গিয়া সেই জলধারা মিশে। এই সকল জলধারা কতকটা নির্দিষ্ট খাতে বহে। সেই নির্দিষ্ট খাতগুলিই নদী।

নদী প্রধানতঃ একই পথে চলিলেও মধ্যে মধ্যে তাহার গতি পরিবর্তন হয়। এক-দিক শুষ্ক হইয়া মজিয়া যায়, অন্যদিক নূতন দিকে ধাবিত হয়। মধ্যে মধ্যে আবার বৃক্ষের ন্যায় নদী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এইরূপ গতি পরিবর্তনের জন্যই নদীকে গতিশীল জীবের ন্যায় দেখায়।

বাংলা নদীমাতৃকদেশ

বাংলা দেশের নদ-নদীগুলি তাহাদের শাখা-প্রশাখা বাহিয়া জলস্রোত টানিয়া বাংলা দেশকে পলিমাটিতে উর্বর করে, এইজন্য বাংলা দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে। মাতা যেমন স্তনধারা দিয়া সন্তানকে পালন করেন, নদীও তদ্রূপ জলধারা দিয়া বাংলা দেশকে বাঁচায়। এজন্য এই দেশ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। নদ-নদীগুলি বাংলার প্রাণ-প্রবাহ বলা চলে। এই নদ-নদী শুষ্ক হইয়া গেলে বাংলার অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়ে।

বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। সেই জল যোগানোর কাজ নদী-ই করিয়া থাকে। বৃষ্টির জল যাহা অতিরিক্ত হয় তাহাও নদীপথে সাগরে গিয়া মিশে। বাংলা দেশে যত নদী, ভারতের আর কোন দেশে তত নাই। ভারতের তিনটি প্রধান নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। ইহাদের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীর শাখানদী বাংলা দেশের দক্ষিণে যেন জালের সূতার ন্যায় জট বাধিয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদীগুলির পলিমাটি বাংলাকে শস্যশ্যামল করিতেছে।

কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে নদীর প্রয়োজনীয়তা

নদী দেশকে বাঁচায় কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে আপনি অপমৃত্যু লাভ করে। নদীর অপমৃত্যুতে দেশের বড় দুর্দশা দেখা দেয়। যে অঞ্চলে নদীর অপমৃত্যু হয় সে অঞ্চলের সকল সৌভাগ্য লুপ্ত হয়। নদীপথে পণ্যবাহী নৌকা, জাহাজ আর চলে না—ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহার আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় না। সে দেশ ক্রমশঃ অবনত হইয়া পড়ে। নদীর খাত গভীর হইলে বর্ষার বিপুল জলধারা নদীপথেই সাগরে গিয়ে মিশে। কিন্তু নদীর খাত বুজিয়া গেলে বন্যা হয়—জল দুই ধারের কূল ছাপাইয়া দেশ প্লাবিত করে। বর্ষান্তে নদীতে যে জল থাকে তাহা মাটির মধ্যকার অদৃশ্য জমানো জল। এই জল মাটি চুইয়া নদীতে আসে। অরণ্য বা জঙ্গল বেশী থাকিলে গাছপালা তাহাদের শিকড়ে করিয়া জল আটকাইয়া রাখে। এইভাবে নদীর

নদীর অপমৃত্যু

জীবনরক্ষার উপায় প্রকৃতিই করিয়া রাখিয়াছে। জঙ্গল কাটার ফলে মাটির তলায় জমানো জলভাণ্ডার শূন্য হইতেছে বলিয়া বর্তমানে নদীগুলির ধারা শুষ্ক হইয়া মজিয়া যাইতেছে।

বাংলার শ্রী ও সম্পদ সকলই এই নদীগুলির দান। নদী শুধু জল দিয়া মাটি সরস করে না। বন্যা পলিমাটি বহিয়া দেশ উর্বর করে। তাছাড়া নদীপথে পণ্য স্থানান্তরিত করা যায়—গমনাগমনেরও সুবিধা হয়। নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল কতশত সমৃদ্ধ নগর—বাংলার বাণিজ্য-তরী পণ্য লইয়া দূর দূর দেশে যাত্রা করিত। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশের সহিত বাংলার বণিকরা বাণিজ্য করিয়া কত সম্পদ ঘরে আনিত। শ্রীমন্ত, ধনপতি, চাঁদ সদাগর বাংলায় বণিককুলের আদর্শ ছিলেন। তাছাড়া নৌবিদ্যায় বাঙালী পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও জাহাজের লস্কর ও খালাসীর কাজ চট্টগ্রাম, নোয়াখালির অধিবাসীদের একচেটিয়া হইয়া আছে। নদীগুলি মজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শ্রীহানি হইয়াছে। বাংলা ধীরে ধীরে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। নদী-তীরের বড় বড় নগরগুলি পরিত্যক্ত, ব্যবসা-বণিজ্য বন্ধ হইয়াছে।

বাংলার শ্রী ও সম্পদের জনক-জননী বাংলার নদ নদী

সরস্বতীর পূর্বরূপ আর নাই, তাহা শীর্ণকায়া হইয়া সামান্য নালায় পরিণত হইয়াছে। অথচ এই সরস্বতী নদীর তীরে এককালে সপ্তগ্রাম নামে একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল।

মজা নদীকে বাঁচাইবার উপায়

বঙ্গদেশের উত্তর অঞ্চলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। এখান হইতে দক্ষিণ মুখে তিস্তা প্রবাহিত হইয়াছে। 'তিস্তা' শব্দ 'ত্রি-স্রোতা' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার তিনটি স্রোত ছিল—পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়া। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের ফলে তিস্তা নদীর গতি পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিকে পরিবর্তিত হয়। ইহা বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া পড়িয়াছে। ফলে পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়ার স্রোত কমিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র প্রবল হইয়াছে আর গঙ্গা ক্ষীণ হইয়াছে। বিভক্ত বাংলার পুনর্ভবা ও আত্রেয়ীর কতক অংশ পড়িয়াছে। মূল গঙ্গার স্রোতও পরিবর্তিত হইয়াছে। আগে ইহা দক্ষিণ মুখে ভাগীরথী বা হুগলীর মধ্য দিয়া সমুদ্রে পড়িত; এখন তাহা পূর্ব মুখে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত দক্ষিণে আগাইয়া মেঘনার জলের সহিত যুক্ত হইয়া সমুদ্রে

পড়িয়াছে। ভাগীরথী মূল গঙ্গার একটি অংশ হইলেও বর্তমানে গঙ্গার জলস্রোত এদিকে সামান্যই প্রবাহিত হয়। বহরমপুরের নিকট ভাগীরথী ক্ষীণ। অজয়, দামোদর, শিলাই, কাঁসাই উপনদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। বর্ষায় এই শুষ্ক নদীতে বন্যা হয়। দামোদর নদের বন্যাও ভীষণ। রেলপথ তৈয়ারীর ফলে অনেক নদীর উপরে পুল বানাইতে হইযাছে। পুল স্থায়ী করার জন্য নদীগর্ভে বালি ও পাথর ফেলিতে হয়। তাহার ফলে নদীর স্রোত ব্যাহত হয়। এইভাবে নদীগুলির প্রাণ-প্রবাহ নষ্ট হইযাছে ও হইতেছে। এই নদীগুলি ঠিক মানব দেহে রক্তবাহী ধমনীর ন্যায় দেশের প্রাণপ্রবাহ বহন করে। কাজেই নদীগুলিতে যাহাতে বছরের সব সময়ে প্রচুর জল থাকে তাহার ব্যবস্থা না করিলে বাংলাদেশের উন্নতির আশা নাই। নদীগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বনসংরক্ষণের প্রয়োজন। দ্বিতীযতঃ বাঁধ দিযা নদীগুলির বন্যার সর্বনাশকর প্রবাহ বাঁধার প্রয়োজন। বাঁধ বাঁধিলে নদীর জলধারা আটক করিযা সেই জলে চাষবাসের সুবিধা করা যায ও নদীপথে যাতাযাত বা পণ্য-বহনেরও সুবিধা হয়। বাঁধ-বাঁধা জলস্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিযা সেই বিদ্যুতের দ্বারা দেশের বহু শিল্পের প্রসার ঘটানো যায।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপাযে বাঁধ বাঁধার কযেকটি পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তবিত হইযাছে ও হইতেছে। সরকার দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত করিযাছেন। দামোদর, অজয, মযূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, কাঁসাই প্রভৃতি নদীগুলির জলধারা যদি বাঁধিযা সঞ্চিত করিযা রাখা যায় তাহা হইলে হাজার হাজার বিঘা জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল ফলানোর উপযোগী জল যোগান সম্ভব হয। দামোদর নদ ও তাহার শাখাগুলি বন্যার প্লাবনে প্রায়ই দেশ ধ্বংস করিত। ইহার ফলে বিহার ও পশ্চিম বাংলার অশেষ দুর্গতি হইত। ১৯৪৮ সালে বিহার, বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের যৌথ দায়িত্বে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হইযা কাজ শুরু হয়। তিলাই, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেট ঝিলে চারিটি বাঁধ বাঁধা হয়। কোনার ছাড়া অন্য তিনস্থানে তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাছাড়া দুর্গাপুরে ১৫৬৪ মাইল ব্যাপী খাল ও জলপথে জল সরবরাহের উপযোগী জলধারা নির্মাণ করা হয়। দুর্গাপুরের জলাধার ১০ লক্ষ একর কৃষি জমিতে জল সরবরাহ করিতে পারে। দামোদরের দুই

পশ্চিমবঙ্গের বাঁধ পরিকল্পনা

দিকে খাল খনন করা হইতেছে। ইহা দ্বারা হুগলী নদীর ধারা সংযুক্ত হইবে, ফলে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি হইতে কলিকাতা পর্যন্ত জলপথে বাণিজ্য চলিবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কতকাংশ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার দ্বারা লাভবান হইবে। এই বাঁধের অপর নাম কানাডা বাঁধ। বিহারের সাঁওতাল পরগণার ম্যাসানজোরে একটি জলধারা এবং বীরভূম জেলার জল সরবরাহ করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনার দ্বারা বাংলার ৬ লক্ষ একর এবং বিহারের ২৩,০০০ একর ভূমি কৃষিযোগ্য হইবে।

জাতির জীবনে নদীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি নদীতীরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মিশরে নীল নদের তীরে এক সমৃদ্ধ রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার স্থায়ী নিদর্শন সিন্ধু, গঙ্গা ও সরস্বতী-তীরে বিদ্যমান। মজা নদী দেশকে মজাইয়াছে। নূতন নদী-পরিকল্পনার ফলে আবার দেশ সমৃদ্ধশালী হইবে, প্লাবনের বিভীষিকা দূর হইবে, কৃষিকার্যের অনিশ্চয়তা দূর হইবে—পরিশ্রমী বাঙালী জাতি আবার নিজ সম্পদ গড়িয়া দেশকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিবে।

নদ-নদীই সভ্যতার সৃষ্টি করে

বাংলার কৃষক

ভারতের শতকরা সত্তর জন লোক কৃষিজীবী। তাছাড়া আরো বহুলোককে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বাংলা দেশ সুজলা—নদীমাতৃক। কৃষি এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। প্রবাদ আছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ধং কৃষিকর্মণি, তদর্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াম্ নৈব নৈব চ"। বাণিজ্য অর্থাগমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তৎপরে কৃষিকার্য, তৎপরে চাকুরি—ভিক্ষাজীবীদের ভাগ্যে কিছু নাই। কিন্তু বাণিজ্য কয়জন করিতে পারে? দেশের বণিক্‌সম্প্রদায় মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ

কৃষি জাতির প্রধান সম্পদ। কিন্তু সেই সম্পদ যাহারা উৎপন্ন করিবে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহাদের আবাসগৃহ জীর্ণ, চালে খড় নাই, পরিধেয় বস্ত্র মলিন ও শতচ্ছিন্ন, বৎসরের সকল দিন ইহাদের ভাগ্যে দুইবেলা আহার জোটে না। শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ কৃষক-সন্তানের থাকে না—স্বাস্থ্যও ইহাদের নিতান্ত খারাপ। ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, বসন্ত ইত্যাদিতে গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হইতেছে। তদুপরি মহাজন ও জমিদারের উৎপীড়ন। ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে বিন্দুমাত্র আলোকও ইহাদের উৎসাহ জাগাইতে মিলে না—চতুর্দিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। তদুপরি মামলা-মকদ্দমা—শেষ সম্বল জমিটুকু বুকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়—তাহা কেহ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে খুনোখুনি, লাঠালাঠি বাধে। এইভাবে নিবিড় তিমিরে বাস করিতেছে দেশের অধিকাংশ এই কৃষক-কুল।

কৃষকের অবস্থা

এদেশে কৃষিযোগ্য জমি সীমাবদ্ধ। এরূপ অবস্থায় পল্লীগ্রামের সকল লোকই কৃষিকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে কাহারও তাদৃশ উন্নতির আশা নেই। জমির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চাপ জমি হইতে না কমাইলে উন্নতির সকল আশাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। প্রথমতঃ কৃষিকার্যের ধারার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, জমিতে প্রচুর সার না দিলে উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটে। মান্ধাতার আমলের প্রথা বর্তমানে চলে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ শস্যের জন্য বিশেষ বিশেষ সার ভূমিতে না দিলে যথেষ্ট ফসল কখনই পাওয়া যাইবে না। উন্নতপ্রণালীর কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহারও শিক্ষা করিতে হইবে। তাছাড়া শুধু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। জমিতে সেচের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এজন্য সরকারের মনোযোগের প্রয়োজন। তাছাড়া কৃষক জমির মালিক না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। সরকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সে পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। কৃষক-কুলকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও করা দরকার। বীজসংগ্রহ, চাষের বলদ সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন। সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিলে কৃষকগণ মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং ফসল উৎপন্ন হইলে সরকারের ঋণ শোধ করিতে পারিবে। কৃষকগণ

কৃষকদের অবস্থার উন্নতির উপায়: শিক্ষা

নিরক্ষর, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ইহাদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের প্রযোজন। সে শিক্ষা শুধু বই পড়া নয়—কৃষি সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের খবর সংগ্রহ—লাভবান শস্যের উৎপাদনে উৎসাহী করা—শস্য বিক্রয়ের জন্য প্রতি গ্রামে 'ধর্মগোলা' বা সাধারণের সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করা ইত্যাদির প্রযোজনীযতা উপলব্ধি করানো এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে।

স্বাস্থ্য

বাংলার কৃষক-কুল পরিশ্রমী কিন্তু রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য। তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। সকল দিন তাহাদের আহার জোটে না। রোগ হইলে চিকিৎসা করাইবার অর্থ তাহাদের নাই। গ্রামে কৃষকদেব বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে কৃষক-কুল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া অধিক পরিশ্রম দ্বারা আপনাদেব অবস্থাব উন্নতি করিতে পারে।

কৃষক আমাদের বন্ধু

কৃসকরা আমাদের জন্য কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করিযা শস্য উৎপাদন করে। সেই শস্য খাইযা আমরা বাঁচিযা থাকি। সেইজন্য তাহারা আমাদের বন্ধু। তাহারা নিজেরা অনশনে থাকিয়া আমাদের ক্ষুধার অন্ন যোগায। আমরা তাহাদের কথা একবারও ভাবি না—অধিকন্তু আমরা তাহাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি। যাহারা আমাদের খাদ্য যোগায় তাহাদেব অবজ্ঞা করা অন্যায়। আমরা এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে অন্নদাতা বন্ধুদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি। এ শিক্ষায গলদ আছে। এ বিদেশী শিক্ষার ফল। নিজের দেশকে যাহারা ভালবাসে, তাহাবা দেশের হিতকাবী বন্ধুদেরও ভালবাসে। কৃষকেবা আমাদের হিতকারী বন্ধু। আমরা তাহাদের ভালবাসিব। তাহাদেব অবস্থার উন্নতি হইলে তাহারা আমাদের জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিবে। সেই দিক দিয়াও আমাদের কৃষকদের কথা ভাবা দরকার।

স্বাধীনদেশের কৃষক-কুল

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের দৃষ্টি দেশের এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি নিবদ্ধ হইযাছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষক-কুলের উন্নতি, গ্রামে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, সমাজ উন্নয়নের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সেচ পরিকল্পনা দ্বাবা কৃষিভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা হইয়াছে। মৎস্য চাষ, গবাদি পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা, সার সরবরাহ, কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিদর্শকের

পরামর্শ ইত্যাদি ব্যবস্থা আজ কৃষক-কুলের উন্নতির জন্যই অবলম্বিত হইতেছে। সর্বাপেক্ষা আশার কথা কৃষকদের মর্যাদা লাভ হইযাছে। তাহাদের প্রতি আর কেহ ঘৃণা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় না। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"যদি তার নাই বা সরে মুখের ভাষা—
ছোটলোক নযরে চাষা!
চাষীর জোরে শক্তি জাতির
চাষের মূলে দেশের আশা।"

বিবেকানন্দ যে নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখিতেন তাহা এই কৃষিজীবী ভারতবাসীদের অভ্যুত্থানের স্বপ্ন। তিনি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে যে ভবিষ্যৎ দেখিযাছিলেন তাহাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিযাছিলেন, "তোরা সব মরে যা। আর তোদের জাযগায় বেবিযে আস্থক নতুন ভারত।" এই 'নতুন ভারত' আর কেহ নহে, কৃষক, শ্রমিক, দেশের অবহেলিত সম্প্রদায়। আজ নতুন ভারতের ভিত্তি রচিত হইতেছে। এ ভিত্তি রচনায কৃষক দধীচি তাহাদের অস্থি দিযাছে—দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দৈন্য বিনষ্ট হইবেই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

বাংলার কৃষকই ভবিষ্যতের আশা

একজন কৃতী বাঙালী

(স্থভাষচন্দ্র)

মরা নদীতে যখন জোযার আসে, নদীর শুষ্ক খাতে সহসা ভীম কল্লোলে মহা তরঙ্গ আলোড়ন শুরু হয়, দেখিতে দেখিতে দুই তীর প্লাবিত করিযা মাটি সরস করিয়া নূতন ফসলের সম্ভাবনা দেখা দেয, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায মহাজীবনের জোযার আসিযাছিল। বাঙালী জীবনে সেই মহাপ্রাণ-স্রোতে বহু কৃতী সন্তানের সৃষ্টি করিয়াছিল। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা প্রতিভাশালী বাঙালী নক্ষত্রের ন্যায় দীপ দীপ করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে—হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ;

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলাদেশ

রাষ্ট্রনীতিতে—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ; বিজ্ঞানে—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ; শিক্ষাক্ষেত্রে—বিদ্যাসাগর, আশুতোষ—এইসব বাঙালী দিক্‌-পালের ন্যায় আপন প্রতিভার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুযারি একজন কৃতী বঙ্গসন্তানের জন্ম হয কটক শহরে, ইঁহার নাম সুভাষচন্দ্র বসু। এই কৃতী বাঙালীব জীবনই আমাদের আলোচ্য।

বংশ পরিচয়

সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার কোদালিযা গ্রামে (বর্তমানে 'সুভাষগ্রাম')। তাঁহার পিতা জানকীনাথ বসু কটক হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। ইনি হাটখোলার দত্ত পরিবাবের কন্যা।

শিক্ষা

সুভাষচন্দ্র কটকেব র‍্যাভেনশ কলেজিযেট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পডাশুনায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল আর ছিল, মানব-সেবার আগ্রহ। রোগীর শুশ্রূষা করার জন্য তিনি মাতাপিতার অজ্ঞাতে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হইযা সেবাদল গঠন করেন। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায তিনি দ্বিতীয স্থান অধিকার করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাব-ধারার সংস্পর্শে আসিযা এই সময়ে সুভাষের মনে বৈরাগ্য দেখা দেয। তিনি সহসা গৃহ হইতে অন্তর্ধান করিযা তীর্থ ভ্রমণ করিতে থাকেন। অবশেষে একদিন আবার গৃহে প্রত্যাগমন কবেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এ, ক্লাসে ভর্তি হন।

১৯১৫ সালে আই, এ, পাস করিযা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করিবার সমযে সুভাষচন্দ্র সহসা এমন একটি কাজ করিযা বসেন যে, তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিতাডিত করা হয। ব্যাপারটা এই—তখন ই. এফ. ওটেন নামে একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁহাদের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি একদিন ভারতীয মহিলাদের সম্বন্ধে একটি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। সুভাষচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিযা তাহার প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বলেন। উদ্ধত অধ্যাপক ত' এজন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, উপরন্তু আবো তীব্র নিন্দাসূচক মন্তব্য করিলেন। ফলে সুভাষচন্দ্র অধ্যাপকটিকে দু'এক ঘা দিয়া দিলেন। এই অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী

কলেজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল ও কলেজে ধর্মঘট শুরু হইল। ভারতমাতার সুসন্তান সুভাষ মাতৃজাতির অবমাননাকর উক্তির প্রতিবাদে যাহা করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া পরাধীন ভারতসন্তানের পক্ষে আর কি করা সম্ভব!

সুভাষের পড়াশুনার পথে একটা বাধা আসিয়া পড়িল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অবশেষে সুভাষ স্কটিশ চার্চ কলেজে ১৯১৭ সালে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তির অনুমতি পাইলেন। তথা হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ সুভাষ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

সামরিক শিক্ষা

তখন বাঙালী ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর গঠিত হয়। সুভাষ সেই ট্রেনিং কোরে যোগদান করিয়া সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হইয়াছিলেন তাহার শিক্ষা পাঠ্য-জীবনেই তিনি গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এম্, এ, ক্লাসে ভর্তি হইবার পর সহসা সুভাষকে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। মাত্র নয় মাসের চেষ্টায় সুভাষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম হন। এই বৎসর বহু ইংরেজও এই পরীক্ষা দিয়াছিল। ১৯২০ সালে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করিয়া ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে তখন ভারতবর্ষ উথাল-পাথাল। দেশবন্ধু বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুভাষ গোলামী

সরকারী চাকুরি ত্যাগ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান

চাকুরি গ্রহণ করিলেন না। দেশবন্ধুর সহকর্মিরূপে সুভাষ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন। জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া সুভাষ কিছুকাল কর্ম করেন তৎপর কংগ্রেস কমিটির প্রচার-সচিবরূপে কার্য করিয়া দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেন। এই সময়ে ভারতে ইংলণ্ডের যুবরাজ আগমন করেন। সুভাষ কংগ্রেস কমিটির তরফ হইতে পূর্ণ হরতাল ঘোষণা করিয়া সেই হরতাল সার্থক করেন। সরকারের বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে সুভাষের ছয়মাস কারাদণ্ড হয়।

কারামুক্তির পর সুভাষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। উত্তরবঙ্গে বন্যা দেখা দিলে সুভাষ বন্যাত্রাণ সমিতি গঠন করিয়া তাহার সম্পাদকরূপে আর্তসেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। সেবাকার্যের প্রতি কৈশোর হইতেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল। বন্যাত্রাণের কার্যে তাঁহার অপূর্ব সংগঠন-শক্তির পরিচয় পাইয়া দেশবাসী মুগ্ধ হয়। সুভাষের জীবন কর্মময়। তিনি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পত্রিকা "ফরোয়ার্ড"-এর সহকারী সম্পাদক হন। ১৯২৪ সালে সুভাষ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেন। এই বৎসরই সুভাষকে সরকার বিনা বিচারে শুধু সন্দেহক্রমে "বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স" বলে বন্দী করেন। প্রথমে তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, পরে বহরমপুর জেলে পাঠান হয়। অবশেষে সরকার তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে মান্দালাই জেলে প্রেরণ করেন। এখানে সুভাষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে। অবশেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি ইউরোপে যান এবং তথায় থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাহিলে সরকার তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন নাই। সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সুভাষ বোম্বাই পৌছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৮ সালে সুভাষ মুক্তিলাভ করেন এবং হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির পদ পান। ১৯৩৯ সালে সুভাষ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সভার সভ্যগণ তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন। দেশবাসী, স্বদেশী সংগ্রামের দুর্ধর্ষ এই সব সৈনিকের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া সুভাষ অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান। ইচ্ছা করিলে তিনি নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠন করিতে পারিতেন কিন্তু সে পথ গ্রহণ না করিয়া তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামক নূতন দল গঠন করেন এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন।

দেশসেবার পুরস্কার

১৯৪০ সালে সুভাষ জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার নামকরণ করেন "মহাজাতিসদন।" সুভাষ ইহার নির্মাণ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

অন্ধকূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভটি অপসারণের জন্য সুভাষ যে আন্দোলন করেন,

সেজন্য তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইন বলে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। ইহার প্রতিবাদে সুভাষ অনশন শুরু করেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহাকে তখন তাঁহার এলগিন্ রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। সহসা ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী জানা গেল যে সুভাষ গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৭ই কী ১৬ই তিনি গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্বদেশের মুক্তির জন্য যে সকল বীর চেষ্টা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নাম চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। যে-কোন অবস্থাতেই পড়ুন না কেন সুভাষের সর্বদা চিন্তা ছিল স্বদেশের মুক্তি। এজন্য বিদেশী সরকারের সহিত আপস করার মনোবৃত্তিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিদেশে গিয়া সুভাষ প্রথমে হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে মহাযুদ্ধের সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি জাপানে উপস্থিত হন, পরে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সেনাদলকে লইয়া ভারতের মুক্তির জন্য ফৌজ গঠন করেন। ব্রিটিশ এই সময়ে সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে পলায়ন করিয়া ভারতীয় সৈন্যদের শত্রুর মুখে রাখিয়া আসিয়াছিল। সেই পরিত্যক্ত সৈন্য ও ঐ সকল স্থানের অসামরিক ভারতবাসীদের লইয়াই সুভাষ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন, "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।" তাহাদের সংগঠন করার কার্যে সুভাষ যে কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য ভারতের বাহিরে এই সৈন্যদল গঠন করিয়া যখন ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে আরাকান, কোহিমা, ইম্ফলের মধ্য দিয়া তাহাদের ভারতে অনুপ্রবেশ করানো হইল তখন সারা ভারতে প্রবল উদ্দীপনা, উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। ভারতের মধ্যে গান্ধীজির "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ধাক্কা আর ভারতের বাহির হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ফৌজের হানা—"দিল্লী চলো, দিল্লী চলো—কদম কদম বাড়ায়ে যা—তু শের হিন্দ, আগে বাঢ়"—সুভাষের উদ্দেশ্য সার্থক হইল। দেশ শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জীবনমরণ পণ করিল। মুক্তিফৌজ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা খাদ্যাভাবে ও রসদ যোগানের অভাবে, ব্যর্থ হইল। কিন্তু যে প্রবল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে আশ্রয় করিল তাহারই ফলে শেষ

ভারতের বাহিরে সুভাষচন্দ্র

পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হইল। ব্রিটিশ ভারতকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্তান ও ভারত এই দুই খণ্ডে দুই স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে স্বাধীনতা দিয়া ভারতের চরম ক্ষতি করিয়া প্রস্থান করিল।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান

১৯৪৫ সালে এক সংবাদ প্রচারিত হইল যে সুভাষ এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। ইতিপূর্বে অনেকবার অনুরূপ সংবাদ প্রচারিত হয় এবং তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সেজন্য অধিকাংশ ভারতবাসীর বিশ্বাস যে তিনি জীবিত আছেন এবং কোথাও কোন উদ্দেশ্য লইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন—যথাসময়ে আবার আভির্ভূত হইবেন।

অমর সুভাষ

সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতবাসীর স্বাভাবিক নেতা। সেজন্য দেশবাসী ভালবাসিয়া তাঁহাকে "নেতাজী" নাম দিয়াছেন। তিনি যৌবনের প্রতীক। যুব শক্তির চিরকালের আদর্শ। স্বদেশ সেবায় অকুতোভয় দৃঢ়তা, সংকল্পের বিশুদ্ধতা, আপসহীন সংগ্রামশীলতা, সংগঠন শক্তি, সর্বসম্প্রদায়ের আস্থাভাজন এরূপ নেতা জাতির বহুভাগ্যের ফলে আভির্ভূত হন। আজও ভারতবাসী নানা দুর্দশার মধ্যে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের আশায় পথ চাহিয়া আছে। খণ্ডিত ভারতের একত্রীকরণ একমাত্র তাঁহার ন্যায় নেতার দ্বারাই সম্ভব—ইহা বহু ভারতবাসীর ধারণা। সুভাষ মরেন নাই—জাতির এইরূপ দুলালরা যুগে যুগে আসিয়া জাতির প্রাণে যে ভাব-গঙ্গার ধারা বহাইয়া দেন তাহা জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে। জাতির চিরকালের নেতা—চিরকালের পূজ্য নেতাজীকে আমরা প্রণাম জানাই।

মহাত্মা গান্ধী

সূচনা

পৃথিবীতে প্রত্যহ কোটি কোটি লোকের জন্ম হইতেছে এবং কোটি কোটি লোক প্রত্যহ কাল-সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। তাদের জন্ম ও মৃত্যুর কেহ হিসাব করে না। তাহারা আসে আর চলিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক এক জনের আবির্ভাব হয় যাঁহারা জাতির ও সমাজের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। অক্ষয় কীর্তির দ্বারা তাঁহারা অমর হন। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তাঁহারা মিশিয়া যান না। তাঁহাদের

মধ্যে মহৎ গুণের আবির্ভাব ঘটে এবং সেই মহৎগুণ সকলের আদর্শ হইয়া আলোক স্তম্ভের ন্যায় সংসার সমুদ্রে পথহারা নাবিকদের পথ দেখায়। এইরূপ মনুষ্যকেই মহাপুরুষ বলা হয়। মহাত্মা গান্ধী এইরূপ একজন মহাপুরুষ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ভারতবর্ষের ঘোর দুর্দিনে যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশের পদতলে আর্তনাদ করিতেছিল, পরাধীনতার নাগপাশে যখন ভারতবাসীদের দেহ, মন ও আত্মা বদ্ধ, যখন স্বাধীনতা লাভের আশা গভীর অন্ধকারে অবলুপ্ত তখন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে এক বণিক বংশে মোহনদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মোহনদাসের পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী বা কাবা গান্ধী। ইনি ছিলেন কাথিয়াবাড় রাজ্যের দেওয়ান। একদিকে প্রবল সত্যানুরাগ, অপর দিকে অমিত তেজ—এই দুই গুণের আশ্রয়ে ছিলেন করমচাঁদ গান্ধী। তাঁহার স্ত্রী পুতলী বাঈ ছিলেন সাধ্বী, ধর্মপ্রাণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের মূর্তিমতী প্রতিমা।

বাল্যজীবন

বীজ হইতে বৃক্ষ হয়। ভাল বীজ না হইলে ভাল বৃক্ষ হয় না। আবার শুধু ভাল বীজ হইলেই হয় না—বীজ বপনের ক্ষেত্রটি বৃক্ষ উৎপাদনের অনুকূল হওয়া চাই। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করিবার ক্ষমতাও চারা গাছের থাকা প্রয়োজন। বংশ পরিচয় হইতে জানা যায় যে, গান্ধী-জীবনের বীজ অতি উত্তম। তিনি বাল্যে অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক ছিলেন। শিক্ষা ও পরিবেশ কি ভাবে এই ভীরুতা ও লাজুকতাকে দূর করিয়া সেই স্থানে অসীম সাহসিকতা ও আত্মপ্রকাশে অনাড়ষ্ট সবল ভঙ্গিমা আনিয়া দিয়া তাঁহাকে কোটি কোটি মানুষের হইয়া লড়াই করিবার সামর্থ্য আনিয়া দিয়াছিল তাহা পর্যালোচনা করিলে আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। রাজকোট বিদ্যালয়ে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। বাল্যে তিনি সেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। বাল্যজীবনে কুসঙ্গে পড়িয়া তিনি কুপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি ধূমপান শুরু করেন এবং নিষ্ঠাবান জৈন-পরিবারের সন্তান হইয়াও লুকাইয়া মাংস ভক্ষণ করেন। এই সব কদাভ্যাস চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি চৌর্যবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি বাল্যকালে তাঁহার অন্তরের নিষ্ঠা ও বিবেক তাঁহাকে সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেন নাই। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী তাঁহার মানসে কতকগুলি সৎগুণের দৃঢ় বনিয়াদ তৈয়ার

করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্রের সত্যানুরাগ হইতেই সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা জন্মে। কপটতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা তাঁহাকে সৎপথে টানিয়া আনে। তিনি আপনার সমুদয় দোষ-ত্রুটি পিতার নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মানসিক শান্তি লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজি বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়িতে যান। ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। তৎপরে একটি মামলা পরিচালনার জন্য তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অনুরোধে দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল প্রদেশে গমন করেন।

নাটালে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী ব্যবসা পরিচালনা করিতেন এবং ভারতবর্ষীয় বহু মজুর এখানে কয়েক বৎসর কার্য করিবার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়া শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের অধীনে কর্মগ্রহণ করিত। ইহাদের নাম "গিরমিটিয়া" বলি। এগ্রিমেণ্ট (Agreement) এই ইংরেজি শব্দের অপভ্রংশ 'গিরমিটিয়া'।

নাটালে অহিংস সংগ্রাম

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ এই গিরমিটিয়া কুলিদের উপর এবং কৃষ্ণকায় ভারতবাসীদের উপর যথেচ্ছভাবে অত্যাচার করিতেন। নির্যাতিত ভারতবাসীরা নিস্ফল আক্রোশে দিনের পর দিন কাটাইত। প্রতিকারহীন স্বৈরাচার তাহাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিত। নাটাল প্রবাসী ভারতীয়গণ ইহার প্রতিকার মানসে গান্ধীজির শরণাপন্ন হন। গান্ধীজি প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য এইখানেই প্রথম অহিংস প্রতিরোধ বা Passive Resistance আন্দোলন শুরু করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত দাবি রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি

গান্ধীজি তদবধি আফ্রিকায় রহিয়া যান এবং দীর্ঘ ২১ বৎসর সেখানকার ভারতীয়দের জীবন গঠনে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। শুধু রাজনৈতিক নয় সেবামূলক কার্যেও গান্ধীজির সমান উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জোহান্সবার্গে ভারতীয় বস্তীতে ব্যাপকভাবে প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। জীবন বিপন্ন করিয়া একদল

সেবাব্রতী লইয়া গান্ধীজি প্লেগ নিবারণের কার্যে যোগদান করেন এবং সেবার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

গান্ধীজি যখন ১৯১৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার ভারতজোড়া খ্যাতি। তিনি আমেদাবাদে সরস্বতী নদীতীরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা ও সংগঠনের কাজ শুরু করিলেন। ভারতে যে স্বাধিকার লাভের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছিল তাহাতে যোগদান করিবার পূর্বে গান্ধীজি মহাসমরে বিপদগ্রস্ত ব্রিটিশকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। সমবান্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভাবতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হয। কিন্তু যুদ্ধান্তে স্বাযত্তশাসনের পরিবর্তে 'বাউলাট আইন' প্রবর্তিত হয। ইহার প্রতিবাদে সারা ভারতে 'হরতাল' ঘোষিত হয।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৯২০ সালে ভারতীয কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীজি ভারতবাসীর হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অস্ত্র "অসহযোগ আন্দোলনের" উপায পদ্ধতি তুলিযা ধরেন। ধীরে ধীরে হতাশ, নির্বীর্য, জড ভাবতবাসী জাগিতে লাগিল। গান্ধীজি ভাবতবাসীকে মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত কবিতে লাগিলেন। বিলাতী বর্জন ও ব্রিটিশের সহিত অসহযোগ—এই দুই পথে ভাবতবাসীর আত্মপ্রত্যয় ক্রমশঃ দৃঢ হইতে লাগিল। ১৯২৬ সালে চম্পাবণে নীলকরদেব অত্যাচারের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এইভাবে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গান্ধীজি বহু গঠনমূলক কাজে আত্মনিযোগ করেন। ১৯৩০ সালে ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অধ্যায শুরু হয। ভারতীয জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে "পূর্ণ স্বরাজ" লাভ ভাবতীযদের লক্ষ্য এবং গান্ধীজি সেই পূর্ণ স্বরাজ-লাভের উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি আইন অমান্যের পথে ভারতবাসীকে পরিচালিত করেন এবং লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য স্বযং ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন। অকস্মাৎ কি এক মহাশক্তির স্পর্শে ভারতবাসীর জীবনে মহা-জাগরণের উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল সারা ভারতবর্ষ মহারঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ব্রিটিশের দমননীতি সে অকুতোভয় দৃঢতাকে বিনষ্ট করিতে পারিল না। অবশেষে ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হইল এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসিল, কিন্তু তথা হইতে শূন্য হাতে গান্ধীজিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। সারা ভারতবর্ষ

গান্ধীজি প্রবর্তিত আন্দোলন

ব্রিটিশের এই অনমনীয়তায় ক্ষুব্ধ হইল। ১৯৪২ সালে আবার বৃদ্ধ গান্ধীজি নূতন আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষকে পরিচালিত করিলেন। এই আন্দোলনের নাম "ভারত ছাড" আন্দোলন। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ভারত হইতে ব্রিটিশের অপসারণের দাবি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহা সঙ্কটজনক অধ্যায় চলিতেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশনেতাদের কারাগারে বন্দী করিয়া ফেলিল। ভাবিল এই তরঙ্গ বুঝি রুদ্ধ হইবে। কিন্তু গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণী সমস্ত ভারতবাসীকে শিকল ছেঁড়ার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া মহাশক্তিতে মাতাইয়া দিল। ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে হইল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া ব্রিটিশ এতকাল রাজত্ব চালাইয়াছে। ভারত ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। নৃশংস ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের রক্তস্রোতে ভারত ভাসিল। অসহায় হিন্দুদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগাইবার জন্য গান্ধীজি জীবন বিপন্ন করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সর্বাপেক্ষা কদর্য নৃশংস হত্যাভূমি নোয়াখালিতে হাজির হইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শয়তানির ফলে শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগ এবং 'পাকিস্তান' নামক মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ নির্দিষ্ট করিয়া তবে ব্রিটিশ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এদেশ হইতে আপনাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটাইতে বাধ্য হইল।

গান্ধীজির আত্মদান

হিংসায় উন্মত্ত ভারতবাসীকে সুস্থ করিবার যত প্রকারের প্রচেষ্টা সম্ভব তাহা গান্ধীজি অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ইহাতে এক শ্রেণীর ধর্মোন্মাদ হিন্দু তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি দিল্লীতে তিনি যখন প্রার্থনা-সভায় প্রবেশ করিতে উদ্যত সেই সময় নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামক এক যুবক পিস্তলের গুলিতে তাঁহার জীবনান্ত ঘটাইল।

অমর গান্ধীজি

সত্য অমর। সত্যকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। গান্ধীজি ভারতবাসীর মনে যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহারও আর মৃত্যু নাই। গান্ধীজির সাধনা ছিল সত্য, প্রেম ও ভালবাসার সাধনা। মিথ্যাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় করেন নাই। বিশুদ্ধ আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই পরাধীন দেশকে শৃঙ্খল-মুক্তির আগ্রহে আকুল করিয়া আজ মর্যাদার আসনে বসাইয়া গিয়াছেন। এইজন্য গান্ধীজিকে ভারতীয় জাতীয়তার জনক বলা হয়—বলা হয় "বাপুজী"। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্যের পাশেই তাঁহার স্থান। তিনি

ভারত-আত্মার মূর্তিময়ী বাণী। মানব-প্রেম ও মানব-সেবাই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। অস্পৃশ্য, পদদলিত ভারতবাসীর মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ সর্বদা কাঁদিত। তাঁহার কর্মময় জীবনে তিনি বহু কর্ম করিয়াছেন। ভারতকে জগতের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি যে সব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সেই পথেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ছাত্র-জীবনের একটি স্মরণীয় দিন

শৈশব হইতে যতদিন আমরা বিদ্যার্জনের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে থাকি, সেই সময়কে ছাত্র-জীবন বলে। এই জীবন বড় মধুর। বাল্যসঙ্গী, কৈশোর-সাথী প্রভৃতির অমৃতময় সংস্পর্শে এই সময় অতি মনোরম। কচিকাঁচা মনটি তখন সর্বপ্রকারের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার ফলে মনটি ক্রমশঃ পরিণত হইতে থাকে। গৃহে মাতা-পিতার স্নেহ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে আমাদের শুভানুধ্যায়ী শিক্ষকবৃন্দ নিয়ত যত্ন করিয়া আমাদের মনের খোরাক সংগ্রহ করিয়া দেন। সহানুধ্যায়ী সহপাঠীদের সান্নিধ্যে আমরা ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইতে থাকি. এ ছাড়া পাঠ্য বিষয়ের অভিনবত্ব আমাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী করিয়া দেয়। এই সকল কারণে ছাত্র-জীবনের স্মৃতি পরিণত জীবনে বড় মধুর মনে হয়।

ছাত্র-জীবনের মাধুর্য

ছাত্র-জীবন সাধনার জীবন। প্রাচীনকালে ছাত্রদের গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যার্জন করিতে হইত। তখন গুরুর পরিবারের একজন হইয়া থাকিতে হইত। এখন আর সে সমাজ নাই। এখন বিদ্যালয়ে গিয়া গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। এ শিক্ষার জন্য একাগ্রতা চাই, সাধনা চাই। কথায় বলে "ছাত্রাণাং অধ্যয়নম্ তপঃ"—বাস্তবিকই অধ্যয়ন তপস্যার ন্যায়ই কঠোর। একাগ্রমনে পঠিতব্য বিষয় পাঠ না করিলে জ্ঞানার্জন সার্থক হয় না। তথাপি এই সাধনার মধ্যেও বহু মাধুর্য রহিয়াছে। ছাত্র-জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি,

ছাত্র-জীবনের সাধনা

অবহেলা-অমনোযোগিতা আমাদের অপরিণামদর্শী মনের দরুণই দেখা দেয়। পরে এজন্য আমাদের অনুশোচনা করিতে হয় কিন্তু তখন সঠিক বোধ না থাকায় আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিতে পারি না।

আমি পল্লীগ্রামের বালক। আম-কাঁঠালের বাগান, বড বড পুষ্করিণী, ঘন বাঁশঝাড়, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের তলায় উদার মাঠ—এই আমার বাল্য পরিবেশ। আমার বাল্যকালে এখানে পাঠশালা ছিল, কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। এই পাঠশালায আমি একদিন মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ আমার মোটেই ভাল লাগে নাই। আমার কযেকজন খেলার সাথী এই পাঠশালায পডিত, তাহাদের সহিত আমিও একদিন পাঠশালায গেলাম। দেখিলাম জন কুড়ি ছাত্র একসঙ্গে নানারূপ পাঠ অভ্যাস কবিতেছে। গুরুমশাই টুলে বসিযা হাঁকডাক করিতেছেন, কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি নূতন ছাত্র। এত কষ্ট করিয়া পাঠশালায় আসিলাম, তথাপি গুরুমহাশয় আমাকে লক্ষ্যই করিলেন না। এই অভিমানে এই পাঠশালার উপর আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিল এবং আমি তৎক্ষণাৎ সেই পাঠশালা ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিযা আসিলাম। ইহার কযেক মাস পরেই পিতৃদেব আমাকে কলিকাতায লইযা গিযা মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি করিযা দিলেন। গ্রামের ছেলে শহরে আসিয়া ইট-কাঠ-পাথবের কারাগারে বন্দী হইলাম।

আমার ছাত্র-জীবন

যেদিন প্রথমে স্কুলে গেলাম সেই দিনটি আমার স্মৃতির পাতায সোনার অক্ষরে মুদ্রিত হইযা আছে। পাঠ্য বইগুলি সদ্য কেনা হইযাছে, তাহাতে কত ছবি—তাছাড়া একখানা নূতন বাঁধানো খাতা, একটি নূতন পেন্সিল ও একটি পেনসিল-কাটা কল লইযা আমি পিতৃদেবের সঙ্গে পা ফেলিযা চলিয়াছি—কত বড স্কুল, কলিকাতার স্কুল। আমাব খেলার সাথীদের প্রতি করুণায মনটি ভরা! আহা, বেচারীরা গ্রামের পাঠশালায় পড়ে—খড়ো ঘর, বুড়ো গুরুমশাই—কয়টাই বা ছাত্র। স্কুলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার কিন্তু ভয়ে বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। খাকীর উর্দীপরা দারোয়ান গেটের সম্মুখে দাঁড়াইযা আছে, আর ছোট-বড় নানা বয়সের বালক পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় সেই গেট দিয়া প্রবেশ করিতেছে। দরজার সম্মুখে আসিয়া আমি পিতৃদেবের হস্ত শক্ত করিয়া ধরিলাম।

স্কুলে প্রথম দিন

বাবা বলিলেন, "কিরে! ভয করছে?"

আমি বলিলাম, "না বাবা, আমাকে কোথায় বসতে হবে আপনি দেখিয়ে দিয়ে যান—"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ চল্, ভয় কি? তোর মত কত ছেলে ক্লাসে আছে। দু'দিনে ভাব হয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম, "তারা যদি, বাবা, আমার সঙ্গে ভাব না করে?"

বাবা আবার হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই ভাব করবে, দেখিস্।" গেট দিয়া প্রবেশ করিতেছি এমন সময়ে আমার সমবযসী একটি ছেলে আমার কাছে আসিযা বলিল, "তুমি ত' আমাদের ক্লাসে ভর্তি হযেছ? তোমার নাম কি ভাই?"

ছেলেটিকে দেখিয়াই চিনিলাম। আমি যেদিন ভর্তি হইতে আসি, সেদিন এই ছেলেটিও ভর্তি হইতে আসিযাছিল। নাম শুনিলাম সুজয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত ভাব হইয়া গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিযা আমি ও সুজয় বসিলাম। বাবা চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, যে ছুটির সময তিনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। দেখিতে দেখিতে আরও অনেক ছেলে আসিল। বেঞ্চগুলি সব ভরিয়া গেল। সহসা ঢং ঢং করিযা ঘণ্টা বাজিল। সব কোলাহল থামিল। ছেলেরা যে যাহার আসনে স্থির হইযা বসিল। চশমা-চোখে শিক্ষকমহাশয় একটি বড খাতা হাতে লইয়া ক্লাসে ঢুকিলেন। সকল ছেলে উঠিযা দাঁডাইল। আমিও দাঁডাইলাম। পরে তিনি বসিলে সকলের সহিত আমিও বসিলাম। তিনি হাজিরা খাতাটি বাহির করিযা হাজিরা লইতে শুরু করিলেন। একে একে সকল ছাত্রের নাম ডাকা হইতে লাগিল। ছাত্ররা কেহ উপস্থিত, কেহ প্রেজেণ্ট স্যার, কেহ ইযেস স্যার বলিয়া সাডা দিতে লাগিল। আমার নাম ডাকা হইলে আমিও "প্রেজেণ্ট স্যার" বলিলাম। নাম ডাকা হইলে ইংরাজী পডানো শুরু হইল। বইটির নাম Peeps into English। শিক্ষক মহাশয় নামটির অর্থ করিযা দিলেন। পরে জানিলাম তাঁহার নাম অমরবাবু। পরের ঘণ্টায় লাঠিতে ভর করিযা অতুলবাবু আসিলেন। ইনি খোঁড়া ছিলেন, সেইজন্য লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেন। তিনি মুখে মুখে ইংরাজী শিখাইলেন। শেখানোর ধরনটি চমৎকার। তারপরে আসিলেন ননীবাবু। ইঁহার হাতে একটি মোটা বেতের লাঠি এবং চোখে যাঁতার ন্যায় পুরু দুটি গোলাকার কাঁচের চশমা।

অঙ্ক কষাইলেন তিনি। কয়েকটা অঙ্ক কষার পর আমাদের গল্প বলিলেন। তারপর টিফিনের ঘণ্টা। এ ঘণ্টায় অন্য অনেক ছেলের সঙ্গে ভাব হইল। বিনোদ, হরিসাধন, নারাযণ, অনন্ত আরও কত। টিফিনের সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্কুলবাড়ী দেখিলাম। ত্রিতল বাটী। অনেক—অনেক শিক্ষক। উঠানের দেওয়ালে কত ছবি টাঙানো—দেশবিদেশের জীবজন্তু, পাহাড়ের ছবি, দেশের কত বড়লোকদের ছবি, কত যন্ত্রপাতির ছবি। স্কুলটি আমার অত্যন্ত ভাল লাগিল। শেষ ঘণ্টায় হেডমাস্টার মহাশয় আসিলেন। কত গল্প করিলেন। খুব মজার মজার গল্প। এত গল্প হাসিখুশি সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু ভয় ভাঙিল না। তাঁহার গাম্ভীর্য যেন তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে একটু আড়াল করিয়া রাখিল। শেষ ঘণ্টায় ছুটি হইল। বাবাকে গেটের ধারে দেখিয়া মনটা খুশি হইল। বিনোদ ও সুজয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল: সুজয়দের বাড়ীটা দেখিলাম। সে হাসিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বিনোদ স্কুলের পাশেই থাকিত। সেও চলিযা গেল। এই স্কুলে সেই হইতে নয় বৎসর পড়িযা ম্যাট্রিক পাস করিলাম। কতদিনের কত ঘটনা স্কুলের জীবনে ঘটিয়াছে কিন্তু প্রথম দিনের ছবিটি কে যেন সোনার ফ্রেমে বাঁধাইযা আমার স্মৃতির সম্মুখে ঝুলাইয়া দিযাছে। সে-দিনের সে কথা আজিও ভুলিতে পারি না।

জীবনে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইযাছে। কত রোমাঞ্চ, কত দুঃখ, কত আনন্দের দিন আসিযাছে। কত জয়, কত পরাজযের কাহিনীতে জীবন পূর্ণ। কিন্তু আগাগোড়া সব কিছু আলোচনা করিলে ছাত্র-জীবনের মাধুর্যে মনটা ভরিয়া উঠে। বারে বারে প্রথম দিনের ছবিটিই মনে উদিত হয। কেন এমন হয তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় পল্লী-বালকের স্মৃতিতে এ দিনের অভিজ্ঞতা অভিনব ও বিচিত্র ছিল—পল্লীর পাঠশালা ও শহরের বিদ্যালযের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক ছিল বলিযাই মনে সেই দিনের স্মৃতিটি অক্ষয় অমর হইযা আছে।

উপসংহার

আমার প্রিয় কবি

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

আমার প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ

বাংলার কাব্য-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মায়া লেখনীর স্পর্শে উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন। বাংলা কাব্যের ডালি "গীতাঞ্জলি" বিশ্ব-সাহিত্য-সভার সর্বশ্রেষ্ঠ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বঙ্গের কাব্য কাননে আজ পিক, দধিয়াল, শ্যামা, চন্দনার কণ্ঠঝঙ্কারে মুখরিত। এই কবিকুলের মধ্যে অনেকের কাব্যই আমাকে মোহিত করিয়াছে, কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সুকুমার পদবিন্যাস, অপূর্ব শ্রুতিমধুর ছন্দকুশলতা এবং লিপিচাতুর্যে আমাকে মোহিত করে। আমার কেন এ কবির লেখা ভাল লাগে তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব, কোনরূপ তুলনামূলক কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হইব না।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাহার পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলায় চুপী গ্রামে। কলিকাতায় দর্জিপাড়ায় পরে ইঁহারা বসবাস করেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের ইনি পৌত্র। ইনি বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং সাহিত্য-সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। কোনদিন ইনি চাকুরি করেন নাই।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সবিতা" প্রকাশিত হয়। তিনি নানারূপ ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া বাংলা কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব

তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পনেরো। একদিকে যেমন প্রবল স্বদেশানুরাগ, অপরদিকে তেমনি ছিল তাঁহার অন্যায়, অসত্য ও ভণ্ডামির প্রতি অসীম ঘৃণা। তিনি বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার পূজারী ছিলেন। সমসাময়িক বহু ঘটনা তাঁহাকে সহজ স্বভাবিক ভাবেই কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিত এবং স্বভাবকবির ন্যায় স্বতঃই তাঁহার লেখনী হইতে অপূর্ব ভাব সমৃদ্ধ উদ্দীপনাময় কবিতা ঝরিয়া পড়িত।

তাঁহার "ডঙ্কানিশান" নামক অসম্পূর্ণ রচনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইহা সম্পূর্ণ হইলে বাঙলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর

আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করিতেন এবং তাঁহার কাব্য বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত। 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', মণিমঞ্জুষা', অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'বেলা শেষের গান', 'বিদায় আরতি', বাংলা কাব্য-সহিত্যের কয়েকটি উজ্জ্বল হীরক। বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারকে তিনি প্রচুর সম্পদে সমৃদ্ধ করিযাছেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন তাঁহার মৃত্যু হয। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হইযা রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব শোক-কবিতা বচনা করেন, তাহা হইতে কযেকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ

"জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত, ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিযাছে ক্ষিপ্র বেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোব, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল।"

খাঁটি বাংলা বুলি বা বাংলা বাগ্‌ধারা উদ্ধারের জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব ছন্দোজ্ঞানের সৃষ্টি করেন। তাঁহার 'ছন্দ সরস্বতী' নামক কল্পনা-বিলাসটি তাঁহার ছন্দোজ্ঞানের অপূর্ব নিদর্শন। এই প্রবন্ধ 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইযাছিল।

কবির স্বদেশানুরাগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল'
কোন্ দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয়রে দূর্বা কোমল।"

উক্ত কবিতাটির মধ্যে তাঁহার তীব্র মধুর স্বদেশ-প্রেম বাংলার শ্যামল শ্রীটিকে যেন

এক মোহনীয আবেশ মাখাইয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসার উৎসে আঘাত করে।

স্বদেশানুরাগ

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেখানে মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গলী বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে—"

কবিতাটিতে কবি বাঙ্গালীর প্রাণে তাহার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বাণী বহন করিযা বাঙ্গালীর সমন্বয় সাধনার কথা পৌছাইয়া দিযাছেন।

"মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদের করতলে ;
অতীতে যাহাব হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।"

কবি যেন প্রাচীনকালের চারণের কণ্ঠ পাইযা সর্বহারা বাঙ্গালীকে চেতনা দিতেছেন।

তাঁহার 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'তে যে অপূর্ব স্বদেশ-প্রীতির বাণী-উৎসারিত হইয়াছে তাহার তুলনা মিলে না—

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর ;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে ;—
তোর কহিনূর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
তিস্তা তোমার ঝাপ্টা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডানকানে তোর বাঁকার ঝিলিক, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ববাণীর মৌচাকে তোর চুযায় যশের মাক্ষি গো,—
দূর অতীতের কবির প্রীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।

বাংলা দেশ পল্লীপ্রধান। বাংলার পল্লীর শ্যামল-স্নিগ্ধ শ্রীটি কবির চোখে ভারী মিঠা লাগিত। তাঁহার 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা' ও বহু ঋতু-কবিতায় পল্লীর যে চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা মিলে না—

"পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—

পল্লী প্রীতি

খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা!
পাঠশালাটি
দোকান ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!
পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে
ছাগল চরে।" (পাল্কীর গান)

ইহা যেন কথা দিয়া আঁকা একটি পল্লীর হুবহু বাস্তব চিত্র।

"হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইলশে গুঁড়ির নাচ।
ইলশে গুঁড়ির নাচন্ দেখে
নাচছে ইলিশ মাছ—।
কেউ বা নাচে জলের তলায়
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়
নদীতে ভাই! জাল নিযে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।" (ইলশে গুঁড়ি)

উদ্ধৃতিটিতে বঙ্গের বর্ষা যেন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

"চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ্ টুপ্
ঘোমটার বউটি।" (দূরের পাল্লা)

"কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—

ছন্দেব চপল ভঙ্গির সহিত কবি যেন দ্রুত চিত্র আঁকিযা চলিযাছেন।

অনেকে সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দ-সর্বস্ব কবি বলিযা তাচ্ছিল্য করেন। ছন্দের কুশলতা ছাড়াও যথেষ্ট ভাব-সম্পদে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি পরিপূর্ণ।

ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার

ছন্দের সুকুমার সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য তাঁহার কবিতা যেন এস্রাজের ঝঙ্কারের মতই মিষ্ট।

"কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিযে
বুঁদ হযে ফেরে রোদ দিযে ;
ফল্‌সা বনের জলসা ফুরলো
মৌমাছি এলো রোল তুলি।" (জ্যৈষ্ঠ-মধু)

কবি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। চরকার মাহাত্ম্য তাই তিনি এমন প্রাণপূর্ণ ভাষায ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

"নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয,
বঙ্গের স্বস্তিক চরকার গাও জয!
চরকায দৌলৎ। চরকায ইজ্জৎ!
চরকায উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চরকায় ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব—আপনায নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায তিস্তায সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পাযে দাঁড়া!" (চরকার গান)

এ ছাড়া "ঝর্ণা" কবিতাটিও ছন্দ-মাধুর্যের জন্য বিখ্যাত—

ঝর্ণা। ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা,
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অর্পণা।
ঝর্ণা!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ চারণ কবির ন্যায় সদ্য সদ্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার 'জাতির পাঁতি', 'পাতিল-প্রমাদ', 'দাবির-চিঠি' প্রভৃতি অপূর্ব কাব্য বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। দেশবাসীকে উদ্দীপনা দান করিয়া স্বদেশের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ করিবার জন্য তিনি অজস্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গাথা রচনায়ও তাঁহার বেশ হাত ছিল। "বুদ্ধ পূর্ণিমা", "গান্ধীজি", "রবীন্দ্রনাথ", "বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি কবিতাতে তিনি মহাপুরুষদের যে বন্দনা গাহিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তরের মহত্ত্বপ্রীতির নিদর্শন। তাঁহার 'ছেলের দল' কবিতাটি বালকদের মধ্যে যে মহৎ জীবনের বীজ রহিয়াছে তাহা অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে পূর্ণ এবং প্রীতির রঙে রঙীন।

সমসাময়িক ঘটনা লইয়া কবিতা

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীর হস্তে সপ্তস্বরা বীণা দিয়াছেন আর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণে দিয়াছেন নূপুর। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচনা ও পর্যালোচনার দিন এখনও আসে নাই। যেদিন সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা হইবে, সেদিন এই কবির মর্যাদা দিতেই হইবে। তাঁহার কাব্যে খাঁটি কবি-মানসের নিদর্শন মিলে। সে জন্যেই রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস কণ্ঠে বলিয়াছিলেন।

বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান

"তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাধা; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুর গুঞ্জরণে।"

আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ছাত্রজীবনে উপন্যাস পাঠের সুযোগ ও সুবিধা বিশেষ নাই। অপরিণত বয়সে উপন্যাসের সমগ্র বিষয়বস্তু, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক সমস্যা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তথাপি যে সকল ঔপন্যাসিকের উপন্যাস আমি পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে শরৎচন্দ্রকেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

ভূমিকা

প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা ঝরঝরে সরল সাধুভাষা—তাহা বক্তব্য বিষয়কে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করায়। সে ভাষার লিপি-চাতুর্য ঠিক নিপুণ কথকের লিপিচাতুর্যের মত। গল্পটিকে সুন্দরভাবে, সম্পূর্ণভাবে, সার্থকভাবে বলার এমন নিপুণতা অন্য রচনায় বড় দেখি নাই। ভাষার বিলাস, বক্তব্যকে ঘোরালো করিয়া তোলা বা বৃথা বাক্য বিন্যাস দ্বারা মূল বক্তব্য হইতে কদাচ তাঁহাকে দূরে যাইতে দেখি নাই। দ্বিতীয়তঃ, অত্যন্ত বাস্তব বিষয় লইয়া তাঁহার রচনা। আমাদেরই চতুর্দিকে আমাদের অলক্ষিতে এই সব ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে অথচ আমরা এরূপভাবে কোনদিন ইহা দেখিবার চেষ্টা করি না। শরৎচন্দ্র যেন আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ ও সজাগ করিয়া আমাদের মনের জড়তা নষ্ট করিয়া দেন। তৃতীয়তঃ, চরিত্র চিত্রণ। অতি অল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের চরিত্র চিত্রিত করেন—অনেক সময়ে মুখের একটি মাত্র বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মানুষটার চরিত্র যেন আমরা কাচের ন্যায় স্বচ্ছভাবে দেখিতে পাই। চতুর্থতঃ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল সমস্যা আমাদের অতি পরিচিত সমাজের সমস্যা—অত্যন্ত ঘরোয়া—অত্যন্ত চেনা সমস্যা। সেজন্য তাহার সমাধানের জন্য আমরা অতিমাত্রায় সতর্ক হইয়া উঠি। পঞ্চমতঃ, শরৎ-সাহিত্যে মানুষের মহিমার কথা আমাদের মুগ্ধ করে। অতি হীন, অতি নগণ্য মানুষের মধ্যেও যে দেবতা লুকাইয়া থাকেন তাহা দেখাইয়া শরৎচন্দ্র আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করেন।

ভাল লাগার কারণ

চীনদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলন হয়। এই দেশেই জগতের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মোগল আমলে রাজকর্মচারীদেরই ব্যবহারের জন্য বাদশাহগণ হস্তলিখিত সংবাদপত্র প্রচারিত করিতেন। ইউরোপে সর্বপ্রথম ভেনিস রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত নিয়মাবলী জনসাধারণকে জানাইবার জন্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতে ভারত সরকার 'দি ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম—'সমাচার দর্পণ'। ইহা শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিসনারীগণ প্রকাশ করেন।

প্রথম প্রচলন

সংবাদপত্র মুদ্রণের কার্যে প্রচুর সহায়তা করে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র। এখন রোটারী মেশিন, লাইনো মেশিন, মনো মেশিন প্রভৃতি বহু প্রকারের মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা দৈনিক সংবাদপত্র ছাপা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের কাগজ বড় বড় রীলে জড়ান থাকে। তাহা হইতে ছাপা হইয়া সংবাদপত্রের চারি পাতা ছাপা হইলে তাহা কাটিয়া ভাঁজ হইয়া বাহির হয়। বর্তমানে তড়িৎ বার্তাবহের সাহায্যে খবর অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে পৌছায়, বেতারেও খবর আসে। ইহাতে অতি শীঘ্র দূর দূরান্তরের খবর আমাদের নিকটে পৌছায়।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য নানারূপ বিশেষ যন্ত্র

সংবাদপত্রের কর্মচারীদের দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করা বড় কঠিন, বহু ব্যয়সাধ্য এবং কার্যতঃ অসম্ভব। এজন্য সংবাদপত্রের খবর সরবরাহের জন্য কতকগুলি সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আছে। দেশী-বিদেশী এইসব News Agencyর দ্বারা পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদ সংবাদপত্রের অফিসে প্রেরিত হয়। রয়টার, টাস্ এজেন্সি, এসোসিয়েটেড্ প্রেস, প্রেস ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এদেশে সুবিখ্যাত। এছাড়া প্রতি সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিনিধি পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে থাকেন এবং তথা হইতে বিশেষ বিশেষ সংবাদ প্রেরণ করেন। এইভাবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমরা বিশ্বের খবর জানিতে পারি।

সংবাদ কি ভাবে সংগৃহীত হয়

সংবাদপত্র তো এই সেদিন বাহির হইল। তাহার পূর্বে সংবাদ প্রচারের মাধ্যম

ছিল শিলালিপি আর ঢক্কা নিনাদসহ ঘোষণা। কোন অনুসন্ধিৎসু পদব্রজে বা জাহাজে করিয়া অন্য দেশের খবর সংগ্রহে বাহির হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলে তাহা পাঠ করিয়া লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। তখন অজ্ঞতার অন্ধকারে লোক বাস করিত। বিদেশ সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত আজ্‌গুবি খবর রটিত। বিদেশের ইতিহাস ছাড়া দৈনন্দিন ঘটনাব বিষয জানার কোন উপায় তখন ছিল না। এজন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতির সহিত জানা-পরিচয ঘটিত না। আজ তাহারা যেন আমাদের নিকট প্রতি-বেশীর মত। তাহাদেব চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, কর্ম সম্বন্ধে আমরা ওযাকিবহাল।

সংবাদপত্র যখন ছিল না তখনকার অবস্থা

সংবাদপত্র আমাদেব সাধারণ শিক্ষক। নিযত নানা বিষয়ের জ্ঞান আমাদের মনের গোচর করিযা সংবাদপত্র আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিয়ত পূর্ণ করিতেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ সকল প্রকারের খবরই প্রত্যহ আমাদের জন্য পরিবেশিত হইতেছে। বিশ্বের অধিবাসী আজ সংবাদ-পত্রের দৌত্যে এক ভ্রাতৃসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। দেশে দেশে মানুষের দুঃখ, দৈন্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি-অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা সংবাদপত্রই আমাদের দ্বারে পৌছাইয়া দেয় এবং আমরা তাহাদের সুখে—সুখী, দুঃখে—দুঃখী, জযে—আনন্দিত, পরাজযে—দুঃখিত হই। তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা সতর্ক হই, বিপদ এড়াইতে শিক্ষা করি। সংবাদপত্র জনগণের মতামত গঠন করে। নিয়ত সংবাদপত্র পাঠ করিলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় আমরা জানিতে পারি এবং বৈদেশিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হইতে পারি। সংবাদপত্র পাঠে আমাদের মন উদাব হয—আমরা শুধু বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, বৃহত্তর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও আমাদের মনে সচেতনতা জাগে। আমরা যে বিরাট দেশের অধিবাসী সেই দেশের সম্যক পরিচয় আমরা লাভ করি এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা কর্মপ্রচেষ্টা, ভাবনা-চিন্তার বিষয় জানিতে পারি।

সংবাদপত্রের উপকারিতা

অনেকেব এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মুদ্রিত সংবাদ মাত্রই সত্য। সংবাদ পাঠেব সময কি সূত্রে সংবাদটি সংগ্রহ হইযাছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে ঐ বিষয়ে উপেক্ষা করা চলে

না। অনেক সময়ে অনেক সংবাদপত্র বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদরূপে বহু বাজে খবর ও অদ্ভুত উদ্ভট সংবাদ পরিবেশন করে। তাছাড়া দলীয় সংবাদপত্র অনেক সময়ে নিরপেক্ষ সংবাদ দিতে পারে না।

সংবাদপত্র পাঠের নিয়ম

এইজন্য খবরের সূত্র, সম্পাদকীয় মন্তব্য বিচার-বিবেচনা সহকারে গ্রহণ করা দরকার। সংবাদপত্র যেমন জনগণের কল্যাণ সাধন করে আবার তেমনি সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িকতা, দলীয় মতবাদ ইত্যাদি প্রচার করিয়া গণচিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব

সংবাদপত্রের কাজ অতি পবিত্র। সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সংবাদপত্রের কর্তব্য। দেশসেবার নামে অনেক সময়ে অনেক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সংবাদপত্র মিথ্যা প্রচারের দ্বারা দেশে বহু অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রের আদর্শ হওয়া উচিত। অর্ধ সত্য মিথ্যা হইতেও ক্ষতিকর। বহু দলীয় সংবাদপত্র এই অর্ধ-সত্য লইয়া ব্যবসা করেন এবং দেশের প্রভূত ক্ষতি করেন। প্রকৃত সাংবাদিক নিজ পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কাজ করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

উপসংহার

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার হয়। ইহা জাতিগঠনে সহায়তা করিতে পারে। আমাদের দেশের কয়েকটি সংবাদপত্র দেশ বিদেশী-সরকারের অধীনে থাকা কালে সরকারী বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করিয়া রাজরোষে দণ্ডিত হইয়াও কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। এইভাবে ভারতের মহাজাতীয়তা গঠনে তাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ সংবাদপত্রকে দেশের সরকারও ভয় করেন। কারণ, সরকারের কার্যকলাপও নিন্দার্হ হইলে তাঁহারা নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হন না। সংবাদপত্রেই দেশের জনগণের চিন্তার তরঙ্গ ওঠে। সরকার সংবাদপত্র হইতে জাতির মনের পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করেন। সংবাদপত্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রচুর। নিরপেক্ষ সাংবাদিক দেশের প্রকৃত বন্ধু ও কল্যাণকামী। পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, দলীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন সাংবাদিক দেশের শত্রু।

ধর্মঘট

ধর্মঘট বলিতে কাজকর্ম বহিত কবা বুঝায়। কোন প্রতিষ্ঠানেব কর্মচাবিগণ বিশেষতঃ শ্রমিকগণ যখন কোন উপায়ে তাহাদেব অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পাবে না, তখনই তাহারা এই উপায় অবলম্বন কবে। 'ধর্মঘট' আজকালকাব দিনে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপাব হইযা দাঁড়াইয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও কাজকর্ম বন্ধ করাকেই ধর্মঘট বলে। সংবাদপত্রে চোখ বুলাইলেই আজকাল কোন-না-কোন স্থানের ধর্মঘটেব সংবাদ নজরে পড়ে। কারখানায় ধর্মঘট, অফিসে ধর্মঘট, ধাঙ্গড় ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট। ছাত্ররা পর্যন্ত আজকাল ধর্মঘট কবিতে শিখিযাছে। 'ধর্মঘট' কথার অর্থ ধর্মার্থ ঘটস্থাপনা। বৈশাখ মাসে জলপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান কবা হয়। সেই ঘটকে 'ধর্মঘট' বলে। শ্রমিকদেব কর্মত্যাগেব সঙ্কল্পেব সহিত ধর্মঘটেব বোধহয় পূর্বে কোন সম্বন্ধ ছিল। হয়ত ঘট বসাইয়া পূজা কবিয়া সেই ঘটেব সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কোন সময়ে এদেশের শ্রমিকবা কর্মত্যাগেব সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হোক সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন দাবি আদায়েব জন্য সাময়িক কর্মবন্ধ করাকে ধর্মঘট বলে। ধর্মঘট নানা উপায়েব হয়। কর্মস্থানে অবস্থানে ধর্মঘট অর্থাৎ উপস্থিত হইয়া কর্ম না কবা একবকম ধর্মঘট। একবাব কেবাণীরা কর্মস্থলে আসিয়া কলম স্পর্শ না কবা ধর্মঘট কবে। আধুনিক যুগে শ্রমিক ও কর্মীদেব অভাব-অভিযোগেব প্রতিকাবেব জন্য কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। মোট কথা ধর্মঘট শ্রমিকগণেব শেষ ব্রহ্মাস্ত্র।

ধর্মঘট কাহাকে বলে

ধর্মঘটেব উৎপত্তি পাশ্চাত্ত্য দেশে হইয়াছে। যান্ত্রিক সভ্যতাব সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘটেব সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশে ভাবী যন্ত্রশিল্প ছিল না বলিলেই হয। সেজন্য শ্রমিক ও মালিকেব মধ্যে কোনরূপ অ-বানিবনাব ভাবও ছিল না। ছোট-খাট শিল্পে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কাজ কবে—তাহাদের দাবিদাওয়া সহজে মেটানো যায। সেজন্য কোন দিন এদেশে শ্রমিক গোলযোগ ছিল না। পাশ্চাত্ত্যেব অনুসরণে এদেশে যন্ত্রশিল্পেব প্রসাব হওয়াব সঙ্গে

প্রথম প্রচলন

সঙ্গেই শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার অস্ত্র এই ধর্মঘট প্রথার আমদানি হইয়াছে।

শ্রমিকরাই দেহের রক্ত জল করিয়া শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। মালিক তাহাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। শ্রমিক যে মালিকদের পণ্য সৃষ্টির অত্যাবশ্যক অঙ্গ ইহা আজ শ্রমিকগণ উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য শ্রমিক সমাজ গঠিত হইয়াছে। এই সংঘই শ্রমিকদের হইয়া মালিকের সহিত কথাবার্তা চালায়। বর্তমান যুগে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার এই শ্রমিকগণ যদি দাবী করে তাহা হইলে তাহাদের দাবী পূরণ করিতেই হইবে। তাহারাই দেশের শিল্প গড়িতেছে—তাহাদের শ্রমের ফলেই মালিকদের এত ঐশ্বর্য। অথচ এই ঐশ্বর্য যাহারা তৈয়ারি করে তাহারা দীন-দরিদ্র থাকিবে, ইহাপেক্ষা অন্যায় আর কিছুই হইতে পারে না। বিত্তশালী মালিকগণ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন চালায়—নানারূপ আইনের দ্বারা তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা করে। এ সকল বিপদ হইতে রক্ষার উপায় সুদৃঢ় সংঘ সৃষ্টি। সংঘবদ্ধ শ্রমিক তাই আজ অতুল শক্তির আধার। সেই শ্রমিকশক্তির অস্ত্র ধর্মঘট। ধর্মঘট দ্বারা কলকারখানার কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া শ্রমিকরা মালিকের নিকট হইতে দাবী আদায় করে।

সংঘই শক্তি

শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের শক্তিশালী সংঘ। সংঘ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকরা বর্তমানে নানারূপ সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে। ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের বীমা আইন এবং ১৯৫২ সালে প্রভিডেণ্টফণ্ড আইন প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকজীবনের অনিশ্চয়তার ভাব অনেকটা কাটিয়াছে। ১৯৪৮ সালে নিম্নতম মজুরী আইন এবং ১৯৫০ সালে ন্যায্য মজুরী আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাছাড়া কলকারখানার কাজকর্মের সময়ও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব আইনের সুবিধা যাহাতে সকল শ্রেণীর শ্রমিকরাই পাইতে পারে সেজন্য ট্রেড-ইউনিয়ন, প্রতিষ্ঠান নিয়ত আন্দোলন করিয়া চলিয়াছে। শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির জন্য আজকাল শ্রমিক কল্যাণ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছে। ইহারা শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের শ্রমিক কল্যাণ আইন

শ্রমিকগণ নিত্যই ধর্মঘট করিলে এবং অযথা মালিকগণের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হইলে দেশে শিল্প-প্রসারের বাধা উপস্থিত হয়। ধর্মঘট কবার পূর্বে যে সব কারণে ধর্মঘট করা হইতেছে তাহা ভাল করিযা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। শুধু সংঘশক্তির জোরে 'ধর্মঘট' চালাইযা কাজকর্ম বন্ধ করা সহজ। কিন্তু উহা যাহাতে জুলুম ও জববদস্তিব আকার প্রাপ্ত না হয সে বিষযে শ্রমিক সংঘগুলির অবহিত হওযা প্রযোজন। ধর্মঘট বিবেচনা কবিযা করা উচিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ও শান্ত পবিবেশর মধ্যে করা উচিত। পাবস্পরিক তিক্ততা যাহাতে বৃদ্ধি না হয় সে বিষযে উভয পক্ষের সচেতন থাকা দরকার। শ্রমিক ও শিল্পপতি উভযেরই প্রযোজন আছে। উভযের মিলন ও একযোগে কাজ করাব উপবই দেশেব উন্নতি নির্ভব করে। অনেক সময়ে রাজনৈতিক দলেব প্ররোচনায ধর্মঘট করা হয়—এটি অত্যন্ত অন্যায। ন্যায্য দাবি না থাকিলে অযথা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানো দেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয। ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকিতে পাবে না। ধনী ও দবিদ্র চিরকাল সমাজে সন্তুষ্ট চিত্তে বাস কবিতে পারে না। জাগতিক গতি আজ সাম্যেব দিকে—জগতের সকল সুখ ও ঐশ্বর্য মুষ্টিমেয লোক চিবকাল ভোগ করিবে আর বাকী লোক তাহাদের দাসত্ব করিযা দাবিদ্র্য ও অসচ্ছলতাব মধ্যে বাস করিবে—ইহা আর সম্ভব নয। শ্রমজীবিদের হৃদযে আজ মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিযাছে, তাই তাহাবা মানুষের মত দাবী জানাইতেছে। তাহারা আর অসহায নয়—সংঘশক্তি তাহাদেব বলীযান করিযাছে। ধনবৈষম্য যতদিন না দূব হয এই মালিক শ্রমিক সংগ্রাম এবং ধর্মঘট চলিতে থাকিবে।

ধর্মঘটের ক্ষতিকর দিক

ধনবৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলিতে থাকিবে

বর্তমান যুগ হিসাব-নিকাশের যুগ। সমাজে দীর্ঘকাল যে অবিচার হইযাছে তাহার প্রতিকাবের যুগ আসিযাছে। বঞ্চিত বুভুক্ষুদের, সর্ব-হারাদের দাবী পূবণ করিতে হইবে। শ্রমজীবিরা সম্পদ গড়িয়া আজ অবহেলিত, বঞ্চিত। তাহাদের ন্যায্য পাওনা মিটাইয়া না দিলে জগতে শান্তি আসিবে না। কবির কণ্ঠে এই বঞ্চিতদের প্রতি

শ্রমজীবিদের মর্যাদা দান বর্তমান যুগের একমাত্র কাজ

যে দরদ ধ্বনিযাছে তাহা আজ দেশের উচ্চশ্রেণীদেব মনেও প্রতিধ্বনি তুলিতে বাধ্য—

"তোমার আসন হতে যেথায তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
ধূলায সে যায বযে
চরণে দলিত হযে
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।"

কুলি, মজুব, শ্রমিক জাতিব দেহে পেশীস্বরূপ। ইহাদেব ছাড়া জাতি একপদও অগ্রসব হইতে পাবে না। অথচ ইহারাই বুভুক্ষু—বঞ্চিত। ইহারা রুটি চাহিযাছে, তাব পরিবর্তে সমাজ দিযাছে পাথর। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামেব কণ্ঠে তাই ধ্বনিযাছে সেই দাবী পূবণের কথা—

"আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িযাছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালাযে ভাঙিল যাবা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িযা যাদেব হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগালো ধূলি—
তারাই মানুষ, তাবাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।"

বাংলার কুটির শিল্প

বর্তমান যুগ যন্ত্রশিল্পের যুগ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানেব প্রভাবে ক্রমশঃ যান্ত্রিক যুগ হইযা উঠিতেছে। মানুষের নব নব উদ্ভাবন শক্তির বলে মানুষেব কাজ যন্ত্রেব সাহায্যে হইতেছে। ইহাতে এক একজনের দ্বারা হাজার হাজার মানুষের কাজ কলের সাহায্যে হইতেছে। অনেকে সেইজন্য এই যুগকে 'কলি' যুগ বা কলের যুগও বলেন। ইহাতে মানুষের পরিশ্রম কমিতেছে

এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বেকার হইতেছে। শুধু বেকার হওয়া নহে, যন্ত্রের মালিকদের হাতে প্রভূত ধন সঞ্চিত হইয়া দেশে আর্থিক অনটনের সৃষ্টি করিতেছে। কলে তৈযারি জিনিস সস্তা ও সুন্দব। এইজন্য ইহাদের চাহিদা বেশী। কলের সঙ্গে হাতে তৈযারি জিনিস প্রতিযোগিতা কবিতে পাবিতেছে না। সেইজন্য গ্রাম্য শিল্পীদের হাতে তৈযারি দ্রব্যেব আব তেমন আদব নাই। ক্রমশঃ গ্রাম্য শিল্পগুলি যন্ত্রেব সহিত প্রতিযোগিতায পরাজিত হইযা বিলুপ্ত হইতেছে। বিদেশীদের শাসনাধীনে থাকার সমযে বিদেশীরা নিজ দেশের কলে তৈযাবি জিনিস এদেশে আনিযা সস্তায বিক্রি করিযা এদেশে গ্রাম্য-শিল্পীদের শিল্প ধ্বংস কবিযা দিযাছে।

কুটির-শিল্প বলিতে হাতে তৈযাবি বা অল্প-স্বল্প যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈযাবী দ্রব্য বুঝায। এ সকল দ্রব্য লোকে ঘবে বসিযা অবসর সমযে তৈযারি করিতে পারে।

আমাদের দেশের শিল্প

আমাদেব দেশে গ্রাম্য অঞ্চলে এইরূপ বহু শিল্প একদা প্রচলিত ছিল। এক একটি শিল্পকে পুরুষানুক্রমে অবলম্বন করিযা আমাদের দেশে একটি শিল্প-সম্প্রদায গড়িযা উঠিযাছিল। তাঁতি, কলু, কামার, কুমাব, ছুতাব, কাঁসারি, পটুয়া—ইহাবা ছিল গ্রাম্য শিল্পের রূপকার। এই সকল শিল্পকে অবলম্বন করিযা তখন গ্রামের অধিবাসীবা জীবিকা নির্বাহ কবিত। কৃষিকার্য ছাড়া যে সময় বাঁচিত সেই সমযে এইগুলি অবলম্বন কবিযা তাহারা আপনাদের আর্থিক বনিযাদ শক্ত কবিযা তুলিত। সেইজন্য পূর্বে বাংলার গ্রামগুলি সম্পন্ন ছিল। লোকেব এত অভাব ছিল না। কুটীব-শিল্পেব জন্য বাংলার নাম দেশ-বিদেশে ছড়াইযা পড়িযা-ছিল। ঢাকাই মসলিন, শান্তিপুর ও ফবাসডাঙ্গার তাঁতেব বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের বেশম শিল্প, বাঁকুড়া বীবভূম ও বর্ধমানের বেশমেব কাপড় বিখ্যাত ছিল। পিতল, কাঁসাব বাসনেব জন্য মুর্শিদাবাদেব খাগড়া, বাকুড়া, বিষ্ণুপুর ও মালদহ বিখ্যাত ছিল। কৃষ্ণ-নগরের মৃৎশিল্প, সুন্দর সুন্দব খেলনা, পুতুল শিল্পও সৌন্দর্যের পবাকাষ্ঠা ছিল। তাহা ছাড়া ঢেঁকিতে চাউল কোটা, চিড়া কোটাও বাঙালীর গৃহশিল্পেব অন্তর্গত ছিল। এছাড়া মাদুর বোনা, বেতেব ধামা, কুলা তৈযারি, বাঁশের চ্যাঙারী, ঝুড়ি তৈযাবি, পল্লীবাসীর কুটীর শিল্পের অন্তর্গত ছিল। আর ছিল কামাবের লৌহ শিল্প। পূর্বে বাঙালী কর্মকাব কামান পর্যন্ত তৈযারি করিতে পাবিত। এখনও কাঞ্চননগবের ছুরি, কাঁচি ও বাংলাব বহু গ্রামের কর্মকারদের তৈযারি দা, কাস্তে, কোদাল, লাঙলের ফাল ভাবতের গৌরবের বস্তু।

বিদেশী শিল্পপতিদের যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এই সব কুটীর শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। ইংরেজরা নিজ দেশের কলে প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য এদেশের তাঁতীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া এদেশের তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছিল। গ্রাম্য জীবনের যান্ত্রিক সভ্যতার ফলেই বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। দেশের শিল্প বন্ধ—শিল্পী অনাহারে দিন কাটায়—বাধ্য হইয়া শহরে কল কারখানায় কাজ করিতে যায়। নাগরিক জীবনের মোহে পড়িয়া গ্রামকে ত্যাগ করে। অর্থ পায় কিন্তু অর্থের সহিত সৃষ্টির আনন্দ যোগ হয় না। তখন শিল্পী শিল্প সৃষ্টির আনন্দ পাইত। সেই আনন্দে সে শিল্প সৃষ্টি করিত। আজ সে আনন্দবঞ্চিত কলের একটি অংশ মাত্র। গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা কুটীর শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেল। গ্রাম বণিকদের পণ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। যত দিন শিল্পগুলি ছিল, যন্ত্রশিল্পের মাল প্রতিযোগিতার জন্য অল্পমূল্যে বিক্রীত হইত কিন্তু গ্রাম্য শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ায় যন্ত্র-শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে লাগিল। লোককে বাধ্য হইয়া, অনন্যোপায় হইয়া এগুলি কিনিতে হইত। এইভাবে গ্রাম্য-জীবনে বৃত্তিহীন দরিদ্র নিষ্কর্মাদের ভিড় হইল। দেশে কর্মী আছে কর্ম নাই—ক্ষুধা আছে, অন্ন নাই—বাঙলার পল্লীগুলি অভিশপ্ত দেশ হইয়া দাঁড়াইল।

বিদেশী আমলে কুটীর শিল্পের ধ্বংস ও গ্রাম্য জীবনের ক্ষতি

বিদেশী শাসকরা শোষণের মাত্রা এতই বাড়াইয়া দিলেন যে, একদিন হাড়ে হাড়ে টান পড়িল। দেশ-প্রেমিকরা রুখিয়া দাঁড়াইল। দেশ বিদেশীর পীড়ন আর বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে রাজী হইল না। এরূপ সময়ে গান্ধীজি 'বিদেশী বয়কট' আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। দেশবাসী এবার ঘরের দিকে চাহিল। ঘর গুছাইতে হইবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে—কবিরা সেই ঘরে ফেরার গান ধরিলেন, "ফিরে চল মাটির টানে"ঃ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবে, ভাই"—"দেশী খদ্দরের প্রতি লোকের টান জাগিল। ঘরে ঘরে কুটীরশিল্পের প্রতি দেশবাসীর নজর পড়িল। বাংলার গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িল। গান্ধীজি কুটীরশিল্পের উপর বিশেষ জোর দিলেন। কুটীর-শিল্পই ভারতের তথা বাংলার গ্রামগুলিকে বাঁচাইবার উপায়। দেশবাসীর স্বদেশী প্রীতি বাড়িল। দেশের শিল্পীরা আবার শিল্প

স্বদেশী আন্দোলনের ফল

স্থষ্টি শুরু করিল। ক্রমশঃ দেশ স্বাধীন হইল। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশায ভরা দেশ! সমস্যায় কণ্টকিত দেশ, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই—এদেশকে নূতন করিয়া গডিযা তুলিতে হইবে যে।

জাতীয সরকার বুঝিলেন, গ্রাম্য শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিতে পারিলে পরিশ্রমী গ্রামবাসী নিজেরাই নিজেদেব ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পাবিবে। এজন্য কুটীব-শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকাব আর্থিক সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায কুটীরশিলের প্রসারেব জন্য সরকার বহু টাকা ব্যয বরাদ্দ করিলেন। গ্রাম্য শিল্পগুলি তাই আবাব গডিযা উঠিতেছে। গ্রাম্য কারিগব ও শিল্পীদেব মুখে আবাব হাসি ফুটিযাছে।

জাতীয সরকারের কুটীরশিল্পের প্রতি অনুরাগ

বাংলা আবার সোনার বাংলা হইবে সেই আশায আজ কর্মীরা বুক বাঁধিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন।

ভাবতবর্ষ বিরাট দেশ। এদেশেব জনসংখ্যা বিপুল। এই বিপুলাযতন দেশেব চাহিদা কখনো কুটীর-শিল্পেব দ্বাবা মেটানো যায না। এজন্য দেশে যান্ত্রিক শক্তির বিকাশ হওযা প্রযোজন। কলকারখানা মুষ্টিমেয ধনীকে আবো ধনী কবে—তাহাতে দেশেব ধন এক এক স্থানে সঞ্চিত হয এবং এই সঞ্চিত ধনই পৃথিবীর অভিশাপ। সেইজন্য ভারী শিল্পগুলিব রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্বন্ধে অনেকে দ্বিমত করেন না। তথাপি কুটীর-শিল্পগুলি বাঁচাইযা রাখা প্রযোজন। ভারতীয সভ্যতা প্রধানতঃ গ্রামীন। কুটীর-শিল্প এই গ্রামীন সভ্যতাব ধাবক ও বাহক। এজন্য এগুলি নষ্ট না করিযা ইহাদিগকে যান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইযা রাখা প্রযোজন। যন্ত্রশিল্পেব শ্রমিক আনন্দবর্জিত কর্ম করে, তাহারা নাগরিক সভ্যতাব মোহে গৃহহারা হয, অত্যাধিক পরিশ্রমের প্রতি-ক্রিযারূপে নেশা প্রভৃতিতে আসক্ত হয। আজকাল 'শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড' স্থাপিত হওযায এবং কাজ করিবাব সময নির্দিষ্ট করিযা দেওযায ও শ্রমিকদের রোগে চিকিৎসা ও বীমা-প্রথা প্রবর্তনেব দ্বারা শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইয়াছে। তথাপি ভারতের প্রাণ পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এদেশের কুটীর-শিল্পেব অত্যন্ত প্রয়োজন। কুটীব-শিল্পগুলি বাঁচাইযা রাখিলে গ্রামগুলি বাঁচিবে—গ্রাম বাঁচিলে দেশ বাঁচিবে। কারণ,

যন্ত্রশিল্প বনাম কুটীর শিল্প

দেশের শতকরা সত্তর জন লোক গ্রামবাসী। আধ্যাত্মিক চিন্তা ভারতবাসীর প্রাণ-মন্ত্র। শান্ত পরিবেশের মধ্যে ভারতবাসী আপনার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সাধন করিয়া সুখী জীবনযাপন করিতে পারিবে।

যন্ত্রশিল্পের প্রসার ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য শিল্পগুলির সংরক্ষণেরও প্রয়োজন। কৃষিজীবি বাংলা—সেই কৃষি বর্তমান সময়ে

উপসংহার

কৃষকের সারা বৎসরের ব্যয়-নির্বাহের উপযোগী নয়। সেজন্য কুটীর-শিল্প তাহাদের পরিপূরক উপজীবিকা হইলে গ্রাম্য জীবন আর্থিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। ভারত এক প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইহার বিশেষত্ব হাজার হাজার বৎসর পূর্বের গ্রাম্য জীবন এখনও বর্তমান রহিয়াছে। দেশে বহু বিপর্যয় ঘটিয়াছে কিন্তু সেই গ্রাম্য জীবনের প্যাটার্ন বিনষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে এক দুর্বার প্রাণশক্তি নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল।

কালজয়ী ব্যবস্থার পরিবর্তন না করাই যুক্তিযুক্ত। সেই গ্রাম্য জীবনকে রক্ষা করিতে হইবে। কুটির-শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত হইলে এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে বাংলার গ্রামগুলি আবার শান্তির নীড় হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থাগার

অতীতের সে কোন্ অন্ধকার যুগে মানুষ কথা কহিতে শিখিয়াছিল আজ তাহার সাল-তারিখ কাহারও মনে নাই। সেই হইতে মানুষ কত কথাই না কহিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে হইল ভবিষ্যৎ মানবের জন্য তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা রাখিয়া যাইবে। প্রথমে মুখে মুখে শ্রুতিধররা সেই সব বাণী বহন করিত। তারপর

ভূমিকা

সেইগুলি স্মরণ করিয়া রাখিবার উপায় হিসাবে কবে কোন্ প্রতিভাশালী আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ যে লেখার সৃষ্টি করিলেন তাহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। সাংকেতিক হরপের সাহায্যে মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর অমরত্ব সম্পাদন যিনি করিয়াছেন তাঁহাকে কোটি কোটি প্রণাম।

তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়েই আজ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি-কাঠি আমাদের করতলগত।

অক্ষরের সাহায্যে ভাব প্রকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়া মানুষ ভূর্জপত্রে এবং তালপত্রে, তাম্রফলকে, প্রস্তর ফলকে জ্ঞানগর্ভ বাণী ক্ষোদিত করিয়া রাখিত। তৎপরে

প্রথম গ্রন্থ

অক্ষরের ছাঁচের দ্বারা মুদ্রণের যন্ত্র সৃষ্টি করিল চীন দেশীয় এক ব্যক্তি। তৎপরে সীসার টাইপ সাজাইয়া মুদ্রণের উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল গ্রন্থ অনেক ছাপা হইয়া জনসাধারণের আয়ত্তে আসিল।

ক্রমশঃ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই সকল পুস্তক কিনিয়া পড়া কেবলমাত্র ধনীদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু ধনী ও দরিদ্র সকলেরই

মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক বাহুল্য

সমান পাঠতৃষ্ণা। কাজেই সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভাল ভাল পুস্তক বাছাই করিয়া একস্থানে রাখিয়া তথা হইতে পাঠেচ্ছুদের দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইল। পূর্বে প্রতি খ্রীশ্চান মঠে এবং হিন্দুমন্দিরে ও বৌদ্ধবিহারে এইরূপ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও টোল প্রভৃতিতেও বহু গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত।

বর্তমান কালে গ্রন্থাগারে সকল শ্রেণীর পাঠকদের জন্য বহু বিচিত্র প্রকারের পুস্তকের সংগ্রহ করা হয়। সেখানে পুস্তক যাহাতে নষ্ট না হয়, যাহাতে একজন বেশী দিন

বর্তমান গ্রন্থাগার

পুস্তক আটক করিয়া না রাখে এই সব বিষয়ে অনেক নিয়ম করা হয়। তাছাড়া গ্রন্থগুলি শ্রেণী বিভাগ করিয়া এমন ভাবে রাখা হয় যে পাঠক ইচ্ছানুযায়ী পুস্তক তালিকা দৃষ্টে পুস্তকটি বাহির করিয়া লইতে পারেন। বর্তমানে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে,—পাঠাগার—এখানে শুধু বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করা যায়—গ্রন্থ বাড়িতে আনা যায় না। গ্রন্থাগার—যাহা হইতে পাঠকগণ গ্রন্থ বাড়িতে আনিয়া পড়িতে পারেন। গ্রন্থাগার আবার বৈতনিক ও অবৈতনিক দুই শ্রেণীর আছে। যেখানে মাসিক চাঁদা দিয়া বই পড়িতে হয় এবং পুস্তক গৃহে আনার জন্য কিছু টাকা জমা রাখিতে হয় তাহাকে বৈতনিক এবং যেখানে বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহাকে অবৈতনিক গ্রন্থাগার বলে।

পূর্বে পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে গ্রন্থাগার পাঠক খুঁজিয়া বেড়ায়। যাহাতে সকলের পাঠানুরাগ বাড়ে সেইজন্য সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যেমন উদ্যোগ হইতেছে তেমনি নিত্য যাহাতে সকলে পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষিত হইতে পারে তাহারও বিরাট তোড়জোড় চলিতেছে। জ্ঞান শুধু মুষ্টিমেয় ধনী ও সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ব্যক্তির করতলগত না থাকিয়া যাহাতে সর্বসাধারণ্যে বিতরিত হইতে পারে তাহার জন্য দেশে দেশে গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য আন্দোলন হইতেছে। আজকের মানুষ আর ঘরকুনো মানুষ নয়, সে বিশ্বের অধিবাসী। বিশ্বের ভাবধারার সহিত তাহার যোগাযোগ ঘটাইয়া তাহাকে উত্তম নাগরিক করার দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের। অজ্ঞ, মূর্খ নাগরিক রাষ্ট্রের ধ্বংসের আয়ুধ হইতে পারে একথা সকল রাষ্ট্র আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। তাই আজ শ্রমিকদের জন্য গ্রন্থাগার—কৃষকের জন্য গ্রন্থগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, ক্লাবের গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারে ক্রমশঃ দেশ ছাইয়া যাইতেছে।

বর্তমান যুগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

প্যারিসের বিবলিওথেক্ ন্যাশনাল পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার। এছাড়া লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। বার্লিনের স্টেট লাইব্রেরী, মিউনিকের স্টেট লাইব্রেরী, ফ্লোরেন্সের বিবলিওথেক্ ন্যাশন্যাল্, মস্কোর লেনিন স্টেট লাইব্রেরী, লেনিনগ্রাডের পাবলিক লাইব্রেরী, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অব দি কংগ্রেস—পৃথিবীর বিখ্যাত-গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারও উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি বড় গ্রন্থাগার

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ, তিব্বত, মিশর, চীন, আরব ইত্যাদি দেশে বহু গ্রন্থাগার ছিল। তথায় বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইত। নালন্দা ও তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগার ছিল। এছাড়া কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত গ্রন্থাগার ছিল—এগুলি কিন্তু আধুনিক গ্রন্থাগারের ন্যায় আদপেই ছিল না। এখানে ধর্মসম্বন্ধীয় ও দর্শন এবং ইতিহাস-সম্বন্ধীয় পুস্তক জমা করা থাকিত। বিখ্যাত পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণের সে সকল গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার ছিল না। নবদ্বীপের শ্রীনিবাস

প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার

বৃন্দাবন হইতে বহু ভক্তিশাস্ত্রের পুঁথি গাড়ী বোঝাই করিয়া নবদ্বীপে লইয়া যান। নবদ্বীপের সে পুঁথিগুলি আজ কোথায় আছে কে বলিতে পারে!

গ্রন্থগুলি এক একজন মনীষীর ভাবচিন্তার বাহক ও ধারক। যে সকল মহাপুরুষ আজ লোকান্তরিত তাঁহাদের বাণী আজও গ্রন্থমধ্যে অমর হইযা আছে এবং আমাদের শিক্ষা দিতেছে। মহামনীষীদের অর্জিত জ্ঞানের ডালি পুস্তকের পাতায পাতায থরে থবে সজ্জিত হইযা রহিয়াছে। পাঠক ইচ্ছামত সেই জ্ঞান সমুদ্রেব বারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিযা তৃষ্ণা নিবাবণ করিতে পাবেন। আজ বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ পুস্তকগুলির সমাবেশ দেখিলে বিস্মযে স্তব্ধ হইযা যাইতে হয। সর্ব প্রকারের জ্ঞানই আজ আমাদেব করতলগত। যান্ত্রিক কৌশল, বৈজ্ঞানিক কৌশল, দার্শনিক বিদ্যা, ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৌবিদ্যা. বিমান চালনা কৌশল, স্থপতিবিদ্যা—সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের জ্ঞানের ডালি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিযা রাখিযাছেন। শিক্ষা বিস্তারের দিক দিযা পুস্তকের তথা গ্রন্থাগারের প্রযোজন যে কত তাহা এক কথায বলিযা শেষ করা যায না।

গ্রন্থ কি ?
গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য আজ দেশে দেশে কতই না আযোজন হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাদের সংখ্যা দেওযা ইত্যাদির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকল দেশেই একটি করিযা জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইযাছে এবং সকল শ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দ্বারা গ্রন্থপাঠে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগ করা হইয়াছে বহু দেশে। ভারতবর্ষে বরোদা রাজ্যে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। সরকারী সাহায্যে বরোদায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পল্লী গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয। ইহাই পরে ইম্পিরিযাল লাইব্রেরী এবং বর্তমানে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হইযাছে। ১৯২৫ সালে বাঁশবেড়িয়ায় প্রথম বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই বৎসরেই কলিকাতায় 'নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মিলন' আহূত হয এবং 'নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠিত হয। এই সমিতির মুখপত্র হিসাবে বঙ্গীয 'গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার আন্দোলন

পরিষদ পত্রিকা' প্রকাশিত হইতেছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায ভারতীয গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা বর্তমানে হাজাব দেডেকেরও অধিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বোলপুরের বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও কমার্শিযাল লাইব্রেরী বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ অর্থাৎ পুস্তক। ছাপার হরপে আজকাল কতই পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। এগুলি সবই কি পাঠ করিবার উপযুক্ত? মুদ্রাযন্ত্র সুলভ হওয়ায আজকাল অল্পমূল্যে পুস্তক প্রকাশ করা যায: সেজন্য বহু অনধিকারী আজকাল গ্রন্থকার হইযাছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকার ছাডা অপকারের সম্ভাবনা সমধিক। সেজন্য গ্রন্থাগারেব উপযোগী পুস্তক নির্বাচন করিবার ভার উপযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিব উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। জগতে এত প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে যে তাহা পাঠ করা একজনের পক্ষে সম্ভব নহে। সেরূপ অবস্থায় দ্বিতীয শ্রেণী ও তৃতীয শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিযা সময় নষ্ট করা কদাচ উচিত নহে। নির্বাচিত পুস্তক পাঠ করাই বুদ্ধিমানের কার্য। এজন্য উত্তম গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ অনুযায়ী পুস্তক পাঠ করা উচিত।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়

গ্রন্থাগার মহা পবিত্র স্থান। এখানে আমরা মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করিযা তাঁহাদের চিন্তার আলোকবর্তিকার সাহায্যে সংসারের অন্ধকার পথ অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের জীবন সার্থক ও সুন্দর করিবার জন্য তাহারা তাহাদের জ্ঞানের সার কত যত্নে তাঁহাদের পুস্তকেব মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন! কী প্রাচীন, কী বর্তমান সকল কালের সকল রকম জ্ঞানের মহাসত্র এই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারকে বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয বলিলেও অত্যুক্তি হয না।

উপসংহার

পল্লী-উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকবসতি-কেন্দ্রকে পল্লী বলে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিক্ষেত্র-গুলি কর্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল লোকবসতি কেন্দ্র স্বতঃই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদিগকে পল্লী বলে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—ভগবান পল্লী সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে শহর। পল্লীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখিলে তাহা যে ভগবানের সৃষ্টি তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই পল্লী একদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ভারতীয় সভ্যতাও ছিল এই পল্লীকেন্দ্রিক।

ভারতের পল্লী

"ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ—
স্নিগ্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ স্নেহ।"

পল্লীর-শ্রী কবি কল্পনাকে শান্ত রসের আস্বাদ দিত। এই শান্তরসাস্পদ পল্লীগুলি সাদাসিধা চালচলন ও উচ্চ এবং মহৎভাবের জনক ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ এই পল্লীর দুলাল ছিলেন। পল্লীর শান্ত পরিবেশই তাঁহাদের মনে ঈশ্বরোপালব্ধি জন্মাইয়াছিল। তখনকার পল্লীর সম্পদ বিদেশীদের লোভের বস্তু ছিল। ধন-ধান্য ভরা ছিল পল্লী, গোহালে থাকিত সুস্থ সবল গাভী ও বলদ, সুজলা বাংলার কৃষিক্ষেত্র ছিল উর্বর। কুটীরশিল্প দ্বারা গ্রামবাসীরা আপনাদের অবসর সময় কাটাইত। যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, তরজা, কবি গানে পল্লীর সান্ধ্য আসর জমিত। লোকের অভাব ছিল না।

পল্লীগুলি কেন ধ্বংস হইল

বিদেশী ইংরাজ এদেশে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রচলন করে। যন্ত্রশিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে শ্রমিকের প্রয়োজন হইল। শিল্পকে অবলম্বন করিয়া নগর গঠিত হইতে লাগিল এবং গ্রাম হইতে দলে দলে কৃষক উচ্চ মজুরীর লোভে গ্রামের কোল শূন্য করিয়া শহরে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। নাগরিক জীবনের পণ্যের দর কমিতে লাগিল এবং কৃষিকার্যে লিপ্ত কৃষকরা দারিদ্র্যের কবলে পড়িতে লাগিল। এইভাবে গ্রাম হইতে বিত্তশালীরা চলিয়া যাওয়ায় গ্রাম অন্ধকার হইতে লাগিল। ভিটায়

জঙ্গল জন্মিল; বাংলার কতকাংশে নদী মজিয়া ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ম্যালেরিয়ার ভয়ে লোক শহরে যাইতে লাগিল। এইভাবে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, অর্থ, বিলাস ইত্যাদির আকর্ষণে গ্রামবাসীরা পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিমান নাগরিক জীবনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। কুটির-শিল্প ধ্বংস হইল, গ্রামের পথ-ঘাট বিপর্যস্ত, পানীয় জলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, কৃষিতে জীবিকা-নির্বাহ হয় না। স্বাস্থ্যহীন, সম্পদহীন হইয়া পড়িল গ্রামগুলি। এইভাবে পল্লী ভারতবাসীর প্রাণকেন্দ্র হইতে ধ্বংসকেন্দ্রে পরিণত হইল। মুষ্টিমেয় লোক বিত্তশালী আর আপামরসাধারণ দরিদ্র —এই হইয়া দাঁড়াইল দেশের অবস্থা।

পল্লীগ্রামের উন্নয়ন প্রয়োজন

দেশের শতকরা সত্তর জন কৃষিজীবী পল্লীবাসী। তাহাদের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি নাই। অধিকাংশের উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। এই শতকরা সত্তর জনের উন্নতি করাই আসল দেশের কাজ। কবির ভাষায়—

"এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা—
এই সব ভগ্ন শুষ্ক বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"........

তুমি-আমি দেশের কয়জন? তুমি আমি লইয়া কি দেশ? দেশের শতকরা সত্তর জন যে উন্নতির ফলভোগী হইল না, সে উন্নতি উন্নতিই নহে। দেশের এই সব অধিবাসীদের উন্নতি করিতে হইলে গ্রাম্যজীবনের অসুবিধাগুলি দূর করা প্রয়োজন।

পল্লী-উন্নয়নের ধারা

ধীরে ধীরে দেশ মজিয়াছে। ধীরে ধীরে দেশকে আবার জীয়াইতে হইবে। এজন্য চাই কঠিন সঙ্কল্প, চাই অবিরাম উদ্যোগ ও পরিশ্রম। নাগরিক সভ্যতার স্পর্শে আমাদের মনে এই পল্লীবাসীদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়াছে। এই অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব দূর করিয়া ভালবাসার প্রসারের প্রয়োজন। ইহারা যে আমাদের ভাই, আমাদের রক্ত তাহা উপলব্ধি না করিলে ইহাদের সেবা করা যাইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, আমার রক্ত"—এই একাত্মবোধ ব্যতীত ইহাদের সেবার অধিকার জন্মে না।

পল্লী-গ্রামবাসীদের প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা ব্যতীত মানুষের মনে আত্ম-প্রত্যয় জাগে না। আত্মপ্রত্যয় না জাগিলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের জাগরণ হয় না। আমি যে বিশ্বাত্মার অঙ্গীভূত—এই বোধ না জন্মিলে আত্মশক্তিতে নির্ভরতা আসে না। এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

শিক্ষা

শিক্ষার ফলে কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশ বৈঠকের প্রয়োজন। এই নৈশ বৈঠকের সাহায্যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য, সমাজ-জীবন, কৃষি, কুটিরশিল্প ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাছাড়া কথকতা, যাত্রা, কবি, কীর্তন, তরজা ইত্যাদির দ্বারাও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রোগ ও মহামারীতে পল্লীবাসীরা জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। শত শত লোক একযোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এজন্য স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। রোগ কিভাবে সংক্রামিত হয় তাহা জানানো এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার উপায়গুলি পল্লীবাসীদের জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। গ্রাম পরিষ্কার করা, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল কাটিয়া ফেলা, খানা-খন্দ বুজাইয়া দেওয়া, পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার করিয়া পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী না হইলে মানুষ আপনার উন্নতি করিতে পারে না। নীরোগ দেহ জগতে এক মহাসম্পদ।

স্বাস্থ্য

কৃষিকার্য পল্লীবাসীর উপজীবিকা। কিন্তু সকল কৃষকের এরূপ কৃষিজমি নাই যে তাহারা উৎপন্ন শস্য হইতে তাহাদের সারা বৎসরের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় কোন কুটিরশিল্পকে অবলম্বন করিয়া না থাকিলে আর্থিক দিক দিয়া কৃষকগণ উন্নতি করিতে পারিবে না। বাঁশ, বেত, মাটি, খেজুরপাতা, তালপাতা ইত্যাদির দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ারি হইতে পারে। তাছাড়া তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, লৌহ বা ইস্পাতের যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা ইত্যাদি বহু কাজ কৃষকেরা করিতে পারে। বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তচালিত যন্ত্র দ্বারাও বহু শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হইতে পারে। এইসব দিকে কৃষকদলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে। কার্পাস, রেশম, বেত ও বাঁশের এবং শঙ্খ ও কড়ির শিল্প একদিন বাংলার প্রধান অবলম্বন ছিল। সেগুলিকে পুনরায় প্রবর্তিত করিতে হইবে।

আর্থিক উন্নতি

এইভাবে আর্থিক উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলে বাংলার গ্রামগুলি আবার শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৃষিকার্যও গতানুগতিক উপায়ে না করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিলে, উন্নত বীজ ও সার ইত্যাদির ব্যবহার করিলে কৃষকগণ প্রচুর লাভবান হইবে।

গ্রাম্য সমাজের প্রতিষ্ঠা

পূর্বে গ্রামের লোক এত আত্মসর্বস্ব ছিল না। তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিত। গ্রাম্য-সমাজ ছিল—তাহা দ্বারা গ্রামের অসুবিধাগুলি দূর হইত। গ্রামে গ্রামে আবার পল্লী-পঞ্চায়েৎ গঠিত করিয়া দিলে গ্রামবাসীরা আপনাদের উন্নতির পথ আপনারাই করিয়া লইবে। কল্যাণকামী ভারতীয় রাষ্ট্র লোক-কল্যাণের উদ্যোগগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য করিলে পল্লীগুলি আবার ছবির ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিবে।

সরকারের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ভারতের অধিকাংশ গ্রামের। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সরকার একটি সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সে কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি গ্রাম ১০০টি পরিবার বা ৫০০ জন লোককে কেন্দ্র করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-একক হইবে। এই গ্রামের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সেচের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রতি গ্রাম-এককের গোচারণ ভূমি, কাঠ সংগ্রহের জন্য বন বা জঙ্গল, রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি থাকিবে। তাছাড়া বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকিবে। প্রতি গ্রাম-এককে চাষী, মজুর, কুটিরশিল্পী, গৃহনির্মাণ-শিল্পী, কারিগর, বণিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ধোপা, নাপিত, মুচি, প্রতিরক্ষিদল থাকিবে। এইরূপ ১৫।২০টি গ্রাম-একককে লইয়া 'মণ্ডি' বা বাজারকেন্দ্র গঠিত হইবে। চার পাঁচটি মণ্ডি লইয়া একটি উন্নয়ন ব্লক গঠিত হইবে।

উপসংহার

আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। পরিকল্পনা রচয়িতারা বিপুল আশা লইয়া এই সর্বনষ্ট অধঃপতিত দেশের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেই কল্যাণের স্পর্শ পাইব। দেশ সকলের। সকলেরই বহু করণীয় কাজ আছে। ভগবানের নাম লইয়া একযোগে কাজ করিয়া গেলে ভারতের পল্লীগুলির উন্নয়ন অবশ্যই হইবে। এই দেশের উন্নতির সহিত আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি, দেশের

স্বার্থ আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ। সেই বৃহত্তর স্বার্থহানি করিলে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থহানি হইবে। এই বিষয়ে সচেতন থাকিলে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সাধু ও চলিত ভাষা

গদ্য ও পদ্যভেদে ভাষার দুই রূপ। তাছাড়া গদ্যের আবার দুই রূপ আছে—কথ্য ভাষা বা মুখের ভাষা, আর বই যে ভাষায় লেখা হয় সেই ভাষা। বই যে ভাষায় লেখা হয় তাহাকে বলে সাধু ভাষা। আর মুখের ভাষাকে বলা হয় চলিত ভাষা। বাংলা দেশের সর্বত্র লোক বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিলেও অঞ্চলভেদে সেই মুখের ভাষার রূপ আলাদা। স্থানে স্থানে এই পার্থক্য এত বেশী যে একস্থানের ভাষা অপর স্থানের লোকের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। পশ্চিমে বীরভূম হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভাষার উচ্চারণ এবং শব্দপ্রয়োগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইংলণ্ডেও এইরূপ কথ্যভাষায় পার্থক্য আছে। লণ্ডনী ভাষা আর ককনী ভাষার পার্থক্য বড় কম নহে। রাজধানীর ভাষারই চল বেশী—অপর স্থানের ভাষাকে অপভাষা নাম দিয়া অপাংক্তেয় করা হইয়াছে। ইটালীতেও বহু অপভাষাকে পিছু হটাইয়া টস্কানি প্রদেশের ভাষা ইটালীয় সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাষার দুই রূপ

মৌখিক ভাষা মুখে মুখে সৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা সকলে বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধুভাষার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? বইয়ে ব্যবহারের জন্য যে ভাষা তৈয়ারি হইয়াছিল তাহা বাংলা দেশের কোন স্থানের মৌলিক ভাষা নহে। এই ভাষা কৃত্রিম। ইহা পোশাকী ভাষা। ইহাকে চেষ্টাচরিত্র করিয়া বানানো হইয়াছে। সর্ব অঞ্চলের বোধগম্য হয় এমনভাবে এই ভাষাকে তৈয়ারি করার প্রচেষ্টায় যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। এবিষয়ে খ্রীশ্চান মিশনারীদেরও দান রহিয়াছে। মহাত্মা রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনব সাধুভাষার প্রথম শিল্পকার।

সাধুভাষার সৃষ্টি

স্বাভাবিক মুখের ভাষা ছাড়িয়া কৃত্রিম বানানো সাধু ভাষা ব্যবহারে আমাদের ভাষা জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এইরূপ মত অনেকে প্রকাশ করেন।

চলিত ভাষা

সাধু ভাষায় এতাবৎ বহু সাহিত্য রচিত হওয়ায় ইহা সমৃদ্ধ ও অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই শিল্পকারুকার্যমণ্ডিত ভাষা ত্যাগ করিয়া মুখের সহজ ভাষা গ্রহণ করার পক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শিত হয়। এক্ষণে উভয় ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি একে একে প্রদর্শিত হইবে।

সাধুভাষার পক্ষে যুক্তি

সাধুভাষা শিল্পকারুকার্যময় সুন্দর ভাষা। সাধু ভাষার শব্দ-প্রয়োগ ও বাক্য গঠন প্রণালী আঁটসাঁট··· চলিত ভাষার ন্যায় ঢিলে-ঢালা নয়। পরিচ্ছদে যেমন সভ্যতার একটি আদর্শ আছে, ভাষায়ও তদ্রূপ থাকা দরকার। ভাষা ভাবের পরিচ্ছদ। উত্তম পরিচ্ছদে শোভিত ভাষা লোকের মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট করে। আঞ্চলিক ভাষা একবার সাহিত্যে প্রবেশ করিতে থাকিলে এবং আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি সাহিত্যে স্থান পাইলে অভিধান বিপুলকায় কিম্ভূতকিমাকার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে এবং ব্যাকরণের সূত্র তৈয়ারি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিণত হইবে।

চলিত ভাষার পক্ষে ও সাধু ভাষার বিপক্ষে যুক্তি

সাধুভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুগ। এজন্য উচ্চারণমাত্রই সর্ব-সাধারণ্যে বোধগম্য হয় না। অথচ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ইহা সর্ব-সাধারণ্যে বোধগম্য হইবে। সাহিত্য লোকের উপলব্ধির জন্য কিন্তু কৃত্রিম ভাষার মাধ্যমে তাহা পরিবেশিত হইলে অল্পসংখ্যক লোকেরই উপলব্ধির বিষয় হইবে। ইহাতে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবে। দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে এই সাধু ভাষার প্রচলনে ব্যবধান বাড়িয়াই চলিবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষাও বটে। কিন্তু সাধুভাষা প্রয়োগে রচনা দুর্বোধ্য হইলে লোকশিক্ষা ব্যাহত হইতে বাধ্য। তাছাড়া শিশুদের শিক্ষার জন্যও মৌলিক বা চলিত ভাষার প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত

সংস্কৃতানুগ হইয়া সাধুভাষা যখন অতিমাত্রায় কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য শব্দঝংকারপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তখন এই ভাষার পরিবর্তে দৈনন্দিনের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে “আলালের ঘরের দুলাল” ও “হুতোম প্যাঁচার নক্সা” নামক দুইটি বই কলিকাতার লোকের মুখের ভাষায় লেখা হয়। ভাষা লইয়া তখন যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা

সমাধানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি পথ বাৎলান। শুধু পথ বাৎলান নয়; তিনি তাঁহার সাহিত্যে ও উপন্যাসে সেই ভাষা ব্যবহার করিয়া তাহার মাধুর্যে সকলকে মুগ্ধ করেন। বঙ্কিমের অভিমত এখানে উদ্ধৃত হইল, "রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; সরলতা ও স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।—যদি সরল প্রচলিত ভাষায় বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উপভাষার আশ্রয় লইবে। যদি সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য হয় তবে সেই ভাষার আশ্রয় লইবে।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ-এর মত

সুসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের মন্তব্যটি সুচিন্তিত। তিনি বলিলেন, "পুরাতন সংস্কৃত ও নূতন উভয়ই আদরের বস্তু, উভয়ই আমাদিগের প্রাণপ্রিয়। সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিলে বাংলার কিছুই থাকে না। আবার বাংলা শব্দ যদি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট স্থান না পায় তবে তাহা বাঙালীর হৃদয়হারিণী হইতে পারে না। কিন্তু এই দুইয়ের সুচারু মিশ্রণ অবশ্যই একটু বেশী যত্ন সাপেক্ষ।"

গুরু-চণ্ডালী দোষ

বঙ্কিম এই উভয় ভাষার সংমিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ভাষার সমালোচনা করিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাঁহার রচনারীতিকে 'মড়াদাহ' ও 'শবপোড়া' নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা সংস্কৃতানুগ ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য চলিত ভাষার সহিত মিশ্রণকে ব্যাকরণে 'গুরু-চণ্ডালী দোষ' নামে অভিহিত করিয়া দেশীয় শব্দ প্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দলও সংস্কৃতানুগ ভাষাকে 'ভট্টাচার্যের চানা' অর্থাৎ অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস ভাষা নামে অভিহিত করিতে থাকেন।

ভাষা জীবনের প্রতীক
জ্যান্ত ভাষা ও মরা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে তাঁহার মতামত অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া চলিত ভাষার পক্ষেই রায় দেন। অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুগ ও নিয়ম-নিগড়ে বদ্ধ কৃত্রিম ভাষা জাতির প্রাণের দ্যোতক নহে। ভাষারও জীবন আছে, তাহার মধ্যে প্রাণচঞ্চলতা আছে। কৃত্রিমতা জড়ত্বের লক্ষণ। অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুগ ভাষা ভাবকে বিলম্বিত করিয়া প্রকাশ করে বলিয়া বিবেকানন্দ তাহার নাম দিয়েছেন 'মরা ভাষা'। কে

ভাষায় আমরা রোজ কথাবার্তা বলিয়া থাকি—যে ভাষায় আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করি—যে ভাষায় আমাদের দৈনন্দিনের মুখরিত কথাবার্তা চলিতেছে—তাহার প্রকাশভঙ্গী কত সহজ, কত সরল, কত প্রাণবন্ত—সেই জীবন্ত ভাষা ত্যাগ করিয়া একটা কৃত্রিম কেতাবী ভাষায় বিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা অন্যায়। আপামর সাধারণ যাহাতে বুঝিতে পারে সেইরূপ ভাষায় সাহিত্য রচনা না করিলে সাহিত্যের সার্থকতা থাকে না।

প্রচলিত ভাষার কোন্‌টি গ্রহণ করা হইবে

চলিত ভাষা সাহিত্যে আসিবে। তাহার পথ কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন্ অঞ্চলের ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে? এক এক অঞ্চলের এক এক ভাষা। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের রীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজধানীর ভাষা কালক্রমে জয়ী হইবে। রাজধানীতে সর্বস্থানের লোক আসে। সেখানে যে ভাষা গড়িয়া উঠে তাহাই আদর্শ ভাষা। ইংলণ্ডে লণ্ডনী ভাষা আদর্শ, ইটালীতে টস্‌কানির ভাষা আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের অভিমত

রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী। তথাপি তিনি সংস্কৃতানুগ সাধুভাষা বহু সাহিত্যিকের সাধনায় যে অপূর্ব সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাকে নষ্ট করিবার পক্ষপাতী নহেন। এই ভাষাটিকে জীয়াইয়া রাখা প্রয়োজন। এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার বক্তব্য বেশ একটু আঁটসাট করিয়া না বলিলে চলে না। এই সকল বিষয়ের বক্তব্য ঢিলেঢালা ভাষায় বলা হইলে বক্তব্যের মাহাত্ম্য কমিয়া যায়—শুধু এই সব বিষয়ের জন্য বহু সাধনালব্ধ সংস্কৃতানুগ সাধুভাষাটিকে রক্ষা করিতে হইবে।

উপসংহার

ভাষা গঙ্গার স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে। তাহা আমাদের দিন-রাত্রির চিন্তার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। আমাদের সর্ব অঞ্চলের ভাষার নমুনা ইহাতে কালক্রমে স্থান পাইবে এবং ইহা সর্বপ্রকার আঞ্চলিক ভাষার মধ্য হইতে মাধুর্য আহরণ করিবে। শব্দ-সম্পদের দিক দিয়া ভাষা এইভাবে অতুলনীয় হইয়া উঠিবে।

আচার্য ভাবে ও সর্বোদয় সমাজ

"সর্বোদয় সমাজ" বলিতে এমন একটি সমাজকে বুঝায় যাহার অন্তর্গত সর্বজাতি ও সর্ববর্ণের লোকের উদয় বা উন্নতির সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা থাকে। এরূপ সমাজ বর্তমানে নাই। কিন্তু এরূপ সমাজ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। এরূপ সমাজ সৃষ্টি করা সহজ নহে। বৈষম্য, প্রতিযোগিতা, রেষারেষি, শোষণ বিরহিত এইরূপ সমাজেব স্বপ্ন দেখিতেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার রামবাজ্য—এইরূপ সর্বোদয সমাজের প্রতিষ্ঠা ছাডা আর কিছুই নহে। যে স্বপ্ন গান্ধীজি দেখিযা গিযাছেন তাহা খেযালীর স্বপ্ন নহে, তাহা মানব হিতৈষীর ধ্যানলব্ধ স্বপ্ন, জাতির কল্যাণে নিযোজিত-প্রাণ মনীষীর সে স্বপ্ন তাই শূন্যে বিলীন হয় নাই। গান্ধীজির মৃত্যুব পব তাঁহার শিষ্যবর্গ ১৯৫০ সালে সর্বোদয সমাজ সংস্থাপনের সঙ্কল্প লইয়া সর্বোদয সেবাসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বোদয় সমাজ

ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ ভাগ লোক গ্রামবাসী। কাজে কাজেই ভারতীয় সমাজের কোন পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে গ্রামেই সর্বপ্রথম সেই পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এক-একটি গ্রামে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বোদয সমাজ গঠিত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। প্রতি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইযা আপনাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনারাই ব্যবস্থা করিযা লইবে। সেই সর্বোদয় সমাজ পঞ্চাযেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কারুকেন্দ্রিক বা গান্ধীজি পবিকল্পিত 'নইতালিম' বা নূতন শিক্ষা ইহাদের এই নূতন সমাজের উপযুক্ত করিযা গঠন করিবে। এইভাবে আর্থিক দিক দিয়া প্রতিটি গ্রাম আত্মনির্ভরশীল হইলে শোষণ, বৈষম্য ও দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে দেশ হইতে বিদূরিত হইবে।

সর্বোদয় পরিকল্পনার বিশেষত্ব

"সর্বোদয সমাজ" সৃষ্টির জন্য প্রথমে প্রয়োজন গ্রামের প্রতিটি লোকের জন্য বাস-স্থানের ভূমি ও কৃষিক্ষেত্র, কিন্তু বর্তমানে ভূমি মুষ্টিমেয়ের হাতে আসিযা জুটিয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই যে অকৃষিজীবী জমির মালিক তাহা নহে। বহু অকৃষিজীবী আজ ভূ-সম্পত্তির মালিক হইযাছেন এবং কৃষি-জীবীরা তাঁহাদের অধীনে দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে অধিকাংশ আজ

ভূদান আন্দোলন

অল্পাংশের দ্বারা শোষিত হইতেছে। এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া কৃষকদের হাতে কৃষি-জমি তুলিয়া দিবার জন্য দেশে ভূমি সংস্কার আইনের প্রবর্তন হইতেছে। কিন্তু সে উপায়ে অভিপ্সীত লক্ষ্যে পৌঁছিতে বিস্তর বাধা রহিয়াছে; এজন্য গান্ধীজির প্রিয় সহচর আচার্য বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তন করেন—বলপূর্বক বা আইনের সাহায্যে ভূম্যধিকারীদের নিকট জমি যাচ্ঞা করিতে শুরু করিলেন। কৃষকদের জমি দান করিবার জন্য তিনি ভূম্যধিকারীদের নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করিলেন—ভূম্যধিকারীদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিয়া স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করাই ভূদান আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করিয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করা হয়। তাহার ফলে তেলেঙ্গানায় গ্রাম্যজীবন বিষাক্ত হাওয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠে। আচার্য বিনোবা ভাবে তেলেঙ্গানায় দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন এবং জমিদারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিয়া স্বার্থত্যাগে প্ররোচিত করিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। ১৯৫১ সালে তেলেঙ্গানায় দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য বিনোবাজী প্রথম ভূদান যজ্ঞ শুরু করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি তিনি পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইতিমধ্যে বহু জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া সর্বহারা কৃষককুলের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। কিন্তু বিনোবাজীর আশা অপরিমিত—তিনি মানবের শুভবুদ্ধির উপর আস্থাশীল। তাঁহার এই মহান আদর্শ আজ বহু লোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। সমাজসেবার এই উন্নত আদর্শের স্পর্শে গ্রামে গ্রামে যতই সামান্য হউক শ্রম দান ও সম্পত্তি দানের যজ্ঞ শুরু হইয়াছে।

ভূদান যজ্ঞের প্রথম সূত্রপাত

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার গাগোদা গ্রামে চিৎপাবন ব্রাহ্মণকুলে বিনায়কের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখা হয় বিনায়ক নরহর ভাবে। তাঁহার ডাক নাম ছিল 'বিন্যা'। বিনোবা নামটি মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া। মারাঠা দেশে 'বা' কথাটি একান্ত শ্রদ্ধাভাজনের নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়। বিনোবার ঠাকুর্দা শম্ভুরাও অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। বিনোবাও পিতামহের মত সংস্কারমুক্ত পুরুষ। ১৯০৫ সালে তিনি বরোদায় পিতার

বিনোবাজীর কথা

কর্মস্থানে আসিযা পাঠশালায় ভর্তি হন। পরে ১৯১০ সালে হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং শ্রেণীতে অনায়াসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাঠ্যছাড়া অন্য বই পডার দিকেই তাঁহার আগ্রহ বেশী ছিল। তিনি 'বিত্থার্থী মণ্ডল' নামে এক পাঠচক্র গঠন করেন এবং প্রায ১৬০০ পুস্তক সংগ্রহ করিযা ফেলেন। বিনোবা দশ বছর বযসে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকাব প্রতিজ্ঞা কবেন এবং সে প্রতিজ্ঞা আজও পালন করিতেছেন। দেশাত্মবোধ তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। কলেজে পাঠ করার সমযে অঙ্কে তাঁহার অত্যন্ত মাথা ছিল। গান্ধীজি বিনোবাজীর কঠিন সংকল্প ও উন্নত মনেব পরিচয বহুবার লাভ করেন। গান্ধীজি বিনোবাকে "অগ্নিগোলক" বলিতেন এবং একবার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তোমার মত এত বড উচ্চ আত্মা আমি আর দেখি নাই"— প্রশংসায় পাছে মনে অহংকার জাগে সেজন্য বিনোবা সেই পত্রখানা ভস্মসাৎ করিযা ফেলেন।

গান্ধীজির তিরোধানের পর অন্ধকার দেশে ভাস্কর জ্যোতির ন্যায় বিনোবাজী আসিয়া দাঁডাইলেন। পথ আলোকিত, পথ সহজ, সরল—তাঁহার সংকল্প অটল।

বিনোবাজীর সংকল্প

'গ্রামবাজ' প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হতোদ্যম হইবেন না। **"মন্ত্র হইতে মন্ত্রের উদ্ভব হয়। দাদাভাই নওরজি স্বরাজের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—আর মহাত্মা দিয়াছিলেন "ভারত ছাড়" মন্ত্র। দাদাভাই দিয়াছিলেন আদর্শের মন্ত্র—গান্ধীজি দিলেন তাহার সাধনের মন্ত্র। সেরূপ গান্ধীজি দিলেন সর্বোদয়ের মন্ত্র আর বিনোবাজী দিলেন উহার সাধনের মন্ত্র—ভূদান, গ্রামদান মন্ত্র, মালিকানা ত্যাগের মন্ত্র, পরিধি সম্প্রসারণের মন্ত্র।"**

গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযানের মত বিনোবাজীও অভিযানে বাহির হইযাছেন। মানবের দ্বাবে দ্বারে, ভাবতের গ্রামে গ্রামে, প্রদেশে প্রদেশে চলিয়াছে তাঁহার বিরাম-

ভারত পথিক বিনোবাজী

হীন যাত্রা। ভূদান যজ্ঞের মহাযাজ্ঞিকেব স্বপ্ন সফল করাব দাযিত্ব ভারতের সকলের। ভারতের সর্বোদয সমাজ জগতের আদর্শ হইবে। গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠা আজ সাফল্যের পথে। বিনোবাজীকে নমস্কার।

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা!"

মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমাদের মুখ হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই ভাষা। এক এক দেশের লোকের ভাষা এক এক প্রকার। স্বদেশী ভাষা বলিতে নিজের দেশের লোকেরা যে ভাষায় কথাবার্তা বলে তাহাকেই বুঝায়। ইহাকে মাতৃভাষাও বলে। আমরা শৈশবে মায়ের নিকট হইতে ভাষা শিখি। মায়ের মুখের সেই ভাষাকেই মাতৃভাষা বলে। ইহাকে আঞ্চলিক ভাষাও বলা হয়।

ভাষা কাহাকে বলে

এক এক দেশে এক এক ভাষা প্রচলিত। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান্, রুশ, ইতালীয়, চীন ইত্যাদি বহু ভাষা জগতে প্রচলিত। ভারতবর্ষে সর্বমোট ১৮ রকম ভারতীয় ভাষা এবং ৬৩ রকম অভারতীয় ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে হিন্দী, উর্দু, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, বাংলা, গুজরাটি, কানাড়া, মালয়ালম্, ওড়িয়া, অসমীয়া, কাশ্মিরী ও সংস্কৃত ভাষাই প্রধান।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা

আমরা বিদ্যার্জনের জন্য অনেক ভাষা শিক্ষা করি। ইংরেজী, হিন্দী, ফরাসী ও জার্মান শিখিয়া সেই সব ভাষায় লেখা বই পড়িয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারি—সেই ভাষায় কথা বলিতেও পারি। কিন্তু সেই সব ভাষা কখনই আমাদের অন্তরের নিগূঢ় ভাবসকল প্রকাশের বাহন হইতে পারে না। সে ভাষায় কথা কহিয়া, বই লিখিয়া আমরা কখনও তৃপ্তি পাই না।

ইংরেজরা এদেশে আসিয়া ইংরেজী বিদ্যালয় খুলিয়া তাঁহাদের সমৃদ্ধ ভাষা আমাদের শিক্ষা দেন। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাও অনেকের মনকে আশ্রয় করে। ইংরেজিয়ানার ঢেউ এমন উঠিয়াছিল যে বাংলা ভাষায় কথা বলাটা অসভ্য, অভব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ছাত্রসমাজে তখন ইংরেজী ভাষা এরূপ মোহ বিস্তার করিয়াছিল যে, কোন কোন ছাত্র বলিতেন যে, তিনি ইংরেজী পড়েন, ইংরেজী লেখেন,

ইংরেজ আমলে মাতৃভাষা অনাদৃত হইয়াছিল

ইংরেজীতে কথা বলেন এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখেন। বিদেশী ভাষার প্রতি এই উৎকট মোহের ফলে মাতৃভাষা বাংলা কিছুকাল অনাদৃত অবস্থায় ছিল। ইংরেজ আমলে ইংরেজী হইযাছিল শিক্ষার বাহন। ফলে ছাত্রগণ বাধ্য হইয়া প্রাণপণে এই বিদেশী ভাষার অনুশীলন করিত। ভাবই আসল, ভাষা গৌণ কিন্তু সেই গৌণ বিষয় আযত্ত করিতে ছাত্রদের অধিক সময ব্যয হইত। ভাব বা বস্তু পর্যন্ত তাহাদের বিদ্যা পৌঁছিত না। মুখস্থ বিদ্যার জোরে তাহারা পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইত কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্রের সংবাদ বড রাখিত না। এইভাবে শিক্ষা জড শিক্ষা হইয়া দাঁডাইযাছিল।

এই অবস্থা হইতে ছাত্রগণকে উদ্ধার করিবার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যাযের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার পথ প্রশস্ত করিযা দেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সহজ

ইহার ফলে ভাষার জন্য ছাত্রদের আর কষ্ট করিবাব প্রযোজন হয না। নূতন নূতন ভাবগুলি তাহারা সহজে আযত্ত করিযা লয এবং আপন মনন ও বীক্ষণের ফলগুলি অনাযাসে নির্ভযে প্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ ভাবপ্রকাশে নিপুণতা অর্জন করে।

জাতির স্বাধীনতার লক্ষণ তাহার আচবণের স্বাধীনতা ও ভাষার স্বাধীনতা। বাংলা শিক্ষার বাহন হওযাব ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার

বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত পরিচয়

বাডিয়াছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিবিধ বিষয়ের পুস্তকাদি রচিত হইতেছে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বাংলা ভাষার মাধ্যমে আজ প্রতি বাঙালীর করাযত্ত। আপন দেশের সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত পরিচয হওয়ায় বাঙালী আজ গর্ব অনুভব করিতেছে।

বাংলাভাষার উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা লইযা বহু মতবিরোধ আছে। কেহ

বাঙলাভাষার উৎপত্তি

বলেন, বাংলাভাষা দ্রাবিড ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার অপর একদল বলেন যে, বাংলাভাষা আর্যদের ভাষা হইতে উৎপন্ন। ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

বাংলাভাষা প্রায় হাজার বছর ধরিযা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাংলাভাষায় নানান দেশীয় শব্দ আসিয়াছে। আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি বহুভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া বাংলাভাষা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা লিখিবার সময়ে যে বর্ণমালা ব্যবহার করি, তাহা খুব প্রাচীন। বাংলা বর্ণমালা আপনা আপনি ধীরে ধীরে উৎপন্ন হইয়াছে। আদি বর্ণমালার নাম ব্রাহ্মীলিপি। এই লিপির নমুনা অশোকের অনুশাসনগুলিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই বর্তমান বাংলালিপির জন্ম।

বাংলা আমাদের স্বদেশী বা মাতৃভাষা

আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের ধ্যান-ধারণা, আশা-কল্পনা, স্বপ্ন-সাধ সকলি এই ভাষায় অভিব্যক্ত। এই ভাষায় আমরা প্রথম কথা বলি এবং আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ করি। কবির ভাষায়—

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা—
এই ভাষারই মধুর বোলে
ডাকিনু মাকে মা মা বলে
এই ভাষাতেই বলব হরি
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।"—

মাতৃভাষা শিক্ষার উপকারিতা

জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, সাধ-কল্পনা সবই মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলাসাহিত্য বাঙালীর মর্মবাণী। সে মর্মবাণীর সহিত বাঙালীর পরিচয় না ঘটিলে বাঙালী স্বীয় পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইলে, প্রাচীনকাল হইতে বংশপরম্পরাগত ভাবধারার সহিত পরিচয় সাধন করিতে হইলে বাঙালীকে বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন করিতেই হইবে।

উপসংহার

মাতৃভাষা ছাড়া হৃদয়ের তৃপ্তি অন্য কোন ভাষায় মিলে না। কবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা সুন্দরভাবে দেখানো যায়। তিনি আশৈশব ইংরেজী ভাষার চর্চা করেন এবং যৌবনে ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের তৃপ্তি মিলে নাই। তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি

পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

তারপর একদিন কবির মোহ ঘুচিল—

"স্বপ্নে মোর কুললক্ষ্মী কহি গেলা মোরে
ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি।"

মাতৃভাষার অনুশীলন দ্বারা কবি মাতৃভাষায় অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিয়া যশস্বী হইলেন।

স্বদেশী ভাষা বা মাতৃভাষা ছাড়া যে মানুষের প্রাণের তৃপ্তি মিলে না, তাহা অতি সত্য কথা। মাতৃভাষার প্রতি শব্দটি মাধুর্যের ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। বিদেশী ভাষা যতই মধুর, যতই ঝঙ্কারপূর্ণ হউক না, তাহা কদাচ আমাদের প্রাণের তারে আঘাত করিয়া মর্মের একান্ত গোপন সুরটি জাগাইতে পারে না।

"যে সয়, সে রয়"

এইটি একটি প্রবাদ বাক্য। প্রবাদ বাক্যগুলি মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে। এগুলি যেন সংসারপথের পথনির্দেশক নিশান। ইহা একটি অমূল্য প্রবাদ। ইহার অর্থ—সহ্য করা সংসারে টিকিয়া থাকার উপায়। ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিয়া থাকিলে শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য আমাদের কণ্ঠকেই বিভূষিত করে। অল্প বাধায়, অল্প আঘাতে, অল্প দুঃখকষ্টে যাহারা ধৈর্যহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দেন, তাহাদের পক্ষে কোনকিছুই করা সম্ভব হয় না। দৃঢ়তার সহিত আপনার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সকল আঘাতে অটল থাকিতে হইবে—তবেই বিজয়ী হওয়া যাইবে, কার্যসিদ্ধি হইবে।

প্রবাদ বাক্যটির অর্থ

সংসারে দুঃখ আছে, শোক আছে, বিপদ আছে, বাধা আছে, শত্রুতা আছে—

লাঞ্ছনা, অপমান সকলই আছে। এই সব বিরুদ্ধ ভাবের ধাক্কায় মানুষের মনে নিরন্তর তরঙ্গ উঠিতেছে। ইহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িলে বা ইহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পশ্চাদপসরণ করিলে অভিপ্সীত বস্তু লাভ করা আমাদের পক্ষে কদাচই সম্ভব হইবে না। কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

সংসারে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা

"ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক
সংসারে সহস্র দুঃখ আসিবে আসুক—
এ সংসার কর্মশালা
জ্বলন্ত কৃতান্ত জ্বালা
পুড়িতে হইবে আছে গাদ যতটুক
ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক।

আগুনে পুড়িয়া সোনা খাঁটি হয়—দুঃখ ও বিপদের ধাক্কায় আমাদের মন ঘাতসহ হয়।

ডারুইন সাহেব প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, যোগ্যতম জীবরাই শেষ পর্যন্ত জগতে টিকিয়া থাকে। পৃথিবীতে বহু বৃহদাকার, শক্তিশালী জীব ছিল। তাহারা পারিপার্শ্বিকের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নাই, সেজন্য তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা বহু ক্ষুদ্র জীব, দুর্বল জীব কেবল সহ্যগুণের দ্বারাই সব আঘাত সহিয়া এখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে। মানুষের বেলাও ঐ এক কথা। মানুষের জীবনযাত্রা এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। গুহা-মানুষের মত অসহায়, দুর্বল জীবও কেবল নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া সহ্যগুণের বলেই আজ পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, মানুষের সহিত সংগ্রাম, ব্যাধির সহিত সংগ্রাম—মানুষের ইতিহাস এইসব সংগ্রামের ইতিহাস।

প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত

সহ্যগুণ না থাকিলে মানুষের মত দুর্বল জীবের একদিনও পৃথিবীতে থাকা সম্ভব হইত না। দেহই মানুষের সংসারসমুদ্রে ভাসিবার তরণী। দেহ সুস্থ ও সবল না হইলে মানুষ জগতে কিছুই করিতে পারে না। এই দেহ শৈশবে অতি কোমল থাকে, অল্পেই এই শিশুদেহ ভঙ্গ হইতে পারে। ইহাকে ক্রমশঃ শীতাতপ সহ্য করাইয়া দৃঢ় না করিলে ইহার দ্বারা

শরীর ও স্বাস্থ্য

কোন কাজ হয় না। যাহারা নিজ দেহকে শীতাতপ, দুঃখ-কষ্ট, অনাহার, অর্ধাহার দ্বারা সহনশীল না করে তাহারা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। উত্তম শরীর ব্যতীত সংসারে কোন কার্যই করা যায় না। কথায় বলে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"। জীবধর্ম পালনের গোড়ার কথা শরীর। এই শরীরকে ব্যায়াম দ্বারা পুষ্ট ও নীরোগ করিতে হয়। সহ্য করাইয়া শরীরের রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা বাড়াইতে হয়। প্রবাদ আছে—

"শরীরের নাম মহাশয়,
যা সহাবে তাই সয়।"—

কথাটি অত্যন্ত খাঁটি। অভ্যাস দ্বারা এই ভঙ্গুর শরীর মহাশক্তির আধার হইয়া ওঠে।

মানুষের মন

শরীরের ন্যায় মানব মনও অত্যন্ত দুর্বল থাকে। আমরা শৈশবে অত্যন্ত মৃদু ভাবের ঝঙ্কারে অভিভূত হই। কিন্তু বয়সবৃদ্ধির সংগে সংগে নিত্য নব অভিজ্ঞতার প্রভাবে আমাদের মন শক্ত হয়। যে মনকে শক্ত করিয়া গড়িতে না পারে, সে জগতে কিছুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। "মৃদুনি কুসুমাদপি" মানুষের মন, অভ্যাসে ও চেষ্টায় "বজ্রাদপি কঠোরাণী" হইয়া ওঠে। সংসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। শুধুই সুখ ও আরামে আমাদের জীবন ঘেরা থাকে না। এখানে ভয়ের ও বিপদের ভ্রুকুটি আছে, নৈরাশ্যের বেদনা আছে, পরাজয়ের গ্লানি আছে, শোক ও দুঃখের প্রবল প্রচণ্ড হৃদয়বিদারক আঘাত আছে। ওমর খৈয়ামের কবির কল্পনা ছিল,—

এই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের মাঝে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।"—এ বাস্তববিমুখী চিন্তা।

বাস্তব জীবন ইহার বিপরীত। সেখানে হাসি-অশ্রু, সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, মেঘ ও রৌদ্রের ন্যায় খেলা খেলিয়া বেড়ায়।

আয়োজন কবি দুঃখের শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ অভিজ্ঞতার অথা অপূর্ব কাব্যে

গ্রথিত করিয়াছেন। দুঃখ যে আমাদের মনের বীণায় ঠিক সুরটি বাঁধিয়া দেয় তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই বলিয়াছেন—

"হাস্য শুধু আমার সখা
অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য করে অর্ধ জীবন
করেছি তো অপচয়।
চলে যাবে সুখের রাজ্য
দুঃখের রাজ্য নেমে আয়
গলা ধরে কাঁদতে শিখি
গভীর সমবেদনায়।"

সহ্যগুণ ব্যতীত জগতে কোন কীর্তিই অর্জিত হইতে পারে না। যে যত উন্নতি করিয়াছে তাহাকে ততই দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, বাধা-বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

ইতিহাসের দৃষ্টান্ত

দুঃখের ফল বড় মধুর। সেই মধুর ফল আস্বাদ করিতে হইলে কণ্টকে পদ ক্ষতবিক্ষত হয়, দুঃখ-হতাশা মনকে বিদীর্ণ করে, বিপদ-বাধার সহিত ঘর্মাক্ত সংগ্রাম চালাইতে হয়। বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য—অনন্ত দুঃখের বারিধি সন্তরণ করিয়া মানুষের জন্য অমৃতের সন্ধান করিয়াছেন। খৃষ্ট ও গান্ধী আপন প্রাণের অধিক দেশবাসীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণ দিয়াছেন। তাই আজ তাঁহারা জগতের নমস্য। নেতাজী সুভাষ দুঃখ-বিপদকে হাসিমুখে বরণ করিয়া অনন্ত কষ্ট সহ্য করিয়া স্বদেশের মুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনে যখন এত কষ্ট করিতে হইয়াছে তবে আমরা তো কোন্ ছার!

জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ধৈর্যের প্রয়োজন

আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজন। সংসারে পাঁচজনকে লইয়া চলিতে হয়। সেখানে সহনশীলতা না থাকিলে সংসার অরণ্যে পরিণত হয়। পরিজনদের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব পোষণ না করিলে সংসারে শান্তির লেশমাত্র থাকে না। পাঠ্যাবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতা না থাকিলে বিদ্যার্জন হয় না।

বর্তমান সমাজের সর্বত্র জনগণের মনে নিত্য অসহিষ্ণুতা ও বিক্ষোভ। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, দেশনেতাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সরকারী ব্যবস্থায় অসহিষ্ণুতা আমাদের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। সমাজের সর্বসাধারণের কল্যাণ সরকারের লক্ষ্য! সেখানে শুধু নিজের কল্যাণ ছাড়া যাহারা আর কিছুকেই আমল দেন না তাঁহারা সমাজের শত্রু—অসামাজিক। এরূপ অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেন—সমাজকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যায়। ইহাদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয় না।

অসহিষ্ণুতা অসামাজিকতা প্রবৃত্তি

জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকিতে হইলে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। গান্ধীজির নিরস্ত্র প্রতিরোধ. অহিংস সংগ্রাম এই সহিষ্ণুতারই পরাকাষ্ঠা। তাঁহার অহিংস সংগ্রাম জাতিকে রক্ষা করিয়াছে—মহাশক্তিতে শক্তিমান করিয়াছে। অধৈর্য, অসহিষ্ণু হইয়া জাতি যদি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইত তাহা হইলে এই দেশ ধ্বংস হইত, এক-জাতীয়তার ভাব সুন্দরভাবে গঠিত হইত না। ইংরেজ জাতি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। গত মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে ইংরাজ অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়াও সহিষ্ণুতার বলে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছিল। পরাজয়ের গ্লানি তাহাদের অন্তরের দৃঢ়তাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। অসহিষ্ণু জার্মানজাতি বারেবারেই আপন অসহিষ্ণুতার জন্য পরাজিত হইয়াছে।

সহিষ্ণুতা জাতির একটি মহৎ গুণ

দুঃখ, বিপদ, বাধা বিধাতার আশীর্বাদ। ইহারা আছে বলিয়া সাহসীর বুক দুর্জয় আশায় দুলিয়া উঠে। ইহাদের উত্তীর্ণ হইয়া সাহসী জয়মাল্য লাভ করে। এ ধরাপৃষ্ঠ হইতে কেহই একেবারে বিলুপ্ত হইতে চাহে না। জগতে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিতে সকলেরই বাসনা হয়। কিন্তু সেজন্য সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা সহিষ্ণুতার সাধনা। যে সাধক সংগ্রামী, বিপদ ও বাধায় তাহার উৎসাহ বাড়িবারই কথা—

উপসংহার

বিপদ আছে, জানি বাধা আছে
তাই জেনে ত' বক্ষে পরাণ নাচে"—

সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদ আমি সইতে পারি এমনি যেন হয়।
দুঃখ তাপ ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ তাপ বহিতে পারি এমনি যেন হয়।"

বন্যা

জলের অপর নাম "জীবন"। জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অথচ এমনই প্রকৃতির পরিহাস যে, এই জলই আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়। অতিবৃষ্টির ফলে নদীর জলরাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া দেশ ও জনপদ প্লাবিত করিয়া মনুষ্য, জীবজন্তু ও শস্যাদির হানি করে। নদী যখন দুই তীরের বাঁধন অগ্রাহ্য করিয়া দুকূলপ্লাবী হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ভূখণ্ড জলমগ্ন করিয়া মৃত্যুর করাল বিভীষিকায় দেশ ছাইয়া ফেলে, তখন আমরা তাহাকে বলি বন্যা। প্রকৃতির অজস্র উচ্ছ্বাসপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর রূপ—ভীমনাদী তরঙ্গ-সংঘাত, সুদূরবিস্তারী অনন্ত জলরাশি—সকল সীমা-অবলোপকারী সর্বনাশা মূর্তি দেখিলে কাহার না প্রাণে ভয় হয়?

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বন্যা হয় অতিবৃষ্টির ফলে। অধিক বৃষ্টি হইলে জলরাশি উন্মাদের ন্যায় বেগে নদীখাত দিয়া বহিয়া যাইবার সময়ে তট প্লাবিত করিয়া উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যায়—কখনও কখনও বাঁধ ভাঙিয়া, বিপুল বিক্রমে জলরাশি গ্রাম-জনপদ ডুবাইয়া দেয়। অত্যধিক জলের চাপে স্রোত ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে এবং আপন খেয়াল-খুসীমত 'আকুল পাগল পারা' ছুটিয়া যায়। নদীর গতিপথ সহসা জলের বেগে পরিবর্তিত হইয়া জনপদের প্রভূত ক্ষতি করিয়া বসে। নদীর জল-প্রবাহ কোনও কারণে ব্যাহত হইলেই বন্যা হয়। পুল তৈয়ারী, নদীগর্ভে বালী ইত্যাদি পুঞ্জীভূত হওয়া এবং দুই তটের রক্ষণ-ক্ষমতা ক্ষীণ বা দুর্বল হওয়ার ফলেই বন্যা, প্লাবন বা জলোচ্ছ্বাস ঘটে।

বন্যার কারণ

বন্যার বিধ্বংসী-রূপ একদিকে যেমন আমাদের মনে ভয়ের বিভীষিকা জাগায় অন্যদিকে প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কত অসহায় সেই বোধও জাগায়। বন্যায় চতুর্দিকে

বন্যার ভয়ঙ্কর রূপ

কেবল জল আর জল—ঘোলা জলের স্রোত ও আলোড়নের কল্ কল্ শব্দ—কবির ভাষায়

—"জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ, চিক্কণ, কৃষ্ণ, কুটিল, নিঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্বা সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।"

সে উন্মাদ জলস্রোতের মুখে মানুষের সাজানো গ্রামগুলি নিমজ্জিত হয়—মৃত্তিকার ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া, পাকাবাড়ী ডুবাইয়া, ক্ষেত-খামার প্লাবিত করিয়া, গবাদি পশুর ও মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়া সে জলস্রোত চতুর্দিকে হাহাকার সৃষ্টি করে। বন্যার জল চলিয়া গেলেও নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, দেশে খাদ্যাভাব ঘটে এবং অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া লোক মারা যায়। সহসা জলোচ্ছ্বাসে আকুল মানবের ক্রন্দন ও আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং সম্পদরক্ষার জন্য বিশৃঙ্খল ব্যস্ততা ও হাহাকারের চিত্র কল্পনাতেই যেন মনের বেদনার বীণায় বড় মর্মান্তিকভাবে বাজিতে থাকে। কত সন্তান মাতৃপিতৃহীন, কত মাতা-পিতা সন্তানহারা হয়। অর্ধমগ্ন গ্রামে গৃহের চাল আশ্রয় করিয়া, কোথাওবা বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়াস প্রাণে করুণার স্রোত বহায়।

সহসা যেমন বন্যার প্রকোপ বাড়ে, তেমনি জল সহসা কমে না—ধীরে ধীরে জল কমে। তখন গ্রাম জাগে। কিন্তু কী সে ভয়ঙ্কর কদর্য কুশ্রীতা লইয়া গ্রাম জাগে। সুন্দর

বন্যান্তে বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানের অবস্থা

পুরুষের গলিত শব দেখিলে প্রাণে যে আতঙ্ক জাগে, বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রাম দেখিলে তেমনই ভয়ের সঞ্চার হয়। সবই বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, নষ্ট, কদর্য রূপ ধারণ করে। গৃহ পড়িয়া গিয়াছে—মৃত্তিকা জলের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। গৃহের আর সে শ্রী নাই—গ্রামের সে

সাজানো সৌন্দর্য নাই। শস্যক্ষেত্রে স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে, বাগানে গাছপালা ছিন্নমূল, শাখাপ্রশাখা ভগ্ন—মন্দিরের বিগ্রহ বেড়িয়া জঞ্জালের স্তূপ—গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুরের মৃতদেহ—মানুষের পচা শব, গৃহের আসবাব-পত্র ইতস্ততঃ জল-কাদা মাখা অবস্থায় পতিত। ছিন্নবস্ত্র, জলকাদা মাখা বুভুক্ষু নরনারীর মর্মন্তুদ হাহাকার—কে কাহাকে সান্ত্বনা দেয় তাহার স্থিরতা নাই।

বন্যায় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অঞ্চলের প্রতি দেশের সমবেদনা জাগে। মানুষ সামাজিক জীব—তাই এই দুর্বিপাকে তাহার কর্তব্যবোধ জাগে। সাহায্য করিবার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকদল বিধ্বস্ত অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। রাষ্ট্র এই আর্তদের ত্রাণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ এবং সাহায্যকারী দল বন্যা-বিধ্বস্ত সকল অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই সকল লোকের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে খয়রাতি দিতে হয়। সমস্ত অঞ্চলের অবস্থা স্বাভাবিক না হাওয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশের বদান্যতার হস্ত প্রসারিত রাখাই কর্তব্য। এই সময়ে দেশের দানশীল লোকেরা মুক্তহস্তে দান করেন, মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা বিপন্নের সাহায্যের জন্য ঐ অঞ্চলে ধাবিত হন, কেহ বা ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতে থাকেন—সমাজের কল্যাণবৃত্তি জাগিলে ঐ অঞ্চল রক্ষা পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র সাময়িক সাহায্য দিয়া কর্তব্য শেষ করেন, কিন্তু ঐ অঞ্চলের পুনর্বাসন সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সংস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না। তা ছাড়া বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারের কর্তব্য থাকিয়া যায় এবং এজন্য স্থায়ী সুদৃঢ় বাঁধ নির্মাণ করাও সরকারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বন্যায় সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য

সৃষ্টি ও ধ্বংস যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। ধ্বংসের পর তাই নবসৃষ্টির সূচনা দেখা দেয়। পুরাতনের ধ্বংস হয় আবার নূতনের ভিত্তি পত্তনও হয়। পুরাতন ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া মানুষ আবার নূতন উদ্যমে নব পরিকল্পনায় ঘর-দ্বার বাঁধে—গ্রাম গড়িয়া তোলে। বন্যার জলে অজস্র পলিমাটি বিধ্বস্ত অঞ্চলের উর্বরতা শক্তি বর্ধিত করে। প্রকৃতি মানুষের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার পরিপূরণ স্বরূপ প্রচুর শস্য দান করে। সমূহ ধ্বংসের ফলে মানুষের মনেরও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। সকলে সকলের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব লইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় আবার নতুন সংসার সাজায়।

বন্যার কল্যাণকর রূপ

পরস্পর যে কত নিকট আত্মীয় তাহা তাহারা যেন এই বিধ্বংসী বন্যা হইতে শিক্ষালাভ করে। ভগবান মানুষকে নানা দুঃখ ও বিপদ দিয়া যেন পরীক্ষা করেন—কবির দৃষ্টিতে—

"নয়ক এ বান্—আজ ভগবান বাংলা জুড়ে দেশটাকে
ভাসিয়ে দিয়ে দেখ্ছে তাদের আত্মবোধের চেষ্টাকে।....
দেশের যদি আত্মা কাঁদে, খোদা কাঁদেন সঙ্গে তার,
প্রলয় জলে বিশ্ব ভাসে, বজ্রে জগৎ ভস্ম-সার!"

দুর্ভিক্ষ

অজন্মা বা শস্যহানি হেতু দেশে খাদ্যাভাব হইলে লোকের দুর্দশার অবধি থাকে না। ঘরে ঘরে তখন অভাব, ঘরে ঘরে তখন অনাহার। সে সময়ে কাহারও বাড়ীতে হাত পাতিয়া কিছু পাইবার উপায় থাকে না। ভিক্ষাও মেলে না; এমন অবস্থা হয় বলিয়া উহাকে বলে দুর্ভিক্ষ। অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি হইতে পারে, অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা হইতে পারে, আবার মানুষের দুর্বুদ্ধির ফলেও বিদেশে শস্যচালান হইয়া দেশে শস্যাভাব দেখা দিতে পারে। তাহাতেও দুর্ভিক্ষ হয়।

সংজ্ঞা

১১৭৬ সালে বাংলা দেশে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের নাম **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'**। ইহাতে বহুলোকের প্রাণহানি হইয়াছিল। আবার ১৩৫০ সালে আর একটি দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ ভয়াবহতা ও প্রাণহানির দিক দিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সকল বিভীষিকাময়ী কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া সভ্য সমাজের বুকের উপর করাল নৃত্য করিয়া চলিয়া যায়।

বাংলার দুইটি বড় দুর্ভিক্ষ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক মর্মন্তুদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "পূর্ব বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, যাহা হইয়াছিল তাহা রাজপুরুষেরা বলপূর্বক লইয়া গেল। সে বৎসর ফসল হইল না, জলের অভাবে ধানগাছ শুকাইয়া খড় হইয়া গেল। লোকে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যাহারা সমৃদ্ধ, তাহারা কিছুকাল যুঝিয়া অবশেষে অবস্থা খারাপ দেখিয়া স্থানান্তরে পালাইল। দেশে

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিবরণ

আর কণামাত্র তণ্ডুল অবশিষ্ট নাই। প্রথমটা লোকে ভিক্ষা করিতেছিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল ....তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল....গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে লাগিল....অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। দেশের চিত্রটি বড় ভয়াবহ। দোকান আছে দোকানী নাই, গৃহ আছে অধিবাসী নাই, স্নানের ঘাট আছে স্নানার্থী নাই—হাটে-বাজারে বাজার বসে না, পথে লোক চলে না। ঘরে ঘরে মৃতদেহ পচিয়া উঠে, সৎকার করিবার লোক নাই।"

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য প্রকৃতিই বহুলাংশে দাযী। তা'ছাড়া তখন দেশে রাজশক্তি তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। মানুষের সামাজিক অবস্থা উন্নত ধরনের ছিল না। দুর্ভিক্ষ

কেন এই দুর্ভিক্ষ ঘটে

প্রতিরোধের মত সামাজিক বুদ্ধি সংহত করা তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল। যানবাহন-ব্যবস্থা এমন ছিল না যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে সত্বর খাদ্যশস্য ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে সহসা যে আকস্মিক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিযাছিল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভযাবহতায ছিয়াত্তরের মন্বন্তবের অপেক্ষা অনেক বেশী। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের ভযাল ধ্বংসকেও ম্লান করিযা দিল। সহসা যাদুকরের ময়াদণ্ডস্পর্শে দেশের খাদ্যভাণ্ডাব শূন্য হইযা গেল। গ্রামে গ্রামে লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। দেশে থাকে কাহার সাধ্য? পেটের জ্বালা উপশমের যে কোন উপায়

পঞ্চাশের মন্বন্তর

সেখানে নাই! কচুসিদ্ধ, গাছের পাতার ঘণ্ট, অখাদ্য ফল, অখাদ্য মূল, মানুষ কতদিন খাইতে পারে! দলে দলে লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া খাদ্যান্বেষণে শহব, গঞ্জ ইত্যাদির দিকে পাড়ি দিল। শহরে কিছু কিছু খাদ্য মেলে—কিন্তু এক গৃহস্থ কযজনকে ভিক্ষা দিবে—রাজপথ কঙ্কালসার নর-নারীতে ভরিযা গেল। অলিতে-গলিতে লোকের দোরে-দোরে আর্তের হাহাকার, "ফ্যান দাও—দুটি ভাত দাও গো—" শব্দে বাতাসও বুঝি মন্থর হইয়া উঠিল। গৃহস্থেরা খাদ্য দিবে কি নিজেদেরই অবস্থা সঙ্কটজনক—চাউলের দর অগ্নিমূল্য—সহজে পাওয়া যায় না। পথে পথে মৃতদেহ, মৃত জননীব শুষ্ক স্তন আঁকড়াইয়া কঙ্কালসার সন্তান ধুঁকিতেছে। এখানে-ওখানে মৃত ও মুমূর্ষুর দেহ। মুখে জল দিবার কেহই নাই।

যদি বা লঙ্গরখানার দোর খোলে—বজরা ও চাউলের সে খিচুড়ি অনাহারক্লিষ্ট নরনারী জন্মশোধের মত খাইয়া মরে—রোগ দেখা দিল। যাহারা শহরে বাঁচিবার আশায় আসিয়াছিল, তাহারা বড বেশী দুর্ভিক্ষের ধোপে টিকিল না। যাহারা গ্রাম আঁকড়াইয়া ছিল তাহারাও মরিল। প্রাচুর্যের মাঝখানে এই অনাহারে মৃত্যু বিংশ শতাব্দীর এক কলঙ্কময় অধ্যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণ বলি হইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর শুধু যে দরিদ্র গ্রামবাসীর উপর দিয়া বহিয়া গেল তাহা নহে, মধ্যবিত্ত সমাজেও ইহা এক ঝটিকার ন্যায় বিপর্যয় আনিযা দিল। অন্নসঙ্কট সমাধানে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুর্নীতি ও কালোবাজারের পথে বহু লোক নামিয়া গেল। দুর্নীতির অন্ধকার অতলে মানুষ পশু হইয়া শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি-ভার বহন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ

কৃষি ব্যবস্থার শোচনীয অবনতির ফলে এবং ভূমি সেচ ব্যবস্থার অবহেলায় কৃষকগণ কিছুকাল যাবৎ ক্রমশঃ হীনাবস্থায পতিত হইতেছিল। তাহার উপর বাংলায় বন্যা ও প্লাবন আছে, মরামারী আছে। ইহার উপর ১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালে বাংলার অনেকাংশে ভাল ফসল ফলে নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার বহু গ্রাম অধিকার করিয়া চাষ বন্ধের হুকুম জারি করেন এবং সৈন্যদের জন্য প্রভূত শস্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তাহার উপর ব্যবসায়ীরা সহসা বাজারে নামিয়া চাউল-ধান সংগ্রহ করিয়া গোপনে গুদামজাত করিয়া ফেলিল। চাউলের দর অসম্ভব রকম বাড়িয়া চলিল—বাজারে চাউল মিলে না, এমন অবস্থা হইল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে সরকার গ্রামাঞ্চলে নৌকাগুলি আটক করিয়া ধ্বংস করিলেন। ফলে নদী বা জলপথে খাদ্য আমদানীর পথ রুদ্ধ হইল। শহরে কণ্ট্রোলের দোকানে সরকারী যে বরাদ্দের ব্যবস্থা হইল তাহাতে কাহারও চলে না—যাহার টাকা আছে সে চোরা-বাজারে চাউল খোঁজে। চোরা বাজারে দেশ ছাইয়া গেল। জনসাধারণ যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে তাহারও উপায় নাই—সরকার ঘোষণা করিল যে, দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য আছে—এই মিথ্যা স্তোকে বিভ্রান্ত হইয়া লোকের যাহা মজুত ছিল তাহাও তাবা রক্ষা করিতে পারিল না, আগামী বিপৎপাতের জন্য প্রস্তুতও হইতে পারিল না। মুনাফালোভী পিশাচ প্রকৃতির ব্যবসাযীরা একদিকে—অপরদিকে দুর্নীতিপরায়ণ অর্থগৃধ্নু সরকাবী কর্মচারিগণ—এই উভযে মিলিযা বাংলা দেশকে শুধু শ্মশান করিল না, বাঙ্গালীরা মনঃকে পর্যন্ত দুর্নীতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল

বিপদ না আসিলে, দুঃখের কশাঘাত না খাইলে কি ব্যক্তির, কি সমাজের কাহারও চৈতন্য হয় না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে বাঙ্গালীর শুভবুদ্ধি ও সেবাপরায়ণতা বৃত্তিও যে জাগে নাই এমন নহে। সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেন বটে, তবে প্রাণহানি রোধ করিতে পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি আর্তত্রাণের কাজে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িলেন। বিদেশ হইতেও প্রচুর খাদ্যশস্য আসিতে লাগিল। বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, ঔষধ বিতরণ, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি করিয়া সেই দুর্দিনে বাঙালী জানাইয়া দিল যে সে মরে নাই। কিন্তু এতবড় একটা বিপর্যয় বাংলা দেশকে অনেকটা পঙ্গু করিয়া দিয়া গেল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে মানুষের সেবাপরায়ণতা

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বাঙালীকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়া গেল। খাদ্যসঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, তাহা বাঙালী আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিল। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি এবং খাদ্য অপচয় ও রপ্তানি বন্ধ করা সম্বন্ধে সকলে সচেতন হইল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় এ সমস্যা আজ জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে এরূপ অনর্থপাত যাহাতে আর না ঘটে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। দুর্ভিক্ষ মানুষে মানুষে বিভেদ অনেকটা ঘুচাইয়া দিয়াছে। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা কবি এই সর্বনাশকর অবস্থার যে চিত্র তাঁহার কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।—তাহা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে—

দুর্ভিক্ষের শিক্ষা

"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে'
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।"

আজ স্বাধীন ভারতে যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়াছে, এ শুধু ঐ পঞ্চাশের মন্বন্তরের শিক্ষা। আজ গ্রামবাসী কৃষক আর অবহেলিত নয়। সে জাতির অন্নদাতা হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কৃষিকার্য আর এখন অবহেলিত নয়—অন্ন উৎপন্ন করা যে এক মহা-পবিত্র কার্য তাহা এই দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। আজ সকলে মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে—গ্রাম না বাঁচিলে শহর বাচে না, কৃষক না বাঁচিলে বাবুদের বাবুত্ব লোপ পায়।

ভূমিকম্প

বন্যা যেমন প্রকৃতির এক ভয়াল ভ্রূকুটি, ভূমিকম্প তেমনই প্রকৃতির এক আকস্মিক আক্রমণ। বন্যা, ঝটিকা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মানুষের উপর সহসা আসিয়া পড়ে এবং মানুষকে বিপর্যস্ত করে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ ইহাদের সহিত তবু কিছুক্ষণ জুঝিতে পারে—সর্বনাশ এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারে—অন্ততঃ চেষ্টা করার মত কিছু সময় পায়; কিন্তু ভূমিকম্প সহসা মুহূর্তেই দেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিযা যায়। সেই সর্বনাশকর উৎপাতের মধ্যে মানুষের আত্মত্রাণের কোনই সুযোগ থাকে না। দুর্ভিক্ষ-মহামারী ক্রমশঃ প্রকট হয়। বন্যার পূর্বে মানুষ কিছুটা বুঝিতে পারে বা তাহা প্রতিরোধের উপায় কিছুটা মানুষের হাতে থাকে, স্থায়ী ব্যবস্থা হইলে তাহা নিবারিত হইতে পারে কিন্তু ভূমিকম্পের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কোনরূপ সতর্কতার সুযোগ নাই। বিজ্ঞান উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিলেও মাত্র ভূমিকম্প কালে জানিতে পারে, যে অমুক স্থানে ভূমিকম্প ঘটিতেছে। কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারাই তাহার আবির্ভাবের সময় পূর্বাহ্নে জানিবার কোন উপায় নাই।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পৃথিবীর জঠরে আছে অগ্নিময় পদার্থ—ইহা নিরন্তর টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। ইহার উপরিভাগে নানা পাথর, মাটি, জল ইত্যাদি থাকে। কোন কারণে উপরিতলস্থ জলবাশি এই অগ্নিময তরল পদার্থমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ধূম ও বাষ্প সৃষ্টি করিয়া সেই তরল পদার্থ ঊর্ধ্বে প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হইযা পৃথিবীর নানা স্তরের মৃত্তিকাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া প্রলয়কম্পনে আপনাকে মুক্ত করে। সেই সময়ে ভূপৃষ্ঠ ভীষণবেগে কম্পিত হইয়া উঠে। জলরাশি বেশী পরিমাণে পড়িলে ভূপৃষ্ঠ বসিয়া গিয়া গর্ত হইয়া যায় বা ভিতরের জল বাহির হইয়া আসে বা ভূপৃষ্ঠের ঘরবাড়ী তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। মতান্তরে পৃথিবীর ভিতরকার তলগুলির কোন একটি যদি ধ্বসিয়া পড়ে তবে ভূপৃষ্ঠে কম্পন জাগে এবং তাহা ভাঙিয়া চৌচির হয়। অপর একদল বৈজ্ঞানিকের মতে আগ্নেয়গিরিই ভূমিকম্পের কারণ। নিকটে আগ্নেয়গিরি থাকিলে তাহার অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ বা লাভা কোন ছিদ্র না পাইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেই ভূপৃষ্ঠে কম্পন ও নানারূপ বিপর্যয় দেখা দেয়।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্পের প্রলয় নৃত্যে জাপান যত বিপর্যস্ত, এত বোধ হয় আর কোন দেশ নয়। অধুনাকালের মধ্যে বিহারে কয়েক বৎসর পূর্বে এক সর্বধ্বংসী ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে। ধন-প্রাণ হানির দিক দিয়া এত বড় ভূকম্পন পৃথিবীতে খুব কমই হইয়াছে। আসামে কিছুদিন পূর্বে ভূমিকম্প হয়—তাহার ক্ষতিও বড় কম নহে। এছাড়া বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে বেলুচিস্তানের কোয়েটাতে অতি ভয়ানক এক ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। এই সকল ভূমিকম্পের ফলে শহরকে শহর ধ্বংস হইয়াছে, মাটি ফাটিয়া জলস্রোত বাহির হইয়াছে—বহুলোক বাড়ীঘর চাপা পড়িয়া মর্মন্তুদ মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পৃথিবী-খ্যাত কয়েকটি বিরাট ভূমিকম্প

মানুষ আপনার দৈনন্দিন কার্য করিতেছে—অন্য কোনদিকে কোন খেয়াল নাই—শুইয়া আছে—কেহ হাটে বাজারে হাট-বাজার করিতেছে—কেহ বা স্কুলে পড়িতেছে—কলকারখানায় পুরাদমে কাজ চলিতেছে—কৃষক লাঙ্গল দিয়া মাটি চষিতেছে, সহসা মাটি যেন কাঁপিয়া উঠিল—তারপরই কয়েকটি দোলা। কেহ টলিয়া পড়িল, কেহ বা সটান মাটিতে গড়াইয়া পড়িল—কাহারও মাথা ঘুরিল। চারিদিক হইতে শঙ্খ ও ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে লাগিল। লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া খোলা মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল—উপরতলা হইতে মানুষ দৌড়িয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবে, কোথায় যাইবে? ঘরবাড়ী হুড়মুড় করিয়া পড়িতে লাগিল, ছাদ ফাঁক হইল, দেয়াল পড়িতে লাগিল, মাটিতে ফাটল ধরিল, সিঁড়ির মুখ বন্ধ। লোকজন ছোটাছুটি, চেঁচামেচি, চীৎকার, কান্না আরম্ভ করিল। মাটির তলায় গুড়গুড় শব্দ হইতেছে—পৃথিবী গা নাড়া দিতেছে—তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। কয়েক সেকেণ্ডে শহরটি ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে ভগ্ন হস্তপদ লইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল। এ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত হইতে মানুষকে কে রক্ষা করিবে?

ভূমিকম্পনের দৃশ্য

পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর জল স্ফীত হইল—মাটি ফাটিয়া জল ও বালি বাহির হইল। ঘরবাড়ী ফাটিয়া গেল—কোথাও বা মাটি নিম্নে বসিয়া বহু লোকের জীবন্ত কবরের ব্যবস্থা করিল।

যে মানুষ জ্ঞানবলে আজ পৃথিবীর অধীশ্বর—প্রকৃতির পায়েও যে মানুষ শৃঙ্খল পরাইয়াছে—সেই মানুষই আবার নিয়তির সামান্য ভ্রূকুটিতে কত অসহায়, কত

দুর্বল, কত তুচ্ছ। তাহার অমিত বুদ্ধিবল—তাহার অমেয় জ্ঞান—কিছুই তাহাকে প্রকৃতির রুদ্ররোষ হইতে বাঁচাইতে পারে না। সে যে কত দুর্বল, তাহার প্রাণ যে কত ভঙ্গুর, তাহা এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে মানুষের মনে হয়। বোধ হয় ইহা সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের লীলা! মানুষ পাছে তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া যায়, পাছে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, পাছে ভাবে—জড়শক্তি এই বিশ্বের নিয়ন্তা—সেই জন্যই মাঝে মাঝে তিনি ভূমিকম্পের কম্পন পাঠান—পাঠান রুদ্রভৈরব শিবকে তাহার প্রলয় পিণাক বাজাইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া পৃথিবীকে শ্মশান করিয়া ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র মানুষকে সচেতন করিতে। তবুও মানুষ এই ধ্বংসমুখর পৃথিবীর কূলে সুন্দর শহর গড়ে—দেশ গড়ে—সাম্রাজ্য গড়ে—আপনার বিজয় নিশান ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দেয়—কারণ, সে অপরাজেয়—তাহার আশা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। সে হার মানিবে না—বারে বারে ব্যর্থ হইলেও পুনরায় চেষ্টা করিবে। সে সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে অধীর হইয়া বলে—

মানুষ কত তুচ্ছ—কত দুর্বল

"মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে
মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা হারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে,
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!"

দারিদ্র্য

অর্থ পৃথিবীর সকলেরই কাম্য—শুধু কাম্য নয়, পরম আরাধ্য। অর্থ না হইলে পৃথিবীতে মানুষের একদিনও চলে না, ইহা সর্বপ্রকার পার্থিব সুখের বাহন। কথায় বলে—অর্থ দিলে বাঘের দুধ মেলে; অর্থাৎ অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই অর্থ মানুষকে চির-চঞ্চল, চির অশান্ত, চির অতৃপ্ত রাখিয়াছে। যে শত মুদ্রা পাইয়াছে তাহার আকাঙ্ক্ষা সহস্র মুদ্রার, যে সহস্র মুদ্রা পাইয়াছে সে চায় লক্ষ মুদ্রা—তৃষ্ণার সীমা নাই, অনন্ত অতৃপ্তির চক্রে মানুষকে ঘোরাইতেছে। অর্থ যেন স্বর্ণমৃগ— ইহা মানুষ-সীতাকে চিরকাল লুব্ধ ও মুগ্ধ করে।

অর্থ সকলের কাম্য

দারিদ্র্য কাহারও কাম্য নহে। কে এই ভোগের ডালি-সাজানো পৃথিবীতে দরিদ্র হইয়া, সর্বসুখ বঞ্চিত হইয়া অনন্ত অভাবের মধ্যে বাস করিতে চায়? দারিদ্র্য শুধু আমাদের জীবনব্যাপী বিড়ম্বনাই আনে। ইহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সবপ্রকার উপায় নষ্ট করে? সংসারে দারিদ্র্য এক মহা অভিশাপ ছাড়া আর কি?

দারিদ্র্য কেহ চাহে না

অনন্ত ঐশ্বর্যময় পৃথিবীতে মানুষকে ভগবান প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের দুর্বুদ্ধি আজ অধিকাংশ মানুষকে সেই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তাই আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করতলগত। আর বিপুল সংখ্যক লোক চির-দারিদ্র্যের অন্ধকূপে ক্রীতদাসের ন্যায় শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। কে তাহাদের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিবে? তাহারা কি কোন ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারিবে না? কোন্ অধিকারে মুষ্টিমেয় মানুষ তাহাদের এরূপ বঞ্চিত, বুভুক্ষু করিয়া রাখিবে? পৃথিবীর অনন্ত ঐশ্বর্য কি তাহাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই?

দারিদ্র্যের অভিশাপ

"দারিদ্র্য রাশি গুণরাশিনাশী"—দারিদ্র্যে লোকের বহু সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কত কত প্রতিভা দারিদ্র্যের তুহিন শীতল স্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কত মেধাবী ছাত্র দারিদ্র্যের জন্য অধিকদূর পঠন-পাঠনে সমর্থ হয় না। দারিদ্র্য আছে বলিয়া প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজ প্রতিভানুযায়ী কাজে নিযুক্ত না হইয়া অর্থের জন্যই জীবনপাত করিতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি দুইবেলা খাইতে পায় না। পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে না। পুত্র-কন্যাকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। দারিদ্র্যের তাড়নায় মানুষ বহু অন্যায় কর্ম করে, দুর্নীতির পথে ধাবিত হয়। দরিদ্র-ব্যক্তির ধর্মলাভের পথ উন্মুক্ত নহে। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়া ছিলেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" কাজেই দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিক ধনবৈষম্য দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হইলেও আপন আপন-সংসার প্রতি-পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা অনেকাংশে আমাদের দ্বারা সম্ভব। নিরলস চেষ্টা, অধ্যবসায়, মিতব্যয় ইত্যাদি গুণ দ্বারা অনেকেই সংসারের সচ্ছলতা আনিতে পারেন। যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে সামান্য পরিশ্রম করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করে—এমন দৃষ্টান্তও

দারিদ্র্যের কারণ

দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার যে একটা মূল্য আছে—তাহা দিন থাকিতে, সুযোগ থাকিতে অনেকে বুঝে না। এখানে তাহাদের কথা বলা হইতেছে। অমিতব্যযিতা ও আলস্যের জন্য কতশত বর্ধিষ্ণু পরিবার দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া জর্জবিত হইতেছে। সেজন্য সঞ্চযের অভ্যাস করা দরকার। তবে সঞ্চয আবাব যেন রূপণতায পর্য্যবসিত না হয। অনেকে নিজে রূপণতা করিয়া পরের জন্য অর্থ সঞ্চয করিযা যান। অপরে আলস্যে কাল কাটাইবে বলিয়া নিজে পরিশ্রম করিযা সর্বসুখ বঞ্চিত হইযা জীবন কাটাইযা যান। ইহাও একপ্রকার অভিশাপ।

দাবিদ্র্য স্বকৃত দোষে হইতে পারে, আবার সামাজিক ব্যবস্থার ফলেও ঘটে। পরিশ্রমী লোক আছে কিন্তু তাহাবা কাজ পায না—কাজ করিলেও যথেষ্ট মজুরি পায না—শরীবের রক্ত জল করিযা ইহাবা পরের সম্পদ গড়ে। দারিদ্র্যের জন্য সমাজই দাযী—ইহাদের অবস্থা সত্যই শোচনীয—

"রাজপথে তবে চলেছে মোটব, সাগবে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেযে গেল কলে,
বলতো এসব কাহাদেব দান। তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকাব মানে।"

কযেকজনের অর্থগৃধ্নুতার ফলেই সমাজে এই যে বিরাট দরিদ্রের দল সৃষ্টি হইযাছে ইহাদের দারিদ্র্য দূর করা এখনি প্রযোজন—এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবা সকলেরই কর্তব্য। ইহাদের অবহেলা করা সমাজের চরম কৃতঘ্নতা, মহা পাপ।

দারিদ্র্য তাহার তীব্র কশাঘাতে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাইযা তুলে; আমাদের মধ্যে সংগ্রামশীল মনোভাব জাগাইয়া মহৎ কর্মে উৎসাহিত করে। সকল মনুষ্যই দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পেষিত হয় না, কেহ বা বীরের ন্যায় যুদ্ধ কবিযা বরমাল্য লাভ করে। দারিদ্র্য তাহাদের কাছে মহান ত্যাগের অভিধানরূপে বিরাজ করে। দারিদ্র্য মানুষের ভোগ-বিলাসী মনকে অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে চালিত করে—দরিদ্রব্যক্তি জগতের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে—মানুষের প্রকৃত পরিচয় পায়। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীরা

দারিদ্র্য মানবজীবনের শিক্ষক

স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া অকিঞ্চন হইয়া ভগবদারাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের আদর্শ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভস্মাঙ্গভূষণ শিব, তাঁহারা উচ্চস্তরের মানুষ। অর্থই যে জগতে অনর্থের মূল এবং পরমার্থ লাভের পথের বাধা, তাহা উপলব্ধি করিযাই তাঁহারা চির দারিদ্র্য বরণ করেন। তাঁহারা আমাদের নমস্য। আর নমস্য সেইসব লোকোত্তর-চরিত্র পুরুষ—যাঁহারা অনন্ত ঐশ্বর্য পাযে ঠেলিযা মানবের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দরিদ্র বেশ ধারণ করেন—পরের জন্য নিজের সুখ-ঐশ্বর্য অকাতরে বিলাইযা দেন—মানবের দুঃখে যাঁহারা আহারনিদ্রা সুখবিলাস ত্যাগ করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁহার 'দারিদ্র্য' করিতায় নিজ জীবনের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিযাছেন—

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্!
তুমি মোরে দানিযাছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা। —দিযাছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস,
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।

খাদ্যসমস্যা

সমস্যা কণ্টকিত বাংলা দেশ। আহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, কৃষি—সকল ব্যাপারেই বঙ্গদেশে সমস্যা আছে। মহাযুদ্ধের পর স্বাধীন হইয়া এইসব সমস্যাকে জাতীয় সমস্যারূপে গণ্য করিযা ইহাদের স্থাযী প্রতিকারের উপায় চিন্তা করার সময় হইয়াছে। সরকার এবং জনসাধারণ উভয়ে মিলিয়া একযোগে এই সমস্যাগুলি সমাধানে অগ্রসর না হইলে উপায় নাই।

ভূমিকা

খাদ্যসমস্যা অধুনাকালের বাঙালীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। অথচ আমরা যে কাব্যে-সাহিত্যে সুজলা-সুফলা বঙ্গদেশের বিবরণ পড়িয়া আসিতেছি, সে সকল কি কবির কল্পনা

মাত্র ?—না ; তাবা কবিব কল্পনা নয। বাংলা দেশ নদীমাতৃক—নদী মজিযা বাংলার সে উন্নতিও মজিয়াছে—বাঙালী মবিযাছে। সেই হইতেই দেশ ম্যালেরিযাগ্রস্ত, চাষেব অবস্থা অনিশ্চিত—দুর্ভিক্ষ বাংলার নিত্য নৈমিত্তিক অঙ্গ। একাংশে ফসল হইল তো অপরাংশে আজন্মা। পঙ্গপালের উপদ্রব বা পোকার উৎপাতে হযত সব ফসল নষ্ট হইয়া গেল। বিদেশী আমলে বাংলাব ধান্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইত—দেশে দুর্ভিক্ষ হইত—বিদেশের পচা চাউল, ক্ষুদ ইত্যাদি বাংলাব লোককে আহাব কবিতে হইত। বর্তমানে দেশে অত্যধিক জনসংখ্যাব চাপ হওযাতে এবং কৃষিজমিব তদনুপাতে বৃদ্ধি না হওযাতে দেশে পর্যাপ্ত চাউল উৎপন্ন হয না। অথচ লোকে দুই বেলা আহাব না পাইলে কাজ কবিবে কি কবিয়া ? তাই আমাদেব খাদ্যেব ব্যবস্থা কবা সর্বাগ্রে প্রযোজন, উৎপাদন বৃদ্ধি। ঘাটতিব সম্ভাবনা দেখা দিলে সময থাকিতে বিদেশ হইতে আমদানী এবং দেশেব সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে খাদ্য বণ্টন এবং মূল্য যথাসম্ভব সমান বাখা ও খাদ্যে ভেজাল নিবাবণ—খাদ্য সমস্যাব এই সকল দিক সম্বন্ধে ব্যবস্থা কবিতে হইবে।

খাদ্য-সমস্যার স্বরূপ

খাদ্য উৎপাদন যাহাতে বৃদ্ধি হয তাহাব ব্যবস্থা কবিতে হইলে প্রথমে কৃষিযোগ্য সর্ব-প্রকার জমিতে যাহাতে ফসল উৎপাদন কবা যায সে বিষযে লক্ষ্য দিতে হইবে। জমিব সেচ-ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ কবিযা অধিক শস্য ফলাইবার জন্য কৃষকগণকে সার, বীজ, অর্থ ইত্যাদি দিযা সাহায্য করিতে হইবে। জমিব উপব যাহাতে কৃষকের স্বত্ব জন্মে সে বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে—মুনাফাবাজদের মজুর-রূপে চাষ করিলে কৃষকের দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। সেজন্য সরকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ভূমি-সমস্যা সমাধানের পথে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। এখনও বহু সমস্যা রহিয়াছে। টুকরা জমির একত্রীকরণ, যৌথ শস্য-গোলা ইত্যাদির ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রামের খাদ্য সম্বন্ধে সে গ্রামের একটা হিসাব থাকিবে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মিবে। ধান্য উৎপাদন ছাড়া ছোলা, কড়াই, নানারূপ সব্জি চাষ ইত্যাদি দ্বারা কৃষি জমি পুরাপুরি ব্যবহার করিতে হইবে। প্রযোজন স্থলে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে কিছু গমজাত খাদ্য ব্যবহারের অভ্যাস করিলে খাদ্য-সমস্যা আমাদের এত বেশী ব্যতিব্যস্ত করিবে না।

উৎপাদন বৃদ্ধি

উৎপাদন বৃদ্ধির যথোচিত ব্যবস্থার পরেও কোন অঞ্চলে ফসলের পূর্বাভাষ কিরূপ

তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এ বিষয়ে বর্তমানে সরকারী নির্ণয় প্রথা ভ্রমপূর্ণ। সরকারী পরিদর্শকগণ অত্যন্ত অবহেলা ভরে শুধুমাত্র শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া এই পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন। ইহাতেই যত গলদ। বৈদ্য রোগীর নাড়ীর খবর না রাখিলে কি ভাবে চিকিৎসা করিবে? পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষি সমবায় বা সংঘের নিকট ফসলের পূর্বাভাষ যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করিলে ঘাটতি বা উন্নতি সম্বন্ধে সরকার ওয়াকিবহাল হইবেন। তখন ঘাটতির সম্ভাবনা দেখিলে বিদেশ হইতে শস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দেশবাসীকে তণ্ডুলজাত দ্রব্য কম ব্যবহার দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবে। অবস্থা বুঝিয়া দেশময় যাহাতে খাদ্য বণ্টনে কোনরূপ মুনাফাখোরের চক্রে পড়িতে না হয় তাহার ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে। ঘাটতি অঞ্চলের ঘাটতি উদ্বৃত্ত অঞ্চলের তণ্ডুল দ্বারা পূরণ করিয়া দেশময় খাদ্য মূল্যের সমতা বিধান করিতে হইবে। খাদ্য লইয়া ব্যবসায়ীদের পৈশাচিক মুনাফাবৃত্তি নির্মম হস্তে দমন করিতে হইবে এবং ত্রুটিহীন মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে।

খাদ্য বণ্টন

খাদ্য দ্বারা আমরা জঠর জ্বালা নিবারণ করি—এই খাদ্য আমাদের দৈহিক পুষ্টি সাধন করে। কাজ করিতে হইলে, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য গ্রহণ না করিলে চলে না। ইঞ্জিনে যেমন কয়লা দিলে ইঞ্জিনে বাষ্প তৈরী হইয়া ইঞ্জিন চালায়, আমাদের দেহও তেমন খাদ্যরস পাইয়া তবেই কর্ম করে। খাদ্যে যদি পুষ্টিকর সার বস্তু না থাকে, তবে তাহাদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে কিরূপে? বর্তমানে অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল দিয়া আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। এই খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার ব্যবসা এত দূর বিস্তৃত হইয়াছে যে নির্ভেজাল খাদ্য সংগ্রহ করা সত্যই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে এই সব ভেজাল খাদ্য খাইয়া আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। এই ভেজাল নিবারণের জন্য কঠোর আইন হওয়া প্রয়োজন। জাতির স্বাস্থ্যহানির জন্য যাহারা দায়ী তাহারা জনসাধারণের শত্রু। তাহাদের নির্মমভাবে দমন করাও খাদ্য সমস্যা সমাধানের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তেল, ঘি, আটা, ময়দা, মাখন, দুধ—কোন দ্রব্যই আজ খাঁটি মিলে না—চাউলে পর্যন্ত কাঁকর মিশাইয়া এই সব অসাধু ব্যবসায়ীরা আজ জাতির পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল

শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের এই সব সমস্যা সমাধান হইবার আশা অল্প। জাতীয় সরকারের শুভ প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা দ্বারা কার্য-করী করিতে হইবে। অধিক শস্য উৎপাদনের আন্দোলন করিতে হইবে। মুনাফাবাজির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে হইবে, খাদ্য-অপচয় বন্ধ করিতে হইবে, পরস্পরের স্বার্থ বুঝিয়া যাহাতে আমরা নিজেরা নিজেদের শত্রু না হইযা উঠি সেজন্য নৈতিকবোধ জাগ্রত করিতে হইবে এবং শেষ অস্ত্র হিসাবে সরকারকে নির্মমতম আইনদ্বারা দেশের শত্রুদের শাসন করিতে হইবে। তবেই দেশেব খাদ্য সমস্যাব সুষ্ঠু সমাধান হইবে।

সামাজিক শুভবুদ্ধির প্রয়োজন

বেকার সমস্যা

যাহারা কর্মশক্তি ও কুশলতা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংগ্রহ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেকার বলে। বেকার অবস্থায় কাল যাপন করা মানুষের একটি অভিশপ্ত অবস্থা। কাজ সংগ্রহ করিয়া লওযার চেষ্টা যাহাদের নাই, এখানে তাহাদের কথা বলা হইতেছে না। যাহারা কাজ করিবার যোগ্যতায় কোন অংশে হীন নয় অথচ শত চেষ্টাতেও কাজ জুটাইতে পারে না, তাহাদের কথাই এখানে বলা হইতেছে।

বেকার কাহাদের বলে ?

আদিম অবস্থায় প্রত্যেক মানুষকেই স্বাবলম্বী হইয়া নিজের আহারের সংস্থান করিতে হইত। এই অবস্থায় মানুষের অবস্থা ছিল অনিশ্চিয়তা। এই অনিশ্চিয়তার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মানুষ স্থায়ী সমাজ গড়িল। কর্ম বিভাগ করিয়া তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় দ্বারা আপনাদের অভাবসকল পূরণ করিয়া লইত। তাহার ফলে কতক লোককে অপরের কার্যে সাহায্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইত। এইভাবে অপরের কর্মে সহায়ক একশ্রেণীর সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণীর লোকেরাই পরের চাকুরি-জীবী বা মজুর শ্রেণীতে পরিণত হইল। সমাজে ধনসঞ্চয়ের ফলেও একশ্রেণীর লোক ধনিক, অপর শ্রেণী তাহাদের কাজকর্মে, ব্যবসায়, কারখানায় সাহায্যকারী হইল

বেকার সমস্যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ফল

উঠিল। এই ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে সমাজের একটি বিরাট অংশকে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতে হইল। তাহাদের পেশা হইয়া দাঁড়াইল চাকুরি করা বা অপরের অধীনে মাহিনা বা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করা।

বেকার সমস্যার স্বরূপ

বর্তমানে বাঙালী সমাজে বেকার সমস্যা ভয়াবহরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে বহুলোকে যুদ্ধের নানাকর্মে লাগিয়া পড়ায় এই সমস্যা কিছুদিন চাপা ছিল। এক্ষণে তাহা আবার ভীষণভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিতের যে দশা অশিক্ষিতেরও সেই দশা—কর্মী আছে, কর্ম নাই,—ক্ষুধা আছে, অন্ন নাই। শত শত পরিবার অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তিলে তিলে মরিতেছে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা যাহোক পরের ক্ষেত-খামারে মজুরী করিয়া কোনরূপে বৎসরের কয়েক মাস কাটায়—বাকী সময় তাহাদের পক্ষে অনাহার—নয়ত অর্ধাহার। শিক্ষিতদের কায়িক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা নাই—শহরে বহু নিষ্কর্মার ভীড়—কে কাহাকে কাজ দিবে? শিক্ষিত বেকার ক্রমশঃ নৈতিক অধঃপতনের ধাপে ধাপে নামিতেছে। বাঙালী পরিবারগুলি বিশেষতঃ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়।

সমস্যা এরূপ ভয়াবহ হইবার কারণ

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙলা দেশের আর্থিক বুনিয়াদ ইংরেজ ধ্বংস করিয়া দেয়। এদেশে আসিয়া তাহারা দেখিল যে বিলাত হইতে ইংরেজ কর্মচারী আমদানী করিয়া এদেশ শাসন করা বা এদেশের কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ এদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের কাজে নিযুক্ত করিলে মজুরী যৎসামান্য দিলেই চলে। তাহাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য শত শত কর্মচারী তাহাদের প্রয়োজন। সেইজন্য তাহারা তাহাদের কার্য করিবার উপযোগী একটি শিক্ষিতশ্রেণী গঠনে মন দিল। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে সামান্য ইংরেজী শিখিতে পারিলেই একটি চাকুরী জুটিয়া যায়। যুবকগণ দলে দলে এ শিক্ষার গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলিল। ক্রমশঃ এই সহজ শিক্ষার ফলে দেশে এত শিক্ষিত লোক হইয়া গেল যে ইংরেজের ব্যবসায়ে বা কাজকর্মে এত অধিক সংখ্যক লোকের চাকুরী মেলা দুষ্কর। তখনই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিল। অথচ ইতোমধ্যে সকলেই চাকুরীর মোহে এতদূর মোহগ্রস্ত যে—যে বাপদাদার জাতকর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। কুটিরশিল্প যন্ত্রশিল্পের কাছে হার

মানিয়া সমূলে উহা ধ্বংস হইয়াছে। স্বাধীন জীবিকানির্বাহের কথা বহুদিন বিস্মৃত হওয়ায় এখন আর বড় বাঙালী সে সব কাজ করিতে পারে না। গ্রাম্য জীবনের মধ্যেও চাকুরির মোহ প্রবেশ করায় অধিকাংশ পরিবার বিলাসী হইয়া কৃষিকর্ম ত্যাগ করিয়াছিল। এখন আর সে পিছনে ফেলিয়া আসা অবস্থায় ফিরিতেও পারে না। সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সহিত শিক্ষিত অশিক্ষিত কেহই আপনাদের খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। এক্ষেত্রে একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত জাতির মুক্তি নাই।

ডিগ্রীধারী বেকার সমস্যা সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। কেন এমন হইতেছে? ইহার জন্য যে বর্তমান শিক্ষার একটা বড় গলদই দায়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। যে শিক্ষা আমাদের অন্নসংস্থানের সাহায্য করে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয। দেশজোড়া কর্মযজ্ঞে এই ডিগ্রীধারী কোনকর্মই করিতে শিখে নাই—কৃষিকে সে হেয় মনে করে। ব্যবসাদারী তাহার নিকট হীন কর্ম, কোন পেশাকেই সে পছন্দ করে না—তাহার কাম্য কেবল একটি চাকুরী—অপরের নির্দেশে শুধু কলমবাজী—নকল করার কাজ। "মাছিমারা কেরাণী"র পদই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ইহারা বিলাসী, কল্পনাজীবী, অকর্মণ্য, স্বাস্থ্যহীন, মানসিক দৃঢ়তাহীন, সহানুভূতিহীন, আত্মম্ভরী ও পরপীড়ক—এক অদ্ভুত শ্রেণীর মনুষ্য। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগাইয়া দেয়—তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে পরমাত্মা বিশ্বাত্মারই অঙ্গ—কাজেই তাহা অমিত শক্তিশালী। মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মশক্তিকে উন্মিলীত করাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু সে শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের শিক্ষা মানুষ-গড়া শিক্ষা নয়, তোতাপাখী তৈয়ারীর শিক্ষা। এই তোতাপাখী পরের বুলি মুখস্থ বলিতে পারে—ইহার নিজের বক্তব্য কিছু নাই। স্বাধীন মনন-চিন্তনে এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি অপারগ। তাহার কর্মশক্তি চিরসুপ্ত, ইহার বিকাশ কোনদিন হয় নাই। এরকম মানুষ দুনিয়ার কেজো লোকের ভীড়ে কাহারও প্রয়োজনে লাগে না। তাই বর্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যে এত বেকার।

আধুনিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিতে হইবে

প্রথমেই চাকুরীর মোহ ত্যাগ করা দরকার। বাংলাদেশের দিকে তাকাইলে দেখা যায় এখানে বহু অবাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করিয়া দুই-হাতে বাংলার ধন আহরণ

করিয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া পরমসুখে বাস করিতেছে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, পার্শি—ইহারা, ত' কৈ চাকরীর উমেদারী করে না! কথা উঠিতে পারে তাহাদের টাকা আছে, তাই টাকায় টাকা আনে। টাকা না হইলে কি কারবার চলে? তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, এই সব বড বড ব্যবসায়ীদের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে দেখা যায় যে ইহারা অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মাড়োয়ারীরা লোটা ও লেংটি সম্বল করিয়া এদেশে আসে, ছাতু খাইয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া সামান্য মূলধন লইয়া ধৈর্য সহকারে ব্যবসা করিয়া ধীরে ধীরে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়। আমরা তাহাদের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, ত্যাগস্বীকার দেখি না,—দেখি মাৎসর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে শুধু তাহাদের দৌলত—ঈর্ষার জ্বালায় তাহাদের নিন্দা করি। কিন্তু তাহাদের অনুসরণ করি না। বাঙালীকে পরের গুণাবলী মানিতে হইবে—সেই গুণাবলীর অনুসরণ করিতে হইবে, তবেই বাঙালীর উন্নতি হইবে। অহেতুক ঘৃণা ও মাৎসর্য ইহাদের গুণ উপলব্ধির পথে বাধা।

সমস্যা সমাধানের পথ
কৃষিকার্য করা

বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর জন লোক কৃষিজীবী। এই কৃষি-কার্য অবহেলা করা এবং সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার ফলেই আমাদের আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বংস হইয়াছে—আমরা আজ অকুলপাথারে ভাসিয়াছি। কৃষিকার্য আবার সুরু করিতে হইবে। শুধু ধান্য চাষ নয়, সকল প্রকার লাভজনক কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহার সহিত হাঁস, মুরগী প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, গো-সেবা ইত্যাদিতে মন দিলে চাকুরীর অধিক উন্নতিলাভ হইবে। বাঙালীর পরিবারগুলি খাইয়া পরিয়া বাঁচিবে—এখনকার মত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দুশ্চিন্তাপূর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে।

কৃষিকার্য করা

দেশে যে সব কুটির শিল্প ছিল সেগুলিকে আবার জীয়াইতে হইবে। তাঁত, ঘানি, ঢেঁকি ছাড়াও মৃৎশিল্প, সূচীশিল্প, শোলার কাজ, মাদুর বোনা, দড়ি বোনা ইত্যাদি শিল্পকর্মে আবার বাঙালীকে নিযুক্ত হইয়া শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রশিল্পও কুটিরশিল্পের ন্যায় সমান অর্থকরী। গেঞ্জী ও মোজা বোনার কল, লোহার

কুটিরশিল্পের
পুন:প্রবর্তন

পেরেক, স্ক্রু তৈয়ারীর কল, কাঠের কাজ ইত্যাদি করিয়া বাঙালী এখনও বেশ সুন্দর-ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে। এত সব পথ খোলা থকিতেও বাঙালী যে কেন্দ্র অফিসের দ্বারে ধর্ণা দেয় তা বাঙালী বোঝে না। তাই আজ বাঙালীরা অপর প্রদেশের অধিবাসীদের করুণার পাত্র।

শিক্ষাকে নূতন ছাঁচে ঢালাই না করিলেও উপায় নাই। গতানুগতিক শিক্ষায় আর বর্তমান যুগে মানুষ তৈয়ারীর আশা অল্প। এই শিক্ষায় যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্থকরী বিদ্যাও শিক্ষা করিতে পারে তাহার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। দেশ এখন স্বাধীন—বর্তমানে দেশে শিল্প ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সেইসব শিল্পের উপযোগী কারিগর চাই, সেইসব শিল্পপরিচালক চাই, সেইসব শিল্প সম্বন্ধে গবেষণাকারী চাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাকে সেইসব দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। তাছাড়া হাতে-কলমে শিল্পকাজ শিখানোর ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহার ফলে যে যাহার কৃতিত্ব অনুযায়ী শিল্প মনোনীত করিয়া তাহাতে দক্ষতা অর্জন করিয়া শিল্প উৎপাদন কাজে নামিয়া পড়িতে পারিবে।

কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বেকার সমস্যা দুর করা সরকারের একটি বড় কাজ। কারণ—বেকার সরকারের শত্রু। ইহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া রাষ্ট্র তরণী বানচাল করিবার শক্তি রাখে—অন্ততঃ অতখানি না পারিলেও দেশে সর্বদা অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত রাখে। আমাদের জাতীয় সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাঙালী জাতির মহৎগুণ এই যে একবার উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে তাহার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই মনে হয় কোণঠাসা, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রপীড়িত, নিষ্পেষিত বাঙালী এবার আরেকবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। সরকারী সাহায্য মুক্তহস্তে প্রসারিত হইলে বাঙালীর বেকার সমস্যা অচিরেই সমাধান হওয়া সম্ভব। সরকারের পরিকল্পনায়, শিক্ষা ও সমাজ-সেবা ব্যবস্থায়, গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনায়, শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনায়, পতিত জমি উদ্ধার-পরিকল্পনায় বহু বেকারের কর্মসংস্থানের উপায় হইবে। তাছাড়া কর্মের নব নব পন্থা প্রদর্শন করিয়া বেকার সমস্যা যাহাতে প্রত্যেকে নিজে নিজেই সমাধান করিয়া লইতে পারে সে বিষয়ে সরকার যথেষ্ট উৎসাহী

সরকারী পরিকল্পনা

বাং

নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার সময় নাই। সকলকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। 'স্বাবলম্বন' শক্তির উপর নির্ভর করিয়া একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া যাইলে আপনার ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া লওয়া যায়। বৃথা মান, অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়া কর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেই দেখা যাইবে অবস্থা এখনও আমাদের আয়ত্তাতীত হইয়া যায় নাই। মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালী মৃত্যুকে জয় করিবে—জীবনযুদ্ধে সে জয়ী হইবে। স্বাবলম্বী বাঙালীদের আদর্শ তাহাদের পথ দেখাইবে।

উপসংহার

বাস্তুহারা পুনর্বাসন-সমস্যা

'বাস্তুহারা' কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহারা ঘরবাড়ি বা বাস্তুভিটা হইতে চ্যুত হইয়াছে। নানা কারণে লোকে বাস্তুভিটাচ্যুত হয়—মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাকের ফলে মানুষ ভিটাচ্যুত হইতে পারে—আবার যুদ্ধের ফলেও মানুষ ঘর-বাড়ি চ্যুত হয়। যুদ্ধে এক দেশের অধিবাসীদের সহিত অপরদেশের অধিবাসীদের বিনিময় হয়—তখন ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া লোকজনদের অপর দেশে যাইতে হয়। কিন্তু আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাহারা ইতিহাসে এক নতুন শ্রেণীর বাস্তুহারা। ইহারা সকলেই একদেশের চিরস্থায়ী অধিবাসী, তথাপি রাষ্ট্রনৈতিক কারণে সেই দেশ অবাস্তব ধর্মীয় ভিত্তিতে দুই ধর্মাবলম্বীর বাসভূমি হিসাবে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে একের অপরের অধ্যুষিত দেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহারা স্বেচ্ছায় নিজ দেশ ভিটামাটি ত্যাগ করে নাই। নিদারুণ হত্যা, গৃহদাহ, অত্যাচার, লুণ্ঠন, নারীহরণ ইত্যাদির ফলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ইহাদের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিতে হইয়াছে।

বাস্তুহারা কাহাদের বলে ?

ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ। বহুকাল এই দুই ধর্মাবলম্বী লোক এদেশে

বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা একই ভাবধারায়, একই সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ। ইহাদের মধ্যে এক জাতিযতায় সৃষ্টি ঐতিহাসিক কারণেই সংঘাটিত হইয়াছে। দেশ ইংরেজদের অধীনে থাকাকালে এই দেশবাসীর মনে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা যখন দেখা দিল—তখন হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন সুরু করিল। কিন্তু চতুর ইংরেজ বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়ে নাই। একশ্রেণীর ধর্মোন্মাদ মুসলমানকে স্বাধীন মুসলমান-রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে বিভোর করিযা দিল এবং রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা দ্বারা সেই বিভেদ ক্রমশঃ সুদৃঢ় করিযা ফেলিল।

দেশবিভাগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ যখন দেখিল যে এদেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যাইবে না, তখন আপন বিভেদ-নীতির চরম ফলস্বরূপ দেশকে হিন্দু-অধ্যুষিত ও মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব পেশ করিল। তখনও জাতির শুভবুদ্ধি একেবারে নষ্ট হয নাই। তখনও অধিকসংখ্যক মুসলমান দেশবিভাগ চাহে নাই—তখনও ঐক্য অসম্ভব হয নাই। এই সন্ধিক্ষণে যখন হিন্দু ও মুসলমান মিলিযা অস্থাযী সরকার গঠন করিযাছে—তখনই ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষিত হইল ১৯৪৬ সালে। এবং তাহার ফলেই দেশে ভয়ঙ্কর হত্যা বিভীষিকা জাগিল। তাহারই মধ্যে দেশ সাম্প্রদাযিক ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল—পাকিস্তান ও ভারত। লোকে আশা করিয়াছিল বুঝি ইহাতে সাম্প্রদাযিক দাঙ্গার প্রশমন হইবে। তখনও পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় নাই। এই বিভাগের ভার ছিল ব্যাড্‌ক্লিফ্‌ সাহেবের উপর। তিনি পাঞ্জাবের বিভাগ সম্বন্ধে উভয় খণ্ডের সীমানা ঘোষণা করিবার পরই পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু দলন সুরু হইয়া গেল। সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষবহ্নি পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিস্তৃত হইযা গেল। নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীনির্যাতন এক নরকের সৃষ্টি করিল এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিযা দেখা দিল হিন্দু-অধ্যুষিত পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীতে। পাকিস্তান মনে করে হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি। তাহারা এই পৃথক জাতিতত্ত্বের যুক্তিতেই দেশ বিভক্ত করিযাছিল, কাজেই এই দাঙ্গার পর পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখগণ দলে দলে পূর্ব পাঞ্জাবে আসিতে লাগিল এবং পূর্ব পাঞ্জাব হইতেও মুসলমানগণ পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে

বাস্তুহারার সৃষ্টি হইল। সর্বভারতীয ভিত্তিতে বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হইল। সিন্ধুর হিন্দুগণ সিন্ধু ত্যাগ করিতে লাগিল। এই বিপর্যযের মধ্যে বিভক্ত বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তানেও বাস্তুত্যাগের হিড়িক দেখা দিল। অন্য সম্প্রদাযের হাতে ধনপ্রাণ নিরাপদ নয় মনে কবিযাই হিন্দুগণ ব্যাপকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিতে লাগিল। উভয রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায যে, ভারত ত্যাগ করিযা যত মুসলমান পাকিস্তানে গিযাছে তদপেক্ষা বহু বহুগুণ বেশি হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করিযা ভারতে আসিযাছে। কাজেই এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এদেশে পুনর্বাসনের সমস্যা বড কম সমস্যা নহে।

কংগ্রেস তৎকালীন সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে দেশ বিভাগের সম্মতি দেওযায় এই উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয সরকারের উপরই পড়ে। পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য-সরকারের সাধ্য ছিল না যে ঐ বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ভার গ্রহণ করে। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জাযগা দখল করিয়া পূর্ব পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসন সমস্যার অনেকটা সমাধান হইল। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদেব নিকটবর্তী দেশীয রাজ্যে পুনর্বসতি করা হইল। দিল্লীতে বহু উদ্বাস্তুকে অস্থাযী তাঁবুতে রাখা হইল এবং কেন্দ্রীয সরকার পূর্ব পাঞ্জাবের সমস্যা কতকটা সমাধান করিযা ফেলিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরকারের আযত্তাধীন হইল না। অফুরন্ত স্রোতে কেবলই বিপন্ন নরনারী ভিটা ত্যাগ করিযা পশ্চিমবঙ্গে আসিতে লাগিল। সরকার "সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ" খুলিযাছেন কিন্তু সমস্যা যে বিরাট—এতবড সমস্যার সমাধান করিতে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজিও সমস্যা গুরুতররূপেই বর্তমান। সরকার এত অধিক সংখ্যক লোকের কতদিন ভরণপোষণ জোগাইবেন। ইহাদের বাসস্থান দিতে হইবে, ইহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় করিযা দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ আজ উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডে এত অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভব নয়। তথাপি সরকার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। বাস্তুহারাদের জন্য নূতন নূতন পল্লী ও নগর নির্মাণ হইতেছে—অনেকে নিজ চেষ্টায় ও সরকারী সাহায্যে নিজেদের ব্যবস্থা করিযা লইতেছেন—সরকার ইহাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে—নূতন উদ্বাস্তুর তরঙ্গ এখনও থামে নাই। আশ্রয়প্রার্থী শিবির এখনও বর্তমান। এখনও

সরকারের সমস্যা

কলিকাতার রেলষ্টেশনগুলি উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ—তাহারা দীন-দরিদ্রের মত ভিক্ষায় জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। উদ্বাস্তুদের অন্য রাজ্যে প্রেরণের প্রচেষ্টা সার্থক হইতেছে না—সকলেই পশ্চিমবঙ্গে থাকিতে চান। সেজন্য সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করিয়াছে।

সরকারের বাস্তুহারা পুনর্বাসননীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। ইহার ত্রুটি আছে। সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত হইয়া অনতিবিলম্বেই ইহাদের পুনর্বাসন ও জীবিকা-নির্বাহের পথ করিয়া না দিলে এই ছিন্নমূল মরিয়া জনশ্রেণী ভয়াবহ রাষ্ট্রদ্রোহের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য। কিন্তু সরকারেরও সমস্যা আছে, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদের প্রতিও সরকারের দায়িত্ব আছে। তাহাদেরও বহুসমস্যা রহিয়াছে। সেগুলিও উপেক্ষা করা যায় না। এই দুই সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, তবেই সরকারী প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় আশে-পাশেও উদ্বাস্তুদের প্রেরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে উদ্বাস্তুদের অকারণ জেদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা শেষ পর্যন্ত এত জটিলাকার ধারণ করিবে এবং অন্নসমস্যা এদেশে এত তীব্র হইবে যে সরকারের পক্ষে তাহা আয়ত্তে আনা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

সরকারের ব্যবস্থায় ত্রুটি

মানব-সভ্যতা গঠনে বিজ্ঞানের দান

মানুষ যখন সেই আদিমকালে প্রথম চোখ মেলিয়া ধরিত্রীর দিকে চাহিল তখন তাহার প্রাণে সে কী ভয়ের শিহরণ! পাথরে-কঙ্করে বন্ধুর মাটি, অরণ্যানীর ভয়াল তরুশ্রেণী, হিংস্র জন্তুদের গর্জন, পার্বত্য নদীর ভীষণ বেগমত্তা, আকাশে মেঘ, কখনও বা প্রলয় ঝড়ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রপাত,—প্রকৃতি সেদিন রক্তাক্ত, নখদন্তে ভীষণা। অসহায় মানুষ গুঁড়ি মারিয়া খাদ্যান্বেষণে অগ্রসর হয়, বৃক্ষপত্রে শীত নিবারণ করে, পৃথিবীর অন্ধকার গহ্বর-জঠরে তাহার আশ্রয়। সেই নিঃসম্বল, অসহায় মানুষ তখন প্রাণধারণের চেষ্টাতেই মত্ত। সে বাঁচিবে, পৃথিবী ভোগ করিবে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে আপন শক্তি সংহত করে—কোমরে

ভূমিকা

লতা সুদৃঢ় করিয়া বাঁধে—ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। সে অজানাকে জানিবে, সে অধরাকে ধরিবে, সে পৃথিবীর পথে অগ্রসর হইবে। তাহার বক্ষে সাহস, চক্ষে সন্ধানী দৃষ্টি, মনে জানার আগ্রহ, প্রাণে অপূর্ব উদ্দীপনা।

সেইদিন হইতেই মানুষের জয়যাত্রার সূচনা। মানুষ নিয়ত চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় ও সাধনাবলে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর আপন আধিপত্য বিস্তারে মন দিল। মানুষ জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্থাপন করিল, সমাজ গড়িল, নিজের দেহ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিল, কৃষিকার্য দ্বারা আহার্য সন্ধানের অনিশ্চয়তা দূর করিল, বন্যজন্তু ও প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিল, তারপর পৃথিবীর রহস্য সমাধানে মনোনিবেশ করিল। ভাব প্রকাশের ভাষা আবিষ্কার, ভাবকে অক্ষরের বাঁধনে অক্ষয় করার উপায় আবিষ্কার এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের নানা উপায় আবিষ্কার করিয়া মানুষ বিপুল বিক্রমে জয়যাত্রায় বাহির হইল। তাহার চির অতৃপ্ত কৌতূহল তাহাকে প্রকৃতির অজানা রহস্যের দ্বারে আনিয়া ফেলিতে লাগিল এবং সে আপন বুদ্ধিবলে সে রহস্য সমাধানে মন দিতে লাগিল। বিস্তীর্ণ জলধি লক্ষ লক্ষ তরঙ্গান্দোলনে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিল কিন্তু সে সেই ভয় অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বুকের উপর দিয়া অর্ণবপোত ভাসাইয়া যাত্রা করিল—আকাশের দুর্নিরীক্ষ্যতা তাহার মনে হতাশার সুর ধ্বনিত করিল কিন্তু মানুষ সেই আকাশের বুকেই পক্ষীর ন্যায় অবলীলায় বিচরণের জন্য আকাশ-যান আবিষ্কার করিয়া বসিল। পৃথিবীর বুক চষিয়া সে আপন বিজয়-রথ চালাইল—সু-উচ্চ পর্বত অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তাহাকে সাবধান করিল—খবর্দার! কিন্তু সে ভয়ের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া, সে পর্বতের বাধা উত্তীর্ণ হইয়া তাহার শৃঙ্গে গিয়া চড়িল। তুষার মেরু হিমশীতল মৃত্যুর ভয়ে তাহাকে আতঙ্কিত করিল—কিন্তু সে বাধাকে সে মানিল না—সে মেরু-জয়ে অগ্রসর হইল এবং মেরু জয় করিয়া আপন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইল।

মানুষের জয়যাত্রা

মানুষের মন এক বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত বস্তু। এই মনেই তাহার যত চিন্তা-ভাবনার তরঙ্গ—এই মনই বিচারশক্তি দ্বারা বিশ্ব রহস্যের মীমাংসায় মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়! কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া মন অগ্রসর হইয়া সেই অনাদিকারণ ঈশ্বরে গিয়া পৌঁছায়। সেই অমূলতরু ঈশ্বর—যাঁহা হইতে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধেও মানুষ

মানুষের দুই আকাঙ্ক্ষা পৃথিবী ভোগ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ

আগ্রহশীল। বস্তু-জগৎ আর ভাব-জগৎ—এই দুই জগৎ লইয়াই মানুষের মাথা ব্যথা—একদিকে বিজ্ঞান অপরদিকে দর্শন। বস্তু-জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা ও তাহার ফলাফল বিজ্ঞান আর ভাবজগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হইল।

বিজ্ঞানের-দান

'বিজ্ঞান' কথাটির অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানের নানা বিভাগ—পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, গণিত, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। চক্‌মকি পাথর ঠুকিলে আগুন জ্বলে—এই জ্ঞান যে আদিম মানব আবিষ্কার করিল সে বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত করিল। বাষ্পের শক্তি যিনি প্রথম আবিষ্কার করিলেন সেই জেমস্ ওয়াট্ একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন। এইভাবে নানা বস্তুর বিশেষ প্রকৃতি জানিয়া তাহাদের সাহায্যে মানুষ নিজের সুখভোগের উপায় করিতে লাগিল। মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার ফলেই অসহায় মানুষ আজ পৃথিবীর সম্রাট।

বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ রেলগাড়ী চালাইতেছে। লৌহের ধর্ম অবগত হইয়া মানুষ তাহা হইতে ইস্পাত তৈরী করিয়া লোহার চাকা, ইঞ্জিন ইত্যাদি গঠন করিয়াছে। লৌহ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণার ফলেই যন্ত্র-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার ফলে মানুষ এই যন্ত্রের দ্বারা অনেক কাজ অবলীলা ক্রমে করিয়া লইতেছে। বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য গবেষণা সুরু হয়। তাহারই ফল বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, টেলিগ্রাফ। ইহার আবিষ্কারের ফলে বেতারযন্ত্র নির্মিত হইল। রঞ্জন নামক অদৃশ্য রশ্মি মানুষকে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্র ও অস্থিসকলের স্পষ্ট চিত্র আনিয়া দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটাইল। এইভাবে রোগে চিকিৎসার ঔষধ, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধা, বিশ্বের খবরাখবর সরবরাহ করিয়া বিশ্বের সহিত মানবের যোগসাধন, পৃথিবীর সর্বত্র অল্প সময়ের মধ্যে গমনা-গমন, শত শত মানুষের কাজ একটিমাত্র যন্ত্রের দ্বারা সাধন, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিচরণ ইত্যাদি মানুষের আয়ত্তে আসিল। আজ প্রাণধারণের প্রতিপদেই আমরা বিজ্ঞানের ফল ভোগ করিতেছি। সভ্যতা-গঠনে বিজ্ঞানের দান অতুলনীয়। মানুষ নিয়ত পৃথিবীকে সুন্দরতর করিতেছে—মানব-

জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করিতেছে সে কেবল বিজ্ঞানের সহায়তায়। নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে মানুষ তাহার কর্ম, চিন্তা, ভাব দিয়া সভ্যতাকে বিচিত্র সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র, বেতারযন্ত্র, চলচ্চিত্র, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক ট্রেন, রঞ্জনরশ্মি, রেডিয়াম্, টীকাদান পদ্ধিত, স্পুটনিক ইত্যাদি আবিষ্কার যেমন সভ্যতার বিস্তারের সাহায্য করিয়াছে ও করিবে—সেই রূপ বিজ্ঞান আবার মানুষকে বহু বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সন্ধান দিয়া পৃথিবী ধ্বংস ও সভ্যতার সমাধি রচনার উপায়ও তাহাদের আয়ত্তে আনিযাছে।

উপসংহার

মানুষ দেবতাব ন্যায় মহাশক্তিধর। কল্যাণ সাধন করা যেমন তাহার আন্তরিক শুভবুদ্ধিব ফল, তেমনি তাহার অন্তরের ঘৃণা-বিদ্বেষ আবার তাহাকে পৈশাচিক শক্তিরও অধিকারী করিয়া তাহার দ্বারা বিশ্বের তথা মানবজাতির মহা-অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে। যে বিজ্ঞান পৃথিবীকে সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের লীলাভূমি করিয়াছে, সেই বিজ্ঞানই আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে পারে। মানুষের শুভবুদ্ধি শুদ্ধ থাকুক। তাহার মানবপ্রেম বিস্তৃত হউক। মানুষ ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাসী হউক, তাহা হইলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সে বিজ্ঞানকে আর এই পৈশাচিক কার্যে ব্যবহৃত করিবে না। মানুষ আপনার অন্তরের ত্যাগে নব নব রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া মানুষের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করুক—দেশে দেশে মানুষ ইহার আশীর্বাদে পরস্পরের কল্যাণ চিন্তায় রত থাকুক—বিশ্বের মানব একপরিবারের লোকের ন্যায় সুখে ও মৈত্রীতে বসবাস করুক—ইহাই মানুষের কামনা হউক।

শিক্ষা বিস্তারে বেতার

ভূমিকা

"বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্য ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতু-নির্মিত অতিন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল

এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে"—উদ্ধৃতিটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর "অব্যক্ত" পুস্তকের অন্তর্গত। বেতারযন্ত্রে কিভাবে সংবাদ বা শব্দ আসে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই উক্তিটি আমাদের সাহায্য করিবে। আমরা কথাবার্তা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই শুনিতে পাই—কিন্তু দূরত্ব বেশী হইলে আর তাহা শুনিতে পাই না। শব্দ ইথারে ঢেউ তোলে—সেই ঢেউ আমাদের কানে আসিয়া লাগিলে শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। দূরের শব্দের ঢেউও আমাদের কানে পৌছায়, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না—সেই ঢেউ অনুভববোধ্য না। কাজেই যন্ত্রের সাহায্য দরকার হয়। এই যন্ত্র উদ্ভাবনের উপরই দূরের শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া নির্ভর করে। বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্র উদ্ভাবনে মন দিলেন। নানা বিজ্ঞানীর চেষ্টা ও সাধনা শেষ পর্যন্ত মানুষকে এই যন্ত্র আবিষ্কারে সাহায্য করিল। ইতালী দেশের মার্কনি বেতারের সমাপ্ত রূপ দিয়া জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করিলেন।

বেতার আবিষ্কারের ইতিহাস

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্‌ওয়েল্ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আর একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক হেনরি হার্ৎস্ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদনে সক্ষম হন। তৎপরে মার্কনি 'রিসিভার' যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরিবার ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেন। পরে ক্রমশঃ বহুদূরবর্তী স্থানের শব্দের তরঙ্গ ধরার কাজেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্র বা 'ট্রান্‌স্‌মিশন' যন্ত্রের উন্নতির চেষ্টা হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বেতারযন্ত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। ইহার পর বেতার-প্রতিষ্ঠান দেশে দেশে গঠিত হয় এবং জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহারের জন্য তাহার প্রসারের ব্যবস্থা হয়।

বেতারযন্ত্রের বিবরণ

প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র এই দুইটি যন্ত্র লইয়াই বেতারযন্ত্রের কারবার। প্রেরক-যন্ত্রের দ্বারা শব্দ পাঠানো হয়, আর গ্রাহকযন্ত্র সেই শব্দ গ্রহণ করে। প্রেরকযন্ত্র প্রথমে মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গকে দীর্ঘ করিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে—এবং তাহাকে ইথার-

তরঙ্গে পরিণত করিয়া দিক্‌বিদিকে প্রেরণ করে। এই ইথার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন এরিয়েলের তারে আসিয়া ধাক্কা খায়, এবং গ্রাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া শব্দ-তরঙ্গে পরিণত হয়। তখনই অনুরূপ শব্দ আমরা শুনিতে পাই। বিভিন্ন দেশের সংবাদ বা গানবাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ দ্বারা প্রেরিত হয় এবং সেই তরঙ্গের বিবরণ পূর্ব হইতেই জানান থাকে কাজেই গ্রাহকযন্ত্র ঘুরাইয়া সেই জাতীয় তরঙ্গ ধরার কোন অসুবিধা হয় না। এই ভাবেই ঘরে বসিয়া আমরা দেশবিদেশের খবরাখবর, গান, বাজনা, অভিনয় শুনিতে পাই।

বেতারযন্ত্র আমাদের আনন্দের যোগান দয়

আমাদের অবসর বিনোদন ও আনন্দের উপকরণ যোগাইয়া বেতারযন্ত্র আমাদের বহু উপকার করে। গান, বাজনা, অভিনয় শুনিয়া আমরা কতই না আনন্দ পাই। আবার বহু শিক্ষার বিষয়ও ইহাতে থাকে। জগতের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তৃতা ও উপদেশ নানা দেশের বিবরণ, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা রেডিও মারফত আমরা জানিতে পারি। প্রত্যেক দেশের খবরা-খবরও নিত্য রেডিও মারফৎ আমাদের নিকট প্রেরিত হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে ইহা একটি আমোদ-প্রমোদের উপকরণ মাত্র। ইহা একটি বিলাসের দ্রব্য। ধনী ব্যক্তিরা ইহা ঘরে রাখিয়া গান বাজনা শুনিয়া সময় কাটান। কথাটির মধ্যে আংশিক সত্য রহিয়াছে। আনন্দ যোগাইয়া বেতার আমাদের জীবনকে মধুময় করে। আনন্দ ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কাজেই সেদিক দিয়াও বেতারযন্ত্রের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে বেতারযন্ত্র মারফৎ লোককে শিক্ষা দিবারও যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যায়।

শিক্ষা-বিস্তারে বেতার

নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে বেতারের উপযোগিতা অসামান্য। পূর্বকালে প্রচারকরা দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া লোক-শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহারা কত দেশে যাইতে পারেন? কত লোককে শিক্ষা দিতে পারেন? এ বিষয়ে তাঁহাদের শক্তির একটা সীমা ছিল। বেতারের ক্ষমতা সীমাহীন। ইহার দ্বারা দেশের সর্বত্র শিক্ষা-বিস্তার করা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক—দেশবাসী সকলে একই সময়ে ইহার

মারফৎ জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। যে দেশে আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা যৎসামান্য সেই দেশে বেতারযন্ত্র যে কত উপকার করিতে পারে তাহার পরিমাণ হয় না। বর্তমান যুগের কথক হইতেছে বেতারযন্ত্র। পূর্বে কথকতা শুনিবার জন্য কতদূর হাঁটিয়া লোককে আসিতে হইত—আসর সাজাইতে হইত, চাঁদোয়া টানাইতে হইত, রোশনাই-এর ব্যবস্থা করিতে হইত—এখন শুধু বেতার-যন্ত্রের কাছে আসিলেই হয়। দেশে অধিক সংখ্যক বেতারযন্ত্র থাকিলে এবং লোকে ইচ্ছুক হইলে অল্পদিনে এই দেশের বিপুল জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। দেশের জনসাধারণকে দেশের পরিচয় জ্ঞাত করা, দেশের মনীষীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, তাহাদের ভাবধারা বুঝাইয়া দেওয়া, দৈনিন্দন কাজকর্মের বহু খুঁটিনাটি শিক্ষা দেওয়া, বৈজ্ঞানিক মতে কৃষি পরিচালনা করার জ্ঞান দান করা। নানা উপাযে জীবন সুন্দব ও সার্থক করার উপায প্রদর্শন করা, দেশের পরিচয দেওয়া এবং পৃথিবী কোন্ পথে চলিতেছে তাহা জানাইয়া দেওয়া ইত্যাদি বেতাবযন্ত্র মারফত অতি সহজেই ঘটিতে পারে।

কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয় ও পঠন ক্ষমতাকে শিক্ষা বলে না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদিগকে সার্থক জীবন-যাপনের উপাযের সন্ধান দেয। যাহার দ্বারা আমরা আমাদের জীবন সুন্দর করিযা গড়িতে পারি, সমাজে আমাদের স্থান করিযা লইয়া বাচিতে পারি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। রেডিও বা বেতার মারফত একাজ সুন্দরভাবে সম্পূর্ণভাবে হইতে পারে।

শিক্ষা কাহাকে বলে?

এই বিরাট দেশের অধিকাংশ লোক সব বিষয়ে অজ্ঞ। তাহাদিগকে বেতার সার্থক জীবন যাপনের উপায় শিক্ষা দিতে পারে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বের সঞ্চিত ভাবধারার সহিত দেশের জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন বেতারের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। অল্পবয়স্ক বালক হইতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেকের জন্যই বেতারযন্ত্র মারফৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। বিশ্বের মনীষীদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিতে পারে—তাঁহাদের কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার বেতারযন্ত্র মাধ্যমে আমাদের নিকট মুক্ত করিতে পারেন। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

জন্য বেতারের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের অধীনে শিক্ষা পাইয়া উপকৃত হইতে পারে।

বেতার দেশ-কালের বাধা বিদূরিত করিয়াছে। আজ আমরা সকল দেশের সহিত বেতার মারফৎ পরিচিত হইতেছি। সকল দেশের কর্মধারার সহিত পরিচিত হইয়া আজ আমরা স্বীয় কর্মধারা স্থির করিতে পারি। বিশ্বের যাহা কিছু ভালো তাহাই বেতার মারফৎ আমাদের কাছে বিবৃত হয়—সেই ভালোটুকু যাহাতে

শেষ মন্তব্য

আমরাও জীবনে আয়ত্তে আনিতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতে পারি। আজ বেতার আমাদের অশিক্ষিত-শিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের মনের যোগাযোগ ঘটাইয়া দেশের চিত্তটিকে একমুখী করিতে যে কতখানি সাহায্য করিতেছে তাহা বলা যায় না। প্রয়োজন শুধু দেশময় বেতারযন্ত্র স্থাপনে সরকারী উদ্যম ও সাহায্য। ভারতের সুদূরতম পল্লীতে যাহাতে বেতারযন্ত্র স্থাপিত হয়—প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক গ্রামে যদি বেতার-যন্ত্র স্থাপিত হয় তবেই জনশিক্ষার কাজ অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে। এজন্য বেতারযন্ত্র যাহাতে অল্পমূল্যে পাওয়া যায় এবং লাইসেন্স্ ফী যাহাতে যৎসামান্য হয় সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সরকার অবশ্য অল্পমূল্যে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে বেতারযন্ত্র সরবরাহ করিতে শুরু করিয়াছেন।

চলচ্চিত্র

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে মানুষ আশ্চর্য হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য হইত আদিম মানুষ। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষ নিত্য নূতন

ভূমিকা

অদ্ভুত ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ছবির মানুষ যে আসল মানুষের মত হাত-পা, মুখ নাড়িতে পারে, আসল মানুষের ন্যায় কথা বলিতে পারে, গান গাহিতে পারে, একথা কে কবে দেখিয়াছে, কে কবে শুনিয়াছে? কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষ ইহা প্রত্যক্ষ

করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই এই অদ্ভুত আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারই নাম চলচ্চিত্র বা বায়োস্কোপ।

চলচ্চিত্র আবিষ্কারের কথা

গুহামানুষ মনের ভাব বুঝাইবার জন্য ছবি আঁকিত। মানুষ সভ্য হইয়া আপন আনন্দ বিধানের জন্য ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল। সে ছবি যত প্রকৃত বস্তুর মত যথাযথ প্রতিকৃতি হয় তত চিত্রকরের কৃতিত্ব। কিন্তু চিত্রকর যতই পটু হোক্ একেবারে হুবহু প্রতিকৃতি আঁকিতে পারে না। অথচ মানুষ হুবহু চিত্র চাহে। হুবহু চিত্র ছাড়া তাহার চলিবে না। সে হুবহু চিত্র কি করিয়া নির্মাণ করা যায় তাহার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করে না। সে দেখে বিনা চেষ্টায় স্বচ্ছ জলে হুবহু প্রতিকৃতি দেখা যায়, আয়নার কাঁচে হুবহু চিত্র প্রতিফলিত হয়। তাহার দুই চক্ষেও বস্তুর হুবহু প্রতিকৃতি পড়ে—এইরূপ হুবহু চিত্র তাহার করা চাই। ক্রমশঃ চেষ্টার ফলে ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হইল। ক্যামেরার লেন্স বা পরকলায় প্রতিফলিত ছবির হুবহু মুদ্রণ সম্ভব হইল। কিন্তু সে ছবি ত' হাঁটে না, চলে না—মানুষের চলন্ত ছবি কি লওয়া যায় না? মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি মিটাইবার জন্য বিজ্ঞানের সাধকদের চেষ্টা ও উদ্যমের শেষ নাই। সহসা পিটার মার্ক রজেট্ নামক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন যে, মানুষের চক্ষুতারকায় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই বস্তু চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইবার পরেও তাহার প্রতিবিম্ব কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। এই তত্ত্বের উপরই চলচ্চিত্র নির্মাণের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না চলচ্চিত্র নির্মিত হইল ততদিন পর্যন্ত মানুষ ধারাবাহিক চিত্র কাঁচে অঙ্কিত করিয়া তাহা পর্দায় নিক্ষেপ করিয়া মুখে গল্প করিয়া 'ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ' (magic lantern) দ্বারা লোকের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। এই ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতিই বর্তমান চলচ্চিত্র। নির্বাক চলন্ত ছবি দেখানোর পর সবাক্ ছবির জন্য মানুষের সাধনা চলিতে থাকে এবং তাহারই সার্থক রূপ বর্তমান কালের সবাক চলচ্চিত্র বা Talkie Cinema।

চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশল

রজেট্ যাহা আবিষ্কার করিলেন তাহা কাজে লাগিল অনেক পরে। কিন্তু ফটোগ্রাফ্ বিজ্ঞানী এদিকে চলন্ত বস্তুর ছবি তোলার আগ্রহে অধীর হইয়া নানারূপ পরীক্ষা শুরু করিল। ইস্টম্যান কোডাক্ কোম্পানী সেলুলয়েডের ফিতার উপর ধারাবাহিক ছবি তোলার

কাজে সফল হইলেন। এই ফিল্মের মধ্য দিয়া আলোকপাত করিলে পর্দায় হুবহু ফটোগ্রাফ্ দেখা যাইতে লাগিল। বজেটের আবিষ্কার এইক্ষেত্রে কার্যকরী হইল। চলন্ত ছবি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছবির ক্রমিক পরিবর্তন। পূর্ব অবস্থা চক্ষুতারকায় প্রতিফলিত থাকা কালেই পরবর্তী অবস্থা সেখানে প্রতিফলিত হয় এবং তৎপরে তাহারও পরবর্তী অবস্থা সেখানে প্রতিফলিত হয় এবং তৎপরে তাহারও পরবর্তী অবস্থা—সমস্ত জুড়িয়া একটি চলন্ত ছবি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান্ বিজ্ঞানী এডিসন্ প্রথমে নিজ ল্যাবরেটরীতে এই ছবি প্রদর্শন করেন। তৎপরে আমেরিকা-বাসীরা ইহা মানবের চিত্তবিনোদনের জন্য কাজে লাগান। এজন্য কলাকুশলীরা কোমর বাঁধিয়া লাগেন এবং নানারূপ আলোকচিত্রের কুশলতার উপর সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা পর্দার উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিয়া ক্রমশঃ সহস্র সহস্র দর্শকের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হন। সেলুলয়েডের রীলে মুদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র Projector বা চিত্রক্ষেপণ যন্ত্রের দ্বারা আলোকের সাহায্যে পর্দায় বড় করিয়া প্রতিফলিত করিয়া দেখানো হয়। এক এক রীলে কিছুটা করিয়া অংশ দেখানো হয়। যন্ত্রের সাহায্যে রীল হইতে দ্রুত সেলুলয়েডের ফিতা আলোকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত এবং তথা হইতে পর্দায় নিক্ষিপ্ত করার জন্য বিশেষ আকারের যন্ত্র ইতিমধ্যেই নির্মিত হইয়াছিল। এই চলচ্চিত্র বহুকাল লোককে অপার আনন্দ দান করিতে লাগিল। কিন্তু মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—সে চায় এই ছবির মানুষদের মুখের কথা শুনিতে—ইহারা কথা বলুক—গান করুক—কাঁদুক, হাসুক—তাহা না হইলে আর কী আনন্দ হইল।

সবাক্ চলচ্চিত্র

লোকে যাহা চায় বিজ্ঞানীরা তাহাই যোগাইবার চেষ্টা করেন। ব্যবসায়ীরা এবার বিজ্ঞানীদের পিছনে আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা এই বিপুল সম্ভাবনায় হ'ন উল্লাসিত। এদিকে সহসা ইউজিনলাস্ট শব্দের ফটোগ্রাফ তোলার প্রচেষ্টায় সফল হইলেন। ইহাকে বলে Sound Photograph। দৃশ্যের ফটোগ্রাফের পাশেই এই শব্দের ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হইল সেলুলয়েডের ফিল্মের উপর। বায়োস্কোপের ছবি সহসা কথা কহিয়া উঠিল,—গান করিতে লাগিল,—যত প্রকারে শব্দ গল্পকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন সবু কিছুরই ব্যবস্থা হইল। সে সবাক চলচ্চিত্রের নাম হইল 'টকি ফিল্ম'। ইহার পর

আরো বৈচিত্র্য আসিল, বহুবর্ণের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যও রূপালী পর্দায় দেখানো হইতে লাগিল। না জানি ভবিষ্যতে ইহার আবার কি ক্রমোন্নতি ঘটে।

চলচ্চিত্রের উপকারিতা

চলচ্চিত্র আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করে। ইহা দ্বারা আমরা বহু বিষয় জানিতে পারি। শিক্ষা-বিস্তারের কাজে চলচ্চিত্রের প্রয়োজন ও উপযোগিতা প্রভূত। সারা পৃথিবীর প্রত্যক্ষ রূপ, পৃথিবীর মানুষদের পরিচয়, পৃথিবীর মানুষদের জীবনযাত্রা প্রণালী পৃথিবীর কর্মশালাগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে লাভ করিতে পারি। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হইলে শিক্ষাজগতে ইহা যুগান্তর ঘটাইতে পারে। ভূগোল আর পুস্তকের অক্ষরের মাধ্যমে এবং ম্যাপের সাহায্যে শিখিতে হইবে না। পৃথিবীর পথে-বিপথে আমরা চলচ্চিত্রের সাহায্যে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইব। পৃথিবীর নির্জন বিজন অরণ্য, গভীর সাগরাভ্যন্তর, দুর্গম গিরিচূড়া, দুস্তর সমুদ্র সকলই চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পারিব। ইতিহাস নাটকের ন্যায় অভিনীত করিয়া শিক্ষার্থীদের দেখান সম্ভব হইবে। আর বিলাত, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপানে যাইতে হইবে না, চলচ্চিত্রের সাহায্যে ঐ সকল দেশ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে টানানো পর্দায় প্রতিফলিত হইবে।

চলচ্চিত্রের অপকারিতা

চলচ্চিত্রের যে সমস্ত বনার কথা বলা হইল তাহার ব্যবস্থা এখনও পুরাপুরি হয় নাই। এখন মাঝে মাঝে ঐরূপ দুই একটি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং বহু সংবাদ চিত্রে পরিবেশিত হয়। অধিকাংশ চলচ্চিত্র অতি নীচু স্তরের আনন্দের যোগান দিয়া অর্থ আহরণ করে। অনেক কুরুচিপূর্ণ মনোজ্ঞ পাপদৃশ্য দেখিয়া আমরা চরিত্র কলুষিত করি। আমাদের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করার ব্যবস্থা বর্তমানে চলচ্চিত্রের সাফল্যের একমাত্র কারণ। বহু অপরিণতবুদ্ধি বালক চলচ্চিত্র দেখার নেশায় মত্ত হইয়া অমূল্য সময় ও নিষ্কলঙ্ক মনটি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের সর্বশ্রেণীর চলচ্চিত্র দেখা একেবারেই উচিত নয়।

চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ

চলচ্চিত্র যাহাতে কোনরূপে দর্শকদের চিত্ত কলুষিত না করে বা কোনরূপ সমাজবিরোধী মনোভাবের প্রসারে সাহায্য না করে বা রাষ্ট্রদ্রোহাদিতে লোককে উৎসাহিত না করে সেজন্য চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সেন্সরবোর্ড আছে। কিন্তু ইহাদের দ্বারা অনুমোদিত

ছবিতেও বহু বুকচিপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জনসাধারণের বিকৃত রুচির খোরাক যোগাইতে বর্তমান চলচ্চিত্র নির্মাতারা এইরূপ কার্য করেন। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। কঠোর নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা চলচ্চিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে ইহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। বর্তমানে শিশু ও বালকদের জন্য বহু ভাল ভাল চিত্র নির্মিত হইতেছে এবং জনসাধারণকে নানা বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও চলচ্চিত্রের সাহায্যে হইতেছে। ভারত সরকারের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রগুলি বর্তমানে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিতেছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিতেছে।

উপসংহার

স্বাধীন ভারতের প্রধান সমস্যা দেশগড়া, জাতিগড়া, দেশের আপামর সাধারণকে শিক্ষিত করা। এই কার্যে বেতার যেমন অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তেমনি পারে চলচ্চিত্র। ইহাকে জনশিক্ষার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিলে অতি সত্বর সুফল লাভ করা যাইবে। সুপরিকল্পিত চলচ্চিত্রের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনন্ত রহস্যের সন্ধান অত্যল্প কাল মধ্যে দেওয়া সম্ভব হইবে। আগামী যুগে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার সহজসাধ্য ও আনন্দময় হইবে। মানুষের কল্যাণকামীরা নব নব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবেন, এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

স্বাধীন ভারতের ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ছাত্রদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন, জ্ঞানানুশীলন। এই অধ্যয়ন অনন্যমনা হইয়া তপস্যার ন্যায় ঐকান্তিকতার সহিত করাই ছাত্র-সমাজের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই---তখনকার মত গুরুগৃহে গিয়া বা তপোবনে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ঋষির নিকট গিয়া জ্ঞানাহরণের সামাজিক পরিবেশ আজ আর নাই। এখন ছাত্রদের কঠিন জীবনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়—অন্নচিন্তা চমৎকারা। পরিবারের দায়িত্ব ছাত্রদের মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। কাজের সেই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হয়। সেই চিন্তায় আজকালকার ছাত্র বিভোর। আর এই দায়িত্ব বহন করিতে

হইলে রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। সে যে এই স্বাধীন ভারতের একজন স্বাধীন নাগরিক—এই বোধ জন্মাইলে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে যথাযথভাবে সচেতন হইলে, তবেই সে নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। আমরা আমাদের পরিবারের একজন, আমাদের পরিবার আবার দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার। এই লক্ষ লক্ষ পরিবার স্বাধীন ভারতের বিপুল মানব-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। এই বিপুল মানবগোষ্ঠি যে রাষ্ট্রের অধীন তাহার সহিত আমাদেরও যে নাড়ীর যোগ আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি !

স্বাধীন ভারতের ছাত্র-সমাজের আদর্শ

দেশ যখন বিদেশীর অধীন ছিল তখনকার ছাত্র-সমাজ কি করিয়াছিল? তাহাদের একশ্রেণী অধ্যয়নকে তপস্যাজ্ঞান করিয়া আপনাদের জীবনে উন্নতি করিবার জন্য, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সচেষ্ট ছিল। অনেকে বড় বড় পদ লাভ করিয়াছিল—জীবনে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অনেকে বিদেশী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেশবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিয়াছিল—দেশদ্রোহিতা, স্বজাতি পীড়ন ইত্যাদি কাজও তাহারা করিয়াছিল। আবার একশ্রেণী দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কারাবরণ, ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদান, অশেষ নির্যাতন সহ্য করা ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহারা স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। ছাত্র-সমাজের নানা আদর্শের চিত্র ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্যমনা হইয়া জ্ঞান সাধনা, শুধু আত্মোন্নতির জন্য বিবেক-বিগর্হিত কাজ করা আর অন্তরের আকুল আবেগে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা—জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করা—এই বিভিন্ন আদর্শের ছাত্র-সমাজ পরাধীন ভারতবর্ষে একযোগে বর্তমান ছিল।

ছাত্র-সমাজ দেশের প্রাণশক্তির ধারক ও বাহক

ছাত্র-সমাজ দেশের প্রাণশক্তির ধারক ও বাহক। যে জাতির প্রাণশক্তি স্তিমিত, সেই জাতির ছাত্র-সমাজও দুর্বল, হীনবীর্য ও উৎসাহহীন। পক্ষান্তরে যে জাতির মধ্যে ভরপুর প্রাণের প্রাবল্য সেই জাতির ছাত্র-সমাজ নিত্য উদ্বেলিত সাগরের ন্যায় চঞ্চল, বেগবান ও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

সর্বকালের সর্বদেশে ছাত্র-সমাজের একটি সাধারণ আদর্শ আছে। তাহাদের উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"—

দেশের ছাত্র-সমাজ তথা যুবশক্তি যে দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, অবুঝ, প্রমত্ত কিন্তু 'চিরযুবা ও চিরজীবী' তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া সেই অমর যুবশক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিপদ ও বাধা উপেক্ষা করিয়া ছাত্র-সমাজ স্বাধীনতার আবাহনে মনপ্রাণ উৎসর্গ করে—তাহারা নতুন প্রাণের স্রোতে জাতীয় জীবন পূর্ণ করিয়া দেয়। তাহাদের মধ্যেই মহাশক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে। আরেকজন কবি তাই মানবাত্মার মাহাত্ম্য বর্ণনায় কণ্ঠ ছাড়িয়া গান ধরিয়াছেন—

"হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে, কে আছে
আমাতে মহা মহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈশা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?"(—নজরুল ইসলাম)

এই মহাশক্তির অনুপ্রেরণায় ছাত্র-সমাজ অসীম শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

"মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান—
....মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক্।
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত-কমল।" (—নজরুল ইসলাম)

ছাত্র-সমাজ জাতির আশা ভরসা, ইহারাই জাতির আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রূপায়িত করে—জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করে। আরেকজন কবি ছাত্র-সমাজের মহিমা কীর্তনে বিভোর হইয়া বলিয়াছেন—

"ওরাই রাখে জ্বালিযে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালযে
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে, নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদেব ছেলেবা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিযে অগৌরবেব রব
দেশ-দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান বিভব।....
মানুষ হযে ওবা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব ভরে।" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চিরকালের আদর্শ সর্বদেশেব ছাত্র-সমাজেব সম্মুখে তাহাদের অজ্ঞাতেই আলোকস্তম্ভের মত জ্বলিয়া উঠে। তাহারা ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসব হয়—জাতির প্রয়োজনেই তাহারা আত্মনিযোগ করে। কেহ তাহাদের বলিযা দেয় না—তথাপি মনুষ্যত্বেব পথেই তাহাদেব অগ্রগতি—তাহারা জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দেয়—জীবনের পথ, আলোকের পথ, অমৃতের পথ।

জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র-সমাজ ঝাঁপাইযা পডিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই—সেই উত্তাল রক্তসিন্ধু মন্থন কবিয়া যে অমৃত ও হলাহল উঠিযাছিল ছাত্র-সমাজ সেই হলাহল পান করিযা মৃত্যুঞ্জয় শিবের মত দেশকে অকুণ্ঠ চিত্তে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করিতে দিযাছিল। আজ স্বাধীনতা সূর্যের রক্ত-আলোকচ্ছটায ভাবত-গগন ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছে—দেশের ছাত্র-সমাজের দাযিত্ব ও কর্তব্য কিন্তু কমে নাই। ভারতবর্ষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব-মৈত্রী। ইতিহাসের ধাবা বাহিযা এই বিশ্ব-মৈত্রীর ভাব বর্তমান ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। সে আদর্শকে রূপায়িত করিবে দেশের ছাত্র-সমাজ। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপায়নে ছাত্র-সমাজকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বৈদেশিক শক্তির নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট মনুষ্যত্বহীন আদর্শহীন এই দেশকে কে গঠন করিবে? কে ইহাকে জগৎ সভায় সম্মানের

স্বাধীন ভারতে ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে? কে এই অন্নহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, স্বার্থপর দেশকে জাগাইবে? একদিকে দেশ গঠন অন্যদিকে দেশকে ইহার মহান আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন রাখা ছাত্র-সমাজের কর্তব্যের অন্তর্গত। এ ছাড়া তাহাদের প্রাণশতদলটিকে বিকশিত করিতে হইবে, জ্ঞান-মকরন্দে সে শতদলটি পূর্ণ কবিতে হইবে। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা নাশ করিতে হইবে, জড়ত্ব দূর করিতে হইবে, বিদেশ হইতে প্রযোজনীয় জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিযা দেশকে পুনর্গঠিত কবিতে হইবে। এ দায ও কর্তব্য আজ ছাত্র-সমাজকে স্কন্ধে তুলিয়া লইযা অগ্রসর হইতে হইবে। এই আদর্শ ধ্রুবতারার মত অনুসরণ করিতে হইবে—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ-বাধা দেখিযা পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না—হুঁশিযার কাণ্ডারীর মত তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে কবিব উদাত্ত উৎসাহ বাণী—

"গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায বাজ,
পশ্চাৎপথ-যাত্রীব মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডাবী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
করে হনাহানি, তবু চল টানি নিযাছ যে মহাভার।"

যুদ্ধ বনাম শান্তি

যুদ্ধ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রাণধারণের জন্য এক সময়ে মানুষকে বাধ্য হইযা অন্য মানুষের সহিত যুদ্ধ কবিতে হইত। তখন মানুষ ছিল পশু পর্যাযে। তাহার মানসিক উন্নতি তখন হয নাই। তখন সে পশুর ন্যায় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া হনন করিত, অপহরণ করিত, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইযা আপনার জীবনযাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করিত। এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম—মানুষের সহিত সংগ্রাম, হিংস্র বন্য পশুদের সহিত সংগ্রাম, প্রকৃতির বিপর্যয়ের সহিত সংগ্রাম,

প্রারম্ভিক ভূমিকা

রোগ-পীড়ার সহিত সংগ্রাম। যুদ্ধ তখন ছিল আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। এইভাবে যুদ্ধ করিয়া, আত্মহনন করিয়া মানুষ সমাজবদ্ধ হইল; শহর, নগর গড়িল, সভ্যতার পত্তন করিল, পৃথিবীর বুকে আপনাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু যুদ্ধেব অবসান ঘটিল না। এক দেশের মানুষেব সহিত অপর দেশের মানুষের, এক জাতির মানুষের সহিত অপর ধর্মাবলম্বী মানুষের যুদ্ধ লাগিয়াই রহিল। অধিকন্তু দেশের রাজশক্তির পতন ঘটাইবার জন্য, ন্যাযের প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, অন্যায়ের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম লাগিযাই রহিল। এ ছাড়া রাজ্য বিস্তার, বাণিজ্য বিস্তাব, প্রভাব বিস্তার, পরস্ব লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য দুর্বল জাতিব উপর প্রবল জাতিব আক্রমণ ইতিহাসের প্রধান উপাদান হইযা পড়িল। ছলে, বলে, কৌশলে শোষণ কবাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম হওয়ার ফলেই বারে বারে পৃথিবী রক্তাক্ত হইযা উঠিযাছে। প্রতিবারের বক্তস্নানের পব পৃথিবীব মানুষ আব রক্তপাত যাহাতে না হয তাহার জন্য বদ্ধপরিকব হইযা নানা ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইযাছে কিন্তু সকল ব্যবস্থা ধূলিসাৎ করিযা আবার পৃথিবীর বক্ষে কাঁপন জাগাইযা কামান গর্জন কবিয়া উঠিযাছে—যুদ্ধ দামামার শব্দ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইযাছে।

বন্য অবস্থায মানুষ গাছ-পাথর লইযা যুদ্ধ করিত, তারপর পাথরের তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রসকল নির্মাণ করিতে শিখিল এবং গদাব ন্যায ভারী অস্ত্র ব্যবহার শিখিল।

সেকালের যুদ্ধ ও এ কালের যুদ্ধ

পরে ধনুতে জ্যা আরোপণ শিক্ষা করিলে দূর হইতে শত্রুকে আক্রমণ করা সহজ হইল। আর্য ও অনার্যদেব মধ্যে যুদ্ধে বোধ হয আর্যরা ধনুর্বাণ ইত্যাদির সাহায্যে ও নানা ফন্দি-ফিকিরের প্রয়োগে আনার্যদেব পরাজিত করিতে সমর্থ হয। সৈন্য-চালনা ইত্যাদির চাতুর্যের উপর তখন যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করিত। পৌরাণিক যুগে যে সকল যুদ্ধ হয তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ সমধিক প্রসিদ্ধ। তখন-কার অস্ত্রগুলির নাম ও কার্যকারিতা, আধুনিক লোককে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নহে এমন মতও অনেকে প্রকাশ করেন। চতুরঙ্গ সেনা—হস্তী, অশ্ব, রথ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। এ ছাড়া ছিল পদাতিক সৈন্য। ইহারা শূল, শেল, গদা, চক্র, খড়্গ, পাশ ইত্যাদির ব্যবহার করিত। এছাড়া ব্যূহ রচনার কৌশলের উপরও যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর

করিত। ধাতুনির্মিত তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র ব্যবহার এবং প্রকৃত বাহুবল বা শারীরিক শক্তির তখন রীতিমত প্রয়োজন হইত। ছলা, কলা ইত্যাদির ব্যবহারও প্রচুর ছিল।

প্রাচীন ভারতের চিত্র কবির ভাষায়—

> "অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
> অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টঙ্কারে····
> উন্মাদ্ শঙ্খের গর্জে, বিজয় উল্লাসে,
> রথের ঘর্ঘর মন্দ্রে··· "

তখন যুদ্ধ হইত মানুষে মানুষে, বীরে বীরে—সম্মুখ সমর ছিল বীরের ধর্ম। হানাহানি, মারামারিরও একটা নিয়ম ছিল সেকালে।

কিন্তু বর্তমান কালের যুদ্ধ বেশী ভীষণ ও মারাত্মক। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা মারণাস্ত্র-গুলিকে এভাবে তৈয়ারী করিতেছে যে, মুহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যাইতেছে—বিরাট জনপদ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। বোমারু বিমান, কামান, হাইড্রোজেন বোমা, আণবিক বোমা, ট্যাঙ্ক, বিমানধ্বংসী কামান, সাবমেরিন বর্তমান কালের যুদ্ধের মারণাস্ত্র। মুষ্টিমেয় মানুষের চক্রান্তে আজ সভ্যতা বিপন্ন হইয়া সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। নিরীহ জনসাধারণেরও রেহাই নাই—সৈন্যদল তখনকার দিনে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিত। আজ সমগ্র দেশ শত্রু হিসাবে বিপক্ষের লক্ষ্যস্থল। এছাড়া দেশের জলাধার, খাদ্যভাণ্ডার ইত্যাদি নষ্ট করা—অস্ত্রনির্মাণের কারখানা ধ্বংস করা—রসদের যোগান বন্ধ করা ইত্যাদিও যুদ্ধকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বুকে দুইটি ব্যাপক মহাযুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে—একটি ১৯১৪ সালের যুদ্ধ—অপরটি ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ। মানুষ যে কতখানি পৈশাচিক ভাবাপন্ন হইতে পারে তাহা এই দুই যুদ্ধ আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে। ভয়াবহতার দিক দিয়া ও ধ্বংসকারিতায় ইহাদের জুড়ি নাই—আতঙ্কগ্রস্ত পৃথিবীর লোক যুদ্ধ চাহে না তবুও যুদ্ধ ঘটে—ইহাপেক্ষা অভিশাপ আর কি হইতে পারে ?

যুদ্ধের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুকাল ধরিয়া গড়িয়া-ওঠা মানব সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর লোক জ্ঞানে উন্নত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে একতাবোধ জাগিয়াছে—তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার দ্বারা বিশ্ব-

বিরোধ মীমাংসার পথ আজ অনেকটা প্রশস্ত। তবুও মুষ্টিমেয় লোকের চক্রান্তে সহসা কোন কোন দেশ রণ-উন্মাদ হইয়া উঠে এবং মানব সভ্যতা যে বিপর্যযের সম্মুখীন হয় তাহাপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? মহাঝটিকার মত মহাযুদ্ধ ঘটিয়া যায়, তারপর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দেখিযা পৃথিবী চমকাইযা উঠে। যুদ্ধে লিপ্ত দেশের শস্য-ভাণ্ডার সৈন্যদেব জন্য রক্ষা করিতে হয—ফলে নিরীহ জনসাধারণকে অনাহারে, অল্পাহাবে, অখাদ্য-কুখাদ্য খাইযা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয। দুর্ভিক্ষ, মহামারী যুদ্ধের নিত্যসঙ্গী। বোমা, কামান ইত্যাদির দ্বারা কত সৈন্য ও নিরীহ লোক যে মৃত্যুবরণ করে তাহাব ত' সংখ্যা নাই—তা'ছাডা আহত ও বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যাও বড কম নয। দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং উন্নতিও বন্ধ থাকে—উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয এবং যুদ্ধোদ্যমের জন্য দেশের সর্বপ্রকাব স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করিতে হয। নৈতিক অধঃপতনও যুদ্ধের একটি বিষময় ফল। মৃত্যুর সম্মুখীন হইযা লোক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বেপরোযা জীবনের সুরে মাতিযা উঠে। মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি পৈশাচিক যুদ্ধের আবহাওযায মাথা চাড়া দিযা উঠে।

যুদ্ধ বর্বর যুগের প্রথা: ইহা সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ

মানুষ যতই তাহার সভ্যতার বড়াই করুক না কেন, তাহার অন্তরে জঘন্য লোভ ও পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রহিযা গিযাছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মহা উচ্চভাবের তরঙ্গাঘাতেও মানুষের আদিম প্রবৃত্তি এখনও বুঝি বশীভূত হয নাই—নচেৎ কেন এমন হয? কেন বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি শান্তি-সংস্থাপকদের উপদেশ আমাদেব মন হইতে মুছিযা যায? কেন বারে বারে আমরা প্রতিবেশীর কণ্ঠচ্ছেদনে এমন লালাযিত হইয়া উঠি? কেন আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তির তৃষ্ণা সহসা বিস্মৃত হইয়া আমরা হত্যা-যজ্ঞে মাতিয়া উঠি? দুর্বলের ও অসহাযের শোষণ-প্রবৃত্তি যতদিন না মানুষের মন হইতে বিদূরিত হইবে, ততদিন যুদ্ধের কারণ থাকিযাই যাইবে। পৃথিবী-জোড়া উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায়ই যত যুদ্ধ। উপনিবেশগুলি শোষণের কেন্দ্র বা ঘাটি। কোন্ জাতি কত অধিক দেশ শোষণ করিবে, তাহা লইয়াই পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ। সভ্যতা বিস্তার, অনুন্নত জাতিদের উন্নতিবিধান ইত্যাদি বড

যুদ্ধের কারণ

বড় বুলির আড়ালে দেশের সম্পদ্ লুণ্ঠন, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া দুনিয়ার বাজারে ফলাও ব্যবসা করিয়া নিজ দেশকে সমৃদ্ধ করাই আসল কথা। সাম্রাজ্যলোলুপ জার্মাণ জাতি প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। সে যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর লোক ভাবিল, বোধ হয় ইহাই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধান্তে উপনিবেশ বণ্টনের সময়ে দেখা গেল আদিম সে লোভ-দৈত্য এখনও মরে নাই। কাজেই বাহিরে যে শান্তির আদর্শ প্রচারিত হইল তাহারই আড়ালে আড়ালে লোভের চরিতার্থতা হইতে লাগিল। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইল না—হইল শুধু একটা প্রহসন—বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি বিজিতের কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া হস্ত শৃংখলিত করিল মাত্র। কাজেই পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে আবার পৃথিবীর বক্ষে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত হানিল সেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মাণী। প্রথম মহাযুদ্ধ অপেক্ষা ব্যাপকতায় ও বিভীষিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইয়া উঠিল প্রচণ্ড। কোন দেশ আর নিরপেক্ষ থাকিতে পারিল না। ধ্বংস, মৃত্যু, হাহাকার, আর্তনাদ—পৃথিবীর পৃষ্ঠ বিপর্যস্ত করিল। সাজানো শহর ধ্বংস হইল, সভ্যতা ধূলিসাৎ হইয়া গেল....এবং একদিন সে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু ন্যায় কি প্রতিষ্ঠিত হইল? মানুষের লোভ কি সংযত হইল? শোষণ প্রবৃত্তি কি লুপ্ত হইল? সহাবস্থানের নীতি কি আন্তরিকভাবে স্বীকৃত হইল? বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব কি মুখের কথাই রহিয়া গেল না? নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, সামরিকতাবাদ পৃথিবী হইতে কি লুপ্ত হইয়াছে? কিছুই লুপ্ত হয় নাই। তাহারা ছদ্মনামে রহিয়াই গিয়াছে। কাজেই যুদ্ধাতংকও লুপ্ত হয় নাই। আমেরিকা ও রাশিয়ার অস্ত্রবলবৃদ্ধির গতি দেখিয়া পৃথিবী তটস্থ হইয়া রহিয়াছে—কবে বা আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হইয়া যায়!

অস্ত্রবলের দ্বারা শান্তি আসিতে পারে না

পৃথিবীর লোক শান্তি চাহে—কিন্তু বোমার শব্দ, কামানের গর্জন তাহাদের কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত করিয়া দেয়। মারণাস্ত্র তৈয়ারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ আমেরিকা ও রাশিয়া যেরূপ নির্লজ্জ ও পৈশাচিকভাবে মাতিয়াছে—তাহাতে তাহাদের মুখে শান্তির বাণী যেন 'ভূতের মুখে রাম নামে'র ন্যায় হাস্যকর বোধ হয়। মানুষের প্রাণ শান্তির জন্য লালায়িত—শান্তির পরিবেশেই তাহার উচ্চতর চিন্তারাশি বিকশিত হইতে পারে—পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে পারে। পৃথিবীর মাটিতে

শান্তির বীজ বপন করা হইতেছে সেই বৈদিক যুগ হইতে। বৈদিক মন্ত্রের শেষ "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"—পৃথিবীর কল্যাণ কামনায়, জগদ্ধিতায় ঋষিগণ শান্তি প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের নিরুপদ্রবে, নিরুদ্বেগে জীবনযাপনের উপযুক্ত অবকাশ চাই—স্বাধিকার ও স্বাধীনতা চাই—শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতি আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে স্বীকৃত না হইলে যুদ্ধাতংক পৃথিবী হইতে দূর হইবে না। মানুষের উৎকৃষ্ট গুণরাজির বিকাশদ্বারাই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৌতম বুদ্ধের বাণী আজ পৃথিবীতে পুনঃ প্রচারের সময় উপস্থিত—"অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে—অপরের উপর হিংসা করিবে না—"। যীশুখ্রীষ্টের মত বলিতে হইবে "প্রতিহিংসা আমার (ঈশ্বরের)—আমিই প্রতিফল দিব—" মানুষকে আজ ধর্মভাবাপন্ন হইতে হইবে। নতুবা "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—নিত্যনিঠুর দণ্ড—" চলিতেই থাকিবে। চাই দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন, মনের পরিবর্তন, নীতির পরিবর্তন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধীর নীতি আজ পৃথিবীর পথপ্রদর্শক না হইলে শান্তি-প্রতিষ্ঠা সুদূর-পরাহত থাকিয়া যাইবে। নেহেরু গান্ধীজীর জীবনাদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন যে "পঞ্চশীলের" নীতির উপরে, তাহা অবলম্বনই পৃথিবীর পক্ষে যুদ্ধাতংক নিবারণের একমাত্র উপায়। (১) কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অমর্যাদা করা চলিবে না, (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ নীতি মানিতে হইবে, (৩) প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (৪) সর্বদেশের কল্যাণ-কামনা আন্তরিকভাবে করিতে হইবে এবং (৫) সকলেই যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই পঞ্চশীলের নীতি মানিয়া চলার জন্য চাই ন্যায়নিষ্ঠা।

ভারতই শান্তির পথ দেখাইবে

এই ভারত বহু যত্নে, বহু অধ্যবসায়ে মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র জপ করিয়া আসিয়াছে সেই বৈদিক যুগ হইতে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব মানুষের ভেদবুদ্ধি নাশ করিবে। সেই 'একই বহু হইয়াছেন'—সকল মানুষই সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অংশ—এই বোধ আমাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া সকলের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ করিবে। প্রাচীন ভারতের সাধনা বর্তমান জগৎকে রক্ষা করিবে। তাই প্রাচীন ধারার তরংগ উঠিয়াছিল—শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ, সেই তরংগ হইতে তরংগ

উঠিয়াছিল বিবেকানন্দ। মহাত্মা গান্ধী এক তরংগ—সেই তরংগান্দোলন পশ্চিমী দেশগুলির তটে গিয়া পড়িয়াছে। নেহেরু আরেক তরংগ—শান্তির বাণী দেশে দেশে বহন করিয়া বেড়াইতেন ভারতপুত্র নেহেরু। অস্ত্রবলে বলীয়ান দেশগুলি একদিন বুঝিতে পারিবে যে অস্ত্রবলের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র প্রতিরোধের অসীম শক্তি বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন—দেখাইয়া দিয়াছেন আত্মিক শক্তিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

মানব-প্রেম, মনুষ্য মাত্রেরই প্রতি প্রীতির ভাব বিস্তারই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই প্রেমই জগৎকে রক্ষা করিতে পারে। আদর্শ অপেক্ষা মানুষ বড়—সর্বপ্রকার নীতিবাদ অপেক্ষা মানুষ বড়—মানুষের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করাই পৃথিবী হইতে যুদ্ধাতংক নিবারণের একমাত্র উপায়। "সবার উপরে মানুষ সত্য"—সেই মানুষকে হত্যা করিয়া যাহারা অস্ত্রবলে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তাহাদের মত ভ্রান্ত জগতে আর কে? ঈশ্বর পৃথিবীকে এই ভ্রান্তি-বিলাসের কবল হইতে মুক্ত করুন। শান্তির পরিবেশে মানুষের মন সহস্র-দল পদ্মের ন্যায় দলগুলি বিকশিত করিয়া দিক—সৌরভে পৃথিবী পূর্ণ হউক—আনন্দে জগৎবাসী মৌমাছির ন্যায় গুঞ্জন করিয়া সেই মকরন্দ পান করুক।

উপসংহার

পয়সার আত্মকাহিনী

ভূমিকা

সকলেরই আত্মকাহিনী আছে। তবে যাহারা বড় হয়, জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহাদের আত্মজীবনীই লোকে আগ্রহ করিয়া পাঠ করে—তাহাদের আত্মজীবনীরই আদর হয়। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মুদ্রাবংশের সর্বকনিষ্ঠ, আকারেও ক্ষুদ্র, মানও ক্ষুদ্র। তথাপি আমার জীবনকাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। সকলেরই কত সাধ হয়—আমারও এটি একটি সাধ।

আমি মুদ্রাবংশ-সম্ভূত। মুদ্রাবংশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা ইত্যাদি নানা বিভাগ। ইহাদেব মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য কুলীন—ইহাদের মর্যাদা অধিক। তবে ব্যাপ্তি বা প্রসারের দিক দিয়া তাম্রমুদ্রার স্থান সর্বদেশে, সর্ব-সাধাবণ্যে আমার আদর। তবে মুদ্রাবংশের সকলেব মান সর্বত্র সমান নয। একদেশের মুদ্রার আকৃতি ও মান অন্যদেশেব মুদ্রার আকৃতি ও মান হইতে বিভিন্ন। আমি ভারতীয় মুদ্রা—ভারতেই আমার আদর। আমি টাকাবংশ-সম্ভূত। আমার পূর্বে টাকাবংশে আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, ডবল-পযসা বর্তমানে আব প্রচলিত নাই। তবে তাহাদেব হটাইবার ভার পডিযাছিল আমাদের উপব। আমাব বংশের প্রথম পুরুষ টাকা—তৎপবে পঞ্চাশ পযসারূপী মুদ্রা—তৎপরে পঁচিশ পযসারূপী মুদ্রা—তৎপরে দশ পযসারূপী মুদ্রা—তৎপবে পাঁচ ও দুই পযসারূপী মুদ্রা—ইহারা সকলেই দস্তায নির্মিত। উক্ত বংশেব কনিষ্ঠতম আমি তাম্র নির্মিত। পূর্বকালে মুদ্রাবংশে এই ভারতেই পাইরূপী যে মুদ্রা ছিল আমাকে দেখিলে অনেকের তাহার কথাই মনে হয। আমাব মান প্রতি ১০০ পযসায এক টাকা। গত কযেক বৎসব হইতে পযসাব ঘন ঘন রূপান্তর ঘটিতেছে—মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পযসা যুদ্ধের বাজাবে চালান হইযাছিল। তৎপরে পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি পযসা বাহির হয এবং ছোট চৌকোণা ডবল-পযসার প্রচলন হয। তৎপরে ১লা এপ্রিল ১৯৫৭ সালে আমাব ও আমাব বংশের নতুন মূল্যমানযুক্ত দশমিক মুদ্রার সৃষ্টি হইযাছে।

বংশ পরিচয়

আমি খনির অভ্যন্তবে তাম্র পিণ্ডাকারে এক সময ছিলাম। সেখান হইতে আমাকে ধাতুব বাজাবে পাঠান হইল। তথায় বাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমাকে শোধিত কবিযা রাখিল। কিছুদিন পবে আমাকে সরকারের টাঁকশালে আনা হইল। সেখানে আমাকে ছাচের মধ্যে ঢালিযা চাপ দিয়া রাখিয়া দিল। উঃ! সে সময় আমার ভাবী কষ্ট হইয়াছিল। আমি ত' মূর্ছিত হইযা পডিলাম। তারপর মূর্ছা-ভংগে দেখিলাম আমার আশেপাশে আমার অসংখ্য জাতভাই ঝক্ঝক্ করিতেছে। কত কর্মচারী আসিয়া আমাদের চেহারা দেখিতেছে—তারিফ করিতেছে। পরে সেখান হইতে আমাকে থলিতে বোঝাই করিযা 'কাবেন্সিতে' আনা হইল। তারপর একজন

জন্ম বৃত্তান্ত

আমাদের লইয়া ব্যাঙ্কে গেল। সেখান হইতে একজন আমানতকারীর ব্যাগে ভর্তি হইয়া তাহার বাড়ীতে চলিলাম। পথে অনেকে আমাকে দেখিতে চাহিল। লোকটি সকলকে দেখাইল। কেহ আমার রূপের প্রশংসা করিল, কেহ বা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সরকারকে গালাগালি দিল। আমার জন্মের যে কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে সে সম্বন্ধেও তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিল এবং সরকারের দশমিক মুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টার নিন্দা করিতে লাগিল।

একদিন বাড়ীর সকলের আনন্দ দিয়া পরদিনই আমাকে বাজারে লইয়া গিয়া অন্য মুদ্রার সহিত দেওয়া হইল। নয়া পয়সা বাজারে চালু হইল। কিন্তু সকলেই আমাকে আদর করিতে পারিল না—পুরাতনের মোহে মুগ্ধ অনেকে আমাকে লইতে চাহে না—কিন্তু কতদিন আমাকে ঠেকাইয়া রাখিবে? আমি ক্রমশঃ সকল হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চলিয়াছি। আমার জয় দেখিয়া পুরাতন পয়সা ও সিকি, দুয়ানি, আধুলি, আনি রাগে গস্ গস্ করে, কিন্তু তাহাদের সহিত একই ব্যাগে আমার স্থান হয়। তাহারা নিয়ত আমাকে গালাগালি দেয়। যাহারা নূতন পয়সার হিসাব জানে না তাহারা পুরাতন মুদ্রাদের যত্ন করে কিন্তু পুরাতন মুদ্রা ক্রমশঃ আমাকে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। বাজারে আমার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার নূতন ওজন প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন। সেই ওজন প্রণালী চালু হওয়ায় আমার একটু সুবিধা হইয়াছে। কথায় বলে, "যে সহে, সে রহে"—আমি সহিয়া গিয়াছি। লোকের অনাদর সহিয়াছি। আমার প্রতিষ্ঠা হইবেই।

বাজারের পথে

আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্র সকলের কল্যাণে মনোযোগ দিয়াছেন। আমার কল্যাণের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য আছে। সব হিসাবপত্র দশমিক মুদ্রায় হইতেছে—ডাকঘরে, রেলে, ট্রামে, সরকারী, বেসরকারী, সকল অফিসে পয়সার হিসাব। আমাকে হঠায় কে? আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া লোকের সেবা করিয়া যাইব। সকল হিসাবের মধ্যে থাকিয়া আমি সকলের লেন-দেনের সামঞ্জস্য বিধান করিব।

সরকারের সাহায্য

একদিন আমিও পুরাতন হইব। কিন্তু আমার নাম আমাকে চিরনূতন করিয়া রাখিবে। আমার নাম নয়া পয়সা—পুরাতন হইলেও ঐ নামে আমি সর্বত্র পরিচিত হইব। কিন্তু কালের গতি বিচিত্র—কবির ভাষায়—"কালস্রোতে ভেসে যায়।

উপসংহার

জীবন, যৌবন, ধন, মান—" শুধু কীর্তিই অমর।

আমি যদি ভারতের ঘরে ঘরে অর্থের জন্য হাহাকার থামাইতে পারি, যদি অকিঞ্চনের দুঃখ দূর করিতে পারি, ক্ষুধাতুরের অন্ন যদি আমার বিনিময়ে সুলভ হয় তবে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। সকলের জীবনেই আদর্শ থাকে—আমারও আছে। আমার আদর্শ ভারতের দারিদ্র্য দূর করা—আমি যদি সে আদর্শ সফল করিতে পারি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ কর—আমার যাত্রা সবে সুরু হইয়াছে—তোমাদের আশীর্বাদে আমি জগতের ধন-বৈষম্য দূর করিয়া মানুষের জীবনের সুখ ও শান্তি আনিব।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত সরকার আমার নূতন নামকরণ করিয়াছেন "নূতন" বাদ দিয়া 'পয়সা'।

স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহস্থালী

খনা, গার্গীর দেশে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না একথা সত্য নহে। শাস্ত্রে আছে—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতিযত্নতঃ"। সেই দেশে সহসা স্ত্রীশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া কি করিয়া নারীগণ অসূর্যম্পশ্যা হইলেন তাহা সত্যই আশ্চর্যের কথা। শুধু অসূর্যম্পশ্যা নহে সর্বপ্রকার শিক্ষা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইল। কাজেই বন্দিনী নারীদের একমাত্র কার্য হইল গৃহস্থালী পরিচালনা। কিন্তু গৃহস্থালী পরিচালনা, সন্তানের চরিত্র গঠন, রোগে সেবা, গৃহের পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার জন্য কি কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না? সে শিক্ষা না পাইলে পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হয়। দীর্ঘকাল আমাদের নারীদের আমরা শিক্ষা-দীক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া অমানুষ করিয়া রাখিবার ফল আমরাই ভোগ করিয়াছি।

ভূমিকা

অনেকের মত এই যে নারীর উপযুক্ত স্থান অন্তঃপুর। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার গড়িয়া উঠে—সেই পরিবার সমাজের ভিত্তি গঠন করে। অতএব পুরুষ বাহিরের জগতের কাজে নিযুক্ত থাকিবে, উপার্জন করিবে আব নারী সংসাবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য বিধান করিবে। স্নেহময়ী মাতা, কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, বধূরূপে সে সংসারের সুখের নীড় রচনা করিবে। কাজেই তাহার জন্য সাধারণ শিক্ষাব কোন প্রযোজন নাই—এ ধারণা অতি ভ্রান্ত। উত্তম আহার যেমন শাবীরিক পুষ্টির জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেবই প্রযোজন, তেমনি মানসিক পুষ্টিব জন্য শিক্ষাও সকলের জন্যই প্রয়োজন। শিক্ষার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মেব জাগবণ হয—সে যে বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত এই জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয বলে মানুষ জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তাছাড়া স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সন্তানের চরিত্র গঠনের উপযুক্ত পবিবেশ কখনই গঠিত হইতে পাবে না। মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানকে শিক্ষিত কবাব কাজ অনেকখানি গৃহেই সম্পন্ন হয। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—"যে হাত দোলনায দোল দেয সেই হাতেই পৃথিবী শাসিত করে—" অর্থাৎ মাতাই সন্তানকে পৃথিবী শাসন করাব শিক্ষা দেন। এইজন্যই দেশের উন্নতি নাবী জাতির শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষাহীনা নারী পরিবারকে শ্মশানে পরিণত করে, পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে, সমাজে মহা অনর্থের স্রোত প্রবাহিত করে।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার দ্বার নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেও নারীদের জন্য গৃহস্থালী পরিচালনার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সকলেই মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্না না হইতে পারেন, সকলেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করিতে পারেন—কিন্তু সকলকেই গৃহস্থালীতে নিপুণতা অর্জনে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, রোগীর সেবা, খাদ্যগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা এবং পারিবারিক আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান—এগুলি নারীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা। বিশেষ করিয়া জ্ঞান থাকা দরকার শিশু পরিচর্যার ও শিশু মনস্তত্ত্বের। তা'ছাড়া সেলাই, বোনা, কাটিং, নানা প্রকারের রন্ধন, সুকুমার কলা,

গৃহস্থালী পরিচালনার শিক্ষা

যথা—সংগীত, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য ইত্যাদির চর্চা ও রুচি বিশেষ প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে নারীর যেদিক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই দিকেই তাহাকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

বর্তমানে মানুষের আয় তাহার জীবন-যাত্রার উচ্চ মানের উপযোগী না হওয়ায় অনেক পরিবারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুরুষ অর্থের ধান্ধায় পৃথিবী ঢুঁড়িয়া বেড়াইবে আর নারী বসিয়া থাকিবে এ ধারণা নারীরা আর পোষণ করেন না। তাঁহারাও সংসারের দায়িত্ব ও ভার গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে তাঁহাদের অনেকেই আজ তাঁহাদের পরিবারের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন।

অর্থকরী বিদ্যা

এজন্য যে শুধুই অফিসে চাকুরী বা অন্য কোন বৃত্তি তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইতেছে তাহা নয়, অনেকে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে এবং হস্তশিল্পের মাধ্যমে যথেষ্ট উপার্জন করিয়া পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছেন। যে শিক্ষা মানুষের উদারান্নের সংস্থানে বিন্দুমাত্র কাজে লাগে না সে শিক্ষা কি পুরুষ, কি নারী উভয়ের পরিত্যাজ্য। মানুষ যদি খাইতে না পারিয়া মরে তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বোঝাটি কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে? এইজন্যই দেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে নারী-শিক্ষার এই বিশেষ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে নারী যেন তাহার স্বস্থানে থাকিয়াও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। অবশ্য বিশেষ প্রতিভাবতী নারীদের উচ্চ-শিক্ষার পথ কণ্টকমুক্ত করিয়া দিতে হইবে—বর্তমানে ভারতবর্ষে নারী প্রতিভার যে বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে আমরা আমাদের একাংশকে অকারণে কোণঠাশা করিয়া মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম—তাহাদের প্রতিভার স্ফুরণ হইতে দিই নাই।

শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের সহায়ক। নারীদেরও আত্মবিকাশের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। পুরুষদের জন্য যেমন নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—নারীদেরও সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

উপসংহার

নারী ও পুরুষ লইয়া পরিবার—শিক্ষিত নারী ও শিক্ষিত পুরুষ পরিচ্ছন্ন পরিবার গঠন করিবে—সেই পরিবারের পরিবেশে

দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উন্নত ভাবধারার মধ্যে গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষা বিলাস নহে—ইহা অকর্মণ্য বাস্তববিমুখ ব্যক্তির মানসলীলা নহে—ইহা আমাদের প্রাণ-ধারণের উপায়—ইহা আমাদের সুন্দর জীবন গঠনের সহায়ক—ইহা আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

শিক্ষা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা নিরর্থক। আমাদেব দেশের বর্তমান শিক্ষা আমাদেব জীবনযুদ্ধের পাথেয় যোগায় না—শিক্ষিত বেকারে তাই আজ দেশ ভরিয়া গিয়াছে।

ভূমিকা

আমবা যে পুঁথিগত বিদ্যা শিখিতেছি তাহা আমাদের উদরান্নেব সংস্থানে সাহায্য করে না। বাস্তব জীবনেব সহিত এ শিক্ষার যোগ নাই—সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয হইতে বাহিব হইযা আমরা চক্ষে ধোঁযা দেখি। চাকুরী অর্থাৎ কেবানীগিরি ছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তিব জীবিকাব পথ নাই। চাকুরী আর কত পাওযা যাইবে? তাই আজ দেশজোড়া হাহাকার—বেকার সমস্যা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইযা দেখা দিতেছে। সবচেযে বড শিক্ষা দুনিয়ার বুকে টিকিয়া থাকার উপায করা। বিশ্ববিদ্যালযের কেতাবে সে উপায দেখানো নাই—শুধুমাত্র ভাব ও চিন্তা দ্বারা মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাহার হাত দুইটি তাহার প্রধান মূলধন। সেই মূলধন কাজে লাগাইলে পৃথিবীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা—খাইয়া বাঁচিয়া থাকা যায। কিন্তু আমাদের হাত শিখিযাছে শুধু কলম পিষিতে, মস্তিষ্ক শিখিযাছে পরেব বুলি লইয়া আলোচনা করিতে—আমবা সকলেই হইয়া দাঁড়াইযাছি শিক্ষিত তোতা—অফিসেব দাঁড়ে বসিযা মাসিক ববাদ্দ মাহিনার ছোলা ছাড়া আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য পথ নাই।

দুনিয়া জোড়া কর্মের যে মহাযজ্ঞ হইতেছে তাহাতে আমাদের কি করিবার কিছু নাই? কৃষি কর্ম, কামারের কাজ, কুমারের কাজ, ছুতারের কাজ, যন্ত্রপাতি

তৈয়ারীর কাজ, কোন যন্ত্র সাহায্যে কিছু উৎপাদনের কাজ, চামড়ার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির পুতুল তৈয়ারীর কাজ, প্লাষ্টিকের কাজ, তাঁতের কাজ, কত কাজ রহিয়াছে। আমরা হাত থাকিতে, কর্মশক্তি থাকিতে, মস্তিষ্ক থাকিতে এই সব কাজ হইতে দূরে থাকিলে কে আমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে? আমাদের এই কর্মকৌশল শিখিতে হইবে। কারিগরী-শিক্ষার প্রতি দেশের যুবকদের দৃষ্টি না ফিরাইলে দেশজোড়া বেকার সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না।

দুনিয়া জোড়া কর্মযজ্ঞ

কেহ যদি বলেন যে তাহা হইলে দেশ কি কারিগরের দেশ হইবে? এখানে কেতাবী শিক্ষা কি একেবারে বন্ধ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিতে হইবে? কখনই নহে। যাহারা প্রতিভাশালী, যাহারা মেধাবী তাহারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকুক—কিন্তু যাহাদের সে প্রতিভা নাই, যাহারা তাদৃশ মেধাবী নহে তাহাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে তাহারা দেশের নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে লাগিয়া গেলে তাহাদেরও উদরান্নের ব্যবস্থা হইবে, দেশের অর্থও দেশে থাকিবে। কাজেই শিক্ষাকে দ্বিমুখী করা অত্যাবশ্যক—এক মুখ থাকিবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার দিকে—ইহা ক্রমশঃ উচ্চতর শিক্ষার সোপানরূপে থাকিবে, আর এক মুখ থাকিবে মাধ্যমিক স্তরেই কতকগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রের হাতে কলমে কাজ করার শক্তি ও প্রতিভা নির্ধারণের উপায় রূপে। যে ছাত্র যে বৃত্তির উপযোগী হইবে তাহাকে সেই বিশেষ বৃত্তির ক্রমশঃ উচ্চতর শিক্ষা দিলে সে আপন উদরান্নের ব্যবস্থা ঐ বৃত্তি অবলম্বনেই করিয়া লইতে পারিবে।

কেতাবী শিক্ষা বনাম বৃত্তিমূলক শিক্ষা

গান্ধীজি প্রবর্তিত 'নই তালিমি' বা নব শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা। কোন একটি হস্তশিল্পকে অবলম্বন করিয়া তাহারই মাধ্যমে ছাত্রদের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ইহাতে আছে। বর্তমানে সরকার যে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মূলতঃ গান্ধীজির 'নইতালিমি শিক্ষা'। এই শিক্ষার পূরাপূরি প্রচলন হইলে ছাত্রগণ শিক্ষাকালেই কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হইবার উপায় আয়ত্ত করিতে পারিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা

'কাজই ভগবানের পূজা'—কোন কাজই ছোট নয। সার্থকভাবে কর্ম করিতে পারিলে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হইবে—মানবের সেবায মহৎ আদর্শ আমরা হৃদযঙ্গম করিতে পারিব। যাহারা কাজ করে—তাহারা সমাজের সেবা করে, তাহারা সমাজের হিতকারী বন্ধু। যাহার কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও পরের মাথায কাঁঠাল ভাঙিয়া খায়—কর্মীদের অবজ্ঞা করে তাহারা নরাধম।

কোন কাজ ছোট নয়

নব প্রবর্তিত সর্বার্থসাধক বিদ্যালযে ৯ম শ্রেণী হইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় শীঘ্র দেশের শিক্ষায এক নব অধ্যাযের সূচনা হইবে। আর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না। এই ব্যবস্থায বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বিশেষ শিক্ষক থাকেন। তিনি ছাত্রগণের মানসিক বৃত্তি অনুশীলন করিয়া কে কোন্ বৃত্তির উপযোগী তাহা ঠিক করিয়া দেন।

সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়

দেশের যুবশক্তির অমিত কর্মশক্তি কাজে লাগাইলে দেশ শ্রীসম্পন্ন হইযা উঠিবে। যে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেইকাজে নিযুক্ত করিলে শক্তির অপচয হইবে না। এই বিপুল জনসংখ্যা এই ভাবে সার্থক কাজে নিযুক্ত হইলে ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার আসিবে। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার অত্যন্ত প্রযোজন। শিক্ষা যতদিন সম্পূর্ণরূপে কর্মকেন্দ্রিক এবং শিল্পমুখী না হয ততদিনআমাদের বেকার সমস্যার সমাধান নাই। বর্তমানে এইভাবে শিক্ষার মোড় ফিরাইযা তাহাকে অবস্থানুযাযী না করিলে দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত। সরকার এই বিষযে সচেতন হইযাছেন। এখন জনসাধারণ গতানুগতিক শিক্ষার মোহ ত্যাগ করিয়া এই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে এবং ব্যবস্থার পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করিলে দেশ সত্যই রক্ষা পাইবে।

উপসংহার

—০—

চরিত্র

মানুষ সু ও কু-প্রবৃত্তির ভাণ্ডার। ভাল ও মন্দ দুই প্রবৃত্তিই মানুষের মনে আদিমকাল হইতে বাসা বাঁধিয়া আছে। এই সু ও কু-প্রবৃত্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। যে ব্যক্তি এই সংগ্রামে কু-প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া সু-প্রবৃত্তির অনুশীলনে জীবন পবিত্র করিতে পাবেন আমরা তাঁহাকেই চরিত্রবান্ আখ্যা দেই। চরিত্র মানুষেব দেবোপম প্রবৃত্তিব বিকাশ। অসৎ প্রবৃত্তি মানব জীবনকে কলুষিত করে, জগৎ সংসার নষ্ট করে, মানুষকে ঘৃণ্য পশু পর্যায়ে আনিযা ফেলে। আর সৎপ্রবৃত্তি মানুষকে ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত কবে, মানবজীবন সুখ ও শান্তির নিলয় করে, সংসারকে স্বর্গে পরিণত করে।

ভূমিকা

অসৎ প্রবৃত্তির একটি প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। তাহার একটি ফল হাতে হাতেই পাওযা যায়—তাহা মনোহর, আপাতমধুর কিন্তু অপর একটি ফল কিছু বিলম্বে ফলে—তাহা বিষময়, অনুতাপ জ্বালায ভযঙ্কব। অসাধুতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ মানুষকে নিযত নানা কুকর্মে প্ররোচিত করিতেছে—নানা আপাত-মনোহর ভবিষ্যতের লোভ দেখাইয়া তাহারা মানুষের ঘাডে চডিয়া বসিতেছে। দুর্বল মানুষ তাহাদের বশীভূত হইযা ক্ষণিক সুখেব লালসায শেষ পর্যন্ত দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। লোভ সর্বাপেক্ষা ভযঙ্কর অসৎ প্রবৃত্তি। এই লোভেই পাপ, আর পাপের ফলেই মৃত্যু। অথচ এত দেখিযাও মানুষ শিখে না, কু-প্রবৃত্তির প্রলোভনে সব হারায়।

অসৎ প্রবৃত্তির ফল, আপাত-মনোহর কিন্তু পরিণামে ভয়ঙ্কর

কু-প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে রথে সংযুক্ত দুষ্ট অশ্বের ন্যায সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যায়। যে চরিত্রবান্ সে মনকে সতর্ক সারথি করিয়া রাখে এবং সংযমের চাবুক মারিয়া কু-প্রবৃত্তিরূপ অশ্বদের বশীভূত করে। অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নানারূপ চারিত্রিক ত্রুটি দৃষ্ট হয। এগুলি ক্ষমার্হ নহে। এই দিক দিয়া আমরা কোনদিন তাঁহাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারি না। প্রতিভা অপেক্ষা চরিত্র বড়। কোন বিশেষ ব্যাপারে বা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেই মানুষ পূর্ণ

সংযম ব্যতীত চরিত্রবান হওয়া যায় না

মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না। নির্মম চরিত্র মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী করে। শত শত রাজ্য জয় অপেক্ষা নিজের মনটিকে জয় করা কঠিন। ভাবিয়া দেখ সে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বল কতখানি যাহাকে লোভ স্বধর্মচ্যুত করিতে পারে না—স্বার্থপরতা যাহাকে ভুলাইয়া অপরের ক্ষতিসাধনে প্ররোচিত করিতে পারে না, শত সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও যে বিশ্বাস ভংগ করে না, অসাধুতা আশ্রয় করে না। এইরূপ ব্যক্তিরাই সাম্রাজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখেন, নতুবা পাপের ভারে পৃথিবী রসাতলে যাইত।

বাল্যে মাতাপিতার সান্নিধ্যেই আমাদের প্রথম শিক্ষা সুরু হয়। আমরা গৃহ হইতে যাবতীয় সদ্‌গুণের অনুকরণ ও অনুশীলন করি। পারিবারিক পরিবেশ চরিত্র গঠনের সহায়ক না হইলে বাল্যকাল হইতেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের দিকে আমাদের আসক্তি জন্মে। বাল্যকালে যেসব কু-প্রবৃত্তি আমাদের মনে বাসা বাঁধে বড় হইয়া তাহাদের বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাঁহার মাতা ভগবতী দেবীর প্রভাবে প্রভাবিত না হইলে তিনি দয়ারসাগর বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাসের তেজস্বিতার প্রভাব না পড়িলে তিনি ঐরূপ বজ্রকঠোর এবং অনমনীয় হইতে পারিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব না পড়িলে এবং গৃহ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না হইলে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য চরিত্র হইতে বঞ্চিত হইতাম। পক্ষান্তরে মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় মহা প্রতিভাবান্ কবির উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্য দায়ী তাঁহার মাতাপিতা। তাঁহাদের আদর ও প্রশ্রয় তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই অসংযত, বেহিসেবী, স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মর্মন্তুদ শেষজীবন মানুষ মাত্রেরই মনে সমবেদনা জাগায়—অসংযমের ভয়াবহ পরিণাম দেখাইয়া মানবকে সতর্ক করিয়া দেয়। এছাড়া সংগ বা সংসর্গ হইতে আমরা দোষগুণ আহরণ করি। "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"—অতএব সৎসংগ করা কর্তব্য। কথায় বলে "সৎসংগে স্বর্গবাস, অসংগে সর্বনাশ"—কুসংগ আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের মনে কলংকের ছাপ দিয়া যায়। এছাড়া কু-গ্রন্থ অধ্যয়নেও চরিত্র কলুষিত হয়। এজন্য নির্বাচিত গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

গৃহই চরিত্র গঠনের প্রধান কেন্দ্র

মহাপুরুষগণ জগতে কয়েকটি সদগুণের আদর্শ স্থাপন করিতে আসেন। তাঁহাদের উপর

অনন্ত সংসার বারিধি-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব তরণীকে পথ দেখাইবার জন্য আলোকস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া চারিত্রিক জ্যোতির আলোকে অন্ধকার রাত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত মানবদের উদ্ধার করেন। তাঁহারাও আমাদের ন্যায় প্রলোভনে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনও সু ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় দোলায়িত হইয়াছে, শয়তান সাধুর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাঁহাদিগকেও উন্মার্গগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সংযম বলে তাঁহারা পাপকে জয় করিয়াছেন, প্রলোভনকে পরাভূত করিয়াছেন। প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ এই দুইয়ের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারাও প্রলোভনে পড়িয়াছেন, পাপের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, কু-প্রবৃত্তির মোহ তাঁহাদিগকেও আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু তাঁহারা সেই ক্ষণিক দুর্বলতার কাছে মস্তক নত করেন নাই, আত্ম-বিক্রয় করেন নাই। তাঁহারা সাবধানে সেই প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে আমরাও পাপকে জয় করার, কু-প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার, প্রলোভনকে দমন করার মন্ত্র শিখিতে পারি। এইজন্য মহাপুরুষদের চরিত্র পাঠ করা আমাদের কর্তব্য। তাঁহাদের চরিত্র-জ্যোতি আমাদের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে, আমাদের সুপ্ত বীর্যকে সঞ্জীবিত করে, আমাদের সংগ্রামশক্তি বর্ধিত করে।

মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক

বাহুবল অপেক্ষাও চরিত্রবল বড়। চরিত্রবল সংসারে মহাশক্তির ধারক ও বাহক। এই চরিত্রবলে সংসার টিকিয়া আছে। যাহাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সকল সদ্‌গুণের লোপ না হয় সেইজন্যই মাঝে মাঝে মহান্ চরিত্র ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়। বিবেকানন্দ, গান্ধী, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া এক একটি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রবান হওয়া সংযম সাপেক্ষ সন্দেহ নাই—কিন্তু অসম্ভব নহে। সু-প্রবৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা ও কু-প্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণার ভাব অন্তরে জাগরূক রাখিলে কু-প্রবৃত্তি আমাদের মনে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। এজন্য আত্মালোচনার প্রয়োজন এবং নিজেকে সর্বদা অপাপবিদ্ধ ভাবিতে হয় যে—আমার মধ্যেই সেই বিশ্বাত্মার অংশ রহিয়াছে—আমি মহাশক্তিমান্—তাহা হইলে পাপ আমাদের [illegible]ত করিতে পারিবে না।

উপসংহার

[illegible]

আমার জীবনের লক্ষ্য

ফুল ফোটে, পাখী গান গাহে, নদী বহিয়া যায়, আকাশের বুকে মেঘমালা ভাসিয়া বেড়ায়—তাহারা কি অকারণেই এইসব করে। তাহাদের কি কোন লক্ষ্য নাই?

ভূমিকা

আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য আছে। ফুল ফোটে গন্ধ দানের জন্য, সে আপন অন্তরের ঐশ্বর্য বিশ্বকে বিতরণ করে। পাখী গান গাহে—আপন অন্তরের আনন্দ বিশ্বে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে। নদী পর্বত-দুহিতা, সে বারিকণা বহন করিয়া দেশ-দেশান্তর সরস করে, উর্বর করে। মেঘমালা বারিবহন করিয়া বৃষ্টিধারারূপে দেশকে সিক্ত করিয়া ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে। জগতের সকল কিছুরই লক্ষ্য আছে। মানব জীবনেরও তেমনি একটি লক্ষ্য আছে। পরের কারণে আত্মদান মানব-জীবনের লক্ষ্য। আমিও একজন মানুষ, সেজন্য আমারও ঐ লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু অত বড় লক্ষ্যে ত' সকলেই পৌঁছাইতে পারে না। সেজন্য আমি আমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য

আমি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার পিতামাতা আমাকে মানুষ করিবার জন্য তাঁহাদের বিত্তসম্পত্তি অনেক নষ্ট করিয়াছেন। আমার জন্য তাঁহাদের ত্যাগ স্বীকারের সীমা নাই। কাজেই আমার পরিবার তথা মাতাপিতার প্রতি আমার একটি মহান্ কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। তাছাড়া আমি যে সমাজের মানুষ সে সমাজের প্রতিও আমার কর্তব্য রহিয়াছে। এবং পরিশেষে আমার দেশ—যে দেশে বাস করিয়া আমি মানুষ হইতেছি, সেই দেশেরই আমি একজন নাগরিক। কাজেই সে দেশের উন্নতি ও অবনতির আমি ফলভোগী। সুতরাং সেই দেশের প্রতিও আমার কর্তব্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সকল কর্তব্য ছাড়া আমার নিজের প্রতিও একটু কর্তব্য রহিয়াছে। আমি এখন কিশোর—কৈশোরের সদ্য-প্রস্ফুটিত মনটির মধ্যে কত আশা, কত অভীপ্সা, কত কল্পনা, কত রঙীন স্বপ্ন দূর্বাদলের উপর

মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কবি আমার কথাই কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমরা কিশোর, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে
লক্ষ আশা অন্তরে
রাত্রি দিবা সন্তরে।"

জানি না বাস্তব জীবনের প্রখর সৌরতাপে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষার শিশির মুক্তাগুলি হয়ত শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহা হউক। আমি মনে মনে বলি, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—ফলাফল ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি আমার লক্ষ্যপথে ধাবিত হইব।

আমার জীবনের লক্ষ্য

আমার লক্ষ্য এমন কিছু বড় নহে। পূর্বেই লিখিয়াছি আমাকে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি পালন করিয়া যাইতে হইবে। তাছাড়া মহাপুরুষদের বর্ণিত পরার্থে আত্মত্যাগ—এই আদর্শও আমাকে মানিতে হইবে। এ সকলের সামঞ্জস্য করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে আমি একজন আদর্শ শিক্ষক হইব। ইহাতে অধিক অর্থলাভের আশা নাই। কাজেই আমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করিতে হইলে আমাকে অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষকতা ও পুস্তক প্রণয়ন হইবে আমার জীবনের লক্ষ্য। শিক্ষকতা কার্য দায়িত্বের সহিত নিষ্ঠা-সহকারে সম্পন্ন করিলে আমি আমার সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তব্যগুলিও অনায়াসে করিতে পারিব। তাছাড়া পুস্তক প্রণয়নের দ্বারাও বালক-বালিকাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিতে পারিব। দেশের সম্পদ্—অর্থে নহে, উত্তম নাগরিকে। দেশের ছেলেরা যদি চরিত্রবান হয়, মানুষ হয় তবে দেশে অন্নাভাব থাকিবে না, দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে।

অন্ন সমস্যাই জীবনের একমাত্র সমস্যা নহে

যাহাতে অর্থ নাই, যাহাতে সম্মান নাই, যে বৃত্তি অবলম্বনে চিরকাল সাদাসিধা জীবনযাপন ছাড়া কোনদিন প্রাচুর্যের সম্ভাবনা নাই, সেই বৃত্তি অবলম্বনে কেন আমি উৎসুক তাহা বলা প্রয়োজন। অর্থ জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু অর্থ মানুষের মনের বহুমুখী আশা চরিতার্থ করিতে পারে না। শুধু

অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিলেই মানুষ সুখী হয় না। তাহার সর্বাধিক দায়িত্বের যথাযথ পালন ব্যতীত সে সুখী হইতে পারে না। ভোগই জীবনের একমাত্র কাম্য নহে—কর্তব্য সম্পাদনে, ত্যাগ স্বীকারে, পরের দুঃখমোচনেও যথেষ্ট আনন্দ আছে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষীণ দীপশিখাটি হইতে বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের মনে দীপ জ্বালিয়া দিব....বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপ করিব....ক্রমশঃ আমার ন্যায় আরো অনেকের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে মানুষের দীপালী উৎসব হইবে—অন্ধকার দেশ আলোক-মালায় ঝল্‌মল্‌ করিবে, মণিদীপের ন্যায় সে দিব্যবিভায় বিশ্ব আলোকিত হইবে—সেই সাধনায় আমি তন্ময় হইয়া থাকিব। সেই আমার সুখ। মানুষ গড়িব—মনুষ্যত্বের বোধন করিব।

লক্ষ্যে পৌঁছিবার সাধনা

ছোট মুখে বড কথার মত মনে হইতেছে এসব। কিন্তু বড আদর্শ না থাকিলে মানুষ বড হয় না। শুধু বড আদর্শ নয়, আদর্শে পৌঁছিবার জন্য বড সাধনা চাই। আমাকে আগে মানুষ হইতে হইবে—নিজের চরিত্র সুদৃঢ় করিতে হইবে—আত্মিক শক্তি অর্জন করিতে হইবে। সেজন্য আমাকে নিয়ত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করিতে হইবে। আমার জীবন প্রদীপে যদি যথেষ্ট তৈল না থাকে ত' প্রদীপের শিখা প্রোজ্জ্বল হইবে কিরূপে? সে শিখা হইতে আরো লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলিবে কিরূপে? লোকশিক্ষা বড সহজ কথা নয়। নিজে শিক্ষিত হইতে হইবে, কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে, মানবপ্রেমিক হইতে হইবে, তবেই আমার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব। প্রাচীনকালের তপোবন আমার ধ্যানের নেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক—উজ্জ্বল হইয়া উঠুক বৈদিক যুগের ঋষিদের বেদ রচনার চিত্র—ভারতের মর্মবাণী আমাকে আমার সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

"অসতো মা সদ্‌ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

শিক্ষা কেবল বিশ্বের পুঞ্জীভূত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত পরিচয় নহে।

ফলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের জাগরণ হওয়া চাই—আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত শিক্ষা ব্যর্থ। দেশের কয়েকটি বালক-বালিকার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারিলে ক্রমশঃ দেশ শিক্ষিত হইবে। শিক্ষিত হইলে আত্মপ্রত্যয় বলে তাহারা আপনাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিযা লইতে পারিবে। বর্তমানকালের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ইহাব ফলে শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয জন্মে না। তাই দেশময় এত শিক্ষিত বেকার। বর্তমানকালেব শিক্ষা চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না। তাই আমাদের সমাজে এত শিক্ষিত চরিত্রহীন। স্বার্থপর, বিলাসী, পরমুখাপেক্ষী, পবস্বাপহারক, পরপীডক, লোভী, সহানুভূতিশূন্য এই সকল পিশাচ সমাজে কোথা হইতে আসিল? আমাদেব সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য কোন ভাবধারা নষ্ট করিযা দিতেছে তাহা অনুসন্ধান কবিযা প্রকৃত মনুষ্যত্ব গঠনের শিক্ষা না দিলে দেশ যতই অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ হউক না কেন, অচিবে ধ্বংস হইযা যাইবে।

প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে

আমাব জীবনেব লক্ষ্য মহান, সে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে বহু বাধা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সকল বাধা বিপত্তি উত্তীণ হইতে পাবিলে তবে আমি লক্ষ্যে উপনীত হইব। পূর্বে বলিযাছি আমার মূল মন্ত্র "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু।"—কর্ম করিযা যাইব। লক্ষ্য স্থির রাখিযাছি। মহাপুরুষেদের পদাঙ্ক অবিচলিত চিত্তে অনুসরণ করিব।

উপসংহার

"সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয কীর্তি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয!"

১৫ই আগষ্ট

১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দুইশত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই দিনটি আমাদের আনন্দের, স্বাধীনতা অর্জনের দিন, এজন্য মহা উৎসবে ও আনন্দে আমরা এই দিনটি উদ্‌যাপিত করি। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হইতে সুরু করিয়া ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খল-

ভূমিকা

মোচনের জন্য বারে বারে হিংস ও অহিংস আন্দোলন করিয়াছে—শেষ পর্যন্ত শত শত বীরের আত্ম বলিদান সার্থক করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিল। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বাধীনতালাভের এই শুভদিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিনটি উৎসবের ন্যায় পালিত হইবার যোগ্য। আমরা যে স্বাধীন হইয়াছি—এখন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভার আমাদের উপরই বর্তাইয়াছে—এ দেশকে সুন্দর ও সর্বসুখের নিলয় করা যে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে—এ দেশকে জগতের অপর স্বাধীন দেশগুলির মত করিয়া গড়িবার ভার যে আমাদের—এদেশের কলঙ্কে আমাদের অগৌরব, এ দেশের গর্বে যে আমাদেরই গৌরব—ইহা আমরা এই দিনটিতে একবার সকলে মিলিয়া নূতন করিয়া স্মরণ করি। যখন প্রভাতে চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইয়া তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া দেয়—যখন পত পত্ শব্দে বায়ুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে আপনাকে মেলিয়া ধরে, তখন দেশপ্রেমে আমাদের বুক ভরিয়া উঠে। এই কাপড়ের টুকরাটুকু তখন আমাদের প্রাণে মহা উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ইহার সম্মানের জন্য প্রাণবিসর্জনে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। মনে হয় ইহা যেন কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ। এই সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে দেশের সেই সব শহীদদের কথা—

১৫ই আগস্টের তাৎপর্য

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান"—তাঁহাদের তপস্যার ফলেই আজ আমাদের স্বাধীনতার সূর্যোদয়। তা'ছাড়া এই দিনটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে দেশ সকলের—দেশের প্রতি আমাদের সকলেরই কর্তব্য আছে, দেশের জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে—দেশের সম্মান-রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে হইবে।

প্রভাতে পতাকা-উত্তোলন, শহীদ-বেদীতে মাল্যদান, দেশসেবক ও দেশের জন্য যাহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী-আলোচনা—দেশের মনীষীদের বাণী-পাঠ এবং ড্রিল, সামরিক কুচকাওয়াজ, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্য দিয়া আমরা এই দিনটি অতিবাহিত করি। তা'ছাড়া সূত্রযজ্ঞেরও ব্যবস্থা হয়। চরকা আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয়

সার্থকভাবে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা

জন্মাইয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আত্ম-নির্ভরতার বাণী শুনাইয়াছিল এই চরকা। এখনও চরকা বহু অসহায় নরনারীর জীবনধারণের উপায় করিতেছে। এজন্য এইদিন সুতাকাটার ব্যবস্থা করা হয়। তা'ছাড়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতীয় পতাকা অঙ্গে ধারণ করিয়া আমরা এই পুণ্যদিনটি অতিবাহিত করি। প্রতিগৃহে জাতীয় পতাকা উড়ান হয় এবং পুষ্প ও মাল্যে শোভিত করা হয়। বেতারে বিশেষ বিবরণী প্রচার করা হয়—জাতীয়সঙ্গীত শোনানো হয়। সারাদিন বহুস্থানে অনেক সভার ব্যবস্থা হয়। সে সভাতে দেশের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হয়—দেশাত্মবোধ জাগাইবার জন্য বক্তারা বক্তৃতা করেন। 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণমন' গানের সুর ঝঙ্কারে আমাদের দেহ, মন ও আত্মা অপূর্ব উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠে।

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদলের কণ্ঠে সঙ্গীত দিয়াছিলেন "কদম কদম বঢ়ায়ে যা"—দেশ স্বাধীন হইয়া অগ্রগতির পথে 'কদম কদম' চলিয়াছে। জাতীয়-সরকার গঠিত হইয়াছে—নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে দেশ-গঠনের ও শাসনের ভার অর্পিত হইয়াছে. প্রতিরাজ্যে মন্ত্রিসভা হইয়াছে—দেশের নির্বাচিত—প্রতিনিধিদের বিধানসভা গঠিত হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রদূত দেশে-দেশে প্রেরিত হইয়াছেন, দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রদূত আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছে, অস্ত্রাগারে অস্ত্র উৎপাদিত হইতেছে। বাণিজ্য-ব্যাপারে আমরা আমাদের পুরাপুরি স্বার্থসংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছি। এই শোষিত দেশের যাহা কিছু অভাব ছিল, তাহার পূরণের জন্য সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। বাধ-পরিকল্পনা, শিল্প-পরিকল্পনা, শিক্ষা-পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা, কৃষি-পরিকল্পনা—নানা পরিকল্পনা লইয়া দেশের মনীষীরা আজ দেশকে সমৃদ্ধ ও সুখী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের অবস্থা আজ উন্নতির পথে। রাষ্ট্র সকলের কল্যাণকামনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু সকল ব্যাপারে হয়ত আশানুরূপ সাফল্য মিলে নাই। সেজন্য ক্ষোভ করা বা দেশ-নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

স্বাধীন দেশের অগ্রগতি

সরকারের হাতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ নাই—রাতারাতি কোন-কিছু করাও যায় না। তা'ছাড়া আমাদের দেশ একটি বিরাট উপমহাদেশ—যুদ্ধোত্তর-কালীন বহু সমস্যা এই পরাধীন দেশকে সমাধান করতে হইযাছে—তথাপি একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে যে, আমরা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি। এক্ষণে সরকারের সকল ব্যাপারে জনসাধারণের গঠনমূলক সমালোচনা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তবেই দেশ সত্য সত্যই উন্নত হইবে।

দেশের প্রতি সকলেরই কর্তব্য রহিযাছে। দেশ সকলের। কাজেই, শুধু সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সরকার সকলের জন্যই সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থায তৎপর। সরকারী পরিকল্পনা অলীক নহে। বহু মনীষীর ধ্যানের ফলে ঐ সকল পরিকল্পনার সৃষ্টি। ঐ সকল পরিকল্পনা সরকার রূপায়িত করেন কর্মে। বহু লোকের উপর ঐ সব পরিকল্পনা রূপায়িত করার ভার থাকে। তাঁহাদের প্রত্যেককেই দেশপ্রেমিক হইতে হইবে, ন্যায়নিষ্ঠ হইতে হইবে, কর্তব্যপরাযণ হইতে হইবে—তবেই পরিকল্পনা সার্থক হইযা উঠিবে। স্বাধীনতা আমাদের আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার দিযাছে। আমাদের দৃঢ় প্রযত্ন লইয়া কর্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—এই অশিক্ষিত দেশকে শিক্ষিত করা, স্বাস্থ্যহীন দেশকে স্বাস্থ্যবান্ করা, অন্নহীন ভারতবাসীর অন্নের ব্যবস্থা করা, দুর্নীতির বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দেশকে মুক্ত করা, দেশে শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত করা, দেশের প্রতি আনুগত্য বজায রাখা—এ-সকলই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। আমরা কর্মতৎপর হইলে সরকার আমাদের সাহায্য করিবেন। কিন্তু সকলেই যদি সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকে তাহা হইলে কোন সরকারের সাধ্য নাই যে, এই দেশকে উন্নত করে। দেশ জড় নয়—অসংখ্য প্রাণবন্ত ব্যক্তির সমষ্টিই দেশ। তাহারা জাগিযা উঠিযা সরকার-প্রদর্শিত পথে চলিলেই আমাদের দুঃখের অবসান হইবে। দেশের জন্য আমরা পরাধীন অবস্থায় চিন্তা করিতাম—দেশ-গড়ার জন্য কর্ম করিতাম। দেশ স্বাধীন হওযার পর আমরা যেন আবার পরাধীন হইয়াছি—আমাদের স্বাধীন প্রচেষ্টা যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমরা কর্তব্যহীন হইয়া সরকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

কর্তব্যের আহ্বান

আছি। আমাদের ভাবখানা এই—"হে সদাশয় ভারত-সরকাররূপ কল্পবৃক্ষ, আমাদের জন্য একটি করিয়া ফল দাও—আমরা মুখব্যাদান করিয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছি—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা মানুষের আর কি হইতে পারে?

১৫ই আগস্ট দিনটির তাৎপর্য স্বাধীনতা, স্বাধিকার। স্বাধীন হইয়াছি, ইহা ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেই দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথাও আমাদের মনে জাগিবে। আমরা মানুষের ন্যায় বাঁচিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বিদেশী সরকার আমাদের সে সুযোগ দেয় নাই, তাই আমরা স্বাধীন হইতে প্রয়াসী হই। আজ স্বাধীন হইয়া আমরা আমাদের বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতে চাই। দেশের সম্পদ্ এখন শুধু আমাদের জন্যই ব্যয়িত হইবে—উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নত হইলে সে উন্নত অবস্থার ফলভোগী আমরাই হইব। কাজেই এখন প্রতিটি নাগরিক যদি নিজকর্তব্য যথাযথ পালন করিয়া যায়, তবে আমরা অচিরেই সুখী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সরকারের ত্রুটি আমাদেরই একজনের ত্রুটি—আমাদের লইয়াই তো সরকার; কাজেই আমরা প্রত্যেকে যদি নীতিপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ ও স্বদেশ প্রেমিক হই, তাহা হইলে সরকারও নীতিপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ এবং স্বদেশ-প্রেমিক হইতে বাধ্য। ১৫ই আগস্ট আমাদের প্রত্যেকের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া আমাদের মানুষ হইতে অনুপ্রাণিত করিলে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে চলিবে। ১৫ই আগস্টের অনুপ্রেরণায়—

উপসংহার

"জাগে নব ভারতের জনতা
এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।"

জন-সেবা

ভূমিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "তিনিই (ঈশ্বর) সব হয়েছেন"—ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু তরুলতা নয়; মাটি, পাথর, নিসর্গের সব-কিছুই সেই ভগবানের অভিব্যক্তি। তবে মানুষেই তাঁহার বেশী প্রকাশ। ভাবুক কবি ভক্ত চণ্ডীদাসের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

এই মানুষকে ভগবানের প্রকাশ হিসাবে দেখা এবং তাহার সেবা করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরম করুণাময় গৌতমবুদ্ধ মানুষকে হিংসা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী তিনিই প্রচার করেন। আর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দেন 'জীবকে শিবজ্ঞানে' পূজা করিতে, সেবা করিতে। যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচারকারীদের প্রতি করুণার ভাব পোষণ করিয়া যান এবং তাহাদের দুষ্কর্মের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জনসেবাই ভগবৎ-আরাধনা

মানুষকে ঘৃণা করিয়া, মানুষকে অবজ্ঞা করিয়া, মানুষের সুখদুঃখে উদাসীন থাকিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করা যায় না। বিশ্বপ্রেমিক কর্মবীর বিবেকানন্দ মানবপ্রেমের মহতী অনুপ্রেরণায় বলিয়াছিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষের দুঃখ ও বেদনা তাঁহাকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি একদিন ঘোষণা করেন—"যতদিন ভারতবর্ষে একটিও লোক বুভুক্ষু থাকিবে, ততদিন আমি নিজের মুক্তি চাই না।" মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মার অংশীভূত। কাজেই মানুষের সেবা

করিলে, মানুষের পূজা করিলে ভগবানেরই পূজা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় সুন্দরভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন—

"অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাট্‌ছে যেথায় পথ
খাট্‌ছে বারোমাস।"

ভগবান আছেন "সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।" সতাই বঞ্চিত, বুভুক্ষু, পীড়িত, আর্ত—ইহাদের সেবাই ভগবানের পূজা। বিদ্রোহী কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে মানুষের মহিমা—

"মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে কেতাব, গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ, কেতাব, সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।"

মানুষকে আপন জাতি, আপন স্বজন না ভাবিতে পারিলে তাহার সেবা করার অধিকার জন্মে না। করুণা বা দয়া আমাদের মনে স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে।

ভালবাসাই সেবার মূল

করুণা বা দয়ায় বশীভূত হইয়া আমরা মানুষের সেবা করিতে পারি, কিন্তু সেই সেবার মধ্যে থাকে আমাদের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা—আমাদের আন্তরিকতাও তাহার মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু ভালবাসা বা প্রেম পীড়িত ও আর্তের সহিত আমাদের একাত্মবোধ জন্মাইয়া দেয়। দুঃখী, বুভুক্ষু ও আর্তকে যদি আপনার জন ভাবিতে না পারি, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ কখনও আমরা যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিব না; সুতরাং সে দুঃখ দূর করার জন্য আমাদের সর্বস্বত্যাগবৃত্তি জাগিবে না। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার প্রতিবেশীকে

নিজের মত ভাবিয়া ভালবাসিবে।" "আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"—সকল মানুষকে আপনার ভাই, আপনার আত্মীয় ভাবিতে না পারিলে জনসেবার, মহান্ আদর্শ আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না।

পশু আপনার জন্যই সর্বদা চেষ্টিত, মানুষ পরের জন্যও ভাবে। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। দুনিয়ায় স্বার্থসর্বস্ব মানুষের অভাব নাই। তাহারা আপনাদের সুখ ও ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত। ভুলিয়াও পরের দিকে চায় না। ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসে তাহাদের মনে সমবেদনা জাগে না, দুঃখীর ক্রন্দনে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হয় না, বুভুক্ষিতের হাহাকারে তাহারা নির্বিকার। তাহারা এ-জগতের শুধু স্বার্থই বুঝে—তাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব যে কি, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিয়া পশুর ন্যায় একদিন ভবলীলা সংবরণ করে। ইহাদের মত হতভাগ্য আর কে? কিন্তু যে উদার ব্যক্তির মনোবীণায় মানুষের দুঃখ-বেদনা আর্ত-করুণ মূর্চ্ছনা তুলে, সেই ব্যক্তি কখনও আত্মসর্বস্ব থাকিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি দুঃখময় পৃথিবীকে সুখের নিলয় করিবার চেষ্টায় সর্বস্ব পণ করে। সমাজে এইরূপ লোকোত্তর চরিত্রের মহাপুরুষ বিরল নহে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জনসেবার যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা মেলে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে জনসেবায় আপনাদের উৎসর্গ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতব্যাপী মহা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে যত্নশীল হ'ন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণমিশন' জনসেবার মহৎ আদর্শে আজিও অচল, অটল-ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশায় বিচলিত হইয়া তাঁহার জীবন জনসেবায় উৎসর্গ করিয়া ভারতে সেবার যে মহান আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ আপামর সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়া পতিত, আর্ত, ব্যথিত ও ক্ষুধিতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবের "সর্বোদয় সমাজ"-প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার এক বিরাট অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বাঙালী কবি কামিনী রায় উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

পরার্থপরতার তুল্য গুণ নাই

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন-প্রাণ সকলি দাও—

তার চেয়ে আর সুখ কিবা আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

এই ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল হইতেই অতিথিসেবার জন্য বিখ্যাত। অতিথির তুষ্টির জন্য শিবি রাজা আপন দেহের মাংস কাটিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন, তথাপি একটি আশ্রিত, শরণাগত কপোতকে পরিত্যাগ করিয়া শ্যেনকে তুষ্ট করেন নাই। অতিথিসংকার করিবার মহতী প্রেরণায় সীতাদেবী ভিক্ষুকরূপী রাবণের কবলিত হইয়াছিলেন! যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে অতিথিসেবার যে বিরাট আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অতিথি-আপ্যায়ন ও সেবার ভার লইয়াছিলেন। অতিথিসেবা ছিল গৃহস্থের পরম ধর্ম। প্রত্যেকের বাড়ীতেই সেকালে একটি করিয়া অতিথিশালা ছিল। তাছাড়া দরিদ্রের সেবার নাম দেওয়া হইয়াছিল "দরিদ্রনারায়ণের সেবা"। দীন-দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করার আদর্শটি অতি মহৎ। ইহাতে সেবায় ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা জন্মে—মানুষের মন উদার ও উচ্চ হয়। বুদ্ধদেব ছিলেন প্রেমের অবতার। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মধ্য দিয়াই বৌদ্ধযুগে জনসেবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সেবার আদর্শটি এদেশে বহু প্রাচীন

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আর্ত ও পীড়িতের প্রতি কর্তব্যবোধ স্বাভাবিক। সকল দেশেই দুঃস্থ, পীড়িত, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও অসমর্থদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান আছে। এই-সব দুঃস্থ লোক সমাজেরই অন্তর্গত, কাজেই ইহাদের উপর সমাজের যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক 'রেডক্রশ'-প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ইহাছাড়া প্রত্যেক দেশেই দাতব্য-চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, গরিবখানা ইত্যাদি আছে। মানুষ যে সেবার মহৎ আদর্শটি ভুলে নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কোন আকস্মিক বিপৎপাতের সময়ে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংঘটিত হইলে দেশের মধ্য হইতেই প্রথমতঃ সেবকদল বাহির হইয়া আর্তদের সেবায় লাগিয়া যায়—বিদেশ হইতে বহু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহায্য আসে। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। মানুষ যে জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা দেখিয়া সত্যই মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাস ফিরিয়া আসে।

সকল সভ্যদেশেই জনসেবার জন্য প্রতিষ্ঠান আছে

জনসেবার বহু দিক্ আছে। প্রকৃত সেবক শুদ্ধ মনে কাজ করিয়া গেলে সেবার মধ্য

দিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারেন। সেবার আদর্শটি অতি মহান্। অনেক ভণ্ড সেবক আত্মস্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য পরোপকারের মুখোস পরিয়া সেবার ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের ন্যায় নীচব্যক্তি সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। ইহারা ক্ষুধিতের অন্ন চুরি করে, দুঃস্থের ব্যবস্থায় ভাগ বসায়, দাতব্য চিকিৎসালয়ের দাতব্য-দ্রব্যাদির বহুলাংশ আত্মসাৎ করে। ইহাদের ন্যায় পাপাত্মা আর কে?

উপসংহার

পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

ভূমিকা

ছাত্রজীবনে পরীক্ষা এক মহা দুশ্চিন্তার কারণ। পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য ছাত্রগণ সারাবৎসর কঠোর পরিশ্রম করে। পঠিতব্য বিষয়গুলি আয়ত্ত করিবার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের পাঠন সব সময় মন দিয়া না-শুনার ফলে অনেক কিছু তাহাদের দুর্বোধ্য থাকিয়া যায়। যাহারা ঠিকমত শিক্ষকগণের পাঠন মন দিয়া শুনে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঠিকমত বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারে না। সেজন্য অর্থপুস্তক, গৃহশিক্ষক বা গৃহের কোন অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে তাহাদের ঐ সব দুর্বোধ্য বিষয় আয়ত্ত করিতে হয়। সব-কিছু সব সময়ে আয়ত্ত হয় না, সেইজন্য অনেক বিষয় বাছাই করা হয়। পরীক্ষায় কিরূপ প্রশ্ন আসিবে, সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লিখিতে ছাত্রগণ সমর্থ হইবে কিনা—এই সব দুশ্চিন্তা তাহাদের আকুল করিয়া তোলে। তাহাদের ক্ষুদ্র চিত্ত অধীত বিষয়ের আধিক্যে ভরপুর হইয়া থাকে, তদুপরি এই দুশ্চিন্তা। যাহাদের স্মৃতিশক্তি আছে তাহারা কতকটা নির্ভয় থাকে। যাহাদের মেধা আছে, তাহারা নির্বিকার থাকে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রগণ অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং কেবলই মনে করে—এইটা একবার দেখি, ঐটা বাদ দিয়া ভাল করি নাই, ইত্যাদি।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা একটি বিভীষিকা হইয়াছে। ইহার আতঙ্কে ছাত্রগণের

নিদ্রা হয় না। দুশ্চিন্তায় তাহারা আকুল হইযা বেড়ায়। তা'ছাড়া পরীক্ষার পদ্ধতি ত্রুটিশূন্য নহে। শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্য দিয়া ছাত্রগণ কিভাবে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার মান নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক। নতুবা কযেকটি প্রশ্নের উত্তরের ভালমন্দের উপর কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা নির্ভর করিলে ছাত্রগণের প্রকৃত গুণাগুণ বিচার করা হয না। অনেক ছাত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যযন করে—তাহাদের পঠিতব্য বিষয়ের জ্ঞান ব্যাপক; কিন্তু তাহার মধ্য হইতে বাছাই করা কোন বিশেষ প্রশ্নের সম্বন্ধে হযত ঐ ছাত্রগণ সাধারণভাবেই কিছু লিখিতে পারে। অপর পক্ষে যে সব ছাত্র চিহ্নিত বিষয-সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর তৈযারী করে, তাহাদের উত্তর অনেক ভাল হয, কিন্তু পঠিতব্য বিষযের সর্বাঙ্গীন জ্ঞান তাহাদের একেবারেই থাকে না। অথচ পরীক্ষায এই দ্বিতীয শ্রেণীর ছাত্রগণই ভাল ফল করে। এইরূপ প্রশ্নের ব্যাপারে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে অনেক অল্পবিদ্যার ছাত্র সহসা ভাল ফল করিয়া বসে। তা'ছাড়া প্রশ্ন বাছাই করিয়া উত্তর করাব উপায ছাত্রগণ অবলম্বন করে। পরীক্ষক প্রাযশঃই সেই গতানুগতিক পদ্ধতির প্রশ্ন দিযা তাহাদের মুখস্থ বিদ্যার প্রশ্রয়ই দেন। ছাত্রের প্রকৃত জ্ঞান বা বিদ্যার পবিচয় লাভ করিতে হইলে যেরূপভাবে প্রশ্ন করা প্রযোজন, তাহা প্রাযশঃই করা হয না। অনেকটা লটারি খেলার মত ব্যাপার হইয়া যায এবং এই পরীক্ষাব ফলাফলের উপরেই কৃতকার্যতা নির্ভর করে। দুই বা এক বৎসরে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা তিন ঘণ্টার মধ্যে দিতে হয়। এই চিরাচরিত পরীক্ষা-পদ্ধতির জন্যই পরীক্ষা ছাত্রগণের কাছে বিভীষিকা হইয়া আছে। সেজন্য পরীক্ষার পূর্বরাত্রি ভয-ভাবনা, আশঙ্কা-উদ্বেগ, উত্তেজনা ইত্যাদিতে ছাত্রগণের ক্ষুদ্র মন উদ্বেল হইযা উঠে। পরস্পর পরস্পরের কাছে নানা উত্তরে জানিতে চায় এবং সেরূপ প্রশ্ন আসিলে কিরূপে উত্তর করিবে, সেই চিন্তায আরো ব্যাকুল হয়।

পরীক্ষা-বিভীষিকা

ছাত্রদের মধ্যে সকলেই একরকম নহে। কেহ কেহ বৎসরের প্রথম হইতেই নিয়মিত পাঠাভ্যাস দ্বারা সকল পঠিতব্য বিষয় গুছাইয়া আয়ত্ত করে। ইহারা পরীক্ষার সময়ে একটু বেশী মনোযোগ-সহকারে পড়িলেও ইহাদের সবই পূর্ব হইতে আয়ত্ত করা থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে অধীর ভাব থাকে না। ইহারা অতিরিক্ত উদ্বেগও ভোগ

নিয়মিত অধ্যয়নশীল ছাত্রদের কথা

করে না। ইহাদের চেষ্টা—যাহাতে মনটি বেশ স্থির থাকে। ইহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ না হইলেও ইহারা বিবেচকশ্রেণীর। এইজন্য পরীক্ষার পূর্বরাত্রে ইহারা আগাগোড়া সমস্ত বিষয়টি একবার এক নজরে দেখিয়া লয়। কোন বিশেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ থাকে না—উহারা সমস্ত পঠিতব্য বিষয়ের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখার জন্য ইহারা পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই পড়াশুনার মাত্রা একটু কমাইয়া দিয়া মনে-মনে অধীত বিষয়ের অনুশীলন করে। কেহ কেহ বা দীর্ঘ সময় ধরিয়া একাকী নির্জনে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং মনের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

অমনোযোগী, অনিয়মিত অধ্যয়নকারীর অবস্থা

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হয় সেই সব ছাত্রের, যাহারা কিছুটা বুদ্ধিমান্, কিন্তু অত্যন্ত অলস। বুদ্ধিমান্ বলিয়া ইহারা অনেক সময়ে 'ধারে কাটে'। সারাবৎসর না পড়িয়া শুধু পরীক্ষার পূর্বে কয়েক মাস পড়িয়া সব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের স্মৃতিশক্তিই ইহাদের পাথেয়। ইহারা অল্প পরিশ্রম করিয়া ভাল ফল লাভ করার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে পটু। ইহারা বহু সম্ভাব্য প্রশ্ন সংগ্রহ করে এবং তাহাদের উত্তরও সংগ্রহ করিয়া লয়। এইসব উত্তর হইতেই জোড়াতালি দিয়া ইহারা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লেখে। সমস্ত পঠিতব্য বিষয় ইহারা ভাল করিয়া পড়ে না বলিয়া আতঙ্কের ধাক্কা ইহাদের সামলাইতে হয় প্রচুর। ভয়-ভাবনা ইত্যাদি ইহাদের সর্বাধিক। ইহারা পরীক্ষার পূর্বরাত্রে সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ ভোগ করে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করিতে থাকে। ফলে ইহাদের মস্তিষ্ক গরম হইয়া যায়। অনেকে পরীক্ষায় শোচনীয় ভাবে অকৃতকার্য হয় বা আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হয়। পরীক্ষার পূর্বের পরিশ্রমের ফলে পরীক্ষার সময়ে ইহাদের মনন-ক্ষমতা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনের স্ফূর্তিও নষ্ট হয় এবং সতেজ ভাব একেবারেই থাকে না। ইহাদের মধ্যে যাহারা অল্প বুদ্ধিমান্ বা বোকা, তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়। অতিরিক্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনার ফলে তাহারা অনেক সময় জানা উত্তরও ঠিকমত লিখিতে পারে না—বিশেষতঃ গণিতে বহু অঙ্ক ভুল করিয়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

•

পরীক্ষার জন্য যে যেভাবেই প্রস্তুত হউক না কেন, সকলকেই মন হইতে পরীক্ষা

বিভীষিকা দূর করিতে হইবে। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে পরীক্ষাকে গ্রহণ না করিলে পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাইবে না। পরীক্ষার জন্য ভয় ও আতঙ্ক সারাবৎসর যদি জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ছাত্রের পক্ষে তাহা বরং কল্যাণকর। পরীক্ষার বিভীষিকা ছাত্রদের মধ্যে অতিমাত্রায় সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই মুখস্থ বিদ্যার এত প্রচলন হইযাছে। বুঝিবার কোন বালাই নাই, 'যেন তেন প্রকারেণ' কতকগুলি পরের ভাব মুখস্থ করিয়া হয়ত বর্তমানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানের দ্বার মুখস্থবিদের সম্মুখে চিরকাল অর্গলবদ্ধ থাকিয়া যায়। পরীক্ষাকে ছাত্রগণ যতদিন পর্যন্ত খেলোয়াড়ী মনোভাবের সহিত গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন পর্যন্ত ইহা ক্ষতিকারকই থাকিয়া যাইবে। খেলোয়াড় খেলার পূর্বদিন ভাবে যে, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় কিরূপে খেলিলে তাহার পাল্টা প্যাঁচ হিসাবে সে কি ভাবে খেলিবে? অনুশীলন খেলায় সে খেলিয়া আনন্দ পায়—খেলার নানাবিধ কসরৎ দেখায়। ক্রমশঃ এইসব কসরৎ তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়। যে কোন খেলাতেই সে এইসব কসরৎ দেখাইতে পারে। দৈবাৎ হযতো ভুল করে, হযতো খেলায় হারে—কিন্তু হারজিতকে খেলার অঙ্গহিসাবেই সে গ্রহণ করে। পরীক্ষার্থীকে এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ফলাফলের চিন্তায় অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন না হইযা আপন বুদ্ধিবৃত্তি, মনন, নির্বাচন ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া শান্তভাবে পরীক্ষা দিতে যাইতে হইবে। খেলার কসরৎ সে যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, পরীক্ষাতে তাহাই দেখাইবে। হয়তো কোন স্থানে ভুল হইবে—হয়তো বা সেজন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে—কিন্তু তাহা লেখাপড়ার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফল ছাত্রজীবনে কল্যাণকর হইবে।

পরীক্ষা-বিভীষিকা মন হইতে দূর করিতে হইবে

নৈতিক শিক্ষা সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা। অথচ অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য অনেক অসদুপায় অবলম্বন করে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ অসদুপায়-অবলম্বন অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয। নকল করার ন্যায় মুখস্থ বিদ্যাবলে পরীক্ষা দেওয়াও দুর্নীতি। রবীন্দ্রনাথ মুখস্থবিদ্‌দের সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "ইঁহারা মস্তকের মধ্যে গোটা বইখানি চুরি করিয়া নকল করে।"

পরীক্ষায় জন্য অসদুপায়-অবলম্বন

অধ্যয়নে নিষ্ঠা না থাকিলে বিদ্যার্জন হয় না। ফাঁকি দিয়া পরীক্ষায় পাস করা যায়,

তাহাতে বাছাই করা প্রশ্ন মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-সাগর সন্তরণে পার হওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যার্জন হয় না। মুখস্থ বিদ্যার দৌড বেশী নয়। এইজন্যই আজ ডিগ্রীধারীদের মধ্যেও এত অজ্ঞ ও অর্বাচীন দেখিতে পাওয়া যায়। পরাক্ষার্থীদেব মনে রাখা উচিত যে, তাহার অর্জিত জ্ঞানেরই সে পরীক্ষা দিতে যাইতেছে—তাহাব মধ্যে যেন খোঁড়াইয়া বড হইবার প্রবৃত্তি দেখা না দেব। যাহা সে প্রকৃত জানে না, তাহাও সে জানে এরূপ ভাণ করার মধ্যে কৃতিত্ব নাই। মুখস্থ বিদ্যা দ্বারা হুবহু এরূপ ভাণ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা ধরা পড়িয়া যাইবেই।

উপসংহার

মহাপুরুষের জীবনী-পাঠের উপকারিতা

কোন জাতির গুণাবলীব প্রকাশ হয সেই জাতির মহাপুরুষদের চরিত্রে। যাহাতে জগৎ হইতে মহান্ গুণাবলী লুপ্ত হইয়া না যায সেইজন্য বারে বারে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহাবা সাধারণ লোকদেব পথ দেখান, তাঁহাদের উচ্চ আদর্শের প্রতি সকলেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদের চরিত্র-মাধুর্য সকলকে প্রীত কবে এবং তাঁহাদের জীবনের কল্যাণকর প্রভাবেব স্পর্শে সাধারণ লোক প্রভাবিত হয। সেইজন্যই বলা হইযাছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। সমাজ মহাজনের পথে চলিবার চেষ্টা কবে বলিয়াই মানুষ আজও পশুত্বে নামিযা যায় নাই।

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে প্রত্যহ কত হাজার হাজার লোকের জন্ম হইতেছে; আবার কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া কালসমুদ্রে মিশিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক-একজনকে মানুষ ভুলিতে পারে না—তাঁহাদের স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিতে চায়—তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি জানবার জন্য মানুষের কত না আগ্রহ। ইঁহারা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় খাইযা, শুইয়া ভোগসুখে জীবন কাটাইযা যান নাই—তৃণখণ্ডের ন্যায় গতানুগতিকতার স্রোতে ইঁহারা ভাসিয়া যান নাই—ইঁহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি

মহাপুরুষ কাহারা

করিয়া বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহবা প্রতিভারূপ অগ্নির দীপ্তিতে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার আলোকিত করিয়াছেন, কেহ বা অপূর্ব সংগঠনশক্তিবলে সমাজকে নূতন করিয়া মানুষের নিজকৃত বহু দুঃখের জ্বালা হইতে উদ্ধার করিযাছেন, কেহবা লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থা হইতে জাতিকে মুক্ত করিযাছেন, কেহবা দুঃস্থ পীড়িত আর্তদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিযাছেন। কেহবা মানুষের স্থাযী সুখেব সন্ধানে কঠোর সাধনায সিদ্ধিলাভ করিযা মানুষকে অমৃতের সন্ধান আনিযা দিযাছেন। ইঁহারা কেহই স্বার্থসর্বস্ব নহেন, সকলেই পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিযা মানুষেব কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়া গিযাছেন।

ইঁহাদের জীবনী পাঠের উপকারিতা

মহাপুরুষদেব জীবনী পাঠ করিলে আমাদের মনেব প্রসাব জন্মে। মানুষ কিভাবে দুঃখ, বিপদ, অভাব, প্রলোভন ইত্যাদিব সহিত সংগ্রাম কবিযা বড হয, তাহা আমবা দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমবা প্রচুর শিক্ষালাভ কবিতে পারি। অনেকের ধারণা যে, মহাপুরুষেরা বিধাতার আশীর্বাদে ক্ষণজন্মারূপে অশেষ গুণাবলী লইয়াই ধরণীতে আবির্ভূত হন—তাঁহাদের সাধারণ মনুষ্যের ন্যায পাপের প্রলোভনে পডিতে হয না, দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইতে হয না, বিরুদ্ধযুক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হয না। একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁহারাও সাধারণ মনুষ্য। তাঁহাদেরও বহু সংগ্রাম করিতে হইযাছে—বহু প্রলোভন জয করিতে হইয়াছে, বহু দুর্বলতা কাটাইতে হইযাছে, তবে তাঁহারা বড হইযাছেন। সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ এইখানে যে, যখন সাধাবণ মানুষ হাল ছাড়িযা হতাশ হইযা পড়ে, ইঁহারা তখনও একনিষ্ঠভাবে কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। এই দৃঢ়তাই মহাপুরুষদেব উন্নতির সোপান। নিষ্ঠা ব্যতীত জগতে কোন কর্মে সাফল্যলাভ হয না। মহাপুরুষদের জীবনী-পাঠে আমরা আদর্শনিষ্ঠা শিখি—একাগ্রতা, তন্ময়তা, দৃঢ়তা, অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—ইত্যাদি ব্যতীত কেহই বড হইতে পাবে না। ব্যক্তিগত জীবনের বহু সমস্যা আমরা মহাপুরুষদের জীবনের আলোকে সমাধান করিয়া লইতে পারি। তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় আমরা লাভবান্ হই, সতর্ক হই। এইজন্যই আমাদের মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রয়োজন।

যাহার জীবনে একটা বিশেষ আদর্শ আছে, সে সেই আদর্শের মহাপুরুষদের

জীবনীপাঠে প্রভূত উপকার পাইবে। যে কবি হইতে চায়, তাহার পক্ষে বড় বড় কবিদের জীবনী পাঠ সত্যই অত্যন্ত উপকারী। বিজ্ঞান-সাধনা যাহার আদর্শ, সে বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়িলে যত উপকৃত হইবে, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন কবির জীবনী-পাঠে ততদূর উপকৃত হইবে না। দেশ-সেবক দেশসেবীদের জীবনী-পাঠে যতখানি উপকৃত হইবে, এত আর অন্য কোন লোকের জীবনী-পাঠে হইবে না। এইভাবে নির্বাচিত মহাপুরুষদের জীবনী-পাঠে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকৃত হইতে পারি। বিজন সমুদ্রে অন্ধকারে যখন চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া দিক্‌চিহ্ন লুপ্ত হয়, তখন আলোক-স্তম্ভের আলো যেমন বিপন্ন পথভ্রান্ত অর্ণবপোতকে সতর্ক করিয়া পথনির্দেশ করে—সেইরূপ মহাপুরুষদের জীবনীও প্রোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে আমাদের সংসার-সমুদ্রে পথনির্দেশ করে।

বিশেষ লোকের পক্ষে বিশেষ বিশেষ জীবনী-পাঠ উপকারী

ইতিহাস মানুষের সমষ্টিগত জীবনের আলেখ্য। জীবনচরিত মনুষ্যবিশেষের ইতিহাস। ইতিহাস জগতের অতীত কথায় পরিপূর্ণ। জাতির পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থাটির হুবহু আলেখ্য ইতিহাসে মেলে। জাতির কোন্ আশা কিভাবে সাফল্য লাভ করিল, কিভাবে কোন্ জাতি উন্নতির সু-উচ্চ সোপানে ক্রমান্বয়ে আরোহণ করিল, আবার কিভাবেই বা কোন্ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা জলবুদ্বুদের ন্যায় সহসা শূন্যে মিলাইয়া গেল, তাহা আমরা ইতিহাস-পাঠে নিয়ত শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। মনুষ্যের জীবন-চরিতে সেইরূপ একটি বিশেষ মনুষ্যের জীবনের আলোছায়া, আশা-হতাশা, সাফল্য-অসাফল্যের চিত্র দেখি। কার্য-কারণ-সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে আমরা এই সকল জীবনী হইতে মহাশিক্ষা আহরণ করিতে পারি। মনুষ্যবিশেষের জীবনী আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে জাগাইয়া দেয়—মহৎ প্রেরণায় আমাদের প্রাণ পূর্ণ করে।

জীবন চরিত মনুষ্য বিশেষের ইতিহাস

জাতির বিশেষ প্রয়োজনের সময়েই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এক-এক ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে। তাঁহারা সমাজব্যাপী ভাবধারা মন্থন করিয়া যেন সমস্তার

সমাধান করিয়া দেন। ঠিক সময়ে ঠিক লোকটি কেমন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা এক মহা বিস্ময়ের ব্যাপার। পরাধীনতার গ্লানি হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্যই দেশে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ, দেশবন্ধু, তিলক প্রভৃতি মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। দেশকে আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষদের মধ্যে জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়

বাঙালীর ভাবধারা যখন ইউরোপীয় ভাবধারার স্পর্শে লুপ্তপ্রায়, তখনই বিদ্যাসাগর, আশুতোষ প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। সমাজ যখন অতিমাত্রায় স্বার্থসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহারা নূতন আদর্শের দীপবর্তিকা জ্বালিয়া জাতির চলার পথ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার

পরশ-পাথরের সংস্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতু লোহও কাঞ্চনে পরিণত হয়। মহাপুরুষেরা এইরূপ পরশ-পাথর। জীবিতকালে ইঁহাদের সান্নিধ্যে বহু লোক উপকৃত হইয়াছে। মরিয়াও ইঁহারা ইঁহাদের জীবনীর পরশ-পাথর স্পর্শে বহু লোককে কাঞ্চনে পরিণত করিতেছেন। কাজেই ইঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করা সকলেরই কর্তব্য।

—o—

শিক্ষা—গৃহে ও বিদ্যালয়ে

যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি। মানুষের শিক্ষা সারাজীবনব্যাপী। এই শিক্ষার সূত্রপাত হয় মাতৃক্রোড়ে। তারপর জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই আমাদের কিছু-না-কিছু শিক্ষালাভ করিতে হয়। জীবনব্যাপী এই শিক্ষার ব্যাপকরূপের মধ্যে, পরিবারের পরিবেশের মধ্যে এবং বিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষালয় বা কলেজের মধ্যে যে শিক্ষা আমরা পাই, তাহাই প্রধান। সমাজের মধ্যে ও সভা-সমিতিতে লোকজনের সান্নিধ্যে আমরা বহু বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকি।

ভূমিকা

গৃহেই আমাদের সকল শিক্ষার হাতে খড়ি। শৈশবে মাতাপিতা ও গৃহের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই আমাদের প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই শিক্ষা শুধু আক্ষরিক জ্ঞান মাত্র নয়, এই শিক্ষা বহুব্যাপক—এই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। গৃহের পরিবেশেই আমাদের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রথম উন্মেষ হয়—আমাদের চরিত্রের ভিত্তি এইখানেই গঠিত হয। মাতাপিতা সুশিক্ষিত হইলে তাঁহাবা সন্তানেব চরিত্র-গঠনে যত্নশীল হন এবং আদর্শ শিক্ষায তাহাকে শিক্ষিত কবিতে পারেন। অধিকাংশ গৃহের পরিবেশ অত্যন্ত সাধাবণ। সেখানে সন্তানের চবিত্র গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয। কাজেই সন্তানের শিক্ষা তাহাব মধ্যে এলোমেলো ভাবেই হইতে থাকে। তথাপি অধিকাংশ বাঙালী-পরিবারেব মধ্যে যে লুপ্তপ্রায আদর্শ-গুলি এখনও বর্তমান, তাহাদের স্পর্শেই সন্তানের চবিত্রও গঠিত হয। স্নেহ, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আদেশপালন, আশ্রিত-বাৎসল্য, কর্তব্যবোধ, স্বজনপ্রীতি, সমবেদনা, দাযিত্বজ্ঞান, শিষ্টাচার, সহনশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন গৃহের পবিবেশেই হইযা থাকে। তা'ছাডা পবিবারের ব্যক্তিদের চবিত্রের প্রভাব পরিবারস্থ সন্তানের চবিত্রকে প্রভাবিত কবে। এই প্রভাব ভালও হইতে পাবে মন্দও হইতে পারে। পবিবারের প্রভাব মন্দ হইলে সন্তানের চবিত্রে যে প্রবণতা জন্মে, তাহা পরবর্তী জীবনে কাটাইয়া উঠা একেবারেই সম্ভব হয না। গৃহের শিক্ষা যে মানবজীবনে কতখানি স্থাযী প্রভাব বিস্তার করে, তাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিযাছেন এবং গৃহের মন্দ প্রভাব হইতে মুক্ত করিবাব জন্য বর্তমানে আবাসিক বিদ্যালযেরও প্রবর্তন বহুদেশে হইযাছে। আমাদের দেশেও গুরুকুল-শিক্ষাপদ্ধতি ছিল। সন্তানগণ গুরুর সান্নিধ্যে থাকিযা মানুষ হইযা পরিবারের মধ্যে ফিরিয়া আসিত। পরিবারেব প্রীতিপ্রদ পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হইযা বালক-বালিকাদের আবাসিক শিক্ষার ফল যে সর্বথা কল্যাণকর হইবেই, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। স্নেহ ও প্রীতির পরিবেশ সন্তানের চরিত্রগঠনের অনুকূল বলিয়াই পারিবারিক পরিবেশ অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা—গৃহে

বিদ্যালয়ের অপর নাম শিক্ষালয়। শিক্ষা দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহের পরিবেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করার

প্রয়োজন হয়, সেই শিক্ষার ব্যবস্থা সামাজিকভাবে সকল পরিবারের সুবিধার জন্য করা হইয়াছে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। উপযুক্ত শিক্ষকগণ এখানে বহু পবিবারের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদানের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবনগঠনে প্রচুর সহায়তা করে। বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সহিত পরিচয লাভ করে। এই সকল জ্ঞানলাভ করিযা তাহারা পরিবারের মধ্যে ফিরিয়া তাহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ কবিলে পরিবাবেরও প্রকৃত উপকার হয। চারাগাছকে যেমন পরিচর্যা করাব প্রয়োজন, তাহাব গোড়া খুড়িয়া দিতে হয়, নিযমিত জল দিতে হয়, পোকামাকড়ে পাতাগুলি না খাইযা ফেলে, তাহা দেখিতে হয়, গরু-ছাগলে না মুড়াইযা দেয়, সেজন্য বেড়া দিযা ঘিরিয়া দিতে হয—মানব-সন্তানগণের জন্যও তদ্রূপ ব্যবস্থার দরকার। এই জন্যই স্কুলেব জীবনে 'কটীন' বা সুকঠোর নিযম-নিষ্ঠাব ব্যবস্থা আছে। এই নিযমনিষ্ঠা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপদে প্রযোজন। অধ্যয়ন যেমন ছাত্রের তপস্যাস্বরূপ, সেইরূপ আবও বহু ব্যাপারে তাহাকে তপস্যা বা সাধনা করিতে হয়। ব্যবহাবিক জীবনের প্রস্তুতি এই ছাত্রাবস্থা। এইজন্য স্কুলে আদর্শ-গুলি তত্ত্বের আকাবে ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত হয। ছাত্ররা সেই সব তত্ত্ব ব্যবহাবিক জীবনে প্রযোগ করে। ভূগোলপাঠে ছাত্রের বহুবিচিত্র পৃথিবী-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, ইতিহাসপাঠে জাতির পতন অভ্যুত্থানের কথা, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মানুষের সমষ্টিগত জীবনেব কথা ছাত্রেরা জানিতে পাবে, বিজ্ঞান-পাঠে বিশ্বরহস্যের সন্ধান তাহারা লাভ করে এবং কার্যকারণ-শৃঙ্খলে যে এই বিশ্ব গ্রথিত, তাহা অনুধাবন করে, গণিত-অনুশীলনে পরিমাণবোধ এবং সূক্ষ্ম হিসাবজ্ঞান জন্মে। ইহা ছাড়া সামাজিক বৃত্তির অনুশীলনও বিদ্যালযে হইয়া থাকে। এবং বালক-বালিকাদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ব্যবস্থাও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে রহিয়াছে। বিতর্কসভা, ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার, খেলাধূলা প্রভৃতির দ্বারা সর্বপ্রকারে মনের ও দেহের স্ফূর্তিসাধন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয। তাহারা কর্মশিবির স্থাপন করিযা গ্রামসেবার জন্য কোন একটি গ্রামে যায় এবং তথায গ্রাম-বাসীদের জন্য রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, পুষ্করিণী সংস্কার প্রভৃতি কার্য করে।

শিক্ষা—বিদ্যালয়ে

আমাদের দেশে তখনকার দিনে ছাত্রগণ গুরুগৃহে থাকিযা পাঠাভ্যাস কবিত।

গুরুর পরিবারের একজন হইয়া তৎকালে ছাত্রদের থাকিতে হইত। পাঠ ছাড়া বহুবিধ গৃহকর্মে গুরুকে সহায়তা করিয়া ছাত্রগণ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিত। আরুনি, উপমন্যু প্রভৃতি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষা তৎকালে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার আহরণ ছিল না। প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষাই তৎকালে দেওয়া হইত। এইজন্য তৎকালে সমাজ এত খারাপ হইয়া পড়ে নাই। বহু সদ্‌গুণের অলঙ্কার তৎকালীন ছাত্রসমাজ অলঙ্কৃত থাকিত। এখনকার মত দুর্নীতি ও মন্দ আদর্শের প্লাবন তৎকালে সমাজে দেখা যাইত না। বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন আদর্শ-অবলম্বনের সুযোগ-সুবিধা নাই। কলের ন্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিতেছে। হাজার-হাজার, শত-শত ছাত্র স্কুলে পড়ে। এক-একজন শিক্ষক পঠিতব্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেন—পাঠ্য-বিষয়ের বিচিত্রতা এবং আধিক্যবশতঃ ছাত্রগণের ব্যক্তিগত জীবন-নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করা বর্তমানে শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে আদর্শ নাই, গৃহে আদর্শ নাই—বিদ্যালয়ে আদর্শ আসিবে কোথা হইতে? সাধুতা বর্তমান সমাজে বোকামি, সমবেদনা মনের দুর্বলতা, উদারতার অর্থ মূর্খতা, দয়ার চেয়ে স্বার্থপরতা বড় গুণ, অর্থকেন্দ্রিক সভ্যতার বিষময় পরিণতি বর্তমানে সমাজকে যে কোথায় লইয়া চলিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে?

পূর্বকালের শিক্ষা

বর্তমানের আদর্শচ্যুত শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মপ্রত্যয়—আত্মপ্রত্যয় মানুষকে মহাশক্তির আধার করে—আত্মপ্রত্যয়-বলে মানুষ ঐশী-শক্তির অধীশ্বর হইয়া জগতে মহান্ কার্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করে। নীতিগুলি যুগ-যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। সেগুলি মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সহায়ক। এইজন্য জীবনের সর্বাবস্থায় নীতিনিষ্ঠ হইলে ছাত্রগণ এই সমাজকে আবার স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে। বড় আদর্শ চাই—বড় আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ছোট কাজে ছাত্রগণ মন দিতে পারিবে না। এইজন্য বাল্যকাল হইতে আদর্শনিষ্ঠার এত প্রয়োজন।

উপসংহার

বিতর্ক সভা

বাক্‌বিস্তার বা মনের কথা সকলের বোধগম্য ভাষায় সুন্দর করিয়া বলিতে পারা শিক্ষার একটি ফল। সংস্কৃতে একটি কথা আছে "শতং ব্যাকরণমধীতে ন তু স্ফুরতি"—একশতবার ব্যাকবণ পাঠ করিযাও কথা কহিতে পারে না—ইহা অত্যন্ত হাস্যকর অবস্থা। এরূপ পডাব কোন সার্থকতা নাই। পূর্বোক্ত ব্যাকবণপাঠরত শিক্ষার্থীর যা অবস্থা, আমাদের বর্তমান শিক্ষায শিক্ষিত ছাত্রদেব অনেকেব অবস্থাই তদ্রূপ। বই পডিযা তাহাবা এক-একটি বিদ্যার মানোযারি জাহাজ, কিন্তু কাহাকেও কিছু বুঝাইতে হইলে বা কাহাবও সহিত কোন বিষয আলোচনা কবিতে হইলে তাহাদেব মুখে কথা যোগায না। অথচ বক্তৃতা করা বা বিতর্ক করিতে পাবা, যুক্তিপূর্ণভাবে নিজ মত ব্যক্ত করার ক্ষমতা মানুষের ব্যবহাবিক জগতে অত্যন্ত প্রযোজনীয। এই ক্ষমতা না থাকিলে মিথ্যা মতবাদকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে হয এবং নিজেব বিশেষ মতকে লোকের মধ্যে প্রচার করা যায় না। কাজ কবিতে হইলে আমাদের বহুলোককে লইযা চলিতে হয—নানা মুনির নানা মত, নানা লোকেব মতও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন—তাহাদেব স্বমতে আনিতে হইলে বিতর্ক করিয়া তাহাদের যুক্তি খণ্ডন কবিতে হয, তবেই নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই সকল কারণে বিতর্ক-বৃত্তির অনুশীলন অত্যন্ত প্রযোজন।

ভূমিকা

বর্তমান সমাজে সর্বপ্রকার শিক্ষাই বিদ্যালয-কেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিদ্যালযে বিতর্ক-সভা স্থাপন করিযা ছাত্রদের বিতর্ক-কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সকল ছাত্রেরই বিতর্কসভার সভ্য হওয়া প্রয়োজন। বিতর্ক-সভায় পূর্ব হইতেই বিষয়টি নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বিষয-সম্বন্ধে ছাত্রগণ পুস্তকাদি পাঠ করিযা জ্ঞানার্জন করে। তৎপরে ঐ বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে দুইটি কৃত্রিম দল খাড়া করা হয়। একজন বিবেচক ব্যক্তির সভাপতিত্বে দুই পক্ষের বিতর্ক শুরু হয় এবং সভাপতিই পক্ষদ্বয়ের জয়-পরাজয নির্ধারণ করেন। এই বিতর্কের কতকগুলি নিয়ম আছে। যুক্তিপূর্ণভাবে ইহাতে কথা কহিতে হয়। এলো-মেলো ভাবে কথা কহিলে চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—তাহাতে বক্তব্য পরিস্ফুট হয় না। গলার জোরে কোন কিছু বুঝান যায় না—সুবিন্যস্ত চিন্তাধারার অভ্যাস ব্যতীত

স্কুলের বিতর্ক-সভা

বিতর্ক-সভায় বক্তব্য পবিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা যায় না। এজন্য বাক্‌সংযম ও বাকপটুতার প্রয়োজন। প্রতিপক্ষের যুক্তির ছিদ্র ধরিবার জন্য সতর্ক ও মনোযোগী থাকাও দরকার।

বিতর্ক-সভা আমাদের বাক্‌বিন্যাসের জডতা কাটাইয়া দেয়, চিন্তাশক্তিকে সঞ্জীবিত কবে এবং জ্ঞানসমুদ্রে নিরন্তর তবঙ্গ উৎপাদন করিযা অর্জিত জ্ঞানেব বিস্তারে সাহায্য করে। সুষ্ঠু বাচনভঙ্গি আযত্ত করা ছাডা অমাযিক স্নিগ্ধ ব্যবহার, বিপক্ষের কটাক্ষ উপেক্ষা কবিয়া পরিহাস-তরলতা দ্বারা তাহাকে কোণঠাসা করা প্রভৃতিব কৌশল আযত্ত হয।

বিতর্ক সভার প্রয়োজনীয়তা

এখানেই বড বড রাষ্ট্রনেতাদের শিক্ষাজীবন শুরু হয, ভবিষ্যৎ-জীবনে যে বহুলোকেব সহিত আমাদের আলাপ কবিতে হয তাহার উপযোগী শিক্ষা বিদ্যালযের বিতর্ক-সভায আমরা লাভ করি। মনন, চিন্তন, বিশ্লেষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের জ্ঞান পবিপূর্ণতব হইযা উঠে। বিতর্ক-সভা আমাদের পাঠ্যাতিরিক্ত বিষযেব অধ্যযনে উৎসাহিত কবে—ফলে আমাদের জ্ঞান বিস্তৃত হয। এলোমেলো চিন্তা বর্তমান কালেব একটি মানসিক ব্যাধি। ইহাব ফলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমরা কোন বিষয-সম্বন্ধে ভাবিবাব শক্তি হারাইযা ফেলিতেছি—সেইজন্য সামান্য ব্যাপারে এই অধৈর্য ভাব আমাদের মধ্যে পবিলক্ষিত হয। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইযা আমরা জীবনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুল কবিযা বসি।

বর্তমান যুগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ। এই যুগে সকলেই স্বাধীন—সকলেই নিজ স্বাধীন মত ব্যক্ত কবিতে পারেন। সেই স্বাধীনমতগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা, নির্ভুল কিনা, তাহা যাচাই করিয়া না লইলে সমাজে বহু ভ্রান্ত ধারণা আসিযা জমা হয় এবং আমাদিগকে ভুল পথে চালিত করে। বহু বাক্‌পটু ব্যক্তি বচনের কৌশলে বহু ভ্রান্তমত জগতে প্রচাব কবিযা নানা অনর্থের স্রোতে জগৎ ভাসাইতেছেন। যুক্তির কষ্টিপাথরে সেই সব মতবাদ যাচাই করিযা না লইলে আমরাও যে তাহাদের দ্বারা প্রতারিত হইব, তাহাতে সন্দেহ কি! গণ্যমান্য ব্যক্তির উক্তি বলিযাই তাহা যে নির্বিচারে মানিযা লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সকল ব্যক্তিই স্বীয মতবাদ প্রচার করিতে পারে—ঐ বিষয়ে তাহাব যেমন স্বাধীনতা আছে—উহা গ্রহণ কবা বা না করার স্বাধীনতাও আমাদের আছে। আমরা যেন যাচাই না করিয়া কাহারও মতবাদ গ্রহণ না করি। স্বাধীন

বর্তমান যুগ বাক্‌-স্বাধীনতার যুগ

চিন্তার আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া—যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করিয়া তবে যেন আমরা তাহা গ্রহণ করি। বিতর্ক-সভাব বাহিবের জগতের সব-কিছু যেন বিতর্ক-সভায় লব্ধ কৌশলেব দ্বারা বিচার করিযা দেখি। ব্যবহাবিক জগতে এইখানেই বিতর্ক-সভার সার্থকতা।

উপসংহার

সুবিন্যস্ত চিন্তাধাবাই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির লক্ষণ। এলোমেলো ভাবে বহু কথা বলা যায, বহু লোকেব বহু মতের সহিত আমাদেব পবিচয থাকিতে পাবে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপাবেই নিজস্ব মত থাকা সুবিন্যস্ত চিন্তাব ফল। জগতে অর্ধসত্য যত অনর্থ আনিযাছে, মিথ্যা এত অনর্থ আনে নাই। বর্তমান বাংলাদেশে এলোমেলো চিন্তার ঢেউ উঠিযাছে। সেইজন্য এক্ষণে ছাত্রগণেব বিতর্ক-বৃত্তির অনুশীলন অত্যন্ত প্রযোজনীয। এই বৃত্তিব সম্যক্ স্ফূর্ত হইলে দেশ হইতে বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে—নির্মল চিন্তার জ্যোতিতে লোকেব মানসলোক আলোকিত হইবে—দেশেব চিন্তন ও মনন-ক্ষমতা সার্থক পথে চালিত হইবে। ইহাব ফলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে এবং দেশের শিক্ষিত জনগণের মনেব স্থৈর্য ফিবিযা আসিবে।

স্কুল-ম্যাগাজিন

‘স্কুল-ম্যাগাজিন’ কথাটির অর্থ ছাত্রগণ-পবিচালিত বিদ্যালযের ছাত্রগণের পত্রিকা। এই পত্রিকাব সম্পাদনা, চিত্রণ, অঙ্গসজ্জা ও যাবতীয লেখাই ছাত্রগণেব। এই স্কুল-

ভূমিকা

ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ছাত্রদেব সাহিত্য-রচনাশক্তি তথা গঠনমূলক সৃজনী প্রতিভাব বিকাশ ঘটে। বর্তমান যুগের স্কুলগুলি হইতেই ছাত্রদেব উত্তর-জীবনেব কার্যকলাপের আদর্শ প্রচারিত হয। সাহিত্য-বচনার শক্তি-বিকাশে স্কুল-ম্যাগাজিনেব উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

দেশে দেশে এবং এই বাংলাদেশেও রুচি ও প্রকৃতি-ভেদে বহুপ্রকারের স্কুল-ম্যাগাজিন প্রচলিত। শ্রেণীর পত্রিকা ও দেওযাল-পত্র কোন-কোন স্কুলের ছাত্রদেব

নানাপ্রকারের ম্যাগাজিন

দ্বারা প্রচারিত হয। কোন-কোন স্কুলে আবার সকল শ্রেণীর ছাত্রদের লইযা স্কুল-ম্যাগাজিন বাহির হয। তাহাতে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকগণের রচনা সন্নিবেশিত হয। স্কুল কর্তৃপক্ষেব

সহায়তায় স্কুল-ম্যাগাজিন মুদ্রিত করিয়া অনেক স্কুল প্রচারিত করে। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। এইজন্য যাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্য কম, তাঁহারা হাতে লিখিয়া পত্রিকা প্রচার করেন। যে-সকল ছাত্রের হস্তাক্ষর সুন্দর, তাহারা এই পত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধাদি লেখে, যে ছাত্র ছবি আঁকিতে পারে—সে ছবি আঁকে ও পুস্তকের অঙ্গসজ্জা বিধান করে; দেওয়ালপত্র বই-আকারে প্রকাশিত হয় না। ইহা একখানি বিস্তৃত কাগজ মাত্র—ইহাতেই দৈনিক সংবাদপত্রের ন্যায় কলমে বা স্তম্ভে করিয়া রচনাদি লিখিত হয় এবং চিত্রাদিও সন্নিবেশিত হয়। সম্পাদনান্তে পত্রিকাখানি স্কুলের কোন প্রকাশ্যস্থানে সকল শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠের জন্য টানাইয়া দেওয়া হয়। দেওয়াল পত্রিকা সাধারণতঃ শ্রেণীর পত্রিকা হইয়া থাকে।

বাল্যে ও কৈশোরে ছাত্রগণ সৃজনীশক্তির ভরপুর আতিশয্যে যখন 'কি করি, কি করি' করিয়া বেড়ায়, তখনই নানারূপ দুষ্টামির পথে তাহাদের ঐ শক্তি চালিত হয়। তখন যদি কোন-কিছু নির্মাণ বা গঠনের দিকে তাহাদের মনটিকে আকৃষ্ট করা যায়, তাহা হইতে তাহারা ঐ ব্যাপারে অদ্ভুত নূতন নূতন সৃষ্টির দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। প্রতিভা ছাত্রগণের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অনুকূল পরিবেশ পাইলে ও উৎসাহিত হইলে সেই সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইয়া উঠে। স্কুল-ম্যাগাজিন বা শ্রেণী-ম্যাগাজিন প্রকাশ করবার ব্যাপারেও ছাত্রদের উৎসাহ এবং প্রতিভা অনেক সময়ে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কোন-কিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। ছাত্রগণ একবার সেই আনন্দের সন্ধান পাইলে আপনা হইতে সৃষ্টির তাগিদে মাতিয়া উঠে। যশের আকাঙ্ক্ষা ও বড়দের অনুকরণস্পৃহার বশবর্তী হইয়া তখন সকল ছাত্রই কলম লইয়া বসে। কেহ বা রং-তুলি লইয়া ছবি আঁকে। ছন্দ না জানিয়াও পদ্যলেখার নেশায় অদ্ভুত উৎকট কবিতার সৃষ্টি করে, কেহ-বা গল্প লেখে, কেহ-বা অন্তঃসারশূন্য বাক্যজাল বিস্তার করিয়া গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনার নকল করিতে গিয়া হাস্যকর কিছু একটার সৃষ্টি করিয়া বসে। আবার অনেকের প্রতিভার দীপ্তিতে স্কুল-ম্যাগাজিন ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে।

ছাত্রগণের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ

স্কুল-ম্যাগাজিনের মাধ্যমে প্রথমতঃ ছাত্রগণের নিজস্ব চিন্তার স্ফুরণ হয়। আপনাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তাহারা সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিবার

ক্ষমতা অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ লেখা ইত্যাদির মধ্যে দোষগুণ-বিচারের প্রশ্ন থাকায় তাহাদের নির্বাচন-ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সমস্ত কাজটা সার্থক করার দায়িত্ব থাকে বলিয়া চতুর্থতঃ তাহাদের দায়িত্ববোধ বর্ধিত হয়। এছাড়া সৌন্দর্য, রুচিজ্ঞান, সাহিত্য-প্রতিভা, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ইত্যাদির অনুশীলন হয়। এই স্কুলের পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যকলাপ তাহাদের পাঠতৃষ্ণা ও জ্ঞানের পরিপোষক এবং অনুপূরক হইয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক আনন্দজনক স্ফূর্তি ঘটায়। মুক্তির উদার আকাশে পক্ষসঞ্চালন—এইটিই ছেলেদের মনে বেশী টানে, এইজন্য স্কুল-ম্যাগাজিন বাহির করার নির্দিষ্ট সময় করিয়া দেওয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্তব্য। সাময়িক পরীক্ষার পরেই এবং দুই দীর্ঘ অবকাশের পূর্বে ম্যাগাজিন বাহির করিবার সময় নির্দিষ্ট থাকিলে এই ব্যাপারে তাহাদের অধ্যয়নের পথে ব্যাঘাত-স্বরূপ হইয়া উঠিবে না।

স্কুল-ম্যাগাজিনের সার্থকতা

প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় অনেক সময়ে কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে। এইজন্য একই স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর ম্যাগাজিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ম্যাগাজিনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলে ম্যাগাজিন ভাল করার জন্য ছাত্রগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিবে এবং তাহার ফলে উৎকৃষ্ট ম্যাগাজিনও তৈয়ারী হইবে। বিভিন্ন স্কুলের ম্যাগাজিনের একজিবিশন বা প্রদর্শনী করিয়া কয়েকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেও ম্যাগাজিন তৈয়ারীর কাজে ছাত্রগণ প্রচুর উৎসাহ পাইতে পারে। এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ জীবনীর জন্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ অঙ্গ-সজ্জার জন্য পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন স্কুলের ম্যাগাজিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা

অনেকে মনে করেন এগুলি ছেলেবয়সের পাকামি ছাড়া আর কিছু নহে; কিন্তু এই ধারণা ভুল। শিশুদের রচনাও যে কত মধুর, কত সুন্দর, কত স্বচ্ছ হইতে পারে, তাহা শিশু-ম্যাগাজিন না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। স্কুল-ম্যাগাজিনের

পাতাতেই উত্তরকালের সাহিত্যিকদের দেখা পাওয়া যায়। ইহা যেন সাহিত্যিক-তৈয়ারীর আখড়া। কুস্তীর আখড়ায় মল্লবীরগণ তাল ঠুকিয়া কসরৎ শিখে—শিক্ষান্তে তাহাদের মধ্য হইতেই শ্রেষ্ঠ মল্লবীর মল্লক্রীড়ার নৈপুণ্য দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করে। সকল শিক্ষানবীশই সার্থক মল্লবীর হয় না। সেইরূপ স্কুল-ম্যাগাজিনের পাতায় কলমবাজি করিতে আমাদের দেশে কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত প্রবন্ধকার, কত নাট্যকার জন্মাইতে পারে। সম্ভাবনা যখন রহিয়াছে, তখন স্কুল-ম্যাগাজিনের আখড়াটির দ্বার খুলিয়া রাখা উচিত এবং সকলকেই সাদর সম্ভাষণ জানানো দরকার।

শিশু-রচনায় মাধুর্য

বীজ হইতে যাহারা গাছ তৈয়ারী করে, তাহারা কত না যত্নসহকারে কাজ করে। মাটি তৈয়ারী করে, সার দেয়, জল দেয়। অঙ্কুরোদ্গম হইলে চারাগাছকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে। পোকামাকড়ের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কত সাবধানতা অবলম্বন করে—নিয়ত তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। গাছ বড় হইলে যাহাতে গরু ও ছাগলে না খায়, সেইজন্য বেড়া দিয়া, চতুর্দিকে কাঁটা দিয়া ঘিরিয়া দেয়। এত সাবধানতা কেন? গাছ হইতে যে ফল পাইবে—সেইজন্যই এত যত্ন। শিশুরাও চারাগাছের মত—কে কোন্ জাতীয় ফল দিবে, আগে হইতে তাহা নির্ণয় করা যায় না—সেইজন্য সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাহাদের লালন পালন করিতে হয়। শেষে একদিন সব পরিশ্রম সার্থক হয়—ছাত্রগণ মানুষ হয়—দেশের সেবায়, সমাজের সেবায় তাহারা অগ্রসর হয়। এইজন্যই শিক্ষালয়ে তাহাদের প্রতিভানুযায়ী বিকাশের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। স্কুল-ম্যাগাজিন এই বহুবিধ ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রধান ব্যবস্থা।

উপসংহার

এভারেস্ট-বিজয়

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবম্' মহাকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে, "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ো দেবতাত্মা নাম নগাধিরাজঃ"—সত্যই হিমালয় পর্বতশ্রেষ্ঠ—পৃথিবীর কোন দেশে এত বড়, এত উচ্চ পর্বত আর নাই। হিমালযের বহু শৃঙ্গ। স্বনামখ্যাত বাঙালী রাধানাথ সিক্‌দার হিসাব করিয়া প্রমাণ করেন যে, ইহার এভারেষ্ট শৃঙ্গ পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত-শিখর। ধবল-তুষারমণ্ডিত মৌলিমালা-শোভিত হিমালয়ের রূপ সকলকেই মোহিত করে। কখনও মনে হয়, যেন এক বিরাট ধবল মেঘ আকাশের বুকে লগ্ন হইয়া আছে। আবার কখনও বা মনে হয়—

ভূমিকা

> "অসীম নীরদ নয়—
> ঐ গিরি হিমালয়,
> উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি।"

কে যেন সমুদ্রের একটি উত্তাল বিরাট ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গকে মন্ত্রবলে 'তিষ্ঠ' বলিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। এই হিমালয় হিমের আলয়, চিরতুষারাবৃত, ভয়ঙ্কর। পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারের রাশি সর্বদা ইহার মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে। তথাপি ভয়ঙ্কর এই মৃত্যুর দেশ মানুষকে আহ্বান করে—দুঃসাহসীর বুকে দুর্জয় বীরত্বের দুন্দুভি বাজে—জয় করিতে হইবে এই হিমালয়কে—ইহার উপর আরোহণ করিয়া মানুষের বিজয় ঘোষণা করিতে হইবে। দলে-দলে দুঃসাহসীরা আসে। হিমালয়ের প্রায় আশীটি শৃঙ্গ ছাব্বিশ হাজার ফুটেরও অধিক উচ্চ। আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট উচ্চতায় ২৯০০২ ফিট্। ইহা দুর্নিরীক্ষ্য, মৃত্যুহীম শীতলতায় পূর্ণ বন্ধুর ও পিচ্ছিল। কিন্তু একজাতের মানুষ আছে যাহারা বাধা দেখিলে আরও উদ্যম লইয়া অগ্রসর হয়—কবি তাহাদের মনোভাবের বাণী-রূপ দিয়াছেন—

> "বিপদ্ আছে, জানি বাধা আছে,
> তাই জেনে ত' বক্ষে পরাণ নাচে।"

এইসব দুরন্ত মানুষের কাছে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।"—ইহারা দুর্গম পথের

যাত্রী—যে পথে মনুষ্যের পায়ের ছাপ পড়ে নাই, সেই পথের দিকেই তাহাদের গতি—তাহারা সেই পথ আবিষ্কার করে, আর আত্মতৃপ্তিতে গাহে—

"মোদের চলার ঘায়ে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে—"

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা হয়; কিন্তু সে অভিযানে শুধু হিমালয়-আরোহণের পথের বাধাগুলিই অভিযাত্রীরা অবগত হন।

হিমালয় বিজয় অভিযানের ইতিহাস

তৎপরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জিবার্ড ১৯,০০০ ফিট্ পর্যন্ত আরোহণে সমর্থ হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম গ্রেহাম ২৪,০০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দুইজন অষ্ট্রিয়ান অভিযাত্রী ২৩,০০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠেন। ইহাদের নাম কনওয়ে ও একেনষ্টিন্। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মামারি-নামক আরোহী নাঙ্গাপর্বত-আরোহণের চেষ্টায় প্রাণ হারান। নাঙ্গাপর্বতের উচ্চতা ২৬,৬২৯ ফিট্। এই প্রথম প্রাণ-বলিদান। ইহাতেও কিন্তু অভিযাত্রীদের উৎসাহ কমিল না। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মিসেস বুলক্ ও তাঁহার স্বামী ২২,০০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠিতে সমর্থ হইলেন। মিসেস বুলক সর্বপ্রথম মহিলা-অভিযানকারিণী। ১৯০৫ সালে জ্যার্কো গুইলার্মোর নেতৃত্বে একটি দল ২৮,১৪৬ ফিট্ উচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করেন। এই অভিযানে একজন অভিযাত্রী তুষারস্তূপে চাপা পড়িয়া মারা যান। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব আব্রুৎসীর নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী ২৮,২৫০ ফিট্ 'কে-২' শিখরের ২০,০০০ ফিট্ পর্যন্ত পৌছান। আব্রুৎসীর অপর একটি চূড়ায় ২৪,৬০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠেন। ইহার পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পল্ বাওয়ারের দল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ২৩,০৩৫ ফিট্ উঠেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পল্ বাওয়ার আবার দলবল লইয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার ২৫,৬২০ ফিট পর্যন্ত পৌছান—তাহার দলের দুইজন অভিযাত্রী স্কালার ও পাসাং মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট পি. আর. অলিভার ও ডেভিড্ ক্যাম্বেল ২৩,৫৬০ ফিট্ উচ্চ ত্রিশূল-নামক শৃঙ্গে আরোহণ করেন। অলিভার ও কেশর সিং নামক একজন শেরপা কুলি চূড়ায় পৌছাইতে সমর্থ হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার ব্রাউনের নেতৃত্বে একদল ২৫,৬৯৫ ফিট্ উচ্চ নন্দাদেবীর চূড়ায় পৌছান। ১৯৩৭ সালে জার্মান-অভিযাত্রীরা কার্লভীনের নেতৃত্বে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ২৪,০০০ ফিট্ পর্যন্ত উঠিয়া তুষারশিলা চাপা পড়িয়া প্রাণ হারান।

এই সকল অভিযানের অপূর্ব বিবরণী প্রকাশিত হওয়ায় বহু অভিযাত্রী এই দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় হিমালয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এভারেস্ট তখনও পর্যন্ত মনুষ্য-পদপাতে কলঙ্কিত হয় নাই। গর্বোন্নত শির উচ্চে তুলিয়া ইহা যেন নির্বিকার চিত্তে দুর্বল মানুষের এই অসমসাহসিকতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একদল অভিযাত্রী এভারেস্ট-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হন এবং এই সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের একটি সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন। এই পথটির নাম 'নর্থ কোল'—এই অভিযাত্রীদের দলে ম্যালোরী ছিলেন। এই ম্যালোরী এভারেস্ট-অভিযানের একজন দুর্ধর্ষ পাণ্ডা। তাঁহার অভিযানের কাহিনীগুলি এত চমৎকার যে, মানুষের বুকে যেন দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যে অভিযান শুরু হইল, তাহার নেতা হইলেন জেনারেল ব্রুস। এই অভিযানে ম্যালোরী, নর্টন, ফিঞ্চ, সমারভেল, ক্রফোর্ড প্রভৃতি অভিযাত্রী যোগ দেন। ইঁহারা ১৭,২৩৫ ফিট্ পর্যন্ত পৌছান—এই অভিযানে একদল সাহায্যকারী ভারতীয় শেরপা বরফস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া প্রাণ হারান; কিন্তু কয়েকজনের মনে এভারেস্টের উচ্চশীর্ষ এমন নেশা ধরাইয়া দিল যে, আবার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা অভিযান শুরু করিলেন। এই অভিযানে সমারভেল, নর্টন, আরভিন ও ম্যালোরী যোগ দিয়াছিলেন। নর্টন ও সমারভেল ২৮,০০০ ফিট্ পর্যন্ত আরোহণ করিয়া আর পারিলেন না। ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া তাবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু ম্যালোরী ও আরভিন এখানে থামিলেন না—তুষার-ঢাকা প্রস্তর পথের মধ্য দিয়া তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন। শ্বেতজ্যোতি-উদ্ভাসিত এভারেস্ট-চূড়ায় ধীরে-ধীরে তাঁহারা উঠিতে লাগিলেন। কী অসীম ধৈর্য। কী অনন্ত অধ্যবসায়! কী ভীষণ মরণ-পণ আগ্রহ। ওডেল্ দূরবীন দিয়া দেখিতে লাগিলেন—চূড়া হইতে মাত্র ৮০০ ফিট্ নীচে ছোট্ট দুটি কালো বিন্দু যেন চলিতে চলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। ম্যালোরী ও আরভিন আর ফিরিলেন না। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের কাছে এই দুই বীরের তুষার-সমাধি ঘটিল। এভারেস্ট রহিয়া গেল অপরাজিত; কিন্তু অভিযাত্রীরা হাল ছাড়িল না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাট্‌লেজের নেতৃত্বে স্মিথ, শিপ্‌টন, হ্যারিস, ওয়েজার, বার্ণ, লাংল্যাণ্ড প্রভৃতি অভিযানকারী

এভারেস্ট-বিজয়-অভিযানের ইতিহাস

২৮,১০০ ফিট্ পর্যন্ত পৌছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে একটি বিমানপোত এভারেস্ট-শৃঙ্গের তিন চার শত ফিটের মধ্যে উড়িয়া আসিল। মানুষ কি একেবারে হাল ছাড়িল? ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাট্লেজ আবার উদ্যোগ-আযোজন করিয়া যাত্রা শুরু করিলেন; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে অভিযান ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় মহাসমরের পর আবার প্রকৃতির সহিত মানুষ সমরে প্রবৃত্ত হইল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এরিক্ শিপ্টন একটি অভিযানে বাহির হন এবং শৃঙ্গে আরোহণের বাধা ও সুবিধাগুলি অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুধাবন করিয়া আসেন। ১৯৫২ সালে সুইস্-অভিযাত্রিদল ডাক্তার উইস্ ডুনান্টের অধিনায়কত্বে এভারেস্ট-বিজয়ে অগ্রসর হন। তাঁহাদের দলের ল্যাম্বার্ট ও একজন ভারতীয় শেরপা ২৮,২০৫ ফিট্ পর্যন্ত উঠিতে সমর্থ হন। এই ভারতীয় শেরপার নাম তেনজিং। বর্ষা-সমাগমে সেবারের অভিযান পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু সেবারের অভিযানেই সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপিত হয়। বর্ষাশেষে আবার সুইস-অভিযাত্রীরা অভিযানে অগ্রসর হইলেন। এবারের অভিযানে অধিনায়কত্ব করিলেন ডাঃ শেভালি—এই দলেও তেনজিং এবং ল্যাম্বার্ট ছিলেন; কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় অভিযান শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট-জয়ের দুর্জয় বাসনা লইয়া একদল বৃটিশ-অভিযানকারী আসেন। এই অভিযাত্রিদলে বৃটিশ রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ও সুইজার্লণ্ডের সুইস্ আলপাইন ক্লাব যোগদান করেন। এই দলের নেতা ছিলেন কর্ণেল হাণ্ট। সর্বসাকুল্যে ১৩ জন অভিযাত্রী এই দলে ছিলেন। দুই অভিযাত্রীর বাসস্থান নিউজিল্যাণ্ড—আর পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ভারতীয় শেরপা তেনজিংও এই দলেই ছিলেন। নেপালের কাঠমুণ্ডু হইতে ইঁহাদের যাত্রা শুরু হয় তুষার-দুর্গম এভারেস্টের চূড়ার দিকে। ইঁহারা শিপটন্ সাহেবের আবিষ্কৃত অপেক্ষাকৃত সুগম দুইটি পথেই যাত্রা শুরু করেন। সেই পথ দুইটির নাম "সাউথ কোল" ও "ওয়েস্টার্ণ কোল"। হিলারী ও তেনজিং ২৫শে মে একবার শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন; কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় না। শেষে ২৯শে মে হিলারী ও তেনজিং পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, এযাবৎ অপরাজিত এভারেস্টের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়া পৃথিবীর দুঃসাহসীদের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করেন।

তুষারাবৃত হিমালয়ের এগারটি অভিযানে তেনজিং যোগদান করিয়া যে অভিজ্ঞতা

লাভ করেন, তাহার ফলেই তিনি এই বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয়গৌরব লাভ করেন।

তেনজিং নোরকের পরিচয়

তাঁহাকে তুষারপথে বার-বার কৃতিত্বের সহিত অভিযান করিতে দেখিয়া দেশবাসী তাঁহাকে 'তুষার-শার্দূল' উপাধিতে ভূষিত করেন। নেপালের অন্তর্গত 'খেম'-নামক গ্রামের অধিবাসী তিনি। অতি অল্পবয়সেই তাঁহাকে জীবিকার্জনের জন্য দার্জিলিং আসিতে হয়। এখানকার তুংসুং বস্তীতে তিনি বাস করিতেছিলেন। আজ এই নেপালাধিবাসীর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। তেনজিং এতবড় একটা কাণ্ড করিয়াও কিন্তু মনে-মনে গর্বিত বোধ করেন নাই।

বারে-বারে মানুষ যে এভারেস্ট-অভিযানে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ তুষার-পথের বাধা। প্রচণ্ড শীত, দুর্গম পিচ্ছল বরফঢাকা পথে যাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বরফ

এভারেস্ট-অভিযানের বাধা

ধ্বসিয়া চাপা পড়িবার ভয়, অক্সিজেনের অভাব, বরফের শ্বেত ঔজ্জ্বল্যে চক্ষুর জ্যোতি লুপ্ত হইবার ভয়—ইহার উপর তুষার-ঝটিকার ভয় আছে—অসহ্য শীতে হাত-পা অসাড় হইয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবার ভয়—পাহাড়ের উপর পুঞ্জীভূত বরফের মধ্যে সহসা ফাটল ধরিয়া মানুষকে গ্রাস করিবার ভয়। এত ভয় কিন্তু মানুষকে দমাইতে পারে নাই। ধন্য মানুষের মনোবল, ধন্য মানুষের অধ্যবসায়।

তেনজিং ও হিলারীর জয় মানুষেরই জয়, মানুষের মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে। দুর্জয় মানুষের আশা, দুশ্চর মানুষের সাধনা—তাই সিদ্ধিও তাহার করতলগত। মানুষ

উপসংহার

তাই গর্ব করিয়া কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারে—

"বলবীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির
ওই শিখর হিমাদ্রির।"

সত্যই আজ হিমালয়ের শির অবনমিত। মানুষ সর্বজয়ী—অসীম শক্তিধর—সে বিধাতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর।

লোকশিক্ষা ও লোক-সাহিত্য

লোকসংখ্যায় বাঙালী বিপুল; কিন্তু এই বাঙালীজাতি নানা সমস্যায় বিজড়িত হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে। এত জনবল কোন্ কাজে আসিতেছে? কাজে লাগাইতে গেলে এই জনসংখ্যাকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। লৌহকে অস্ত্রে পরিণত করিলে তবে তাহার দ্বারা পাথর প্রভৃতিও কাটা যায়; কিন্তু সে কার্য তো আকরের লৌহ দ্বারা সম্ভব নয়। লৌহকে অন্য উপাদানে মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া, আকার দিয়া শাণিত করিতে হয়। বাংলার বিপুল জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করিতে হইলে লোকশিক্ষার প্রয়োজন। লোক ঠিকমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে আপনার উন্নতি আপনারাই করিয়া লইতে পারিবে। যতদিন সে কার্যটি না হইতেছে, ততদিন উন্নতির আশা অল্প।

ভূমিকা

বিদ্যালয় খুলিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস পড়াইয়া এত লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সে শিক্ষার কথা এখানে বলা হইতেছে না। চিত্তবৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও আত্মপ্রত্যয় শিক্ষার মূল। যাহাতে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়, স্ব-স্ব কর্তব্যকার্যে উৎসাহ ও দক্ষতা জন্মে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। গতানুগতিক শিক্ষার দ্বারা যে ঐ কার্যটি হওয়া সম্ভব নহে, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

লোকশিক্ষা কি?

ইউরোপে নানা উপায়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রুসিয়া প্রভৃতি দেশে আপামর সকলের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। সে সব দেশে আক্ষরিক জ্ঞান-সম্পন্ন লোকের আধিক্যবশতঃ সংবাদপত্র সে সব দেশের লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। তাছাড়া যাত্রা, থিয়েটার, বক্তৃতা, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে ও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে পরিকল্পিত প্রচার-পত্রের সাহায্যে ইউরোপে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আক্ষরিক জ্ঞান থাকিলে দেশকে যত সহজে শিক্ষিত করা যায় এমন আর কোন উপায়ে নহে! সে দেশে শত-শত সংবাদপত্র, শত-সহস্র পাঠক। বক্তব্য-প্রচারের জন্য সংবাদপত্র একটি প্রধান উপায়—তাছাড়া সামাজিক নিমন্ত্রণ

অন্যান্য দেশের লোকশিক্ষার উপায়

প্রভৃতিতে একত্র হইলে ভোজসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে সে-দেশে সহজেই ও স্বাভাবিক ভাবেই লোককে শিক্ষিত করা যায়।

আমাদের দেশের লোকশিক্ষার উপায়

আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম। তদুপরি সংবাদপত্রেরও সংখ্যা কম। মুষ্টিমেয় লোক সংবাদপত্র পাঠ করে। আর দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত; কিন্তু তথাপি এদেশে কি লোকশিক্ষার উপায় ছিল না? বৌদ্ধধর্ম যে ভারত প্লাবিত করিয়াছিল, লোকচিত্তে আসন লাভ করিয়াছিল, তাহা কি উপায়ে হইয়াছিল? লোক-পরম্পরায় পরিব্রাজক-পরম্পরায় এই ধর্মশাস্ত্রসকল শুধু ভারতবর্ষ নহে—সিংহল, যবদ্বীপ মালয়, চীন, ব্রহ্ম, জাপানেও প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রেমধর্ম উৎকলদেশে কিভাবে প্রচারিত করিয়াছিলেন? বহু লোকশিক্ষার উপায় সেকালে ছিল—বর্তমানে তাহা অবলুপ্ত। কথকতার সাহায্যে তখন যে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহা আপামর সকলকে প্রাণের দরদ দিয়া ডাকিত—আনন্দের টানে লোক জমা হইত—সাহিত্যের সার, ধর্মের নির্যাস নীতির মূলতত্ত্ব, সমাজ-জ্ঞানের মর্মকথা এইভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। ইহা ছাড়া ছিল যাত্রা, পালাগান, কীর্তন, পাচালী, গীতিকথা, বাউলের গান, ময়নামতীর গান, মানিক পীরের গান, তরজা, ঢপ। এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতায় জেলেপাড়ার সং বাহির হইত চৈত্রমাসে—তাহার মধ্য দিয়া অপূর্ব লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হইত। স্বদেশী আমলে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা লোক-মধ্যে স্বদেশীমন্ত্র-গ্রহণের প্রেরণা যোগাইয়াছে। আজও বহু মেলা-পার্বণে ও দোলে বা সং প্রভৃতিতে বহু সামাজিক পাপের উচ্ছেদের জন্য ছোট-ছোট রঙ্গরস-পূর্ণ যাত্রার দ্বারা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

লোকশিক্ষার-প্রধান উপায় লোক সাহিত্য

বর্তমানে শিক্ষিত লোকদের সহিত অশিক্ষিত লোকদের প্রাণের যোগ নাই। শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিতের কথা ভাবে না—তাহারা যদি অশিক্ষিতদের ডাকিয়া কিছু বলিবার প্রেরণা পাইত, তাহা হইলে লোকশিক্ষার উপায় হইত। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে বিস্তর প্রভেদ। বাংলার হৃদয়-কমলের মধু একদিন লোকসাহিত্যে সঞ্চিত

হইয়াছিল। দেশের আপামর সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ ভাষা পাইযাছিল লোক-সাহিত্যে। বাংলার সভ্যতা, গ্রামীণ, সভ্যতা। লোকসাহিত্যের মধ্যেই সেই গ্রামীণ সভ্যতাব নিদর্শন রহিযাছে। লোক-সাহিত্যের জন্ম পল্লীর পবিবেশে, তাহা পল্লীবাসীদের জন্যই রচিত হইযাছিল। সেইজন্য পল্লীবাসীদের প্রাণেব কথায তাহা ভরপূর। এই লোক-সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ ও শিক্ষার একত্র সম্মেলন হইযাছিল অতি স্বাভাবিক ভাবেই।

লোকসাহিত্য প্রথম শুরু হয মুখে-মুখে প্রচাব দ্বারা। ছেলেভুলানো ছড়াই বোধ হয় আদি লোক-সাহিত্য। ছেলেমেযেদেব লইযা সংসার—সেই সংসারে ছেলেমেযেদেব ভুলাইযা রাখিবাব জন্য মা-মাসী-পিসী-দিদিমা-ঠাকুবমাবা সেকালে ছড়া বানাইত। সেই ছড়ার ক্রমশঃ প্রচারের দ্বাবা বাংলাব ছড়া-সাহিত্যের সৃষ্টি হইযাছে। কে যে ইহাদেব রচযিতা, তাহা কেহ জানে না। বিভিন্ন ছড়ার রচযিতা বিভিন্ন—আবার একছড়াই লোকের মুখে-মুখে পবিবর্তিত হইযা চেহারা পালটাইতেছে। ছড়াগুলির মধ্যে বাংলার পল্লীর জীবনযাপনের সুখ-দুঃখেব যে টুক্‌রা চিত্র পাওযা যায, তাহা সত্যই অপূর্ব। শিশুশিক্ষার ইহা একটি প্রথম সোপান। সেই ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আজও লোকশিক্ষাব প্রাচীন পাকা ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায। আমাদের যে শিক্ষার ধাবাটি আজ অবলুপ্ত, তাহার শুষ্ক খাত ও বালি এখনও চোখে পড়ে কোন-কোন ছড়ায়—

লোক-সাহিত্যের বহুমুখিতা
(ক) ছেলেভুলানো ছড়া

"ষোল কই ষলুয়ে
দুটি গেল তার পালিযে।
তবুও তো থাকে চৌদ্দ,
দুটি নিল তার বিড়াল বৈদ্য।
তবুও ত' থাকে বারো—"

বিয়োগ-শিক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থা। আবার শিশুকে নানাবিধ রং-সম্বন্ধে ধারণা দিবার জন্য রচিত অপর ছড়ায দেখা যায়—

"যাদু, এ-ত বড রঙ্গ, যাদু, এ-ত বড রঙ্গ—
চার ধলো দেখাতে পারো যাব তোমার বঙ্গ।"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ।"

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ হইতে নির্বাচিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তখনকার দিনে যেসব যাত্রাগানের আয়োজন করা হইত, তাহা গীতবাদ্যে ও অভিনয়ে বহু লোককে আনন্দ দান করিত এবং সেই সব কাহিনী হইতে লোক প্রচুর শিক্ষা লাভ করিত। রামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালন, ভরতের রাজতপস্বীর ন্যায় ত্যাগী জীবন, সীতার বনবাস, শকুন্তলার কাহিনী, হরিশ্চন্দ্রের দান, প্রহ্লাদের ভক্তি, ধ্রুবের সাধনা, দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবদের সত্যনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুরাগ, কর্ণের দান, দধিচির আত্মত্যাগ ইত্যাদি হইতে জনসাধারণ তৎকালে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিত। মোট কথা, সমাজের উপর দিয়া এত সব বড বড আদর্শের যেন নিত্যই প্লাবন বহিয়া যাইত এবং তাহারা নূতন উর্বর পলি সঞ্চিত করিয়া জনসাধারণের জীবন-ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া তুলিত।

(খ) যাত্রা

ইহা ছাড়া তখনকার দিনে কথকঠাকুর ছিলেন এক মহা আকর্ষণের কেন্দ্র। ফোঁটা-তিলক কাটিয়া পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া তিনি আসরে বসিতেন। তারপর গান ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুমধুর স্বরে ভক্তিমূলক নানা পৌরাণিক উপাখ্যান গল্পের ন্যায় বলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাবগাঢ় কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মনের তারে ঝঙ্কার তুলিত। সে কথকতার আসর বসিত তখনকার দিনের চণ্ডীমণ্ডপে। সেই কথকতার পুঁথি এক অপূর্বধারার লোকসাহিত্য। এখনও কোথাও এরূপ কথকতার আসর বসে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহাদের বড আমল দেন না।

(গ) কথকতা

অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করাইবার জন্য বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞান, 'ডাকের ও খনার' বচনের মধ্যে ছড়া ও পদ্যে গ্রথিত হইয়া আর একশ্রেণীর লোকসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এসব বচনে চাষবাসের কথা, বহু অমূল্য উপদেশ গ্রথিত হইয়া আছে। কয়েকটি বচনের নমুনা দেওয়া হইল—

(ঘ) ডাক বা খনার বচন

"যদি বর্ষে আগনে
রাজা যান মাগনে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।"

"কোদালে কুড়লে মেঘের গায়,
এলোলো বহে বায় ;
বলগে চাষার বাঁধ্‌তে আল,
আজ না হয় জল হবে কাল।"

"ধর্ম করিতে যেজন জানি
পুখর দিয়া রাখিয় পানি।
অশ্বত্থ রোপে বড় কর্ম
মণ্ডপ দেয় অশেষ ধর্ম।
অন্ন বিনা নাহি দান
ইহাপর ধর্ম নাহি আন।"

প্রবাদ-বাক্য

বাংলা-ভাষার লোকশিক্ষার উপায়-হিসাবে একশ্রেণীর প্রবাদ প্রথমে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া এক্ষণে ভাষার মধ্যে আসিয়া স্থান করিয়া লইয়াছে। এগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আপামর লোকসমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি প্রবাদ এখানে দেওয়া হইল—

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ; নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠানের দোষ ; পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী, ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী ; যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া ইত্যাদি।

তখনকার সাহিত্যিকের আসর ছিল দেশের সর্বসাধারণকে লইয়া। এখনকার মত শুধু শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য রচিত হইত না। তাই কবিগানের পালা,

তরজা, ঢপ, কীর্তন ইত্যাদিতে তখনকার আকাশ, বাতাস, বাংলার পল্লীগ্রাম নিয়ত ঝঙ্কৃত থাকিত। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, গোপীচাঁদের গান, ময়নামতীর গান, বেহুলার ভাসান, আগমনী গান ইত্যাদি ও নানা মঙ্গলকাব্য গীতিবাদ্যাদি সহকারে জনসাধারণের মধ্যেই প্রচারিত হইত এবং তাহা লোকশিক্ষার সহায়ক হইত। এইসব লোকসাহিত্য এখন অনাদৃত। পল্লীতে এখনও এইসব সাহিত্যের প্রতি আদর যথেষ্ট, কিন্তু নূতন সাহিত্য আর কে রচনা করিবে? সেই পুরাতনের প্রতি প্রীতিবশতঃ এগুলি এখনও সমাজের কতকাংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়া আছে।

কবিগান, বাউল গান, পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা, পালাগান ইত্যাদি

বর্তমানে লোকশিক্ষার বহু উপায় হইয়াছে—সিনেমা, থিয়েটার, বেতার; কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে দেশের প্রয়োজনে দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বতঃই যে ব্যবস্থা গজাইয়া উঠিয়াছিল এবং যে ব্যবস্থা বাঙালীর মনের স্বাস্থ্য সার্থকভাবে বজায় রাখিয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে আমাদের অবহেলায়। সেইজন্য আবার আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সে সকল ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বর্তমানে লোকসাহিত্য প্রয়োজন। দরদী সাহিত্যিকগণ এই ব্যাপারে যত্নশীল হইলেই আবার লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হইবে—লোকশিক্ষার একটা কার্যকরী উপায় হইবে।

উপসংহার

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস মানব-জাতির কীর্তি-কাহিনীর বিবরণ। আমাদের অতীত গৌরবের কথা ইতিহাস-পাঠে আমরা জানিতে পারি। মানুষের কীর্তি-কাহিনীই শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়—মানুষের সমাজ-জীবনের কথা, সাধারণ জীবনযাত্রা-প্রণালী, আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করার প্রচেষ্টা, এককথায় অতীত কালের মানুষের সব-কিছু সংবাদ

ইতিহাস কি?

আমরা ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি। ইহা আমাদের পিতৃ-পিতামহের কথা—তাঁহাদের উত্থান-পতনের কথা—তাঁহাদের জয়-পরাজয়ের কথা—তাঁহাদের যাবতীয় কাজকর্মের কথা।

ইতিহাস পাঠে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি ?

অতীত কালের মানুষের জযযাত্রার ইতিহাস আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রের গঠন ও সমাজের উপর তাহার প্রভাব দেখিয়া আমরা নিজেদের রাষ্ট্রসম্বন্ধে সচেতন হই। বংশের ধারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-গঠনেব সহাযক। অতীত ইতিহাসের ধারার সহিত পরিচয ঘটিলে আমরাও আমাদের সমষ্টিগত জীবন-গঠনের আদর্শটি খুঁজিয়া পাইব এবং আমাদেব ঐতিহ্যটি বজায় বাখিতে চেষ্টা করিব। ইতিহাসের ঘটনা সমুদ্রের ঢেউ-এর ন্যায নিরন্তর উঠিতেছে এবং পডিতেছে—বড বড ঐতিহাসিক ঘটনা বিরাট তরঙ্গের ন্যায আমাদেব জাতীয জীবনে বহু ভাঙ্গাগডা সাধন করে; অতীতের বহু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখন আমরা ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিবার সুযোগ লাভ কবি। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।" এইজন্যই আমাদের অতীত ইতিহাস মনোযোগসহকারে পাঠ করা উচিত। ইতিহাসে যথাযথ জ্ঞান থাকিলে জাতি নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী আপনাকে নিযন্ত্রিত করিয়া অনেক বিপর্যয ঠেকাইয়া বাখিতে পারে। কিসে জাতির উন্নতি হয, সেই ভাবে আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত করিয়া আমরা আমাদের দেশকে উন্নত কারিতে পারি। ইতিহাস-পাঠে জাতির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাতি জাগিয়া উঠে। অতীতের গৌরবগাথা-শ্রবণে কাহার হৃদয না গর্বে স্ফীত হয—বর্তমান হীনাবস্থায অতীতের গৌরব-কথা আমাদের মনে সুপ্ত বীর্য জাগাইয়া মহা অনুপ্রেরণায় পূর্ণ করে। মনীষী কার্লাইলের মতে "ইতিহাস অসংখ্য জীবন-চরিতের সার নির্যাস।" পুস্তকে যেমন মনীষীরা তাহাদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাকে স্থাযী রূপ দান করেন, ইতিহাসে তদ্রূপ মানুষের সমষ্টিগত জীবনের কথা প্রতিফলিত হয়। সংবাদপত্রে দৈনিক জীবনেব সংবাদ মিলে, এইজন্য আমাদের ইতিহাস-পাঠের এত প্রয়োজন।

নদী যেমন পাহাডের উপর হইতে বহিযা দেশ ও জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হইয়া মহাসাগরে গিয়া পড়ে এবং দেশ ও জনপদ শস্যশ্যামলা করে, ইতিহাসের ধারাও তেমনি সুদূর অতীতকাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অনন্তে গিয়া মিশে। ইতিহাসের ধারাটি অনন্ত—ইহা নিত্য নূতন ঘটনার সংযোগে বেগবতী হইতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস মানবের কর্মধারার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে—ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, সিপাহী বিদ্রোহ—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অহিংস সংগ্রাম যেমন মানবসভ্যতা গঠনের পথে আলোকস্তম্ভের ন্যায়, তেমনি ব্যক্তিগত বীর্য ও কর্মপ্রচেষ্টার জন্য আব্রাহাম লিঙ্কন, ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডী, সিজার মহাত্মা গান্ধী, তান্তিয়া তোপে, নেপোলিয়ান, হিট্‌লার, মুসোলিনী, সুভাষচন্দ্র জাতির মহাশিক্ষক। সর্বধ্বংসী কাল সকলই ধ্বংস করে, কিন্তু মানবের কীর্তি ধ্বংস করিতে পারে না—কালের প্রবাহ এখানে স্তব্ধ, শান্ত হইয়া যায়। সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, কিন্তু কীর্তি ধ্বংস হয় না। ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে মহা ভাবের তরঙ্গ নির্গত হইয়া মানব সভ্যতাকে পুষ্ট করিতেছে।

ইতিহাস মানব-সভ্যতার ধারক ও বাহক

কবে কি হইয়াছে, কোন্ প্রাচীন যুগে সীজার রাজ্যবিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিল, নেপোলিয়ান পৃথিবী জয়ের যে প্রচেষ্টা করিয়াছিল, আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইয়া কোন্ কোন্ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, রুশ বিপ্লব কি কারণে সংঘটিত হইয়াছিল—তাহার আদর্শ কি ছিল—তাহার পরিণাম কি হইল—রুশ বিপ্লব রুশ জাতির জীবনে কি পরিবর্তন ঘটাইল—আমেরিকা স্বাধীন হইল কি উপায়ে—ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা কি রূপ পরিগ্রহ করিল—এগুলি কেবলমাত্র মৃত অতীতের বিবরণ নয়—ইহা হইতে মানুষ বর্তমান জীবন নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা লাভ করে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের লোভ, স্বার্থপরতা ও হিংসা, পরস্বাপহরণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির খেলা দেখিয়া, মানুষের কল্যাণী বৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক বৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখিয়া আমরা সতর্ক হইতে পারি।

ইতিহাস মৃতব্যক্তির বিবরণ মাত্র নয়—জীবিতদেরপথ-প্রদর্শক

জগতের কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন নহে। তাহার পিছনে একটি-না-একটি ঘটনা

রহিয়াছে। সমুদ্রের কোন তরঙ্গ একক নহে—তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গমালা। মানুষ যতদূর জানিতে পারিয়াছে, ততদূর পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পূর্বাপর সকলকে একত্র গ্রথিত করিলে তবেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। ইহাকেই বলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। ইতিহাস-পাঠে এই দৃষ্টিভঙ্গী জন্মে এবং কার্যকারণ নির্ণয়ে ক্ষমতা জন্মে। অনন্ত পথযাত্রীর পদপাতে ধূসরিত ইতিহাসের পথ—অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার, পরাজয়-ব্যর্থতার, চিন্তা-ভাবনার কথা, সাধনার কথা ইতিহাস-পাঠেই জানা যায়। কোন্ অনাদি কাল হইতেই ক্ষীণ ধারাটি বহিয়া আসিয়াছে, কে কিভাবে তাহাকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহা জানিলে তবেই আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই ধারা আরও বেগবতী করিতে পারি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না

অতীত কথা কাহার ইতিহাস, সে কথা শুনিবার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব, আকুল—তাই মানুষ অতীত বিষয়ের অনুসন্ধানে এত আগ্রহশীল—তাই মানুষ তাহাকে সাধ্য-সাধনা করে—অন্ধ যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাহার অনন্ত রহস্যের ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত করিবার জন্য—

উপসংহার

"কথা কও, কথা কও
অনাদি অতীত, অনন্ত-রাতে
কেন ব'সে চেয়ে রও।
কথা কও, কথা কও।
যুগ যুগান্তর ঢালে তার কথা।
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।"

মানুষের কোন-কিছু ইতিহাস ভোলে না—অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া বুকে করিয়া রাখে—সবকিছুরই প্রমাণ তাহার হস্তগত—সবকিছুরই সাক্ষী সে। মহাকালের পটে অক্ষয় তুলির অক্ষরে সে সব আঁকিয়া রাখে। মানুষ পাঠ করিবে বলিয়াই মানুষের ইতিহাস—ইতিহাসের মর্ম ইতিহাস নিজেই উদ্‌ঘাটন করে—কালে কালে তাহার ব্যাখ্যা সে আপনিই করে।

স্বদেশ-প্রেম

স্বদেশ মানচিত্রের একটি চিহ্নিত অংশ মাত্র। বিশাল ভূমণ্ডলের এই বিশেষ অংশটি আমাদের জন্মভূমি—পিতৃপিতামহের বাসস্থান। কবির ভাষায—

স্বদেশ কাহাকে বলে

"মাতৃস্তন্যে যথা, এদেশের
ফলে জলে পালিত আমরা।"

শুধু ফল ও জল নহে—এদেশের আবহাওযা, এদেশের ভাবধারা, এদেশের সমাজ, এদেশের সংস্কৃতি আমাদের দেহ মন পরিপুষ্ট করে। সেইজন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থান আমাদের কাছে এত প্রিয মনে হয না। এই দেশের প্রতি আমরা গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় আকর্ষণ বোধ করি।

স্বদেশ সকলেরই প্রিয। ইহা যতই অনগ্রসর দেশ হউক, ইহার জলবায়ু যতই খারাপ হউক, ইহা যতই দুর্জন মনুষ্যে পরিপূর্ণ হউক, তথাপি স্বদেশ সকলের নিকট প্রিয়। কবির ভাষায—

স্বদেশকে মানুষ কেন ভালবাসে ?

"দেখ রে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, দেখ কি কুস্থান হায।
এমন সুলভ রৌদ দুর্লভ তথায॥
তথাপি জিজ্ঞাস তা'র নিবাসীর কাছে—
এমন সুখের দেশ আর কিবা আছে।"

বাল্য হইতে স্বদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয। প্রথম চলিতে শিখি এই দেশের মাটির উপর—এই দেশের ধূলায় আমাদের অঙ্গ ধূসরিত হয, এদেশের বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচি। এদেশের আবহাওযার মধ্যে আমাদের দেহ গঠিত হয। এদেশের সমাজের মধ্যে থাকিয়া আমরা বযঃপ্রাপ্ত হই। এদেশের ভাবধারা আমাদের মনটি গঠন করে, এদেশের ঐতিহ্য ও সভ্যতা আমাদের মনের সংস্কাররূপে মনে বাসা বাঁধে, এদেশের গৌরবে আমাদের বক্ষঃ স্ফীত হয়। এদেশের কলঙ্কে আমরা অধোবদন হই, এদেশের দুঃখে আমাদের হৃদয়বীণায় করুণ রাগিণী জাগে, এদেশের জনসাধারণকে আমরা ভাইয়ের ন্যায় আপন মনে করি, এদেশের শত্রুদের আমরা আপন শত্রু মনে করিয়া উচ্ছেদ করিবার বাসনা মনে পোষণ করি। এত বেশী ভাবে এদেশের সঙ্গে আমরা জড়িত

যে, আমাদের ব্যক্তিগত বিশেষ চরিত্রও এদেশের অধিবাসীর সাধারণ চরিত্র হইতে পৃথক্ হয় না—বহুলতঃ একই রকম হইযা পড়ে। আদিম মানুষেব আপন বাসস্থানের প্রতি যে টান, আধুনিক যুগে তাহাই 'স্বদেশ-প্রেম'। এখন আমবা এককভাবে বাস করিতে পাবি না। আমাদের স্বদেশ আমাদেব বৃহত্তম বাসস্থান হইযা পড়িযাছে। একারণ আমরা স্বদেশকে ভালবাসি।

স্বদেশপ্রেম বনাম বিশ্বপ্রেম

স্বদেশ-প্রেম মানুষের একটি কল্যাণী বৃত্তি—কিন্তু স্বদেশ-প্রেমেব মধ্যে স্বজাতি-প্রীতি, স্বজন-প্রীতিব আধিক্যবশতঃ অনেক সমযে মানুষ অন্যদেশেব প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন হয। প্রীতি বা ভালবাসা কি কেবলমাত্র স্বদেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে? ইহা কি বিশ্বের সকল দেশের অধিবাসীর প্রতি, তথা মানুষমাত্রের প্রতিই প্রসাবিত হইবে না? "বসুধৈব কুটুম্বকম্" সমস্ত লোককে আত্মীয জ্ঞান করাব পথে ইহা কি বাধাস্বরূপ হইযা থাকিবে? তাহা হইলে তো স্বদেশ-প্রেম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপবতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিবে না। তাহা হইলে স্বদেশ-প্রেম আমাদের চিত্তবৃত্তির ব্যাপকতা ও বিস্তার-সাধন করিবে কিরূপে?

স্বদেশ প্রেম বিশ্বপ্রেমের পরিপন্থী নয়

মানুষের চিত্তবৃত্তির প্রসারেব একটি নিযম আছে। একবারেই মানুষ বিশ্ব-প্রেমিক হইতে পাবে না। আত্মপ্রীতি হইতে আত্মীয-প্রীতি, তাহা হইতে সমাজ-প্রীতি, তাহা হইতে স্বদেশ-প্রীতি—প্রীতির ধারা নির্বাধে এতদূব অগ্রসর হইযা আসিলে মানুষেব প্রীতি বিশ্বমুখীন হইবার জন্য উন্মুখ হয। কিন্তু এবিষযে মানুষের একটু স্বার্থবুদ্ধি সহজাত ধর্ম আছে। বিশ্বপ্রেম যদি তাহাকে স্বদেশের প্রতি বিরাগী করে—স্বদেশের ক্ষতির সম্ভাবনাযও যদি সে উদাসীন হয, তবে সেই বিশ্বপ্রেম কপট ভণ্ডামিমাত্র। বিশ্বের হিতসাধন করিবাব পথে যদি স্বদেশের ক্ষতি হয, তবে ববং স্বার্থপর হওয়া ভাল। তথাপি বিশ্বপ্রেমিক হওযা নিন্দনীয়। স্বদেশেব ক্ষতি না হয অথচ বিশ্বের মঙ্গল হয, সেই কার্যই প্রকৃত মানুষেব কার্য। স্বদেশের প্রতি কর্তব্য আগে, বিশ্বপ্রেম তৎপরে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—দান-ধর্মের গৃহেই প্রথম সূত্রপাত করিতে হয। কথাটি অত্যন্ত খাঁটি। নিজের ভাইকে ভালবাসিতে পারি না, তাহাব সহিত লাঠালাঠি করি আর পাড়াপ্রতিবাসীকে ভালবাসি;

স্বদেশের উপকার করিতে পারি না, বিশ্বের উপকার করিয়া বেড়াই—ইহার মধ্যে বিরাট্ ফাঁকি রহিয়াছে।

ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেম

স্বদেশ-প্রেমের বহু উৎকট বিকার আছে। ইহাকেই ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেম বলে। স্বদেশের কল্যাণ কামনায় বিশ্বে মহা অকল্যাণের স্রোত প্রবাহিত করিয়া বারে বারে ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেমিকগণ বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। পরদেশ আক্রমণ, পরদেশ লুণ্ঠন, পরদেশ পদানত করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথটি বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেমের পথ নয়। এই স্বদেশ-প্রেম মানব-ধর্মের বিরোধী। স্বদেশ-প্রেমিক ইংরেজের পদতলে ভারতবর্ষের স্বদেশ-প্রেম দুইশত বৎসর ধরিয়া নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল। জার্মান জাতির স্বদেশ-প্রেম বিশ্বকে দুই-দুই বার ধ্বংস করিয়া ছারখার করিয়াছে। ইতালীর স্বদেশ-প্রেম ইউরোপে ও আফ্রিকায় মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাপানের স্বদেশ-প্রেম এশিয়ার শান্ত পরিবেশটিকে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকলই ভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেম।

স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্ব-প্রেমের সামঞ্জস্য বিধান

ভারতবর্ষের গান্ধীবাদই স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজের স্বেচ্ছাচারের তিনি নিন্দা করিয়াছেন। শোষণের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ-জাতির উপর তাঁহার কোন প্রতিহিংসা ছিল না—স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় গান্ধীজীর এই নির্মল প্রীতিই আজ তাঁহাকে মহাপুরুষের আসনে আসীন করিয়াছে। তাঁহার নিরস্ত্র প্রতিরোধ—তাঁহার 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—বিশ্বকে এক নূতন নৈতিক শক্তির সন্ধান দিয়াছে। উগ্র স্বদেশ-প্রেমের ধাক্কায় যাহাতে বারে বারে মানব সভ্যতা বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাহার উপায় গান্ধী-শিষ্য শ্রীনেহরু তাঁহার পঞ্চশীল বা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতির মধ্য দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন—এই নীতিগুলি যেন উৎকট স্বদেশ-প্রেম প্রতিহত করার সুদৃঢ় বাঁধস্বরূপ—

১। পরস্পরের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতার প্রতি মর্যাদা।
২। পরস্পরকে আক্রমণ না করার নীতি গ্রহণ।
৩। পরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।
৪। সমানাধিকার ও পরস্পরের কল্যাণ সাধন।
৫। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতে এক মহা ঐক্য সংস্থাপনের প্রচেষ্টার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া 'ভারততীর্থে' তাঁহার যে স্বপ্ন রূপায়িত করিয়াছিলেন, আজ ভারত সেই স্বপ্ন স্বার্থক করিবার প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষতঃ অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের স্বদেশ-প্রেম নিজের স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কবির স্বপ্ন হয়তো অচিরেই সার্থক হইবে—

উপসংহার

"হেথা একদিন বিরাম-বিহীন মহা ওঙ্কার-ধ্বনি
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি—
তপস্যানলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া—
সেই সাধনার, সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।
এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।"

পৌরজনের কর্তব্য

'পুরে' বা নগরে যাহারা বাস করে, তাহাদের পৌরজন বা নাগরিক বলে। নগর সাধারণতঃ সভ্য, শিক্ষিত লোক দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস। এই নগরবাসের সুবিধা বিধানের জন্য পৌরসভা বা নাগরিক সভা থাকে। রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট হইয়া এবং নাগরিকদের নিকট হইতে আদায়ী কর সংগ্রহ করিয়া নগরবাসের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা পৌরসভাই করিয়া থাকে। পৌরবাসীর বহুতর অধিকার স্বাধীন দেশের প্রত্যেক পৌরবাসী ভোগ করে, কিন্তু তাই বলিয়া অবাধ স্বেচ্ছাচারের অধিকার পৌরবাসীর থাকে না।

পৌরবাসী যে-সকল অধিকার লাভ করে, তাহাদের পরিবর্তে পৌরজন-

সাধারণের সাধারণ স্বার্থরক্ষার কতকগুলি দায়িত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের অধিকারে আসে। রাষ্ট্র একজনের নয়, সকলকে লইয়াই রাষ্ট্র। কাজেই সকলকার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সকলকে রক্ষা করে, সেইজন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করে—কাজেই রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক নাগরিকেরও রাষ্ট্ররক্ষার একটা দায়িত্ব থাকে। এইজন্য রাষ্ট্রকে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিতে হয়। সেই সকল আইন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই প্রণয়ন করেন। এই কারণে সেগুলি পালন না করা আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় না থাকিলে আমাদের সর্বসাধারণের স্বার্থের হানি হয়—সেইজন্যই আইন প্রণয়ন করিতে হয় এবং আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হয়। উত্তম নাগরিক এই সকল আইন মানিয়া চলেন। কাজেই আইনকে মান্য করা নাগরিকের একটি পবিত্র কর্তব্য। আমাদের দেশ বৃহত্তম সংখ্যার ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়—তাঁহাদের শাসন না মানার অর্থ স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া। তাহা কোন রাষ্ট্রই সহ্য করে না।

অধিকারলাভের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞান

রাষ্ট্র প্রধানতঃ আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপার্জনের উপায়, ধর্ম-কার্য করার অবাধ অধিকার, যানবাহনের ব্যবস্থা, খাদ্য-সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সকল কার্যই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা যাহাতে সকলেই উন্নত হইতে পারি, সকলেই নিজ নিজ কর্মপটুতা অনুযায়ী কর্ম করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থাও সরকার করিয়া থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত মত প্রচারের স্বাধীনতাও সরকার আমাদের দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি অপরের স্বার্থহানিকর কোন কার্য করি, তাহা হইলে সরকারের আইনানুসারে দণ্ডনীয় হই। পরস্বাপহরণ, নরহত্যা, অপরের উপর জুলুম, অপরের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি প্রচার, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ অবস্থা ব্যাহত করিলে আমাদের নাগরিক কর্তব্যের হানি হয়। উত্তম নাগরিকের এরূপ ব্যবহার করা কদাচ উচিত নয়।

রাষ্ট্র আমাদের জন্য কি কি ব্যবস্থা করে

উত্তম পৌরজন বা নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চিন্তাশীল হওয়া—সকল

বিষযে ভাল করিযা চিন্তা করিয়া দেখা। ইহা ছাড়া জীবনেব প্রতিক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়া উত্তম নাগরিকের দ্বিতীয় কর্তব্য। তৃতীয় কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ হইযা কাজ করা। অপরের সহযোগিতা করা একটি প্রধান গুণ। পবস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত কোন মহৎ কার্যই সাধিত হয না। নাগরিক যদি অজ্ঞ হয, তাহা হইলে তাহাকে অন্ধই বলা যায। শিক্ষাহীন নাগরিক অন্ধেব ন্যায। সে তাহার কোন কার্যই ঠিকভাবে করিতে পারে না, উপবন্তু দুষ্ট লোকেব দ্বাবা চালিত হইযা পরের বুদ্ধিতে নিজের এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি করে। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের নিযম-পালন যেমন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেব জন্য প্রযোজনীয়, তেমনি সমাজেব জন্যও প্রযোজনীয। অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সমাজে রোগ বিস্তৃত হইয়া সকলকেই মৃত্যুপথের যাত্রী করে। শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আত্মপ্রত্যয জন্মে এবং আত্মচেষ্টার দ্বারা অবস্থাব উন্নতি করিতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিজে শিক্ষিত হওযা এবং সমাজে শিক্ষাব বিস্তাবে সাহায্য করা। ইহাছাড়া উত্তম চরিত্র অর্জন নাগবিকদেব কর্তব্যের অন্তর্গত। চরিত্র মানবেব অন্তর্নিহিত শক্তি—সকল কর্মের নিযামকরূপে ইহা আমাদিগের যাবতীয় কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। চরিত্রবান্ নাগবিক বাষ্ট্রে মহাশক্তিরূপে বিবাজ করেন। অর্থ ও বিত্তের যথাযথ ব্যবহারও উত্তম নাগরিকের কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা প্রধান কয়েকটি কর্তব্য নাগরিকের থাকা উচিত—তাহা শৃঙ্খলবোধ এবং পরের জন্য ভাবা। নিজে মানুষের মত বাঁচা এবং অপবেও যাহাতে মানুষের মত বাঁচিতে পাবে, সে বিষযে লক্ষ্য রাখা উত্তম নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

পৌরজনের কর্তব্য

মহাত্মা যীশুখৃষ্ট উপদেশচ্ছলে বলিযাছিলেন—"তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাসিবে।" ইহাতে একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করেন "প্রতিবেশী কে?" যীশু তাহার উত্তরে বলেন, "তুমি যাহার বিপদে সাহায্য কবিতে পাবিবে, যাহার দুঃখ-বেদনা দূর করিতে পারিবে, ক্ষুধায যাহাকে অন্ন দিতে পারিবে, সেই-ই তোমাব প্রতিবেশী।"

ভালবাসা সকল কর্তব্যের প্রধান

মানুষের ভালবাসা প্রসাবিত হইলে মানুষ সেই ভালবাসার জনের জন্য অসীম ত্যাগ, অনন্ত দুঃখ বরণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের অধীন সকলের প্রতি যদি আমাদের ভালবাসা বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সেই ভালবাসা আমাদিগকে কর্তব্য দেখাইযা দিবে।

রাষ্ট্র আমাদের—রাষ্ট্রের অধীন সকলেই আমাদের ভাইয়ের ন্যায—সকলের ভাল-মন্দের সহিত আমাদের ভাল-মন্দ জড়িত। সকলেব স্বার্থ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, এই বোধটি জন্মিলে পৌরজনেব মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত হইযা তাহাকে রাষ্ট্রের মহা হিতকারী সেবকে পরিণত করিবে।

রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে লাগার জন্য প্রত্যেক নাগরিক যেন সব সময়ে প্রস্তুত থাকে। রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয, আমারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হই। রাষ্ট্রের জন্য উত্তম নাগরিক প্রাণ বলিদানে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আমাদের রাষ্ট্র আজ আমাদেব আশা-আকাঙ্ক্ষাব মূর্ত বিগ্রহ। এই রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে হইলে আমাদেব প্রত্যেকেরই আদর্শ নাগবিক হইতে হইবে। উত্তম রাষ্ট্র—উত্তম নাগবিকেরই সৃষ্টি।

উপসংহার

বিশ্বত্রাস আণবিক বোমা

বর্তমান জগতে আণবিক বোমা বিশ্বের একটি বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত সভ্যজগৎ আজ নবমীর পাঁঠার মত এই মহাধ্বংসকারী আয়ুধের ভয়ে কম্পমান। দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা এই বোমা তৈযারীর প্রচেষ্টায় আণবিক গবেষণার কাযে আত্মনিযোগ করিযাছে। সকলেরই কাম্য এই বিশ্বধ্বংসী বোমা। ইহার বলে জগতে অপরাজেয় হইবার আকাঙ্ক্ষায সভ্যদেশগুলি লালাযিত।

ভূমিকা

গত মহাযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক বোমার প্রযোগ প্রথম করা হয। তাহার আগে পর্যন্ত আণবিক বোমার আবিষ্কার, তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয, সে সকলই লোকে যুদ্ধকালীন প্রচারিত বহু মিথ্যার ন্যায একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা বলিযা সন্দেহ প্রকাশ করিযাছিল। কিন্তু জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুইটি শহরে একদিন দুইটি আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হইযা মুহূর্ত মধ্যে যখন শহর দুইটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া লক্ষ মানব-সন্তানের মৃত্যু ঘটাইল, তখন

আণবিক বোমার বিভীষিকা

ইহাদের ধ্বংসকারিতা দেখিয়া মানুষ ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সেই বিকট বিভীষিকার আতঙ্কে জাপান হার মানিল। এই বোমার প্রলয়ঙ্কর শক্তি উক্ত শহর দুইটির চিহ্নপর্যন্ত বিলুপ্ত করিল এবং প্রাণিমাত্রেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আমেরিকা যে এই বোমা তৈযারীর কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাতে অন্য বড় বড় রাষ্ট্রগুলি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিল। বড় বড় বৈজ্ঞানিক এই কৌশল আয়ত্ত করার সাধনায় একনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আমেরিকা সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এই মারাত্মক আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল মেক্সিকোর কুমেরু দেশে নির্জন একটি প্রান্তরে; তথাপি সে সংবাদ গোপন রহিল না। বস্তুতঃ আণবিক-শক্তির মূল তত্ত্বগুলি বিশ্বের বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত নয়, তবে যে বিশেষ কৌশলে এই অস্ত্র নির্মিত হয়, তাহাই অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে জগতের মূল উপাদান অনন্ত শক্তিশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু এবং সেই অণুগুলিও চৈতন্যময়। কিন্তু এই উপলব্ধি ছাড়া অণু লইয়া কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বৈদিক যুগে হইয়াছিল কিনা, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে গ্রন্থে অণুর বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টপূর্ব ৪০০ বৎসর পূর্বে। এই বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম ডিমোক্রিটাস্। তিনি বলেন যে, অণুকে আর বিভাগ করা যায় না—এইগুলি অবিভাজ্য ও বিশ্বের মূল উপাদান। তৎপরে অণু সম্বন্ধে বহু কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত হইতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন ইংরেজ দার্শনিক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তথ্যটি উদ্ধার করিয়া তৎসম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন বাস্তবিক সত্য কখনও মরে না। কবির ভাষায়—

অণু ও আণবিক শক্তি

"মরে না মরে না কভু, সত্য যাহা
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়
আঘাতে না টলে।"

এই ইংরেজ দার্শনিকের নাম জন ডাল্টন্। তিনি অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করিলেন যে, জগতের বিভিন্ন পদার্থ এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুগুলির বিভিন্নভাবে সম্মেলনের

ফলেই সৃষ্ট হইযাছে ।....ডাল্‌টনের তথ্যগুলি লইয়া' তাঁহারই প্রদর্শিত পথে যাত্রা সুরু করিলেন বার্জোলিয়াস, লিবিতা প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা।....গবেষণা চলিতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারাও অদৃশ্য এই অণুসম্বন্ধে বহুতর তথ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইল সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা পদার্থ হাইড্রোজেন বাষ্প। ইহার উপাদানীভূত অণুগুলিই যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু, তাহা আবিষ্কৃত হইবাব পরই তাহাদেব শক্তি লইযা গবেষণার ফলেই হাইড্রোজেন বোমা তৈযারীর কৌশল আযত্ত হইল এবং মানুষের সর্বধ্বংসী আযুধগুলির মধ্যে এইটিই ধ্বংস-কারিতায় হইযা উঠিল বিশ্বের মহা আতঙ্ক। মানুষ এই মারাত্মক শক্তি লইযাই কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। এই শক্তি দ্বাবা মানবের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব কিনা সে বিষযেও গবেষণা সুরু হইযাছে ঃ

মানব কল্যাণে আণবিক শক্তি

আণবিকশক্তি আবিষ্কার আপাততঃ মানবের নিকট এক অভিশাপ বলিযা বোধ হইলেও 'রিণামে যে এই আবিকার মানব কল্যাণে নিযোজিত হইযা মানুষের জীবনযাত্রাকে সুখের করিযা তুলিবে, তাহার সম্ভাবনাও অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিযাছেন এবং সেই সম্ভাবনা সফল করিবার কাজে আত্মনিযোগ করিযাছেন। মানুষের শুভবুদ্ধি মানুষকে আজ সভ্যতার উচ্চতম শিখরে উপনীত করিযাছে। বিধাতার আশীর্বাদে মানুষ এই সভ্যতাব সোপানে উত্তরোত্তর আরোহণ করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতেছে। একদিন পৃথিবীতে বাষ্পের যুগ চলিয়াছিল, তৎপরে মানুষ বৈদ্যুতিক যুগে পদার্পণ করিযাছিল। এখন আবার পৃথিবীতে এক নবযুগের সূচনা হইতেছে—সে যুগে আণবিক শক্তিকেও মানুষ শীঘ্রই দাসের মত আজ্ঞাবহ করিযা মানব কল্যাণে নিযোজিত করিবে। আলাদিনের আজ্ঞাবাহী দৈত্য—প্রদীপ ঘসিলেই বাহির হইয়া আসিত—আলাদিনের আজ্ঞা পালন করিত। বর্তমানকালে আণবিক শক্তি সেই আজ্ঞাবাহী দৈত্য—ইহার আকৃতি আমাদের বিভীষিকার সৃষ্টি করিলেও আমরা শেষ পর্যন্ত ইহাকে বশীভূত করিতে পারিব, এইরূপ আশা মনে পোষণ করা নিতান্ত অলীক নয।

মানুষের জ্ঞান যাদৃশ বর্ধিত হইযাছে, মনুষ্যত্ব অদ্যাপি তাদৃশ বর্ধিত হয নাই। এখনও মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তিসকল সংযত হয় নাই। লোভ, স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসা

মানবকে দানবীয় স্বেচ্ছাচারের পথে বিভ্রান্ত করিতেছে। কিন্তু একদিন না একদিন মানুষের শুভবুদ্ধি জাগরিত হইবে—সর্বজীবে সমদৃষ্টির প্রসন্নতায় মানুষ শান্ত হইবে—তাহার ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হইবে।

উপসংহার

সেইদিন এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে। তখন দেখা যাইবে মানুষের অস্ত্রাগারে আর অস্ত্র নাই—আছে কেবল প্রেম আর মৈত্রী। বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কবে সে প্রেম ও মৈত্রীর ভাবধারা প্রবাহিত হইবে, সেই প্রতীক্ষায় বর্তমানে মানুষ শুধু দিন গণনা করে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

(২৬শে জানুয়ারী)

স্বাধীনতা মানুষের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু। কবি স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় অতি সুন্দর ভাষায় লিখিয়াছেন—

ভূমিকা

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।"

এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসী বহুদিন ধরিয়া আকুল হইয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করিয়া ভারতবাসী এই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়ে ২৬শে জানুয়ারীর একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী—ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিল। যতদিন না ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, ততদিন প্রতি বৎসরে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণের দ্বারা ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। তৎপরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে এবং তারপর তিন বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষ নিজের আদর্শ অনুযায়ী সংবিধান স্বীকার করিয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এইভাবে ২৬শে জানুযারী স্বাধীনতার সঙ্কল্পের দিনটিই ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনরূপে পালিত হইতেছে।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহা প্রজাসাধারণের রাষ্ট্র, তাহা প্রজাসাধারণের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণে সর্বদা সচেষ্ট। জাতির চিন্তা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রেরণা অক্ষুণ্ণ থাকিলে তবেই প্রজাতন্ত্রের আদর্শ অভিমুখে ধাবিত হওয়া যায়? নাগরিক কর্তব্যবোধ ও যোগ্যতার উন্নয়ন ব্যতীত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর না হইলে, প্রজায় প্রজায় সমমর্যাদা সম্পন্ন না হইলে, শিক্ষায়, অর্থে, প্রাণধারণের মান সকলেরই সমান না হইলে প্রকৃত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র কাহাকে বলে

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ কোটিরও অধিক। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে কি বিরাট বৈচিত্র্য—ভাষা, জীবনযাত্রা কতই না বিচিত্র। এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের, বহুকে একক করার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ যে এক বিরাট দায়িত্ব পালনের আদর্শ অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ইতিহাসের এক বিরাট নব অধ্যায়ের সূচনা করিবে। দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যিক শোষণের ফলে মেরুদণ্ড-হীন, অন্তঃসারশূন্য, শিক্ষাহীন, আত্মপ্রত্যয়হীন হইয়া পড়িয়াছিল এই দেশ। ইহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ বড় সহজ নয়। সেই কঠিন পথেই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার লক্ষ্য অতি উচ্চ। সেই লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করা সবে আরম্ভ হইয়াছে। এখন মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ, কর্ম ও সাধনার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে। আমরা যাহাতে একটি আদর্শ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর্গত সর্বমানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ বাধামুক্ত করিতে পারি, সেইজন্য প্রতিবৎসর ইহার সমাবর্তন উৎসবে আমাদের নূতন করিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে এবং নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এক গৌরবজনক কীর্তি

এইদিন আমাদের জাতীয় জীবনে মহা উৎসবের দিন। নগরীর বিভিন্ন অংশে

প্রভাতফেরী বাহির হয়। শিশু ও তরুণ তরুণীগণ দলে দলে জাতীয় পতাকা-হস্তে ভারতমাতার জয়গান গাহিতে গাহিতে রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করে। সরকারী ও বেসরকারী ভবনসমূহের শীর্ষে, গৃহস্থভবনে, পার্কে, ময়দানে, নানা ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানে

এই দিবসের উৎসব ও উৎসাহ

এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংস্থাসমূহে, এমনকি যানবাহনগুলির অগ্রভাগেও ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত চক্রলাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা শোভা পায়। নগরের স্থানে স্থানে শহীদ বেদী নির্মাণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়। বক্তারা মাঠে-ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন—দেশভক্তি, দেশের প্রতি আনুগত্য, দেশসেবা, দেশকে মহান্ করার ব্রত গ্রহণ করিতে বক্তারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। কলিকাতার রেড্ রোডে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা হয়—তাহাতে পুলিশ, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সেনানী ও অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া স্পেশাল কনষ্ট্যাবুলারী, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় রক্ষিবাহিনী, জাতীয় সমরশিক্ষার্থিবাহিনী, এ. সি. সি., সেণ্টজন অ্যাম্বুলেন্স ব্রীগেড ইত্যাদিও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। এই দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান—রাজ্যপাল কর্তৃক দেশের কৃতী ও যোগ্য সন্তানদিগকে কৃতিত্বের উপযোগী বীরচক্রাদি প্রদান করা হয়। প্রতি রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এইভাবে উৎসব পালন করা হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আড়ম্বর হয় রাজধানী নয়া দিল্লীতে। এখানে রাষ্ট্রপতি নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। রাজধানীর প্রধান প্রধান পথগুলি দিয়া সৈন্যবাহিনীর মার্চ দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের জনতায় পথগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। স্কুলের ও কলেজের ছাত্রীরা মার্চ করিয়া উৎসবটির মধ্যে মহা উৎসাহের সঞ্চার করে। আকাশে বিমান উড়িয়া নানারূপ ধূম্রজালের সৃষ্টি করিয়া একটি বিরাট্ জাতীয় পতাকার ন্যায় আকারের সৃষ্টি করে। উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, নৃত্য-গীত প্রভৃতিতে নয়া দিল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। এই দিবস বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ভারত-সন্তানদিগকে নানা উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি একটি বাণী দেন। প্রধান মন্ত্রীও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। দেশ-বিদেশ হইতে ভারতকে শুভেচ্ছা জানান হয়।

এই দিনটি যেমন মহা উৎসবের দিন, তেমনি আবার মাহান্ সঙ্কল্প গ্রহণের দিন।

১৯৩০ সালে এই দিনটিতে আমরা স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। তদবধি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আমরা ঐ ভাবেই দিনটি পালন করিয়াছি।

এই দিনের নূতন তাৎপর্য

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরও এই দিনটির তাৎপর্য ফুরায় নাই। ইহা যেন আমাদের মনে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ সর্বদা সজাগ করিয়া দেয়। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমরা আমাদের দেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করি। এই আদর্শের অভিমুখে যাহাতে আমরা অনলসভাবে অগ্রসর হইতে পারি এবং তাহার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ও যত্ন করার কথা যাহাতে আমরা না ভুলি, সেইহেতু এই দিনটি পবিত্রভাবে পালন করা উচিত। ভারতের অসংখ্য জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়—ভারত যাহাতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্র হইতে পারে—ভারতের প্রতি অধিবাসী যাহাতে সম্মিলিতভাবে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে, সেইজন্য আমাদের প্রত্যেককেই কাজ করিতে হইবে।

দেশভক্তি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি। দেশ অর্থে দেশের অধিবাসী। তাহাদের ভালবাসা ও তাহাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারা মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের রাষ্ট্র আজ স্বাধীন—আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত। তাঁহারা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী পথে ধাবিত হইতেছেন কিনা, তাহা যেমন সতর্ক দৃষ্টিতে দেখা

উপসংহার

প্রয়োজন আবার এই রাষ্ট্র যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায়, সেইজন্য আমাদের কার্যকলাপেরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। রাষ্ট্র আমাদের সৃষ্টি, আবার আমাদের আশ্রয়—একথা আমরা যেন না ভুলি।

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। ইহা একখণ্ড বস্ত্র মাত্র—ইহাতে কয়েকটি রং থাকে এবং নানারূপ প্রতীক ব্যবহৃত হয়। তথাপি ইহাকে দেখিলে স্বদেশ-প্রেমিকের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হয়। ইহার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। জাতীয় পতাকা যেন জাতির জীবনের ভাগ্যনিয়ন্তা। পূর্বকালে প্রাচীন ভারতবর্ষে রথের উপর ধ্বজায় নানারূপ প্রতীক ব্যবহৃত হইত, এই সকল ছিল ব্যক্তিগত চিহ্ন। এই সব চিহ্ন দেখিয়া তৎকালে বিশেষ বীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান জানা যাইত। এইভাবে কবে যে জাতীয় প্রতীকরূপে পতাকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না।

ভূমিকা

বর্তমানে প্রতি রাষ্ট্রের একটি জাতীয় পতাকা আছে। দেশের মনীষী ও বীরদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এইসব পতাকা ক্রমশঃ তৈয়ারী হইয়া বর্তমান আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতীয় পতাকায় যে-সব রং ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাহাদের একটি করিয়া অর্থ থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য শত শত বীর প্রাণ-বিসর্জন দিয়া এই পতাকার গৌরব বৃদ্ধি করে। এই পতাকা আমাদিগকে স্বদেশ-প্রেমে উজ্জীবিত করিয়া দেশের এবং ভবিষ্যৎ মানুষের স্বার্থরক্ষায় সর্বপ্রকার ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। ঐ বস্ত্রখণ্ড যেন মহাশক্তির আধার হইয়া যুগে যুগে দেশসেবকদের প্রাণে দেশপ্রেমের সঞ্চার করে।

বর্তমান পৃথিবীর প্রতি রাষ্ট্রের একটি করিয়া জাতীয় পতাকা আছে

ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্তিলাভের বাসনা জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কয়েকজন ভারতীয় কর্তৃক প্যারিসে সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় পতাকার পরিকল্পনা তৈয়ারী হয়। ঊর্ধ্বে জাফরাণী রং ও আটটি তারা, মধ্যে সাদা রং, নিম্নে সবুজ। সবুজের দক্ষিণে চন্দ্র ও বামে সূর্য। তৎপরে ১৯১৬ সালে অ্যানী বেসান্ত যখন হোমরুল প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন তখনকার

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার ক্রমবিবর্তন

পরিকল্পনায় আমাদের জাতীয় পতাকা এইরূপ ছিল :—পাঁচটি লাল রং ও চারটি সবুজ রং পর পর সমান্তরালভাবে স্থাপন করিয়া জাতীয় পতাকা তৈয়ারী হইবে। পতাকার বামধারে উর্ধ্বে ইউনিয়ন জ্যাক (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা) এবং তাহার নীচে সপ্তর্ষিমণ্ডল থাকিবে। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন তাহার রূপ এই প্রকার :—উর্ধ্বে শাদা (সংখ্যালঘুদের প্রতীক), মধ্যে সবুজ (মুসলিমদের প্রতীক) এবং নিম্নে লাল (সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতীক)। তিনটি সমান্তরালভাবে থাকিবে এবং বস্ত্রটি খদ্দরের হইবে। ১৯৩১ সালে আবার নূতন পরিকল্পনায় জাতীয় পতাকার রূপ এই প্রকার হয়—উর্ধ্বে জাফরাণী, মধ্যে শাদা এবং নিম্নে সবুজ। মধ্যে শাদা অংশে চরকা আঁকা থাকিবে। রঙ্‌গুলি গান্ধী পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের প্রতীক ছিল—এক্ষণে বিভিন্ন জ্ঞানের দ্যোতকরূপে কল্পিত হইল। জাফরাণী—সাহস ও ত্যাগ : শাদা—শান্তি ও সত্য ; সবুজ—বিশ্বাস ও শৌর্য। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের স্মরণীয় তারিখে জাতীয় পতাকা হইতে চরকা উঠাইয়া অশোকচক্র স্থাপন করা হইল। ইহাই আমাদের জাতীয় পতাকার বিবর্তনের ইতিহাস।

জাতীয় পতাকা সকলের সম্মানের বস্তু

জাতীয় পতাকা একখানি পবিত্র বস্ত্রখণ্ড। ইহাকে অবমাননা করা আইনতঃ দণ্ডনীয়। জাতীয় মহাশক্তির দ্যোতক এই পতাকাকে সম্মান করা প্রত্যেক দেশবাসীরই কর্তব্য। পতাকাকে অবমাননা করা দেশদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহ। আজ সকল স্বাধীন দেশেই আমাদের রাষ্ট্রদূত থাকেন। তাঁহাদের আবাসে আমাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। আমাদের দেশে যে-সব রাষ্ট্রদূত থাকেন তাঁহাদের বাসভবনে তাঁহাদের স্ব-স্ব দেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাকে। জাতির স্বাধীনতা সমাবর্তনের দিনে এবং প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উড্ডীন করা হয় এবং অনুষ্ঠানশেষে তাহাকে নামাইয়া রাখা হয়। অকারণে যথাতথা জাতীয় পতাকা উত্তোলন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। জাতীয় মহাপুরুষদের মৃত্যু বা কোন জাতীয় শোকের দিবসে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। তেমনি আবার জাতির শহীদদের জন্মদিবসে পতাকা উত্তোলন করাও অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।

জাতীয় পতাকা যখন কোন অনুষ্ঠানে উত্তোলন করা হয়, এবং ইহা বাতাসে উন্মুক্ত হইয়া পত্‌পত্‌ শব্দে উড্ডীন হয়, তখন ইহার ত্রিবর্ণের প্রীতিপদ রঙগুলি আমাদের মনে নানাভাবের তরঙ্গ তুলে—জাফরাণী রঙ আমাদের মনকে মহাবীর্য ও সাহসে পূর্ণ করে এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত করে। শাদা রঙ আমাদের মনে শান্তি ও সত্যের এবং প্রীতির ভাব আনে। আমাদের মনে বিশ্বমৈত্রী ভাব জাগে এবং শান্তির কল্যাণকর রূপ আমাদের মন হইতে হিংসা দূর করিয়া দেয়। সবুজ রঙটি আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয় আনে এবং শৌর্যবান্‌ হইতে উৎসাহিত করে। পতাকার সহিত আমাদের মনের এমন একটি নিবিড় যোগ ইতিমধ্যেই সাধিত হইয়া গিয়াছে যে, পতাকা দেখিলেই মনটি মহা উৎসাহে ভরপুর হয় এবং দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়।

জাতীয় পতাকার অনুপ্রেরণা

উপসংহারে একটি কবির উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। কবির নাম কুমুদরঞ্জন মল্লিক। তিনি আমাদের মনের ভাবটি ভারী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

উপসংহার

"হিমাচল হ'তে কন্যা-কুমারী
গিল্‌গিট্‌ হ'তে খাসিয়া,
উড়ে ভারতের জাতীয় পতাকা
শঙ্কা ও দ্বিধা নাশিয়া।
কমলা লেবুর ফুলের পরাগ
জাফ্রান সাথে রাখে তাহে দাগ
গঙ্গোত্রীর সজল সমীর
দোলায় তাহারে আসিয়া·······
·······অহিংসার ওই অশোক-চক্র
বিশ্বপ্রেমের ও প্রতীক
জগবন্ধুর ও নীলচক্র
অমৃতসিক্ত করে দিক্‌।"

মহাভারতের এ দিগ্বিজয়
নূতন রাজ্য দখলের নয়—
মানবতার যে পরিধি বাড়াতে
চাহিছে—চাহে না ততোধিক।"

একটি দিয়াশলাইয়ের আত্মকথা

ভূমিকা

পূর্বকালে মনীষীরা আত্মকথা লিখিতেন। বড় বড় রাজা ও দেশনায়ক ছাড়া বড় কেহ আত্মকথা লিখিতেন না। লিখিলেও সে আত্মকথার আদর হইত না—কেহ পড়িত না। কিন্তু বর্তমান-যুগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ—এখন সকলেই সব করিতে পারে—যে একেবারে অপদার্থ, সেও কত কথা বানাইয়া লিখিয়া সমাজে বড় সাজে। যাহার জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, সেও মহাডম্বরে অতি সামান্য ঘটনা লইয়া কলমবাজি করে। তাই সব দেখিয়া আমারও আত্মকথা লিখিবার সাধ হইয়াছে। ভয় হইতেছে, হয়ত বা মহাকবি কালিদাসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে—আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত সকলের উপহাসের পাত্র হইব—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

হয়ত বা তাহাই—এ যেন বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো!

আমার পূর্ব ইতিহাস ও বংশ-পরিচয়

আমাকে তোমরা "দিয়াশলাই" বল, ইহা তোমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাকে অবজ্ঞা করিয়া জানিয়া শুনিয়া অনেকে ঐ নামে ডাকে। ইহা বড়ই অন্যায়। আমার নাম "দীপশলাকা" অর্থাৎ দীপকাঠি। তবে যে সে দীপকাঠি নয়—ইহা বড় আশ্চর্য দীপকাঠি। আমি জ্বালিবার কার্যে তোমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। আমাকে ছাড়া বর্তমানে আগুন জ্বালাবার উপায় আর নাই। বহু পূর্বকালে মানুষ যখন আদিম অবস্থায় জঙ্গলে ঘুরিত, তখন মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিত যে, জঙ্গলে

শুষ্ককাঠের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। সেইভাবে আগুন জ্বালাবার জন্য তাহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। তৎপরে সহসা তাহারা চকমকি পাথর আবিষ্কার করিল। সেই পাথরের সহিত ইস্পাতের ঘর্ষণে আগুন জ্বালিতে শিখিয়া মানুষের সেদিন কি আনন্দ। তারপর মানুষ গন্ধক আবিষ্কার করিয়া তাহা কাঠিতে মাখাইয়া তদ্দারা অগ্নি জ্বালিত; কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শ ব্যতীত তাহা জ্বালান যাইত না। কাজেই চকমকি হইতে নির্গত অগ্নি প্রথমে শোলায় করিয়া জ্বালিতে হইত। এই গন্ধক কাঠিই আমার বংশের বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনিই আমার পিতা। আমার পিতা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি সুদূর সুইডেনে যান এবং তথাকার একজন রাসায়নিকের গৃহে স্থান পান। তাঁহারই গৃহে আমার জন্ম হয়। তিনি জন্মমাত্রেই আমাকে সাল্‌ফেট্‌ নামক পদার্থ দ্বারা মাখাইয়া দেন। আমার শরীরের একপ্রান্তে কৃষ্ণবর্ণ এই পদার্থটি শক্ত হইয়া গেলে আমার আকৃতি বেশ সুন্দর হয়। তারপর ঐ পদার্থ-মাখান কাগজে আমার মুণ্ড ঘষিতেই আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে এবং আলোকে ঘর ভরিয়া যায়। পুড়িতে আমার বড় কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তখনই মনে হইল যে, জগতে সবকিছুই নশ্বর—কীর্তিই অবিনশ্বর। আমি নিজ দেহ পুড়াইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিব—ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে?

সুইডেন দেশে ত আমার কত পসার হইল। কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোক যে আমাকে চাহে। আমার জন্য প্রত্যেক দেশ লালায়িত। সল্‌ফেট্‌ মাখাইয়া হাতে গড়িয়া কত কাঠি মানুষ তৈয়ারী করিবে? অসম্ভব চাহিদার জন্য শেষে দিয়াশলাই প্রস্তুতের কল তৈয়ারী হইল। সরু সরু করিয়া একই মাপের কাঠি কলে প্রস্তুত হইতে লাগিল। কলের সাহায্যে সল্‌ফেট্‌ মাখান হইতে লাগিল এবং ছোট ছোট বাক্সে ভর্তি করিয়া আমাকে দেশবিদেশে চালান দেওয়া হইতে লাগিল। বাক্সের দুই পার্শ্বে সল্‌ফেট্‌ মাখাইয়া সহজেই অগ্নি জ্বালাবার উপায় করা হইল। এইভাবে আমি প্রত্যেক দেশে আদৃত হইলাম। এখন সব দেশেই আমাকে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দিয়াশলাই তৈরী

আমি ক্ষুদ্র দিয়াশলাই—চল্লিশ বা ষাটটি করিয়া কাঠি একত্র বাক্সে ভর্তি

হইয়া সকলের ঘরে ঘরে বিরাজ করি। ধূমপানকারীদের পকেটে ঘুরিয়া বেড়াইতে কিন্তু আমার বড় বিরক্তি। আমি লোকের ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইতে বড় আনন্দ পাই। দেবদেবীর সম্মুখে ধূপ ও দীপ জ্বালাইতে আমার বড় সাধ। আর আমাকে কিনা দুর্গন্ধ বিড়ি, তামাক ও চুরুট খাইবার কাজে ব্যবহার করে। আবার পরের সর্বনাশ করিবার জন্য, পরের ঘরে আগুন জ্বালাইবার জন্য অনেক দুর্বৃত্ত নরপিশাচ আমাকে ব্যবহার করে। তাহাদের হাতে পড়িলে রাগে আমার শরীর রী-রী করিতে থাকে। কিন্তু কি করিব, নিরুপায় হইয়া শুধু মানুষের নষ্টামি দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। বর্তমানে অনেক সৌখীন বাবু আমার পরিবর্তে চক্‌মকিযুক্ত পেট্রোলের পলিতাওয়ালা একপ্রকার ক্ষুদ্র সুদৃশ্য যন্ত্র ব্যবহার করে। এই যন্ত্রটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। তথাপি আজও আমার প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। এই সেদিন আমার দাম বাড়াতে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন হইয়াছিল। ইহাতে আমার মনে ভারী আনন্দ হইয়াছিল।

আমার প্রয়োজনীয়তা

মনে করিতেছ, আমি ত' একবার জ্বলিয়াই শেষ হই—একবার আলো দিয়াই ত' কাঠিটি লোকে জঞ্জালের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। একথা সত্য বটে, কিন্তু আমি যে রক্তবীজের বংশ। অধুনা কলে কোটি কোটি দিয়াশলাই প্রত্যহ তৈয়ারী হইতেছে। অবতারগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন, আমরা অবতারদের চেয়েও বড়—একটি দিয়াশলাই ফুরাইলে তৎক্ষণাৎ আরেকটি কিনিতে হয়। আমার আসন কদাচ শূন্য হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে খোল ও আমার কাঠি ছাড়াছাড়ি হইলে মহা বিপদ্। তখন পরস্পরকে খুঁজি। আমরা যে হরিহরাত্মা—একে অন্যকে ছাড়া থাকিতে পারি না।

সম্ভবামি যুগে যুগে

এই আমার আত্মকথা—এখনও পর্যন্ত আমার রাজত্ব চলিতেছে, আরও বহুদিন চলিবে। আমার সেবায় সকলে তুষ্ট—সকলেই আদর করে। এইজন্য আমার মনটি সদাই পরিতৃপ্ত। তবে সহসা আমার মাথাটি বাক্সের গায়ে ঘষিলে আমি ফোঁস্ করি—সে কিন্তু রাগে নয়—তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য—তোমাদের সতর্ক করিবার জন্য—

উপসংহার

পাছে তোমাদের গায়ে আগুন লাগে, তাই তোমাদের সাবধান করিবার জন্যই এইরূপ শব্দ করি। তথাপি যদি তোমাদের জ্ঞান না হয়—হাতে আগুন লাগে, সেজন্য আমার উপর রাগ করা কিন্তু তোমাদের অন্যায়। তোমরা মানুষ, আর আমি সামান্য দীপকাঠি। আমি তোমাদেরই সেবক—আমার উপর রাগ করা অন্যায় নয় কি?

--

দক্ষিণ-মেরু অভিযান

মেরুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষের বহুদিনের। এই অভীষ্টলাভের জন্য কত সাধনাই না হইয়াছে। এই সুদুর্গম পথ কত বীরের কঙ্কালে বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা অভীষ্টলাভের সাধনায় মৃত্যুবরণ করিয়া মানুষের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। এই পথ তুষারে আকীর্ণ, মৃত্যুভয়াল। বরফশুভ্র এই তুষারমেরু কেবলই মানুষকে ডাকিয়াছে এবং মানুষও সে ডাকে বীরের ন্যায় সাড়া দিয়াছে। দক্ষিণ-মেরু অভিযানের ইতিহাসে ক্যাপ্টেন স্কটের নাম অমর হইয়া আছে। তিনি মেরুবিন্দুতে পৌঁছান, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে প্রাণ হারান। তাঁহার পর বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী এভারেস্ট বিজয়ী তেন্‌জিং নোর্‌কের অন্যতম সঙ্গী স্যার এড্‌মণ্ড হিলারী দক্ষিণ-মেরুর মেরুবিন্দুতে পৌঁছাইয়া আবার দক্ষিণ-মেরু বিজয়ী হইয়াছেন।

ভূমিকা

১৯১১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর নরওয়ে দেশের অভিযাত্রী আমুণ্ডসেন সর্বপ্রথম দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছান। ইংরেজ মেরু-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন স্কট্ এ সংবাদ জানিতেন না। তিনি উইল্‌সন্, ওটস্, বাওয়ার্স ও ইভান্স এই চারিজন সঙ্গীর সহিত ১৯১২ সালের ১৮ই জানুয়ারী অর্থাৎ আমুণ্ডসেনের ঠিক একমাস পরে মেরুতে উপস্থিত হইয়া আমুণ্ডসেনের তাবু দেখিতে পান এবং নরওয়ে দেশের পতাকা উড্ডীন দেখেন। ফিরিবার পথে তুষারঝড়ে ক্যাপ্টেন স্কটের মৃত্যু হয়। তিনি ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে রস্‌দ্বীপ হইতে যাত্রা করেন। প্রথমে মোটর-চালিত চাকাহীন স্লেজগাড়ীতে যাত্রা করেন কিন্তু

দক্ষিণ-মেরু বিজয়ের ইতিহাস

বরফের উপর দিয়া এই যন্ত্র-যান ঠিকমত চলিতেছে না দেখিয়া পরে টাট্টুঘোড়া ও কুকুর দ্বারা টানা শ্লেজে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। মেরু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল কিন্তু চরিতার্থ হয় নাই। এই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য আবার দক্ষিণ-মেরু অভিযানের ব্যবস্থা হয়। দুইটি দল একই সময়ে যাত্রা করেন। স্যার এড্‌মণ্ড হিলারী ছিলেন নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ-মেরু অভিযানকারীদলের নেতা এবং প্রধান কমনওয়েল্‌থ্‌ অভিযানকারীদলের নেতা ছিলেন ডাঃ ভিভিয়ান্‌ ফুক্‌স্‌। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে হিলারী 'ম্যাক্‌মরডো সাউণ্ড' হইতে যাত্রা করেন। তিনি বরফকাটা ট্রাক্টর, শ্লেজ ও কুকুরের দলের সাহায্যে দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছান। ৩রা জানুয়ারী বেলা ১০-১ মিনিট (গ্রীনউইচ্‌) সময়ে তিনি সাফল্য লাভ করেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি বেতারে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দক্ষিণ-মেরু বিন্দু হইতে ৪৫ মাইল দূরে আছেন এবং সম্মুখে পথও সহজ। ইহার পূর্বদিন ডাঃ ফুক্‌স্‌ মেরু হইতে ৩০ মাইল দূরে ছিলেন এবং হিলারী ছিলেন ৭৫ মাইল দূরে। তথাপি হিলারী সর্বাগ্রে কুমেরু পৌঁছাইয়া মানুষের প্রকৃতি-বিজয়ের ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি করিলেন। কুমেরু-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সর্বপ্রথম অভিযান শুরু হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। একটি ফরাসী অভিযাত্রীদল এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রদর্শক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আসেন একটি আমেরিকান্‌ অভিযাত্রীদল ; ইঁহাদের নেতা ছিলেন ড্যুমণ্ট দ্য আর্‌বেভিল এবং উইক্‌স্‌। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্‌ রস নামক একজন ইংরেজের পরিচালনায় একদল অভিযাত্রী 'এরবুস' ও 'টরর' নামক জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের উপকূল হইতে আণ্টার্টিকা অভিমুখে যাত্রা করেন—ইঁহারা কুমেরুর বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লারসেন সর্বপ্রথম কুমেরুর মূল ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। ইহার পর হইতে ক্যাপ্টেন স্কটের অভিযান শুরু হয়। তিনি প্রথম বারের অভিযানে 'ডিসকভারি' নামক বিশেষভাবে প্রস্তুত জাহাজে যাত্রা করেন এবং কুমেরু সম্বন্ধে কিছু তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহকারী শ্যাকল্‌টন্‌ 'নিম্‌রড্‌' জাহাজে চড়িয়া কুমেরুর পথে যাত্রা করিয়া কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেন।

যে কুমেরু মহাদেশের স্থলভাগে পেঙ্গুইন, সি-গাল প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখী ছাড়া আর কোন প্রাণীর জীবনধারণ সম্ভব নয়, সেখানেও মানুষ পৌঁছিয়াছে—সেদেশ সম্বন্ধে তাহাদের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য। মেরু ও তৎসংলগ্ন দেশগুলি ভয়াবহ

—সেখানে মনুষ্য-জীবন রক্ষা করা এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়।

কুমেরুর রহস্য

কয়েক শতাব্দী পূর্বেও পাশ্চাত্য জগতের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সবদক্ষিণ অঞ্চল শস্য ও ধনসম্পদে সমৃদ্ধ : কিন্তু মানুষের সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। ভূমিখণ্ড এখানে পাঁচ সাত হাজার ফিট বরফের আস্তরণে সর্বদা ঢাকা থাকে। এখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বহু নীচেই থাকে। তদুপরি সহসা ব্লিজার্ড বা তুষার-ঝটিকা বহিতে থাকিলে কিছুক্ষণের মধ্যে বরফের তলায় চাপা পড়িয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই মহাদেশের আয়তন চুয়ান্ন লক্ষ বর্গমাইলের কাছাকাছি। তুষারাতঙ্ক ছাড়াও ছয়মাসকালব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন মেরু-রাত্রির বিভীষিকা ত' রহিয়াছেই।

মানুষের সাধনা—দুর্জয়কে জয় করার সাধনা—অজানাকে জানার সাধনা—অদেখাকে দেখার সাধনা। এইসব সাধনায় মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সে সন্তুষ্ট নয়। চির অতৃপ্তির তাড়নায় সে পৃথিবীর দুর্গম পথে-বিপথে ঘুরিতেছে। আকাশপথেও তাহার অভীপ্সার গতি অবাধ। কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়া মানুষ এবার গ্রহগুলিতে পর্যন্ত ধাবমান হইবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। পৃথিবীর ঠিকানা তাহার জানা হইয়াছে, এইবার গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত বিশ্বজগতের পথে সে বাহির হইবে। এই পথে মৃত্যু তাহার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে কিন্তু তথাপি সে মৃত্যুও মানুষ উত্তীর্ণ হইবে। দুরন্ত মানবগণই মানুষের জয়যাত্রার নব নব ইতিহাস রচনা করিয়া আসিতেছে। ইহাদের বন্দনায় কবি গাহিয়াছেন—

দুর্জয় মানুষ

"অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে, তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই।
পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির ;
প্রভঞ্জনের বিরাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।" —(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ

ভূমি সকলেরই, কাহারও নিজস্ব নহে। ইহাতে রাজারও যে অধিকার, দীনতম ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। তথাপি দেশে জমির উপর এক কায়েমি স্বার্থবাদীর স্বত্ব দাঁড়াইয়া গেল এক অভূতপূর্ব অবস্থার চাপে। প্রাচীনকালে যে যে পরিমাণ ভূমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতে পারিত, সেইটুকুই সে ভোগদখল করিত। অপরের পরিশ্রমের ফলভোগীরূপে একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তন করিয়া এই জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করেন। তখন কোম্পানি জমিদারের নিকট হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহা বাদেও জমিদার প্রজার নিকট হইতে যাহা পাইতেন, তাহাই তাঁহাদের নিট্ আয় ছিল। নির্দিষ্ট তারিখে সরকারের রাজস্ব জমিদার জমা দিলে নির্বিবাদে জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিতেন।

ভূমিকা

দেশের একশ্রেণী আবার জমিদারের দেখাদেখি ছোট জমিদার বা মধ্যসত্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা আবার জমিদারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া উচ্চহারে খাজনা ধার্য করিয়া কৃষকগণকে বণ্টন করিতে লাগিলেন। পূর্বে কৃষক ছিল সরকার। এক্ষণে জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী এই উভয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল সরকারিয়ানা। ফলে দরিদ্র কৃষকের উপর করের ভার বেশী চাপিতে লাগিল। জমিদারগণ মালিকানা স্বত্বে অধিকারী হইয়া মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের জমি দেন, তাহারা আবার তাহাদের নিম্নে প্রজার সৃষ্টি করে। লাভের উপর লাভ—এইভাবে দরিদ্র প্রজা করভারে জর্জরিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ খাজনার হার এরূপ হইতে লাগিল যে, চাষী জমি চষিয়া প্রায় কিছুই পায় না—শুধু ভূতের ব্যাগার খাটাই সার হয়। কৃষিব্যবস্থায় ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে লাগিল। জমিদার হইতে মধ্যস্বত্বভোগী সকলেই মুনাফাখোর। কৃষি-জমির উন্নতির ব্যবস্থা করে কে? সেচ-ব্যবস্থার অভাবে জমিসকল পতিত হইতে লাগিল, ফসল উৎপাদনের হার কমিতে লাগিল, কৃষক ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিল, জমিগুলি ক্রমশঃ মধ্যস্বত্বাধিকারীদের খাসে পরিণত হইতে লাগিল এবং কৃষকগণ ক্রমশঃ ভূমিশূন্য হইয়া কৃষিমজুরশ্রেণীতে পরিণত হইতে লাগিল।

মধ্যস্বত্বাধিকারী

১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস্ ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশনকে "ফ্লাউড কমিশন" বলা হয়। ইহারা জমি সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া রায় দিলেন যে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদারের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করাই কৃষকদের পক্ষে কল্যাণকব। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভা 'জমিদখল বিল' উপস্থাপিত করেন এবং ক্রমে বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। ইহাতে জমিদার ও মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের নিট্ আযের উপর ক্ষতিপূরণ দানেব একটা নীতি স্থিরীকৃত হয়।

ভূমি রাজস্ব কমিশন

জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহাদের খাস জমির মধ্য হইতে কত জমি নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারেন, তাহার পরিমাণও সরকার নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং জমির মালিকমাত্রেরই জমির পরিমাণের সীমা নির্দিষ্ট হয। অধীনস্থ সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব চিরতরে বিলোপ করিয়া সবকার যাবতীয় জমির মালিক হন। এই ব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারগণের একটি আয়ের পথ বন্ধ হইযাছে। তাহাদের ক্ষতিপূরণের টাকা সরকার এখনও দান করে নাই। বড বড জমিদারদের আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জমিদারী-প্রথা বিলোপের ফলে কৃষকের এখনও কোন লাভ হয় নাই। শুধু জমিদারের স্থলে সরকার আসিযাছেন। খাজনার বর্ধিত হার যাহা ছিল, কৃষককে অদ্যাবধি সেই হারে ভারবহন করিতে হইতেছে। জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী ও বর্ধিষ্ণু কৃষকদের উদ্‌বৃত্ত জমি সরকার দখল করিয়া পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করেন নাই।

জমিদারী উচ্ছেদের ফলাফল

আমাদের ভূমিব্যবস্থার বহুতর ত্রুটি রহিয়াছে। এই সকল ত্রুটির মধ্যে প্রধান ত্রুটি জমির খণ্ডীকরণ। খণ্ডীকৃত জমিগুলি ক্রমশঃ চাষের অযোগ্য হইয়া পডিতেছে। আইন দ্বারা খণ্ডীকরণ বন্ধ করিযা খণ্ডীকৃত জমির একীকরণ ব্যতীত ভূমিব্যবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নয। তাহা ছাড়া কৃষক ব্যতীত অপরের হাতে জমির মালিকানা যাহাতে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য। কৃষক জমির মালিক হইলে সে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রাণপাত করিতে পারে। বর্তমান অবস্থায় এখনও বহু মধ্যস্বত্বাধিকারী কৃষকদের পরিশ্রমের উপর বাণিজ্য করিতেছে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ দ্বারা কৃষকের যে মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তাহা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে

তা'ছাড়া জমির খাজনাও বর্তমানে একহারে নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পূর্বব্যবস্থানুযায়ী কৃষকদের এখনও খাজনা দিতে হয়—তাহা অসমান এবং কতকক্ষেত্রে অত্যন্ত অন্যায়রূপে উচ্চ।

উপসংহার

বাংলাদেশের শতকরা সত্তর জন গ্রামে বাস করে। তাহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবীদের উন্নতির উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর করে। এই কৃষিজীবীর অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায়স্বরূপে যদিও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তথাপি সরকারের এখনও বহুতর কর্তব্য রহিয়াছে। উন্নতধরণের কৃষিপ্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে হইবে, ভাল বীজ, জমির সার ইত্যাদি দিয়া যাহাতে কৃষির উৎপাদন বর্ধিত হয়, সেই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বলিষ্ঠ বলদ প্রভৃতির সংগ্রহে কৃষকদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়ার দরকার। কৃষকেরা যাহাতে স্বল্প সুদে ঋণ পায়, তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার বর্তমানে সমবায় কৃষি-প্রথার প্রবর্তনে উৎসাহদান করিতেছেন এবং এইরূপ সমবায়-সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন; কিন্তু সমবায়-কৃষির বাধাগুলির অপসারণেও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন। আমাদের কল্যাণকামী-রাষ্ট্র এই বিষয়ে তৎপর হইলে বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ শ্রেণীর মঙ্গল অনিবার্য এবং দেশের খাদ্য-সমস্যারও সমাধান অতি সুষ্ঠুভাবেই হইতে পারে।

স্বাস্থ্য, অর্থ, জ্ঞান—কোন্‌টি চাও? কেন?

ভূমিকা

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। কতরকম বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার বুদ্বুদ যে আমাদের মানস-সরোবরে নিত্য উঠিতেছে, আর মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে! শৈশবে কত বিচিত্র অদ্ভুত সাধ আমাদের মনে জাগে কিন্তু বয়স যত বাড়িতে থাকে, ততই আমাদের বিচারবুদ্ধি পরিপক্ক হয়। তখন আমরা মনের এই সকল বিচিত্র আশাকে ক্রমশঃ ছাঁটিয়া

ফেলি এবং কতকগুলি কল্যাণকর আদর্শ স্থাপন করিয়া সেই আদর্শের অভিমুখে জীবনকে পরিচালিত করি।

স্বাস্থ্য, অর্থ ও জ্ঞান তিনটিই মানুষের সমান কাম্য। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন দেহ লইয়া অর্থলাভ করিয়াও তাহার ফলভোগী হওয়া যায় না। স্বাস্থ্যহীন জীবনে সুখ কোথায়? আবার শুধু অর্থ হইলেও চলে না—যে অর্থ জীবন-পথের পাথেয়, সেই অর্থের বিনিময়েও কিন্তু স্বাস্থ্য মিলে না। স্বাস্থ্যহীনের পক্ষে জ্ঞানলাভ করার পথটিও সুগম নহে। জ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ—স্বাস্থ্যহীনের পক্ষে সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর নয়। অর্থবলেও জ্ঞানলাভ করা যায় না—জ্ঞানসাধনার পথ সুগম করে সত্য, কিন্তু অর্থের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের জ্ঞানসাধনার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। আবার শুধু জ্ঞানের সাধনা করিলেই ত' আমাদের উদরের জ্বালা মিটে না। আহার চাই, বাসস্থান চাই, মানুষের যোগ্য ভোগ্যবস্তু চাই—এগুলির অভাব ঘটিলেই জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর নয়। জ্ঞানলাভের দ্বারা অর্থোপার্জন হইলে অবশ্য উভয়ের সামঞ্জস্যে সুখের হইতে পারে; কিন্তু স্বাস্থ্যও সেই সঙ্গে চাই বৈকি। স্বাস্থ্যহীনের জীবনে অর্থ ও জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

তিনটিই সমান কাম্য

এই তিনটিই মানুষের সুখের নিদান। ইহাদের কোনটিকেই ত্যাগ করা যায় না। কাজেই এই তিনটির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। শুধু স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়ামে, কসরতে, শরীর ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিলে জ্ঞানলাভ করার সুযোগ নষ্ট হইয়া যায়। শুধু দেহটিই মানুষ নয়—তাহার মধ্যে একটি মন আছে—সেটির প্রতি উদাসীন হইলে মানুষের একদিক চিরকাল অন্ধকারে আবৃত হইয়া থাকে। এইজন্য দেহ ও মন উভয়েরই সমানভাবে স্ফূর্তি সম্পাদন করা চাই। এই দুইটির সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলে জীবনে বহু সুখের উপায় হয়। দেহটি নীরোগ, সুগঠিত, রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতায় বলীয়ান্ হইলেই যথেষ্ট। অত্যধিক পেশী সঞ্চালন দ্বারা এক-একটি ভীম হওয়া অপেক্ষা পূর্বোক্তরূপ নীরোগ দেহই আমার কাম্য। এইরূপ দেহ লইয়া জ্ঞানসাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু সেদিকেও আবার সীমা আছে। সেটি পার হইয়া গেলে

তিনটিই আমার জীবনে প্রয়োজনীয়

আবার সংসারে টিকিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়ে। আমাদের পরিবার আমাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া, কত আশা লইয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমাদের কতকগুলি গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্তব্যগুলি পালন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্য জ্ঞানসাধনার পথটিও যাহাতে পরিণামে অর্থকর হয়, সে বিষয়েও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "যে শিক্ষা আমাদের রুটি দিতে পারে না, সে শিক্ষা আবার শিক্ষা কি?" বাস্তবিক বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী জ্ঞানসাধকদের দারিদ্র্য ও দৈন্য দেখিলে মনটি সত্যই দমিয়া যায়। এ পথ যেন আমার পথ না হয়। কাজেই অর্থও আমার চাই বৈকি। কিন্তু সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আমি স্বাস্থ্য বা জ্ঞান কোনটিকেই ছাড়িতে রাজি নহি। প্রাণধারণ ও সংসার প্রতিপালন, সংসারের বিবিধ দায়িত্ব পালন এবং মানুষের ন্যায় বাঁচিয়া থাকিবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমার অবশ্যই চাই। দীনহীনের মত দুনিয়ার পথে উত্তম স্বাস্থ্য ও জ্ঞান লইয়া আমি ঘুরিতে রাজী নই। অতুল ঐশ্বর্য অনেক সৎকাজে লাগান যায়—মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের উপার্জনের জন্য যদি স্বাস্থ্য হারাইতে হয়, যদি বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিটি হারাইতে হয়, তবে তাদৃশ অর্থোপার্জনে আমার প্রয়োজন নাই।

গামা, গোবর, স্যাণ্ডো, হেকেন, স্মিথ যে হইতে চায়, হউক; রকফেলার, তুতান, খামেন, সলোমন, আগা খাঁ'র ঐশ্বর্য যে কামনা করে, করুক; প্লেটো, সক্রেটিস, ডায়োজিনিস্ যাজ্ঞবল্ক্য যে হইতে চায়, হউক; আমার কিন্তু সে সাধ নেই। আমি সাধারণ মানুষ হইতে চাই। জ্ঞান চাই, অর্থ চাই—আমার চাওয়া সীমিত চাওয়া। প্রাণধারণের জন্য যাহা যে পরিমাণ লাভ করা প্রয়োজনীয়, সেইটুকু লাভ করিলেই আমার আশা মিটিবে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ আশা আমার নেই।

উপসংহার

বাংলাভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজী ভাষা

দীর্ঘকাল ইংরেজের অধীনে থাকার ফলে ইংরেজ আমাদের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার সংস্পর্শে আমরা নিজেদেব সব কিছু ভুলিতে বসি। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামরিক জীবনে এক বিরাট রূপান্তর সাধন করে। ক্রমশঃ আমরা ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিলাম এবং ইংবেজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া একেবারে নিজস্ব সব কিছু জলাঞ্জলি দিলাম। ইহার ফলে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিলাম, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু হইল না, নিজস্ব সম্পত্তি হইল না। আমাদের শিক্ষা কেবল পরের বুলি মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছু হইল না।

ভূমিকা

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলে শিক্ষার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ হয়—আমরা আমাদের স্বাধীন মনন ও বীক্ষণ দ্বারা তাহাকে যাচাই করিয়া ঘরে তুলিতে পারি। যে ভাষায় আমাদের মনে অভিজ্ঞতা প্রথম আকার গ্রহণ করে, জীবনের বিচিত্র সমস্যা যে ভাষায় আমাদেব চেতনার দোল দেয়, যে ভাষা আমাদের নিত্যদিনের কাজকর্মে, ভাব-কল্পনায়, ভাবের আদান-প্রদানে আমাদের চিত্ত-কুসুম বিকশিত করে, সেই ভাষা ছাড়িযা পরের ভাষা গ্রহণ করিলে আমাদের মনের সহিত সে শিক্ষার সহজ, স্বাভাবিক যোগ হইতে পারে না। এইজন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশে মাতৃভাষার পাশে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর একটু স্থান করিয়া দেওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন। এখানে হিন্দীভাষার স্থান কখনই হইতে পারে না। ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়ার কারণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের আধিক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। উচ্চশিক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষায় যে সকল পুস্তকাদি আছে। তাহাদের সহিত আমাদের যোগাযোগ সাধনের দরকার আছে। সাহিত্য ও

ইংরেজী ভাষা

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী আমাদের একটি উচ্চতর মানের নির্দেশ দেয়। কাজেই ইংরেজী ভাষার সাহচর্য আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর ও উচ্চতর করিবার পক্ষে অপরিহার্য। জাপানে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার পরেই ইংরেজীর স্থান। রুশদেশেরও ঐ এক কথা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ইংরেজী ইতোপূর্বেই আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

হিন্দী ভাষা

হিন্দীকে ইংরেজীর স্থানে স্থাপন করিলে ভারতীয় একটি ভাষাকে স্থান দিয়াছি মনে করিয়া স্বদেশপ্রীতি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়; কিন্তু তাহার সার্থকতা নাই। হিন্দীর মাধ্যমে আমরা যাহা শিক্ষা করিব, সে সমস্তই মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা করিতে পারি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হিসাবে অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই যখন ইংরাজী ভাষা আসিয়া গিয়াছে তখন তাহাকে হটাইয়া আবার সেই স্থানে হিন্দীকে বসানো অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর। ইংরেজীর স্থলে হিন্দী প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতৃভাষা ও ইংরেজী অবহেলিত হইতে বাধ্য; এবং তাহার ফলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। হিন্দীকে প্রাধান্য দিতে গিয়া যদি ফলে-ফুলে বিকশিত ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত বাংলা ভাষার ক্ষতি হয় তবে তাহাতে বাঙালী মাত্রেই প্রতিবাদ করিবেন। পক্ষান্তরে ইংরেজী ভাষাকে একেবারে তুলিয়া দিলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা একেবারে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব।

কেহ কেহ এরূপ মত ব্যক্ত করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের প্রধান চৌদ্দটি ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিলে হিন্দী ভাষার প্রাধান্য কমিবে। কিন্তু এ মত কার্যকরী করা এক জটিল সমস্যা। এক যোগে চৌদ্দটি ভাষার কাগজপত্র লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করিতেও হাসি পায়।

প্রধান চৌদ্দটি ভাষাকে এক সঙ্গে চালানো

এই প্রচেষ্টা 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র মতই। ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহ একদিন বাংলা ভাষাকে অনেকখানি পিছাইয়া দিয়াছে—এক্ষণে হিন্দীভাষা আবার ভারতবাসীদের আঞ্চলিক ভাষার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ—কিন্তু এ ভাষার কি সম্পদ আছে—কি ঐশ্বর্য আছে? হিন্দী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হউক, হিন্দীভাষার

ঐশ্বর্য বাড়ুক—কিন্তু তথাপি তাহাকে সর্বভারতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করা কোন দিক দিয়াই লাভজনক নয়। ইহার ফলে আবার আঞ্চলিক ভাষাগুলি ক্রমশঃ দুর্বল ও অবহেলিত হইবে।

ভাষা লইয়া বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষারূপে হিন্দীকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। শ্রীরাজা গোপালাচারির সতর্কবাণী প্রণিধান-যোগ্য—ধর্মের ভিত্তিতে দেশ একবার বিভক্ত হইয়াছে—ভাষার ভিত্তিতে যাহাতে আবার না বিভক্ত হয় সে বিষয়ে দেশবাসীর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য বর্তমানে এমন একটি ভাষাকে কেন্দ্রীয়-শাসনকার্যের প্রধান ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন যে ভাষা অঞ্চল বিশেষের নয়। ভারতবর্ষে একূপ ভাষা আজ দুইটি মাত্র আছে—ইংরাজী ও সংস্কৃত। সংস্কৃত ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু সে ভাষা অধুনা অব্যবহারে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়াছে। অধুনা-কালে তাহাকে চালাইতে হইলে পাণিনি ও মুগ্ধবোধ দুই-বগলে চাপিয়া বেড়াইতে হইবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হিসাবে ইংরেজী যেমন চলিতেছে তেমনই চলিতে থাকুক। প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মাধ্যমে শাসন কার্য চলুক। জনসাধারণের সঙ্গে শাসন ব্যবস্থায় সাক্ষাৎ যোগাযোগ প্রধানতঃ প্রাদেশিক ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যে কোন ভাষাই গৃহীত হউক না কেন, প্রদেশে প্রদেশে শাসন কার্যের ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য আঞ্চলিক ভাষা হইবে। সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রদেশে প্রদেশে প্রেরিত হইলে আর কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না।

ভারতীয় ঐক্য

ভারতের আদর্শ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—বহুর সমন্বয় সাধন। "এদেশে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুধর্মের পাশে মুসলমান ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে। খ্রীষ্টধর্মকে আমরা বিজাতীয় জ্ঞানে বিতাড়িত করিনি। এই গ্রহণ-ধর্মিতাই ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় দিক। ভাষার ক্ষেত্রেও এই উদার গ্রহণ-ধর্মিতাই আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। বহু ধর্মের মত বহু ভাষাকেও আমাদের অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি দিতে হবে। এদেশে যুগের পর যুগ নূতন নূতন সভ্যতার স্রোত বয়ে গেছে। দ্রাবিড় সভ্যতার উপর আর্য সভ্যতার পলিমাটি পড়েছে, তারপর মুসলমান এসেছে, ইংরেজ

উপসংহার

এসেছে। বহু সভ্যতার বিবিধ উপাদান নিয়ে এ দেশের বিচিত্র সভ্যতা। এর কোন একটি উপাদানকে বর্জন করতে গেলে অবশিষ্ট উপাদনগুলির ভিতর ভারসাম্য ভঙ্গ হয়ে নূতন সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টির আশঙ্কা। যে মনোবৃত্তি আজও ইংরেজীকে "বিদেশী" ভাষা বর্জন করবে সেই মনোবৃত্তিই হয়ত কাল খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মকেও বিজাতীয় আখ্যা দেবে। এই বর্জনধর্মী, সংকীর্ণ জাতীযতাবাদের লক্ষ্য হ'ল এক হিন্দুধর্ম এবং হিন্দী ভাষার উপর হিন্দুস্থানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা—উত্তর ভারতের এই সংকীর্ণ সাম্প্রদাযিকতার দক্ষিণী প্রতিধ্বনি আর্যবিরোধী উগ্র দ্রাবির আন্দোলনে। এই সাম্প্রদাযিকতা ভারতবর্ষকে শুধু আভ্যন্তরীন হানাহানি এবং মধ্যযুগীয অন্ধকাবের দিকেই ঠেলে নিযে যাবে।"

* উদ্ধৃতিটি আনন্দবাজার পত্রিকালে প্রকাশিত "অম্লান দত্ত"ব প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষা

প্রত্যেক রাষ্ট্রই সামরিক শিক্ষাকে জাতীয শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে জ্ঞান করেন এবং ছাত্রজীবনেই সামরিক শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশ যতদিন বৃটিশের অধীন ছিল ততদিন ভারতবাসীদের সামরিক ও অসামরিক জাতি হিসাবে বিভাগ করিযা কতক কতক রাজ্যের অধিবাসীদেরই সেনাবিভাগে ভর্তি করা হইত ও সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। বৃটিশ শাসনাধীনে থাকাকালেও কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা "ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর" নামে খ্যাত। সুভাষচন্দ্র এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছাত্রজীবনেই সামরিক শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী জীবনে এই শিক্ষাই তাঁহাকে দেশের মুক্তিফৌজ—'আজাদ হিন্দ্ সৈন্য' গঠনে সহায়তা করে।

ভূমিকা

লর্ড মেকলে বাঙালীদের ভীরু আখ্যা দিযা তাহাদের কপালে যে কলঙ্কতিলক আঁকিয়া দেন তাহার প্রভাব বাঙালীদের কাটাইয়া উঠিতে কিছু সময লাগে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে বাঙালী পল্টন বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিযা বাঙালীর ভীরু অপবাদ মিথ্যা প্রমাণ করেন। গত মহাযুদ্ধে সামরিক কৃতিত্বের তালিকায বাঙালী সৈন্য ও বৈমানিকের কৃতিত্ব বড কম নহে। তথাপি সামরিক বিভাগে প্রবেশের উৎসাহ বাঙালীর মধ্যে অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা কমই লক্ষিত হয়।

বাঙালীদের মধ্যে সামরিক শিক্ষার অভাব

বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইযাছে। এদেশের ধন-প্রাণ রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব আজ দেশের যুবকদের হাতে। যদিও আমরা শান্তিকামী রাষ্ট্র, যুদ্ধবিগ্রহ আমরা চাই না, তথাপি বিশ্ব হইতে যখন যুদ্ধের ঝোঁক কাটে নাই এবং প্রতি দেশেই যুদ্ধোদ্যম সমভাবে বর্তমান তখন আমাদের প্রতিব্যবস্থা দৃঢ় করার যে একটা প্রযোজন আছে তাহা অনস্বীকার্য। যতদিন দেশ বৃটিশের অধিকারে ছিল ততদিন আমাদের সামরিক শক্তি বৃটিশের স্বার্থরক্ষায নিযোজিত হইত বলিযা সর্বসাধারণ্যে স্বদেশ রক্ষার মহৎ অনুপ্রেরণা তেমনভাবে কোন দিনই জাগিবার অবকাশ পায নাই। পৃথিবী হইতে যুদ্ধাতঙ্ক দূর করার প্রচেষ্টায ভারত উৎসাহী, তথাপি বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য তৈযারী থাকা যে শান্তি ও নিবাপত্তার সুদৃঢ় বাঁধ—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতবর্ষ বিবাট দেশ—এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায সামরিক প্রস্তুতি অকিঞ্চিৎকর। সামবিক বিদ্যালযে মুষ্টিমেয শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবস্থা আছে। সামরিক শিক্ষা দেশের ধনপ্রাণ রক্ষার দাযিত্ব পালনে ভারতবাসীকে উপযোগী কবে। সেজন্য ব্যাপকভাবে সামবিক শিক্ষাব প্রযোজন যথেষ্টই রহিয়াছে। যুদ্ধ না হইলেও দেশের শান্তি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাথার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন। দেশের কোন দুর্দৈব উপস্থিত হইলে শিক্ষিত সেনা-বাহিনীর দ্বারা সে সময বহু হিতকর কার্যও হইতে পারে। গঠনমূলক বহু কর্মেও সেনাবাহিনী আপনাদের সুশৃঙ্খল কার্য পদ্ধতি দেখাইয়া জনসাধারণের সহযোগিতায দেশকে সাহায্য করিতে পারে।

বর্তমানে স্বাধীন দেশে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অন্যান্য বহু শিক্ষার বিষয়ের সহিত বর্তমান সমযে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করার সত্যই প্রযোজন আছে। দেশাত্মবোধ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন জাগে এমন আর কোথাও নহে। কারণ দেশের জন্য প্রাণদানের শিক্ষা সামরিক শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এছাড়া নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধ, আদেশ পালন করা, সহসা কোন ব্যাপারে মীমাংসা করা, হস্ত-পদ চক্ষু ইত্যাদি সতর্কতার সহিত চালিত করার শিক্ষা মানবের জীবনধারণের প্রতিপদেই দরকার হয। এইগুলি সামরিক শিক্ষায় যেমন সহজে হয় অন্য কোন শিক্ষায় তেমন হয় না। এজন্য ছাত্রজীবনে এই শিক্ষার সত্যই

ছাত্র-জীবনে সামরিক শিক্ষা

প্রয়োজন আছে। উত্তম দেহ গঠন ও স্বাস্থ্যলাভ—আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির অভ্যাস সামরিক শিক্ষা দ্বারা ছাত্রজীবনেই লাভ করা যায়। বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় তাহা সংশোধনের একমাত্র কার্যকরী উপায়—ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষা। সামরিক শিক্ষায় মনের যে প্রসার হয় তাহা উত্তর জীবনে মানুষকে জাতীয় সমাজের জন্য ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমানে বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য N. C. C. বা National Cadet Corps এবং অল্পবয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য A. C. C. বা Axuiliary Cadet Crops-এর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা এত অল্প যে প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে অকিঞ্চিতকর বলা যায়।

বর্তমানে N. C. C. ও A C. C. ব্যবস্থা

প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এই ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে অংশ গ্রহণ করে সে বিষয়ে সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন। দেশরক্ষার মহৎ অনুপ্রেরণা এই শিক্ষা দ্বারা ছাত্রদের মধ্য সঞ্চারিত করিয়া দিলে আপৎকালে সরকার ইহাদের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইতে পারেন। সামরিক শিক্ষা ছাত্রদের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিতে বাধ্য।

দেশের ছাত্রগণই দেশের শক্তি, দেশের বল। ইহাদের কচি-কাঁচা মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করার উপায় সামরিক শিক্ষা। ইহাদের অদম্য উৎসাহ বর্তমানে নানা কদাচারের মরুভূমিতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অথচ এই উৎসাহের স্রোত শৃঙ্খলা ও আদেশানুবর্তিতার পথে পরিচালিত করিতে পারিলে এই দেশ প্রকৃত বীর ও কর্মীর দেশ হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

স্পার্টার অধিবাসীরা এক সময়ে অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ, অলস ও নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাদের মধ্যে লাইকর্গস নামক একজন দেশহিতৈষীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া অল্প কয়েক বৎসরেই স্পার্টার যুবকদের মহা-শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়া ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করেন। বর্তমানে আমাদের দেশেও এইরূপ লাইকর্গস দরকার। দেশের যুবশক্তি দেশের সম্পদ—এই সম্পদ দেশ গড়ার কাজে যত দ্রুত নিয়োজিত হইবে ততই মঙ্গল।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমিকা

ভারতের সামাজিক জীবনে যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহ একখানা রঙ্গীন মেঘের মত তাহার বর্ণাঢ্যতা লইয়া দেখা দিল তখন ভারতবাসীরা কেহ বড আর নিজের দেশের মাটির দিকে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ বাঙালীরা সব ভুলিল—তাহারা আপনাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম সবই নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য মনে করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। বৈদিক ঋষির বংশধরগণ পরাণুকরণ ও ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণের ঘৃণ্য পথে পা বাডাইল। পুরাতন আদর্শ যখন ভাঙ্গিয়া পডিতেছে কিন্তু নূতন কিছু গডে নাই সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবনে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহার নাম পরমহংস শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ। জাতির উন্মথিত হৃদয়-সমুদ্রকে এই মহাপুরুষই তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর দ্বারা শান্ত করিয়াছিলেন। তাহারই মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ—ইনি এই আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিয়া জাতিকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন।

জন্ম ও বাল্যকাল

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী—কলিকাতা সিমুলিয়া পাডার বিখ্যাত দত্তবংশে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বেশ্বর দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। ইনি বাল্যে অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। বাল্যকালেই তাহার খেলা ছিল পূজা-অর্চনা, জপতপ লইয়া। অনাথ-আতুরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত! ইনি কোন কিছুই নির্বিচারে মানিতেন না। সকল ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা করাই ছিল ইঁহার বাল্য প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠ্যাবস্থা

গান-বাজনার দিকে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। ইনি কলিকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলিয়া একবার মাত্র পডিয়াই পাঠ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বিস্তৃত ছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেম্বলিজ কলেজে প্রবিষ্ট হন। বি, এ, পডিবার সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং তিনি ঈশ্বর আছেন কিনা এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আকুল হইয়া পড়েন। তখনকার সময়ে নব প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের দিকে তাহার মন ঝুঁকিয়া ছিল। তিনি প্রায়ই

ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিতে লাগিলেন। প্রাণের অনুসন্ধিৎসা কিছুতেই মিটিল না।

নরেন্দ্রনাথ অন্তরে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রাণে জ্ঞানের নিদারুন পিপাসা কিন্তু যাহা জানিতে চাহেন কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারে না। ঈশ্বর আছেন কিনা—একথা কেহ নিঃসংশয়ে যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে পারে না। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন—সেই এক প্রশ্ন—ঈশ্বর কি আছেন? মহর্ষি বেদ উপনিষদেব বাণী উদ্ধৃত কবিযা ব্যাখ্যায প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সোজা প্রশ্ন, 'আপনি কি তাঁহাকে দেখিযাছেন?' মহর্ষি তখন ঈশ্ববেব শক্তি ও গুণের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথেব প্রাণের পিপাসা ইহাতে মিটিল না। এই সময়ে একজন বন্ধু তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে গিযা রামকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন। ইনি একজন সাধক—দিব্যজ্ঞানশূন্য হইযা থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন সেখানে উপস্থিত হইলেন। মনে দারুণ সন্দেহ, অবিশ্বাসে মন ভরপূর। সোজা প্রশ্ন করিলেন, "মশায, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" রামকৃষ্ণের সদা আনন্দময় মূর্তি, ভাব-ভোলা সহজ কণ্ঠে বললেন, "দেখেছি বৈকি। এই যেমন তোমাকে আর সকলকে দেখছি তেমনি দেখছি।" এ উত্তর ত' কেহ দেয় নাই। নরেন্দ্রনাথের চিত্তের উত্তাল-তরঙ্গ যেন মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। তিনি আবাব প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে দেখাতে পারেন কি?" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "পাবি, কিন্তু তাঁকে দেখার জন্য সব ত্যাগ করতে হবে—আকুল হযে ডাকতে হবে, সাধনা করতে হবে।" নরেন্দ্রনাথের চোখের উপর হইতে একটা ঘন কুজ্ঝটিকার আবরণ অপসৃত হইল। অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত হইল। তিনি রামকৃষ্ণ চরণে শরণ লইলেন—তদবধি রামকৃষ্ণ যেন নরেন্দ্রনাথকে অসহ্য শক্তির দ্বারা টানেন।

যুগাবতার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ

সংসারেই থাকেন নরেন্দ্রনাথ। প্রাযই বামকৃষ্ণ সমীপে যান। ধর্মের কথা হয়। ধর্মের বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয। এদিকে সহসা নরেন্দ্রনা পিতৃবিযোগ হওযায সংসাবের দায়িত্ব তাঁহার উপর আসি পডিল। সংসার পোষণ করিবার চিন্তায় তিনি ব্যতিব্যস্ত একদিন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইযা কহিলেন "আপনি

সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ

ভবতারিণীকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন—সংসারের চিন্তায় আমি পাগল হয়ে গেলাম।" রামকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, 'বলব'। পরে আরেক দিন আসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশাই, বলেছিলেন ?" রামকৃষ্ণ অকপটে বলিলেন যে, তিনি কিছুতেই বলিতে পারেন নাই, কে যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরে। নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুই যা না, নিজে গিযে মাযের কাছে বল্।" নরেন্দ্রনাথ গেলেন, সেই ভুবনমোহিনী মনোহারিকা ভবতারিণীর সম্মুখে নতজানু হইযা কৃতাঞ্জলিপুটে বসিলেন। কিন্তু কি চাহিতে আসিযাছিলেন সমস্ত ভুলিলেন—চিত্তেব যাবতীয আকাঙ্ক্ষা কোথায় মিলাইযা গেল, ভক্তিভরে কহিলেন, "আমাকে বিবেক বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও।" ফিবিযা আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল ?" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি মাযেব কাছে ও-সব চাহিতে পারলুম না" রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তিনবার পাঠাইলেন—তিনবারই একই ফল হইল। গুরু শিষ্যকে মহাশিক্ষা দিলেন। ইহাব কিছুকাল পরেই নরেন্দ্রনাথ সব ত্যাগ করিযা বামকৃষ্ণেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী জীবনে তাঁহাব নাম হইল—স্বামী বিবেকানন্দ।

গুরুর সান্নিধ্যে বিবেকানন্দের সাধন-ভজন চলিতে লাগিল। গুরূপদিষ্ট পথে বিবেকানন্দ অনেক দূর অগ্রসব হইলেন। রামকৃষ্ণদেবের আরো শিষ্য ছিলেন। তিনি সকলকেই সাধনপথে অগ্রসব করিযা দিতে লাগিলেন। একদিন বিবেকানন্দ গুরুকে কহিলেন, "মহাশব আপনি আমাকে কিছু সাধনোপায বলে দিন। সকলকে সব দিচ্ছেন, আমাকে কিছু দিচ্ছেন না।" রামকৃষ্ণদেব হাসিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস্?" বিবেকানন্দ বলিলেন, "নির্বিকল্প সমাধি—রাত-দিন ভগবানের চিন্তায বিভোব হযে থাক্‌তে চাই।" বামকৃষ্ণ বলিলেন, "এখন না, তোকে যে লোকশিক্ষা দিতে হ'বে, আপনার চিন্তাই কবছিস্, কিন্তু এই দেশের আপামর সাধারণের চিন্তা কে করবে ?"

সাধনা

আত্মচিন্তা হইতে বিবেকানন্দ জগৎচিন্তার মহাসমুদ্রে গিয়া পডিলেন। গুরুর বাণী প্রাণে জ্বলিতেছে—"তিনিই সব হয়েছেন।" মনে মনে উচ্চারণ করিলেন, "জগদ্ধিতায়।" পরে তাঁহারই লেখনী হইতে অপূর্ব উদ্দীপনাময়ী "সন্ন্যাসীর গীতি" উৎসারিত হইয়াছিল—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বজীবে সেই প্রেমময়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করিলেন। যে ধর্মের প্রদীপ্ত দীপশিখা এতদিন বিবেকানন্দপ্রমুখ শিষ্যবর্গের পথ প্রদর্শক ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। শিষ্যবর্গ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব উত্তম আধারে আপনার শক্তি দিয়া গিয়াছিলেন; শিষ্যবর্গের প্রাণে অসংখ্য দীপমালা অনির্বাণ জ্বলিতে লাগিল। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ গুরুর দেহত্যাগের পর ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। গৈরিক আচ্ছাদিত দেহ, মস্তকে গৈরিক বস্ত্রের পাগড়ী, হস্তে দীর্ঘ দণ্ড। পরিব্রাজক চলিলেন ভারতের দেশে দেশে। স্বচক্ষে দেখিলেন, আর্য ঋষির বংশধরেরা কী হীন জীবনযাপন করিতেছে—কী মর্মন্তুদ দুঃখ—কী অচিন্তনীয় দারিদ্র্য—কী শোচনীয় অধঃপতন। গুরুর বাণী হৃদয় মথিত করিয়া মনের জ্যোতির্ময় অক্ষরে ভাসিয়া উঠিল—"জীবে দয়া নয়, জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা।" তিনি অগণিত মানুষের সংস্পর্শে আসেন—অগণিত মনের ধর্মের শিখাটি জ্বালাইয়া দেন। দেখেন, "নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।" ধর্মের মূলতত্ত্ব সকলকে বিলান।

আমেরিকা ভ্রমণ

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো সহরে যে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন হইতেছিল তাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেখানে তিনি অনাহূত। তথাপি সনাতন হিন্দুধর্মের মহাত্ম্য ব্যাখ্যার জন্য কে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। নিঃসম্বল, নিঃসহায় গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী তথায় বহু ক্লেশে হাজির হইয়া একজন দয়াবতী আমেরিকান মহিলার আনুকূল্যে সেই বিরাট সভায় মাত্র তিন মিনিট কাল হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার লাভ করিলেন। কি যে বলিবেন তাহা আগে হইতে ঠিক করেন নাই। কিন্তু কে যেন তাঁহার মধ্যে এক মহাভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। তিনি প্রথমেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া আপনার পরিজনদের ন্যায় ঘনিষ্ঠ সুরে যখন সবে আরম্ভ করিলেন, "আমেরিকাবাসী—আমার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ"—অমনি সভাশুদ্ধ সকলে সেই

আহ্বানে আপ্যায়িত হইয়া তুমুল করতালী ধ্বনি তুলিল। বিবেকানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব দেড় ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনতা স্থির হইয়া শুনিল। তিন মিনিটকাল যে বহুবার চলিয়া গেল তাহার খেয়াল পর্যন্ত কাহারও রহিল না। দাবানলের ন্যায় এই হিন্দু-সাধুর কথা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িল। লোকে তাঁহার নামকরণ করিল Cyclonic Sadhu—প্রকৃতই বিবেকানন্দের বক্তৃতা সমুদ্র-ঝটিকার ন্যায় প্রবল ছিল। তাঁহার বহু শিষ্য জুটিল—আমেরিকায় মঠ তৈয়ারীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু গুরুদেব যে লোকশিক্ষার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা তখনও সাধিত হয় নাই, জীবনকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে বিবেকানন্দ জনসেবার আদর্শ রূপায়িত করার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানই বেলুড়মঠ। বিবেকানন্দ বলিতেন, "যে ঈশ্বর আমাকে এখানে রুটি দিতে পারে না সে স্বর্গে অনন্ত আনন্দ দান করবে—এ আমি বিশ্বাস করি না।" তিনি দেশের তরুণদের কাছে আহ্বান জানাইলেন। তাঁহার আহ্বানে শত শত লোক সেবার আদর্শ লইয়া আসিতে লাগিল—তিনি ব্রহ্মচার্য্যধারী লৌহ পেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ুবিশিষ্ট যুবকদের লইয়া মহা-কর্মের উদ্যোগ সুরু করিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ আজ ফলে-ফুলে বিকশিত হইয়া ভারতব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী ও সাধুদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

স্বদেশ-প্রেমে তাঁহার অন্তরটি ছিল ভরপুর। এদেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। সেই সমবেদনাপূর্ণ দরদী প্রাণের স্পর্শে তিনি তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্যদের একত্র করিয়া লইয়া দেশগড়ার যে কাজ সুরু করিয়া ছিলেন তাহা আজিও চলিতেছে। দেশের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের যে সকল উপায় বিবেকানন্দ তাঁহার রচনাবলী ও বক্তৃতায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বর্তমানের সমাজসেবীগণ প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান সকল বিষয়েই তাঁহার ঋষির ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সর্বোপরি ছিল এক বিরাট প্রাণবত্তা।

বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেম

তাঁহার বাণী জড়ের মধ্যেও মহাভারতের তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হইত। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই বিরাট ধর্মবীর ও কর্মবীরের মহাপ্রয়াণ ঘটে। সেই হইতে অদ্যাবধি ভারত যে পথে চলিতেছে সকলই তিনি ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। সাম্যবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হইল—"মানব সমাজে পর পর চারবর্ণ রাজত্ব করে যাবে—পুরোহিত, যোদ্ধা, বণিক ও শ্রমিক। প্রথম তিনবর্ণ রাজত্ব করে গেছে। এবার চতুর্থ বর্ণের পালা—কেউ তাদের রুখতে পারবে না।" এ ভবিষ্যদ্বাণী রুশ বিপ্লবের কুড়ি বছর আগে তিনি করিয়াছিলেন।

উপসংহার

বিবেকানন্দ আজ নাই কিন্তু তাঁহার আদর্শ রহিয়া গিয়াছে। এই আদর্শ এক জ্বলন্ত অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় মহাকাশে মাথা তুলিয়া আমাদের অন্ধকার সমস্যা-সঙ্কুল জীবনে আলোকপাত করিতেছে। এই পথ মনুষ্যত্বের পথ—এই পথ অবলম্বন করিয়া আমরা আজিও সার্থক ভাবে বাঁচিতে পারি—সার্থকভাবে মরিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

জগতে মহাপুরুষদের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও রহস্যময়। সমুদ্রের উপরিভাগে কি ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ—সদা চঞ্চল, উদ্বেল আক্ষেপ—আর তলদেশে জলজ শৈবালের জলজ শৈবালের ঘন গহন অরণ্য—প্রবাল, স্পঞ্জ, শামুক, শাঁখ, কড়ি, শুক্তি, সামুদ্রিক মৎস্যাদি ও বিপুলকায় জলজন্তুদের বিচিত্র জগৎ। সূর্য্য হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি তরঙ্গ ভঙ্গ ভেদ করিয়া কী মধুর মৃদুতায় সেখানে গলিয়া পড়ে। সে এক রহস্যময় জগৎ বৈকি! মানুষের চরিত্র এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং গভীর। কিন্তু মহাপুরুষদের চরিত্রে এই রহস্য আরো জটিল, আরো দুর্বোধ্য, আরো চমকপ্রদ। যে লোকোত্তর প্রতিভা জগৎকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করে, যে বিরাট ব্যক্তিত্ব গগনস্পর্শী জ্বলন্ত স্বর্ণ স্তম্ভের ন্যায় আমাদের চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দেয় তাহার উৎস সন্ধানে স্বতঃই মানব আগ্রহী হইয়া উঠে। কোন্ সাধনায়, কী অপরিমেয় অধ্যবসায়ে এই প্রতিভা বিকশিত হয় তাহা বড় কেহ

দেখে না—মনে করে যে ইহা এক ঈশ্বরীয় মহিমার সহসাদীপ্ত প্রকাশ। অবশ্য ইহা আংশিক সত্য। কিন্তু মানুষমাত্রকেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। তাই আমাদের মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিতে হয়—কবিরা যাহাকে "দুর্গং পথস্তৎ" বলিয়াছেন ইহা সেই পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ সে পথ তবুও মানুষ সেই পথের সন্ধান করে—সেই পথে ধাবমান হয়। তাই আদর্শরূপে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করা প্রয়োজন।

প্রতিভা ও চেষ্টাযত্ন সাপেক্ষ

প্রতিভা দৈবদত্ত ক্ষমতা। ইহা স্বর্গীয় অগ্নি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রতিভার অগ্নিকণাকে জগতে প্রজ্বলিত করার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় বৈ কি। শত শত লোক যখন অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সেই অগ্নিকণাকে প্রদীপ্ত করিবার সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। আলস্য ইহাকে তুষরাবরণে ঢাকিয়া দিতে চেষ্টা করে, অহমিকা ইহাকে হঠাৎ বাহুর ফুৎকারে নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করে তাই প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা, যত্ন অধ্যবসায়ের দ্বারা ও আপন প্রাণবায়ুর নিয়ত জোগান দ্বারা একদিন ইহাকে উদ্দীপিত শিখাময় করিয়া জগৎবাসীকে আলোক ও উত্তাপ প্রদানে সহায়তা করে।

শৈশব পরিবেশ

শৈশবেই মানবের পরিণত জীবনের পূর্ণতার আভাষ পাওয়া যায়। প্রভাতের আবহাওয়া যেমন দিনের পূর্বাভাষ দান করে, তেমনি শিশুর মনোভঙ্গীর মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ মানুষের সম্ভাবনাগুলি ফুটিয়া উঠে। এ যেন বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ। এজন্য বংশানুক্রম, পরিবেশ, অন্তর্নিহিত শক্তির প্রয়োজন হয়। এরণ্ড বৃক্ষের বীজে শালতরু হয় না। বিরূপ বা প্রতিকূল পরিবেশে বীজে অঙ্কুর উদ্গম হয়না বা শিশুতরুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিও হয়না। আবার বীজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিটুকু ও সতেজ থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সকলগুলিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভগবান যেন তাঁহাকে ফুলের মতই বিকশিত করিবার জন্য অনুকূল পরিবেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ না করিলে বোধহয় এমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই ঠাকুর পরিবার ছিলেন তখনকার বাংলার একটি বিশিষ্ট প্রতিভাকেন্দ্র এবং সাংস্কৃতির জন্মভূমি। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন প্রিন্স-

দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারাও কেহ কবি, কেহ সুরকাব—সকলেই বাণীব সেবক। শুধু একটিমাত্র পরিবারে উনবিংশ শতাব্দীতে এতগুলি প্রতিভার বিকাশ বাংলাদেশে বোধহয আর কোথাও ঘটে নাই।

রবীন্দ্রনাথ নিজ শৈশবস্মৃতি জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—বাল্যশিক্ষার সময়ে কিভাবে "জল পড়ে, পাতা নড়ে" পঙ্‌ক্তি দুইটির মধ্য দিযা প্রথম ছন্দবোধ তাঁহাকে অভিভূত করিযাছিল তাহার সুন্দর বর্ণনা তিনি দিযা গিযাছেন। তার পরই বিপুল বিশ্বের যেটুকু ঐ শিশুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহাতেই শিশুছন্দসুষমা দেখে তাহা যেন বিশ্ববিধাতার মহাকাব্যের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। যদিও বাল্যকালে ভৃত্যদের অধীনে তাঁহাকে সর্বদাই বন্দী জীবন যাপন করিতে হইত তথাপি এক অনস্বাদিত মুক্তির স্বাদ পাইযাছিলেন আপন মানস বিচরণের মধ্য দিযাই। মানবমাত্রেই যে পৃথিবীর সীমার মধ্যে বন্দী তাহা অতি শৈশব হইতেই তিনি আপনার পরিবেশের মাধ্যমেই বুঝিতে পারিযাছিলেন এবং সুদূরের, বিপুলের, বিরাটের, অজানার আহ্বান তখনই তাঁহাকে চঞ্চল করিযাছিল।

প্রতিভার বিকাশ

—"আমি চঞ্চলহে,
আমি সুদূরের প্রযাসী"
—ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর,
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী"

অথবা "আর কতদূরে নিযে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?"

ইত্যাদি রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্রই ধ্বনিত হইযাছে।

শিশু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য বালকদের মত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রথম শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু বিদ্যালযের প্রাণহীন শিক্ষা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। উপরন্তু বাধানিষেধগুলি যেন তাঁহাব স্বাধীন প্রাণের অভীপ্সার গতি রোধ করিযা তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। স্কুল-পালানো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইযা দাঁড়াইল! পরিবারের বড়দের মধ্যে রবির ভবিষ্যতের চিত্রটি ক্রমশঃ মসীলিপ্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু মহর্ষি

শৈশবশিক্ষা

এই ব্যাপারটি অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন এবং নিজতত্ত্বাবধানে তাঁহার পাঠের অপূর্ব রুটীন করিয়া দিলেন। ফলে গৃহেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। এইসব বিচিত্র জ্ঞান তাঁহার মনটিকে অপূর্ব ভাবনায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও আপনার মানসকল্পনা হৃদয় মথিত করিয়া একদিন কাব্যে প্রকাশলাভ করিল। এই প্রতিভার জয়যাত্রাকে কবি রূপকের সাহায্যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি মনের সেই বহির্বিশ্বের দিকে যাত্রা যেন সমুদ্রের আহ্বানে নদীর যাত্রা—বিরাটের আহ্বানে ক্ষুদ্রের যাত্রা—কবিতার প্রথম চরণের বন্ধন দ্বিতীয় চরণে মুক্তি।

"ওরে ডাকে যেন ডাকে যেন
সিন্ধু মোরে ডাকে যেন"—

—সিন্ধুই কবিকে ডাকিয়াছে। তাই আর ঘুমাইবার অবসর নাই—কবিকে উঠিতে হইয়াছে—জাগিতে হইয়াছে—সে আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ছুটিতে হইয়াছে।

অনুভব প্রতিভার প্রভাত

কবি চোখ চাহিয়াই মুগ্ধ, বিস্মিত, বিপর্যস্ত এ কী বিচিত্র সুন্দর জগৎ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শভরা রোমাঞ্চিত এ জগতে কত রূপ, এ জগতে কত রং, এ জগতে কত সুর, এ জগতে কি বিচিত্র গতিতরঙ্গ। কবি গাঢস্বরে গাহিয়াছেন—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর"

এক নিবিড় সৌন্দর্য্যানুভূতি কবিকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিতে লাগিলেন আর গাহিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ঋতুচক্র আবর্তিত হইতেছে—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—কি বিচিত্র রূপ পৃথিবীর। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী হইলেন। কাব্যে সে সুন্দরকে রূপ দিতে কবির যেন আলস্য নাই, ক্লান্তি নাই।

দেশ-প্রেম ও প্রতিভার মধ্যাহ্ন

কিন্তু সেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ধ্বনিময় পৃথিবীর সৌন্দর্য্যালোকে বিচরণ করিতে করিতে কবি সহসা যেন দেখিতে পাইলেন যে. এই জগতে শুধু কল্পনা লইয়া মানুষের থাকা চলে না—সে সামাজিক জীব সমাজের উপর তাঁহার কর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহাকে কাব্যলক্ষ্মী ধূলিধূসর, কর্মমুখর জগতে আহ্বান জানাইলেন। কবি শুনিলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে—

"ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি।
জাগাতে জগৎ জনে। কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্য তল।"

তখন তাঁহার বোধ লইল যে আর সংসার পলাতক বালকের মত মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে বাঁশী বাজাইবার সময় নাই। কবি তখন মানুষের গান ধরিলেন। স্বদেশী সমাজ, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মর্মন্তুদ দুঃখ দুর্দশার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল। তখন দেশ স্বদেশী আন্দোলনে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন না। তিনি যে কবি—কবির কর্তব্য অন্যরূপ। দেশ ও জাতিকে আপন অগ্নিময ভাব দিয়া চেতাইযা তুলিতে লাগিলেন। তাহার "জনগন-মন অধিনায়ক", "ও আমার দেশের মাটি", "অয়ি ভুবনমন মোহিনি", "একলা চলরে", "সঙ্কোচের বিহ্বলতায নিজেরে অপমান", "ওরে ভীরু, তোমার ারে নাই জীবনের ভার" ইত্যাদি অপূর্ব উদ্দীপনাময় গানগুলি স্বদেশী-আন্দোলনের সৈনিকদের অপর্ব অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিযা তুলিযাছিল।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গীতাঞ্জলি ও নৈবদ্য ইত্যাদি হইতে বাছাই করা কযেকটি গানের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করিলেন।

নোবেল পুরস্কার লাভ

এই ইংরাজী ছন্দোবদ্ধ গদ্য এক অপূর্ব মাধুর্য্য ও সুষমা মণ্ডিত। বাঙালী তথা ভারতীয় সকলেই এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে গৌরবান্বিত হইযা উঠিল। জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিল এবং জাতিকে ইহা এক নতুন শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলিল। যে কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী তাহার ভগবানে উৎসর্গীকৃত হৃদয়ের ভাবগাঢ় সঙ্গীত দেশে বিদেশে সকলের চিত্ত জয় করিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত ও স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে লিখিত বহু প্রবন্ধে ও কবিতায় ভারতের মহিমা কীর্তন, অন্তর্নিহিত আত্মার অমরতা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, আত্মশক্তির প্রতি নির্ভরতা ইত্যাদি জাতিকে শিক্ষা দিযা গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যে নহে, সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত সংগ্রহ এক বিচিত্র বিপুল কীর্তি। যাহা কাব্যে কথায ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, তাহাই তিনি তাঁহার সঙ্গীতের সুরে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষযে তাঁহার কাব্য

ইংরাজী কবি শেলীর সমধর্মী। এছাড়া প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটকেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি নিজের নাটকগুলিতে নিজে অভিনয় করিয়া অভিনয়েও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটক ভাব-প্রধান। মনুষ্য হৃদয়ের ভাবগুলির মধ্যে যে নাটকীয় সংঘাত তাহাই তিনি আপনার নাটকে দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি ইউরোপীয় নাট্যকার মেটারলিঙ্কের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে তিনি মনস্তত্ত্বের আশ্রয়ে চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া যে নবধারার প্রবর্তন করেন তাহারই সার্থক পরিণতি শরৎচন্দ্রে দৃষ্ট হয়। ছোটগল্পও রবীন্দ্রনাথের এক অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। ছোটগল্পগুলিতে চিত্রের পর চিত্র চলিয়াছে—সে আর এক কাব্যলোক যেন! আর কত মানুষ কি দরদ দিয়াই না তাহাদের তিনি আঁকিয়াছেন! শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার বহু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের নিদর্শন আমরা তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে পাঠ করিতে পারি। বাংলা ভাষা, শব্দতত্ত্ব, বাংলা ছন্দ এসকল বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে কবি ছবি আঁকা সুরু করেন এবং রং-এর ও রেখার যাদুতে এক অপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া যান।

বহু বিচিত্র প্রতিভা

ভারতীয় সংস্কৃতির দূতরূপে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ পর্যটন করিয়া বেড়ান। ভারতকে পৃথিবীতে পরিচিত করার ব্যাপারে তাঁহার দান অসামান্য। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান, সুমাত্রা, বার্লিন প্রভৃতি যে সব দেশ তিনি ভ্রমণ করেন সেখানে ভারতীয় সাধনার বাণী বহন করিয়া তিনি ভারতের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনীগুলি একদিকে বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও অপরদিকে পরকে আপন করার ক্ষমতার প্রকাশ। সকল দেশকে সংস্কৃতির সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এক বিশ্বসংস্কৃতি রচনা ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা।

সংস্কৃতির দূত

গঠনমূলক কার্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। বীরভূম জেলার বোলপুরে তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামক একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় "বিশ্বভারতী" নামক এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বভারতীকে বিশ্বজ্ঞানের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য তিনি আমরণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত

গঠনমূলক কার্যে কবির প্রতিভা

শান্তিনিকেতনের অদূরে তিনি 'শ্রীনিকেতন' স্থাপন করিয়া দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান কবিযা আদর্শ পল্লী রচনায যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন।

১৯৪১ সালেব ৭ই আগষ্ট তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সম্প্রতি ১৯৬১ সালে আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী পালন করিযাছি। তাঁহার জন্ম তারিখ ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮। এই ২৫শে বৈশাখ সারা বাংলার এক বার্ষিক উৎসবেব দিনে পবিণত হইযাছে। কিন্তু ১৯৬১ সালের শতবার্ষিকী উৎসবটি এক বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হইযাছে। আমেরিকা, রাশিযা, ইংলণ্ড, ইউরোপের প্রতি দেশেই সকলে শ্রদ্ধার সহিত রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিযাছেন। বাংলাদেশেই সরকার নামমাত্র মূল্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রচারের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। খণ্ডে খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী এখনও গ্রাহকদের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।

উপসংহার

গ্রাম-পঞ্চায়েত

সকলে মিলিযা মিশিযা পরস্পরকে অধিকার দিয়া ব্যষ্টি-স্বার্থ সমষ্টিস্বার্থের কাছে বলি দিয়া মানুষ সমাজ গড়িয়াছে। দেশে দেশে মানুষেব রূপ পৃথক হইলেও এই বিষয়ে তাহাদের ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই সমাজের রূপ চিরস্থাযী নয়—তাই বারেবারেই তাহাকে নিযন্ত্রিত করিতে হয, নূতন করিযা ঢালিযা সাজিতে হয। 'গ্রাম-পঞ্চাযেত' কথাটির অর্থ ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামেব শাসন যদি গ্রামবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয তবে সারা ভারতবর্ষ এক সুশৃঙ্খল নিযন্ত্রণে গড়িয়া উঠিতে পারে। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করিযা এইভাবে তাহারা আত্মনির্ভর হইতে পারিবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কার্য হাতে-কলমে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে শিক্ষা করিযা উত্তম নাগরিক হইয়া উঠিতে পারিবে।

ভূমিকা

প্রাচীন এথেন্সে যে সব নগররাজ্য ছিল (city states) যেখানে এইরূপ স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসন ছিল। সেখানে নগর-সভায় সকলে উপস্থিত হইয়া ভোট দিয়া আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিত। দেশ শাসনে সকলেই মাথা ঘামাইত, প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিত। বৈদিক যুগে আমাদের ভারতবর্ষেও গ্রামসভা ছিল। মৌর্যযুগেও এই প্রথা ছিল এবং ক্রমশঃ এই প্রথা উন্নত হইয়া গ্রামগুলির বিবাদ মীমাংসা করিত ও দেশের নানা স্থানীয় সমস্যার সমাধান করিত। পরে ইংরাজ আমলেও অনেকদিন এই সভা ছিল কিন্তু সরকারের অবহেলায় তাহা শেষ পর্যন্ত দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং মোড়লো ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজেরা পঞ্চায়েত প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ সালিশী বোর্ড স্থাপন করিয়া তাহাদের হাতে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পঞ্চায়েতের কার্যাবলীকে আইনের সমর্থন দেওয়া হয় নাই।

গ্রাম পঞ্চায়েত একটি প্রাচীন ব্যবস্থা

ভারতের সংবিধানে পঞ্চায়েত গঠন করার যে নির্দেশ ছিল তাহার গুরুত্ব 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' রচনার সময়ে প্রথমে উপলব্ধি হয়। এই বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মাবলম্বী, বিরাট উপমহাদেশকে সংগঠিত করা বড় কম প্রতিভার কাজ নহে। গ্রামে-গাঁথা ভারতবর্ষকে তাই গ্রাম হিসাবে উন্নত করার কথাই পরিকল্পনা রচয়িতাদের মনকে প্রথম অধিকার করে। গ্রাম্যসমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য কার্যকরী করা হইল পঞ্চায়েতগুলিকে। ইহা যেন একটি যন্ত্র—এতকাল অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল এই যন্ত্র। এখন স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই যন্ত্রকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিল। বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণয়নের দ্বারা গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিকে জীয়াইয়া তোলার তোড়জোড় চলিতে লাগিল। গ্রামগুলির অবস্থা এক এক রাজ্যে এক এক রূপ। প্রতি গ্রামের স্থানীয় সমস্যা রহিয়াছে। কোনটির আর্থিক সঙ্গতি আছে, কিন্তু পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়, কোনটিতে এরূপ দারিদ্র্য যে জনসাধারণ দুইবেলা খাইতে পায় না, কোনটি শহরের কাছাকাছি, কোনটি বা শহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এই সকল অঞ্চলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা কয়েকটিকে লইয়া একটি পরস্পর নির্ভরশীল ব্লক গঠন করিলে সর্ববিষয়ে স্থানীয় চাহিদা মিটে। পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্য সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

পঞ্চায়েত-প্রথার গুরুত্ব

পঞ্চায়েতগুলির কাজ বহু প্রকারের হইতে পারে। তাহা পৌরবিষয়ক, শাসনতান্ত্রিক,

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করিতে পারে। গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরী, সেতু, পুল ইত্যাদি গঠন, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার দ্বারা স্থানীয় স্বাস্থ্য বজায় রাখা, রোগ-সংক্রমণ নিবারণ, নলকূপ খনন, পাঠশালা, স্কুল ইত্যাদি নির্মাণ, সামাজিক উৎসব ইত্যাদির দ্বারা আনন্দবিধান ও পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, মামলা মোকদ্দমা নিবারণ ও ঝগড়া-বিবাদ সালিশী দ্বারা মিটাইয়া দেওয়া, কর্মসংগ্রহের ব্যবস্থা করা, দুষ্ট-প্রকৃতির লোকদের শাসনে রাখা, চোর-ডাকাতের ভীতি হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষা করা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ হইতে পারে।

পঞ্চায়েতের কাজ

পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। খোয়াড, চৌকিদারী ট্যাক্স, খেয়া, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য দরখাস্ত ফি ইত্যাদি হইতেও অর্থ আদায় করা চলিতে পারে। প্রয়োজন হইলে সরকার বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য কিছু কিছু টাকা পঞ্চায়েতের হস্তে প্রদান করিলে তাহার অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা অল্প।

পঞ্চায়েতের আয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার পল্লী-উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন সে পরিমাণ ফল প্রাপ্ত হন নাই। তাহার প্রধান কারণ এতদ্দেশীয় লোকেরা জড়প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার ফলে পরনির্ভর এই জাতি অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। সুদূর শহরাঞ্চল হইতে শিক্ষিত বাঙালী সাহেব কর্মচারী গিয়া ইহাদের উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। নিদ্রিত গ্রামবাসী জাগে নাই—সুযোগ কাজে লাগায় নাই, পরিকল্পনাগুলির সুদূরপ্রসারী শুভফলগুলি উপলব্ধি করে নাই। সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যাহা করা হইয়াছে আলস্যে ও অবহেলায় তাহা নষ্ট হইয়াছে। পরিকল্পনায় গ্রামবাসী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। তাই দেশ আজও পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে।

পল্লী উন্নয়ন সেরূপ দ্রুতগতিতে হয় নাই কেন?

পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়াই এই দেশকে একই সঙ্গে উন্নত করা যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত গঠিত হইলে লোকেরা স্থানীয় ব্যাপারে উৎসাহী হইতে বাধ্য। নিজেরাই যদি নিজেদের

উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে, সকলে মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুবিধাগুলি দূর করিয়া লয়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করে, ভূমি-সংস্কার করে, পরস্পরের সাহায্য করে বা সাধারণ তহবিল গঠন করিয়া নিজেদের হঠাৎ আপৎকালীন ব্যবস্থা করিয়া লয়, তাহা হইলে নিজেরাই অল্প আয়াসে উন্নত হইতে পারে। পঞ্চায়েত যত ক্ষুদ্রায়তন হইবে ততই কার্য পরিচালনার উপযোগী হইবে। বৃহদায়তন হইলে তাহার আভ্যন্তরীণ ত্রুটির ফলে তাহা কার্যকরী নাও হইতে পারে।

গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ

পঞ্চায়েত প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ। এইভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে দৃঢ়মূল করিলে জাতির সর্বত্র যে মহাশক্তির বিদ্যুত্তরঙ্গ চলিবে তাহাতে জাতি সত্যই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়াই জাতির অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকশিত হইবে। দেশ তখন চক্ষুষ্মান নাগরিকের দেশ হইবে এবং দেশ হইতে শোষণ ভয় একেবারে দূর হইবে।

মহাকাশ পরিক্রমা

মানুষের অভীপ্সার বুঝি শেষ নাই—তাই সে শুধু আকাশে উড়োজাহাজ চালাইয়া খুশী নহে। পৃথিবীর সবকিছুই সে আজ জানিয়াছে। এখন তাহার বাসনা মহাকাশ পথে জয়যাত্রা। এই অনন্ত মহাকাশে যে কোটি কোটি নক্ষত্র, উপগ্রহ রহিয়াছে সেখানে সে একবার টহল দিয়া দেখিবে। কিন্তু চতুর্দিকে উদ্যত ভয়ের তর্জনী তাহাকে নিষেধ করিতেছে—মানুষের সেখানে প্রাণবায়ুর অভাব, সেখানকার আবহাওয়া মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে পারে। সেজন্য মানুষ কিন্তু পিছপাও নয়। সে আজ জ্ঞানের উত্তুঙ্গ পর্বতের উপর সদর্পে দাঁড়াইয়া নিজেকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মনে করিতেছে। বাস্তবিক মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আজ তাহাকে বিপুল বলে বলীয়ান করিয়াছে। পরমাণু মধ্যে মৃত্যু-আণবিকার নৃত্য আজ তাহারই ইঙ্গিতে সুরু হইবার অপেক্ষায়।

ভূমিকা

মহাকাশ অনন্ত প্রসারিত এবং তথায় যে সব বড় বড় নক্ষত্র রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে

কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। সেখানে এমন সব নক্ষত্র রহিয়াছে যাহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কোটি কোটি যুগের মধ্যেও সম্ভব নয়। এইরূপ কত নক্ষত্র যে কত কোটি কোটি বৎসর এইরূপ নিঃসঙ্গভাবে রহিয়াছে তাহার হিসাব করা যায় না। নক্ষত্রগুলির এক-একটি কোটি কোটি সূর্যের মত বিরাট। কাজেই তাহাদের মধ্যবর্তী মহাকাশ যে কত সুদূরপ্রসারী ও অনন্ত-বিসারী তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অনন্ত মহাকাশ হয় অত্যন্ত গরম, না হয় অত্যন্ত শীতল। সেখানে জীবমাত্রেই হয় দগ্ধ হইয়া যাইবে, নয়ত' শীতে জমিয়া মারা যাইবে। এই মহাকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে নানা গ্রহ ও নক্ষত্রের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। তন্মধ্যে আমরা শুধু পৃথিবীর ভৌম আকর্ষণের কথাই জানি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বস্তুমাত্রেই বস্তুকে আকর্ষণ করে। কাজেই পৃথিবীর এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলে মহাকাশের মধ্যে গিয়া পড়িলে মানুষের যে কী দশা হইবে তাহা অনুমান করিতেই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মহাকাশের পরিচয়

মানুষ এই ভয়ে ভীত হইয়া বসিয়া থাকিল না—উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। দুঃসাহসীরা আকাশযান নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের এলাকা ছাড়িয়া মহাশূন্যে গমনের আকাঙ্ক্ষায় দুর্বার হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানীরা অঙ্কের পর অঙ্ক কষিতে লাগিলেন।

মহাকাশ পারাপারের তরণী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রকেট্ সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা শুরু হইল। কিভাবে রকেট্‌কে একটি নির্দিষ্ট দিকে চালানো যায়—কি ভাবে তাহার গতি ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহাই হইল মূল সমস্যা। এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সংশোধিত করিতে বহু শ্রম ও সময় গেল। তারপর শুরু হইল নকল গ্রহ তৈয়ারীর কাজ। সেই উপগ্রহকে মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে পরিক্রমণ করাইবার কৌশল আমেরিকা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই মহাশূন্যে প্রেরিত হইবে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইবার পরেই সর্বাগ্রে রাশিয়ার প্রথম স্পুট্‌নিক বা শিশুচন্দ্র ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে মহাশূন্যে উঠিয়া ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে পৃথিবীকে অনবরত দুই মাস ধরিয়া ঘুরিয়াছিল। রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুট্‌নিক লাইকা নামক একটি জীবন্ত কুকুরকে অভ্যন্তরে লইয়া ৯৪০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিল। এক উপগ্রহ চারমাস ধরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের এই কীর্তিতে যখন জগৎবাসী

স্তব্ধ-বিস্ময়ে মূক, তখনি আমেরিকার 'আল্ফা' নামক কৃত্রিম গ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহা রাশিয়ার স্পুট্‌নিক অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও রাশিয়ার স্পুট্‌নিক অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

একটি কুকুরকে স্পুট্‌নিকের অভ্যন্তরে মহাকাশ পরিক্রমণ করাইবার পর রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ মানুষকে পাঠাইবার উপযোগী রকেট্ নির্মাণ করিয়া গ্যাগ্রীণ নামক এক ভদ্রলোককে তন্মধ্যে রাখিয়া শূন্যে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন।

মনুষ্যবাহী রকেট্

তৎপরে আবার টিটোভ নামক আরেকজন রাশিয়ানও রকেটে চড়িয়া মহাকাশ ভ্রমণান্তে ফিরিয়া আসিলেন। আমেরিকাও একার্যে সার্থক হইলেন—তাঁহারাও গ্লেন নামক এক ভদ্রলোককে মহাকাশ পরিক্রমণ করাইয়া আনিলেন।

বিজ্ঞান মানুষকে ইন্দ্রিয়শক্তির অতিরিক্ত শক্তি ও ক্ষমতা দান করিয়াছে। তাহারই বলে আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই মানুষ অজানা রাখিবে না। একদিন মানুষ যে গ্রহে উপগ্রহে মানুষের নূতন নূতন উপনিবেশ বসাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ আর বুঝি রহিল না। এখন

মানুষের জয়যাত্রা

চন্দ্রের যে পিঠ এ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই—তাহাও দেখা সম্ভব হইবে এবং মহাজাগতিক রশ্মির স্বরূপও মানুষের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। পৃথিবীকে আজ অতি অল্প-পরিসর মনে হওয়ায় স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষে যাহার পরিবেশ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হইতে দূরে গিয়া মানুষ একদিন আবার স্বপ্ন দেখিবে, আবার আপন আদর্শকে রূপদান করিতে হয়ত সেখানকার জীবকুলকে উন্নত করিয়া সে এক বিচিত্র নূতন জীবগোষ্ঠী স্থাপন করিতে পারিবে এবং পৃথিবীর এই জঘন্য সংগ্রাম একদিন তাহাদের নিকট তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে।

গুজব

গুজব বা লোকমুখে প্রচারিত বিচিত্র অলীক বার্তা যুগে যুগে মানুষকে নানাভাবে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইহার কোথায় উৎপত্তি এবং কিভাবে যে ইহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন কিন্তু ইহার অনুকূল মৃত্তিকা মানব মনে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিশ্বাস-প্রবণ মনে ইহা মুহূর্তে প্রোথিত হইয়া ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আকাশচুম্বী মহামহীরুহে পরিণত হইয়া পড়ে।

ভূমিকা

এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, কথা কাণে হাঁটে। কাণ হইতে কাণে ইহারা কিভাবে অল্পক্ষণে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে তাহা লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে ইহার বৃদ্ধি এবং রূপান্তর। সকল মানুষের মনের রঙে ইহা বিচিত্র আকার ধারণ করে এবং এমন একটি দেশব্যাপী অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবার মত বলশালী মানসিকতা বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু যে নিরক্ষর অশিক্ষিতদের উপর ইহার প্রভাব তাহা নহে। সুশিক্ষিত দেশেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার যাদুকরী প্রভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

কিরূপে বিস্তার লাভ করে

মানুষ যতই শিক্ষিত হউক না কেন কুসংস্কারের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি সহজে সে পায় না। বহু শিক্ষিত ব্যক্তির আলোকোজ্জ্বল মনের মধ্যেও কুসংস্কারের অন্ধকার গুহা রহিয়াছে। গুজব একেবারে এই সব অন্ধকার গুহায় আশ্রয় লইয়া দৃঢ় হইয়া মনটি দখল করিয়া বসে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, দেশব্যাপী অরাজকতা, মহামারী, মড়ক ইত্যাদির ফলে যখন মানুষের মন দুর্বল হইয়া পড়ে তখনও গুজব তাহাকে অধিকার করে। এজন্য বৈদেশিক শক্তি যখন কোন দেশকে আক্রমণ করে তখন গুজব ছড়াইয়া দেশ-বাসীর মনোবল শিথিল করিবার প্রতিরোধ-শক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। লণ্ডনে যখন মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়াছিল এবং সর্বত্র অগ্নিদাহের হিড়িক পড়িয়াছিল, তখন শহরে নানারূপ গুজব প্রচলিত করিয়া দুষ্কৃতিকারীরা শহরবাসীকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া নানা

কুসংস্কার ও দুর্বলচিত্ততা গুজবের বন্ধু ও সাহায্যকারী

উপায়ে কার্যসিদ্ধি করিয়া লইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের সময়ে নানারূপ গুজবের ফলে কলিকাতাবাসীকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে বোমা পড়ার পর বোমাতঙ্ক কলিকাতাকে অধিবাসীশূন্য করিয়াছিল।

যুগে যুগে জ্যোতিষীরা মানুষকে জগৎ ধ্বংসের ভয় দেখাইয়া বোকা বানাইয়াছে। তবু একবার গুজব রটিল আর বুঝি মানুষের রক্ষা নাই। হায় মানুষের শিক্ষা! হায় মানুষের সংস্কারের গর্ব! সাম্প্রতিককালে ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ফলে জগতের ধ্বংস সম্বন্ধে যে পৃথিবীব্যাপী গুজব রটিয়াছিল, তাহাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল ভারতবর্ষ। সারা ভারতবর্ষে এই অমঙ্গল রোধ করিবার জন্য যজ্ঞ হইয়াছিল। তাহাতে প্রচুর মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—তদপেক্ষা প্রচুর ঘৃত ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং আতঙ্কে কত মানুষ যে কাতর হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। এই অহেতুক গুজবের প্রভাবে দিশাহারা হইয়া বিশ্বাসপ্রবণ লোক কাশীধামে উপস্থিত হইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে নাই। কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত এবং পৃথিবী বহির্ভূত স্থান হিসাবে তাহারা এইরূপ হাস্যকর উন্মত্ততা দেখাইয়াছিল।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন

হে গুজব, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ধনীকে নির্ধন বানাও; নির্ধনকে ধনী কর। তোমার প্রভাবে ভগবানও ভূত হইয়া যান। তোমার প্রভাবে মূর্খ পণ্ডিত হয়। পণ্ডিত মূর্খ প্রতিপন্ন হয়। মহাপুরুষদের ঐশী মহিমা বাড়াইতেও যেমন তোমার ক্ষমতা, তাহাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটাইয়া তাহাদের অকিঞ্চিৎকর করিতেও তেমনি তোমার ক্ষমতা। তুমি যাহার পিছনে থাক তাহারও আর সুনামের আশা নাই। তবে তুমি যাহাকে কৃপা কর তাহার ক্ষমতা না থাকিলেও সে ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়া লোক-প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। তোমার শক্তি অসীম—সমাজে তোমাকে এড়াইয়া চলিবার শক্তি বড় কাহারও নাই। তাই আবার তোমাকে নমস্কার করি আর করজোড়ে মিনতি জানাই, তুমি দুর্বলকে পীড়া দিও না, অসহায়কে দুঃখ দিও না, অশিক্ষিত মানবের ধ্বংসের কারণ হইও না। যাও দুনিয়ার বড় বড় লোকদের পিছনে লাগ। তাহা হইলেই আমরা রেহাই পাই।

গুজবের মহিমা

—o—

"বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়"

উক্তিটি কবিবর শ্রীকালিদাস রায় রচিত একটা কবিতার একাংশ। ইহার সম্পূর্ণ চরণটি এইরূপ :

"বিত্ত হ'তে চিত্ত বড
এই ভারতের মর্মবাণী"

উক্তিটির অর্থ

কাজেই মাত্র খণ্ডিত উদ্ধৃতিতে কবির উক্তিটির সম্পূর্ণ অর্থ হয় না। তিনি ভারতের মর্মবাণীর কথাই অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার মূল সত্যটি দেখাইযাছেন। ভারত কোনদিন জাগতিক ঐশ্বর্যকে বড় করিয়া দেখে নাই। তাই ভারতের সভ্যতা রাজা-মহারাজের জীবনীতে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় বরং শান্ত তপোবনে—যেখানে ঋষিগণ আধ্যাত্মিক চিন্তায নিমগ্ন থাকিয়া পার্থিব জগতের সর্ববিধ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার মহৌষধি ত্যাগ ও সংযম এবং ঈশ্বরে নির্ভরতা শিক্ষা দিযাছেন। বিত্তের দান অপেক্ষা চিত্তের দান জগৎকে বেশী সমৃদ্ধ করিযাছে।

ইতিহাসের মধ্যে একবার বিচরণ করিয়া আসিলে আমরা এই সত্যটির সারবত্তা অধিক হৃদযঙ্গম করিতে পারি। সভ্যতা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ধনাকাঙ্ক্ষা মানবকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। যেখানেই বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইযাছে সেইখানেই বিপুল বিলাসের আড়ম্বর দেখা দিযাছে। শত শত মানুষকে দান করিযা একদা ঐশ্বর্যশালীদের বিজযরথ পৃথিবীতে ধূলি উড়াইযা ভ্রমণ করিয়াছে। আজ ইতিহাসের পাতায় সেইসব ঐশ্বর্যশালীদের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। সেইসব আত্মসুখপরাযণদের কথা আজ কেহ বড মনে করে না। কিন্তু তথাপি জগতে বিত্তের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায না। বিত্তহীন বিত্তের জন্যই পরিশ্রম করে। বিত্ত সেই দিক দিযা এই সংসারের সকলকেই কর্মচক্রে ঘুরাইতেছে। এই পৃথিবীতে

বিত্তের প্রয়োজন অনস্বীকার্য

প্রাণধারণের জন্য বিত্তের প্রযোজন—সেই বিত্ত সংগ্রহ না করিয়া অলসভাবে বৈরাগ্যের শরণাপন্ন হওয়া সকল মানুষের সাজে না। আবার বিত্তের প্রয়োজন আছে বলিয়া সবকিছু ত্যাগ করিযা কেবল বিত্তসংগ্রহ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। কাজেই বিত্তার্জন করিতে গিযা বিত্তকে একেবারে নিঃস্ব রাখাও যুক্তিসম্মত নহে। তাহাতে মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

পক্ষী এক ডানায় ভর করিয়া উড়িতে পারে না—তাহাকে ক্রমান্বয়ে দুই ডানা সঞ্চালন দ্বারা গগনে উড্ডীন হইতে হয়। তবেই ভারসাম্য বজায় থাকে। মানবের পক্ষেও এই নীতি পালনীয়। দেহের সুখ ও নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভারের জন্য আমাদের বিত্তার্জন করিতে হয়। বিত্ত আমাদিগকে দৈহিক সুখ দান করে কিন্তু চিত্তের শান্তি ও তৃপ্তি শুধু বিত্তার্জনে কদাচ পাওয়া যায় না। বিত্ত সম্পদ্ চিত্তের স্থৈর্য ও শান্তির পরিবেশ রচনা করিতে পারে—কিন্তু বিত্তার্জন ও তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরন্তর উদ্বেজিত-চিত্ত ব্যক্তির মনে শান্তি স্থায়ী হয় না। সেজন্য বিত্তার্জনের একটা সীমা নির্ধারণ প্রয়োজন। আমাদের দেশে পূর্বকালে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" নীতি বলবৎ ছিল। অধুনাকালে আমরা হয়ত বনে যাইতে পারিব না কিন্তু অনাসক্ত হইয়া ধর্মাচরণ করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়। তাই আমাদের সাধক কবি রাম-প্রসাদ বলিয়াছিলেন,

বিত্ত বনাম চিত্ত

"এমন মানব জমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

যুগে যুগে মানুষের কর্ম দুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। কেহ বা ভোগসুখকে জীবনের সার মানিয়া বিত্ত সংগ্রহ করিয়া জগতে এক চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জনে বহু বিত্ত ব্যয় করিয়া গিয়াছে। কেহ বা সর্বসুখ ও বিত্ত-সম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া চিত্তোৎকর্ষ সাধনে নিমগ্ন হইয়াছে। এই দুই ধারার মধ্যে মনের বড় মানুষ যে ধনের বড় মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা মানুষমাত্রেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। একদিকে মানুষের চিত্ত সমুদ্রতল হইতে আগত মন্থিত সুধা আর একদিকে জাগতিক ঐশ্বর্যের ধনরত্ন, মণিমুক্তা, স্ফটিক-প্রাসাদ, গগনচুম্বী আবাস, মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, আর পৃথিবীর ঐশ্বর্যদ্বারা গঠিত যাবতীয় কীর্তি স্থাপিত করিয়া যদি তুলাদণ্ডে তৌল করা যায় ত' মানুষের মনের কীর্তি, চিত্তের দানগুলিই মহত্তর বোধ হইবেই। যদি কেহ বলে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ, শেক্সপীয়ারের গ্রন্থরাজী, কালিদাসের গ্রন্থরাজী, হোমার, ভার্জিল, ব্যাস, বাল্মীকির মহাকাব্য, সক্রেটিসের রচনাবলী, প্লেটোর কথোপকথন আর আরিষ্টটলের রচনা, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, বৌদ্ধ পিটকগ্রন্থাবলী, জেন্দাবেস্তা

উপসংহার

ইত্যাদি বড় না তুতান খামেনের ঐশ্বর্য, সলোমনের রত্নাগার, রকফেলার, রথস্‌চাইল্ডের ঐশ্বর্য বড়—তবে বোধ হয় কেহ পরোক্তগুলিকে বড় বলিবে না। মানসিক ঐশ্বর্যগুলি জগৎ স্বেচ্ছায় কোনদিন হারাইতে চাহিবে না এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

বিশ্বজগৎ চাহিছে তোমারে

মানুষ যেদিন পৃথিবীতে প্রথম চক্ষু মেলিল সেদিন এই পৃথিবীর কোন স্থানই তাহাকে সাদর আহ্বান জানায় নাই। সর্বত্র হিংস্র শ্বাপদ গর্জন করিয়া তাহাকে নাশ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহার বাসস্থান পাহাড়ের স্যাঁৎসেঁতে গুহা—আহারের জন্য যদিচ্ছা ভ্রমণ ছাড়া তাহার উপায় ছিল না। একদিকে ঘন অরণ্য অসংখ্য পাদপে অন্ধকার ও বন্যজন্তুতে ভয়ঙ্কর, অপরদিকে দীর্ঘ বন্ধুর সু-উচ্চ পর্বতমালার উন্নত তর্জনী তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ জানাইল আর একদিকে সমুদ্র বিপুল তরঙ্গভঙ্গে তাহাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া দিল। বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, দুস্তর মরুভূমি। মানুষ দেখিল তাহাকে টিঁকিতে হইলে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে।

ভূমিকা

এই বিশ্বজগতে কিভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটিল তাহা চিন্তা করিলে বোধহয় এই বিরাট বিশ্বযন্ত্রের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন প্রাণ সৃষ্টি নহে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে কোটি কোটি বৎসর পূর্বে একটি নিঃসঙ্গ বিরাট তারা মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সূর্যের অতি নিকটবর্তী হইল। নক্ষত্ররাজ্যে এই ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। প্রত্যেকটি নক্ষত্র কোটি কোটি মাইল ব্যবধান রাখিয়া সীমাহীন মহাকাশে বিচরণ করে। কাজেই একটি নক্ষত্রের সহসা সূর্যের সন্নিকটবর্তী হওয়া অতি আশ্চর্য ঘটনা। দৈবাৎ এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া যাইবার ফলে সূর্যের বায়বীয় গ্যাসপূর্ণ দেহে তাহা জোয়ারের মত প্রচণ্ড ঢেউ তুলিল এবং সূর্যের একাংশ ছিন্ন করিয়া আবার নিজ কক্ষপথে উধাও হইয়া গেল। সূর্য্যের সেই ছিন্ন অংশগুলি মহাশূন্যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং কালক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহে রূপান্তরিত হইল। সেই শীতল পৃথিবীতে

নবাগত মানুষের পরিচয়

দৈবাৎ একদিন আমিবা বা অনন্তরূপী জীবশৈবালের সৃষ্টি হইল। তাহাই প্রথম প্রাণবীজ। সেই এককোষবিশিষ্ট জীবই মানুষের প্রথম পুরুষ। কালক্রমে বিবর্তনের ফলে একদা মানুষের সৃষ্টি হইল।

মানুষের শক্তি

মানুষ অসহায় হইয়া পৃথিবীতে প্রথম জন্মাইলেও ইহার মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা জটিল এবং কার্যকরী থাকায় সে বুদ্ধি প্রভাবে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করিয়া ফেলিল। মরুভূমিকে সে কৃষি-কর্মের দ্বারা সুফলা করিল—অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইল—বন্যজন্তুদের সুদূর জঙ্গলে বিতাড়িত করিল এবং মৃত্তিকা ও প্রস্তর দিয়া ঘর বাড়ী বানাইয়া নিজ নিরাপত্তা বিধান করিল। ফলে যে পৃথিবী তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল, এখন তাহার বুদ্ধিকৌশলের নিকট পরাজিত হইয়া আপন রহস্যভাণ্ডার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

মানুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি

মানুষের মনটি বড় বিচিত্র। সেই বিচিত্র মনে একবার কোন বাসনা জন্মিলে আর রক্ষা নাই। মানুষ একবার যাহা করিবে ভাবিয়াছে তাহা শেষ পর্যন্ত করিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছে। জগৎ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে আর মানুষ তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আপন সুখের উপকরণ বৃদ্ধি করে। পাখীরা আকাশে—মানুষ আকাশের দিকে চাহিল—সুনীল আকাশ যেন হাতছানি দিয়া মানুষকে ডাকিল। ব্যস্! মানুষ উপায় চিন্তায় মাতিয়া গেল। কত যন্ত্র তৈয়ারী হইল—কত দুঃসাহসী প্রাণ দিল তবু মানুষ নিরস্ত হইল না—অবশেষে একদিন সে এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়া অবলীলায় আকাশ-পথে বিচরণ করিতে লাগিল। এইভাবে সে সমুদ্রের জলতলে নামিল। পৃথিবীর মৃত্তিকার তল হইতে রত্ন-ভাণ্ডার খনন করিয়া তুলিল। সমুদ্রের জলে বিরাট অর্ণবপোত ভাসাইয়া সমুদ্র পার হইল। দুর্গম পাহাড় ডিঙাইল, সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিয়া নব নব দেশ আবিষ্কার করিল। রোগ, অপমৃত্যু জগৎ হইতে নিবারণ করিল। কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার আশা মিটিতেছে না। বিশ্ব-জগতের যেটুকু জ্ঞান সে আহরণ করিয়াছে তাহাতে সে খুশী নয়। মহাকাশে কি আছে তাহা সে জানিতে মহাকাশের শেষ সীমায় না পৌছান পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। সে শান্ত হইবে না। ক্ষুদ্র অণুর মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে তাহাও তাহার জানা হইয়া গেল।

এবার তাহার যাত্রা তারালোকে। আজ সেই ভাবনায় সে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। তাহার চেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। মানুষের তৈয়ারী নকল উপগ্রহকে মানুষ পৃথিবী হইতে যন্ত্রসাহায্যে শূন্যে পরিভ্রমণ করাইয়া মহাকাশের রহস্য সংগ্রহ করিতেছে। পার্থিব চৌম্বক শক্তির বাহিরে মহাকাশে যে মহা জাগতিক রশ্মি বিস্তৃত রহিয়াছে তাহার প্রকৃতি নিরূপণে আজ মানুষ কথঞ্চিৎ সফল হইয়াছে। তাছাড়া চন্দ্রের যে দিক সম্বন্ধে এতকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল আজ উপগ্রহগুলি চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করায় চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের রহস্যও মানুষের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

উপসংহার

হে অসীমশক্তিধর মানুষ, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুধু জগৎরহস্য সমাধানেই ব্যস্ত নহ, মানুষের মনরূপ মহাজগৎও আজ তোমার অণুবীক্ষণী দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। তুমি পৃথিবীর পরমাশ্চর্য—তুমি জগতের কাব্যকার—তোমাকে আবার নমস্কার করি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

এদেশে যখন সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত লোকের ভাষা তখন সাধারণ লোক প্রাকৃত ভাষায় (পালি) কথা কহিত। সেই প্রাকৃত ভাষা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ভাষা-জননী ছিলেন সংস্কৃত। 'প্রাকৃত-পিঙ্গল' বলিয়া একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে প্রাকৃতে লেখা বহু শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্লোকে বাঙালী-জীবনের বহু খণ্ড-চিত্র রহিয়াছে। এ ছাড়া 'গাথাসপ্তশতী'-তেও এরূপ শ্লোক আছে।

'প্রাকৃত-পিঙ্গলের' একটি শ্লোক নীচে দেওয়া হইল। ইহাতে বাঙালী কেমন ভোজন-বিলাসী ছিল তাহার চিত্র রহিয়াছে—

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা, দুগ্ধ সজুত্তা॥
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণ্যবন্তা॥

অর্থ : ওগ্‌রা ভাত, কলার পাতায় ঢালা হইয়াছে। তাতে গরুর দুধের ঘি এবং সুস্বাদু দুধ দেওয়া হইয়াছে। মৌরলা মাছ, নালিতা শাক রাঁধিয়া কান্তা পরিবেশন করিতেছেন আর পুণ্যবান কান্ত খাইতেছেন।

বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ কি, বাংলা ভাষার আদিরূপ কেমন ছিল সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ জানা যায় যে সৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় বৌদ্ধাচার্যগণ যে সকল দোহা রচনা করেন তাহাদের সহিত বাংলা ভাষার বহু মিল রহিয়াছে। ইহাদের রচয়িতারা বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের অধিবাসী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে পুরাতন নেওয়ারী অক্ষরে লেখা কয়েকখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিগুলির রচনাকাল ৭ম হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে। ইহার মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক একটি পুঁথি আছে।

দোহাগুলির রচনাকারের মধ্যে কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যায়। চর্য্যাপদের কিছু ভাষার নমুনা দেওয়া হইল :

তিথ তপোবণ ম করহু সেবা (অর্থ : তীর্থ ও তপোবনে যাইবে না); ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই (অর্থ : ঘরে আছে, ঘরেই আছে; বাহিরে কোথায় পুছিতেছিস?)

এই প্রাচীন সৌরসেনী অপভ্রংশ বাংলা ভাষা না হইলেও বাংলা ভাষার সহিত ইহার আশ্চর্য মিল আছে।

এখন আমাদের জানিতে হইবে বাংলা লিপি কোথায় কোথায় চলিত। একসময়ে বাঙলার উত্তর-পশ্চিমে মিথিলা, উত্তর-পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা পর্যন্ত বাংলা লিপি চলিত। এখন এ ব্যবস্থার সঙ্কুচিত হইয়া শুধু আসামেই বাংলা লিপি চলিত আছে।

অশোকের অনুশাসনগুলিকে ব্রাহ্মীলিপিতে লিপিবদ্ধ বলা হয়। এই ব্রাহ্মীলিপি ভারতের মৌলিক লিপি। ইহা হইতেই ভারতীয় লিপিগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

বাংলা লিপি যেমন ক্রমশঃ সুন্দর ছাঁদ লাভ করিয়া বর্তমান ছাপা অক্ষরের ছাঁদ পাইয়াছে তেমনি বাংলা ভাষা চর্য্যাপদের পর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাংলা ভাষার প্রধানতঃ তিন স্তর।

১। **প্রাচীন বাংলা ভাষাঃ** ১০ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত।

২। **মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষাঃ** ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। চর্য্যাপদের ভাষা হইতে ভারতচন্দ্রের ভাষা পর্যন্ত।

৩। **আধুনিক বাংলা ভাষাঃ** ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

এই সকল যুগের বইগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে ভাষার তিনটি স্তর রহিয়াছে। সাধু, চলিত ও উপভাষা। কলিকাতা বাংলার রাজধানী। তাই কলিকাতার ভাষাই প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য ভাষাগুলিকে কোণঠাশা করিতেছে। কিন্তু অন্য ভাষা হইতে বিস্তর শব্দ এবং বাগ্‌ভঙ্গী এই কলিকাতার ভাষাকে সবল ও প্রকাশ-ব্যঞ্জনাময় করিতেছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। ডাক ও খনার বচন, শূন্য পুরাণ, কথাসাহিত্য, মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া বা রূপকথার কোনটাতেই সেকালের ভাষা বিধৃত হইয়া নাই—সেগুলি মুখে মুখে বদল হইয়া আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মধ্যে বাংলা ভাষার মূল কাঠামো ও বহু শব্দ বেশ লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগীয় ভাষার সীমা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই ছয় শত বৎসরের সাহিত্যিক কৃতিগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কিরূপে ভাষা ধীরে ধীরে জড়তা কাটাইয়া সুন্দর, সাবলীল ও প্রকাশব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠিতেছে। মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামক পুঁথিটি। চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচনার মধ্যবর্তী কালে যে সব সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা পাই নাই। এই সময়কার গ্রন্থগুলি হয়ত তুর্কী আক্রমণের ফলে দেশে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহার মধ্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন গোপীচন্দ্রের কাহিনী, গোরক্ষ নাথের গল্প, মঙ্গল-কাব্য ইত্যাদি এই সময়ে কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল। এই সব লুপ্ত পুঁথির স্মৃতি অবলম্বনে পরে পুনর্লিখিত হইয়া থাকিবে। এই সকল পুঁথির ভাষার মধ্যে চর্য্যাপদের বহু ভাষা-নিদর্শন রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা ভাষায় প্রাণের প্রবল বান ডাকিয়াছিল। তৎপরে দ্রুতবেগে ভাষা অগ্রসর হইতে থাকে। ১৬শ শতাব্দীতে আরবী, ফারসী ভাষা বহুল পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে

থাকিল ব্রজবুলি বা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক বাক্‌ভঙ্গিমা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীব মধ্য দিযা বাংলা, উডিষ্যা ও আসামেও বৈষ্ণবপদের ভাষা হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিল। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান হরফে বাংলা গদ্য ভাষায পুস্তক বচিত হইল। ইহা পর্তুগীজ মিশনাবীদেব দ্বাবা মুদ্রিত হওযাব ফলে বহু পর্তুগীজ ভাষা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আধুনিক যুগের শুরু। প্রথমে ইসলামী প্রভাব ও সংস্কৃত প্রভাবের ফলে বাংলা গদ্য জডতাসম্পন্ন থাকিলেও ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীযার্ধ হইতে সংস্কৃত প্রাধান্য কমিযা ভাষার নিজস্ব রূপটি বিকশিত হইতে লাগিল। ইংবাজী শব্দ এবং বহু বাচনভঙ্গী ভাষাব মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বাক্যবিন্যাসে ইংবাজী রীতিও ক্রমশঃ প্রবেশ কবিতে লাগিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গত ২৯শে জুন, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক-বিভাগ আশুতোষ স্মারক ডাক-টিকিট প্রচার করিলেন। টিকিটটির একদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব থামওযালা প্রাচীন সিনেট হলের ছবি এবং তাহার পাশে গুম্ফসমন্বিত আশুতোষেব পৌরুষব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত চিত্র। আমরা আশুতোষকে ভুলিতে বসিযাছিলাম—সহসা তাঁহাব শতবার্ষিকীতে আবার নূতন করিযা তাঁহাকে স্মরণ কবিলাম। স্বদেশী আন্দোলনেব সময় যখন ইংরেজ দ্বারা স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকাংশ লোক গোলাম-খানা আখ্যা দিয়া পবিত্যাগ করিতে বসিয়াছিল তখন আশুতোষ দৃঢতার সহিত এই বিশ্ববিদ্যালয়েব উপযোগিতার কথা দেশকে বুঝাইয়া ইহার মাধ্যমে বাঙালী সন্তানদের মানুষ কবিবাব সংকল্পে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। বাস্তবিক বিদেশী-স্থাপিত গোলাম তৈযারীর এই যন্ত্রটিকে আশুতোষ সকলের অলক্ষ্যে এরূপ নূতন ভাবে নিযন্ত্রণ করিলেন যে ইহা হইতেই দেশের প্রত্যেকটি কৃতি সন্তানের সৃষ্টি হইল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশের থাবার তলায় বসিযা ইহাকে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত কবা বড কম দুঃসাহস ও প্রতিভার কার্য নয়।

ভূমিকা

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন কলিকাতার অন্তর্গত মলঙ্গা লেনে আশুতোষের জন্ম

হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম ছিল জগত্তারিণী দেবী। মাতা-পিতার প্রভাবে বাল্যকাল হইতে আশুতোষের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয। লেখাপড়ায় তিনি শুধুমাত্র মেধারই পরিচয দেন নাই, তাহার মনোযোগ ও অধ্যবসায ছিল প্রায যোগীর ন্যায। বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিটি পরীক্ষা তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং বহু বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রেমচাঁদ রাযচাঁদ বৃত্তি পান এবং আইন পরীক্ষায উত্তীর্ণ হইযা ডি, এল উপাধি অর্জন করেন। বাল্যকালে তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সার্থক হইযাছিল।

জন্ম ও ছাত্রজীবন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা পাশ করার পর আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। আইনে তাহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালযের সদস্যরূপে তিনি একাদিক্রমে ২৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিযা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের মান উন্নত করিযা তাহার সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করেন। তিনি চারি বার ভাইসচ্যান্সেলার হন। ১৯১১ সালে তিনি সি, আই, ই উপাধি পান এবং ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২০ সালে কিছুকালের জন্য তিনি প্রধান বিচার-পতির পদ লাভ করেন। বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী' উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতা হাইকোর্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয এই দুইটি ছিল আশুতোষের প্রধান কর্মক্ষেত্র।

কর্মজীবন

আশুতোষের ধারণা হইযাছিল যে ইংরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয-রূপ যন্ত্রটিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাইলে তাহা দ্বারা প্রকৃত মানুষ গড়া যাইবে। সেজন্য স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও তিনি অপূর্ব সৎসাহস প্রদর্শন করিয়া অকুতোভয়ে আপনার কার্য চালাইয়া গিযাছেন। দেশে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালযের নিম্ন মানগুলির পরীক্ষা যথাসম্ভব সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গঠনে আশুতোষের প্রচেষ্টা

কিন্তু সেজন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মান একটুও কমে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের স্রষ্টা তিনিই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজও তাহারই সৃষ্টি। তিনিই বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রথম গোড়া পত্তন করেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে নানা বিষয়ের পুস্তক রচনা করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ছিলেন বিদ্যাসাগরের মতই একজন খাঁটী বাঙালী। বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালা-ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে আশুতোষ যে কত ভালবাসিতেন তাহার পরিচয় তাঁহার বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে। এই সভায় তিনি ছিলেন সভাপতি।

খাঁটী বাঙালীয়ানা

তাঁহার অভিভাষণটি একটি সরস্বতী স্তোত্র। হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে উত্থিত সেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে আশুতোষের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ধ্বনিত হইয়াছে। আচারে-বিচারে, বেশভূষায় আশুতোষ খাঁটী বাঙালী ছিলেন। তাহার সহিত যাঁহাদের আলাপ ছিল না তাঁহাদের চক্ষে আশুতোষ ছিলেন দাম্ভিক, প্রভুত্বপ্রয়াসী। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এটি আশুতোষের বাহিরের পরিচয়। তিনি কর্মক্ষেত্রে একটু কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। এদেশে কড়া না হইলে কাজ আদায় করা যায় না। তাই কঠোরতা ছিল আশুতোষের কর্ম-কৌশলের অঙ্গ।

বাগ্মী ও স্বদেশকর্ম্মী বিপিন চন্দ্র পালের মতে আশুতোষ ত' প্রভুত্ব প্রয়াসী ছিলেনই না অধিকন্তু তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় 'ডেমোক্রাটিক'। তিনি আপনাকে সর্ব বিষয়ে দশজনের মধ্যে মিশাইয়া রাখিতেন। কথাবার্ত্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে কখনও নিজেকে দশজনের ঊর্ধ্বে মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে দিতেন না। হাইকোর্টের জজদের পোশাক পরিতে হইলেও অন্যত্র তিনি দেশী পোশাক পরিতেন। স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে বাঙালীর পোশাক ছাড়া বিদেশী পোশাক তিনি পরেন নাই।

ডেমোক্রাটিক

আধুনিক বাংলার সংগঠকদের মধ্যে আশুতোষ ছিলেন প্রধান। তাঁহার চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে চিরকাল বাঙালীর মনে অমর করিয়া রাখিবে। 'বাংলার বাঘ' বলিতে যে তেজবীর্য্য বুঝায় তাহা আশুতোষে সম্যগ্ বিকশিত হইয়াছিল। উচিতকথা বলিতে কোনদিন তাঁহাকে দ্বিধা করিতে হয় নাই। আজ বাঙালীদের অধঃপতিত অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। পরাধীনতার গ্লানিময় অবস্থাযও বাংলায যে সব তেজী সন্তান জন্মিযাছিলেন আজ তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভের উপযোগী একজনও দেখিতে পাওয়া যায না। এই আশুতোষের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন 'শ্যামাপ্রসাদ'; কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালী তাহাকেও অকালে হারাইযাছে।

উপসংহার

চৈনিক আক্রমণ ও ভারতবর্ষ

চীন এক অতি প্রাচীন দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনেব সহিত ভারতবর্ষেব যোগ। ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধদেবের 'মৈত্রীভাব তরঙ্গ' চীনে পৌছে ছিল এবং চীনকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যযন করতে বহু ছাত্র চীন থেকে নিযমিত ভারতবর্ষের নালন্দা ও তক্ষশীলায আসত। চীন বহু ব্যাপাবে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে অগ্রবর্তী ছিল। কিন্তু বর্তমানে ধীরে ধীবে কোথা দিযে সেই প্রাচীন সভ্যতাব ধারক ও বাহক চীন মবে গিযে জেগে উঠেছে তার কঙ্কাল থেকে এক দানবীয শক্তি যার নাম 'লাল চীন'। তার ঝাণ্ডায লেখা সাম্যবাদ—মানুষকে পদানত করা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করাই যেন এই সাম্যবাদের মোদ্দা কথা।

ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা করেছে চীনকে। নয়া চীনকে প্রথমেই ভারতবর্ষ আহ্বান করেছে 'জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে'র সভ্য হবার জন্যে। ভারতবর্ষ ভোলেনি তার প্রাচীন ঐতিহ্য—চীনের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য ঘন করতে চেযেছে। বান্দুং-এ যে এশিযাবাসী দেশগুলির প্রতিনিধি সম্মেলন হয়েছিল তাতে 'পঞ্চশীল নীতি' অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে চীন মৌখিক আস্থা জানিয়ে পাঁচজনের একজন হয়েও ছিল। কিন্তু এ সকল চীনের মুখের বুলি নয়, মুখোসের বুলি—মুখোসের মৈত্রী।

চীনের মুখোস খসে আসল মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যেদিন চীন নিরীহ ধর্মসর্বস্ব

তিব্বতকে আক্রমণ করে গোটা দেশটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার মধ্য দিযে দখল করে নিল। চীনের কাজ খানিক হাসিল হ'ল। যে মুখটা সহসা জগৎবাসী দেখেছিল তাকে ঢাকা দিতে হবে যে। তাই সে আবার মুখোসটাকে রং করে নিলে। এবার শুরু হ'ল মুখ আর মুখোসের খেলা। মুখোস এঁটে চীনের প্রধানমন্ত্রী এলো ভারতবর্ষে বেড়াতে। আসল কাজ হ'ল ভারতবর্ষের রন্ধ্র খোঁজা। স্বাধীন ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিযে ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তুল্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রহিসাবে তাতে চীনের গাত্রদাহের যথেষ্ট কারণ ছিল বৈকি! কিন্তু ভারতবর্ষ সহনশীলতার আদর্শ, সহাবস্থান নীতিতে আস্থাবান্। তাই ভারতবর্ষ সস্নেহে, সসম্মানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে উদারভাবে আহ্বান ও অভিনন্দন জানালো। সেদিন চীনের মুখোসের ভাঁজে ভাজে কি অমায়িক হাসি—কি সৌহার্দ্য আর কি সৌভ্রাত্র্য। ভুলে গেল ভারতবাসীরা। প্রাচীনকালের বন্ধুকে নবীনকালের উৎসাহ নিযে বুকে জড়িযে ধরলো। ধ্বনি তুললো "হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই"।

আসলে মুখোসটা এসেছিল ভারতবর্ষের সাজঘর দেখতে। পঞ্চমবাহিনী বন্ধুদের উৎসাহ দিতে। রঙ্গমঞ্চে নেচেও ছিল খানিক কিন্তু দেশে গিযে মুখোসটা খুলতেও তর সযনি। ভারতবর্ষ ও চীনের চিরকালের স্থাযী সীমারেখা 'ম্যাকমোহন লাইন' নিযে আপত্তি তুল্তে শুরু করলো সে। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এই সীমারেখা নিযে কোনদিন কোন আপত্তি ওঠেনি। কিন্তু চীনের মুখ হযে উঠলো মুখর। বললে, "চীনের ভূখণ্ড রযেছে ম্যাকমোহন লাইনের ওপারে—সে ভূখণ্ড আমাদের চাই—শান্তিপূর্ণ আলোচনায আপত্তি নেই—কিন্তু শেষকালে আমাদের দিতে হবে ঐ ভূখণ্ড।" ম্যাপ ছাপিযে চীন প্রচার শুরু করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে ঝপ্ ঝপ্ করে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চল দখল করে নিতে লাগ্ল।

ভারতবর্ষ শান্তিকামী। কিন্তু ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। সে ধৈর্যের সীমা পার হতেই ভারতবর্ষ রুখে দাড়াল। সীমান্তে ভারতীয জওযানরা প্রাণ দিতে লাগ্ল—চীন কিন্তু মীমাংসার বুলিও আওড়াচ্ছে, এদিকে ঘাটির পর ঘাটি দখলও করছে।

সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হযে উঠল। সংকল্প নিলে, লালচীনের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে। চীন যে যুদ্ধ ঘোষণা না করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে তা রোখ্বার সংকল্প জানিযে ভারতবর্ষ আজ সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করতে বাধ্য হযেছে।

আজ আমাদের দেশ চীনের আক্রমণ-প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর ও সশস্ত্র। চীনাদের জুয়াচুরি আজ সারা জগতের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বাসঘাতক মুখটা মুখোস ফেঁড়ে বেরিয়েছে। তার নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টা কিন্তু 'নেফা-লাদক' সীমান্তে এসে ঠেক খেয়েছে।

চীন ভেবেছিল ভারতবর্ষ নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। এ অবস্থায় তাকে ঘায়েল করা শক্ত হবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মিত্রও ত' কম নেই। সবাই আজ সবকিছু দিয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষের সব লোক আজ যুদ্ধ-তহবিলে যথাসাধ্য দান করছে—দলে দলে শরীরের রক্ত দিচ্ছে অকাতরে, নারীরা তাদের স্বর্ণভূষণ যুদ্ধ-তহবিলে দান করছে স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

যারা মনে করছে এটা ব্রিটিশ আর আমেরিকার ওসকানিতে হচ্ছে, তাদের মত মূর্খ পৃথিবীতে নেই। যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরাগভাজন হয়েও একদিন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে লালচীনের সভ্যপদের জন্য আবেদন ও অনুমোদন করেছিল, সেই ভারতবর্ষ কেন আজ লালচীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে তা যেন কেউ ভুলে না যায়। এই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ও আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোয়া থেকে পর্তুগীজদের হটিয়েছিল। এ ভারতবর্ষ শান্তিকামী কিন্তু নিজ স্বাধীনতা রক্ষায় এর সর্বস্বপণ সংকল্প। এ জানে সত্য ও ন্যায়ের জয় হবে। ভগবানের আশীর্বাদ ন্যায় ও সত্যের পূজারীর উপর।

আজ ভারতবর্ষে কোন বিভেদ নেই—সবাই এক হয়েছে—সবাইয়ের মনেই এক সংকল্প, চীনকে রুখতে হবে। 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে ভারতীয়রা আজ দেশ-মাতৃকার এই নবতম শত্রুর সম্মুখীন হবে। সারা ভারতবর্ষে এখন এই এক মহাভাবের তরঙ্গ দুলে উঠেছে ; হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু!

বিজ্ঞানশিক্ষা ও সাহিত্যশিক্ষা

বিজ্ঞান আর সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের দুই শাখা ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞান বস্তুজগতের নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়াচ্ছে আর সেই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ বিধান করছে। আর সাহিত্য মানুষের মনের ভাব-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে

নিযে সুন্দব জগৎ সৃষ্টি করছে—মানুষের পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনেব জন্য যে মানসিক স্থৈর্য প্রয়োজন তা এনে দিচ্ছে সাহিত্য। কাজেই দুটো সম্বন্ধেই আমাদেব কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা যদি জগতেব তাবৎ সাহিত্যকে অলস মস্তিষ্কেব অলীক কল্পনা বলে উড়িযে দেয ত' তা যেমন ভুল হবে আর সাহিত্য-স্রষ্টাবা যদি বিজ্ঞানকে শুধু বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান বলে অবজ্ঞা কবে তবে তাও সমান ভুল হ'বে। জগতের মাটিতে জাগতিক নিয়মেব মধ্যেই মানুষেব মন বিকশিত হয। কাজেই ইন্দ্রিযগ্রাহ্য এই জগৎটাকে মাযা বলা ভুল বৈকি!

শিক্ষা বলতে সাহিত্যশিক্ষাই বুঝায। প্রাচীন কালেব পণ্ডিতবা সাহিত্য দিযেই প্রথম শিক্ষা শুরু করেন। তখন বিজ্ঞানকে দেখা হ'ত শযতানেব সৃষ্টিরূপে। কিছুকাল পর্যন্ত মনে কবা হ'ত নতুন কিছু বলা বা কবাই হ'ল শযতানেব কাজ। সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষা দেওযা হ'ত দর্শন ও ইতিহাস।

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানেব দ্রুত অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান অত্যন্ত আদবের বস্তু হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানেব যুগ। আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে এড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই বহুব্যাপক বৈজ্ঞানিক বস্তু উৎপাদনেব জন্য তাই দরকাব হচ্ছে বহু বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওযাকিবহাল লোকদের। তাদেব শেখাতে হচ্ছে বিজ্ঞান। তাই বর্তমান শিক্ষাব এক স্থান অধিকার কবেছে বিজ্ঞান-শিক্ষা। বিজ্ঞান-শিক্ষা ছাড়া আজ আব আমাদেব এক পা'ও অগ্রসব হবার উপায নেই। বিজ্ঞান চিন্তার জগতেও এনেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। তাই বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আমাদের শিক্ষা কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তাই বলে কিন্তু সাহিত্যশিক্ষাকেও বাদ দেওযা চলবে না। সাহিত্য আমাদের মনকে বিকশিত কবে—মনকে প্রশস্ত কবে দেয। উদাব মন না হ'লে জগতে টিকতে পারা যায না। মহৎ সাহিত্যের কাজ মানুষেব মনকে বড়ো করা—উদাব করা, জগতেব মানুষের প্রতি সমবেদনশীল করে তোলা। মানুষের মন উদার না হ'লে, মনের ভাব প্রকাশ করাব উপযুক্ত ভাষা না পেলে মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পাবে না—সুখী হ'তে পারে না। দৈনন্দিন জীবনেব যাবতীয সুখ পরিবৃত হলেও মানুষের মন চায স্থাযী কিছু যা সাহিত্য ছাড়া আর কোন বিষযই তাকে দিতে পাবে না। পৃথিবীর নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে তাই মানুষের মন আদর্শ তৈরী ক'রে তাব মধ্যে বাস ক'বে শান্তি পেতে চায।

একঘেয়ে বিজ্ঞানচর্চা যেমন জীবনকে স্বাদহীন যান্ত্রিকতার মধ্যে ফেলে দেয় আবার একঘেয়ে সাহিত্যচর্চাও মনকে বাস্তববিমুখ ও অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ করে দেয়। তাই দুইয়ের সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। এক পাখায় পাখীর ওড়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি শুধু সাহিত্যশিক্ষা বা শুধু বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তির চরমোৎকর্ষ হয় না। Newton-ও চাই আবার Shakespeare-ও চাই। কাহাকেও অবহেলা করা চলবে না। মানুষের সভ্যতা এই দুই খাতে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে নব নব সার্থকতার মধ্যে মানব মনকে তৈরী করে চলবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(১ম, ২য় ও ৩য়)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হইয়াছে। বিদেশী শাসকগণ দেশের সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। তাহারা যখন এদেশ ছাড়িয়া গেল তখন এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্নপ্রায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইন্ধন সরবরাহ করিতে ভারতের রক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা সকলই প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল। দেশের কল্যাণকামী সেবকদের হস্তে যখন এই দেশ-পরিচালনার ভার পড়িল তখন দেশের সমস্যাগুলি ইহাদের চক্ষে প্রকট হইয়া উঠিল। কিন্তু এত বড় দেশের সমস্যা একদিনে সমাধান করা যায় না। এইজন্য কোন্‌গুলি অগ্রাধিকার লাভ করিবে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনার প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতের সমস্যা

আজ পৃথিবীতে কেহ একক নহে। সকলের সহিতই সকলের সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশই আপন আপন হিত চিন্তা করে এবং তাহার ফল অন্যদেশ অনুসরণ করে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর রাশিয়া একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া দেশ পুনর্গঠিত করিয়াছিল। সেই দেশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কল্যাণকামী সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর দেশের উন্নতির একটি ক্রমশঃ কার্যকরী পরিকল্পনা নির্মাণের ভার দেন। দেশের সম্পদকে সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে এই কমিশন গঠিত হয়। প্রথম পঞ্চবর্ষের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাহার কার্যকাল ১৯৫১-এর এপ্রিল হইতে

অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত

১৯৫৬-এর মার্চ। ইহাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৯৫৬ হইতে ১৯৬০ সাল। ১৯৫৬ হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, ১৯৬০তে ইহা শেষ হইবে।

দেশের সম্পদ্ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, বেকার ব্যক্তিদের কর্মের সন্ধান করা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দ্বারা দেশকে খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, ধনবৈষম্য দূর করা ও সকলের উন্নতির জন্য সুযোগ সুবিস্তার করা—প্রধানতঃ এইগুলিই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই পরিকল্পনা বহুমুখী। কৃষি ভারতের প্রধান উপজীবিকা। এজন্য কৃষিজমির পুনরুদ্ধার ও ছোট-খাট সেচ-প্রণালীর কাজ—উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ, জমিতে সার দেওয়া ও উন্নত প্রণালীর কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গবাদি পশুপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান দান, মৎস্য চাষ, বনভূমি সৃষ্টি, স্থায়ী রাস্তা নির্মাণ ও পরিবহনের প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়; নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, কারিগরী শিক্ষা, কুটীর শিল্প ও ছোট-খাট যন্ত্রশিল্পের প্রসারে উৎসাহ দান করা হয়। গ্রাম্য সমাজ-জীবনে উন্নতির জন্য সমাজ-সেবা-কেন্দ্র স্থাপন, গ্রামোন্নয়নে উৎসাহ দান, খেলাধূলায় উৎসাহ দান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার ব্যাপক দৃষ্টি প্রসারিত ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সরকার বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সে ব্যয় সার্থক হইয়াছে। তাহার সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হইয়াছে। জমিদারী প্রথার বিলোপ ও উন্নত প্রণালীর চাষ সম্বন্ধে প্রচারের ফলে ভাল বীজ সংগ্রহ, জমিতে সারদান ও সেচ ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়িয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যে ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেণ্ট প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া সিন্ধ্রীতে সার উৎপাদন কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, হিন্দুস্থান জাহাজ কোম্পানী স্থাপন, দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা ও কয়েকটি বাঁধ, জলাধার ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রস্থাপন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। দেশব্যাপী জাগরণের ভাব

পরিকল্পনার সাফল্য

আনয়ন—দেশকে আত্ম-সচেতন করা যে সরকারী প্রচেষ্টার ফল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হইতে না হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খস্‌ড়া তৈয়ারি হয় এবং ১৯৫৬ সালে তাহার কার্য সুরু হয়। প্রথম পরিকল্পনায় দোষ ত্রুটি যাহা ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহা সংশোধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মূল ও ভাবী শিল্পগুলির উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ প্রতিষ্ঠা ও ধন বৈষম্য দূর করা। প্রথম পরিকল্পনা প্রধানতঃ কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়াছিল—দ্বিতীয় পরিকল্পনা অগ্রাধিকার দিয়াছিল শিল্পোন্নতিকে। শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প—এই দুইটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। মৌলিক শিল্পসম্প্রসারণ ব্যতীত এই বিরাট দেশের উন্নতি সম্ভব নয়—এ কথা পরিকল্পনা রচয়িতারা বুঝিয়াছেন এবং কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পগুলির প্রসার সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, দেশের খনিজ সম্পদ কাজে লাগানো এবং পরিবহন ব্যবস্থা উন্নততর করা হইল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পার সাফল্যের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রকল্পের রচনা ও কার্যক্রম সূচিত হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে—(১) ৫% হারে জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি পরিকল্পনা-কাল তাহার পরেও অব্যাহত রাখা, (২) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, (৩) ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, জ্বালানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপাদনমূলক শিল্পের সম্প্রসারণ ও ভারীযন্ত্র নির্মাণ-ক্ষমতা অর্জন, (৪) দেশীয় জনশক্তির সদ্ব্যবহার ও কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং (৫) অর্থনীতিক বৈষম্যের বিলোপসাধন। উদ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু চৈনিক আক্রমণে রাষ্ট্রনীতিক বিপর্যয়ের জন্য সঙ্কল্প এখনও সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। এই সম্ভাব্য অসম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতির কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের নিয়ন্ত্রণের ভার আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আমরাই তুলিয়া

দিযাছি। তাঁহারা আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপায চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের নির্দেশ অনুযাযী তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ ধরিযা আমাদের অগ্রসব হইতে হইবে। দূবে দাঁড়াইযা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে দেশ এক পদও অগ্রসব হইবে না। সকলকে কাজ করিতে হইবে, সহযোগিতা করিতে হইবে। দেশেব অগ্রগতিব পথে বাধা বিস্তর। নিবক্ষবতা, অবিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভবতার অভাব, দারিদ্র্য—এগুলি দূর কবার প্রচেষ্টায সবকার আমাদের সহায়—সরকাবী প্রচেষ্টায আমবা যদি হাত না মিলাই তবে আমাদেব সোনাব ভাবত কে নির্মাণ কবিবে ?

জনসাধারণের সহযোগিতা

পরিকল্পনা ও জাতীয় সমৃদ্ধি

পরাধীন জাতেব আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকাব থাকে না। সে জাতি আপন আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযাযী আপনাকে গঠিত করিতে পাবে না। পরজাতির অধীনে সে হীন-বীর্য্য ও দরিদ্র হইযা পড়ে। সেজন্য স্বাধীনতাব প্রযোজন। ভাবতবর্ষ সেজন্যই স্বাধীন হইতে চাহিযাছিল। বিদেশী শাসকদেব বিতাড়িত করিযা জাতির ভাগ্য নিযন্ত্রিত কবিতে চাহিযাছিল। অজস্র প্রাণ বলিদান ও ত্যাগস্বীকারের ফলে অবশেষে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল। তারপবে দেশেব সর্বাঙ্গীন উন্নতিব জন্য দেশেব নাযকগণ কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু সর্বাঙ্গীন উন্নতি ত সময-সাপেক্ষ, একদিনের ব্যাপাব নহে। সেজন্য কি ভাবে ভারতের জনবল, মৃত্তিকাব অভ্যন্তরস্থ সম্পদ কাজে লাগানো যায সে বিষযে একটি কমিশন গঠিত হইল ইহারই নাম পরিকল্পনা কমিশন।

ভূমিকা

রাশিযা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ পরিকল্পনা অনুযাযী প্রভূত উন্নতি সাধন কবিযাছে। ভাবতবর্ষও সেইজন্য ১৯৫০ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা কবিল। এইভাবে ধাপে ধাপে শনৈঃ শনৈঃ দেশ অগ্রসর হইবে—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ইহাই। প্রথম পরিকল্পনার স্থাযিত্ব কাল ১৯৫১ সালেব এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত। এই পরিকল্পনার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল—জীবন যাত্রাব মান-উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। এজন্য খাদ্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি উন্নযন প্রয়োজন। তাই সরকার নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ গ্রহণ করেন। তাছাড়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, মৃত্যুকর ইত্যাদির প্রবর্ত্তন সরকার করেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তাঘাট তৈযারী, রেল ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য প্রভূত টাকা ব্যযিত হয়। কযেকটি বৃহৎ নদী পরিকল্পনা রূপাযণে সরকার প্রভূত টাকা ব্যয করেন। পাঞ্জাবের ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা, বিহাব ও পশ্চিম বঙ্গের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, উড়িষ্যার হীরাকুদ পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাব সাফল্যের কীর্ত্তি। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কাবখানা, সিন্দ্রিব সার উৎপাদন কারখানা, বিশাখা পত্তনের জাহাজ-নির্মাণের কারখানা ভারতবর্ষের অগ্রগতিব স্চনা করে। এছাড়া শিক্ষাব প্রসারে বিদ্যালযের সংখ্যা বৃদ্ধি, ম্যালেরিযা উচ্ছেদ ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

দ্বিতীয পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে সুরু হইযা ১৯৬১ সালের মার্চ্চ মাসে শেষ হয। এই পরিকল্পার উদ্দেশ্য ছিল চারিটি। (ক) জাতীয আযেব বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান-উন্নযন, (খ) শিল্পোন্নতি দ্রুততর করার জন্য মৌলিক ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, (গ) কর্ম-সংস্থানের ব্যাপক সুযোগ দান ও (ঘ) দেশেব ধনসম্পদ ও ব্যক্তিগত আযের পার্থক্য লোপ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনাব মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পোন্নযন ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠন। এই পরিকল্পনাকালে তিনটি ইস্পাতশিল্পের কারখানা স্থাপিত হইযাছে মধ্য প্রদেশের ভিলাই-এ, উড়িষ্যার রুবকেল্লায আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। জাতি আজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইযা চলিযাছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাস্তুহারাদের দলে দলে ভাবতের ভূমিতে আগমন হেতু এখনও বহু সমস্যায ভারত ক্লিষ্ট।

দ্বিতীয পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনার কাজ সুরু হয ১৯৬১ সালেব এপ্রিল মাস হইতে এবং ইহা সমাপ্ত হইবে ১৯৬৫ সালেব মার্চ্চ মাসে। এই পরিকল্পনায জাতীয় আয় শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ইস্পাত ও বিদ্যুৎশক্তি আরো উৎপাদন, বেকার সমস্যা সমাধান এবং গ্রামে সমষ্টি উন্নযন ও সমবায আন্দোলনের প্রসার। চীনের সহসা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারত আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি হেতু তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ কিছু পরিমাণ বিঘ্নিত হইলেও ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে।

জাতীয় উন্নতির আর একটি বিশেষ কার্য্য সরকারের দণ্ডকারণ্য পবিকল্পনা। দেশে নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় আশী হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান নির্বাচিত হইযাছে। ইহা মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাংশে, উড়িষ্যাব পশ্চিমাংশে এবং অন্ধ্রের উত্তরাংশে অবস্থিত। এ পর্য্যন্ত ৩১ লক্ষ উদ্বাস্তু এ দেশে আসিযা জনসংখ্যার চাপে সর্ববিধ ব্যবস্থা বাণচাল করিয়া ফেলিতেছেন। ইহাদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন কবাইবার জন্য দণ্ডকারণ্য নির্বাচিত হইয়াছে। এখানে উদ্বাস্তুদের বসবাসের সকল প্রকার সুবিধা দেওযা হইতেছে। ইহা বনবাসে প্রেবণ নয, নতুন সভ্যতা সৃষ্টিব সুযোগ সুবিধা দান। আশা করা যায উদ্বাস্তুগণ এই সুযোগ গ্রহণ কবিযা অচিরে এই জনপদকে শিল্পে ও কৃষিতে সমৃদ্ধ করিযা তুলিবেন।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

চাণক্য শ্লোকে বলে, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্। বড বড কাজ একদিনে হয না। দীর্ঘকাল অধ্যবসায় সহকাবে পরিশ্রম করিলে তবেই সাফল্য লাভ করা যায। রোমনগবী একদিনে নির্মিত হয় নাই। ভারতবর্ষকেও পুনর্গঠিত করিতে সময লাগিবে। দেশবাসী ত্যাগ ও অধ্যবসায বলে একদিন ভারতবর্ষকে জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী কবিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

বলো বলো বলো সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায
শ্রেষ্ঠ আসন লবে

বিদ্রোহী কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম

যে সকল বাণী সাধক বাংলা সাহিত্যকে মহার্ঘ্য ভাব ও ভাষা ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সুবিখ্যাত। তিনি ছিলেন প্রকৃত চারণ কবি বা গণ সাহিত্যিক। তাহার প্রতিভা প্রধাধতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত করিয়া জনমানসে প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করিযাছিল। পরাধীন ভারতের ক্ষুব্ধ বেদনা তাঁহাব সাহিত্য সার্থক বাণীরূপ লাভ করিযাছে।

ভূমিকা

ইংবাজী ২৪শে মে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলাব অন্তর্গক চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম হয়। নজরুলের পিতার নাম কাজি ফকিব আহম্মদ। নজরুলের আদিপুরুষ একদা চুরুলিযায অবস্থিত মুসলমান শাসনকর্ত্তার আদালতে কাজ কবিতেন। এইজন্য ইঁহারা 'কাজি' উপাধিতে ভূষিত। নজরুলেব মাতা জাহেদা খাতুন উচ্চবংশীয মহিলা ছিলেন। নজরুলরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই মারা যাওয়ায নজরুল মাযের বড আদরেব সন্তান হইযা উঠেন। আট বৎসর বযসে নজরুল পিতৃহীন হন। নজরুল বাল্য হইতে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হন। সেজন্য লোকে তাঁহাকে দুখু মিঞা বলিযা ডাকিত।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নজরুলের পাঠ্যাবস্থায় তাঁব পিতাব মৃত্যু হয। চতুর্দিকে দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে জ্ঞান স্পৃহার ক্ষুদ্র দীপ শিখাটি জ্বালাইযা রাখা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তিনি মক্তবে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। কিন্তু সংসাবেব ভার স্কন্ধে চাপায তাঁহাকে মসজিদে ধর্ম ব্যাখ্যকারীর কাজ গ্রহণ কবিতে হইল। মক্তবে পাঠ সমাপ্ত করিয়া মক্তবেই শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে নজরুল হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও ইস্‌লামী শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কবিতা রচনার ক্ষমতা বাল্যকাল হইতে অঙ্কুবিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাটোয়ার অন্তর্গত মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে নজরুল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভর্ত্তি হইলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাল্য ও পাঠ্যজীবন

চুরুলিয়ায় তখন একদল ভ্রাম্যমান কবিদলের আখড়া ছিল। নজরুলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও কাব্য প্রতিভার জন্য তাহারা তাহাকে ডাক দিল। ইহাদের নাম 'লেটোর দল' বা নাটুকেদের দল। তিনি এই দলে মুখে মুখে গান রচনা করিয়া কবিগানের উত্তর দিতেন। এইভাবে দারিদ্র্যের জ্বালায় কিশোর নজরুলকে নাটুকেদের দলে ভর্ত্তি হইতে হইল। ইহার ফলে তাঁহার কাব্য প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। চতুস্পার্শ্বের গ্রামে নজরুলের নূতন নামকরণ হইল 'তারা ক্ষেপা'।

কাব্য প্রতিভার বিকাশ

লেটোর দলে কিছুদিন কাজ করার পর নজরুল একদা 'আসানসোল' শহরে আসিয়া এক রুটীর দোকানে কাজ লইলেন। অবসর সময়ে গান বাজনা ও পড়াশুনা করিয়া তাঁহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু স্থানীয় দারোগা তাঁহাকে মৈমনসিংহে নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন কিন্তু নজরুল সেখানে থাকিতে পারিলেন না। আবার রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নজরুল সিয়ারশোল রাজস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে তাঁহার শৈলজানন্দের সহিত পরিচয় হইল। তিনি এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

চিরচঞ্চল কিশোর

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৎসরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল লেখাপড়া ছাড়িয়া মহাযুদ্ধে সৈনিক বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর। করাচীর সেনা নিবাসে নজরুল তিন বৎসর কাটাইলেন। তারপর তিনি হাবিলদার নজরুল রূপে কবিতা ও গল্প লিখিতে লাগিলেন। এখানে পল্টনের এক পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে তিনি ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। পরে এই ফার্সি ভাষার কবি হাফিজের কাব্য তিনি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

হাবিলদার নজরুল

যুদ্ধশেষে ১৯১৯ সালে নজরুল দেশে ফিরিয়া সাম্যবাদী নেতা মুজঃফর আহমদের সংস্পর্শে আসিলেন এবং ক্রমাগত কাব্য রচনা করিয়া চলিলেন এবং গানের জোয়ারে বাংলাদেশ ভাসাইয়া দিলেন। নানা কাগজে নজরুলের লেখা বাহির হইতে লাগিল। এই সময়ে ফজলুল হক্ পরিচালিত নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক হইলেন মুজঃফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম। নজরুলের লেখনী অনল উদ্গার করিতে লাগিল। পত্রিকাটি সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়িল। ১৯২১ সালের জুন মাসে নজরুলের সহিত আকবর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক-

প্রথম বিবাহ ও কবি জীবন

ব্যবসায়ীর ভাগিনেযীর বিবাহ হয়। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। শ্বশুর বাড়ীর লোকদের দম্ভ ও অহমিকা নজরুলের পক্ষে অসহনীয় হওয়ায় তিনি বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হইবার পূর্বেই সেস্থান ত্যাগ করেন।

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে এবং দেশের আপামর সাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে দেখিতে নজরুলের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইতে ছিল। বিবাহানুষ্ঠানের বিরূপ পরিণতিতে তাহা যেন শতশিখায় লেলিহান হইয়া উঠিল। তিনি চারি বৎসরের মধ্যেই এক হিন্দু পরিবারে বিবাহ করিয়া সমাজ বিদ্রোহের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। নজরুলের বিদ্রোহ ঘোষণা ছিল সমাজের ঘুনধরা কাঠামোর বিরুদ্ধে, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে, আর ছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে ও দেশের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন বীর্য্যের কবি, উদারতার কবি, স্বাধীনতার কবি ও সাম্যের কবি। তাঁহার কাব্যে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু অসুন্দর তাহাদের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন বাংলার চারণ কবি। গান গাহিয়া, কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি দেশের লোকের মনে সাহস ও শক্তি আনিয়া দিয়াছিলেন। চিরকাল হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। দেশকে স্বাধীন দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই—কবির সহসা মস্তিষ্ক বিকার ঘটে এবং বর্ত্তমানে তিনি স্তব্ধ হইযা আছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের কোষগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সরকার ও দেশবাসীর চেষ্টায় তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু বিদেশী চিকিৎসকগণ এই রোগ 'দুরারোগ্য' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্রোহী কবি

গায়ক ও সঙ্গীত রচনাকারী হিসাবে নজরুল যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি প্রধানতঃ কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী হইয়া আছেন। যে অগ্নিকণা তিনি তাঁহার কাব্যে পরিবেশন করিয়াছেন তাহা যুগে যুগে বাঙালীর মনে নূতন উদ্দীপনা ও উৎসাহ আনিয়া দিবে। তিনি হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় করিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে। কি করিয়া একজন মুসলিম কবি এরূপ ভাবনায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে পারে তাহা চিরকালের বিস্ময় হইয়া থাকিবে।

বাংলা কাব্যে নজরুলের দান

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার 'বিষের বাঁশী', 'ফণিমনসা', 'অগ্নিবীণা', 'দোলন চাঁপা' ও 'সর্বহারা' কাব্যগুলি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কবিতা ও কাব্য গ্রন্থ

—ছাত্রদলের গান, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার, সাম্যবাদী, চল্ চল্ চল্, ফরিয়াদ, সব্যসাচী কবিতা আজ দেশময় লোকসঙ্গীতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার রচিত শিশু কাব্যগুলিও শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

জাতীয় সংহতি

সংহতি কার্য-সাধিকা। ঐক্য বা সংহতিই কার্য সাধনের মূল। কি ব্যক্তিগত উন্নতি কি জাতীয় উন্নতি সর্ব ব্যাপারে সর্বশক্তির সংহতি বা একীকরণের প্রয়োজন। সকল প্রচেষ্টায় লক্ষ্য একমুখী না হইলে কোন কার্য সার্থক হইতে

ভূমিকা

পারে না। কোটি কোটি মানুষ লইয়া একটি জাতি গঠিত। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু জাতির দেশ। কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র রহিয়াছে—তাহা হইল এই যে প্রত্যেকেই ভারতবাসী। প্রত্যেক ভারতবাসী এক ভৌগলিক সীমার মধ্যে বাস করে। প্রত্যেকেই জাতীতে ভারতীয়।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতির সকলের মনে একটা ঐক্যবোধ চাই। সহযোগিতার প্রবৃত্তি ঐক্যবোধ হইতে জন্মায়। যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে শত্রু ভাবি তবে কি করিয়া তাহার সাহায্য করিব? আর

প্রয়োজনীয়তা

যদি ভাবি যে আমাদের উন্নতি এককভাবে সম্ভব নহে পরন্তু সহযোগিতা দ্বারা সম্ভব তবেই ঐক্যবোধ আসিবে। একটি জাতির প্রত্যেকে যদি ভাবে যে সে দেশজননীর সন্তান তবে সংহতি আপনা হইতে গঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের

সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতির মধ্যে এই সংহতি বোধ আসিয়া ছিল, বলিয়া সারা ভারত এক উত্তাল তরঙ্গের মত বৃটিশ শক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পডিতে পারিয়াছিল

ভেদবুদ্ধি সংহতির অন্তরায়। হিন্দু-মুসলমান ভেদ, উচ্চজাতি নিম্নজাতি ভেদ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ, ধনী-দরিদ্র ভেদ এগুলি উন্নতির পরিপন্থী ও সংহতির অন্তরায়। এ ছাড়া রাজ্যগুলির মধ্যে পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থবুদ্ধি থাকিলে তাহা জাতীয় সংহতি নষ্ট করে। ভাষা সমস্যা ও সংহতির অন্তরায়। রাজ্যগুলির সীমানা লইয়া বিরোধ অনেক সময়ে সংহতি নষ্ট করে। হিন্দী ভাষা ভারতবাসীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার ফলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সংহতির অন্তরায়

এক ভাষা, এক ধর্ম সংহতি সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ, বহু ভাষার দেশ। এদেশে ইংরাজী ভাষাকে স্থায়ীভাবে অবলম্বন করিলে তাহা জাতীয় সংহতি রক্ষার সহায়ক হইবে। এ দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ। সেজন্য ধর্মের বিভেদ এদেশে জাতীয় সংহতি নাশ করিতে পারে না। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের প্রতি মমতা সংহতির সহায়ক।

সংহতির সহায়ক

আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা মানুষের ধর্ম। সেই রকম স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। স্বদেশ পরহস্তগত, পরাধীন হইলে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা সম্ভব নহে। স্বদেশকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করা তাই পরম ধর্ম। এজন্য সংহতির প্রয়োজন। দুর্বল জাতির আত্ম-রক্ষার অধিকার থাকে না। তাই বলবান হইতে হইবে—এই বল সংহতি হইতে আসে। সেজন্য জাতীয় সংহতি অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ্ঞা পালন সমাজের ঐক্য সূত্র, ইহাই মনুষ্য সমাজকে শক্তিশালী করে। কোন জাতির মধ্যে যদি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয় ত সে জাতি বিশৃঙ্খল, সংহতিহীন হইয়া পড়ে। সে জাতি কোন কার্য্য সুষ্ঠভাবে করিতে পারে না। পাঁচজনে মিলিয়া যে সব কার্য্য করিতে হয় তাহাতে একজনকে প্রধান ও দলপতি করিয়া আর সকলে তাহার আজ্ঞা পালন করিলে তবেই সে কার্য্য সার্থক হয়। নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা হইলেও তাহাকে উৎকৃষ্টের মর্য্যাদা দিয়া আজ্ঞানুসারে কাজ না করিলে সে কাজ সফল হয় না। শিষ্য গুরুর বশীভূত, শ্রমিক নিয়োগকর্ত্তার বশীভূত, দেশবাসী দেশনায়কের বশীভূত না হইলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়। সে জাতির উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হয় না।

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা বোধই জাতীয় সংহতি। যে সকল জাতি বড় হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যেই সংহতি ছিল। সেজন্য আমাদের সর্বদা জাতীয় সংহতি রক্ষা করিতে হইবে এবং সংহতির অন্তরায় গুলি ধীরে ধীরে দূর করিতে হইবে।

উপসংহার

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। কীর্ত্তিমান পুরুষই লোকচিত্তে অমর হইয়া থাকেন। কীর্ত্তি কি? কীর্ত্তি আমাদের কার্যাবলী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সকল কার্যই কীর্ত্তি নহে। যে কার্যের মধ্যে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ নিহিত, যাহা স্বার্থ প্রণোদিত নয় তাহাই কীর্ত্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থে মানুষ যাহা করে তাহা মানুকে অমর করে না—পরার্থে, মানব কল্যাণে যাহা করা হয় তাহাই কীর্ত্তি। বিধানচন্দ্র রায একজন কৃতী চিকিৎসক কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা-পেশা ব্যক্তিগত স্বার্থ ছড়াইয়া যেদিন সমষ্টিব কল্যাণে নিয়োজিত হইল সেইদিন হইতে তিনি কীর্ত্তিমান পুরুষ হইলেন। শুধু তাহাই নহে চিকিৎসক হইয়াও তিনি যেদিন জাতির মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন, বিবিধ কল্যাণের কার্যে আত্ম নিয়োজিত করিলেন সেইদিন হইতেই তিনি স্থায়ী কীর্ত্তিতে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া অমর হইলেন।

ভূমিকা

যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়ের বংশে বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। বাল্য ও পাঠ্যাবস্থায় বিধান পাটনায় ছিলেন। বি, এ পাশ করার পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আগমন করেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ও চিকিৎসা এই দুই বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার সংকল্প করেন কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি পূর্বে পান বলিয়া সেই প্রতিষ্ঠানেই ভর্ত্তি

ছাত্রজীবন ও শিক্ষা

হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯১১ সালে এম্, আর, সি, পি এবং এফ্, আর, সি, এস্ উপাধিতে ভুষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কর্ম জীবন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া বিধানচন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে য়্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ও ঐ স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব সিনেটেব সদস্য হন এবং তদবধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাজ কবিযা যান। তিনি ১৯১৯ সালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হন।

স্বদেশ সেবা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিধানচন্দ্রকে রাজনীতি ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সমর্থনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁহাকে পরাজিত কবিযা বঙ্গীয ব্যবস্থাপক সভায সভ্য হন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার বাসভবনে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠা—বিধানচন্দ্র ইহার সম্পাদক। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন।

কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের কার্য

মানুষ যখন বড হয়, যখন তাহার মধ্যে বিপুল কর্মোদ্যম দেখা দেয, তখন নানা বিচিত্র কর্মে তাঁহার ডাক পড়ে। বিধানচন্দ্রের ডাক পডিল কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজে। তিনি তাঁহার সেবার হস্ত অমনি প্রসারিত করিয়া দিলেন! ১৯৩০ সালে তিনি অল্ডারম্যান হইলেন। পর বৎসর তিনি পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়রের পদ লাভ করিলেন।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

দেশ স্বাধীন হইবার পর উত্তব প্রদেশের রাজ্যপালের পদ তাঁহাকে দেওয়া হয় কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। বিধাতা তাঁহাকে পশ্চিম বাংলা সংগঠনের জন্য নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও নানা সমস্যা বিজডিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যখন নায়কের অভাবে বিপর্যস্ত সে সময়ে বিধাতাপ্রেরিত মহাপুরুষের ন্যায় বিধানচন্দ্র পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রূপে নির্বাচিত হইলেন। বাংলা দেশ তাঁহার মত নায়ক পাইয়া আবার শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

বিধানচন্দ্র অতি উচ্চমানের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ছিল বহু-মুখীন। রাজনীতিতে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুগঠিত, দৃঢ়, উন্নত দেহে যখন তিনি ঋজু ভাবে দণ্ডায়মান হইতেন তখন তাঁহাকে শাল তরুর ন্যায় মহিমা মণ্ডিত দেখাইত। তাঁহার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বাংলা দেশে মুষ্টিমেয়। তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল এবং কোন কার্য হাতে লইলে তাহা সম্পন্ন না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বাংলার বহু ভাগ্য তাঁহার মত নেতা জুটিয়াছিল এবং বহু দুর্ভাগ্য বাংলা দেশ তাঁহাকে হারাইয়াছে। আজ বিধানচন্দ্র নাই—সর্বভারতীয় এই নেতার অভাবে বাংলা দেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বহু বিচিত্র প্রতিভা

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

স্বদেশপ্রেমের যে পূত যজ্ঞাগ্নি হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ অগ্নিকণা আহরণ করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই যজ্ঞাগ্নির ঋত্বিক। দেশপ্রেম তাঁহার প্রাণ বায়ুর ন্যায় ছিল। ইংরাজের অধীনে কর্ম করিয়াও তিনি কোনদিন ইংরাজের স্তাবকতা করেন নাই এবং দেশকে মহান্ আদর্শের পথে পরিচালিত করিবার মহান্ কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

ভূমিকা

ইংরাজী—১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তিকচন্দ্র রায়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্ এ পাশ করিয়া কৃষি বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন। কৃষিবিদ্যায় ডিপ্লোমা পাইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। কিন্তু স্বাধীন মানুষের সহিত পরিচয় ঘটায় তাঁহার দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়া গেল। এক দিকে উদার ভাব পূর্ণ হৃদয় ও অন্যদিকে গোঁড়া কুসংস্কার পূর্ণ জরা-

ছাত্রাবস্থা ও শিক্ষা

জীর্ণ হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা। সংঘাত বাধিল সেই সমাজের সহিত। সমাজ তাঁহাকে 'একঘরে' করিল এবং আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে পরিহার করিল।

কর্মজীবন

সরকারী কাজে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইযা তিনি প্রবল প্রতাপে মফঃস্বল অঞ্চলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার তেজস্বী স্বভাব ও অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য উর্দ্ধতন ইংরেজ অফিসাররা তাঁহাকে পছন্দ কবেন নাই। তিনি উগ্র স্বদেশিতার জন্য কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। ফলে তাঁহাকে কেবল একস্থান হইতে অন্যত্র বদলী হইতে হইল। কিন্তু ইহাতে দ্বিজেন্দ্র দমিলেন না!

সাহিত্য জীবন

বাল্যকাল হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল কবি প্রকৃতিব ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন এবং অনেক গান রচনা করিযা নিজে তাহাতে সুর দিযা গাহিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীত বচযিতা, সুবকাব ও কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন কবিলেন। বিশেষ করিয়া হাসির গান রচনায় তিনি নূতন স্বাদ আনযন কবিলেন। হিন্দু সমাজের গোড়ামি, বিলাত প্রত্যাগত যুবকদের নকল সাহেবিযানা, দেশের সামাজিক দোষ ক্রটি ইত্যাদি লইয়া সঙ্গীত রচনা করিযা তিনি কিছুটা সমাজ সংস্কাবকেব ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধক গান রচনা কবিযা দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা দান করেন। 'বঙ্গ আমার, জননী আমাব; ধনধান্যে পুষ্পেভরা, যেদিন সুনীল জলধি হইতে, কিসের শোক করিস্ ভাই', ইত্যাদি গান বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য নিধি।

নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল সহসা বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মধ্যে ছিল ভাষা, ভাব ও উচ্ছ্বাসের নায়াগ্রা প্রপাত। তিনি নাটক অবলম্বন করিয়া সেই সুরেলা, ঝঙ্কারময, নাট্যকাব মার্লোর ন্যায় তাঁহার কাব্যময় ভাষা তাঁহার নাটকগুলি চিরকাল অমরত্বের মহিমায় মহীয়ান করিয়া রাখিবে। তিনি ইতিহাস হইতে মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া নাটক লিখিতে লাগিলেন। মেবার পতন, প্রতাপসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, দুর্গাদাস, সিংহবিজয়, সাজাহান। পৌরাণিক নাটক লিখিবেন সীতা, পাষাণী। প্রহসন রচনা করিযা তিনি প্রথমে যশস্বী

হন। কল্কি অবতার, ত্রহস্পর্শ ও পুনর্জন্ম রঙ্গ মঞ্চে নতুনত্বের স্বাদ আনয়ন করেন। 'পরপারে' নামক একখানি সামাজিক নাটক ও তিনি লিখিয়া ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে এক উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদ ও সঙ্গীতময়তার স্বাদ মিলে। দেশপ্রেম তাঁহার প্রাণ বায়ুর ন্যায় ছিল। নাটকের মাধ্যমে তিনি জাতিকে স্বদেশ

উপসংহার

প্রেম শিখাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রহের সৈনিক করিয়া গড়িয়া দিলেন। তাঁহার স্বদেশী গান বাংলার ঘরে ঘরে স্বদেশী মন্ত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। স্বদেশকে অন্যান্য দেশের ন্যায় উন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার প্রাণবায়ুর ন্যায়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হইয়াছে। দেশ এখনও তাঁহার সাহিত্য ও কাব্য হইতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিতেছে। রবীন্দ্র যুগে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এই কবির রচনা অনুশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

মহাকাশ অভিযান

মানুষের আকাঙ্ক্ষার বুঝি শেষ নাই। এই আকাঙ্ক্ষা যেমন তাহাকে মহাশক্তির অধীশ্বর করিয়াছে তেমনি মহাজ্ঞানের ও অধিকারী করিয়াছে। মানুষের এই শক্তি

ভূমিকা

ও জ্ঞান মানুষের কল্যাণে নিযোজিত হইয়া আজ মানুষের জীবন কত সুখকর করিয়াছে। এই সকলের মূলেই মানুষের অনুসন্ধিৎসা—মনের চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। এইত সেদিন মানুষ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ এভারেষ্ট শিখরে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া আরোহণ করিল। আবার চলিল তুষার শীতল মৃত্যু হিম দেশ কুমেরুর পথে। সেখানে কেন্দ্র-বিন্দুতে পৌঁছিয়া সেখান-

কার কত তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিল। এই ভাবে চলিয়াছে দিকে দিকে মানুষের অভিযান। যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন তাহার এই অভিযান স্পৃহা থাকিবে—এ স্পৃহা না থাকিলে মানুষ জড় হইয়া যাইত। আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষাটিও মানুষের বহুদিনের। এজন্য মানুষ বড় কম কষ্ট সহ্য করে নাই। কত শত লোক মৃত্যু বরণ করিয়া মানুষের এই আকাশে ওড়ার কল্পনাটি সত্যে পরিণত করিয়াছে। আজ আকাশের সর্বত্র সে সেচ্ছাগতি—পৃথিবীর কোন ঠিকানায় যাইতে আজ আর তাহার কোন বাধা নাই।

আকাশ হইতে মহাকাশ

কিন্তু এইখানেই মানুষের গতি স্তব্ধ হয় নাই। তাহার চেষ্টা শান্ত হয় নাই। আকাশের পর মহাকাশ রহিয়াছে। সেই মহাকাশে মানুষের যাত্রা নিষেধ। সেখানে পৃথিবীর মানুষের কোন কোন প্রাণীর জীবন্ত থাকা সম্ভব নয়। এই মহাকাশ বা মহাজাগতিক রাজ্যে বিচিত্র রহস্য জানিবার কৌতূহলে মানুষ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অসীম আকাশে অনন্ত বিস্তারি অবকাশের রাজ্যে গ্রহ তারকা খচিত দেশে যাইবার জন্য মানুষের মধ্যে ঐ দেশ সম্বন্ধে তথ্য সন্ধানের তোড়জোড় সুরু হইল। গ্রহান্তরে বিহার করিবার স্বপ্নে বিশেষতঃ নিকটতম গ্রহ চন্দ্রে যাইবার স্বপ্নে মানুষ বিভোর হইল। নানা প্রকার যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া মানুষ সেই দেশে প্রেরণ আরম্ভ করিল। এই ভাবে সেই অপূর্ব রাজ্যের খবরও তথ্যাদি সংগ্রহে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতে লাগিল।

শূন্যে রকেট প্রেরণের ইতিহাস

খ্রীঃপূঃ ১২৩২ সালের আগেও আকাশে হাউয়ের মত বাজী ছুড়িবার কৌশল চীন দেশে আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৩৭৯ সালের এক যুদ্ধে এক রকেটের ব্যবহারের কথা ইতালীর একজন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সব রকেট্ নির্মাণ কৌশলে খুব নিকৃষ্ট ছিল। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবেও ইহাদের মধ্যে অভিনবত্ব থাকিলেও কার্যকারিতায় তেমন সার্থক ছিল না। রকেট্ তৈয়ারীর কৌশল অতি সাধারণ। রকেটের পেটের মধ্যে কঠিন বা তরল জ্বালানী থাকে। রকেট্‌কে এমন ভাবে তৈয়ার করা হয় যে ইহার মধ্যকার জ্বালানী হইতে গ্যাস তৈয়ার হইয়া লেজের মধ্য দিয়া তাহা বাহির হইবার সময়ে বিপরীত ধাক্কায় রকেটকে উর্ধ্বগামী করে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে রকেট্

তৈযারীর কলা-কৌশলেরও প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে। গত যুদ্ধে হল্যাণ্ড হইতে জার্মাণরা যে v-2 রকেট্ ছাড়েন তাহা লণ্ডনে তথা সারা বিশ্বে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার করিযাছিল। এই v-র রকেট্ ৭৫ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া দুইশত মাইল পর্যন্ত যাইতে পারিত। এই রকেট্ মানুষের মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের তালিকায় একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। এক্ষণে হাইড্রোজেন বোমা ঘণ্টায় ১৫,০০০ মাইল বেগে ধাবিত হইযা যে কোন দেশকে মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে পারে। ইহাকে বলে "ব্যালেষ্টিক মিসিল।"

স্পুটনিক

১৯৫৭ সালের শেষ ভাগে একটি বিরাট রকেট্‌কে রাশিয়া শূন্যে মহাজাগতিক রাজ্যে প্রেরণ করিযাছে। ইহা এরূপভাবে নির্মিত হইযাছে যে পৃথিবীর চতুদিকে ইহা চন্দ্রের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিবে এবং ইহা আপনার চতুর্দিকেও পৃথিবীর ন্যায় ঘুরিবে। ইহারই নাম স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ। এই উপগ্রহ পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর আরো বিপুলকায স্পুটনিক নং ২ এর মধ্যে একটি জীবন্ত কুকুরকে বিশেষভাবে নির্মিত আধারে করিযা পাঠান হয়। মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়া এই কুকুরের উপর কি রকম হয় তাহা পরীক্ষা করার জন্যই তাহাকে এইভাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কুকুরটির নাম "লাইকা"। আমেরিকায় এইরূপ কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। প্রথমে

আমেরিকার "১৯৫৮ আলফা"

যে প্রচেষ্টাটি হয তাহা সার্থক হয় নাই। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেই উপগ্রহ ছাডার পর নিম্নে নামিয়া আসে। তৎপরে ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী আমেরিকা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম "১৯৫৮ আলফা"— ইহা ঘণ্টায ১৯,৪০০ মাইল বেগে ধাবমান হইয়া ১০৬ মিনিটের মধ্যেই প্রথবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে। কামানের গোলার ন্যায আকৃতি বিশিষ্ট এই বিচিত্র বর্ণের উপগ্রহটিকে 'জুপিটার সি' রকেটের সহাযতায় শূন্য লোকেয় কক্ষে স্থাপন করা হয়। ইহার ওজন ত্রিশ পাউণ্ড। রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ দুইটির তুলনায ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার "১৯৫৮ আলফা" অপেক্ষাকৃত বেশী সময় টিকিযা থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ইহা আড়াই বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে। ইহাতে যে সকল যন্ত্রপাতি রাখা আছে সেগুলি উপগ্রহের অভ্যন্তরে ও বাহিরেয তাপমাত্রা ও

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য প্রেরণ করিবে। ইহার মধ্যে দুইটি রেডিও ট্রান্সমিটার রাখা হইয়াছে। তাহা হইতে সঙ্কেত প্রেরিত হইবে।

সোভিয়েট স্পুটনিক আপন অক্ষের উপর আবর্তিত হইবে ও শূন্যে ভ্রমণ করিবে কিন্তু আমেরিকার উপগ্রহ আপন অক্ষের উপর আবর্তিত হইবে না। সোভিয়েট স্পুটনিক আপনিই স্বাবলম্বী হইয়া আকাশ ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহটিকে কক্ষ পথে স্থাপনের জন্য চার পর্যায়ে রকেট নিয়োগ করা হইয়াছে। মার্কিন উপগ্রহও তাহাকে প্রেরণকারী রকেটের পর্যায়ে রকেটটি একই ইউনিট হিসাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ ঔজ্জ্বল্যের দিক হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর তারকার ন্যায় খালি চোখে উহা দেখা যাইবে না। উহার অক্ষপথের সর্বাপেক্ষা নিকবর্তী স্থানটি পৃথিবী হইতে ২০০ মাইল এবং সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানটি প্রায় ১০০০ মাইল। ইহার অপর একটি নাম "এক্সপ্লোরার।" এই উপগ্রহের জনক ডাঃ ওয়ার্ণার ফন ব্রাউন। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাজাগতিক রশ্মি ও অয়ন মণ্ডলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কা-কণা সম্পর্কে বহু তথ্য জোগাইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। প্রথম রুশ স্পুটনিকের গতি মন্দীভূত হইয়াছে। ইহার উদ্ভাবকদের ধারা যে তাহা শীঘ্রই বায়ুমণ্ডলের ঘনীভূত স্তরে প্রবেশ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি গুজব রটিয়াছে যে রাশিয়া একটি তৃতীয় স্পুটনিক আকাশে প্রেরণ করিয়াছে।

রুশ স্পুটনিক ও আমেরিকান উপগ্রহের পার্থক্য

রাশিয়া সমস্ত জগৎবাসীকে চমকাইয়া দিয়া একদা ঘোষণা করিল যে ১৯৬১ সালের মার্চমাসে দুইবার মানুষের ওজনের পুতুল চালকের স্থানে স্থাপন করিয়া দুইটি কুকুরকে তাহারা মহাকাশ পরিক্রমা করাইয়া ফিরাইয়া আনিযাছে। তৎপরে রাশিয়া ১২ই এপ্রিল ঘোষণা করিল যে সোভিয়েট বিজ্ঞানী ইউরি গাগারিন ভোষ্টক নামক মহাকাশ যানে (রকেট্) চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নিরাপদে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গাগারিনের বয়স ২৭ বৎসর। তিনি ১৯৬১ সালে কলিকাতা বাসীকে সশরীরে দেখা দিয়াও যান। এরপর প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মী মার্শাল টিটভ্ ও মহাকাশ অভিযান করিলেন। রুশ মহিলা অভিযাত্রী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভ ও অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন।

মানুষের মহাকাশ অভিযান

এই অভিযান গুলি মানুষের খেয়াল খেলা মাত্র নহে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন

যে এইভাবে মানুষ মহাব্যোমের তথ্য সংগ্রহ করিষা অদূর ভবিষ্যতে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাত্রার কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত্ব করিতে সক্ষম হইবে। এই উপগ্রহ হইতে হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করায় যে সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে বিশ্ববাসী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পরিযাছে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভ বুদ্ধি নিশ্চয়ই তাহাকে কল্যাণের পথে চালিত করিবেই। অন্ততঃ প্রত্যেক ভারতবাসী ত ইহাই কামনা করে।

উপসংহার

জননেতা জওহরলাল

ব্যক্তিত্ব মানুষকে স্বতন্ত্র করে। অপর সাধারণ লোক হইতে ব্যক্তিত্ব বলে মানুষ প্রাধান্য লাভ করে এবং লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে। এই ব্যক্তিত্ব সহজে জন্মে না। সাধনা বলে আপনার মনকে সংযত করিয়া মানুষ এই বিরল গুণেব অধিকারী হন। জওহরলালের এই ব্যক্তিত্ব ছিল এবং ছিল চৌম্বক শক্তি। এই জন্যই তিনি সহজে ভারতেব নেতৃত্ব করিতে পারিযাছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখদুর্দ্দশা দেখিযা তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল আর ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণের দাবী তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন। ভালবাসিতেন ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের জন-সাধারণকে। এই ভালবাসার প্রভাবে তিনি জনচিত্ত জয় করিয়া একজন গণনেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ইহার কারণ তিনি বিশ্বমানবকে ভালবাসিতেন। কদাচ তাঁহার আচরণে বা বাক্যে জাতি বৈরের ভাব প্রকাশিত হয় নাই।

ভূমিকা

২৭শে মে, বুধবার ১৯৬৪ সালে দ্বিপ্রহরে সহসা বেতারে এক নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইল—ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল আর ইহজগতে নাই। সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল এই শোকবার্তা। পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া গেল মুহূর্তে। এত বড় শান্তির দূত বিশ্বনেতা বুঝি আর কোনদিন জন্মে নাই। যুদ্ধের আতঙ্কে আতঙ্কিত বিশ্ববাসী চাহিয়াছিল আশা ভরা দৃষ্টিতে জওহরলালের দিকে—শান্তি তাহাদের কাম্য আর জওহরলাল ছাড়া সেই শান্তির বাণী আর কে প্রচার করিবে। ২৮শে মে যমুনার নীল জলতরঙ্গে জওহরলালের চিতাভস্ম সপ্তসমুদ্রে বাহিত হইয়া গেল। পরে এই শান্তি দূতের চিতাভস্ম এরোপ্লেন হইতে সারা ভারতময় বর্ষিত হইল। নেহরু আজ ভারতের মাটিতে, ভারতের ঘরে ঘরে, ভারতের শস্যক্ষেত্রে, পাহাড়ে, নদীতে, ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিলেন।

মহাপ্রয়াণে জওহরলাল

১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে জওহরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মতিলাল নেহরু ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ কিন্তু সম্পূর্ণ অঙ্গীভাবাপন্ন পুরাদস্তুর সাহেব। তিনি ওকালতি করিতেন। জওহর পিতার একমাত্র পুত্র। শৈশব শিক্ষার ব্যাপারে মতিলাল অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং পুত্রকে গৃহেই লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। ফার্ডিনাণ্ড টি ব্রুক্‌স্ নামক একজন আইরিশ গৃহশিক্ষকের নিকট জওহরের শৈশব পাঠ শুরু হয়। একজন পণ্ডিত জওহরলালকে হিন্দী ও সংস্কৃত শিখাইতেন। সম্পূর্ণ ইংরাজীখানার মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্য জওহর ইউরোপীয় ভাবধারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় আদর্শ ও ইংরেজী ভাবধারা অতি সহজেই সংমিশ্রিত হইয়া এক মহান্ আদর্শে রূপায়িত হইয়াছিল। ১৯০৫ সালে জওহর এবং তাঁহার ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী পিতামাতার সহিত ইংলণ্ড গমন করে। হ্যারো স্কুলে জওহরলালের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হ্যারো স্কুল আবাসিক এবং ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিষ্টার উড্। হ্যারোর বিচিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা জওহরকে প্রকৃত মানুষ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া মিষ্টার উডের ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। ছাত্র জীবনে গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত তাঁহার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয় এবং রাজনীতির প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। ১৯০৭ সালে জওহর ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। রসায়ন,

জন্ম, বাল্যজীবন ও শিক্ষা

ভূতত্ত্ববিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পাঠ্যক্রম লইয়া তিনি ক্যামব্রিজের Tripos হইলেন। ইহার পর লণ্ডনে আসিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে লাগিলেন এবং ১৯১২ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করিলেন।

জওহর আইন ব্যবসায়ে যোগদান করিলেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে কাজ শুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হইয়াছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে। জওহর কোর্টের কাজ করেন আর স্বদেশী আন্দোলনের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইতিমধ্যে প্রথম মহাসমর বাধিল। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনার পর ভারতে ফিরিলেন। ভারতে তখন বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছে। যুদ্ধকালে নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করেন নাই। কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতবাসীকে কোন রাজনৈতিক সুবিধা বা স্বাধিকার না দিয়া ব্রিটিশ সরকার যখন রাউলাট্ আইন প্রবর্ত্তন করিলেন তখন দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইলেন। তারপর আসিল মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড সংস্কার। মতিলাল এই সংস্কার গ্রহণের পক্ষে কিন্তু পুত্র জওহরলাল বিপক্ষে। রাউলাট্ আইনের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষিত হইল। তারপব পাঞ্জাবে হত্যাকাণ্ড—জালিয়া-ওয়ালাবাগ্। অমৃতসরের এক পার্কে বিশ হাজার লোকের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষিত হইল। এই হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে তদন্তের ভার লইলেন দেশবন্ধু আর তাঁহার সহাকারী হইলেন জওহর। জওহর এইভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিলেন। প্রথমে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন জওহর বেরিলীতে—। এদিকে মতিলাল গান্ধীর পাশে দাড়াইলেন। ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া ধরিলেন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ। সুভাস, দেশবন্ধু ইত্যাদির পাশে আসিযা দাঁড়াইলেন জওহর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের যুদ্ধে জওহর একজন নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। গান্ধীর সান্নিধ্যে তিনি এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইলেন। জেলে গেলেন বার বাব। ক্রমশ হইযা উঠিলেন একজন প্রথমশ্রেণীর নেতা। আন্দোলনের পর আন্দোলনের তরঙ্গে ভারতবর্ষ ভাসিতে লাগিল, অগ্রসর হইতে লাগিল বহু ঈপ্সিত পূর্ণ স্বাধীনতাব পথে। অবশেষে বহু ত্যাগ স্বীকারের পর ভারতবাসী স্বাধীন হইল কিন্তু 'পাকিস্তান' নামক দুই বিশাল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া গেল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বদেশী আন্দোলন যোগদান

জওহর দক্ষ নাবিক, বহু ঝড় তুফানে পাড়ি দিয়াছেন। তিনিই স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী হইলেন আর দেশকে নানা পরিকল্পনার মধ্যদিয়া সমৃদ্ধির পথে চালিত করিতে লাগিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী জাতির জীবনে এক দুর্যোগ নামিয়া আসিল।

নব ভারতের রূপকার

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন। নেহরুর মহাআশ্রয়, পরামর্শদাতা, মন্ত্রগুরু আজ নেই। কিন্তু দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার প্রিয় মহা কর্ত্তব্যের ভার পড়িয়াছে।

"দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুশিয়ার!"

১৯৫১ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হইলেন রাষ্ট্রপতি আর জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী। তাঁহাদের সহকারী লৌহমানব প্যাটেল। ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াইতেছে—দেশবিদেশে তাহার কত বন্ধু—তাহার পতাকা শান্তির পতাকা—সহাবস্থানের নীতিতে তাহার গভীর আস্থা। পৃথিবীর শান্তি কিসে আসে সেই ভাবনায় নেহেরু নিরন্তর আকুল, যাকুর মত দেশবিদেশে ঘুরিতেছেন। বৎসরের পর বৎসর যায় আমাদের প্রিয় জননেতা দেশকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলেন কিন্তু সহসা একদিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ২৭শে মে নয়াদিল্লীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নেহরু ভাবুক ও কর্মবীর ছিলেন, ছিলেন বাস্তববাদী কর্মী। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল। সেইজন্য তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে একটি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসিতেন মনে প্রাণে, ভারতবাসীর কল্যাণ ছিল তাঁহার একান্ত ঈপ্সিত। নবভারত গঠনে

উপসংহার

তাঁহার দান দেশবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ হৃদযে স্মরণ করিবে। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপনে নেহরুর দান অমূল্য। এই মহান্ জাতির ঐতিহ্য তাঁহাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়াছে। জওহরের দৃষ্টান্তে দেশের সন্তানগণ উদ্বুদ্ধ হইলেই দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ।

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন-আসাম

ভারতবর্ষের এই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যটিকে প্রকৃতি আপনার অঙ্কের মধ্যে সস্নেহে সতর্কতার সঙ্গে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। ইহার একদিকে তিব্বত ও ভুটান, আরেক দিকে ব্রহ্মদেশ, আরেক দিকে পূর্ব পাকিস্তান। অসংখ্য পর্বতমালা ও অরণ্যে সমাকীর্ণ এর উত্তরে হিমালয় পর্বত যেন ইহার উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি মেলিযা বহিয়াছে। এই দেশের আকাশ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন—অজস্র বৃষ্টিপাতের ফলে অজস্র শস্য সম্ভারে এই দেশ পূর্ণ। চা-বাগান, আখের ক্ষেত, অরণ্য সম্পদ, ফলফুল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীতে বিচিত্র এই দেশ। ইহা যেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া কত বিচিত্র পার্বত্য জাতির বাস এখানে।

ভূমিকা

এই রাজ্যের মোট ভূমির পরিমাণের শতকরা চল্লিশ ভাগ অরণ্য। এর সকল অরণ্যের কাষ্ঠ হইতে প্রতিবৎসর ১ লক্ষ ভেনেস্তা কাঠের চায়ের বাক্স তৈযারী হয়। এইসব অরণ্যে প্রচুর বাঁশ জন্মে এবং তাহা হইতে উত্তম কাগজ তৈয়ারী হয়। তাছাড়া এই সকল জঙ্গল হইতে বহু বেত সংগৃহীত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে চালান যায়। আসামের জঙ্গলে প্রায় ৭০ রকমের বিভিন্ন কাঠ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দশ-বারো রকমের কাঠ বর্তমানে নানা আসবাব-পত্রাদি তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

অরণ্য

এশিযার মধ্যে আর কোন দেশে আসামের মত এত বিচিত্র এবং দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু পাওয়া যায় না। আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এত জীবজন্তু নাই। আসামের জঙ্গলে একখড়্গধারী গণ্ডার প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বিরাটকায় গণ্ডার আসাম ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এছাড়া হাতী, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ, ধনেশ পাখী বিরাটকায় সর্প, বাঘ, চিতা প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। এই সমস্ত পশুপক্ষীকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে আসাম সরকার সাতটি অরণ্য এলাকাকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইভাবে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য হইল ইহাদের যথেচ্ছ শিকার বন্ধ করা।

পশুপক্ষী

আসাম পাহাড়ের দেশ। ইহার বুকের উপর অচঞ্চল স্থির তরঙ্গের মত কত পাহাড় ইতঃস্তত: দেখা যায়,—গারো, লুসাই, নাগা, খাসী, জয়ন্তী, মিকির—সবুজ লতাগুল্মে, বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারে, মনোরম হইয়া বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতির এই রম্য উপবনে কত না পার্বত্য জাতির বাস! স্বাধীন তাহাদের গতিবিধি, বিচিত্র তাহাদের বেশভূষা, অদ্ভুত তাহাদের রীতিনীতি, বিভিন্ন তাহাদের ভাষা! এই পার্বত্য জাতিদের মধ্যে নাগারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। ইহাদের সংখ্যা চার পাঁচ লক্ষ। বর্তমানে নাগাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পর্বত

অন্যান্য পাহাড়ী জাতি অপেক্ষা নাগারা দুর্ধর্ষ। ইহারা আধুনিক সভ্যতা পছন্দ করে না। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়াও ইহারা আদিম জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে। নাগা পাহাড়ে বাস করে বলিয়া ইহাদের নাম নাগা। পাহাড়টি অত্যন্ত দুর্গম। ইহার জাপ্‌পু শৃঙ্গ সর্বাপেক্ষা উচ্চ। নাগাদের আবার অনেক শাখা যেমন, আঙ্গামি, সেমা, আও, লোটা কাচা, কনিযাফ প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কনিযাফরা সর্বাপেক্ষা অশিক্ষিত। ভিন্ন ভিন্ন নাগা শাখার ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। ইহাদের গ্রাম পাহাড়ের উপর অবস্থিত—ঠিক যেন এক একটি সুরক্ষিত দুর্গ। সব ঘরবাড়ী একই ছাঁদের। ইহারা মানুষের মাংস ছাড়া আর সব রকমের পশুপাখীর মাংস খায়। লাউয়ের খোলের মধ্যে ইহারা এক রকমের মদ্য তৈযারী করিয়া রাখে—ইহার নাম লাউপানি। এই মদ ইহাদের খুব প্রিয। নাগাদের জীবনযাপন প্রণালী অদ্ভুত। ইহারা সমাজের মধ্যে অনেক আইন কানুন করিয়াছে। এগুলি পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হয়। বর্তমানে আসামের পার্বত্য জাতিগুলির কল্যাণের জন্য ভারত সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাদের কতক কতক এখন লেখাপড়ায় অনুরাগী হইয়াছে।

নাগা ও অন্যান্য পার্বত্য জাতি

'অসমীয়া' ভাষা বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা। এই ভাষাই আসামের রাজ্য ভাষা। আসামে 'আহোমরা' একটি সম্প্রদায়। আহোম মাত্রই অসমীয়া। আহোমদের নিজস্ব ভাষা আছে এবং লিখন রীতিও আছে। এছাড়া পাহাড়ীয়াদের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা—তাহাদের অধিকাংশের বর্ণমালা বা লিখন রীতি নাই।

আসামের ভাষা

প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেই সংস্কৃতি সেই দেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বহু বাঙ্গালী অসমীয়া ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বাংলা ও আসামের হৃদয়ের যোগসাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

অসমীয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ 'কামরূপ শাসনাবলী' গ্রন্থে আসামের অতীত ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ডঃ সূর্য্যকুমার ভুইঞা বহু সরকারী রেকর্ড হইতে আসামের বহু বুরঞ্জীর সম্পাদন করেন। তদানীন্তন রাজ্যপাল জয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে শিলঙে একটি ইতিহাস পরিষদ গঠিত হইযাছে। এই পরিষদ আসামের ইতিহাস উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন নাথ ইংরেজীতে 'The Background of Assamese Culture' এবং অসমীযা ভাষায় 'গৌরবময় আসাম', ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত করিযাছেন। আসামের সতী জয়মতীর কাহিনী আসামের ইতিহাসের এক গৌরবময অধ্যায়। এই রাজমহিষীর আত্মত্যাগের কাহিনী শ্রীহট্টের গোপাল কৃষ্ণ দে নামক বাঙালীই প্রথম লোকলোচনের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেন। বর্তমানে অসমীয়া সাহিত্যও ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। অসমীয়া ভাষায় এখন বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি অনূদিত হইতেছে। কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া প্রভৃতি সাহিত্যিক আজ আসামের কাব্যকুঞ্জ মুখর করিয়া তুলিযাছে।

প্রত্যেক দেশের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেই সংস্কৃতির নদী-ধারা আসিয়া ভারতের সংস্কৃতি-সাগরকে বৈচিত্র্যময় করিতেছে।

উপসংহার

আসামের সংস্কৃতি ধারা বেগবতী হউক—ভারতের সংস্কৃতি গঠনে তাহা সহায়ক হউক। ইহাই আমাদের কামনা।

ভারতবর্ষের একটি সুপ্রাচীন তীর্থ—কামাখ্যা

সূচনা

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী। সারা ভারতময় নানা দেবদেউল ও তীর্থ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসীকে ধর্ম্মে উদ্দীপনা দান করিয়া আসিতেছে। পুরানে এই সকল দেবদেউল ও তীর্থ ইত্যাদির সুপ্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে এই সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভারতবাসী মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়। কামাখ্যা তীর্থ আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলায় অবস্থিত। ভারতবর্ষের তীর্থ স্থানগুলির মধ্যে ইহা একটি প্রধান তীর্থ। কামাখ্যা পাহাড়ের উপর এই দেব-দেউল প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যে কামাখ্যা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌহাটি হইতে পদব্রজে এই মন্দিরে পৌছিতে আধঘণ্টার মত সময় লাগে।

কামাখ্যা সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী

দেবাদিদেব শিব দক্ষের কন্যা সতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু দক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোনদিন শিবের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন না। ভোলানাথ শিবের সর্ব্বত্যাগী উদাসীন ভাবটি তিনি ঠিক মত উপলব্ধি করিতে পারিতেন না এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। নিজ কন্যা সতী শিবের ন্যায় সন্ন্যাসী আপনভোলা পাগলের হাতে পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। একদা দক্ষ একটি যজ্ঞ করিয়া শিব ছাড়া অপর সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করেন—শিবকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী দক্ষের এই যজ্ঞে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু সতী পিতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া এই যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণেই শুদ্ধ মাত্র স্নেহের দাবীতে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তিনি বুঝিতে পারেন যে এ যজ্ঞে আসা তাঁহার ঠিক হয় নাই। দক্ষ সেই যজ্ঞস্থলে অন্যান্য সকল দেবতার সম্মুখে শিবের নিন্দা সুরু করেন। তাহা শুনিয়া অপমানে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

শিব এই সংবাদ পাইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তমা সতীর 'বিচ্ছেদে রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ভূত, প্রেত, পিশাচাদি সহ যজ্ঞস্থলে

উপস্থিত হ'ন এবং যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দক্ষের মুণ্ড ছেদন করিয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে দক্ষের পত্নী প্রসূতির সাধ্য সাধনায় দক্ষের কর্তিত স্কন্ধে ছাগলের মুণ্ড বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিয়া শিবকে অবহেলার সমুচিত শাস্তি দেন। সতীর মৃতদেহ শিব স্কন্ধে লইয়া ত্রিভুবন পরিক্রমন করিতে থাকিলে বিষ্ণু শিবকে ভারমুক্ত করিবার জন্ম সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিতে থাকেন। সতীর দেহের এক একটি অংশ যেখানে যেখানে পতিত হয় সেইখানে এক একটি তীর্থ গড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষে এইরূপ ৫২টি তীর্থ গড়িয়া উঠিযাছে। ক্যামাখ্যা এই ৫২ টি পিঠ বা তীর্থস্থানের অন্যতম।

কামাখ্যা তীর্থের বর্ণনা

কামাখ্যা একটি ছোট শহর। এখানে কয়েকটি দোকান, একটি বাজার, একটি ডাকঘর, একটি ডাক্তার খানা আছে। ইহা প্রধানতঃ পাণ্ডাদের বাসস্থান। এই পাণ্ডাদের সহিত কামাখ্যা দেবীর পুরোহিতদের ব্যবস্থা থাকায় ইঁহারাই মন্দিরে আধিপত্য করেন। মন্দিরে দেবীর দর্শনার্থী ও পুজার্থীদের এই পাণ্ডাদের মধ্যস্থতা ছাড়া পূজা দেওয়া বা দেবীর দর্শন সম্ভব নহে। ইঁহারা তীর্থ যাত্রীদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং পুজাদি প্রেরণের সকল ব্যবস্থা করেন। তবে তাহারা এই আতিথেয়তার ও সেবার পরিবর্তে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য গ্রহণে উদাসীন থাকেন না। নিরীহ এবং ভক্তিপরায়ণ তীর্থ-যাত্রীদের উপর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চাপ দিয়া অত্যধিক অর্থ আদায় করিতে তাহারা কখনও নিরুৎসাহ হন না। অধুনা অবশ্য এই সকল জোর জবরদস্তি হ্রাস পাইয়াছে।

কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য

সতীর দেহাংশ এইস্থানে পতিত হওয়ায় এই তীর্থের মাহাত্ম্য অত্যন্ত অধিক। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারী এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্মপিপাসা নিবৃত্ত করেন। জুনমাসে অম্বুবাচি উপলক্ষে এইস্থানে সর্ব্বাধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শত শত ছাগ ইত্যাদি এই উপলক্ষে বলি প্রদত্ত হয়। এই সময় ধূপধূনার সুরভিতে মন্দিরাভ্যন্তর, মন্দিরের চারিপার্শ্ব আমোদিত হইয়া উঠে। ঘণ্টাধ্বনির অবিরত স্বননে চতুষ্পার্শ্ব মুখরিত হইয়া উঠে এবং দেবীর পূজার সময়ে মনে হয় যেন দেবী প্রাণময়ী হইয়া ভক্তদের পূজা সানন্দে গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার সময়ে

যখন অন্ধকারের কৃষ্ণাঞ্চল কামাখ্যা পাহাড়ের উপর বিস্তৃত হয় এবং চতুর্দ্দিক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসে তখন দেবীর আরত্রিক সুরু হয়। আরতি প্রদীপের প্রোজ্জ্বল শিখায় দেবীর মুখ দিব্য আলোকিত হইয়া উঠে এবং ঘণ্টাশব্দে যেন তাঁহার মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া যায়। ধ্যানস্তব্ধ অগণিত ভক্ত নর-নারীর হৃদয়ের ভক্তিতে যেন স্থানটি স্বর্গে পরিণত হয়। এই সময়ে সারাদিন ধরিয়া মন্দিরের বাদ্য ধ্বনি চলিতে থাকে এবং দেবীর দর্শনার্থী নরনারী আনাগোনা করিতে থাকে। সকলের যুক্তপাণি ভক্তিনম্র ব্যবহার দেখিয়া ভক্তিহীনের প্রাণেও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। স্তোত্র, স্তবাদির শাস্ত্রগম্ভীর ভক্তি রসাশ্রিত কণ্ঠস্বরে দেবী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া জাগ্রতা হইয়া পূজা ও আবেদন গ্রহণে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভুবনেশ্বরী মন্দির

কামাখ্যায ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটিও একটি আকর্ষণীয স্থান। কামাখ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে এই মন্দির স্থাপিত। ইহা প্রকৃতির সবুজ বর্ণ সুষমার পটভূমিকায় বিটপী শ্রেণীর মধ্যে অতি সুন্দর পরিবেশে স্থাপিত। ইহার চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের নিস্তব্ধ শ্রেণী—যেন সাগরের কয়েকটি অঞ্চল তরঙ্গ। আহা! কী সুন্দর শোভারাজীর সমাবেশ! মনে হয় ভুবনের ঈশ্বরীর মন্দির এমন সুন্দর স্থানেই বুঝি সর্ব্বাধিক মানায়!

উপসংহার

হিন্দুর নিকট ভারতের প্রতিধূলিকণা পবিত্র। তন্মধ্যে আবার এই সকল তীর্থ এবং নদনদী ততোধিক পবিত্র। ভারতে অগণিত তীর্থ, তাই ভারতকে তীর্থময বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায গর্ব্বিত ভারতবাসীদের অনেকে এই সকল তীর্থাদি সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিযা থাকেন কিন্তু এই তীর্থ গুলিই ভারতের অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি। ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের সুরে বাঁধা। সেই ধর্ম্মের সুরের তাল লয় সম্বলিত এক একটি তীর্থরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল তীর্থে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া ভক্তদের আকুতি না দেখিলে ইহাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। দিনে দিনে যুগে যুগে ভারতবর্ষের এই তীর্থগুলি যেন ক্রমশঃ অধিক মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উৎসরূপে ভারতবাসীর প্রাণে ভক্তিবারি সেচন করিযা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং অধর্ম্মের অসারত্ব প্রদর্শন করিযা দেদীপ্যমান হইযা উঠিতেছে।

— —

শিলং-এর প্রাকৃতিক শোভা

আসামের রাজধানী শিলং শহরটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহাপীঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খাসী ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শিলংএর শোভা 'অতুলনীয়' বলিলে মনে হয় যেন বক্তার ভাষার দৈন্য বশতই এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। কারণ, অরণ্যশোভা, পুষ্প-বিটপীর বর্ণালী, সৌর কিরণের ঝিকিমিকি—পাহাড়ের গাযে ছায়ারৌদ্রের ক্রীড়া-কৌশল.ক বর্ণনা করিবে—চিত্রকর যে ছবি আঁকিয়া শিলংএর বর্ণোজ্জল রূপ আঁকিবে তাহারও উপায় নাই—মানুষ সে রং কিভাবে তৈয়ারী করিবে তাহা অদ্যাবধি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বৃক্ষলতা, ফলপুষ্প, প্রজাপতি, কীট-পতঙ্গ, পাখী এদের গায়েরই বা কত রকম রং। আহা। পুষ্পগুলি আপনাতে আপনি বিকশিত হইযা আপন গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া দুলিতেছে—চক্ষু সে সৌন্দর্যের স্মৃতি বুঝি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবে না। তাই সৌন্দর্য্য পিপাসুদের শিলং যেন অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধিয়া আকর্ষণ করে।

ভূমিকা

দার্জ্জিলিং ও শিমলার ন্যায় শিলং স্বাস্থ্যলোভীদের পক্ষে কাম্যস্থান। এই দুই স্থানের ন্যায় শিলং ও গ্রীষ্মকালে পরম প্রীতিপ্রদ। শীতকালে অত্যন্ত শীতাধিক্য বশতঃ বিদেশীদের নিকট আসাম মোটেই প্রীতিপ্রদ মনে হয় না। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে নব-নারী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বা ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে এখানে দলে দলে সমাগত হয।

শিলং শহর

শিলং আসামের রাজধানী। আসামের রাজ্য-সরকারের স্থায়ী আবাস এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। আসামের শাসনব্যবস্থা এখানকার গর্ভমেণ্ট হাউস এবং সেক্রেটারিযেট দপ্তর হইতে পরিচালিত হয়। শিলং-এর পরিষদ্ গৃহ অতি মনোরম। এখানে আসাম রাজ্যের জন-প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া সরকারের সমুদয় কার্য্য নিযন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন। শিলংএ দুইটি বৃহৎ বাজার আছে—পুলিশ বাজার এবং বড বাজার। জেলরোড ও থানা রোডেই শহরের বড বড প্রসাদগুলি রহিয়াছে। এই দুই প্রধান সডকের দুই পাশের মনোরম সৌধশ্রেণী চন্দ্রালোকিত রাত্রে বডই সুন্দর দেখায়। আসামে বহু কলেজ ও স্কুল আছে। ইহা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। গভর্ণমেণ্ট

শিলং এর বিবরণ

হাউসের সম্মুখের কৃত্রিম হ্রদ এবং নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলির প্রাকৃতিক ঝরণার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য শিলংএ বহু পর্য্যটকের ভীড় জমে। বীডন ও বিশপ ঝরণার সৌন্দর্যা বর্ণনা করার জন্য কবির লেখনীর প্রয়োজন। সারা শহর যে জলবিদ্যুৎ কারখানার বিদ্যুতালোকে আলোকিত হয় এবং সারা শহরের কলকারখানাগুলি যেখান হইতে সরবরাহ পায় সে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিও একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

অধিবাসী

আসামের নানা স্থানের অধিবাসীরা শিলংএ বাস করে এবং কার্য্য-কর্ম ব্যাপদেশে জমায়েত হয়। এদেশের অধিবাসীদের বিশেষতঃ নারীদের বিচিত্র বেশ-বাস এবং খাসিয়াদের সৌন্দর্য্য এখানকার সৌন্দর্য্যকে আরো বর্দ্ধিত করিয়াছে। যেখানে প্রকৃতি সুন্দর, সেখানে মানুষও সুন্দর হইবে বৈকি! সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আসামের অধিবাসীদের একটি বিশেষ গুণ। শিলং শহরটি খাসিয়া পাহাড়ের ৫০০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহার মত সুন্দর ও মনোরম স্বাস্থ্যনিবাস আর নাই বলিলেও চলে। খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে পৃথিবীব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইলেও শিলং শহরে বৃষ্টিপাত ৮০″ অধিক নহে। ইহাব কারণ শিলং শহরটি বৃষ্টিচ্ছায অঞ্চলে অবস্থিত।

আসামের ভূমিকম্প

আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীকে আপাততঃ স্থির ও নিরেট মনে হইলেও ইহা বাস্তবিক ওরূপ নহে। ইহা আপন অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতে হইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহা ছাডা অল্পকাল ব্যবধানে ইহা কম্পিত হয়। যদিও সে কম্পন আমরা ঠিকমত অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সম্প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ভূমিকম্পের বেগ ও স্থান নিরুপণ করা যায়। এই যন্ত্রের নাম "সিস্মোগ্রাফ্"।

ভূমিকা

ভূমিকম্প অল্পক্ষণ স্থায়ীও হইতে পারে আবার বহুক্ষণ স্থায়ীও হইতে পারে,

সামান্য হইতে পারে আবার ভয়ঙ্করও হইতে পারে। ইহা কম্পের বেগের উপর নির্ভর করে। অনেক ভূমিকম্প শুধু পৃথিবীকে একটু দোলা দিয়াই শেষ হয়। আবার মাঝে মাঝে ভূমিকম্প প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে মহা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিতে পারে। ইহার ফলে সাজানো শহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া বীভৎস আকার ধারণ করিতে বহুবার দেখা গিয়াছে। ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরির মুখ ফাটিয়া একবার যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে হারকিউলেনিয়াম্ ও পম্পেই শহর সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। লর্ড লিটনের লেখা "লাষ্ট্ ডেজ্ অব পম্পেই" নামক পুস্তকে এই ভূমিকম্পের বিবরণ অতি মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। বছর কুড়ি-পঁচিশ পূর্বে বিহারে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে বহু শহরবাসীর ধনপ্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে কোয়েটায় একটি সর্বনাশকর ভূমিকম্প ঘটে।

আসামের ভূমিকম্প

আসামের বুকে এক শতাব্দীর মধ্যে দশ বারোবার বেশ বড রকমের ভূমিকম্প ঘটিলেও গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৫০ সালে যে ভূমিকম্প ঘটে তাহার তুলনা অতি অল্পই মেলে। ১৫ই আগষ্ট ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন অন্যান্য রাজ্যের লোকের মত আসামের অধিবাসীবৃন্দ ঐ দিনের অনুষ্ঠানে সারাদিন আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। সন্ধ্যায় বহুস্থানে বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছিল—দীপমালায় সরকারী ভবন সকল আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল এমন সময়ে সহসা কয়েকবার উপর্যুপরি ভূমিকম্পের ধাক্কায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ধাক্কার বেগ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। অসহায় নরনারীর আর্ত্ত চীৎকারে গগন মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেকে বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহাদের বিশ্রামের আমেজ টুটিয়া গেল—অনেকে নৈশ আহারের আয়োজন করিতেছিল, সে সব ত্যাগ করিয়া ভীতভাবে চীৎকার করিতে করিতে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া খোলা জায়গায় জমায়েত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল এবং আত্মীয় পরিজনদের ডাকাডাকি করিতে লাগিল। তারপর এদিকে হুড়মুড় করিয়া বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে—ওদিকে বড বড় গাছ মড মড শব্দে কাত হয়—রাস্তার মাটি চড চড করিয়া চোখের সম্মুখে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতে লাগিল—

কোথাও ভূর্গভস্থ জল ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল।

এই ভূমিকম্পে আসামের অন্তর্গত উত্তর লখিমপুর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট ও শিবসাগর মহকুমার ক্ষতি সর্ব্বাধিক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আবার আসামের কতক কতক অঞ্চল এই ভূমিকম্পের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল

হওয়ায় ভূমিকম্পের বহুদিবসের পর পর্য্যন্ত অধিবাসীরা অনেক দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের বহু পর পর্য্যন্ত আভর ও মিস্‌মি পাহাড়ে অধিবাসীদের মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইযাছিল। রাস্তাঘাট অনেকগুলিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়— বিশেষতঃ আসাম ট্রাঙ্করোডটি ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছিল। ঘরবাড়ী একদিক হইতে ভূমিসাৎ হওযায় বহু লোককে আশ্রয়হীন হইতে হইযাছিল এবং খোলা আকাশের নীচে বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হইয়াছিল।

আসামের নদীতে বন্যা দেখা দেয় এবং ভূগর্ভস্থ ধাতু ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হইযা নদীর জল দূষিত করিয়া ফেলে। সে জল পান করার অযোগ্য হইয়া পড়ে। বহু মাছ দূষিত জলে মারা পডিয়া নদীবক্ষে ভাসিতে দেখা গিযাছিল। কয়েকটি নদীর স্রোতের গতি ভিন্নমুখী হইযা গিয়াছে। মোট কথা এই ভূমিকম্পের ফলে আসামের বহু নরনারী নিহত হইয়াছেন এবং অধিকাংশ নরনারী সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আসামের ধনপ্রাণ ক্ষতির পরিমাণ বড কম নহে।

ভূমিকম্পের ফলে আর্ত্ত আসামের অধিবাসীদের প্রতি দেশবাসীর সম-বেদনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং নানাস্থান হইতে ত্বরিতে সাহায্য প্রেরিত হইযাছিল। সরকার উড়োজাহাজে করিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বহিয়া আনিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া বহু লোককে মৃত্যুর

উপসংহার

হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবীরা আর্ত্ত নরনারীর সেবার মহৎ ভার গ্রহণ করিযা আসামে উপস্থিত হইয়া ইহাদের সাহায্য করিয়া বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

আসামের জাতীয় উৎসব

সকল জাতিরই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য একটি বিশেষ সময় আছে। সেই সময়ে সকলে মিলিত হইয়া তাহারা আনন্দ উৎসব করে। ধনী-দরিদ্র সকলেই নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে এই উৎসব করে। এই উৎসবের মধ্যদিয়া সেই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয়। সেই উৎসবের মধ্য দিয়া সেই জাতির প্রাণপ্রবাহ কল্লোলিত হইয়া উঠে। এই বিশেষ উৎসবকে সেই জাতির জাতীয় উৎসব বলে।

জাতীয় উৎসব

আসামের জাতীয় উৎসব **'বিহু'**। বিষুব সংক্রান্তির অপভ্রংশ বিহু। এই বিহু উৎসব আসামের সর্বত্র পালিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তি বা মহা-বিষুব সংক্রান্তির দিন যে বিহু উৎসব হয় তাহাকে বলে **'চত বিহু'** বা **'বহাগ বিহু'**। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতে আর একটি বিহু উৎসব হয়। ইহার নাম **'মাঘ বিহু'**। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে আবও একটি বিহু উৎসব হয়—তাহার নাম **'কাতি বিহু'** বা **'কাঙ্গালী বিহু'**।

বিহু

চৈত্র সংক্রান্তিতে যে বিহু উৎসব হয় তাহাই আসামের সর্বাপেক্ষা বড উৎসব এবং এই বিহুকেই আসামের জাতীয় উৎসব বলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে সুরু করিয়া বৈশাখের সাতদিন ধরিয়া বিপুল আড়ম্বরে, মহা আনন্দের মধ্য দিয়া সারা আসামে এই উৎসব চলে। আসামে এই উৎসবের বিশেষ নাম **রঙালীবিহু**। ইহার ন্যায় আনন্দ আর কোন উৎসবে হয় না বলিয়া ইহার এইরূপ নাম। রঙালী শব্দের অর্থ আনন্দময়। আনন্দের বন্যায় আসাম প্লাবিত হইয়া যায়। ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন, ঘরে ঘরে আনন্দের কলহাস্য—উচ্ছ্বসিত প্রাণের আনন্দময় অভিব্যক্তি।

চত বিহু, বহাগ বিহু বা রঙালী বিহু

প্রথম দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূজা অর্চনা হয়। এদিন ভাগ্য গণনা হয়। দ্বিতীয় দিন গৃহস্থরা স্নান করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে। উৎসবের কয়দিন দিবাভাগে কাহারও বাড়ীতে উনান জ্বলে না। নানাবিধ পিঠা খাওয়া কয়দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। 'বরা' নামক আটামুক্ত একপ্রকার ধান্যজাত তণ্ডুল গুঁড়া দ্বারা এই পিঠা প্রস্তুত হয়। পিঠাগুলির নাম ঘিলা পিঠা, খোলা ছপরীয়া, বড়পিঠা, ছেছা পিঠা, ভূরভুরিযা, বুককিযা, ফেনি পিঠা, খুর্মা পিঠা

উৎসবের বিবরণ

ইত্যাদি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন, **গরুর বিহু** হয়—গরুগুলিকে এইদিন স্নান করানো হয়। এইদিন বাড়ীর লোকেরা এক হাত লম্বা একটি বাঁশকে দুই তিন ভাগে চেলা করিয়া সেগুলি সূচ্যগ্র করে। তারপর তাহাতে লাউ, বেগুন, কয়লা, হলুদ এবং ন্যাসপাতির মত এক এক রকম টক ফল খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রথিত করে। ইহাকে 'ছাত' বলে। গরুকে স্নান করাইয়া এই ছাত দ্বারা গরুর গা ডলিয়া দেয় এবং বলিতে থাকে, "লাউ খা, বেঙ্গেনা খা, হালধি খা, বড ঠেকেরা খা ; মার সরু, বাপের সরু, তই হবি বর বর গরু"—পরে ছাতগুলি আনিয়া গেয়ালে রাখিয়া দেয়।

গরু স্নানের পর ছেলেমেয়েরা নতুন কাপড় পরিয়া 'নাম ঘরে' আসে। সেখানে হরি সঙ্কীর্ত্তন হয়। কীর্তনান্তে গামছা, চাউল, পান ও দক্ষিণা দিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়।

'গরু বিহু'র পরদিবস 'মানুহ বিহু'। এইদিন সকলে তেল-হলুদ মাখিয়া স্নান করে। কোন কোন সত্রে গুরু শিষ্যদিগকে এক প্রকার মিঠাই খাইতে দেয়—ইহাতে শিষ্যের আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। এই মিঠাই চালের গুঁড়া, গোলমরিচ, কর্পূর, লবঙ্গ, জায়ফল, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদির গুঁড়া সহযোগে তৈয়ারী হয়।

এক সপ্তাহ ধরিয়া পিঠা ভক্ষণ ও নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ চলে। ঢাক, ঢোল, বাঁশী, করতাল প্রভৃতির শব্দে আসাম মুখরিত হইয়া উঠে। এ ছাড়া ভাগ্যপরীক্ষা করার জন্য আমোদজনক জুয়াখেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, ডিমের খেলা ইত্যাদি আনন্দজনক খেলার মধ্য দিয়া সকলে এই কয়দিন অতিবাহিত করে।

এই সময়ে প্রকৃতিও নূতন বেশ পরিধান করিয়া যেন উৎসব সাজে সজ্জিত হইয়া উঠে। বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য শতধারে উৎসারিত হইয়া লোকের মনে আনন্দের বান ডাকায়। বিহু গীত মাধুর্যের গীত—মধুর ভাবের গীত—প্রেম ভালবাসার গীত। একটি গীতের নমুনা দেওয়া হইল—

হাঁহ হৈ চরিম গৈ তোমার পুখরীতে
পার হৈ পরিম গৈ চালত।
চরাই হৈ পরিম গৈ তোমার ফুলনীত
মাখি হৈ পরিম গৈ গালত।

অর্থ : আমি হাঁস হইয়া তোমার পুকুরে চড়িব। পায়রা হইয়া তোমার ঘরের চালে বসিব। পাখী হইয়া তোমার ফুল বাগানে ঘুরিব। মাছি হইয়া তোমার গালে বসিব।....

আসামের গ্রামাঞ্চলেই এই উৎসবের পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় এবং প্রাণবন্ত মাধুর্য দৃষ্টিগোচর হয়। নাগরিকরা উৎসবের আহারাদির দিকটাই জাঁকজমকসহকারে পালন করে।

শ্রীহট্টে আবার পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বিহু উৎসব পালন করে। এইদিন সেখানকার সকলে সকালে উঠিয়া স্নান করে। গৃহে পুলি পিঠা, রুটি পিঠা, মশকি পিঠা, কুলাকুলি পিঠা, দুধ চুবি বা চই মই পিঠা ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া মহানন্দে আহার করে। ঐদিন পিঠা ছাড়া আর কিছু আহার করে না। ছেলেমেয়েরা ভোরে স্নান করিয়া ২।১ দিন পূর্বে তৈয়ারী খোড়ো ঘরে আগুন দিয়া আনন্দ করে। এই ঘরকে 'মেড়ামেড়ির' ঘর বলে। নিম্ন আসামেও মাঘবিহু উৎসব হয়। সেখানে আগুন দিবার জন্য তৈয়ারী খড়ের ঘরকে 'পুঁজি' বলে। ইহারা মাসের প্রথম দিনের বিহুকে 'বড়বিহু' বলে। কামরূপে আবার 'বিহু''কে বলে 'দামাহি'।

মাঘ বিহু

আসামে কোন কোন অঞ্চলে কার্তিক মাসে বাংলা দেশের ন্যায় আকাশে আকাশ-প্রদীপ দেয়। এখানকার সত্রগুলিতে সন্ধ্যায় আকাশপ্রদীপ দেওয়ার প্রথা আছে। আকাশে প্রদীপটি কপিকলের সাহায্যে উঠাইয়া ইহারা গীত গাহিতে থাকে এবং বাদ্যকরেরা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। অসমীয়ারা আকাশ-প্রদীপকে 'আকা-বাটি' বলে। শিবসাগর জেলায় আউনী আটি সত্রে কাতি বিহুর দিন সন্ধ্যায় ২৪।২৫ জোড়া আকা-বাটি জ্বালান হয়। দণ্ডের সহিত সংযুক্ত আকা-বাটি টানাইবার চেঁচাড়ী দ্বারা নির্মিত চক্র ইত্যাদি দেখিতে অতি সুন্দর।

কার্তিক বিহু
বাঙালী বিহু

বিহু উৎসবের বিচিত্র আনন্দের মধ্য দিয়া আসামের প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় মিলে। যে মানুষ কাজ করে, সহস্র দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে নিয়ত ডুবিয়া থাকে সেও এই উৎসবের দিন বাঁধনহারা আনন্দের মধ্যে প্রাণের স্ফূর্তি উপভোগ করে। আপামর সাধারণ সকলেই এই জাতীয় উৎসবের অমৃত হ্রদে স্নান করিয়া নব উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। বিহু অসমীয়াদের বড় আনন্দের উৎসব—ইহা তাহাদের মনে যে রঙের ছাপ ধরাইয়া দেয় তাহা সারা বৎসর তাহাদের মনকে প্রদীপ্ত রাখে।

উপসংহার

আসামের অরণ্য

অরণ্য প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি, এই অরণ্যই আদিম বাসস্থান ছিল। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অরণ্য কাটিয়া লোকালয নির্মাণ করিযাছে —অরণ্য ত্যাগ করিযাছে। কিন্তু এখনও বহুস্থান অরণ্য রহিয়াছে এবং এই অরণ্য-ক্রোডে মাতৃ-ক্রোডে শিশুর ন্যায বহু মানুষ বসবাস করিতেছে।

ভূমিকা

আসাম প্রকৃতির লীলাভূমি। প্রকৃতি নিজের হাতে গড়া পাহাড ও অরণ্যে আসাম পরিপূর্ণ। এইসকল অরণ্যে বহু আদিবাসীদের বাস। ইহারা অরণ্যের দুলাল, প্রকৃতির সন্তান। আসামের উপব দিযা পর্বতশ্রেণী ও অরণ্য থাকে থাকে স্তবকে স্তবকে তরঙ্গায়িত হইযা গিযাছে। সমগ্র আসামের শতকরা চল্লিশভাগ অবণ্যসঙ্কুল। ইহাব প্রায এক-তৃতীযাংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বাকী অংশ আদিবাসীদের সৃষ্টি—তাহাবা পর্বতাঞ্চলে নিজ চেষ্টায় লাগাইযা বন সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আসামের অরণ্য

প্রতি বৎসর প্রায দুইলক্ষ চাযের বাক্সের প্লাইউড আসাম হইতে পাওযা যায়। কাগজ তৈযারীর উপাদান হিসাবে প্রচুর বাঁশ আসাম হইতে মিলে। আসাম হইতে প্রতি বৎসর এত বেত পাওয়া যায ভারতবর্ষের আর কোথাও এত মিলে না। প্রায ষাট সত্তর রকমের বিভিন্ন কাষ্ঠ আসামের জঙ্গল হইতে মিলে—ইহাদের মধ্যে মাত্র দশ বারো রকম বর্তমানে নানা কার্যে ব্যবহৃত হয।

আসামের অরণ্য-সম্পদ

এশিযার মধ্যে আসামের ন্যায অপর কোথাও এত বিভিন্ন প্রকারে জীবজন্তু নাই। আফ্রিকাকে বাদ দিলে জগতের মধ্যে আসামই বোধ হয় সর্ববৃহৎ জীবজন্তুর চিড়িয়াখানা। এত বিভিন্ন প্রকারের পশু, পাখী, সরীসৃপ ও পতঙ্গ আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক খড়্গা বিশিষ্ট গণ্ডার পৃথিবীর মধ্যে বিরলতম জীব—আসামে এরূপ গণ্ডার যত আছে পৃথিবীর আর কোথাও এত নাই। আসামের গণ্ডার এখন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণ্ডার বলিয়া স্বীকৃত। হাতী, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ, ধনেশ পাখী, কেউটে সাপ, আরো বহু রকমের সরীসৃপ আসমের জঙ্গলে পাওয়া যায়। বেঙ্গল টাইগার এবং চিতা বাঘও আসামের জঙ্গলে আছে। আসামে এখন সাতটি বন্যজন্তুর সংরক্ষিত এলাকা আছে। (১) তিরাপ সীমান্ত জাতীয় পার্ক, (২) পাভা স্যাংচুয়ারী—এখানে বন্য মহিষ আছে (৩) সোনাইরূপা

আসামের জীবজন্তু

—বন্য হস্তী, গাউর, সম্বর হরিণ, গণ্ডার এখানে থাকে, (৪) ওরাং রিসার্ভ, (৫) লাখোমা রিসার্ভ—গণ্ডার ও হরিণ আছে, (৬) খাজিরঙ্গ রিসার্ভ—একখড়্গ বিশিষ্ট গণ্ডার, বন্য মহিষ, শূকর, হরিণ, তিতির এবং বহু রকমের জলার পাখী এখানে আছে, (৭) মানস বা উত্তর কামরূপ স্যাংচুয়ারী—এখানে বন্য মহিষ, হরিণ, পেলিকান পাখী, বন্য হস্তী, গাউর, গণ্ডার, সম্বর এবং কুকুরের ন্যায় শব্দকারী হরিণ আছে।

প্রকৃতির অজস্র ঔদার্যে আসাম বৃক্ষলতা, ফল পুষ্পে শোভিত হইযা সৌন্দর্যের রাণী সাজিয়া অধিবাসীদের চিত্ত হরণ করে। সেই সুন্দরের মধ্যে হিংস্র জন্তুদের ও সরীসৃপদের ভযাল গতিবিধি প্রাণে ভযের সঞ্চাব করে। ভযাল ও সুন্দরের সমাবেশে আসামেব অরণ্য "ভীষণে মধুরে মেশা" আদিম অধিবাসীরাও হিংস্র জন্তুর মতই ভযাল কিন্তু তাহাদের মধ্যেও মাধুর্য রহিযাছে। তাহারা আপনাপন গোষ্ঠীপতিদের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং অরণ্যের ছাযায শ্যামলতা ও রুক্ষতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হয।

ভয়াল ও সুন্দরের সমাবেশ

আসামের নর্থ-ইষ্ট-ফ্রন্টিযার এজেন্সীতে আট লক্ষ অধিবাসীদের বাস। ইহারা ৩০।৪০টি উপজাতিতে বিভক্ত। এই অঞ্চলকে ছযটি ভাগে ভাগ করা হইযাছে। (১) কার্মেং ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনে; প্রধানতঃ মন্পা, আকা, মাজি, দাফ্লা, সেরডুকপেন জাতির বাস। (২) সুবাং সিরি ফ্রন্টিযার ডিভিসনে: মযা, টাগিন, পাহাডী, মিরি, আপা টানি, নিসি, সারক্ জাতির বাস। (৩) সিযাং ফ্রন্টিযার ডিভিসনে: মেম্বা, গালং, মিনিয়ং, পাদাম্, টাগিন, বোরি, রেমো পৈলিবো জাতির বাস। (৪) লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনে: চুলিকাটা, ডিগারু, মিজু, খাম্পটিন্, সিংকো, লামা, পাডাং, মিস্মি জাতির বাস। (৫) তুযেনসাং ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনে: কোনিযাক, কোম্, চ্যাং, সাংটাম্, কাল্লী কেংগুযু, সীমা জাতির বাস। (৬) তিরাফ ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনে: নক্‌টে, ওয়ান্‌চো, টাংসা, সিংগকে জাতির বাস।

আসামের অরণ্য ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল—পাহাড়ে পাথরে বন্ধুর প্রকৃতি। মানুষের লোভী হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ইহাকে ভয়াল সুন্দর করিয়া গড়িয়া রাখিয়াছে। অজস্র বারিপাতে এই অরণ্য চির সবুজ—অনন্ত প্রাণের রসে সঞ্জীবিত, পুষ্পিত।

উপসংহার

গোপীনাথ বরদলৈ

ভূমিকা

এক একজন লোক থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের অক্লান্ত কর্ম, নিরলস সেবা-পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের দ্বারা জাতির জীবনে এক মহা আদর্শ স্থাপন করিয়া যান। ইহারা যেন জাতিকে গঠন করিবার জন্য যথা সময়ে আবির্ভূত হন এবং আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া জাতিকে জীবনের একটি পথ দেখাইয়া যান। মানুষ হিসাবে ইহারা অতি সাধারণ কিন্তু ইহাদের কর্মধারা সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র। গোপীনাথ এই সকল মহাপুরুষদের একজন।

জন্ম, বংশ পরিচয় ও পাঠ্যাবস্থা

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে আসামের অন্তর্গত গৌহাটি শহরে গোপীনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র বরদলৈ। তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কুশলী চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তি ছিল। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও গোপীনাথ মোটেই বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত সাধাসিদা প্রকৃতির ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একদিকে যেমন পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অপর দিকে তরুণ মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ আসিয়া পড়িল। "দেশের ও দশের একজন হইব" এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই বিদ্যার্জনকে তপস্যার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বিনয় ও নম্রতার জন্য তিনি সহপাঠীদেব ও শিক্ষক মহাশয়গণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার ও ধীর। ক্রমশঃ তিনি কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আইন ব্যবসায়ের অপেক্ষা অধ্যাপনাকে তিনি বেশী পছন্দ করিতেন। তথাপি তাঁহাকে আইন ব্যবসায় গ্রহণ করিতে হইল। আইনে তাঁহার বেশ মাথা ছিল। কিন্তু গোপীনাথকে বেশীদিন ওকালতি করিতে হইল না। দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতে যে মরণ-পণ আন্দোলন চলিতেছিল একদিন তাহার ঢেউ আসিয়া গোপীনাথের হৃদয়ে আঘাত করিল।

মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনে গোপীনাথ সহসা ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু দেশসেবা বড় সহজ কাজ নয়। বিদেশী ইংরেজের বিষ নজরে পড়িলেন আসামের

এই অসম সাহসী যুবা। কিন্তু হটিবার পাত্র ছিলেন না গোপীনাথ। শত নির্যাতন সহ্য করিযাও বীর গোপীনাথ আন্দোলনের তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। দেশবাসী এই আসামের বীর যুবকের আত্মত্যাগ, দেশের জন্য চরম লাঞ্ছনা ভোগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনে আসামের সর্বোৎকৃষ্ট বলি গোপীনাথ।

স্বদেশ সেবা

১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গোপীনাথ আসামের মন্ত্রী সভায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিযাছিলেন এবং আসামের প্রধান মন্ত্রীরূপে আসামকে ও অসমিয়াদের সংগঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিযাছিলেন, দেশকে বিশেষতঃ নিজ জন্মভূমি আসামের উন্নতির জন্য তেমনি আবার কঠোব পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী পদে গোপীনাথ

গোপীনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি আসামের শিক্ষা বিভাগের সংস্কার। আসাম যে একটি নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া চলিয়াছিল তাহা গোপীনাথের প্রচেষ্টায় প্রথম প্রচারিত হইতে থাকে। আসামে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অসমীয়া শিক্ষা ব্যবস্থা কোনক্রমে চলিতে ছিল। গোপীনাথ মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া স্বহস্তে শিক্ষাদপ্তর লইলেন এবং আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। শুধু ইহাই নহে—মেডিকেল কলেজ, এঞ্জিনীয়ারীং স্কুল, পশু চিকিৎসার বিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা দিকে অসমীযা ছাত্রদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিযা দিলেন। আসামে বহু পাহাড়ী জাতির বাস। তাহাদের উন্নতির জন্য গোপীনাথ বহুতর কল্যাণমূলক কার্য করেন। তাহার স্বপ্ন ছিল দেশের ও দশের একজন হওয়া। সেই স্বপ্ন সার্থক হইয়াছিল। স্বদেশের উন্নতির জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রধান কৃতিত্ব

শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই যে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল তাহা নহে—তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। ব্যায়ামের দিকেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহাব মাধুর্যময় স্বভাব, সরল কথাবার্তা ও আন্তরিকতার জন্য তিনি সকলের খুব

উপসংহার

প্রিয় ছিলেন। আজ গোপীনাথ নাই। অকালে তিনি মনুষ্যলোক হইতে তিরোহিত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার জীবন্ত আদর্শ আজ অসমীয়াদের জাতি-গঠনের, স্বদেশ সেবার পথ দেখাইতেছে। তিনি আসামের আশা জাগাইয়াছেন—অসমীয়াদের মনে স্বপ্ন জাগাইয়াছেন। আজ আসাম তাঁহার প্রদর্শিত পথে জয়যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছে।

—•—

লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া

ভূমিকা

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন আসাম। পার্বত্য প্রকৃতি যেন ইঁহাকে আপন অঙ্কে করিয়া পরম স্নেহে লালিত করিতেছেন। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে এত অধিক উপজাতির বাস নাই। পাহাড়ে জঙ্গলে দেশটি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি মনোরম। প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া পার্বত্য জাতি আপন আপন চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাস লইয়া স্বাচ্ছন্দ্যে বিহার করিতেছে। ফুলে-ফলে, পশু-পাখীতে, পাহাড়ে-নদীতে, ঝর্ণায়-তড়াগে মেঘমালার অবিরাম সমাগমে সুজলা, সুফলা, শ্যামলা, পাহাড় কুন্তলা এই দেশ। এ যেন কবির স্বপ্নপুরী। এই দেশে আসামের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক লক্ষ্মী নাথ বেজ বড়ুয়ার জন্ম হয়। তাঁহার সাহিত্যে আসামের ভাবধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

জন্ম ও শিক্ষা

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লক্ষ্মীনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ বড়ুয়া। অতি বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীনাথ ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন এবং পাঠ্যাবস্থা হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ ও আইন পড়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী বি, বড়ুয়ার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। কিছুদিন বাদে তিনি উড়িষ্যার সম্বলপুরে গমন করিয়া তথায় ব্যবসা কার্যাদিতে আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আসাম প্রকৃতির রাজ্য। সেখানে থাকিবার সময়ে লক্ষ্মীনাথের মনে কাব্যের ছাপ লাগে। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা আসামের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার সহিত

লক্ষ্মীনাথের হৃদ্যতা জন্মে। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি নীরবে সাহিত্য সাধনা করিতেছিলেন।

সাহিত্য সাধনা

বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনা বাহির হইত। ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার এ সাধনা পুরাদমে চলিতে লাগিল। ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি অর্থ-উপার্জনকে জীবনের সার মনে করেন নাই। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যসাধনা করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, ধর্মতত্ত্ব, রসসাহিত্য সকল বিভাগেই তাঁহার লেখনী সমান দক্ষতার সহিত চলিত। তাহার নাটক, গল্প ও উপন্যাস অসমীয়া সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করে। একদিকে চিন্তাশীলতা অপরদিকে ভাব ও কল্পনার প্রগাঢ়তার জন্য তাঁহার সাহিত্য শীঘ্রই জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

কবি ও সহিত্যিকরা সাধারণতঃ ভাবরাজ্যের মানুষ হন। লক্ষ্মীনাথ কিন্তু সে প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁহার সাহিত্য বাস্তবমুখী। তিনি অসমীয়া জাতির সম্মুখে কর্মের যে আদর্শ

ভাবুক ও কর্মী

তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা প্রত্যেকের অনুকরণীয়। ব্যবসায়ী হইয়াও যে সাহিত্য সাধনা করা যায়—ভাব ও কর্মে যে সমন্বয় সাধন করা যায়—তাহা তিনি নিজে জীবন দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিরলস কর্মী ছিলেন। জীবনের একটি মুহূর্তও কোন দিন বৃথা নষ্ট করেন নাই! তাই ভাবুকতা ও কর্ম এই দুই দিকেই তাহার জীবনের দুই ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। দেশকে তিনি ভাল বাসিতেন। ভাল বাসিতেন স্বীয় জন্মভূমি আসামকে। তাই জন্মভূমিকে উন্নত করার জন্য তিনি তাঁহার সাহিত্যের মাধ্যমে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। শত সহস্র শ্রোতারা চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার বক্তৃতা মুগ্ধভাবে শুনিত।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে লক্ষ্মীনাথের লোকান্তর ঘটে। অসমীয়াদের প্রাণের দুলাল ছিলেন তিনি। তাঁহার শব শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সে শোভাযাত্রায় যে ভীড় হইয়াছিল তাহা হইতেই তাঁহার জনপ্রিয়তা

উপসংহার

অনুমান করা যায়। অসমীয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা লক্ষ্মীনাথ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। যতদিন অসমীয়া সাহিত্য থাকিবে ততদিন লক্ষ্মীনাথ অসমীয়াদের মনের মন্দিরে দেববিগ্রহের ন্যায় অবস্থান করিয়া অসমীয়াদের অন্তরের প্রীতির অর্ঘ্য লাভ করিবেন।

দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন

আসামের অন্তর্গত গৌহাটির একটি প্রসিদ্ধ বংশে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তরুণরাম ফুকনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বলরাম ফুকন ও মাতার নাম ভাগীরথী দেবী। উভয়েই খুব ধার্মিক ছিলেন। পিতা ও মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তরুণরাম বহু সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন। সেই সকল সদ্‌গুণের সহিত নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায় যুক্ত করিয়া তরুণরাম দেশবাসীর সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপনে সক্ষম হন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বাল্যে তরুণরাম গৌহাটীর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে সর্ব্ব বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্বের সহিত সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ১৮৯২ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এফ্‌. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তরুণরাম আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি দেশে ফিরেন।

শিক্ষা

তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী সুরু করিয়া শীঘ্র প্রচুর সুনাম অর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌহাটির আইন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার শতগুণ সুনাম দেশসেবার জন্য তিনি লাভ করেন।

কর্ম্মজীবন

স্বদেশের প্রীতি ভালবাসা তরুণরামের প্রাণ বায়ুর মত ছিল। ব্যারিষ্টারী বৃত্তি ছাড়া তিনি দেশসেবাকেও আপনার কর্মের অন্তর্গত করিয়া অধিকাংশ সময় নানা দেশহিতকর সাধারণের কার্যে নিযুক্ত করিতেন। নিজ সমাজকে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় তরুণরামের কোনদিন ক্লান্তি দেখা যায় নাই। গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা যখন ভারতবর্ষের প্রাণে এক মহাভাবের জোয়ার ডাকিয়া আনে তখন সেই জোয়ারের জলে তরুণরামও ঝাঁপাইয়া পড়েন। ইহাতে তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করিতে হইয়াছিল।

দেশসেবা

বক্তাহিসাবে তরুণরাম যেরূপ ছিলেন, সাহিত্য প্রীতিতেও তিনি তদ্রূপ খ্যাতি

অর্জ্জন করেন। তিনি শিকার করিতে ভাল বাসিতেন এবং শিকার সম্বন্ধে কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া জনপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সাহিত্যপ্রীতি

তিনি একবার আসাম সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতি হন। ছাত্রসমাজের উপর ও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আসামের ছাত্রসম্মেলনেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য এবং বিশেষ করিয়া দেশ ও দশের প্রতি সদা জাগ্রত মনোযোগের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে "দেশভক্ত" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই সুবিখ্যাত আসামের সুসন্তানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু যে আসামের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরও ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার স্থান অদ্যাবধি শূন্য পড়িয়া আছে। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তে

উপসংহার

অনুপ্রাণিত হইয়া ছাত্রগণ তাঁহার সেই শূন্যস্থান পূরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করুক।

—o—

শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও

আসামের যে সকল সুসন্তান জন্মভূমির উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও অন্যতম। নওগাঁ জেলায় বরোদা গ্রামে

জন্ম ও বাল্যকথা

শঙ্কর দেও-এর জন্ম হয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ লৌকিকশিক্ষা তিনি তেমন ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই তীব্র ধর্মপিপাসা তাঁহাকে সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন করিতে পারে নাই। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনায় নিযুক্ত হন নাই। সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে বসিয়া তিনি ধর্মসাধনায় রত থাকেন। তিনি

ধর্মানুরাগ

সংসারী হইলেও সংসারের সকল মালিন্য ও ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য হইতেই ধর্মসংস্কারক ও ধর্মসম্প্রদায় সংগঠকের

ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আজীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আজও সমগ্র আসাম তাহাকে ধর্মসংস্কারক রূপে পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী ও ধার্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং সকল প্রকার ধর্মশাস্ত্রের সার মন্থন করিয়া এই সিদ্ধান্তে

ভগবতী বৈষ্ণব ধর্ম

উপনীত হন যে, প্রকৃত ধর্মের পথ অতি সহজ ও সরল—সর্ব্বদা ভগবানের নাম কীর্ত্তনই প্রকৃত ধর্ম। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই ধর্মমত তিনি আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ছাড়া ধর্মলাভের অন্য পথ নাই। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা তাঁহার নিকট অর্থহীন মনে হইত। নানা ধর্মের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মাইয়া ছিল যে পৌরোহিত্য প্রথার ফলেই এই সকল অনুষ্ঠানের সৃষ্টি এবং এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণ লোককে বিভ্রান্তই করিয়াছে—প্রকৃত ধর্মের সন্ধান দিতে পারে নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্মের নাম 'ভগবতী বৈষ্ণব ধর্ম'—ইহা যেরূপ উদার তেমনি ব্যাপক। এই ধর্মে মানব ও জীবপ্রীতিই প্রধান অনুশাসন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও প্রচুর ধর্ম সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আসামের অধিবাসীরা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য রূপে অধ্যাবধি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। তাঁহার রচিত সঙ্গীত আসামের ঘরে ঘরে ভক্তিভরে গীত হয় এবং শ্রোতাদের প্রাণে ভক্তির বন্যা বহাইয়া দেয়। একটি

আসামের শ্রীচৈতন্য

সাধারণ সহজ সরল ধর্মের পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি সকলের মনে যে ধর্মানুরাগের বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য চিরকাল তিনি আসামের অধিবাসীদের মনের মন্দিরে বিরাজ করিবেন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর দেও আজ নাই। তাঁহার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার

কিন্তু তাহাতে কি? তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। জগতের ধর্মসংস্কারগণের মধ্যে তিনিও একটি বিশিষ্ট সম্মানিত আসনের অধিকারী।

লছিৎ বরফুকন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আসামের এক গ্রামে সাধারণ এক গৃহস্থ পরিবারে লছিৎ বরফুকনের জন্ম হয়। বাল্যে তিনি শিক্ষার সুযোগ সুবিধা তেমন পান নাই। কিন্তু সাহস ও বীরত্বের কার্যে লছিৎ বরফুকন বাল্য হইতেই অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবক এবং দেশবীর হিসাবে তাঁহাব খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। যোদ্ধা ও বীর হিসাবে তিনি আসামের রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কালক্রমে আসামের সেনাপতি-রূপে স্বীকৃত হন। মুঘল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি রামসিংহ যখন বারে বারে আসামের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকেন তখন সিংহ-বিক্রম লছিৎ অপূর্ব্ব বীরত্বপূর্ণ কৌশলে সেই সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া মুঘল গর্ব্ব লাঞ্ছিত করিয়া দেশভূমির সম্মান রক্ষা করেন। তখন আসামের রাজা ছিলেন চক্রধর সিংহ। লছিৎ তখন আসামেব রাজ-প্রতিনিধি। গৌহাটীতে তাঁহার কেন্দ্রীয় বাসস্থান। রামসিংহের অধিনায়কত্বে মুঘল সৈন্য যখন আসামেব সরাঘাটে আক্রমণাত্মক কার্য্য সুরু করেন তখন অসীম সাহসী আসামী সৈন্যকে পরিচালিত করেন লছিৎ বরফুকন। রক্তাক্ত সংগ্রামের পর মুঘল সৈন্য সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইল। কিন্তু রামসিংহ দমিলেন না—তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিযা ক্রমশঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে লছিৎ একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া সেই সৈন্যদলকে বাধা দানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। এত অল্প সময়ে এত বড দুর্গও পরিখা নির্মান বড সহজ কাজ ছিল না। তথাপি অপূর্ব কৌশলী বীর লছিৎ সেই কার্য্য সমাধা করিলে এবং মুঘল সৈন্যদের গতি প্রতিহত করিয়া রামসিংহের গর্ব খর্ব করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্যমে ব্যর্থ হইয়াও রামসিংহ নৌযুদ্ধে লছিৎ বরফুকনকে পরাজিত করিবার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লছিতের সদাজাগ্রত চক্ষু দুইটি মুঘল পরিকল্পনা আবিষ্কার করিয়া তাহা একেবারে ধ্বংস করিলেন। বিজিত মুঘল সেনাপতি হতাশ হইয়া এবার পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

দেশসেবা ও বীরত্ব

লছিৎ বরফুকন অনেক কাল আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু আসামের

ইতিহাসে তাঁহার বীর্য্য ও সাহসের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আজও তাঁহার কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিলে আসামের অধিবাসীদের দেহে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইয়া উঠে এবং তরুণ মনে সাহস ও বীরত্বের অনুপ্রেরণা জাগে।

উপসংহার

সতী জয়মতী

আসামের ইতিহাসের পাতায় যে মহীয়সী মহিলার মূর্তি অপূর্ব দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে তাঁহার নাম রাণী জয়মতী। প্রাচীন ইতিহাসের তমোময় গহ্বর হইতে ইঁহার কীর্তিকাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তটি অসমীয়া মহিলাদের প্রাণে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

ভূমিকা

আহোমদের রাজা ছিলেন চক্রধ্বজ সিং। তাঁহার শাসনে প্রজারা সংযত ছিল —রাজ্যে কোনরূপ গোলমাল উপদ্রব ছিল না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল অন্যরূপ। মন্ত্রীরা সকলেই রাজ্যময় যথেচ্ছাচারের স্রোত বহাইয়া দিলেন। তারপর যিনিই রাজা হন মন্ত্রীরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই নিহত করেন। সাত বৎসরের মধ্যে তিনজন রাজা এইভাবে নিহত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে সকলে একমত হইয়া চামগুরীয়া পরিবারের চুলিকফাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চুলিকফা বালক ছিলেন বলিয়া অসমীয়ারা তাঁহার নাম-করণ করিল 'লরা রাজা'। 'লরা' কথাটির অর্থ বালক। বালক হইলেও চুলিকফা বুঝিলেন যে তিনি নামেই রাজা। ক্ষমতা সকলই রহিয়াছে মন্ত্রীদের হাতে। মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে অপর কোন রাজবংশের ছেলেকে সিংহাসনে বসাইতে পারে এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে। চুলিকফা অন্যান্য রাজকুমারদের হত্যা করাই নিজ প্রতিষ্ঠার উত্তম পথ বিবেচনা করিলেন।

মন্ত্রীদের স্বৈরাচার

আসামের তুঙ্গখুঙ্গীয়া বংশের রাজকুমার গদাপাণি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বলবান।

'লরা রাজা' চুলিক্ফা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু তাঁহার ষড়যন্ত্রে কথা কিভাবে গদাপাণির কানে আসিল। গদাপা বলবান ও সাহসী। পুরুষকারের উপর তাঁহার প্রগাঢ় আ থাকায় তিনি ইহাতে মোটেই ভীত হইলেন না। তাঁহার রাণী জয়মতী কিন্তু অত্য ভীতা হইয়া উঠিলেন। পলাইয়া গিয়া চুলিক্ফার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তি গদাপাণিকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গদাপাণি প্রথমে কিছুতেই রা হইলেন না। শেষে জয়মতীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং বিপদের ভয়ঙ্করতা উপলব্ধি করি দিনকতক নাগা পাহাড়ে আত্মগোপন করাই স্থির করিলেন।

গদাপাণির আত্মগোপন

গদাপাণির দুই পুত্র লাই ও লেচাই। জয়মতীর উপর লাই ও লেচাইয়ের ভার দি একদিন গদাপাণি নিরুদ্দেশ হইলেন। সতী জয়মতী স্বামীর মঙ্গলকামনায় লাই লেচাইকে লইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। নিশিদিন তাঁহার একমাত্র চিন্তা—তি ভাল থাকুন, শত্রু যেন তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে। গদাপাণি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নাগাদের স নাগা পাহাড়ে বাস করিতে লাগিলেন। লরা রাজা একদিন সহসা অনেক লোকজ পাঠাইয়া গদাপাণির বাড়ী ঘেরাও করাইলেন। কিন্তু গদাপাণিকে কোথাও পাওয়া গে না। হতাশ হইয়া লোকজন ফিরিয়া আসিল। দারুণ উদ্বেগে লরা রাজা অস্থির হই পড়িলেন।

চুলিক্ফার ষড়যন্ত্র

'লরা রাজা' একজন দূত পাঠাইলেন জয়মতীর কাছে। দূত বিস্তর ভয় দেখাই জয়মতীর কাছ হইতে স্বামীর সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সাহসিনী রা নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "তোমাদের রাজাকে গিয়া খবর দাও যে আমার কাছ থেকে তি আমার স্বামীর সন্ধান পাবেন না।" লরা রাজা খবর শুনি একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। তখনই রাণী জয়মতীকে বন্দিনী করিলেন এবং ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, "ইহাকে প্রকাশ্য স্থানে বাঁধিয়া চাবু মারো—যতক্ষণ না ইহার স্বামীর সন্ধান দেয় ততক্ষণ মোটেই ছাড়িও না।" অত্যাচা চলিতে লাগিল। একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। নাগাপাহা গদাপাণির কাছে খবর পৌঁছিল। তিনি ছদ্মবেশে জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া জয়মতী বলিলেন, "স্বামীর খবর দিয়ে দাওনা—খবর দিয়ে এখন তুমি প্রাণে বাঁচো।"

উপসংহার

জয়মতী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাছে স্বামীর বিপদ হয় সেজন্য অসহ্য নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন।

জয়মতী আবার বন্দিনী হইলেন। একদিন গদাপাণি ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আর কত সহ্য করিবে? স্বামীর সন্ধান বলে দিয়ে বিপদ মুক্ত হও।"

জয়মতী স্বামীকে চিনিতে পারিলেন। ভয়ে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সর্বনাশ! কেহ যদি তাঁহাকে বন্দী করেন। তিনি স্বামীর দিকে করুণ চোখে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি যে হোন্ এখনি এস্থান ত্যাগ করুন। আমি আমার স্বামীর চিরশত্রু চুলিকৃফাকে স্বামীর সন্ধান কিছুতেই দেব না।"

চুলিকৃফার অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত বেত্রাঘাতে জয়মতীর মৃত্যু হইল। স্বামীভক্তির আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই অসমীয়া সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। গদাপাণি নাগা সৈন্যসামন্ত লইয়া চুলিকৃফার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। গদাপাণির মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গদাপাণির পুত্র লাই বাণী জয়মতী যে স্থানে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন সেখানে একটি দীঘি কাটিয়া তাহার তীরে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন। শিবসাগরে আজিও সেই দীঘি ও মন্দির আছে। দীঘির নাম 'জয়সাগর' আর মন্দিরটির নাম 'জয়দল'।

জয়মতীর মৃত্যু

অসমীয়া রমণীরা জয়মতীর এই অতুলনীয় সতীত্বের কথা আজিও শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে। জয়মতী আজ আর নাই— কিন্তু তাঁহার সতীত্বের কাহিনী আজ অসমীয়াদের মুখে মুখে রহিয়া গিয়াছে।

সতী জয়মতী

রচনা

দ্বিতীয় খণ্ড

বঙ্গানুবাদ

এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় অনুবাদ করা সহজসাধ্য নহে। ইহাতে যথেষ্ট ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যে ভাষায় ভাবটি দেওয়া থাকে সেই ভাষায় জ্ঞান যেরূপ দরকার, যে ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয় তাহারও জ্ঞান থাকা সেরূপ দরকার। প্রত্যেক ভাষার প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। সেই ভাষার বাগ্ধারার সহিত পরিচয় না থাকিলে সে ভাষায় সার্থক নির্ভুল রচনা লেখা যায় না। ইংরেজী ভাষার সহিত ছাত্রদের পরিচয় স্বল্প। সেজন্য আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া তাহাদের অর্থগ্রহণ করিতে হয়। আক্ষরিক অনুবাদ অর্থগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও অনুবাদের পক্ষে বাধাস্বরূপ। এইজন্য ইংরেজী ভাষার ভাব আয়ত্ত করিয়া তাহা বাংলা ভাষার বাগ্ধারার সহিত খাপ খাওয়াইয়া যথাযথ প্রকাশ করিবার অভ্যাস করা বিশেষ দরকার। মূল ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ভাষার যাহা বাংলায় অনুবাদ করিতে হইবে তাহাতে যে সব ভাব আছে তাহার যাহাতে অণুমাত্র বাদ না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। সমগ্র বাক্যটির মূল ভাব ধরিয়া তাহা বাংলায় যথাযথ প্রকাশ করিতে পারিলেই মোটামুটি অনুবাদ ভাল হইবে।

কেবল শুদ্ধভাবে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারিলে অনুবাদের কাজ শেষ হয় না। ভাষা যাহাতে সুন্দর হয়, বাক্যগঠনে যাহাতে যথেষ্ট বাঁধুনি থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। অনুবাদ যাহাতে স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ষ্ট হয় এবং সাবলীল হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। কোথাও 'করিত', কোথাও 'করিয়াছিল', কোথাও 'করিল', এরূপ ব্যবহার যেন না থাকে। একই অনুচ্ছেদের সর্বত্র ক্রিয়ার ব্যবহার একইরূপ করিবে। যেখানে বাংলায় ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় না সেখানে ইংরেজীর ক্রিয়াপদের আক্ষরিক অনুবাদ করিবে না।

মনে রাখিও যে, ইংরেজীতে প্রথমে **কর্তা**, তারপর **ক্রিয়া** ও ক্রিয়ার পরে **কর্ম** বসে। ইংরেজীতে **ক্রিয়ার বিশেষণ** ক্রিয়ার পরেই বসে। কিন্তু বাংলায় প্রথমে **কর্তা**, তৎপরে **কর্ম** ও শেষে **ক্রিয়া** বসে। বাংলায় ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

এছাড়া আরও বহু বিশেষত্ব তোমরা একটু স্থিরভাবে দুই-একটি অনুবাদের নিদর্শন মন দিয়া পড়িলেই লক্ষ্য করিতে পারিবে। ইংরেজীতে It, There প্রভৃতি কতকগুলি প্রারম্ভিক অর্থহীন বাক্যের প্রয়োগ হয়। বাংলায় সেরূপ হয় না। বাংলায় ঐরূপ অর্থহীন বাক্যের অনুবাদ করিবে না। যেমন, It is a fine day—দিনটি ভারি চমৎকার। It rains—বৃষ্টি হইতেছে। There was a king— এক যে ছিল রাজা। There is no meaning in your words—তোমার কথার অর্থ হয় না।

তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য কয়েকটি ইংরেজী বাক্-রীতির বাংলা দেওয়া হইল :

(ক)

He is absent for weaks—তিনি **কয়েক সপ্তাহ** অনুপস্থিত। Let us go for a walk—**চল আমরা বেড়াইতে যাই**। I bought this fcr a few chips—**মাত্র কয়েক টাকায়** এটি কিনিয়াছি। Lila is playing on the harmonium—লীলা **হারমোনিয়ম বাজাইতেছে**। He is very fat—সে অত্যন্ত মোটা। Do not ask me to read it—এইটি আমাকে পড়িতে **বলিও না**—This rule does not hold good here—এই নিয়ম এখানে **খাটে** না।

(খ)

Things are at sixes and sevens in the room—ঘরে জিনিস-পত্র ছত্রাকার করা আছে (নয়ছয় করা আছে)।

A rolling stone gathers no moss—অথল-চাথার কপালে সুখ নাই।

A bad carpenter quarrels with his tools—নাচতে না জানলে, উঠান বাঁকা।

He hunts with the hound and runs with the hare—সে বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি।

No cross, no crown—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

Waste not, want not—অপচয় করিও না, অভাব হইবে না।

It is a wild goose chase—এ শুধু বনের মোষ তাড়ান।

(গ)

There lived a king who had no children—এক ছিল রাজা। রাজার কোন ছেলে ছিল না।

"Oh my God !" he said, "I am undone"—সে বলিয়া উঠিল, "হা ভগবান। আমার সর্বনাশ হইয়াছে।"

"Who is there ?" asked the king—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কে হে ?"

A moment, and the assasin vanished—আততায়ী মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

A Chinese lady who was on a visit to India some years ago, said that, ..—কয়েক বৎসর পূর্বে এক চীনদেশীয় ভদ্রমহিলা ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি বলেন যে,....

A son was born to James—জেমসের একটি পুত্র হইল।

The Russians are sure to defeat the Germans—রুশরা নিশ্চয়ই জার্মানদের হারাইয়া দিবে।

কয়েকটি ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইল :

Culture—সংস্কৃতি

Civilization—সভ্যতা

Co-operation—সহযোগিতা

Co-existence—সহাবস্থিতি

Duty—কর্তব্য, শুল্ক
Freight—মাশুল
Exchange—বিনিময়
Phobia—আতঙ্ক
Response—সাড়া
Phase—দশা
Galaxy—ছায়াপথ
Ebb-tide—ভাঁটা
New-moon—অমাবস্যা
Mammal—স্তন্যপায়ী
Parasite—পরজীবী
Plasma—রক্তরস
Average—গড়
Crisis—সঙ্কট
Bankrupt—দেউলিয়া
Indemnity—ক্ষতিপূরণ
Environment—পরিবেশ
Academic—বিদ্যাবিষয়ক
Administration—পরিচালন
Ballot—গুপ্তভোট
Urban—পৌর
President—রাষ্ট্রপতি, সভাপতি
Symbol—প্রতীক
Minor—অপ্রধান, নাবালক
Regional—আঞ্চলিক

Cabinet—মন্ত্রী-সভা
Background—পটভূমিকা
Practical—ব্যবহারিক
Venture—সাহস করা
Formula—সংকেত
Unit—একক, মাত্রা
Flow-tide—জোয়ার
Full-moon—পূর্ণচন্দ্র
Leap-year—অধিবর্ষ
Vertebrate—মেরুদণ্ডী
Diet—পথ্য
Serum—রক্তমস্তু
Co-operation—সমবায়
Credit—জমা
Debit—খরচ
Invest—বিনিয়োগ করা
Retail—খুচরা
Faculty—শক্তি
Academy—পরিষৎ
Armistice—যুদ্ধবিরতি
Handicraft—হস্তশিল্প
Zone—মণ্ডল
Control—নিয়ন্ত্রণ
Universal—সর্বগত
Minimum—অল্পতম

১

What the littie fish had foretold soon came to pass ; and the queen had a little girl that was so very beautiful that the king could not cease looking on her for joy, and determined to hold a feast. So he invited not only his relations, friends and neighbours, but also the fairies, that they might he kind and good to his little daughter. (C. U. 1920)

এক ছিল রাজা আর এক ছিল রাণী। রাজারাণীর কোন ছেলেপুলে ছিল না। এজন্য তাঁরা রাতদিন দুঃখ করতেন। একদিন রাণী নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময় একটা ছোট মাছ জল থেকে মাথা তুলে বল্লে "তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে—শীঘ্র তোমার একটি মেয়ে হবে।" মাছটি যা বলেছিল শীঘ্র তা ফলে গেল। রাণীর এক মেয়ে হ—

(C. U. 1910)

মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। একদিন তোমাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল, তখন তুমি চলিতে ও কথা কহিতে পারিতে না। তুমি তখন তাঁহাদের ভার-বোঝামাত্র ছিলে এবং তোমার জন্য তাঁহাদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ? তোমার পীড়া হইলে তাঁহারা কি গভীর স্নেহে তোমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া থাকিতেন। তোমার কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তোমার অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা কী আনন্দে চেষ্টা করিতেন। অকৃতজ্ঞ সন্তানের চেযে মহা পাষণ্ড যে দুর্লভ তাহাতে আর সন্দেহ কি ? মাতাপিতাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের উপর নির্ভর করিবে। তাঁহাদের নিকটে অকপটে প্রকাশিত করা যায় না এমন কোন রহস্যই তোমার থাকা উচিত নয়। কোন অন্যায় কাজ করিলে খোলাখুলিভাবে তাঁহাদের নিকট স্বীকার করিয়া তাঁহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কোন কাজে লাগিবার পূর্বে তাঁহাদের সম্মতি লওয়া উচিত।

২

William Tell was instantly seized and taken before the Governor, who determined to take cruel revenge. Turning

to the Captive he said, "I have heard that you are a famous

Duty—কর্তব্য, শুল্ক

Freight—মাশুল

Exchange—বিনিময়

Phobia—আতঙ্ক

Response—সাড়া

Phase—দশা

Galaxy—ছায়াপথ

Ebb-tide—ভাঁটা

New-moon—অমাবস্যা

Cabinet—মন্ত্রী-সভা

Background—পটভূমিকা

Practical—ব্যবহারিক

Venture—সাহস করা

Formula—সংকেত

Unit—একক, মাত্রা

Flow-tide—জোয়ার

Full-moon—পূর্ণচন্দ্র

Leap-year—অধিবর্ষ

Vertebrate—মেরুদণ্ডী

করা হইল। শাসনকর্তা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ

হইলেন। বন্দীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "শুনিয়াছি, তুমি একজন বিখ্যাত তীরন্দাজ। এখন তোমার কেরামতি দেখাইতে পারিবে।" টেলের বালক-পুত্রের মস্তকের উপর একটি আপেল রাখিয়া তিনি পিতাকে তাহার পুত্রের মাথার উপরে স্থিত আপেলটিকে তীরবিদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। ভয়ে টেলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "বাবা, তীর ছুড়ুন। আমার মোটেই ভয় করিতেছে না। আমি জানি আপনার লক্ষ্য কখনও ভ্রষ্ট হইবে না।" বালকের নির্ভীক উক্তি টেলের মনে আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দিল। তিনি দুইটি তীর লইয়া তাহার একটি ধনুকের জ্যাতে আরোপিত করিলেন। চতুষ্পার্শ্বের নির্বাক উদ্বিগ্ন জনতার মধ্যে থাকিয়া তিনি ধনু উত্তোলন করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরটি অব্যর্থ লক্ষ্যে তির্যক গতিতে আপেলটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল।

৩

Once upon a time there lived a king and a queen who had no children; and this they lamented very much. But one day, as the queen was walking by the side of a river, a little fish lifted its head out of the water and said, "Your

wish shall be fulfilled, and you shall soon have a daughter." What the littie fish had foretold soon came to pass ; and the queen had a little girl that was so very beautiful that the king could not cease looking on her for joy, and determined to hold a feast. So he invited not only his relations, friends and neighbours, but also the fairies, that they might he kind and good to his little daughter. (C. U. 1920)

এক ছিল রাজা আর এক ছিল রাণী। রাজারাণীর কোন ছেলেপুলে ছিল না। এজন্য তাঁরা রাতদিন দুঃখ করতেন। একদিন রাণী নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময় একটা ছোট মাছ জল থেকে মাথা তুলে বল্লে "তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে—শীঘ্র তোমার একটি মেয়ে হবে।" মাছটি যা বলেছিল শীঘ্র তা ফলে গেল। রাণীর এক মেয়ে হল। মেয়েটি এত সুন্দরী যে রাজা ত' আনন্দে তার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। তিনি একটা ভোজ দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই ভোজে তিনি যে শুধু তাঁর আত্মীয়, বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করলেন তা নয়; পরীদেরও নিমন্ত্রণ করলেন। ইচ্ছেটা পরীরা তাঁর মেয়েকে ভাল চোখে দেখে আর তার উপর কৃপা করে।

৪

Nanak's father Kalu was greatly distressed when he learnt that Nanak had become a fakir, and did all in his power to induce his son to return to the world. He even went in person to persuade him and offered him a house to live in, horses, jewels, rich cloths, in short everything that money could procure, it he would yield to his entreaties. But though Nanak received his father with every sign of affection, nothing could turn him from his holy purpose. (C. U. 1921)

নানক ফকির (সন্ন্যাসী) হইয়াছেন জানিয়া নানকের পিতা কলু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পুত্র যাহাতে সংসারে ফিরিয়া আসে সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য তিনি স্বয়ং পুত্রের

নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে বসত-বাড়ী, ঘোড়া, হীরা-মাণিক, দামী পোশাক, অল্প কথায় অর্থদ্বারা যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায় সমস্তই তাহাকে দিতে চাহিয়া, তাঁহার অনুরোধ অনুযায়ী কার্য করিতে বলিলেন। কিন্তু নানক পিতাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ সহকারে অভ্যর্থনা করিলেও নিজ সাধু সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন না।

৫

Japan has been the "Children's Paradise". Japanese parents are very good to their children, and train them to be polite and kind to each other. Indeed they are among the most polite children in the world, and while fond of fun and games, they rarely quarrel or fight. In a country where the houses are chiefly of wood and where lamp and lantern are so much used as in Japan, terrible fires often take place. (C. U. 1924)

জাপানকে 'শিশু স্বর্গ' বলা হয়। জাপান দেশের মাতাপিতারা সন্তান-সন্ততিদের খুব ভালবাসেন এবং তাহারা যাহাতে নম্র ও পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হয় সেইভাবে তাহাদের শিক্ষা দেন। বাস্তবিকই জগতের মধ্যে জাপান দেশের শিশুদের মত নম্র ও বিনয়ী শিশু আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদপ্রিয় হইলেও বড় একটা কলহ বা মারামারি তাহারা করে না। জাপানে ঘরবাড়ী প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারী এবং লণ্ঠন ও প্রদীপ অত্যন্ত বেশী ব্যবহার হয়। এজন্য প্রায়ই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া যায়।

৬

Altamish had taught his daughter Rizia everything that a woman usually knows and all that a man is taught as well. She was brought up like a prince, and knew all about the affairs of government and could write and read well. She could ride on horseback and use a bow or sword like

.any of her brothers. While she was still young, Altamish had to leave Delhi with great army to fight against the Rajputs in the south. He chose his daughter to rule in his stead, while he should be away. (C. U. 1921)

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই যাহা যাহা জানে এবং পুরুষদের যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় সে সমস্তই আল্‌তামিস তাঁহার কন্যা রিজিয়াকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় তাঁহাকে মানুষ করা হয় এবং তিনি রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ই জানিতেন এবং লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের ন্যায় অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা ও অসিচালনা করিতেন। তিনি যখন অত্যন্ত অল্পবয়স্কা সেই সময়ে আল্‌তামিসকে বিপুল সৈন্য লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশে রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে হয়। তাঁহার অনুপস্থিত-কালে তাঁহার স্থলে রাজ্য পরিচালনা করিবার জন্য তিনি তাঁহার কন্যাকে মনোনীত করেন।

৭

The Czar Ivan, when reigned over Russia about the middle of the sixteenth century often went out disguised, in order to satisfy his own mind as to the condition of his subjects. One day in a solitary walk near Moscow he entered a small village, and pretending to be overcome by fatigue implored relief from several of the inhabitants. His dress was ragged, his appearance mean ; but what ought to have excited the compassion of villagers, and ensured a kind reception, produced a refusal. (C. U. 1922)

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ায় আইভান রাজত্ব করিতেন। প্রজাদের অবস্থা নিজে জানিয়া সন্তুষ্ট হইবার জন্য তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে বাহির হইতেন। একদিন মস্কোর নিকটে এক নির্জন রাস্তা দিয়া তিনি একটি ছোট গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তিনি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন এরূপ ভান করিয়া কয়েক-জন গ্রামবাসীর নিকট হইতে করুণা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার পরিধানের বস্ত্র

শতছিন্ন এবং চেহারা অত্যন্ত হীন ছিল। কিন্তু এসব গ্রামবাসীদের মনে দয়ার উদ্রেক করিল না বা সাদর অভ্যর্থনার তাগিদ জাগাইল না। তাহারা তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হইল।

৮

Sir Isaac Newton, one of the greatest men of science the world has ever seen, was at the same time a man of peculiar mildness of character. One evening he had indiscreetly left his door open, when his little dog Fido went in and threw his candle, which set fire to his valuable papers, and entirely consumed them. When Newton entered the room and saw the irreparable mischief that had been done, he simply exclaimed, "Ah Fido ! you know not what harm you have committed." (C U. 1922)

জগতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন স্যার আইজাক নিউটন। ইনি অত্যন্ত মৃদু ও কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অসাবধানতা-বশতঃ তাঁহার কক্ষের জানালাটি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার ছোট কুকুর ফিডো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোমবাতিটি ফেলিয়া দিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আগুন ধরাইয়া সবকিছু সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। নিউটন ঘরে ঢুকিয়া লক্ষ্য করিলেন যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'হায় ফিডো। তুমি যে কত ক্ষতি করিয়াছ তাহা যদি জানিতে!'

৯

For a moment I stood thunder-struck. I looked at the footprint. There it was ; I could see the marks of the toes, heel and all. How it came there I could not imagine. Full of terror, hardly knowing what I did, I fled home, mistaking every bush and tree for some one chasing me. I could not sleep, nor dared I stir out of my castle, for days, lest some savage should capture me. However, I gained a little courage

and went with much dread to make sure that the footprint was not my own. Mine was not nearly so large. A stranger, may be a savage, must have been on shore, and fear again filled my heart. (C. U. 1941)

ক্ষণকাল আমি বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পদচিহ্নটির দিকে তাকাইলাম। পদচিহ্নটি সেখানে স্পষ্ট দেখা গেল, পায়ের আঙুল, গোড়ালী সবকিছুর ছাপ স্পষ্ট দেখিলাম। এই পদচিহ্ন কিভাবে এখানে আসিল তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলাম না। অত্যন্ত ভীত হইয়া কি করিতেছি তাহা না জানিয়াই আমি বাড়ীর দিকে পলায়ন করিলাম। প্রত্যেক ঝোপ, প্রত্যেক গাছ দেখিয়া আমার ভ্রম হইতে লাগিল যেন কেহ আমাকে পিছন হইতে তাড়া করিতেছে। দিনের পর দিন ভয়ে আমার ঘুম হইল না। দুর্গ হইতে বাহির হইবার সাহস হইল না। সর্বদাই ভয় হইতে লাগিল পাছে কোন অসভ্য অধিবাসীর হাতে পড়ি। যাহা হউক, আমি খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সেই পদচিহ্নটি আমার কিনা দেখিতে গেলাম। আমার পায়ের ছাপ অত বড় হইতে পারে না। কোন বিদেশী বা কোন অসভ্য অধিবাসী নিশ্চয়ই সমুদ্রতীরে আসিয়াছিল। আমার মন ভয়ে পরিপূর্ণ হইল।

১০

When I was able to struggle no longer, I found myself within my depth. By this time the storm was almost over. I walked nearly a mile in the shallow water before I got to the shore, which was about eight o'clock in the evening. I could not discover any sign of house or inhabitants ; at least I was n so weak condition that I did not observe them. I was extremely tired and with that and the heat of the weather I found myself much inclined to sleep, I lay down on the grass, which was very short and soft, and slept sounder than ever I remember to have done in my life. When I awoke it was just daylight. (C. U. 1942)

যখন আর বুঝিবার ক্ষমতা নাই তখন দেখিলাম আমি জলমধ্যে থই পাইয়াছি (অর্থাৎ সেখানে ডুবজল ছিল না)। ইতিমধ্যে ঝড় প্রায় থামিয়া গিয়াছে। তীর পর্যন্ত পৌঁছিতে আমাকে অল্পজলের মধ্য দিয়া প্রায় এক মাইল হাঁটিতে হইল। তখন সন্ধ্যা ৮টা হইবে। কোন ঘরবাড়ী বা বাসিন্দাদের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম না। অন্ততঃ অত্যন্ত দুর্বলতার জন্য আমি ওসব লক্ষ্য করি নাই। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলাম। ক্লান্তিতে ও গরম আবহাওয়ায় আমার অত্যন্ত ঘুম ধরিতে লাগিল। ছোট ছোট নরম ঘাসের উপর আমি সটান শুইয়া পড়িলাম। তারপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হয় জীবনে কোনদিন বোধহয় এরূপ গভীরভাবে ঘুমাই নাই। যখন আমার ঘুম ভাঙিল তখন সবে দিনের আলো ফুটিতেছে।

১১

Shylock the Jew, lived at Venice ; he was a usurer, who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men and particularly by Antonio, a young merchant of Venice ; and Shylock as much hated Antonio, because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent ; therefore there was great enmity between this covetous Jew and generous merchant Antonio. Whenever Antonio met Shylock, he used to reproach him with his usuries and hard dealings.

(C. U. 1942)

ইহুদী শাইলক ভেনিস শহরে বাস করিত। সে সুদখোর ছিল। চড়া সুদে খৃষ্টান বণিকদের টাকা ধার দিয়া সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। শাইলক অত্যন্ত কঠিন-হৃদয় লোক ছিল। টাকা ধার দিয়া সেই টাকা আদায় করিবার সময়ে সে এত কড়াকড়ি করিত যে ভাল লোক মাত্রই তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, বিশেষতঃ অ্যাণ্টনিও নামে ভেনিসের একজন যুবক বণিক তাহাকে

অত্যন্ত ঘৃণা করিত। শাইলকও অ্যাণ্টনিওকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। কারণ, অ্যাণ্টনিও বিপদ্‌গ্রস্ত লোককে টাকা ধার দিত এবং সেজন্য সে সুদ গ্রহণ করিত না। কাজেকাজেই লোভী ইহুদী ও উদারহৃদয় বণিক অ্যাণ্টনিওর মধ্যে প্রবল শত্রুতা জন্মিয়াছিল। শাইলকের সঙ্গে দেখা হইলেই অ্যাণ্টনিও সুদ লওয়ার জন্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তাহাকে গালাগালি করিত।

১২

তিনি স্কন্ধে মশক ঝুলাইয়া বেড়াইতেন। ওমর একজন মহানুভব নৃপতি ছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি যেমন শক্তিশালী ছিলেন, মানুষ হিসাবে আবার তদ্রূপ সাধুপ্রকৃতির ছিলেন।

১৪

Painting has been practised with great success by Indians. It was during the time when Buddha's influence was supreme in India that painting came to be highly developed. The finest example of Indian painting can be seen even now in the temples of Ajanta. These show how Indian painters were always eager to express the truths of their religion by means of picture. Even in the days of Mughals—painting continued to flourish, for many of the Mu (C. U. 1943) were patrons

চক্ষু মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। অন্ধতা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করিতে পারে না; মানুষের মুখ দেখিতে পায় না, প্রজাপতির সুকুমার সৌন্দর্য তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। পুস্তকে যে মানবচিন্তার ঐশ্বর্য রহিয়াছে তাহা সে আবিষ্কার করিতে পারে না। নিজ চিন্তা বা ভাব লিখিয়া প্রকাশ করার সাধ্য তাহার নাই। (বর্তমান কালে) ইদানীং অন্ধদের শিক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্ধদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল স্কুলে অন্ধদের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে লিখিতে ও

পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অন্ধদের এই সকল বিদ্যালয়ে একপ্রকার উঁচু-অক্ষর-বিশিষ্ট বই দ্বারা বালক-বালিকাদের পড়ান শিক্ষা দেওয়া হয়। আঙ্গুলদ্বারা অনুভব করিয়া তাহারা এই সকল অক্ষর পাঠ করে। অন্ধরা স্বভাবতঃই সঙ্গীতানুরাগী। তাহাদের শ্রবণশক্তি নিভুল এবং প্রায়শঃই অন্ধগণ সুগায়ক হইয়া উঠে।

১৩

Omar Ibu

তারপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হয় জীবনে কোনদিন বোধহয় এরূপ গভীরভাবে ঘুমাই নাই। যখন আমার ঘুম ভাঙিল তখন সবে দিনের আলো ফুটিতেছে।

১১

Shylock the Jew, lived at Venice ; he was a usurer, who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men and particularly by Antonio, a young merchant of Venice ; and Shylock as much hated Antonio, because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the carry a water-skin therefore there was great enmity between this great as a ruler and good as a man. (C. U. 1943)

খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন ওমর ইব্‌ন আলি খাত্তাব। প্রজাদের ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য তিনি যে পরিমাণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেন ঠিক সেই পরিমাণে তাহাদের পরমার্থিক মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেরূপ ভাবে তাহাদের পরিচালনা করিতেন ঠিক সেইরূপ ভাবে তাহাদের উপাসনার সময়েও পরিচালনা করিতেন। রাজকোষ হইতে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না। ব্যক্তিগত আয় হইতে তিনি তাঁহার পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি প্রায়শঃই ছিন্ন তালি দেওয়া পোশাক-পরিচ্ছদে

মদিনার রাজপথে ঘোরাফেরা করিতেন। জেরুজালেম জয় করিবার সময়ে তিনি ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সাধাসিধে আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়াই নিজের হাতে নিজ উটটিকে ধরিয়া তিনি শহরের মধ্যে প্রবেশ করেন। একবার ওমর তীর্থযাত্রায় বাহির হন। মাটি হইতে একটি তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার ইচ্ছা (আমার সাধ হয়) আমি যেন এইরূপ তৃণের ন্যায় হইতে পারি। তিনি তৃণের ন্যায় বিনয়ী ও অকিঞ্চিৎকর হইতে চাহিয়াছিলেন। বিনয়ী ও নম্র হইবার সাধনায় তিনি স্কন্ধে মশক ঝুলাইয়া বেড়াইতেন। ওমর একজন মহানুভব নৃপতি ছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি যেমন শক্তিশালী ছিলেন, মানুষ হিসাবে আবার তদ্রূপ সাধুপ্রকৃতির ছিলেন।

১৪

Painting has been practised with great success by Indians. It was during the time when Buddha's influence was supreme in India that painting came to be highly developed. The finest example of Indian painting can be seen even now in the temples of Ajanta. These show how Indian painters were always eager to express the truths of their religion by means of picture. Even in the days of Mughals—painting continued to flourish, for many of the Mughal emperors were patrons of this art. There were also many Rajput painters who tried to paint such familar scenes and sights as can be seen everyday in India. Indian painters were also good at painting the portraits of living men and women. To-day India can still boast of some painters of great merit. Their work is appreciated not only in this country, but also abroad. (C. U. 1944)

ভারতীয়গণ বিশেষ সাফল্যের সহিত চিত্রবিদ্যার চর্চা করিতেন। বৌদ্ধ প্রভাব ভারতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকার সময়ে চিত্রবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। অজন্তার মন্দিরগুলিতে চিত্রবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি দেখা

যায়। ভারতীয় চিত্রকরগণ তাঁহাদের চিত্রে তাঁহাদের ধর্মের মূলসূত্রগুলি প্রকাশ করিতে কত যত্নবান ছিলেন তাহা এই সকল চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে। মুঘল আমলেও চিত্রকলার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, অনেক মুঘল সম্রাট এই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমান নরনারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনেও ভারতীয় চিত্রকরগণ পটু ছিলেন। বর্তমান কালেও ভারতবর্ষ কয়েকজন প্রতিভাবান চিত্রকরের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে। ইহাদের শিল্পকলা শুধু এদেশে নয় বিদেশেও আদৃত (প্রশংসিত) হইয়াছে।

১৫

A Chinese lady who was on a visit to India some years ago, said that she was much inpressed with beauty of the Taj-Mahal at Agra ; if she had seen nothing else then in India, she would have felt that her visit had not been in vain. She spoke about what even China had learnt from India. India had taught the people of China love of peace and tranquility. It has told them that they should live in a spirit of co-operation with the people of other countries ; that is to say that they should help other people and not subdue or destroy them. She also spoke those Chinese scholars who had visited India thousand of years ago and established a contact between the two countries. She felt that India had always been a source of good not only to China but to the world at large.

কয়েক বৎসর পূর্বে এক চৈনিক ভদ্রমহিলা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি আগ্রার তাজমহলের সৌন্দর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। যদি তিনি তাজমহল ব্যতীত ভারতের আর কিছুই না দেখিতেন তাহা হইলেও তিনি তাঁহার ভারত-ভ্রমণ বৃথা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। চীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তিনি

সে বিষয়েও উল্লেখ করেন। ভারত চীনবাসীকে বিশ্বের শান্তির প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দিয়াছে। ভারত চীনবাসীকে অপরাপর দেশবাসীর সহিত সহযোগিতার মনোভাব লইয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে; অর্থাৎ তাহারা অপরাপর দেশবাসীকে সাহায্য করিবে, তাহাদের দমন বা ধ্বংস করিবে না। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যে সকল চৈনিক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া এই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, ভারত চিরকাল শুধু চীনদেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের উৎস হইয়া আছে।

১৬

[illegible]
করার জন্য আপনার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া একচুলও যাইতে রাজী নন।

১৯

web—মাকড়সার জাল; fineness—সূক্ষ্মতা। for[illegible] সূক্ষ্মতার জন্য। protested—প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন। seven times round—সাতবার শরীরে জড়াইয়াছিলেন।]

২৫

word to [illegible]
When told that the Alps stood on the way of his armies, he replied, "There shall be no Alps". Again at the battle of Morango, which had been against the French during the first half of the day, Napoleon looked at his watch and said [illegible]

(C. U. 1945)

ভারতীয় সভ্যতা একটি বৃক্ষের ন্যায়। বহু প্রাচীন হইলেও এই বৃক্ষ সবুজ পত্রবহুল, ফলবান এবং বহুলোকের আশ্রয়স্থল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে বহুবিধ প্রভাবের ফলে এই ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি। মহেন-জো-দাড়োতে যাহারা বাস করিত তাহাদেরও কিছু দান ইহাতে রহিয়াছে। তারপর আর্যগণ আসিলেন। ইঁহারা ইহার ভিত্তি পত্তন করিলেন এবং কার্যতঃ ইহাকে রূপ-

দান করিলেন। দ্রাবিড়গণ তাঁহাদের সভ্যতার চিহ্ন ইহাতে রাখিয়া গেলেন। তৎপরে পারসীকগণ, গ্রীকগণ ও মুঘলগণও ইহাতে কিছু না কিছু দান করেন। ইংরেজগণ তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া আসিলেন। বর্তমান ভারতের সর্বত্র সেই সভ্যতার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই। এইভাবে আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত বহু প্রভাব ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে (হারায় নাই)।

১৭

The strength of character which we call moral courage, sometimes, instead of being respected, makes us the object of ridicule. This is because men do not think. Men do not

A Chinese lady who was on a visit to India some years ago, said that she was much inpressed with beauty of the Taj-Mahal at Agra ; if she had seen nothing else then in India, she would have felt that her visit had not been in vain. She spoke about what even China had learnt from India. India had taught the people of China love of peace and tranquility. It has told them that they should live in a spirit of co-operation with the people of other countries ; that is to say that they should help other people and not subdue or destroy them. She also spoke those Chinese scholars who had visited India thousand of years ago and established a contact between the two countries. She felt

শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মে না। একটিমাত্র শব্দের [illegible]

ব্যক্তির পরিচয় মেলে। ভ্রমাত্মক উচ্চারণ অথবা বর্ণাশুদ্ধির দ্বারা লোকের নিকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

২১

People living on the plains have strange ideas about the Himalayas. They think that a mountain is just a huge cone-shaped mound of rock, or earth, or stone, mostly stone, and

not too much trouble." You say, "No" to the question because you are not going past the post office, it means to your friend that you are not willing to go out of your way even a little to oblige him. (C. U. 1947)

নির্বোধ লোকেরাই লোকের উক্তির আক্ষরিক অর্থমাত্র গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অর্থের সন্ধান করে না। ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। যখন কোন লোক আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন "মশাই, আপনি ডাকঘরের ও'দিক যাবেন নাকি? হাঁ। মশাই?" তাহার মনের প্রকৃত ভাব এইরূপ "আমার একটা চিঠি যদি ডাকে ফেলে দেন ত' অনুগৃহীত হই, অবশ্য যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।" আপনি ডাকঘরের দিকে যাইতেছেন না বলিয়া হয়ত বলিলেন, 'না'; কিন্তু আপনার বন্ধু মনে করিল যে আপনি তাঁহার উপকার করার জন্য আপনার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া একচুলও যাইতে রাজী নন।

১৯

web—মাকড়সার জাল। fineness—সূক্ষ্মতা। for......
সূক্ষ্মতার জন্য। protested—প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন। seven times round—সাতবার শরীরে জড়াইয়াছিলেন।]

২৫

word to be found only in the ... [illegible]

When told that the Alps stood on the way of his armies, he replied, "There shall be no Alps". Again at the battle of Morango, which had been against the French during the first half of the dav, Napoleon looked at his watch and said, the battle is completely lost; but it is only two o'clock and we shall have time to gain another" He then made his famous cavalry charge and won the field. Washington lost more battles than he won, but he organised victory out of defeat and triumphed in the end. "Impossible!" echoed the elder Pitt, "I triumph upon impossibilities."

(C. U. 1941)

[*to regard nothing as impossible*—কোন-কিছুকেই অসম্ভব মনে না করা। *in the...fools*—নির্বোধের অভিধানে। *Stood........of*—পথে

হইয়া যায় না। পিতামাতার আদেশ পালন করিলে যেমন আমরা পিতা-মাতার ক্রীতদাস হইয়া যাই না, তেমনি শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিলেও ক্রীতদাসত্বের প্রশ্ন আদৌ উঠিতে পারে না।

২০

A well-educated gentleman may not know many languages—may not be able to speak any but his own—may have read very few books. But whatever language he knows, he knows precisely; whatever word he pronounces, he pronounces rightly. An uneducated person may know, by memory, many languages, and talk them all, and yet truely know no word of any—not a word ever of his own. The turn of expression of a single sentence will at once mark a scholar. A false accent or a mistaken syllable is enough to mark a man as inferior for ever. (C. U. 1949)

... at Agra; if she had seen nothing else then in India, she would have felt that her visit had not been in vain. She spoke about what even China had learnt from India. India had taught the people of China love of peace and tranquility. It has told them that they should live in a

(C. U. 1945)

Modern India—নব্য ভারত, নবীন ভারত। *dates*—জন্ম, সুরু হইয়াছে। *contact*—সংস্পর্শ। *era of....struggle*—দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের যুগ। *noble activity*—মহৎ ক্রিয়াকর্ম। *reform*—রূপান্তরিত করা, সংস্কার করা। *Social....life*—সামাজিক জীবনে। *realm... spirit*—আধ্যাত্মিক জীবন। *unify... politically*—রাষ্ট্রজীবনে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা। *impulse*—অনুপ্রেরণা। *have...direction*—নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন। *critical time*—সঙ্কটজনক অবস্থা। *shape*—আকার দেওয়া, গঠন করা।]

২৪

When the ruins of an ancient Indian town were discovered at Mohenjo-Daro in Sind and were dug up to find out how people lived in those days, cotton clothes were

that the Himalayas are not one peak, or mass, or even a cluster of peaks or masses but a whole vast chain, range or series of mountains. If India can be conceived as a house, the Himalayas are like boundary wall for this house, a vast snow-capped boundary, glittering like silver. Of the 1 00 peaks of the Himalayas, only two have been successfully scaled up till now. Man has shown great courage and

It is said that the Mughal Emperor ... his daughter for having so little clothing on her. The Princess protested that she had wrapped the Sari seven times round herself.

[ruins—ধ্বংসাবশেষ। were dug up—খনিত হইল। cotton cloths—কার্পাস বস্ত্র। those who know—বিশেষজ্ঞগণ। biggest industry—বৃহত্তম শিল্প। right....company—প্রাচীন কাল হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত। was prized—আদৃত হইত। spider's web—মাকড়সার জাল। fineness—সূক্ষ্মতা। for...her—আবরণের স্বল্পতার জন্য। protested—প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন। seven times round—সাতবার শরীরে জড়াইয়াছিলেন।]

২৫

Have you seen my pet cat? Her name is Rangia. I give her milk to drink. She is fond of both meat and fish. She will eat them even when they are raw. What sharp claws she has! If she has no claws, she would not catch rats and mice. She can draw her claws, so that you cannot see them. When they are drawn in, her paw feels quite soft and smooth. On a fine sunny day Rangia lies on the lawn. When it is cold she lies near the fire.

(C. U. 1974)

[*pet*—পোষা। *raw*—কাঁচা। *claws*—নখ। *draw in*—টানিয়া ভিতরে লওয়া বা লুকাইয়া ফেলা। *soft and smooth*—নরম ও মসৃণ। *sunny day*—রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। *lawn*—বাড়ির সম্মুখের মাঠ।

২৬

The result was that all the boys except myself were found to have spelt each word correctly. They went about saying "Gandhi is only stupid." The teacher later tried to bring this stupidity home to me, but without effect. I could never learn the art of 'copying'. Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. I was by nature blind to the faults of elders. Later I came to know of many other failings of the teacher, but my regard for him remained the same. I had learnt to carry out the orders of elders, not to scan their actions. (C. U. 1929)

[*The result was that*—ফলে ; ইহারই ফল এই হইল যে। *were spelt each word*—দেখাইলেন যে প্রত্যেক শব্দই (ঠিক ঠিক) বানান করিয়াছে। *stupid*—নির্বোধ। *to bring... home*—আমাকে (আমার বোকামি) বোঝাইবার। *without effect*—বৃথাই। *copying*—নকল করা, দেখিয়া দেখিয়া লেখা। *diminish*—হ্রাস করা। *failings*—ত্রুটি। *Scan*—বিচার করা।]

২৭

Ramsaran ran off with birthless speed to inform his master of what had happened. It was a holyday and several players had gathered together at Kedar Babu's house. The game was in full swing when Ramsaran burst in upon them. "Babu, Babu," he cried out, "come home at once". Mohendra Babu got frightened and asked, "what's the matter ? Any one taken ill ?" Ramsaran replied, "A robber has come to the house. He has brought a gun with him and says "I am the Babu's son-in-law." Upon this there was a general out-burst of laughter.

[*ran.......speed*—রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটিয়া গেল। *in full swing*—পুরাদমে। *burst....them*—ঢুকিয়া হইলেন। *there was....laughter*—সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।]

২৮

Presently when the procession reached the burning ghat it became clear that the performance of the rite of Sati was to take place. A woman was standing near the corpse who was evidently the wife of the dead body. She was waiting to be burned with him on the funeral pyre. The emperor Akbar was strongly opposed to this cruel rite and did all he could, to prevent it. He ordered that no wife was to be so sacrificed except of her own free will. Abbas Khan immediately determined to see with his own eyes that the imperial order was not destroyed in the particular case. (C. U. 1935)

[*Presently*—অবশেষে। *procession*—শোভাযাত্রা। *burning ghat*—শ্মশান। *performance of the rite of Sati*—সতীদাহের অনুষ্ঠান। *corpse*—শবদেহ। *evidently*—অভ্রান্তরূপে। *funeral pyre*—চিতা। *so sacrificed*—এইরূপে দাহ করা। *imperial order*—সম্রাটের আদেশ।

২৯

Rising very early in the morning, Sujata milked the best cows of the herd and taking the milk boiled some fine rice in it. Having cooked and sweetened the rice-milk with the greatest care, she poured into a priceless golden vessel and carrying it on her head went out to make her offering. As she approached the tree, which was, as she believed, the dwelling of the God, she noticed the figure of a man seated beneath its shade So glorious and gracious he seemed in the golden light of the morn that Sujata took him for the God who had answered her prayer. (C. U. 1936)

[*boiled*—সিদ্ধ করিলেন, রাঁধিলেন। *rice-milk*—পায়স। *priceless*—বহু মূল্যবান্। *offering*—পূজা নিবেদন। *answered her prayer*—তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন।

৩০

I had not got three steps in but I was almost as much frightened as I was before. I heard as very loud sigh, like that of a man in some pain. It was followed by a broken noise, as of words half expressed, I stepped back and was struck with such surprise that it put me into a cold sweat. With a great effort I stepped forward again and held up the light over my head. I saw lying on the ground a most frightful old he-goat dying of old age. I stirred him a little but he was so ill that he could not rise himself.

(C U. 1937)

[*I....steps in*—আমি তিন ধাপ মাত্র ভিতরে যাইতে না যাইতে। *broken noise*—ভাঙা ভাঙা কোলাহল, থামা থামা শব্দ। *half expressed*—অর্ধোচ্চারিত। *cold sweat*—শীতল ঘর্ম। *stirred*—সঞ্চালন করিলাম।]

অনুশীলনী

নিম্নের অনুচ্ছেদগুলি বাংলায় অনুবাদ কর :

গুচ্ছ (ক)

1. Travel is a part of education. He that travels into a country goes to school. If one travels with his eyes open he can learn much of the country. What he read from books can be learnt from our experience. It is tedious to sit for hours in a school, but it is always interesting to learn by travel.

2. There are many terrible tales told of the Octopus and its cousin the great Cuttle-fish ; but in reality, both these creatures are more harmful to the dwellers in the sea than they are to man.

3. The baby-Seals at first do nothing but sleep and feed and sleep again ; but as they grow older, they begin to frolic play together. But they do not at first venture into the water.

4. Long, long ago all the birds met together to talk about making nests.

"Every man has a house" said the Robin, "and every bird needs a home".

"Men have no feathers" said the Owl, "and so they are old without houses We have feathers "

"I keep warm by flying swiftly" said the Swallow.

5. A boy went into the water. He could swim as easily as a fish, and he went from shore to shore, some times talking with the fishes, sometimes getting a birch piece of stone. Suddenly something caught him by the foot and dragged him down, down through the deep, dark water.

6. There was once a king who had only one son. He loved him better than anything in the whole world. The king's greatest desire was to see his son married. One day the king called his son to him and said, "My son, you must choose a wife now. So please go on a travel and choose a wife. You must return within a year "

7. Napoleon was by no means a favourite, either with his teachers or with his school-fellows. In the first place, he did not look like a French boy, nor did he speak the language well. He never tried to gain friends. He learned history and geography well.

8. One day when the birds were all together, one of them said, "I have been watching men, and I saw that they had a king. Let us too have a king "

"Why ?" asked the others.

"Oh, I do not know, but men have one".

"Which bird shall it be ? How shall we choose a king ? Let us choose the most beautiful bird."

"Oh, no, let us choose the bird that sings most sweetly".

9 It is night. A man is knelling before a hole which he has dug in the earth : near him is his pick-axe, and a lantern. He has two bags of gold which he is putting in the ground. It is wise to save but foolish to save in this way.

10. Raja Rammohan Roy was one of the makers of modern Bengal. He was born of respectable parents at Radhanagar in the district of Hoogly on May, 1774. His father Ramkanto Roy and mother Tarini Debi were highly educated and pious. After completing his early education at home he went to Patna to study Persian and Arabic.

গুচ্ছ (খ)

11. Once upon a time there lived a dear little girl. Her name was Red Riding Hood. She was called Red Riding Hood because she wore a red hood. One day her mother said, "Red Riding Hood, I want you to see your grand-mother. Take to her this little basket. I have put in it a pat of butter and a slice of cake. Do not stop on the way. Do not run, for you might fall and drop the basket. Be sure to say "Good Morning to any one you may meet".

"I will do just as you tell me", said Red Riding Hood.

12. In a dark wood there once lay a man's shoes. No one knew how it came there No man had been near the wood. The wild animals who lived near by had never seen a man. But there in the wood was the shoe. The first one to see it was the bear. He poked it with his nose. He rolled it over and over with his paws. But he could not think what it was.

13. A thirsty cat found a jug half full of milk, wh'ch she tried to lap up. But the neck of the jar was so narrow that she could not reach the milk with her tongue. A bright thought came into her head. She dipped her paw into the jug, and brought it out covered with milk. She did this again and again till the milk w s all gone.

14. As Henry's parents were rather poor, he did not get much pocket-money. He was very fond of playing cricket. But he had no bat of his own. So he made one out of piece of wood. He used an old saw belonging to his father and a pocket-knife belonging to himself. The bat was not much to look at. But he was very proud of it. The first time he used it, he made twenty runs.

15. Like a lion that ends a flock of sheep without a shepherd, even so did Di omedes slay the men of Thrace. On this side and on that he slew, till the earth grew red with blood and terrible was he groaning of the dying men. Twelve men did he slay, and as he slew them, Odysseus dragged them to the side that a way might be left clear for the white horses of Rhesus.

16. Behind them the Greeks left a mighty horse of wood, and the men of Troy came and drew it into the city as trophy and sign of victory over those who had made it. But inside the horse were hidden many of the bravest warriors of Greece and at night, when the Trojans feasted, the Greeks came out of their hiding place and threw open the gates.

17. Long, long ago a great king named Nala reigned over one of the states of India. He had all the qualities of a good ruler; he was wise and brave and truthful; his own passions were under his control, he was skillful in the use of the bow, and in taming and driving horses. His neighbouring state was governed by Bhima, who was also a great and wise rajah. Now Bhima had a daughter, Damayanti, so lovely that even the

gods marvelled at her beauty, which was as that of the queen of heaven herself.

18. For many, many years the gods and the demons had striven together. The great Indra commanded the gods, and Visnu, the preserver gave them strength and encouragement, but they knew that they would never prevail in the long struggle without *amrita*, which would give those who tasted it eternal life. They determined to charm the ocean in order to obtain this magical food. The demons were to help them, but they resolved that when the *amrita* appeared, they would seize it and keep it for themselves.

19. In a sechlued mountainous part of Syria there was in old time a valley of the most surprising and luxuriant fertility. It was surrounded on all the sides by steep and rocky mountains, rising into peaks, which were always covered with snow, and from which a number of torrents descended in constant cataracts.

20. Man is by nature social and cannot live alone. Inspite of his selfish tendencies, he has always lived in the company of other human beings. From his very birth one individual is dependent upon others, and cannot develop by himself. As he grows, his outlook widens. It reaches out from the family to the village or the town, from the town to the country, from the country to the world.

গুচ্ছ (গ)

21. In the morning when thou risest unwilling, let this thought be present—I am rising to the work of a human being, why then am I dissatisfied if I am going to do the things for which I exist and for which I was brought into the world? Or have I been made for this to lie in bed-clothes and keep myself warm? But this is more pleasant—Dost thou exist then to take thy pleasure and not at all for action or exertion?

22. It has often been remarked that the position and build of a country have much to do with the character of its inhabitants. Dwellers in mountainous regions, independent in spirit, the inhabitants of tropical lands are frequently listless and idle, while those whose homes are in temperate climates are, as a rule, active and hard-working.

23. Now-a-days every child can read and every body, young and old, who live in a town of any size can go to the library and borrow a book to take home to read, without having to pay for it. This is simple to most of us that we often forget how different things are to-day from what they were even a short time ago. A good Library to-day is a busy and often a crowded place, with its reading room stocked with newspapers and magazines, where people come to see the news, to study the advertisements, or to pass an idle hour over a magazine.

24. Three hundred years ago when there were very few machines in industry, there was a great scarcity of coal. The reason for this was the lack of means to draw coal from deep pits. The only coal which could be obtained was mined from the surface or from mines which did not go far below surface. Horses, and some times even men and women raised the coal in baskets which were drawn by ropes. It was a laborious method.

25. A sailor's life in those days was a very rough and hazardous calling. Ship's boys were badly treated, being everybody's servant and very often receiving a kick or a cuff for their trouble. Ships were clumsy craft, the food was invariably bad and scarce, and a boy was a hardy creature who survived his apprenticeship as a sailor. There were

of preserving fresh food, and as ships were slow, crews were fed for weeks on scanty rations of salt beef.

26. Almost fainting, Oliver was dragged into court, where Mr Fang, the magistrate, heard his case. Mr Fang was a very stern man in a hurry to get home for his dinner. He had little time to waste in showing sympathy to young offenders like Oliver. The kind old gentleman, who was called Mr Brownlow, came into court. He took his card up to Mr Fang and laid it before him.

27. The story of History is the story of changing times. There is a well-known proverb which says, "happy is the country which has no history." This means that a country which has no violent changes, no wars, no sudden inventions to upset the peaceful living of people, is indeed happy.

28. At this time the Arabs were making spasmodic attacks on the Turks, but as the Turks had seen to it that the Arabs were not allowed to buy modern weapons, their attacks did not achieve much. The British Government decided to help the Arabs, and supply them with arms and amunitions, but as the Arabs seemed to be without a capable leader the British were at a loss to decide who to consign the arms to.

29. Jackson was, heart and soul, completely with the plain people. He was born in utter poverty, his father died before his birth. Reared in hardship, he developed keen sensitiveness and a lifelong sympathy with the oppressed. As a mere lad, he fought in the Revolution in which two brothers died. At fourteen he was alone in the world.

30. On his return to Calcutta, Shri Subhas Chandra met Deshabandhu C. R. Das, the leadr of Bengal. In Deshabandhu Das he found his Political Guru. Here was a leader, he acclaimed, who was conscious of his exact role, namely that of a practical politician. Their union reminded Bengal of another equally happy union referred to before—the union between Shri Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda.

গুচ্ছ (খ)

31. In the presence of this Cabuliwallah I was immediately transported to the foot of arid mountain peaks, with narrow little defiles twisting in and out amongst their towering heights. I could see the string of camels bearing the merchandise and the company of turbanned merchants, some carrying their queer old fire-arms, and some their spears, journeying downward towards the plains. I could see. But at some such point Mini's mother would intervene, and implore me to "beware of that man".

Rabindranath

32. The fever rapidly increased, and through out the night the boy was delirious. Bishamber brought in a doctor, Phatik opened his eyes, and looking up to the ceiling said vacantly "Uncle, have the holidays come yet ?"

Bishamber wiped the tears from his eyes and took Phatik's thin burning hands in his own and sat by his side through out the night. Again the boy began to mutter till at last his voice rose almost to a shriek ; 'Mother !' he cried, "don't beat me like that......Mother ! I am telling the truth."

—Rabindranath

33. Among the European community in India there is a class who not only hate the Native with their whole heart, but seem to take a pleasure in doing so. The existence of such a class of men cannot possibly be disputed. They regard the Natives as one of the vilest nations on earth, hopelessly immersed in all the vices which can degrade humanity, and bring it to the level of brutes. They think it mean even to associate with the Natives. —Keshab Sen

34. "Seek ye first the Kingdom of God" and that alone, and all things needful shall be added unto you. You have only to place your deepest faith in the Lord and He will do all that is good for you and your country. Bestir yourselves then, my brethren, and strive earnestly, humbly and prayerfully, to attain that faith which alone can give you true life and remedy all the manifold evils to which you are individually and nationally subject. —Keshab Sen

35. Some publishers and book sellers regard libraries, of all kinds, as their enemies : they think that they prevent the sale of books which the public would buy were they not able to borrow them. A little impartial consideration, however, will show how false this attitude really is. In the first place there are many books which no one wants to buy. But the library must gather some of them, in case people would want to read them. Thus libraries are friends of publishers.

36. "The daily service of the Mother Kali gradually awakened such intense devotion in the heart of the young priest that he could no longer carry on the regular temple-worship. So he abandoned his duties and retired to a small woodland in the temple compound, where he gave himself up entirely to meditation. These woods on the bank of the

river Ganges and one day the swift current bore to his very feet just the necessary materials to build a hut.

—Swami Vivekananda

37. There is a vast difference between saying "food, food" and eating it, between saying "water, water" and driking it. So by merely repeating the "God, God" we can not hope to attain realization. We must strive and practise. Only by the wave falling back into the sea can it become unlimited, never as a wave can it be so.

—Swami Vivekananada

38. "Shut up", said the ruffian, "unfasten your buttons and watch. Give them to me. Quick, quick, or I pull the trigger of my gun".

The man was shaking from head to foot. He saw the gun aimed at his head. He took his buttons and watch out and gave them to the ruffian.

The ruffian then shot a blank fire and disappeared.

As soon as the ruffian dispersed, the man raised a hue and cry. But none came to rescue him. He stood there in pitch darkness, his head began to swirl.

39. Unfortunately for us, our forefathers did not at first realise that the British constituted a grave threat to the whole of India and they did not therefore put up united front against the enemy. Ultimately, when the Indian people were roused to the reality of the situation, they made a concerted move—under the flag of Bahadur Shah in 1857, they fought their last war as free men.

40. Japan has been called the "Children's Paradise". Japanese parents are very good to their children and train

them to be polite and kind to each other. Indeed they are among the most polite Children in the world, and fond of fun and games, they rarely quarrel or fight. In a country where the houses are chiefly of wood, and where lamps and lanterns are so much used as in Japan, terrible fires often take place. (C. U. 1944)

41. Gokhale gave an affectionate welcome and his manner immediately won my heart. This was my first meeting with him and it seemed as though we were renewing an old friendship. Pherozashah Metha had seemed to me like the Himalayas and Tilak like the Ocean. But Gokhale was sacred as the Ganges. The Himalayas were unscalable and one could not easily launch forth on the sea, but the Ganges invited one to its bosom. It was joy to be on it with a boat and an oar. (C. U. 1932)

42. The fight went on. A wind swept over the plain and raised a storm of dust and sand, which hid the pair of warriors from the sight of the armies. And the two fought in the gloom, while round them the sun shone upon the sand and the broad Oxus stream sparkled in sun-light. Rustum struck the shield which Shorab held out stiff in his left arm. Then Shorab smote with all his might and Rustum had to bow his head. But Shorab's blade was severed to pieces against the steel helmet of his foe. Now the turn had come for Rustum. He shook his menacing spear on high and before charging, gave the mighty shout 'Rustum'. And at that name, Shorab shrank, amazed, and as the *shield* dropped from his hand, the spear pierced his side and he fell. (C. U. 1940)

গুচ্ছ (ছ)

43. Libraries are another important agency of self-education for adults. A popular library movement is even

did not understand how his caste could go so easily. He said, "I find liftle difference between man and man, I find them all alike, I love them equally."

67. One night Shivaguru's wife had a dream in which she was told, 'Noble lady, your prayers have been heard You will soon have a son, and a very wise one, but he will not live long. Yet he will be remembered long, long after his death.' The lady awake, both joyful and sad : joyful— because she would soon be a mother, sad—because her son would not live long. She only hoped that she would not live to see her son die—certainly she would die earlier. One bright day a son was born to her. The mother looked on the bady on her lap and then at the sun in the sky, and she knew not which of the two was brighter.

68. An Englishwoman was very fond of travel. On the death of her parents she left on a foreign tour and at last reached Africa. Then Africa was known as the dark country. The woman began to travel through the forests of Africa. Once she reached a village and wanted to spend the night there. But the cries of the people kept her awake. She heard that a leopard had been caught in a trap. She was move by the pitious cries of the leopard. She got up and walked towards it in the dark, On reaching the trap she uprooted the wooden aupports one by one. She had thought that the leopard, on gaining its freedom, would rush to the jungle ; but instend of doing so, it began to moved round her like a pet dog.

69. The village was full of houses but no man could be found. There were rows of shops in the bazar, series of huts

in the market, hundreds of mud houses in every part of the village with high and low brick buildings at places. Today stillness prevailed everywhere. The shops were closed in the bazar, the shopkeepers had flied away, no one knew where. Today was a market day but there were no buyers and sellers. Even beggars were not out for alms. The weaver had stopped working and lay weeping in one corner of the house. The tradesman had forgotten his trade and was weeping with his baby in his arms. The teacher had shut his school and even children did not dare to cry.

70. If we would profit by our reading, we must be careful not only to select proper books, but also to persue them right. The same book will affect its readers differently according to the purpose with which they read it. The butterfly flies over to flowerbed, gathering nothing ; the spider collects poison from it ; but the bee finds and stores up honey and so the objects for which you go to a book will determine the kind of fruit it will yield to you. The child takes off the lid of a tea-kettle for sport, the housewife for use—but James Watt for science, which resulted in the improvement of the steam-engine.

71. Modern India dates from India's contact with the West. Naturally this has been an era of strife and struggle. But it has also been a time of noble activity. Indians have done much valuable work in the fields of learning, science and knowledge and they have always tried to reform themselves in the social spheres of life. In the realm of the spirit, too, they have made every effort to advance and unify India politically. The impulse for all this has come from different directions and from different men. Of all the persons who

have given a direction to the life of new India the most honoured is Raja Rammohan Roy. He was born at a critical time in the history of this country and he did much to shape its political, social and religious life.

72. Indian civilization has been like a tree which, though very old, has still green leaves, bears fruits, and gives shelter to many person. Historians tell us that many influences have gone to the making of Indian civilization. The peole who lived at Mohen-Jo-Daro contributed something to it. Then came the Aryans who laid the foundation of it and practically perfected it. The Dravidians also left their mark on it. Then the Persians, the Greeks, and the Mughals added something to it. The English brought witn them their own culture, the traces of which we find everywhere in India to-day. Many influences, in this way, from within as well as without, have had an effect on Indian civilzation, but it has retained its own characteristics.

73. When the ruins of an ancient Indian town were discovered at Mohen-Jo-Daro in Sind and were dug up to find out how people lived in those days, cotton clothes were found. That, we are told by those who know, was five thousand years old. Even to-day our biggest industry is that of making cloth out of cotton. Indeed, right down the ages to the time of the East India Company, cloth made in India supplied the markets of Asia and Europe. The work of India's weavers was prized all the world over. The muslin of Decca wae compared to the spider's web for its fineness. It is said that the Mughal Emperor Aurangzeb once rebuked his daughter for having so little clothing on her. The princess protested that she wrapped the sari seven times round herself.

74. Much of the happiness and purity of our lives depend on our making a wise choice of our companions and friends. If badly chosen, they will certainly drag us down ; if well, they will raise us up. Yet many people leave the selection of their friends to chance, though in the choice of a dog or a horse, they exercises the greatest care. It is well and right to be courteous to every one with whom we are brought into contact, but to choose them as real friends is another matter. Some seem to make a man a friend because he lives near, or because he is in the same profession. There cannot be a greater mistake. Much as our worthy friends add to the happiness and value of life, we must in the main depend on ourselves, and every one is his own best friend or worst enemy.